গায়ত্রী সন্ধ্যা

সেলিনা হোসেন

BanglaBook.org

সেলিনা হোসেন রচিত 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়। দীর্ঘ আটাশ বছরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। আটাশ বছর কালের পরিধিতে বড় সময় নয়, কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের জন্য বড় সময়। এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে নানা ঘটনা। যেসব ঘটনার অভিঘাত তৈরি ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে লাভ করেছিল স্বাধীনতা। ধোপে টেকেনি এ স্বাধীনতার আদর্শগত ভিত্তি। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঙালি অর্জন করে একটি পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং স্বাধীন ভূখণ্ড। এ জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালে তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পট-পরিবর্তন হয় ইতিহাসের। শুরু হয় বাঙালির উল্টো যাত্রা।

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাস এই সময়ের শিল্পিত শব্দরূপ। সময়ের এই পরিধি পূর্ববঙ্গের বাঙালি অধিবাসীর জীবনের দিকবলয়। একটি সূচনা থেকে অন্য সূচনায় প্রবেশের ক্রান্তিকাল।

এতবড় পটভূমিতে এমন একটি উপন্যাস আর লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙালি জীবনের এই দলিলকে অসাধারণ দক্ষতায় বাঙ্ময় করেছেন সেলিনা হোসেন।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। পরপর তিন বছরে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি খণ্ড। ২০০১ সালের মধ্যে প্রথম দু'টি খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ হয়েছে, তৃতীয় খণ্ডের দু'টি মুদ্রণ হয়েছে। এত অল্প সময়ে এই বইয়ের তিনটি মুদ্রণ নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।

পাঠকের বিচারই একটি উপন্যাসের বড় মানদণ্ড। সময়ই বলে দেয় কালের রুচিতে তার অবস্থান কী। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' বড় একটি যাত্রার জটিল শিল্পরূপ হলেও পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে উতরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাই এই ত্রয়ী উপন্যাসের অখণ্ড রূপ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই ত্রয়ী উপন্যাসটি পাঠককে একসঙ্গে দেয়ার প্রত্যাশা থেকে আমাদের এই আয়োজন। আমাদের বিশ্বাস শুধু এই প্রজন্ম নয়, আগামী প্রজন্মের মাঝেও এ উপন্যাস সমাদৃত হবে। সমাদৃত হবে এ কারণে যে শিল্পের মাঝে পাঠক আবিষ্কার করবে নিজেকে, নিজের ইতিহাসকে। শুধু তাই নয় এ উপন্যাস পাঠকের নিজের কাহিনী। কোনো একজনের নয়, একসঙ্গে সবার। এ উপন্যাসে পাঠক পাবে নিজের অতীতের মাঝে সমকালের চিত্র। যে চিত্র সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন রূপে কখনো ফিরে আসে ভিন্ন সময়ে। উপন্যাস যোগসূত্র ঘটাবে অতীত এবং বর্তমানের। যে বর্তমান পুরনো হবে না পাঠকের নান্দনিক বোধের কাছে। এই প্রত্যাশাই আমাদের কাম্য।

১ জানুয়ারি ২০০৩

ফরিদ আহমেদ
স্বত্বাধিকারী
সময় প্রকাশন

সেলিনা হোসেন : জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭। রাজশাহী শহরে। পৈতৃক নিবাস লক্ষীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। বাবা এ কে মোশারাফ হোসেন। মা মরিয়মন্নেসা বকুল। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। ষাটের দশকের মধ্যভাগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে লেখালেখির সূচনা। সেই সময়ের লেখা নিয়ে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো নিজের উদ্যোগে। লেখক হবার বাসনা থেকে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরি পাবার অতিরিক্ত যোগ্যতার বিবেচনা হিসেবে।

সেই তো শুরু। বর্তমানে উপন্যাসের সংখ্যা ২১টি। গল্পগ্রন্থ ৮টি। প্রবন্ধ ৬টি। কিশোর সাহিত্য ১০টি। ভ্রমণ তাঁর নেশা। দেশের আনাচে-কানাচে নিয়মিত ঘুরে বেড়ান। দেশের বাইরে ভারত, নেপাল, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণ করেছেন। দেশের উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলো পেয়েছেন। 'যাপিত জীবন' উপন্যাসটি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চারটি উপন্যাস নিয়ে এমফিল থিসিস রচিত হয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ও 'যাপিত জীবন' সমকালীন সাহিত্য-পত্রে পাঠ্য।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠী, কানাড়ি, মালয়ালাম, রুশ, মালে, ফরাসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে 'হাঙর নদী গ্রেনেড' এবং ১৯৮৩ সালে 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পায়। ২০০০ সালে 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পায়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'হাঙর নদী গ্রেনেড' মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়ে কেরালা থেকে প্রকাশিত হয়। 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে ২০০৩ সালে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

গায়ত্রী সন্ধ্যা

(অখণ্ড)

সেলিনা হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সময় প্রকাশন

গায়ত্রী সন্ধ্যা (অখণ্ড)
সেলিনা হোসেন
© লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৭
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৩

সময়

সময় ৪০৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র

গোলাম মোস্তফা
কম্পিউটার কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য: ৭৫০.০০ টাকা মাত্র

GAWOTRY SONDHA by Selina Hosain. First Published February Bookfair 2003, 3rd Print in December 2013 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com
Writer's E-mail: selinahosain@yahoo.com

Price: Tk. 750.00 only

ISBN 984-458-409-4 Code 409

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে www.rokomari.com, www.boi-mela.com

উৎসর্গ

যে পরাক্রান্ত, ইতিহাস সৃষ্টি করে
তার জন্য আহ্বান : তিষ্ঠ ক্ষণকাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

একটি স্বপ্নের ঘোরে আমি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ী উপন্যাসটি লিখি। এর অখণ্ড প্রকাশের প্রুফ দেখার সময় বারবারই মনে হয়েছে কীভাবে লিখলাম।

স্বপ্ন ছিল একটি ট্রিলজি লেখার। বড় পটভূমি নিয়ে কাজ করব এমন তাগিদ ছিল নিজের ভেতরে। কতটা হয়েছে সেটা সময় বিচার করবে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, এটুকু আমার সান্ত্বনা। পাঠকের রুচিতে শিল্পের দাবি পূরণ কঠিন কাজ। তবু লেখকের চেষ্টা অন্তহীন। প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ ক্ষমতার কাছে নতজানু হন। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। জয়তু পাঠক।

ভাবিনি এত দ্রুত 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ী উপন্যাসের অখণ্ড প্রকাশিত হবে। সেটি সম্ভব করলেন সময় প্রকাশন-এর ফরিদ আহমেদ। একসঙ্গে এই উপন্যাসটি পাওয়ার পাঠকের ইচ্ছা তিনি পূরণ করেছেন। এর আগে দুটি খণ্ডের তিনটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ খণ্ডটি মুদ্রিত হয় দু'বার। তিন খণ্ড মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আটশ পৃষ্ঠার এই বইটির তিনবার মুদ্রণ পাঠকের ভালোবাসার সাক্ষ্য। আশা করি অখণ্ড 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' পাঠকের চাহিদা পূরণ করবে।

একটি বই শুধু লেখক ও পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না, সম্পর্ক স্থাপন করে লেখক ও প্রকাশকের মধ্যেও। এই সম্পর্ক সততা ও নৈতিকতার। কারণ লেখকের কাছে বই সৃষ্টি হলেও প্রকাশকের কাছে বাণিজ্য। এই বাণিজ্যে লেখকেরও অধিকার বর্তায়। সেজন্য প্রয়োজন সুসম্পর্ক স্থাপনের ভেতর দিয়ে উভয়ের অধিকারকে সমুন্নত রাখা।

লেখক, পাঠক, প্রকাশকের ত্রিমুখী স্রোতে বই ভালোবাসার বন্ধন। ধারণ করে কালের কণ্ঠ। সমন্বয় ঘটায় অতীত ও বর্তমানের।

এই পটভূমিতে 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'র নতুন রূপে প্রকাশ লেখক হিসেবে আমার আনন্দ এবং পাঠক ও প্রকাশকের সঙ্গে সখ্য। সকলকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

১ জানুয়ারি, ২০০৩
বাড়ি ১৬/এ, সড়ক-২
শ্যামলি, ঢাকা-১২০৭

সেলিনা হোসেন

গায়ত্রী সন্ধ্যা

১ম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৯৯
প্রচ্ছদ : মঈন আহমেদ
উৎসর্গ : যে পরাক্রান্ত, ইতিহাস সৃষ্টি করে তার জন্য আহ্বান : তিষ্ঠ ক্ষণকাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

সাতচল্লিশ পরবর্তী সময় থেকে এ দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে তিন খণ্ডে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করি ১৯৮৫-তে। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংঘটিত ঘাত-প্রতিঘাত সংবলিত গভীর ও বিশাল সময় এ উপন্যাসের বিষয়।

এ সময়কে বোঝার অক্ষমতা আমার নেই, আছে রূপায়ণের যন্ত্রণা। কতোট সফল হতে পারবো কিংবা আদৌ পারবো কি না, এই দ্বন্দ্ব।

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' প্রথম খণ্ডের ব্যাপ্তি সাতচল্লিশ থেকে আটান্ন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা থেকে যে পাকিস্তানের জন্ম, সে পাকিস্তানে বাঙালিদের লড়তে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে। ৪৭ থেকে ৫৮ মহাকালের বিচারে হয়তো সময়ের একটি বিন্দুমাত্র, কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষের জীবনে তা ছিলো এক দীর্ঘযাত্রা। এ সময়েই এ দেশের মানুষ নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছিলো।

তিন খণ্ডে এ উপন্যাস লেখার কথা আমি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম। কাগজে সে সাক্ষাৎকার পড়ে বিদ্যাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী মজিবর রহমান খোকা উপন্যাসটি প্রকাশের আগ্রহ দেখান। তাঁকে ধন্যবাদ।

এ উপন্যাস সম্পর্কে এর পরবর্তী ধাপ আরো একটু অন্যরকম। ১৯৯২-র অক্টোবর মাসে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কনসালটেন্ট ডক্টর ভি.সি. যোশী আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার কোনো উপন্যাসের পরিকল্পনা থাকলে আমাকে একটি প্রজেক্ট-প্রোপোজাল দেবেন। আমরা একটি ফেলোশিপের কথা চিন্তা করছি।' আমি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'র তিন খণ্ডের প্রস্তাব দেই।

মাঝে পেরিয়ে গেছে এক বছর। এর মধ্যে আমার উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে ফেলেছি। ১৯৯৩-র নভেম্বর মাসে ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে ফেলোশিপ প্রদানের চিঠি পাই। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়টি অনুমোদন করে। বাংলা একাডেমী দু'বছরের শিক্ষা ছুটি দেয়।

এতোকিছুর মধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

সেলিনা হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মহানন্দা নদী পার হওয়ার সময়ে নৌকাতেই পুষ্পিতা ফিসফিস করে আলী আহমদকে বলে, শরীর খারাপ লাগছে– ব্যথা হচ্ছে।

আলী আহমদের বুক কেঁপে ওঠে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে পুষ্পিতার পিঠে হাত রেখে মৃদু স্বরে সান্ত্বনা দেয়, কী করবে, অনেকটা পথের ধকল সইতে হলো তো, সেজন্যেই দুর্বল লাগছে। ধৈর্য ধরো।

ব্যথায় পুষ্পিতার মুখ কুঁচকে থাকে। চোখে জল আসতে চায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলে নিশ্বাস কেমন ভারী হয়ে ওঠে, বুঝি দম বেরিয়ে যাবে। তখন নিজের ডান হাত দিয়ে আলী আহমদের বাম হাত চেপে ধরে। এসব অবস্থায় কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয়, ও জানে না। ও জানে ওর এখন ভরা স– যখন তখন ব্যথা উঠতে পারে কে জানে হয়তো উঠেই গেছে। এই আশঙ্কায় কুঁকড়ে থাকে পুষ্পিতা। আলী আহমদের বুকের ভেতর ঢুপঢাপ শব্দ, শব্দটা কিছুতেই থামবে না। কারণ এ এক অনিশ্চিত যাত্রা– ও প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে, পারে না। ক্রোধ এসে আচ্ছন্ন করে কিংবা অভিমান, নয়তো হতাশা অথবা অনিশ্চিতের ভয়। বুঝতে পারে যে পুষ্পিতাকে ধৈর্য ধরতে বলা অর্থহীন– একজন শিশুর বেরিয়ে আসার সময় হলে ও সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসবেই। পথ, নদী, নৌকা, মানুষ, লজ্জা– কোনো কিছুর ধার ধারবে না ও। ওর কাছে সব মিথ্যে, সত্য শুধু বেরিয়ে আসা এবং তারস্বরে চিৎকার করে নিজের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা। অস্তিত্ব? চমকে ওঠে আলী আহমদ, অস্তিত্ব কি? সেটা কি নিজের উপস্থিতি নাকি নিজের পরিচয়? নাকি দুটো মিলে একটা সত্য। আলী আহমদ কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে। সাহিত্যের ছাত্র ও, দর্শন বুঝবে কী করে। তবু মাঝে মাঝে এমন কাঁচা চিন্তা ওকে কষ্ট দেয়, বুঝে উঠতে না পারার কষ্ট। ও পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকায়, নরম-সরম সরল মুখ, ভয়ে আতঙ্কে এখন একটা পোকার মতো দেখাচ্ছে ওকে। নিজের সঙ্গে যোঝাযুঝি করছে। পারবে কেন? শিশুটিতো জানে না যে দেশ ভাগ হয়ে গেছে– ওর বাবা মাকে পালাতে হচ্ছে। মুসলমান হওয়ার অপরাধে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে ওরা। এখন থেকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ওদের খাঁটি জায়গা– এখানেই ওরা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শিশুটির দেশ হবে পাকিস্তান। একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই একজন মানবশিশুরও জন্ম।

এই দেশ কি ওর জন্য গৌরবের হবে? পাবে কি মাতৃভূমির সত্যিকার মর্যাদা? একত্রিশ বছর আগে ও নিজে যে দেশে জন্মেছিলো আজ সেখান থেকে উৎখাত হয়ে গেলো। এই শিশুর একই নিয়তি হবে না তো? না, ও আর ভাবতে পারে না। এখন এই মুহূর্তে কী হবে এই চিন্তায় আলী আহমদের হাঁটু কাঁপে। ও প্রাণপণে দুই পা জড়ো করে রাখে। ওর মুঠোর মধ্যে পুষ্পিতার হাত ঘামছে। নৌকায় নয়জন লোক। ওরা সবাই একই

গ্রামের, পরস্পরকে চেনে। একসঙ্গে যাত্রা শুরু হয়, বিভিন্নভাবে পথে এসে একত্র হয়েছে ওরা, হয়তো এক জায়গায় থাকবে না, হয়তো আরো কিছুক্ষণ পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আলী আহমদ ভেবে দেখলো তবু ওরা একই দড়িতে বাঁধা, ওদের পরিচিতি অভিন্ন। এই পাকিস্তানে ওরা উদ্বাস্তু বলে বিবেচিত হবে। যতই খাঁটি ঈমানদার মুসলমান হোক না কেন, পাকিস্তানের মুসলমানদের কাছে ওরা রিফিউজি। স্বাধীনতার জোয়ারে ইন্ডিয়া থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদ একজন বিপন্ন মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে। স্বাধীনতার স্বপ্ন মুছে যায় মন থেকে। রাষ্ট্রীয় তাণ্ডব কি মানুষকে এভাবে বিপর্যস্ত করে– যার দায়ভার বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন? ও নৌকার অন্য আরোহীদের মুখের দিকে তাকায়। কেউ কি ওর মতো ভাবছে? না, সবাই শোকে ম্রিয়মাণ– গাল ভেঙে গেছে, চোখ কোটরগত, দুশ্চিন্তায় কপালের শিরা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ কারো দিকে তেমন করে তাকাচ্ছে না, দৃষ্টি ভাবলেশহীন, নদীর ওপর দিয়ে দিগন্তরেখার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আলী আহমদ আনমনা হতেই যেন শুনতে পায় শিশুর কান্না। মুহূর্তে এক ধরনের প্রশান্তি ওকে তৃপ্তি দেয়। আর কিছুক্ষণ পর যে শিশুটি ভূমিষ্ট হবে সে বলতে পারবে আমার জন্মস্থান রাজশাহী, পূর্ব পাকিস্তান। রিফিউজি বলে কেউ ওর দিকে আঙুল উঁচিয়ে থাকবে না। এই নৌকা আর অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের পৌঁছে দেবে রোহনপুর, সেখান থেকে ট্রেনে রাজশাহী।

আলী আহমদ পুষ্পিতা এবং ছয় বছরের প্রদীপ্তকে নিয়ে নৌকার সামনের দিকে বসেছে। ওদের সামনে সামান্য ব্যবধানে বৈঠা হাতে মাঝি। পুষ্পিতা পা ছড়িয়ে বসতে চায়, বড় করে শ্বাস নেয়। নদীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস গলগলিয়ে ঢুকে যায় ওর মুখে। একটু আগে যে মুখটা পোকার মতো ছিলো, এখন সেটা প্রজাপতি, যে কারণে হোক কিছুটা রঙ ফিরে পেয়েছে, ওর ব্যথা কমে গেছে, ফলে ও কিছুটা স্বস্তি পায়। বাবার কথা মনে পড়ে ওর, বুক উজাড় করে আদর করতেন ওকে। বলতেন, ও পুষ্প, ওর কাছ থেকে পুষ্পের সৌরভ পাই। ওহ্ ভাবতে গেলে বুকটা কে যেন খামচে ধরে। চব্বিশ বছরের হাজার রকমের দিনগুলো মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি গ্রামে রেখে যাচ্ছে। আর কোনোদিন কি ওখানে ফিরে যাওয়া যাবে? বুকের ব্যথা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের ব্যথা কেমন একটা হেঁচকি দিয়ে বেড়ে যায়। ইচ্ছে হয় পা ছড়িয়ে বসতে, কিন্তু উপায় নেই, থাকবে কী করে– সব জমিনের তো একটা সীমানা থাকে, যে সীমানার বাইরে কেউই যেতে পারে না। টুটি চেপে ধরতে চায় ওরা, ওই ওরা, যারা খবরদারি করে। পুষ্পিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

নৌকার শেষ মাথায় বসে আছে ফজলে গাজী আর ওর মা। কদিন আগের দাঙ্গায় ওরা পরিবারের ষোল জন সদস্য হারিয়েছে। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে ওদের। নিয়ে গেছে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ধান-চাল সব। পুড়িয়ে দিয়েছে ভিটে। সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে ফসল ফলাবে ওরা, ওই ওরা, যাদের হাতে দা, সড়কি, বল্লম আছে। নির্মমভাবে কুচি কুচি করে কাটা হয়েছে ফজলে গাজীর বাবাকে, ওরা মা ছেলে কোনো রকমে বেঁচে গেছে। পুষ্পিতা এসব কথা ভাবতে চায় না, ভাবলে শরীর দুর্বল লাগে, পেটের ভেতরের বাচ্চাটা নড়ে ওঠে– মাছ যেমন পুকুরের পানিতে ঘাই দেয় তেমন করে। পুষ্পিতা ফজলে গাজীর মাকে দেখে– অস্বাভাবিক মোটা এবং কালো বলে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে কালো খালা ডাকতো, কীভাবে নামটা চালু হয়েছে পুষ্পিতার তা মনে

BanglaBook.org

নেই। ও দেখেছে কালো খালার ডাকসাইটে ভঙ্গি, নারী-পুরুষ সবাইকে কড়াভাবে শাসন করতে পারতো। তার ওপরে কেউ কোনোদিন কথা বলে জিততে পারেনি। কালো খালা যা বলেছে তা সবাইকে মানতে হয়েছে। একটা অদ্ভুত গুণ ছিল তার– যে কারো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তো, হয় গায়ে খেটে দিতো, না হয় টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। এসব ব্যাপারে তার কোনো না ছিল না। গাঁয়ের ছেলেমেয়ের কালো খালা ডাক কত সহজে হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। এই নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না তার। এখন কেমন নির্বিকার বসে আছে, দু'চোখ ফোলা, চোখের নিচে কালো রঙের বৃত্ত, কাঁদতে কাঁদতে কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। এখন মুখে কথা নেই, কোথায় যাচ্ছে জানে না, কী খাবে জানে না। গাছের নিচে থাকবে নাকি মাথার ওপর ছাদ থাকবে, এসব কিছু ভাবার শক্তি তার নেই। ফজলে গাজী বোকা-হাবা, বুদ্ধিহীন। মায়ের জন্য ও কিছু করতে পারবে না, মাকেই ওর জন্য করতে হবে। তবে পুষ্পিতা জানে কালো খালা একটা কিছু করে নিতে পারবে– সামান্য সুযোগ পেলেই হবে, বেশি কিছু তার জন্য দরকার নেই।

কাছেই হেডমাস্টার নসরুল্লাহ বসে আছে, সঙ্গে দুই ছেলে এবং স্ত্রী। ওরা হেডমাস্টারের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। দেবেই, ওই ওরা বলেছিলো, মাস্টারের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার বড় একরোখা মানুষ, একটুও ভাঙেনি। বরং কীভাবে কী করবে সেসব চিন্তাভাবনা করেছে। নাচোলে তার চাচাতো ভায়ের কাছে যাচ্ছে। চাচাতো ভাই ওসমান গনি অনেক আগে থেকেই চাইছিলো নসরুল্লাহ যেন ওদের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের দায়িত্ব নেয়। এতদিন কথাটা কানে তোলেনি, এখন সেই ভরসায় যাচ্ছে। নসরুল্লাহর বড় ছেলে মফিজুল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে আইএ পড়তো। ছোটটি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ওদের মা হাসনা বেগম রোগা, পাতলা গড়ন, এখন অসুস্থ– প্রবল জ্বর, একটু পরপর বমি করছে। নসরুল্লাহর কাঁধের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে আছে। কালো খালা মাঝে-মধ্যে কপালে হাত রেখে জ্বর দেখছে। গামছার কোণা ছিঁড়ে নদীর পানিতে ভিজিয়ে জলপট্টি দিচ্ছে। বোতলের মুখ খুলে গলায় এক চুমুক পানি ঢেলে দিলে হাসনা বেগম তৃপ্ত হয়। কালো খালার ভরসা হাসনা বেগম, যদিও রক্তের সম্পর্ক নেই, এক গাঁয়ের মানুষ এই যা। গাঁয়ে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও, কজন মানুষ এখন খুব কাছাকাছি হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চাইছে। আগামী দিনগুলো কীভাবে কাটাবে সেইসব ভাবনা ওদের মনে আনাগোনা করছে, কিন্তু কেউই পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝতে পারছে না বলে কথা বলছে না। নদীর জলে জলপট্টি ভিজিয়ে কালো খালা এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে হাসনা বেগম বলেছে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না হামিদা বু। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। একটা ব্যবস্থা হবেই। এইটুকু আশ্বাসেই কালো খালার হয়ে গেছে। এর বেশি সে চায়ও না। এইটুকু পেলেই বাকিটা সে গুছিয়ে নেবে। তাই এই মুহূর্তে কোনো ভাবাভাবির মধ্যে সে নেই। এই নৌকায় একমাত্র প্রদীপ্তই সত্যিকার অর্থে কিছু বোঝে না। এটা-ওটা প্রশ্ন করে। আলী আহমদ কখনো উত্তর দেয়, কখনো দেয় না। পুষ্পিতার হাতটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ওর কিছুই ভালো লাগছে না, জলের ঘূর্ণির মতো মাথার মধ্যে ভয়ের প্রবল ঘূর্ণি, তলিয়ে যাচ্ছে মানসিক শক্তি, চিন্তা ইত্যাকার বিষয়গুলো। ও আকাশের দিকে তাকায়, ছেড়ে আসা নদীর পাড় দেখে, তারও ওপাশে গাছের সারি এবং ঘর, একটি পরিপূর্ণ গ্রাম– শুধু মানুষেরা কেউ মৃতবৎ, কেউ উন্মত্ত হননকারী। কিন্তু এই মুহূর্তে গ্রামের সেই ভয়টা এখন আর নেই, এখন ওর বুকে অন্য ভয়, ভয়ের গুটলি

BanglaBook.org

পাকানো দড়িটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ওকে। কারণ পুষ্পিতা মা হবে, ডরামাস, যখন তখন ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসবে সে- যখন তখন-।

কারো মুখে কথা নেই। স্রোতের তোড়ে নৌকা দুলে ওঠে। পাকা মাঝির দক্ষতার সীমা নেই। অবলীলায় ঢেউয়ের মাথায় নৌকা উঠিয়ে দেয়, যেন সব বিপদের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই মানুষগুলোকে। মাঝে মাঝে নদীর সঙ্গে কথা বলে, ওরে রাখ, রাখ। বেশি খেপিস না। তুই খেপলে মা আমরা যাবো কোথায়?

প্রদীপ্ত মাঝির কথায় হেসে উঠে হাততালি দেয়। মাঝি চোখ বড় করে ওর দিকে তাকায়। বলে, বাবুরা কেউ নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে বসেন। দেখছেন না নদীর ভরা বর্ষা। বর্ষা কালেইতো নদী পোয়াতি হয়।

শিউরে ওঠে পুষ্পিতা। নদী পোয়াতি হয়? এটা কেমন কথা। কই কোনোদিনতো ও এমন কথা শোনেনি। নাকি মাঝি বানিয়ে বলছে? সারাদিন নদীর বুকে থাকে তো তাই আবোল-তাবোল অনেক কিছু ভাবে। পুষ্পিতা মাঝির ওপর বিরক্ত হয়। লোকটার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হয়তো দু'চার দিন কামায়নি, কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। রোগা, খিটখিটে শরীর, গলার হাড় জেগে আছে, বড় একটা মাদুলি দু'হাড়ের মাঝখানে। সবুজ রঙের ফতুয়া পরেছে। পুষ্পিতার জানতে ইচ্ছে করে মাঝির নাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়, আবার হয়তো ধমকে উঠবে। একটু আগে কথা বলতে নিষেধ করায় আলী আহমদ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। বাম হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে রেখেছে। প্রদীপ্ত গোঁ গোঁ করে বলছে, বাবা ছেড়ে দাও। আমি আর কথা বলবো না। পুষ্পিতা অবাক হয়ে আলী আহমদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝি একটা ধমক দিয়েছে, তাই বলে ছেলের মুখটা অমন করে চেপে ধরতে হবে? সবকিছুই ওর কাছে কেমন উদ্ভট লাগে। আলী আহমদ প্রদীপ্তর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলে প্রদীপ্ত মুখে একটা আঙুল পুরে চুপ করে বসে থাকে। পুষ্পিতা হেসে ওর চুল ঝাঁকিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত মার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

পুষ্পিতার এখন একদম ব্যথা নেই। তাই ও স্বস্তি বোধ করে, ব্যথা যদি দু'চার দিন থাকে তাহলে তো কথাই নেই, রাজশাহী পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি অতদিন না থাকে? তাহলে কি হবে? ভাবতেই শরীর হিম হয়ে আসে। প্রদীপ্ত হওয়ার সময় আট দিন ব্যথা ছিলো, কী যে কষ্ট হয়েছে। মনে করলে ঠোঁট এখনো নীল হয়ে উঠতে চায়। আট দিন অপেক্ষা করার পর ওর বাবা যখন সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, তখনি প্রদীপ্ত হয়। কী বড়সড়ো, কী সুন্দর ছেলে। দাই বুড়ি ন্যাকড়ায় জড়াতে জড়াতে বলেছিলো, ছেলে তো নয় আকাশের চাঁদ। মায়ের কোল জুড়ে থাকবে। পুষ্পিতা কথা বলতে পারেনি। অসহনীয় ব্যথায় ওর শক্তি তখন প্রায় নিঃশেষ। নির্জীবের মতো পড়েছিল বিছানায়। দু'দিন উঠতেই পারেনি। এখন এই শিশুটি কি করবে? ভেতরে বসে বসে কীসের পাঁয়তারা করছে? এসব ভাবতে ভাবতে নদীর প্রসঙ্গে ফিরে আসে ও। নদী পোয়াতি হলে কি ব্যথা হয়? তরঙ্গ কি নদীর ব্যথা? মাঝিকে জিজ্ঞেস করতে চায়, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে যেই মুখটাকে বিশ্রী লাগছিলো, এখন সেই মুখে গভীর মনোনিবেশ। একাগ্র মনে নৌকা বাইছে। চোখের পাতা স্থির, অচঞ্চল। ঢেউয়ের দিকে নজর রাখছে, ঢেউতো ইচ্ছে করলে নৌকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে। নদীকে কী বিশ্বাস আছে? হাসি পায় পুষ্পিতার। মানুষকে কী বিশ্বাস আছে? যারা এতদিন ভাইয়ের মতো ছিলো, তাদের হাতে এখন ছুরি, রক্ত দেখে, মৃত্যু দেখে একটুও বিচলিত বোধ করে না। পুষ্পিতা প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবনাগুলো সরিয়ে রাখে, ভয় যদি ব্যথা ওঠে, যদি শিশুটি বেরিয়ে আসার জন্য বেপরোয়া

BanglaBook.org

হয়ে যায়। তার চেয়ে ও ঘুমিয়ে থাক, উষ্ণতায়, আমেজে, নিভৃতে। অমন নিরাপদ আবাস কি ও এই পৃথিবীতে পাবে? তখন ও অনুভব করে ব্যথা বুঝি আবার শুরু হচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে মাঝি ঘাটে নৌকা ঠেকায়, ঘাট ঠিক নয়, কাদামাখা নদীর কিনার- পিচ্ছিল, জলজ ঘাসে আচ্ছাদিত। মাঝি লগিটা পুঁতে নৌকা ঠেকিয়ে রেখেছে। পাড়ে মানুষের কোলাহল। যারা আগের খ্যাপে এসেছে তারা উচ্চস্বরে কথা বলছে। বোঁচকা-বুঁচকি এলোমেলোভাবে ছড়ানো। পাড়ের দিকে তাকিয়ে মাথা ধরে যায় আলী আহমদের। এদিকে জল-কাদার সংঘর্ষে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। পুষ্পিতা কিভাবে নামবে চিন্তা করে ভয় পেয়ে যায়। মাঝি চেঁচাচ্ছে, নামেন, সবাই নামেন। আমার তো আবার যেতে হবে। সবাই জুতো খুলে হাতে নেয়, ঘাড়ে-পিঠে যার যার বোঁচকা-বুঁচকি। কালো খালা সবার আগে নামে, সরাসরি কাদায়, শাড়ি খানিকটুকু উঠিয়ে হাতে ধরে রেখেছে। তার পঁয়ত্রিশ বছরের সংসার, কিন্তু তার হাতে কিছু নেই। কাপড়ের দুটো পুঁটলি ফজলে গাজীর হাতে, ও কাদা পেরিয়ে উপরে চলে যায়, কিন্তু কালো খালা দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্পিতা এবং হাসনা বেগমের জন্য। ও জানে ও না ধরলে ওরা নামতে পারবে না। তাছাড়া জ্বর গায়ে হাসনা বেগমের কাদাজলে নামাও ঠিক হবে না।

ও দু'হাত বাড়িয়ে নসরুল্লাহকে বলে, ভাবীকে আমার হাতের ওপরে দেন, আমি কোলে করে পাড়ে নিয়ে যেতে পারবো।

হেডমাস্টার ইতস্তত করে, তা কি হয়? আপনি-

কোনো অসুবিধে নেই। আপনি দিয়ে দেখুন।

জ্বরের ঘোরে হাসনা বেগম মৃদু আপত্তি করে কিন্তু এর বেশি কিছু বলতে পারে না। মফিজুল দ্রুত গিয়ে মাকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে কালো খালার কাছে দেয়। নদীর পাড় পিচ্ছিল হয়ে আছে, পড়ে যাবার সম্ভাবনা- কালো খালা ঘাসের ওপর পা রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে পাড়ের ওপর ওঠে। বুকে হাঁফ ধরে যায়- বড় করে শ্বাস নেয়। হাসনা বেগমের গায়ের উত্তাপ কালো খালার শরীর তাতিয়ে দেয়। ও বুঝতে পারে যে জ্বর তো কমেনি বরং বেড়েছে, পুড়ে যাচ্ছে শরীর। হাসনা বেগমকে একটা বড় গাছের ছায়ায় বসায় ও। হাসনা বেগম অবসন্নের মতো গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। ওর সামনে থেকে নদী, গাছ, মানুষগুলো মুছে যেতে থাকে। দেখতে পায় না আলী আহমদের হাত ধরে কাদা ভেঙে কীভাবে উঠে আসছে পুষ্পিতা। নদীর ঢালু পাড় বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে ওর। এক পা দু'পা ফেলে তিন পা দেবার বেলায় ও দাঁড়ায়। শক্ত হাতে আলী আহমদকে আকঁড়ে ধরে। আলী আহমদের উপায় থাকলে ওকে কোলে করে পাড়ে নিয়ে যেতো কিন্তু কী করবে, চারদিকে মানুষ, সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। এক ধরনের সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কারণ পুষ্পিতা মা হবে, ওর গর্ভে শিশু। এমন অভাবনীয় দৃশ্য তো মানুষ দেখতেই চাইবে, মানুষের কী দোষ- মানুষের ভেতর আবেগ আছে, তৃষ্ণা আছে, লোভ আছে। পুষ্পিতা হাঁফিয়ে ওঠে, আর পারে না। সবচেয়ে বড় কথা ও মানুষের দৃষ্টির সামনে থেকে নিজেকে লুকোতে চায়, পারবে কেন? যে উদরে মানব শিশু থাকে, মানুষ সে উদরের দিকে তাকিয়ে থাকবেই, মানুষের কী দোষ। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে একদমই আড়াল করতে চায় না। তখন কালো খালা এসে পুষ্পিতাকে ধরে, জাপটে ধরে আড়াল করতে চায়- লোকলজ্জা থেকে, মানুষের দৃষ্টি থেকে। পাড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরে মেয়েরা, আহা বেচারা। ভরা মাস নাকি গো? কালো খালা মাথা নাড়ে, পুষ্পিতা ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকোয়।

মুখটা অমন করছো কেন বাছা? ব্যথা হচ্ছে? পুষ্পিতা ঘাড় ঘুরিয়ে বুড়িকে দেখে। তারপর হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

BanglaBook.org

দেখেই বুঝেছি, সময় বেশি নেই।

পুষ্পিতা গাছের নিচে হাসনা বেগমের কাছে বসে। মফিজুল প্রদীপ্তকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে ওখানে নামিয়ে দেয়। ও মায়ের পাশে গুটিসুটি বসে থাকে। বাকিরা ট্রেনের খোঁজে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়। বিকেল পড়ে এসেছে, একটু পর সন্ধ্যা নামবে, নদীর ঘোলা জলে চিকচিক করে সূর্যের শেষ আভা। পাশে বসে কালো খালা এক টুকরো আখ ভেঙে চিবোচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'এক টুকরা প্রদীপ্তকে দিচ্ছে। পুষ্পিতা দেখতে পায় প্রদীপ্তর মুখে খুশি, আখ চিবিয়ে অনেক দূরে ছুঁড়ে মারে ছিবড়া। এক টুকরা শেষ হলে আর এক টুকরো পায় কালো খালার কাছ থেকে। পুষ্পিতার মনে হয় দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য খেলা গড়ে উঠেছে– এভাবেই খেলা গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে মানুষের খেলা– কেউ মুখে তুলে দেয়, কেউ ছিবড়ে বানায়, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কালো খালাকে কখনো কখনো প্রদীপ্তর মতো শিশু মনে হয়, প্রদীপ্ত কখনো কালো খালার মতো বয়স্ক– দু'জনের মুখ ওলোটপালোট লুটোপুটি খায় পুষ্পিতার সামনে। সামনে নদী, পেছনে ধান ক্ষেত, ধান কাটা হয়ে গেছে, নাড়া ক্ষেতে চড়ুই পাখির কিচিরমিচির, পড়ে থাকা ধানের গুছি মুখে নিয়ে দৌড়ে যায় ইঁদুর, বেশ বড়োসড়ো মোটা ইঁদুর। পুষ্পিতার এখন সময় নেই, ভরা মাসে কারো ইচ্ছেমাফিক সময় থাকে না, নইলে ও এই চড়ুই এবং ইঁদুরের সঙ্গে খেলায় নামতে পারতো– ইদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে অনায়াসে তুলে আনতে পারতো সোনালি শস্য, যা দিয়ে হতে পারতো চড়ুইভাতির উৎসব। পুষ্পিতার বুকের ভেতর কান্না জমে থাকে, ওর সামনে থেকে চড়ুইভাতির উৎসব শেষ– চড়ুইয়ের কিচিরমিচির গান হয়ে উঠবে না। ভুনো খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস রান্না হবে না কোনো এক নদীর চড়ায়। ওরা একদল ছেলেমেয়ে হল্লা করতে করতে ফিরবে না যার যার ঘরে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে না যে ভোরে উঠে ইঁদুরের গর্তে জমিয়ে রাখা ধানগুলো তুলে আনতে হবে। লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগে দেখতে হবে যে ইঁদুর আছে কি না, নইলে কামড়ে দেবে আঙুল। পুষ্পিতা টের পায় ওর বুকের ভেতরে এক ইঁদুরের কামড়ের ক্ষত– খুবলে খেয়েছে একটা অংশ। ও মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে। নদীর দিকে তাকায়। নদীর জলে কালো ছায়া নেমে আসছে। দু'জন অসম বয়সী মানুষের আখ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওদের সামনে একগাদা স্তূপ, মাছি উড়ে এসে বসছে, ছিবড়ে থেকে রস শুষে নিতে চাইছে। মাছি উড়ে আসে পুষ্পিতার মুখের ওপর। কালো বড়ো মাছি। তখন প্রদীপ্ত পুষ্পিতার গলা জড়িয়ে ধরে, মা খিদে পেয়েছে। পুষ্পিতা সঙ্গের পুটলি থেকে একমুঠো চিঁড়ে বের করে ছেলের হাতে দেয়। প্রদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে চিঁড়ে, আমি খাবো না, কিছুতেই খাবো না। শুকনো চিঁড়ে কি খাওয়া যায়?

পুষ্পিতা অসহায়ভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। ও নিজেও জানে শুকনো চিঁড়ে খাওয়া যায় না। ফেলে দেওয়া চিঁড়ের ওপর উড়ে আসে একটি কাক। পুষ্পিতা আঙুল উঁচিয়ে ওকে কাক দেখায়, ঐ দেখো, তুমি তো খেলে না, কাক খাচ্ছে তোমার চিঁড়ে।

আমি খাবো কেন? আমি কি কাক?

পুষ্পিতার বুক মুচড়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় বলতে, হ্যাঁ মানুষও কখনো কখনো কাক হয়। কিন্তু প্রদীপ্তকে তো এই কথা বলা যায় না।

প্রদীপ্ত মার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, বলো, বলছো না কেন? আমি কি কাক?

আমি তো জানি না। তাহলে, তুমি বলো আমরা কি?

আমরা কি?

প্রদীপ্ত সমস্যায় পড়ে যায়। ও কোনো জবাব দিতে পারে না। ও একবার মাকে

BanglaBook.org

দেখে, একবার কাক, কাকটা একমনে চিঁড়ে খুঁটে খাচ্ছে। প্রদীপ্ত হুশ করে কাকটা তাড়িয়ে দেয়। পুষ্পিতা বিড়বিড়িয়ে বলে, মানুষ না চাইলেও কাক হয়ে যায়। মানুষের সাধ্য কি সবসময়ে ভালো থাকার? তখন কালো খালা চমকে ওর দিকে তাকায়, তুই ঠিকই বলেছিস পুষ্পিতা, মানুষ কখনো কাক হয়, এই আমি যেমন এখন কাক। পুড়ে গেছে আমার শরীর, কলজে। তুই ভেবে দেখ পুড়ে আমার ভেতরটা কাকের মতো কালো হয়ে আছে। ঐ কলজে কি আর কোনোদিন সাদা হবে রে?

কালো খালা আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে। পুষ্পিতারও চোখ ভিজে যায়। ইচ্ছে হয় ছয় বছরের বালিকা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে। প্রদীপ্ত কাকটা তাড়িয়ে দিলেও একটুপর আবার ফিরে আসে, চিঁড়ে খেতে শুরু করে। ওরা তিনজনে তাকিয়ে থাকে, কেউ কোনো কথা বলে না।

আলী আহমদ ও মফিজুল কাছে এসে দাঁড়ায়। মফিজুল হাসনা বেগমের কপালে হাত রাখে, তখনো জ্বর প্রবল। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মাথা এলিয়ে বসে আছে হাসনা বেগম। মফিজুল আস্তে করে ডাকে, মা ওঠো।

প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা আমরা কোথায় যাবো?

স্টেশনে।

রেলগাড়িতে চড়বো?

হ্যাঁ।

কী মজা! রেলগাড়ি ঝিকঝিক'

প্রদীপ্ত লাফিয়ে ওঠে।

মা, ওঠো। চলো।

প্রদীপ্ত পুষ্পিতার হাত ধরে টানে।

হাসনা বেগম মফিজুলের দিকে তাকিয়ে দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কি এসেছে?

একটু পরে আসবে।

আলী আহমদ পুষ্পিতাকে ধরে। কালো খালা হাসনা বেগমকে। ওরা আস্তে আস্তে হেঁটে যায়। সামনে অন্য লোকজন ছুটছে। প্রত্যেকে উদ্বাস্তু এবং ব্যস্ত। আলী আহমদ বুঝতে পারে না যে ওদের এতো কীসের তাড়া? ওরা কোথায় যাবে? কোথায় ওদের আশ্রয়? ঘর হারানো মানুষেরা কি ঘর খোঁজার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে? হঠাৎ করে পুষ্পিতা কঁকিয়ে উঠে থেমে যায়।

কী হলো?

ব্যথা বাড়ছে।

ধৈর্য ধরো পুষ্পিতা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রাজশাহী পৌঁছে যাবো।

কেমন করে ধৈর্য ধরবো? আমি আর হাঁটতে পারছি না।

আর একটু, ঐ তো স্টেশন।

আলী আহমদ আলতো করে পুষ্পিতাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। কিছুটা উত্তাপ, কিছুটা নিরাপত্তা দিতে চায়। চায় নিজের আবেগ ওর মধ্যে সঞ্চারিত করতে।

ছোটো স্টেশনে মানুষ গিজগিজ করছে। গ্যাসের টিমটিমে বাতি ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে কেবল, চারদিকে নোংরা, মানুষের কলগুঞ্জন অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে আসে। এক জায়গায় বসতে হয় ওদের সবাইকে। কাছ থেকে পেসাবের গন্ধ আসছে, তীব্র এবং উৎকট। পুষ্পিতার গা গুলিয়ে ওঠে, কিন্তু কোথায় যাবে, চারদিকে মানুষ, ঠিকমতো পা ফেলার জায়গা নেই, অন্ধকারে মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা। নাকে আঁচল চেপে

BanglaBook.org

বসে থাকে ও। অন্যদিকে দুর্গন্ধে নয়, কিভাবে জীবনের সবটুকু ওলোটপালোট হয়ে গেলো ভাবতেই বমি পায় আলী আহমদের। মুখভর্তি থুতু উঠে আসে। নিমেষে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে, যেন পায়ে ত্রস্ত গতি, ভীত চাউনি এবং রুদ্ধশ্বাসে ভরা ফুসফুস। হ্যাঁ, কুকুরই তো, একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে ওকে তাড়া করেছে, ও লেজ তুলে দৌড় দিয়েছে, দৌড়ে এসে রোহনপুর স্টেশনে পড়েছে। এখন এখানে ও বুক ভরে নিশ্বাস নেবে। পারবে কি? এখন তো পারছে না। চারদিকে উৎকট দুর্গন্ধ। শ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত জায়গা কি আছে ওর জন্য? পারবে কি নিজেকে তেমন জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে? তখন ও শুনতে পায় ট্রেনের শব্দ, গুমগুম ধ্বনি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, চারদিক আলোকিত হচ্ছে, মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত তীব্র, ধাঁধালো আলো। স্টেশনে বসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়। পোটলা-পুটলি গুছিয়ে সবাই তৈরি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। মফিজুল, তরীকুল ফজলে গাজীকে নিয়ে এগিয়ে গেছে ট্রেনের কামরায় জায়গা দখল করার জন্য। আলী আহমদ এবং নসরুল্লাহ মেয়েদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। খিদের কথা ভুলে গেছে প্রদীপ্ত, ওর ঘুম পাচ্ছিলো। এখন বাবার হাত ধরে উৎসুক চোখে ট্রেন দেখছে। ইঞ্জিন স্টেশন ছাড়িয়ে সামনের দিকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়, গ্যাসের টিমটিমে আলো অন্ধকার দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। যাত্রীরা দরজা-জানালা দিয়ে যেভাবে পারছে গাড়িতে উঠছে। চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, বাক-বিতণ্ডা এবং ছোটোখাটো মারামারি হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে জায়গা ছাড়তে রাজি নয়, যতটা পারে দখল করে রাখার চেষ্টা। বেঞ্চের ওপর বিছানা ছড়িয়ে দিচ্ছে নয়তো চাদর। আলী আহমদ কেমন অস্বস্তি বোধ করে। এক অসম, তীব্র প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে। এর মধ্যেই পথ করে এগুতে হবে। মফিজুল এসে কাছে দাঁড়ায়। বলে, চলেন সবাই। অনেকখানি জায়গা রাখতে পেরেছি।

কারো মুখে কথা নেই। অন্ধকারে মফিজুলের চোখের ভাষা পড়া যায় না, দেখা যায় না ওর চেহারা। নইলে আলী আহমদ হয়তো বুঝতে পারতো মফিজুলের দৃষ্টিতে সাফল্য কতটা। আলী আহমদ জানে ও রাগী এবং তরুণ, কিছু একটা করার বাসনা পোষে। খুব সহজে সবকিছু মেনে নিতে পারে না। বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মানিক বন্দোপাধ্যায় ওর প্রিয় লেখক, তবু মানিকের 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস পড়ে লেখককে গালাগাল করেছে। আলী আহমদের সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা প্রায়ই করে। তর্ক করতে পারলে খুশি হয়। আলী আহমদ ওকে সেই প্রশ্রয় দেয়। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে এই পলায়ন মফিজুল মেনে নিতে পারছে না। আলী আহমদকে বলে, শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য আমাদের পালিয়ে যেতে হচ্ছে কেন আহমদ ভাই?

এই ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তো দেশটা ভাগ হলো।

তাই বলে কে কোথায় থাকবে সেটা চিন্তা করার স্বাধীনতা থাকবে না কেন?

চিন্তার স্বাধীনতা আছে মফিজুল। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনি আমরা। এখান থেকেও অনেক হিন্দু আমাদের মতোই যাচ্ছে।

পুষ্পিতাকে নিয়ে হাঁটতে গিয়ে আলী আহমদ পিছিয়ে পড়েছিল। সামনে থেকে মফিজুলের ডাক শুনতে পায়। প্রদীপ্ত ওর সঙ্গে। পুষ্পিতার বাম হাত আলী আহমদের ঘাড়ের ওপর। ওর ব্যথা বাড়ছে, কষ্ট হচ্ছে– কিছুই ভালো লাগছে না। আলী আহমদ ফিসফিস করে, পুষ্পিতা আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরো, আর অল্প।

না, আমি আর পারছি না।

ওর ক্লান্ত, বিষণ্ন কণ্ঠ। ও ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। তবু ট্রেনের কামরায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদের মনে হয়, বিপদ বুঝি কেটে গেলো। এ যাত্রা রক্ষা।

BanglaBook.org

কালো খালা পুষ্পিতাকে বেঞ্চের কোণায় জানালার ধারে জায়গা করে দেয়। ও বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, ওর পানি ভেঙে গেছে, জরায়ুর মুখ খুলেছে, আর উপায় নেই। পুষ্পিতা কেঁদে ফেলে– প্রসবের যন্ত্রণায় নয়– এক অনিশ্চিত দুঃসময় ওকে কুঁকড়ে রেখেছে, সে সময়টিকে ও অনুধাবন করতে পারছে না বলে ওর যন্ত্রণা হয়। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাখে, যাতে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের না হয়।

কালো খালা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, কাঁদছিস কেন? ভয় কী?

ভয়ই তো খালা। পানি ভেঙে গেছে।

পানি ভেঙে গেছে? কালো খালা প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হয়, তারপর হেসে বলে, ভয় কী আমি তো আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কয়দিন আগেও যে মানুষটি মৃতবৎ ছিলো, সে মুহূর্তে চাঙা হয়ে ওঠে। একটি কাজ পেয়েছে, মহৎ কাজ, তাকে বুক দিয়ে আগলাতে হবে, এই কালো খালা। পুষ্পিতা আশ্বস্ত হয়ে হাত দিয়ে চোখের পানি মোছে। কিন্তু ভিজে যাচ্ছে ওর কাপড়, ভিজে যাচ্ছে কাঠের বেঞ্চ, গড়িয়ে নামছে পানি। একই সঙ্গে ওর ব্যথা বাড়ছে। ও কালো খালার হাত চেপে ধরে, খালা আর পারছি না। ও চিৎকার করে ওঠে। গাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। সবাই চমকে ওর দিকে তাকায়। ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকখানি এসে পড়েছে। আলী আহমদ জানালায় মুখ রেখে বসেছিলো। দেখতে পায় ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুনো ঝোপঝাপ, ফণিমনসা, দূরের তালগাছের সারি এবং খোলা মাঠ অন্ধকারে একাকার হয়ে যায়। পুষ্পিতার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ওকে স্পর্শ করলে ও কিছুক্ষণের জন্য স্থবির হয়ে যায়। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। তখন কালো খালা ওকে নির্দেশ দেয়, চেন টানো। চেন টেনে গাড়ি থামাও।

চেন টানবো?

হ্যাঁ, চেন টানবে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার সময় নেই।

কালো খালার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কামরার যাত্রীরা অস্বস্তি অনুভব করে। আলী আহমদ কিছু করার আগেই মফিজুল লাফ দিয়ে উঠে চেন টানে। পুষ্পিতা দু'হাতে জানালার শিক চেপে বসে আছে। চেন টানার পর গাড়ি আস্তে আস্তে থেমে যায়। কালো খালা হাত উঁচিয়ে পুরুষদের নির্দেশ দেয়, আপনারা নেমে যান। অন্য কামরায় যান।

যাত্রীরা গাইগুই করে, কেন নামবো? অন্য কামরায় তো জায়গা নেই। এইসব মালপত্তর নিয়ে নামা কি সম্ভব? উঃ মা, বাইরে যা অন্ধকার, কামরাতেও আলো নেই।

কালো খালা চেঁচিয়ে বলে, আমি কারো কথা শুনতে চাই না। আপনারা না নামলে আমি সবাইকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো। এই মেয়েটা যদি মরে যায় তবে দায়ী হবেন আপনারা।

মফিজুল এগিয়ে আসে, চলুন, নামুন সবাই। মালপত্তর এখানে থাকবে। আপনাদের মালের দায়িত্ব আমার। একটাও খোয়া যাবে না।

যাত্রীরা নেমে যায়। এর মধ্যে গার্ড এসে পড়ে।

কেন চেন টানা হয়েছে? কী হয়েছে আপনাদের?

কালো খালা গার্ডের নাকের ওপর আঙুল উঁচিয়ে কথা বলে, এই কামরায় এখন একটা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। আপনার গাড়ির ড্রাইভারকে বলেন এখন গাড়ি ছাড়া চলবে না। গাড়ির দুলুনিতে মেয়েটার কষ্ট হবে। মা আর বাচ্চার যদি কিছু হয় তার জন্য দায়ী হবেন আপনারা।

গার্ডের চোখ কপালে ওঠে, বিস্ময়ের শেষ নেই। এমন অদ্ভুত কথা এই এতটা বয়সে ও শোনেনি। ঢোক গিলে বলে, বলেন কি?

BanglaBook.org

যা বলছি, ঠিকই বলছি।

তা, কতক্ষণ গাড়ি আটকে রাখতে হবে?

যতক্ষণ বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ না হয়।

ঠিক আছে। আমি দেখছি।

কামরা খালি হয়ে যায়। কালো খালা দ্রুত হাতে কাঠের বেঞ্চের ওপর চাদর বিছিয়ে পুষ্পিতাকে শুতে দেয়। আলী আহমদ বুঝতে পারে ওর ভূমিকা এখন নিষ্ক্রিয় দর্শকের, কিছুই করার নেই। তবু নেমে যাবার আগে ঝটিতে পুষ্পিতার দিকে তাকায়। প্রাণহীন, ফ্যাকাশে মুখ। বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে আলী আহমদের, পুষ্পিতা বাঁচবে তো? নিশ্বাস নিতেও বুঝি ওর কষ্ট হচ্ছে। ওহ্ কী ধকলটা গেলো বেচারির ওপর দিয়ে। আলী আহমদের দু'হাতে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই তো ওকে পালাতে হচ্ছে। তবে স্বাধীনতাটা কীসের? শুধুই কি ধর্মের? আলী আহমদ সিঁড়িতে পা দিতেই কালো খালা বলে, আহমদ, তুমি দরজার এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, দূরে যেয়ো না।

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে, বাবা আমার ভয় করছে।

ভয় কি বাবা, আমি তো আছি।

যা অন্ধকার, সামনে শেয়াল নেই তো? কামড় দেবে না তো?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। কাছাকাছি কোথাও থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে, সঙ্গে ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ। এ এক বিরান এলাকা, সামনে খোলা প্রান্তর। জায়গার নাম কি তা কেউ বলতে পারে না। অন্ধকারে দৃষ্টি বেশি দূর প্রসারিত হয় না। কিন্তু আলী আহমদের চিন্তা অন্ধকারে ছুটতে থাকে-খানাখন্দ, বুনো ঝোপ, ফণিমনসা কোনো কিছুতেই বাধা মানে না। কেবলই তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো মনে করছে নিজেকে, যেন পায়ে ত্রস্ত গতি, ভীত চাউনি এবং রুদ্ধশ্বাসে ভরা ফুসফুস। হ্যাঁ, কুকুরই তো, একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে ওকে তাড়া করেছে, ও রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে, সে দৌড় এখনো থামেনি। যে তীব্র গতিতে ট্রেনটা ছুটে এসেছে, তার চেয়েও তীব্র গতি ওর মগজে। এই তিরিশ বছরের জীবনে ও নিজেকে মানুষই তো ভেবেছে, যে মানুষ দু'পায়ে হাঁটে, কথা বলে, লেখাপড়া শেখে এবং পশুবৃত্তির ঊর্ধ্বে জীবনযাপন করে। কিন্তু গত সন্ধ্যার আগের সন্ধ্যা থেকে ও নিজেকে নেড়ি কুকুর ভাবতে শুরু করেছে, নিরীহ নির্জীব কুকুর, যে শুধু ভয়ে পালিয়ে যায়, ঘেউঘেউ শব্দে প্রতি-আক্রমণ করে না। দু'পায়ের মানুষ চার পায়ের কুকুর হলে আক্রমণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কেননা তখন সে আপন মাটি থেকে উৎখাত হয়ে দেশের সীমানা অতিক্রম করে। ঐ সীমানা অতিক্রম করার জন্যই তো লোকে ওকে তাড়া করেছে, ওর আর কিইবা করার আছে? ও অবসন্ন বোধ করে। কেননা ওকে বিতাড়ন করা হয়েছে ওর কোনো অপরাধের জন্য নয়। ও বিতাড়িত হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আলী আহমদ মনে মনে বলে, ধর্ম একটি পবিত্র অনুভূতি, গভীর বিশ্বাস। অথচ ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে কুকুর বানাচ্ছে। কিভাবে জীবনের সবটুকু ওলোটপালট হয়ে গেলো, ভাবতেই শরীর দুলে ওঠে, বমি পায়, মুখভর্তি থুতু। এখন যদি পুষ্পিতাও মরে যায়?

তখন শুনতে পায় কালো খালা পুষ্পিতার সঙ্গে এটা-ওটা কথা বলছে– একটানা, কখনো বকছে, কখনো সোহাগ করছে। আলী আহমদ জানে কালো খালা এমনই। সবসময়ে মুখে মিষ্টি কথা বলবে না, কিন্তু যেটুকু সাহায্য করবে, তা দরদ দিয়ে করবে, সেখানে কোনো

BanglaBook.org

ফাঁকি কিংবা প্রতারণা নেই। তাই শেষ পর্যন্ত কালো খালাকে পছন্দ না করে পারা যায় না। কালো খালা মুখ ঝামটা দিয়ে বলছে, তুমি আর বিয়োবার সময় পেলে না গো মেয়ে। পুঁচকেটাই বা কেমন যে বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে। বাবারে বাবা, বাপের জনমে এমন সমস্যায় পড়িনি।

কথা শুনে আলী আহমদের বুক মুচড়ে ওঠে। এত কথার পর কেউ কি বুঝবে যে মাত্র তিন দিন আগের দাঙ্গায় কালো খালার পরিবারের ষোলো জন নিহত হয়েছে। একমাত্র ছেলে ফজলকে নিয়ে পালিয়ে এতদূর এসেছে। পুষ্পিতা শক্ত মুঠিতে কালো খালার হাত চেপে ধরে রেখেছে। হাসনা বেগম ওর মাথার কাছে বসে আছে। আরো দু'জন মহিলা যাত্রী আছে কামরায়।

আলী আহমদের মনে হয় অনন্ত সময় ধরে ও এক ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কতক্ষণ এভাবে থাকতে হবে ও জানে না। ট্রেন থেমে আছে বলে যাত্রীরা কেউ অন্য কামরায় ওঠেনি। মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছ থেকে আলী আহমদ নড়তে পারে না। কালো খালা ওকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। শুনতে পায় হাসনা বেগমের কণ্ঠ, তুমি ওর কাছ থেকে নোড়ো না হামিদা বু। এমন অপ্রশস্ত বেঞ্চ যে বাচ্চাটা আবার গড়িয়ে না পড়ে যায়।

কালো খালা ধমক দেয় পুষ্পিতাকে, এমন হাত-পা ছুঁড়ছিস কেন মেয়ে? শান্ত হয়ে থাক।

তুমি আমাকে মেরে ফেলো কালো খালা।

পুষ্পিতা কেঁদে ফেলে।

দেখো দেখি কান্নার কী হলো? চুপ কর বলছি। বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই।

ফোঁস ফোঁস শব্দ করে থেমে যায় পুষ্পিতার কান্না। যেভাবে পানি পড়ছে, সে হারে ব্যথা বাড়ছে না। কালো খালা চিন্তিত হয়ে ওঠে। সব পানি পড়ে গেলে বাচ্চা তো শুকনো হয়ে যাবে, ঠেলে বেরুবার জোর কমে যাবে। ওর চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্পিতা ভয় পায়, কিছু বলতে পারে না, গলার কাছে সবকিছু আটকে যায়– ভেতর থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসার সে পথ বন্ধ। থেকে থেকে ব্যথা হচ্ছে। এটা যে কোনো কাজের ব্যথা নয় তা পুষ্পিতা জানে– প্রচণ্ড ব্যথা দরকার, নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচণ্ড শক্তি। কালো খালা জোরে জোরে বলে, মুখ হাঁ করে অমন করে শ্বাস টানিস না। মুখ বন্ধ করে নিচের দিকে চাপ দে, জোরে জোরে চাপ দে। উহ্, মা গো বাঁচা গেলো– রক্ত ভেঙেছে।

বাতাসে রক্তের গন্ধ এসে আলী আহমদের নাকে লাগে। ওর মনে হয় ওর চোখ খোলা কিন্তু ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওর মগজ কাজ করে না বলে দৃষ্টিও স্থবির। ওর কেবলই মনে হয় ওর চারপাশে ভীষণ এক কালো সময়– রক্তের গন্ধ ওর স্নায়ু অবশ করে দেয়।

তোমার টর্চটা দাও আহমদ।

আলী আহমদ কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে, ও কালো খালার কণ্ঠ শুনতে পায় না, যেন ঐ কণ্ঠ পুষ্পিতার– পরপার থেকে ডাকছে ওকে। অথচ আর কোনো দিন দেখা হবে না দুজনের।

কী হলো শুনতে পাচ্ছ না? তোমার টর্চটা দাও।

কালো খালা চেঁচিয়ে উঠলে আলী আহমদ ওর টর্চটা তার দিকে এগিয়ে ধরে। ওর হাত কাঁপে থরথর করে।

কী হলো তোমার? এতো ঘাবড়ালে চলে নাকি?

BanglaBook.org

পুষ্পিতা মরে যাবে না তো খালা?

পাগল। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সর্বস্ব হারিয়ে আমরা তো মানুষ ক'জন বেঁচে আছি। মানুষ না থাকলে আমাদের আর কী থাকবে?

আলী আহমদের গলা ধরে আসে। চোখ ছলছল করে। কালো খালা জবাব না দিয়ে দু'পা পিছিয়ে পুষ্পিতার শরীরের ওপর টর্চের আলো ফেলে। অল্প পাওয়ারের বাতি টিমটিম করে জ্বলে, প্রায় অন্ধকারই বলা চলে, পুরো কামরার সব জায়গায় আলো পৌঁছে না। আকাশে চাঁদও নেই যে চাঁদের আলোয় কিছুটা সুরাহা হবে। কালো খালা পুষ্পিতার শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো করে নেয়। বাচ্চা রাখার ন্যাকড়া। রক্ত ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বেড়ে গেছে। টর্চের আলোয় দেখা গেলো বাচ্চার মাথা বেরিয়ে আসছে। জরায়ুর মুখ এখন উন্মুক্ত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। কালো খালার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কপালে ঘাম- বুক- পিঠ ঘামে ভিজে জবজব করছে। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে পুষ্পিতা। সেই চিৎকারে প্রদীপ্ত দু'হাতে আলী আহমদকে জড়িয়ে ধরে, বাবা, মা কি মরে যাচ্ছে?

ছিঃ এমন কথা বলতে নেই।

তবে মা কাঁদছে কেন?

প্রদীপ্ত অসিহষ্ণু কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

বাবা, আমি মার কাছে যাবো।

আহ্ দীপু চুপ কর।

বলো না কেন মার কী হয়েছে?

মা যুদ্ধ করছে।

কার সঙ্গে।

মৃত্যুর সঙ্গে।

মা কি জিতে যাবে?

হ্যাঁ বাবা জিতে যাবে।

আমি মার কাছে যাই। আমিও মার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তুমি বলে দাও কাকে ঠেকাতে হবে বাবা?

যমকে।

যম কী বাবা?

তখন কালো খালা চেঁচিয়ে ওঠে, বেরিয়েছে, বেরিয়েছে, ওর মাথা, ঘাড় বেরিয়ে এসেছে। সাবধান হামিদা বু, পড়ে যায় না যেন।

হাসনা বেগমের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ।

তখন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নবজাতক। সে কান্না খোলা প্রান্তরে ছড়িয়ে যায়। কালো খালা দু'হাতের তালুতে বাচ্চাকে ধরে রেখেছে। রক্ত, পানি, শ্লেষ্মায় মাখামাখি শরীর, হলুদ গায়ের রঙ। কপালের দু'পাশে নীল শিরা জেগে উঠেছে। তখনো মায়ের সঙ্গে ও যুক্ত হয়ে আছে, ওকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। কালো খালা মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলে, এ যাত্রা রক্ষা হলো গো ছেলে। তোমার ছেলে হয়েছে।

আলী আহমদ প্রদীপ্তর মুখটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

প্রদীপ্ত বাবার দু'হাত ধরে ঝাঁকায়, বাবা কী হয়েছে?

তোমার ভাইয়া হয়েছে দীপু।

BanglaBook.org

ভাইয়া! কী মজা! বাবা ওর নাম রাখো জিতু। বাবা যুদ্ধে ও তো জয়ী হয়েছে না?

হ্যাঁ, আমরা সবাই জিতেছি।

তখন হাসনা বেগম বলে, হামিদা বু ওকে আমার কাছে দিন। আপনি ওর নাড়ি কাটুন।

তাই তো নাড়ি তো কাটতে হবে। কিন্তু কী দিয়ে কাটবো? ও আহমদ একটা ব্লেড বা ছুরির জোগাড় করো।

আলী আহমদ বিড়বিড় করে, ব্লেড বা ছুরি? কোথায় পাবো? ব্লেড বা ছুরি? ওহ্ কী প্রচণ্ড সমস্যা। ও মুহূর্তে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে যায় যাত্রীর কাছে, আপনাদের কারো কাছে ব্লেড বা ছুরি আছে? ধারালো তীক্ষ্ণ ছুরি?

যাত্রীরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পোটলা-পুটলি, পকেট হাতড়ায়। একজনের পকেটে পাওয়া যায় ছুরি। ও দৌড়ে ফিরে আসে। কালো খালার হাতে ছুরিটা দিতে দিতে ভাবে, ও আর কতক্ষণ মার সঙ্গে থাকবে? ওকে মার কাছ থেকে আলাদা করা হবে। ওকে একা হতে হবে। এক বিরান প্রান্তরে নিঝুম কালো রাত্রিতে ও একা হচ্ছে। এখন থেকে ও একজন মানুষ হয়ে বাড়বে। যে মাটি আবহমান কালের, যে ঘাসে বয়ে গেছে হাজার বছরের জল এবং বাতাস, অথচ যার একটি নতুন রাজনৈতিক নামকরণ হয়েছে, ও এখন থেকে এই মাটির সন্তান। হাজার বছরের শেকড়ের সঙ্গেই ওর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক– যে নাড়ি কেটে ও মানব শিশুর অধিকার পেলো সেই নাড়ির বাকিটুকু প্রোথিত হয়ে যাবে এই মাটির বুকে। আলী আহমদ উত্তেজনা বোধ করে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, খালা নাড়ি কাটা হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। চাঁদের টুকরো ছেলে তোমার।

আহ্ খালা, কী আনন্দ! পুষ্পিতা কেমন আছে?

ভালো।

প্রদীপ্ত আলী আহমদের হাত ধরে টানে, বাবা মায়ের কাছে যাবো।

এখন নয়।

হামিদা বু ছেলের মুখে একটু মধু দেওয়ার দরকার ছিলো না?

হাসনা বেগমের কথায় হেসে ফেলে কালো খালা। তারপর বলে, আমি তো নাড়ি ধরে বসে রয়েছি। ফুলটা বেরিয়ে এলেই বেঁচে যাই।

ফুলটা কী করবেন?

কী আর করবো? এখানকার মাটিতেই পুঁতে যাবো। ও আহমদ একটুখানি মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করো।

আলী আহমদ আবার কর্মতৎপর হবার চেষ্টা করে। মফিজুল এগিয়ে আসে, কী খবর আহমদ ভাই?

ছেলে হয়েছে।

কী মজা! অভিনন্দন আহমদ ভাই।

মফিজুল অন্য কামরার যাত্রীদের কাছে গিয়ে খবর পৌছে দেয়। গার্ড, ড্রাইভার সবাই খুশি হয়, যেন এতক্ষণের অপেক্ষা সার্থক হয়েছে। আলী আহমদ শুনতে পায় কেউ একজন আজান দিচ্ছে– খোলা প্রান্তরে আজানের ধ্বনি কেঁপে কেঁপে ভেসে যায়, এক অসীম শূন্যতায় ঘোষিত হয় নবজাতকের বার্তা। আলী আহমদ দু'হাতে বুক চেপে ধরে আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। নসরুল্লাহ কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। বলে, আমি খুব খুশি হয়েছি বাবা যে বিপদ কেটে গেছে। তোমার ছেলে আজাদ পাকিস্তানের সন্তান।

পাশ থেকে মফিজুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, বাবা ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভুখা হায়।

BanglaBook.org

চুপ, চুপ এসব কথা বলিস না। আমরা এখানে উদ্বাস্তু।

না বাবা, আপনার এই কমপ্লেক্স থাকা উচিত নয়। উদ্বাস্তু হই আর যা হই আমি মনে করি এই মাটিতে আমার অধিকার আছে। সুতরাং সত্য উচ্চারণ আমাকে করতেই হবে বাবা।

নসরুল্লাহকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আলী আহমদ বলে, চাচা, মফিজুল ঠিক বলেছে। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ওর বয়সটা ছেড়ে এসেছি। নইলে আমিও ওর মতো লড়ে যেতাম।

এটা ঠিক নয় আহমদ ভাই। যারা লড়াই করে তোদের কোনো বয়স থাকে না। লড়ে যাওয়াটাই ধর্ম।

তখন গার্ড এসে জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কি ছাড়বো? আলী আহমদ বিব্রত মুখে তাকায়। অন্ধকারে গার্ডের চেহারা দেখা যায় না, পড়া যায় না চোখের ভাষা, রেখাগুলোই বা কেমন, হাত ধরলে বন্ধুত্বের স্পর্শ পাওয়া যায় শুধু। সেটুকু নির্ভর করে বলে, আর কিছুক্ষণ সময় দিন দয়া করে।

হা-হা করে হেসে ওঠে গার্ড, দয়া করে বলছেন কেন? দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগে একজন মানুষ বাড়লো। এ তো আমাদের জন্য আনন্দের।

তখন কালো খালা ওকে ডাকে, আহমদ তুমি কোথায়? তোমার গর্ত করা হয়েছে?

তাই তো। ও একদম ভুলে গেছে। নাড়ি-কাটা ছুরিটা চেয়ে নিয়ে ও রেললাইন থেকে নেমে গিয়ে একটা গর্ত করে, পুষ্পিতার গর্ভফুল এই গর্তে প্রোথিত করা হবে। আলী আহমদ চকিতে ভাবে ছেলের নাম কী রাখবো? আহ্ নাম থাক এখন, পরে হবে। আগে এই কাজটি করে নিই– এই ফুল এবং অবশিষ্ট নাড়িটুকুসহ আমার ছেলেকে আমি এখানে প্রোথিত করি। কালো খালার কাছ থেকে পাওয়া ন্যাকড়ায় পেঁচানো গর্ভফুলটি গর্তে ফেলে ও মাটি চাপা দেয়।

ট্রেন ছেড়ে দেয়। ওরা অন্য কামরায় উঠেছে। এ কামরায় আর কাউকে উঠতে দেওয়া হয়নি। ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে সারারাত বসে থাকে আলী আহমদ। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক হয় না। কোলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে প্রদীপ্ত। কামরায় টিমটিমে আলো। পোকা উড়ছে। কালো বড়ো পোকা, উড়ে বেরিয়ে যায়, আবার আলোর কাছে আসে। নোংরা ট্রেনের কামরা, চারদিকে মানুষ– বাঙ্কে, সিটে এবং মেঝেতে। আলী আহমদের মনে হয় ভিটেমাটি থেকে উপড়ে এসেও ওদের কোনো চিন্তা নেই, ওরা ঘুমোচ্ছে। আলী আহমদের মনে হয় ওরা কি মানুষ? নাকি মানুষ নামের প্রেতাত্মা? ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় ওরা প্রত্যেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে, ওদের মুখগুলো ছুঁচালো, ওদের শরীর পশমভরা। ও নিজের দিকে তাকায়। নোংরা পাঞ্জাবি গায়ে, কনুইয়ের ওপর গোটানো আস্তিন, বোতামগুলো খোলা, ভেতরের গেঞ্জি ঘামে ভিজে আছে। পা কাঠের বেঞ্চির ওপর ওঠানো, ধূলিধূসরিত। ধুলায় মাথার চুল আঠালো হয়ে আছে। ও ইচ্ছে করলেই সে চুলের ভেতর আঙুল ঢোকাতে পারে না। নিজের এই নোংরা শরীরের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে, দু'দিন ধরে গোসল নেই। ওর মনে হয় জিহ্বাটাও আঠালো হয়ে গেছে, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আছে। ও কামরার চারদিকে তাকায়, মানুষেরা ঘুমোচ্ছে। আলী আহমদের আবার মনে হয় ভিটেমাটি থেকে উপড়ে এসেও ওদের কোনো চিন্তা নেই। কারো কারো নাক ডাকার শব্দ আসছে। এমন মানুষেরাই ভালো থাকে, এদের কোনো যন্ত্রণা নেই। জানালার শিকে মাথা ঠোকে আলী আহমদ। ওর একটু ঘুম দরকার– দশ মিনিটের জন্য হলেও সামান্য তন্দ্রা, না কিছুতেই তা হবার নয়। চোখের

BanglaBook.org

সামনে দিয়ে সরসরিয়ে সরে যাচ্ছে অন্ধকার গায়ে জড়ানো গাছগুলো। ট্রেন দু'একটা স্টেশনে থামছে, কোথাও থামছে না। টিমটিমে আলো ছুঁয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে প্লাটফরম। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওর সন্তানের কথা মনে হয়, ও এখন কী করছে? কাঁদছে না ঘুমোচ্ছে। ওর মুখটাও দেখা হয়নি। নানা ধরনের টেনশান ছেলের মুখ দেখার কথাও মনে হয়নি ওর। সামনে দীর্ঘ সময় পড়ে আছে– প্রতিদিন দেখতে হবে সে মুখ। একদিন বড় হবে, তারপর– তারপর দীর্ঘ সময়। সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে কেটে যায় রাত।

খুব ভোরে ট্রেনটা রাজশাহী স্টেশনে এসে পৌছে। তখনো সূর্য ওঠেনি, সাদা আলো ছড়িয়েছে কেবল। ট্রেন থেকে দেখা যায় দিগন্ত– দিগন্তরেখার কাছে লাল আলো। আলী আহমদ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। সাদা আলো ওর দৃষ্টিতে লেগে যায়– সাদা আলো ধাবিত হতে থাকে লালের দিকে। আলী আহমদের করোটিতে ফুটে ওঠে ফুল– সে ফুল সদ্যোজাত শিশুর মুখ। একজন শিশু জন্মালে পিতার আত্মা বিকশিত হয়– সে আত্মায় ধ্বনিত হয় অনাগত দিনের ঘণ্টাধ্বনি, যে ঘণ্টাধ্বনি মৃত্যুর বার্তা নয়, ঐ ধ্বনিতেই বাজে মানুষের মঙ্গল এবং শুভাশুভ। আলী আহমদ সে ধ্বনি শুনতে শুনতে দেখতে পায় দিন বাড়ছে, অথচ মগজে তখনো অন্ধকার– অন্ধকারে ও এক বিরান প্রান্তরে মাটির নিচে পুঁতে এসেছে একটি গর্ভফুল, যাকে নির্ভর করে মায়ের পেটে বেঁচে থাকে মানবশিশু। ওখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে সে উঠে দাঁড়ায়। আমরা সবাই দাঁড়াতে চাই।

আলী আহমদ চুলের জটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছিন্নভিন্ন করে কেশরাজি। ও এমন করে খুঁড়ে ফেলতে চায় নিজেকে। কবেই তো দাঁড়াবার সময় হয়েছে। তাহলে এখনো পারছে না কেন? আলী আহমদ বিড়বিড় করে, নতুন দেশে নতুন জীবনের শুরুতে ও আমার হৃদয়ের প্রতীক। ওর নাম আমি প্রতীক রাখলাম। প্রতীক আহমদ।

BanglaBook.org

২

গোরহাঙ্গার দু'কামরার ছোটো বাড়িটা পুষ্পিতা নিজের বাড়ির মতো গুছিয়ে নিতে পেরেছে বলে অনেক দুঃখ ভুলেছে। বাড়িটা ফজলুল আগেই ঠিক করে রেখেছিলো। ওর আর এক বন্ধুর জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলী আহমদকে দিতে হয়। ভাড়া আট টাকা, মন্দ নয়। উঠোনে পাকা ইঁদারা আছে। ইঁদারার পাশে লাউ-কুমড়ো-পুইশাকের মাচা তোলার মতো ছোটো জায়গা– পাশেই একটি লেবু গাছ, বারোমাস লেবু ধরে। দক্ষিণ দিক খোলা, চমৎকার আলো বাতাস বয়। বাড়ি থেকে বের হলে সামান্য একটু সরু চাপা গলি, তারপরই প্রধান সড়ক, কাঁচা– সারাদিন ধুলো ওড়ে। গলির বামদিকে একটা কাঠের আড়ত– জ্বালানি কাঠ বিক্রি হয় বলে রাতদিন কুড়াল দিয়ে কাঠ চেরাই হয়। বামে বেশ বড় একটা ডোবা, কচুরিপানা ভর্তি। ডোবার পাশে মাঠ, সেখানে বিকেলে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলে, বেশ জমে ওঠে তখন। অফিস-ফেরত বড়রা গোল হয়ে বসে ওদের খেলা দেখে। বড় রাস্তার ওপরে একটা কল আছে, সিমেন্টের তৈরি বেঢপ আকারের মোটা। লোকেরা বলে ঢপ কল। বন্ধ না করলে কল দিয়ে সারাদিন পানি পড়তে থাকে। কেউ ঠিকমতো বন্ধও করে না, যার যেমন খুশি খুলে রেখে চলে যায়। আলী আহমদের গলির মুখে বলে ও প্রায়ই কলটা বন্ধ করে বাড়িতে ঢোকে। পুষ্পিতা খাবার পানি এখান থেকেই সংগ্রহ করে।

ছোট্ট শহরটি আলী আহমদের ভালোই লাগে, বেশ একটা একাত্মতা অনুভব করে। সন্ধ্যা হলেই শহরটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে যায়, লোক চলাচল কমে যায়। মুদির দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলে। আলী আহমদ প্রদীপ্তকে নিয়ে ডোবার ধারের মাঠে এসে বসে। শতশত জোনাকি জ্বলে। প্রদীপ্ত ছুটোছুটি করে জোনাকি ধরে। মুঠির মধ্যে নিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। ওকে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। পড়াশুনায় ভালো, আগ্রহও আছে। আলী আহমদ বুঝে যায় যে ছেলের পড়াশুনা নিয়ে ওকে তেমন ভাবতে হবে না। একসময়ে একমুঠি জোনাকি নিয়ে ও আলী আহমদের কাছে আসে, বাবা এই জোনাকিগুলো জিতুর জন্য নিয়ে যাই? ও এগুলো দিয়ে খেলবে?

কেমন করে খেলবে? ও তো বড় হয়নি।

ঠিক বলেছো। ও সারাদিন শুয়ে থাকে দেখে আমার একটুও ভালো লাগে না। ও বড় হলে আমরা দুজনে ফুটবল খেলবো। পাড়ার সব ছেলেকে আমরা হারিয়ে দেবো।

অন্যদের হারিয়ে দিতে চায় প্রদীপ্ত। হারিয়ে দেওয়া কি এত সহজ? অন্যকে হারিয়ে দিতে চাইলে আগে নিজের বুকের ভেতর পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করতে হয়। গ্লানিবোধ থাকলেই তো তবে জয়ের আনন্দ উদ্ভাসিত হয়। সব সময় জয়ী হলে মানুষ দাম্ভিক হয়, অহংকারী চেতনা নষ্ট করে মানবিকতা। আলী আহমদের বুকের ভেতর এখন পরাজয়ের গ্লানি, জীবনের ফুটবল খেলায় ও হেরে গেছে। কিন্তু ওকে জিততে হবে, অন্যদের হারিয়ে দিতে হবে। এই জেতার লড়াইয়ে নেমেছে ও, নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। তখন ও ট্রেনের শব্দ শুনতে পায়, আমনুরার দিক থেকে আসছে। বড় রাস্তার ওপারে পতিত জমি, তারপর ট্রেনের লাইন। দিনের বেলা ট্রেনের শব্দ পেলে প্রদীপ্ত দৌড়ে এসে গলির মুখে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে রেলগাড়ি দেখে। প্রতীকের জন্মের পর রেলগাড়ি আলী আহমদকে আনমনা করে দেয়, পুষ্পিতা ভীত হয়। কিন্তু প্রদীপ্তর কাছে রেলগাড়ি এক দারুণ স্মৃতি। বলে, বাবা কী ভীষণ অন্ধকার ছিলো, একটাও জোনাকি ছিলো না সেদিন। ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিলো মাঠের মধ্যে, আর মা কাঁদছিলো। আমার ভীষণ ভয় করছিলো বাবা। সেদিন যদি আমি হারিয়ে যেতাম, তুমি আর আমাকে খুঁজে পেতে না বাবা।

আলী আহমদ নিষ্পলক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখটা আর শিশুর মুখ থাকে না। আলী আহমদ সেই মুখে নিজেকে দেখতে পায়। যেন কতকাল আগে এক ধুলো-ওড়া রাস্তা দিয়ে ও টমটমে চড়ে চলে যাচ্ছে। দিনভর ঐ রাস্তা দিয়ে স্টেশন থেকে টমটম শহরের দিকে যায়। ঘোড়ার খুরে উড়ে আসে ধুলো, চাকায় টকটক শব্দ ওঠে। এই গাড়ি এবং শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই। আর কোনো ধ্বনির কথা আলী আহমদ জানে না। ওর মাথা জাম হয়ে ওঠে। প্রদীপ্ত ওর গলা জড়িয়ে ধরে, বাবা? বাবা শুনতে পাচ্ছো ট্রেন যাচ্ছে?

আলী আহমদ দেখতে পায় তীব্র আলো ফেলে ট্রেনটা ওর সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলো। এখন ঝমঝম শব্দ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রদীপ্ত অস্থির হয়ে ওঠে, বাবা চলো, বাড়ি যাই। মা হয়তো ভাবছে।

অন্ধকারে আলী আহমদ ওর মুখ দেখতে পায় না। কিন্তু ভাবে, ছেলেটা একটু বেশি বোঝে, হয়তো বয়সের তুলনায় বেশিই।

তখন ও দেখতে পায় কেউ যেন অন্ধকারে হেঁটে আসছে, হয়তো কাঠের আড়তের কেউ। ওরা ডোবার ধারটাকে নানা কারণে ব্যবহার করে। ওর কেমন অস্বস্তি হয়, ভাবে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু এক ধরনের আড়ষ্টতায় ও উঠতে পারে না। লোকটি কাছে এলে ও বুঝতে পারে যে কাঠের আড়তের মালিক মতলুব মিয়া। মুসলিম লীগের

BanglaBook.org

রাজনীতিতে বিশ্বাসী, উগ্র বদমেজাজি লোক। চোখের দিকে তাকালে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চায়। আলী আহমদ যতটা সম্ভব ওকে এড়িয়ে চলে। তবু যাওয়া-আসার পথে দেখা হয়, লোকটি সালাম দেয়, পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসে। আড়তের সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে থাকে। কাঠ চেরাই দেখে, কাঠ বিক্রি করে কোনোদিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জুয়া খেলে। কাছাকাছি এসে নিজেই বলে, কে অধ্যাপক সাহেব?

জ্বি।

এখানে কী করছেন?

এমনি বসে আছি।

ছেলেকে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন?

কথাটা বলে হা-হা করে হাসে মতলুব মিয়া। এই কথায় হাসার কী থাকতে পারে তা ভেবে পায় না আলী আহমদ। মানুষের এমন অকারণ হাসি শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর। হাসি থামিয়ে ও আবার বলে, আমি ভাবলাম আমিও একটু হাওয়া খেয়ে আসি আর শরীরের আবর্জনা কিছুটা ঝেড়ে আসি। শরীরটা হালকা হয়ে যাক।

আবার সেই অকারণ খ্যাকখ্যাক হাসি। তারপর লোকটা সামনের দিকে হেঁটে চলে যায়। আলী আহমদ উঠে পড়ে। প্রদীপ্ত ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে বলে, বাবা লোকটা ভালো না।

কেন রে?

ওর হাসি শুনলে ভয় করে।

আলী আহমদ ছেলেকে বলতে পারে না যে ঠিক বলেছিস। হাসির মতো আনন্দদায়ক অভিব্যক্তি কারো কারো ঠোঁটে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তখন বদলে যায় অর্থ– বদলে যায় অনুভূতি। এই এখন যেমন তোর এবং আমার হয়েছে। তবু এইসব লোকেরা আমাদের চারপাশে থাকবে– তাদের সঙ্গেই আমাদের বসবাস।

ঘরে ফিরে দু'জনে ইঁদারার ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। পুষ্পিতা প্রতীককে বুকে নিয়ে বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওর কণ্ঠে গুনগুন ধ্বনি। আলী আহমদের শুনতে ভালো লাগে। মা ও শিশুর এই অন্তরঙ্গ মুহূর্ত আলী আহমদকে সবসময় আনন্দ দেয়। বারান্দায় চৌকির ওপর হারিকেন জ্বলছে। চিমনির ওপরের দিকটা কালো হয়ে গেছে। প্রদীপ্ত এই চৌকির ওপর পড়তে বসবে। ওর জন্য চৌকির ওপর এক গ্লাস দুধ ঢাকা আছে, সঙ্গে একটি আতা ফল। প্রদীপ্ত দুধ খেতে ভালোবাসে। ওর জন্যে এক পোয়া দুধ রাখা হয়, পাশেই গোয়ালা আছে। দু'জনে বারান্দায় উঠতেই পুষ্পিতা ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাপবেটায় কোথায় বেড়ানো হলো?

প্রদীপ্ত দুধের গ্লাস হাতে নিতে নিতে বলে, বাবা আজ বেশি দূর যায়নি মা। ডোবার ধারেই বসেছিলাম। ফুটবল খেলা দেখেছি।

আমার ইচ্ছা তোমাদের মতো আমিও একদিন রেললাইন ধরে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে যাবো। খুব মজা হবে। তুমি কিন্তু আমাকে অনেক ফড়িং ধরে দেবে মা। বাবা কিন্তু একটাও ফড়িং ধরে দেয় না।

ঠিক আছে আমি দেবো।

কিন্তু জিতুটা বড়ো না হলে তুমি কেমন করে যাবে? ঐ জিতুর জন্যই তো তুমি কোথাও যেতে পারো না।

তুই যখন ছোটো ছিলি তখন তোর জন্যও তোর মা কোথাও বের হতে পারতো না।

যাহ্।

প্রদীপ্ত লজ্জা পেয়ে দ্রুত ঢকঢকিয়ে দুধ খায়। আলী আহমদ চৌকির ওপর বসে। এই

BanglaBook.org

সময়ে ও কিছু খায় না। আটটা বাজলে ও ভাত খাবে, তারপর নিজের টেবিলে পড়তে বসবে। পরীক্ষার খাতা দেখে, নয়তো ক্লাসের লেকচার তৈরি করে। রাজশাহী কলেজে চাকরিটা হয়ে যাওয়াতে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আরো দু'জন অধ্যাপক এসে জয়েন করেছে। একজন রসায়নের জামান, অন্যজন ইতিহাসের বাদল খান। সমগ্র বাংলা আসামে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরই রাজশাহী কলেজের সুনাম ও ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। হিন্দু অধ্যাপকরা চলে যাওয়ার ফলেই বাংলা বিভাগ খালি হয়ে গেছে, সেজন্যই চট করে চাকরিটা হয়ে গেলো, নইলে ওকে স্কুলে মাস্টারি নিতে হতো। রাজশাহীতে আর কলেজ নেই। তবে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এবং রাজশাহী মুসলিম ক্লাব আছে বলেই বেশ একটা শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। ফজলুল ওকে একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তবে কারো সঙ্গে তেমন একটা হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। নিজের অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্যই সময় লাগছে, আলী আহমদ এটা ভালোভাবেই বোঝে। হৈ-চৈ করা প্রাণবন্ত মানুষ হলে এতদিনে ও শহরটা জমিয়ে তুলতে পারতো। কিন্তু পারছে না, ওর ধাতটা অন্যরকম। পুষ্পিতা ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুমি কিছু খাবে? চা দেবো?

না, কিছু না। জিতু ঘুমিয়েছে?

এখনই ঘুমোবে দুষ্টু ছেলে।

দাও, আমার কাছে দাও।

আলী আহমদ দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নেয়। প্রদীপ্ত আতা ফলের বিচি চুষতে চুষতে বলে, জানো মা ডোবার ধারে ঐ খেঁকশিয়ালটার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?

পুষ্পিতা অবাক হয়, খেঁকশিয়াল? বলিস কী?

বুঝলে না যে খ্যাকখ্যাক করে হাসে সে তো খেঁকশিয়ালই।

আহ্ দীপু, মানুষের নামে এভাবে কথা বলতে নেই। আর কখনো যেন আমি তোমার মুখে এ ধরনের কথা না শুনি। মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হয়।

আলী আহমদের ধমকে প্রদীপ্ত ভয় পেয়ে চুপ করে যায়। পুষ্পিতার বিস্ময় কাটে না। বলে, ও কার কথা বলছে?

মতলুব মিয়ার কথা।

মাগো কেমন ডেঁপো ছেলে হচ্ছিস রে তুই।

পুষ্পিতা ছেলের চুল ধরে আলতো করে ঝাঁকিয়ে দেয়। ওর চিবুক ধরে বলে, কখনো এমন কথা বলতে নেই দীপু। ওর ছেলে শুনলে তোমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

প্রদীপ্তর চোখ ছলছল করে। বাবা-মা দুজনের কাছে ও এমন বকা খাবে ভাবেনি। আতার বাটি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে যায়। তখন গেটের কড়া নাড়ে কেউ।

নাচোল থেকে মফিজুল এসেছে। স্টেশন থেকে হেঁটে এসেছে, একটু আগে ট্রেন থেকে নেমেছে। হাতের চটের ব্যাগে কাপড়চোপড়, বইখাতা। কুশল বিনিময়ের পর বললো, আমি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হবো আহমদ ভাই। হোস্টেলে থাকবো। আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

অসুবিধে নেই। তুমি আমার এখানে কয়দিন থাকো। সব ব্যবস্থা করে দেবো।

পুষ্পিতা ওর জন্য মুড়ি মাখিয়ে আনে। সরষের তেলের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে।

মা আপনার জন্য এসব দিয়েছে।

মফিজুল ওর দিকে একটা পোঁটলা এগিয়ে দেয়।

ওমা, কতো কী! কতদিন যে এইসব পিঠে-নাড়ু খাইনি। কালো খালা কেমন আছে

BanglaBook.org

রে মফিজুল?

শরীর বেশি ভালো নেই। এটা-ওটা লেগেই থাকে।

মনে শান্তি না থাকলে শরীরের কী দোষ।

আলী আহমদ বড়ো করে নিশ্বাস ফেলে।

আমি লাইফকে অন্যভাবে দেখছি আহমদ ভাই। এইসব নিশ্বাস ফেলাফেলির মধ্যে নেই।

আলী আহমদ বলে, বাম রাজনীতি করেছো তো। সাহস বেশি।

আপনি তো আমাদের সাপোর্ট করতেন আহমদ ভাই?

এখনো করি।

তাহলে আমাদের ভাবনা কী? লাইফ তো একটা চ্যালেঞ্জই।

তবু কখনো মনটা মুচড়ে ওঠে।

কবিতা-গল্প লেখেন তো সেজন্য এমন হয়। নতুন কিছু লিখেছেন?

না, ওখান থেকে এসে এতোদিনেও মন বসাতে পারিনি। ভাবছি আবার শুরু করবো।

মফিজুল মাথা নেড়ে একমুঠি মুড়ি গালে পোরে। কচকচিয়ে কাঁচামরিচ চিবোয়। প্রদীপ্ত হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ও বইয়ের দিকে তাকায়, বইয়ের কালো হরফের সঙ্গে মিলেমিশে একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওটার পা, মুখ কিছুই দেখা যায় না, যেন আগাগোড়া কালোতে মোড়ানো একটা বস্তু, কিন্তু যখন ওড়ে পাখা দুটো খুলে যায়, নিচে নেমে যখন হাঁটে সেই পাখা জোড়া বন্ধ হলে পোকাটার পুরো শরীর মুড়ে যায়। প্রদীপ্ত অনেকক্ষণ ধরে পোকাটাকে দেখে। ওর সম্ভবত ক্ষুদ্র পা এবং মুখ ভালো করে তাকালে দেখা যায়। প্রদীপ্ত পোকাটাকে বইয়ের পৃষ্ঠার ভেতর আটকে রেখে বইটা বন্ধ করে দেয়। কাল সকালে দেখবে ওটা মরে গেছে না বেঁচে আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত নিজের পড়ার টেবিলে বসে থাকে আলী আহমদ। সাহিত্যের ইতিহাস পড়ায় ও। চর্যাপদের ওপর একটা নোট তৈরি করেছে। ওর ইচ্ছে নোট তৈরির ফাঁকে ফাঁকে সহজ ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস লিখে ফেলবে সাধারণ পাঠকের জন্য। এমন একটা বইয়ের অভাব ও খুব অনুভব করছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় মফিজুল কবিতা-গল্পের প্রসঙ্গ ওঠানোর পর থেকে মনটা খুব বিষণ্ন হয়ে আছে। একটা মোটা খাতায় অসংখ্য কবিতা লিখেছিলো, চার ফর্মার একটা বই হতে পারতো, কিন্তু পালিয়ে আসার সময়ে সেটা ফেলে এসেছে। এখানে আসার এই ছয়মাসের মধ্যে একটি লাইনও লিখতে পারেনি। অনবরত কেবলই মুখ থুবড়ে পড়া। মনের এই ক্ষতটুকু কাটিয়ে উঠতে পারছে না বলেই পারিপার্শ্বিক এখনো দূরের রয়ে গেলো। ও কাগজ-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করে, কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে না। কী লিখবে? নিজের জীবনের কথা? এই কয় মাসের ঘটনাই তো গল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু লিখতে চাইলেই তো আর লেখা হয়ে ওঠে না। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে আলী আহমদ। প্রায়ই ও এমন অন্ধকার দেখে, কখনো একটি বস্তুর আকৃতি নিয়ে বিশাল হয়ে ওঠে, পাহাড় কিংবা নদীর মতো। হারিকেনের তেল পুড়ে যায়, এক সময়ে আলো কমে যায়, তবুও বসে থাকে। ও বুঝতে পারে না কেন, কেন এই দহন? কোথায় মুক্তি। পাশের ঘরে পুষ্পিতা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমায়– কখনো কেঁদে ওঠে প্রতীক, আবার ঘুমিয়ে যায়। ওর মনে হয় কান্নার শব্দ শুনলে অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে, ঘন কালো, তেমন কুচকুচে কালো পোকাটার মতো, যে পোকাটাকে প্রদীপ্ত বইয়ের পাতায় আটকে রাখে। আলী আহমদ টেবিলের ওপর কনুই রেখে হাতের তালুতে মুখটা রাখে। বেশ গরম পড়েছে, ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

BanglaBook.org

জানালার বাইরে বেশ বড় একটা পুকুর, এটা এ বাড়ির পেছন দিক। ওপাশে যাবার কোনো রাস্তা নেই। ওরা এই জানালা দিয়ে পুকুর দেখে। আশেপাশের মহিলারা বড় লোহার কড়াইয়ে সোডা দিয়ে কাপড় সেদ্ধ করে পুকুরঘাটে কাচতে আসে। দিনভর লোকজন এই পুকুরে গোসল করে। আলী আহমদের মনে হয় শুধু গভীর রাতে পুকুরটা ওর একলার হয়ে যায়। চাঁদনি রাতে পুকুরের জল টলটল করে। আজ এই মধ্যরাতে কিছু লিখতে না পারার অক্ষমতায় ওর ভীষণ কষ্ট হয়। ওর চোখ জলে ভরে যায়। তখন তেলের অভাবে দপদপিয়ে হারিকেন নিভে যায়। ও বিছানায় উঠে আসে।

প্রতিদিন হেঁটেই কলেজে আসা-যাওয়া করে ও। যেটুকু পথ এটুকুর জন্য রিকসায় চড়তে হয় না, চড়তে ভালোও লাগে না। হাঁটতেই আনন্দ। ধূলো-ওড়া পথটা রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ঃ গ্রাম ছাড়া এই রাঙামাটির পথ। আলী আহমদের মনে হয় যথার্থ অর্থেই এটি রাঙামাটির পথ। মানুষের যে কোনো পথের জন্য অনুরাগ থাকতে পারে ও এখন এটা অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ ওর প্রিয় বিষয়। ও মনে করে একজন মানুষ রবীন্দ্রনাথ পড়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। এখন এই পথ ওকে পথে টানে। কতদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। সোনাদিঘি, সাহেববাজার পার হলেই ও অন্যমানুষ হয়ে যেতে থাকে। যেমন গভীর রাতে অন্ধকারের দিকে তাকালে ওটা একটা বস্তু হয়ে যায়, তেমন এই পথটা, কখনো বস্তু হয়ে যায় কিংবা মানুষ। তখন প্রবলভাবে বিষণ্ন হতে থাকে ও। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষ ও, এখন পথ শুধু গানের কলির মতো অপরূপ সৌন্দর্য বিস্তার করে থাকে না– একটি যুবতীর কঙ্কাল হয়, কিংবা কোনো বৃদ্ধের করোটি। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে গ্রামে যেমন পথের ওপর দেখেছিলো যুবতী, বৃদ্ধ এবং শিশুর লাশ। বুঝে নেয় যে, এ পথের উপর দিয়েও একটি তেতাল্লিশের মন্বন্তর বয়ে গেছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায়ও এ পথের ওপর পড়েছিলো যুবতী, বৃদ্ধ এবং শিশুর লাশ। শকুনে ওদের মাংস খুবলে খেয়েছে, শিয়াল টেনে বের করেছে হৃৎপিণ্ড। আলী আহমদের মনে হয় পথটা কখনো পুরো দেশ হয়ে যায়, তখন ওদের মতো চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। কিন্তু না, চাইলেও ও বলতে পারে না। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে এ এক অসম্ভব চিন্তা। ওকে মেরে ফেলবে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা। কিন্তু কতকাল ও চুপ করে থাকবে, কতকাল? এক সময়ে ও না চাইলেও, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গলগলিয়ে কথা বেরিয়ে আসবে। তখন কেউ ওকে রুখতে পারবে না। তখন কি মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে? ওহ্ না, আমি মৃত্যু চাই না। আলী আহমদের অবচেতন সরব হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে কলকল শব্দ হয়। কিন্তু তাই বলে কি আমি বোবা হয়ে থাকবো? কথা বলবো না? হ্যাঁ, আমি কথা বলবো, একশবার কথা বলবো। যদি মৃত্যু হয়? থমকে যায় আলী আহমদ, তারপর মৃদু হাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটের কোণায়, তারপর নিজেকেই নিজের দৃঢ় প্রত্যয় কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, মৃত্যু হলেও আমি কথা বলবো। একটা সময় আসে যখন মানুষের চুপ করে থাকা আর সম্ভব হয় না। তখন মৃত্যু এক শূন্য গোল বিন্দু হয়ে চোখের সামনে থেকে সরে যায়, মুছে যায় ভয় ইত্যাকার যাবতীয় ধারণাগুলো– শাণিত, দীপ্র হয়ে ওঠে চেতনা- প্রবল, ভীষণ, ভয়ানক শক্তি হয়ে। আলী আহমদের মনে হয় ও এখন এমন একজন মানুষ হয়ে যাচ্ছে– ওর মাথার ওপর ছাতা নেই, হাতে বইপত্র নেই, ও কোনো কলেজে ছেলেদের পড়াতে যাচ্ছে না।

বেলা দশটাতেই মাথার ওপর চড়চড়িয়ে রোদ উঠে গেছে– শুধু ছাতা সেই রোদ থেকে কাউকে আড়াল করে রাখতে পারে না। আলী আহমদের গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে

BanglaBook.org

গেছে। কলেজ গেটে মফিজুল দাঁড়িয়ে ছিলো, অন্য ছেলেদের কী যেন বোঝাচ্ছে। আলী আহমদ জানে ওর মজ্জায় রাজনীতি, দারুণ মেধাবী ছেলে, কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে পারে না, কারণ পড়াশোনায় মন নেই। ওর ভর্তি সহজে হয়েছে, কিন্তু হোস্টেলে সিট পেতে বেশ বেগ পেতে হয়। কলকাতা থেকে অসংখ্য ছেলে এক সঙ্গে এসে ভর্তি হয়েছে বলে হোস্টেলের সিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষ পর্যন্ত মফিজুলের জন্য একটা সিটের ব্যবস্থা হয়েছে এ ব্লকে। এইসব ছেলেরা বেশির ভাগই প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, কলেজ সরগরম করে তুলেছে। আলী আহমদ যা পারেনি মফিজুল তা পেরেছে। ও খুব দ্রুত শহরের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, ছাত্র-সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছে। পুষ্পিতা মাঝে মাঝে অভিযোগ করে, কিরে তুই কোথায় ডুব দিয়ে থাকিস? বাসায় আসিস না কেন?

হেসে বলবে, সময় পাই না ভাবী।

কী এমন রাজ কাজ যে সময় পাস না?

ও হেসে চুপ করে থাকে। আলী আহমদ বোঝে যে ও আসলেই সময় পায় না। এতকিছুতে জড়িয়ে গেলে সময় কিভাবে কাটে টেরই পাওয়া যায় না।

গেটের সামনে ওকে দেখে মফিজুল দ্রুত এগিয়ে আসে। আলী আহমদ দাঁড়িয়ে ছাতা বন্ধ করে। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কেমন আছো?

ভালো আহমদ ভাই। তারপর একটু ইতস্তত করে ও।

কিছু বলবে?

একটা খবর আপনাকে বলা হয়নি। আগামী পরশু আমি কলকাতায় যাচ্ছি। ওখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে যুব সম্মেলন হবে তাতে অংশ গ্রহণ করবো।

আর কেউ যাবে?

আতাউর রহমান।

ভালো, যাও।

বাবাকে জানানো হয়নি।

চিন্তা নেই। তাকে আমি বুঝিয়ে বলবো।

BanglaBook.org

মফিজুল স্বস্তির হাসি হাসে। এজন্যই আলী আহমদকে ওর এত ভালো লাগে। চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলে না, কিন্তু যে কাউকেই সমস্যা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়। আলী আহমদের এক অদ্ভুত গুণ যে সে মানুষকে বোঝে, কারো স্বাধীনতায় নাক গলায় না, কারো ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেয় না, কারো অবমূল্যায়ন করে না এবং অসাধারণ তার সহিষ্ণুতা।

আচ্ছা আমি যাই আহমদ ভাই।

আলী আহমদ সেদিন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ায়। আজি হতে শর্ত বর্ষ পরে– বলতে বলতে কেমন ঘোর লাগে, কথা ফুরোয় না, যেন ভেতরের অর্গল মুক্ত হয়ে গেছে। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার লেকচার শোনে, পুরো ঘর নিস্তব্ধ, কাগজের খসখস শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই, খুকখুক কাশি নেই– ঘর জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় রবীন্দ্রনাথ এবং আলী আহমদের আবেগময় কণ্ঠ। ক্লাসে তিনি ছেলেদের বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আত্মার আত্মীয়। তাঁকে বাদ দিলে আমাদের অস্তিত্বের আমিটাই না হয়ে যাবে।

তার এই লেকচারে খুব মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। কবিতার আলোচনায়, বিশ্লেষণে অসুবিধা হলো না, কিন্তু শেষের কথাগুলো অনেকের পক্ষে হজম করা কঠিন হলো। এক পক্ষ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো, অন্য পক্ষ গুম হয়ে রইলো। কেউ আগ বাড়িয়ে, কিন্তু

ফিসফিসিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বললো, কেমন কথা রবীন্দ্রনাথ আত্মার আত্মীয়? স্যার কি মালাউন নাকি?

এতদিনে কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং তাঁর সহকর্মীরা বুঝে গেছে আলী আহমদ কেমন মানুষ, কথা বলে কম কিন্তু প্রবল তার অনুভূতি। ছেলেরা ফিসফিসিয়ে বললেও কথাটা ওর কানে এসেছে। চুপচাপ শুনেছে ও, কাউকে কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। প্রবল কষ্ট আচ্ছন্ন করে রেখেছে কয়দিন। মুসলমানের দেশে ও এত তাড়াতাড়ি মালাউন হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি।

পুষ্পিতাকে কিছু বলেনি। শুধু দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছে পালিয়ে আসার স্মৃতি। আর অনবরত নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে যে মানুষের সাম্প্রদায়িক হওয়াকে আমি ঘৃণা করি। পাছে কাউকে কিছু বলতে হয় এজন্য একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে পদ্মার ধারে। দূরন্ত পদ্মার বয়ে যাওয়া ওর প্রিয় দৃশ্য। কমিশনারের বাংলো পেরিয়ে সরু মেঠো পথে পদ্মার ধার পর্যন্ত চলে আসে ও। বুনো ঝোপে জায়গাটা জঙ্গল হয়ে আছে। ভাট ফুলের গন্ধ ছড়ায় তীব্র- অজস্র লজ্জাবতীর লতা পথের দু'পাশে বিছিয়ে থাকে। আলী আহমদ খুব সাবধানে হাঁটে যাতে পায়ে লেগে পাতাগুলো বুঁজে না যায়। প্রজাপতি এবং রঙিন ফড়িং গাছের শোভা বাড়িয়ে দেয়। মাথার চারপাশে পাক খেয়ে ভন করে উড়ে যায় বোলতা। এইসব দেখতে ভালো লাগে। মফিজুল একদিন ওকে আতাউর রহমানের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলো, রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু অমায়িক লোক। অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। এরপর ওর সঙ্গে আরো কয়েকদিন আলাপ হয়, অন্তরঙ্গ আলাপ, প্রাণ খুলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলা যায়। একদিন আতাউর রহমান বলে, আপনার মতো মানুষ কম দেখেছি। সামনাসামনি আপনি বড় বেশি শীতল, কিন্তু আপনার ভেতরটা তাতানো। কখনো উগ্র হন না, কিন্তু আপসও করেন না। মনেপ্রাণে প্রগতিশীল এবং সচেতনভাবে যুক্তিনির্ভর।

এই গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর কানে এখন সেই কথাগুলো বাজে। একজন মানুষ অল্পসময়ে ওর ভেতর ধরে নাড়া দিয়েছে, বুঝতে পারছে ওকে। ও তো এমন অজস্র মানুষ চায়, যারা পরস্পরকে বুঝতে পারে। না বুঝে আকস্মিকভাবে কোনো মন্তব্য করে না, যে মন্তব্য শুনলে প্রবল বিবমিষায় নিজের জগতকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করে। ঐ একটি শব্দ মালাউন, ভীষণভাবে ওর অস্তিত্ব ধরে নাড়া দিয়েছে। এই যদি লোকে বুঝতে থাকে তাহলে এই মাটিতে ওর অবস্থান কোথায়? কেমন করে ও নিজেকে টিকিয়ে রাখবে?

ভাবতে ভাবতে ও স্যান্ডেল খুলে নদীর জলে পা ডোবায়। দূরের পাল তোলা নৌকাগুলো কত বাহারি, নানান রঙের কাপড়ে তৈরি। বিশাল নৌকাগুলোয় মাল বোঝাই করা। কী নিয়ে যাচ্ছে ওগুলো? চাল নাকি পাট? এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা ভাবলে ওর মাথা হয়তো হালকা হবে। ও আকাশের দিকে তাকায়, হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, নীলের সঙ্গে ধূসর রঙ মিলেমিশে অন্য এক রঙ তৈরি করে। ও দৃষ্টি ফেরায় নদীর ওপরে, যতদূর চোখ যায় কেবলই ঘোলা জল, ছলছল শব্দে বয়ে যাচ্ছে- ঢেউয়ের ওপর ঢেউ এসে গড়িয়ে পড়ে। ও পাখি খোঁজে। পাখি দেখলে ওর দৃষ্টি স্নিগ্ধ হবে, নইলে এই এতকিছুর মধ্যেও কেবলই বিষণ্নতা দেখতে পায়। জঙ্গলের ভেতরে কোনো একটা গাছের মধ্যে বসে একটা ঘুঘু ডাকে। ডাক শোনা যায়, কিন্তু পাখি দেখা যায় না। ঘুঘুর ঘু ঘু শব্দে ওর বুকের ভেতর শুকিয়ে যায়, বিষণ্নতা বাড়তে থাকে। ও পায়চারি করে। স্যাণ্ডেল খুলে রেখে সবুজ ঘাসের ওপর পা ঘষে ঘষে হাঁটে, হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে হয়। পরিশ্রান্ত হলে মাথার ভেতর ঘুঘুর ডাক প্রবল হয়।

BanglaBook.org

একদিন ও প্রদীপ্তকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছিলো। প্রদীপ্ত ছুটোছুটি করছিলো। ঘাসের ওপর ডিগবাজি দিচ্ছিলো। প্রজাপতি আর ফড়িঙের পেছনে ছুটে হয়রান হচ্ছিলো। একসময় ঝোপের আড়ালে শেয়াল দেখে ও চিৎকার করে উঠেছিলো, বাবা দেখো ওটা কী?

শেয়ালটা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়েছিলো ওর দিকে। তীক্ষ্ণ সূচালো মুখ। যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আলী আহমদের বুক কেঁপে ওঠে। তারপর দ্রুত ইটের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওটার দিকে। শেয়ালটা পালিয়ে যায়।

তারপর প্রদীপ্ত আর থাকতে চায় না।

বাবা চলো।

যাবো, আর একটু বসি।

না, বাবা, না। ভয় করছে। বাবা তুমিও আর এখানে কোনোদিন আসবে না।

কেন রে?

বাবা শেয়াল যদি আমাদের খেয়ে ফেলে তবে মা আমাদের আর খুঁজে পাবে না। চলো বাবা, আমাদের না পেলে মা খুব কাঁদবে।

আলী আহমদ একদৃষ্টে ছেলেকে দেখে। ওর কচিমুখ ভীত, সন্ত্রস্ত, চোখে জল টলটল করে। সেদিন আলী আহমদ ওকে কিছু বলতে পারেনি। আজ বলতে ইচ্ছে করে। ও বলতে চায়, সাহস করে রুখে দাঁড়ালে শেয়ালরা পালিয়ে যায়।

পরদিন সকালে স্টেটসম্যান পত্রিকা হাতে নিয়ে চমকে ওঠে আলী আহমদ– মহাত্মা গান্ধী নিহত– খবরটা পড়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে ও। কাগজটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকলে মনে হয় শরীরের ভেতরের যন্ত্রগুলো নিথর হয়ে গেছে। ও বারান্দার চৌকির ওপর রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খায়। না, ঠাণ্ডা হয় না ভেতরটা। ও উঠোনে নেমে আসে। লেবু গাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। গাছের পাতায় শিশির জমে আছে। নরম রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। প্রদীপ্ত ঘর থেকে দু'টো বেতের মোড়া নিয়ে আসে।

বাবা বসো। রোদে বসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।

ও নিজে আর একটি মোড়ায় বসে মুড়ি খায়, মুড়ি আর পাটালি। ওর পছন্দের খাবার। খাওয়ার সময়ে ও মুখে একরকম ধ্বনি করে, অনেকটা গুনগুনিয়ে গান করার মতো। প্রদীপ্ত পা দোলায় আর শব্দ করে। আজ এই শব্দ আলী আহমদের কানে সহস্র গুণ হয়ে বাজে। ও কিছুতেই বসতে পারে না। কেবলই মনে হয় মানুষের কোলাহল এবং রক্ত– বুক চেপে আসে, বড় করে শ্বাস নিতে হয়। খবরটা ওকে শুধু মর্মাহত করেনি, আতঙ্কিতও করেছে। গত বছর যে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখেছে, এ তারই পুনরাবৃত্তি। এর শেষ কোথায়? মানুষ কি একজনের পর একজন কিংবা একসঙ্গে অনেক জন জল্লাদের খাঁড়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে?

পুষ্পিতা রান্নাঘর থেকে এক বাটি মুড়ি এবং পাটলি গুড় নিয়ে রোদে এসে দাঁড়ায়। বাটিটা আলী আহমদের দিকে বাড়িয়ে দেয়, নাও।

এখন রাখো। পরে খাবো।

কী হয়েছে? তোমাকে কেমন অস্থির দেখাচ্ছে?

মহাত্মা গান্ধী গুলিতে নিহত হয়েছেন।

কী বলছো?

এই দেখো।

আলী আহমদ পত্রিকাটি পুষ্পিতার সামনে মেলে ধরে। ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সামান্য লেখাপড়া জানে, পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে না। ওর সামনে কালো কালো

BanglaBook.org

অক্ষরগুলো মানুষের মুখ হয়ে যায়।

বাবা মহাত্মা গান্ধী কে?

আলী আহমদ প্রদীপ্তর প্রশ্নের জবাব দেয় না। ও পুষ্পিতাকে দেখে। পুষ্পিতার ঠোঁট কাঁপছে, মুখ ফ্যাকাশে, ওর হয়তো দাঙ্গার কথা মনে পড়ছে। আলী আহমদ দ্রুত কাগজটা বন্ধ করে ফেলে। ততক্ষণে পুষ্পিতার হাত থেকে মুড়ির বাটিটা পড়ে যায়, ছড়িয়ে যায় মুড়ি-গুড়। পাঁচিলের ওপর বসে থাকা দু'টো কাক উড়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়ায়। ওরা একটু সরে গেলেই মুড়ি খেতে শুরু করবে।

তোমার কী হলো পুষ্পিতা?

ও মোড়ার ওপর বসে পড়ে দু'হাতের তালুতে মুখ ঢাকে। হাত দু'টো থরথর করে কাঁপে।

কী হলো তোমার পুষ্পিতা?

আমার কালো খালার কথা খুব মনে পড়ছে। কালো খালাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক আছে চিঠি লিখে দেবো না হয়। কালো খালা চলে আসবে। ক'দিন আমাদের এখানে থাকবে।

আচ্ছা তোমার কি সেই ঘটনাটা মনে আছে। ঐ যে লোকটার নাম যেন কী? বিশাল একটা ভোজালি নিয়ে আমাদের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিলো। বলেছিলো, দেশ ছেড়ে চলে না গেলে আমাদের টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে, নয়তো শেয়ালের খাবার হতে হবে। ঐ যে ঘটনাটা–

আহ্ পুষ্পিতা আমার সব মনে আছে। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি আমাকে বাজারের থলেটা দাও। আমি বাজার করে আসি।

তুমি বলো না লোকটার নাম যেন কী?

কি পাগলের মতো নাম মনে করার চেষ্টা করছো পুষ্পিতা, ওর নাম তো নাথুরাম গড্‌সেই।

পুষ্পিতা চোখ গোল করে তাকায়, নাথুরাম গড্‌সে? না, তুমি ভুল বলছো।

কখনো না, আমি একটুও ভুল বলছি না। ওদের কোনো আলাদা নাম থাকে না। ওরা সবাই এক। ও নাথুরাম গড্‌সেই।

হা-হা করে হেসে ওঠে আলী আহমদ। আকস্মিক শব্দে কাক দু'টো উড়ে আবার পাঁচিলের ওপর চলে যায়। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা তুমি এখান থেকে সরে যাও। কাক দু'টোকে মুড়ি খেতে দাও।

আলী আহমদ এক পা পেছনে সরে আসে। ওর হাসির রেশ তখনো ফুরোয়নি।

পুষ্পিতা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বুকে হাত রেখে বলে, তুমি এমন করে হেসো না, আমার ভয় করছে।

প্রদীপ্ত বাবার হাত ধরে টানে, আমিও তোমার সঙ্গে বাজারে যাবো।

যাই বাজারের থলে নিয়ে আসি।

পুষ্পিতা রান্নাঘরে চলে যায়। কাক দু'টো আবার ফিরে এসেছে। মুড়ি খেতে ব্যস্ত। পুষ্পিতা থলে হাতে ফিরে আসে। আলী আহমদ জিজ্ঞেস করে, কী আনবো?

তোমার যা খুশি।

বাবা আজ কিন্তু খাসির কলজে কিনবে।

খাসির কলজে?

আলী আহমদ কেমন বিমূঢ় বোধ করে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ বাবা কলজের ভুনা করবে মা। তুমিও তো খেতে ভালোবাসো।

আলী আহমদ আপন মনে বিড়বিড় করে, কোন কলজে, যে কলজে বুলেটের গুলিতে ফুটো হয়ে যায়! মানুষই তো মানুষের কলজে খায়।

প্রদীপ্ত এসে আলী আহমদের হাত ধরে, বাবা চলো, আমিও তোমার সঙ্গে বাজারে যাবো।

আলী আহমদ ধমকে ওঠে, না যাবে না।

প্রদীপ্ত জেদ করে, কেন যাবো না? আমি যাবোই। খাসির কলজে কিনবো।

অসভ্য ছেলে। বেশি ডেঁপো হয়েছো।

আলী আহমদ ছেলের গালে ঠাস করে চড় মারে। ও ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। পুষ্পিতা কিছুই বুঝতে না পেরে আলী আহমদের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে, কী হয়েছে তোমার? মারলে কেন দীপুকে?

পুষ্পিতা আমার মাথাটা কেমন যেন করছে। আজ বাজারে না গেলে কি তোমার রান্না হবে?

হবে। জিয়োনো শিং মাছ আছে। শাকসবজিও ঘরে আছে।

আলী আহমদ হাতের থলেটা উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। ঢপ কলের কাছে এসে দাঁড়ায়। কলের মুখটা জোরে খুলে দিলে গলগলিয়ে জল পড়ে। ইচ্ছে হয় মাথা পেতে রাখে কলের নিচে, কিন্তু মাথা পাতা হয় না, ও পায়ের পাতা বিছিয়ে রাখে জলের নিচে। শীতল হতে থাকে শরীর, মাথা এবং মেজাজ। ও রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং খুব শিথিলভাবে এক অনির্দিষ্ট যাত্রায় টমটমে উঠে বসে। যাত্রী তেমন নেই, ওরা তিনজন। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। কোচোয়ান মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে যে ও কোথায় যাবে। আলী আহমদ একটু হেসে বলে, তুমি যতদূর যাবে আমিও ততদূর যাবো।

কিছু দূর যেতেই বাকি দুজন যাত্রী নেমে যায়। টমটমে আলী আহমদ একা। কোচোয়ান ওর ছাউনিতে যাবে। কিন্তু ও কোথায় যাবে? কোথায় গন্তব্যস্থল? ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং একই সঙ্গে উড়ে যাওয়া ধূলোর মধ্য দিয়ে ধ্বনি এবং রঙের জগৎ তৈরি হয় ওর সামনে। ও নির্মোহ ভঙ্গিতে সেই ভুবনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় এখনই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার– কী করবে, কী করা উচিত। সরে যায় আবরণ, দৃষ্টি দীপ্র হয়ে ওঠে– সামনে বিস্তৃত পথ– চলতেই হবে, এত তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থল খুঁজলে চলবে কেন? আলী আহমদ নিজেকে বলে, শান্ত হও মন। আত্মস্থ করো নিজেকে।

সাহেববাজার এলে কোচোয়ান গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, নামবেন আপনি?

তুমি কোথায় যাবে?

তালাইমারি।

আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

তারপর?

তুমি ফিরলে আমিও ফিরবো।

তারপর?

হেসে ফেলে আলী আহমদ। বলে, এক জায়গায় তো আমাকে থামতেই হবে কোচোয়ান ভাই।

কোচোয়ানও হাসে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বলে, চলেন তাহলে যেদিকে খুশি যাই।

কোচোয়ান হেই-টকটক করে মুখে বিচিত্র শব্দ করে কষে চাবুক চালায়। মুখে ফেনা উঠিয়ে ছুটতে থাকে ঘোড়া। কোচোয়ান হাসিমুখে পেছনে তাকিয়ে বলে, আপনার মতো মানুষ দেখিনি।

BanglaBook.org

রাজশাহীতে একটি যুব সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মফিজুলরা। তার তোড়জোড় চলছে। সম্মেলন সফল করার জন্য ওর কলেজের বন্ধুরা দিনরাত খাটছে। ভিয়েতনামের যুবনেতা মাই-থি-চাও সম্মেলনে আসবে। ছোট্ট শহর, চল্লিশ হাজারের মতো লোকের বসবাস, তাই অল্পতেই সরগরম হয়ে ওঠে। একদিন সন্ধ্যায় মফিজুল আলী আহমদের কাছে চাঁদা চাইতে আসে।

আহমদ ভাই আমাদের সম্মেলনের জন্য কিছু চাঁদা দিতে হবে?

কত দেবো?

যা আপনার ইচ্ছে।

আলী আহমদ দুটি টাকা বের করে দেয়। পুষ্পিতা ওর জন্য মুড়ি নিয়ে আসে। মুড়ি খেতে খেতে ও বলে, আপনি নাকি পরশু দিন টমটমে করে ঘুরেছেন? আমার বন্ধু একরাম দেখেছে।

আলী আহমদ নির্লিপ্ত স্বরে বলে, হ্যাঁ, ঘুরেছি।

একরাম বলেছিলো, স্যারকে খুব উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো।

হবে হয়তো।

আমি একরামকে বলেছি যে সৃষ্টিশীল মানুষদের হাজার রকম পাগলামি থাকে।

হো-হো করে হেসে ওঠে আলী আহমদ। বলে, রাজনীতি করলে কী হতো?

রাজনীতিবিদদের শক্ত মাটিতে পা রাখতে হয়। এখানে তো আবেগের জায়গা নেই। কিন্তু মিথ্যাচার আছে। রাজনীতির অনেক কিছুই মিথ্যাচারের গোঁজামিল।

মফিজুল কিছুটা উত্তেজিত হয়। আলী আহমদ ওর গায়ে হাত রেখে শান্ত স্বরে বলে, কোথাও ধাক্কা খেয়েছো বুঝি?

জানেন কী জঘন্য ষড়যন্ত্র! ওরা প্রচার করছে আমরা কম্যুনিস্ট এবং এই সম্মেলন কম্যুনিস্টদের চক্রান্ত। ঠিক হয়েছিল আমরা ভুবনমোহন পার্কে সভা করবো। কিন্তু জেলা প্রশাসক ভুবনমোহন পার্কে সম্মেলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, তাই নাকি?

আপনি হাসছেন আহমদ ভাই?

হাসবো না? সবে তো শুরু। কত কিছু দেখতে হবে। তুমি না একটু আগে বললে রাজনীতি? এই হলো রাজনীতি।

ঠিকই বলেছেন? যা হোক নিষিদ্ধ ঘোষণার পর আমরা তো গোপন সভার চিন্তাভাবনা করছিলাম। কিন্তু এখন একটা পথ পেয়ে গেছি।

কী রকম?

মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন। সুতরাং আমরা একটি শোকসভার আয়োজন করতে পারি। আমরা তাই করেছি। প্রকাশ্য সভা হবে। সুলতান ভাই সভাপতি।

আলী আহমদ মফিজুলের পিঠ চাপড়ে দেয়, ভালো। তোমাদের দিয়ে হবে।

মফিজুল প্রাণ খুলে হাসে। আলী আহমদ মনে মনে বলে, হাসি তোমাদেরকেই মানায়। কারণ তোমরাই আমাদের ভরসা।

রাত বাড়লে পুষ্পিতা ওদের খেতে দেয়। মফিজুল আগ্রহ নিয়ে খেতে বসে। বলে, আমি মনে মনে চাইছিলাম যে আজ এখানে খাবো। হোস্টেলের একঘেয়ে খাওয়া কত আর সহ্য করা যায়।

খাবি তো বলিসনি কেন?

সংকোচ লাগছিলো।

BanglaBook.org

হেসে ওঠে পুষ্পিতা, ও বাবা ছেলের আবার লজ্জা।

এখন থেকে ও এলে তুমি ওকে খাইয়ে দিও পুষ্পিতা। বুঝবে যে ওর মনে সংকোচ আছে।

ঠিকই বলেছো।

মফিজুল হেসে মাথা নীচু করে। মাঝখানে কুপি জ্বলে। বাতাসে কুপির শিখা কেঁপে ওঠে। অল্প আলোয় ইলিশের কাঁটা বাছতে অসুবিধা হয় ওদের। কিন্তু চমৎকার রান্না হয়েছে। মফিজুলের মন ভরে ওঠে। পেট পুরে খেয়েদেয়ে বলে, এ না হলে আর পদ্মার ইলিশ, যেমন স্বাদ তেমন রাঁধুনির কৃতিত্ব। থ্রি চিয়ার্স ভাবী।

আলী আহমদ বলে, দেখেছো কেমন সেয়ানা ছেলে। ভাবীকে বেশ পটিয়ে হাত করলো।

রাজনীতি করি যে, পটানোই তো কাজ। না পটাতে পারলে মাটি থেকে পা উপরে উঠে যায়।

কিন্তু তোয়াজ করে সব জায়গায় চলে না।

জানি।

গম্ভীর হয়ে যায় মফিজুল।

আমি জানি আহমদ ভাই এ বড় শক্ত পথ। আজ যাই। বেশ শীত পড়েছে।

পুষ্পিতা বলে, আর একটা গায়ের চাদর দেবো?

না, দরকার নেই। যা আছে এতেই চলবে। বাবার তসরের চাদরটাই আমি নিয়ে এসেছি।

দরজা খুলে বেরিয়ে যায় ও। আলী আহমদ নিজের পড়ার টেবিলে আসে। নিঃশব্দে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কাজটা করে যেতে থাকে। পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। হারিকেনের মৃদু আলোয় নিজের গুটি গুটি হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরো শরীর পাখনা দিয়ে মোড়া কালো পোকাটার কথা মনে হয়। ওটা যখন হাঁটে তখন মনে হয় না ওর কোনো পাখা আছে, যখন ওড়ে পাখা ছড়িয়ে যায় শরীরের ওপর। লেখাগুলোও অমন। যতক্ষণ কাগজের পৃষ্ঠায় বন্দি ততক্ষণ শরীর মোড়ানো থাকে, যখন পাঠকের কাছে যায় তখন পাখা খসে পড়ে শরীর থেকে– তখন উড়াল, পাঠকের মনের নীলিমায় ডানা মেলে চলে যাওয়া। কী আনন্দ! আলী আহমদের দ্রুত কলম চলে, যেন ও ছুঁতে চায় মানুষের হৃদয় এখনই, এই কনকনে শীতের রাতে। মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ অনেক বেশি, ঐ উত্তাপ ছাড়া কাগজের পৃষ্ঠার শব্দগুলোর কোনো মুক্তি নেই। ঠাণ্ডার জন্য ওর সামনের জানালা বন্ধ। ও দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে পারে অন্ধকারের বুকে গাঢ় হয়ে জমেছে কুয়াশা। সকালে দেখা যাবে পুকুরের বুক ধোয়াটে হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না জল, পাড় এবং পাড়ের ওপর বিছিয়ে থাকা দুর্বা ঘাস। এত কিছুর মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস ফুটে ওঠে মগজে, যে আপন নিয়মে পথ করে এগোয়।

ভুবনমোহন পার্কের এক কোণে বসে ছেলেদের বক্তৃতা শোনে আলী আহমদ। শোকসভা হলেও প্রকাশ্যে নিজেদের কথাও বলে ওরা। ছাত্র জনতার প্রচণ্ড ভিড়, ছোটো পার্কটায় মানুষ থৈ থৈ করছে। শীতের বিকেল দ্রুত শেষ হয়ে যায়, গোধূলির ম্লান আলো চারদিকে। মানুষ খুব আগ্রহ ভরে বক্তৃতা শুনছে। ভিড়ের এক রকম উষ্ণতা আছে– শীতের বিকেল, আলো নিভে গেছে– একটু পর আঁধার নামবে, কুয়াশা পড়বে, তবু তেমন ঠাণ্ডা নেই। মানুষেরা পরস্পরকে শরীরের উত্তাপ দিচ্ছে, ভাবতেই ভালো লাগে আলী

BanglaBook.org

আহমদের। কিছু কবিতার পংক্তি মাথার ভেতর বেড়ে উঠলে আলী আহমদ তা স্মৃতিতে গেঁথে নেয়। রাতে গিয়ে লিখবে। ততক্ষণে মাই-থি-চিউ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করেছে। তার বাংলা অনুবাদ করছে বীরেন্দ্র। কতদূর থেকে এসেছে ছেলেটি– যেটুকু কথা বলছে আবেগ দিয়ে বলছে, বিশ্ব-ভ্রাতৃমৈত্রীর কথা বলছে, শুনতে ভালো লাগে। মানুষ যদি পরস্পরকে এমন রাখি-বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারতো তাহলে কি এমন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতো? সুলতানের বক্তৃতার পর সভা শেষ হয়ে যায়। ও ভিড়ে ঠেলাঠেলি না করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে। পার্ক ফাঁকা হয়ে গেলে কনকনে বাতাস এসে চোখমুখে ঝাপটা দেয়। ও ধীরেসুস্থে বেরিয়ে আসে। রাস্তাঘাটে তেমন লোকজন নেই। হয়তো ঠাণ্ডার জন্য সবাই যে যার ঘরে ঢুকছে, যারা বাইরে তারা তাড়াহুড়া করছে, সবার পায়ে চঞ্চল গতি। একমাত্র ওর গতি মন্থর। ও ঘুরেফিরে মদনের দোকানে আসে। এককাপ গরম চা নিয়ে বসে। এই দোকানে ও সবসময় আসে, ফজলুলও আসে। দু'জনে অনেকক্ষণ আড্ডা দেয়। কত বিচিত্র বিষয়– রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য। ফজলুল নিজে লেখে না, কিন্তু বোদ্ধা পাঠক। যখন কথা বলে তখন অন্য লোক কথা বলার সুযোগ কমই পায়। যেহেতু আলী আহমদ চুপচাপ থাকতে ভালোবাসে, সেজন্য ও ফজলুলের মনোযোগী শ্রোতা– ঘাড় কাত করে মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ শুনে যায়। ওর মনে হয় আজ ফজলুল থাকলে ভালো লাগতো। সাহেববাজারে ওর বইয়ের দোকান আছে। ঢাকায় গেছে বই আনতে। নইলে ও নিজেই চলে যেত বইয়ের দোকানে, ধরে নিয়ে আসতো এই চায়ের আড্ডায়। আলী আহমদ এক কাপ চা নিয়ে বসে থাকে, ঘন চা, গাঢ় রঙ, চিনি পরিমাণ মতো। মদনের চায়ের খ্যাতি আছে এই শহরে। আজ দোকানটা প্রায় ফাঁকা। শেষ দু'একজনও উঠে চলে গেছে। মদন গান করছে আর পয়সা গুনছে, সব খুচরো। গোণা শেষ করে খুচরো পয়সা একটা কাপড়ের থলেতে ভরে কোমরে গোঁজে। তারপর আলী আহমদের কাছে এসে বলে, স্যার লুচি খাবেন? দেবো ক'খান ভেজে?

না রে এই সন্ধ্যেবেলা লুচি খেতে পারবো না।

সন্ধ্যে কোথায় স্যার? মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। দেখছেন না রাস্তা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে।

শহরের লোকগুলো বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। হল্লা করতে ভুলে গেছে।

বাড়ি ফিরবে না তো কী? যা, ঠাণ্ডা পড়েছে। আমার তো এক কাপে কিছু হলো না রে?

দেবো এক মগ বানিয়ে? গরম জল চুলোয় আছে।

দে, বেশ অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া যাবে।

বাড়ি ফিরবেন না স্যার?

ফিরবো। তাড়া নেই। তুই বাড়ি ফিরবি না?

বাড়ি! খ্যাকখ্যাক করে হাসে মদন। বলে, বাড়ি ফিরবো কেন? বাড়ি মানে তো সংসারের খেচাখেচি। তার চেয়ে জুয়োর আড্ডা অনেক ভালো। রাত যে কোথা দিয়ে পার হয়ে যায় টেরই পাই না।

বলিস কি জুয়োর আড্ডা? কোথায় সেটা?

গণকপাড়ায়। আমার এক বন্ধুর বাসায়। ঐ শালা দোতলায় থাকে। নিচতলাটা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সারারাত হল্লা করি।

তোর বন্ধু জুয়ো খেলে না?

খেলে। ও না খেললে তো খেলা জমে না।

কতক্ষণ খেলিস?

BanglaBook.org

ভোররাত পর্যন্ত। তারপর ওখানেই ফরাসের ওপর খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে ভোরে দোকান খুলি।

বাড়িতে কখন যাস?

দুপুরে খেতে।

বউ রাগ করে না?

এককালে করতো। এখন করে না। রোজ ভোরে ভোম্বাকে দিয়ে অনেক বাজার পাঠিয়ে দেই। ওই পেয়েই খুশি। পাঁচ-সাত পদ চটপট রান্না করে ফেলে।

বাজার পেয়েই খুশি? তোকে চায় না?

আলী আহমদের কথায় একমুহূর্ত থমকে যায় মদন। ইতোমধ্যে ও চা বানিয়ে ফেলেছে। মগটা ধীরে-সুস্থে টেবিলে এনে রাখে। এতক্ষণের হাসিখুশিভরা উচ্ছ্বাস দমকা বাতাসে উড়ে যায় যেন। বলে, আমাকে আবার চাইবে কি? আমি তো আছি বৌয়ের জন্য।

হো হো করে হাসে আলী আহমদ। বলে, আমার কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেলো তোর?

জুয়োখেলা লোকের তো মন খারাপ করতে নেই। জুয়োতে হারজিত আছে না?

হ্যাঁ, আছে তো।

মদন বোকার মতো মাথা নাড়ে।

জুয়োতে হেরে গেলে তোর মন খারাপ হয়?

মন খারাপ হবে কেন? তখন তো আবার নতুন করে জেতার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠি।

সংসারটাও এমন হার-জিতের জুয়ো খেলা রে মদন। বউ তো কখনো তোকে পাবে, কখনো হারাবে। তোরও তাই।

এটা শুনে প্রচণ্ড বেগে খ্যাকখ্যাক করে হাসে মদন। ও যতক্ষণ হাসতে থাকে ততক্ষণ আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটার থলথলে মুখ, টানা চোখ, দৃষ্টিতে ঝিলিক, পৃথিবীর সব সুখ হরণ করতে চায় ও। গায়ে ফতুয়া, পরণে ধুতি, খালি পা– মদন একজন জুয়োড়ি।

ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী দেখছেন?

দেখছি এবং শুনছি।

কী?

তোর হাসি। হাসলে তোর চোখে ঝিলিক ওঠে। আর তোর হাসিটা বড্ড প্রাণখোলা।

মদন আবার হেসে ওঠে। এবার বেশিক্ষণ হাসি টানে না। আলী আহমদ মগের চা শেষ করে, বেশ বড় মগ। শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

পয়সা দিতে গেলে মদন প্রবলভাবে আপত্তি করে।

আজ পয়সা দেবেন না স্যার। আজি আপনি অতিথি। আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে বড্ড শান্তি পেলাম। আমার বউকে আপনার গল্প করবো।

আলী আহমদ হেসে বেরিয়ে পড়ে। একটু পর পেছন থেকে মদনের ডাক শুনতে পায়, স্যার, দাঁড়ান?

আলী আহমদ দাঁড়িয়ে পড়ে। মদন কাছে এসে বলে, আমার খুব ইচ্ছে করছে স্যার যে আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করি। কিন্তু বউটার যন্ত্রণায় পারবো না।

কেন, তোর বউ কী করেছে?

কী আর, ঐ আর কী, ছুঁচিবাই।

BanglaBook.org

আমি মুসলমান তাই তো।

মদন হঠাৎ খুব লজ্জা পায়। তারপর আকস্মিকভাবে আর কোনো কথা না বলে দ্রুত হেঁটে চলে যায়। আলী আহমদ বুঝতে পারে না যে ও কেন হঠাৎ নেমন্তন্নর কথা বলতে এলো। পরে নিজের মনে হাসে। আসলে ও খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলো, ঐটুকু বলে ও লজ্জা পেলেও স্বস্তি পেয়েছে। জেনেশুনেই ও কথাটি বলেছে, না বলে ওর উপায় ছিলো না। মদনের জন্য আলী আহমদের মায়া হয়। মানুষের কত বিচিত্র স্বভাব ভাবতে ভাবতে ও বাড়ি ফেরে।

বারান্দায় চৌকির ওপর গোল হয়ে বসে কথা বলছে কালো খালা, ফজলে গাজী ও পুষ্পিতা। একমাস ধরে কালো খালা জ্বরে ভুগছে, চিকিৎসার জন্য এসেছে। সন্ধ্যার ট্রেনে আসার পর থেকে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। ফজলে গাজী পুষ্পিতাকে বলেছে, মা সারাক্ষণ কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই মরে যাবে। আমি তখন কার সঙ্গে থাকবো গো।

ফজলে গাজীও গামছায় চোখ মোছে। পুষ্পিতার চোখের কোণাও ভিজে ওঠে। বলে, সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেলে না কেঁদে কি উপায় আছে রে ফজলে। তবু তো চিকিৎসার জন্য আসা হলো। কালো খালা আমার কাছে কিছুদিন থাকুক।

ফজলে গাজী আঁতকে উঠে বলে, ঘর-সংসারের কী হবে?

তুই দেখবি। পারবি না?

পারবো।

ফজলে গাজী বোকার মতো মাথা নাড়ে। পুষ্পিতা কাজে যায়। কালো খালাকে সাগু রেঁধে খাইয়েছে। মাথা ধুইয়ে দিয়েছে। অনেকদিন পর মায়ের বয়সী একটা মানুষকে যত্ন করতে ওর ভালো লাগছে। প্রদীপ্ত অনেকক্ষণ কালো খালার কাছে বসে গল্প শুনে ঘুমোতে গেছে। এখন ওরা তিনজন, কত কথা যে জমা হয়ে আছে। কথা আর ফুরোয় না। তখন আলী আহমদ ফেরে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই আবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে কালো খালা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমরা তো গেলে না আমার বাড়ি। আমিই এলাম তোমাদের কাছে। যে কদিন বাঁচি তোমরাই আমার আপন। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে।

এমন অন্তরঙ্গ কথা আলী আহমদের বুক স্পর্শ করে। ও কালো খালাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। বলে, আমরা থাকতে আপনার ভাবনা কী খালা। আপনি শান্ত হন।

পুষ্পিতা সান্ত্বনা দেয়, অসুস্থ শরীরে আর কাঁদবেন না খালা।

আলী আহমদ কালো খালার কপালে হাত রাখে, বেশ জ্বর তো। ঘরে তো থার্মোমিটার নেই। কালই ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুষ্পিতা খালাকে আমার বিছানায় শুইয়ে দাও। বারান্দায় এতক্ষণ থাকা ঠিক হয়নি, যা ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডায়, গরমে– শীত-গ্রীষ্মে-বর্ষায় কাবু হয় না কালো খালা, কাবু হয়ে যায় কাঁদতে শুরু করলে– নোনা জল নষ্ট করে কালো খালার বুকের পলিমাটি, বাঁধ ভেঙে অপ্রতিরোধ্য হুড়হুড়িয়ে ঢোকে সেই জল। মানুষই তো এই জল মানুষের জন্য তৈরি করে। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ার টেবিলে বসে থেকেও কিছু লিখতে পারে না আলী আহমদ। কালো খালা মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে বলে একরকম শব্দ আসছে। ঐ শব্দটুকু ওর মনোযোগ কেড়ে রাখে। কত সহজে ও একজন মানুষকে শান্ত হতে বললো, অথচ এই নিঃশ্বাসই তো প্রমাণ করে যে যার সর্বস্ব যায় সে কিছুতেই শান্ত হতে পারে না– এদের নিশ্বাসের শব্দই আলাদা। স্বাভাবিক নিশ্বাস নয়, জোর করে শ্বাস ফেলছে কালো খালা– যে কদিন বেঁচে থাকবে এমনই ফেলবে। যেহেতু মৃত্যুকে নিজের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন তাই শ্বাস নিতে ফুসফুস ফুটো হয়ে গেলেও নাচোলের মেঠো পথে হেঁটে যাবে মানুষ, রাজশাহীর টমটমে ঘুরে বেড়াবে মানুষ

BanglaBook.org

এবং সংসার সাজাবে– হাঁসমুরগি পেলে, মুড়ি ভেজে এবং ক্ষেতমজুরি করে। ভাবতেই নিজের মধ্যে স্পন্দন অনুভব করে– কালো খালা গল্প হয়ে গেলে ওর কলম সক্রিয় হয়ে ওঠে– খসখস করে বেশ খানিকটা লিখে ফেলে। কালো অক্ষরগুলো বিশাল হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর মনে হয় ফজলুলের কথা, ও এখন ঢাকায়। ও প্রায়ই বলে, সাহিত্যিক হতে হলে তোকে ঢাকায় যেতে হবে আহমদ। মফস্বলে পড়ে থাকলে কিছু হবে না। আমি তোর বদলির জন্য চেষ্টা করবো। আমার চাচাতো ভাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আছে।

মানিকচক হাই মাদ্রাসায় পড়ার সময় থেকেই ফজলুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ও দেশভাগের আগেই রাজশাহী চলে এসেছিলো। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাস করার পর আর লেখাপড়া করেনি। বইয়ের ব্যবসায় ঢুকে যায়। ওর ইচ্ছে প্রকাশনায় যাওয়া, কিন্তু বই বিক্রির অবস্থা দেখে এগোতে সাহস পায় না। তবু আশা ছাড়ে না, বলে, দেখিস একদিন না একদিন ঠিকই বই বের করবো।

আলী আহমদের ইচ্ছে হয় হো-হো করে হেসে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলতে। এতদিনে তো ওরও একটি বই বের হয়ে যেতো, কবিতার বই। মোটা একটা খাতায় অজস্র কবিতা লিখেছিলো। কিন্তু কী হলো? সব স্বপ্ন কী বাস্তবায়িত হয়? পালিয়ে আসার সময় হারিয়ে গেলো খাতাটা। ঐ খাতাটার জন্য ওর বুকের ভেতরে স্বর্বস্ব খোয়ানোর কান্না আছে। এই বেদনা কী কালো খালার চেয়ে কম? কালো খালা হারিয়েছে মানুষ। ও হারিয়েছে হৃদয়ের টুকরো, ভাবতেই আলী আহমদ স্থবির হয়ে যায়। খাতাপত্র, কলম গুটিয়ে রাখে। হারিকেন নিভিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়– খোলা আকাশ, তারাখচিত, কোথাও নীল আছে কি না বোঝা যায় না। কোথাও কুয়াশা জমছে কি না বুঝতে পারে না। ডোবার ধার থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝির শব্দও ওর কানে তেমন করে প্রবেশ করে না। ওর কেবলই মনে হয় আকাশটা চৌকো চৌকো টুকরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে– একজন মানুষের জীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলে যেমন হয় তেমন। সে মানুষ যদি হয় সৃষ্টিশীল তবে সেটা আরো ভয়াবহ– সে রক্তক্ষরণ আরো ভয়াবহ। আলী আহমদের মনে হয় ঐ আকাশ, মেঘ, চাঁদ, তারা, গাঢ় অন্ধকার ছাড়িয়ে এক বর্ণহীন রক্তক্ষরণে ও স্নাত। ও বুঝি কোনোদিন এই বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কালো খালার মতো ও কাঁদতে পারে না। ইচ্ছে করলেও কান্না আসে না। বরং নোনা জল শুকিয়ে শক্ত হয়ে থাকে। কে যেন বুকের ভেতরে বসে বলে, আলী আহমদ চলো যাই।

ও চমকে উঠে প্রশ্ন করে, কোথায়?

সে উত্তর দেয় না, ইশারায় দেখিয়ে দেয় সামনে।

আলী আহমদ দেখতে পায় সামনে অসীম শূন্যতা।

তখন ঘুমের ভেতর কেঁদে ওঠে প্রতীক, কান্নার ঢংটা ফোঁপানো, গভীর দুঃখ থেকে উঠে আসা শব্দের মতো– অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। আলী আহমদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবে, বুকের ভেতর প্রতীকরাই থাকে।

BanglaBook.org

৩

অল্প সময়ের মধ্যেই নসরুল্লাহ বুঝে যায় এলাকার পরিস্থিতি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আশেপাশের অনেক কিছু আঁচ করার সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। ও বুঝে যায় যে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলোতে তেভাগা আন্দোলন থেমে গেলেও এই এলাকায় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার রমেন মিত্র ও তার স্ত্রী ইলা মিত্র দু'জনে খুবই সক্রিয়। রমেন মিত্র নিজের পাঁচশ বিঘা জমিতে তেভাগা দিয়েছে। দুদিন ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভালো লেগেছে নসরুল্লাহর। নতুন জায়গায় ও নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিয়েছে। অবশ্য ওসমান গনির সহায়তা না পেলে কী হতো ও জানে না। ওসমান গনি নিজের জায়গায় ওকে ঘর উঠিয়ে দিয়েছে– দুটো ঘর, মাটির দেয়াল, ওপরে খড়ের চাল– পাশে রান্নাঘর এবং উঠোনের অপর পাশে গোয়াল। দুধেল গাই কিনে দিয়েছে– মাসে মাসে সে টাকা শোধ করতে হয় ওসমান গনিকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সে– স্কুলটা ভালো চলছে। গাঁয়ের লোক ওকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। নসরুল্লাহ ভেবে দেখেছে যে এতকিছু ওর প্রাপ্য ছিলো না। চাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়া হয়ে গেছে– সুতরাং সে সুখী লোক। এর বাইরে নিজেকে নিয়ে বেশি ভাবে না। ভাবার প্রয়োজনও নেই। এখন ও ফজলে গাজীর মুখের দিকে তাকায়, যে বর্গাদার তমিজের সহযোগী, সোজা কথায় একজন ক্ষেতমজুর। নসরুল্লাহ দেখতে পায় বোকাসোকা ছেলেটির চেহারায় আত্মপ্রত্যয়। ও তেভাগা বুঝে গেছে। প্রয়োজন কী নির্মম শিক্ষক, বুঝিয়ে ছাড়ে মানুষকে। ও ভেবে দেখলো দিনভর খাটতে খাটতে ছেলেটির বুকপিঠ এক হয়েছে। ও তেভাগা বুঝবে না তো বুঝবে কী ওসমান গনি, যার ভূমিকা একজন ছোটোখাটো জোতদারের, যে তেভাগার কথা শুনলে চিড়বিড় করে। নসরুল্লাহর বিবেচনার পাল্লাটা ফজল গাজীদের দিকেই ভারী হয়ে ওঠে। কখনো স্কুলে যাওয়ার পথে মেঠোপথ থেকে নেমে ধান ক্ষেতে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে। বাড়ি থেকে অনেকটা পথ হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। মাঠের ভেতর দিয়ে, দু'পাশে ধানের ক্ষেত, যতোদূর চোখ যায় কেবল সবুজ। এই সবুজের ভেতর থেকে নসরুল্লাহ তেভাগা বুঝতে চেষ্টা করে। বৃষ্টির দিনে এই পথ কাদায় থকথক করে, গরুর গাড়ির চাকায় কোথাও গভীর গর্ত হয়ে যায়– শুকনোর দিনে ধুলো ওড়ে, দমকা বাতাসে ধুলো ঢুকে যায় চোখেমুখে, চিকচিক করে জিভ। নসরুল্লাহ ছাতার আড়াল করে পথ চলে, তবু চোখে ভরে আসে জল, ধুলো এড়ানো মুশকিল। পথের দু'পাশে ফণিমনসার ঝোপ, কাঁটাভরা গাছ। সামান্য আঁচড় লাগলেই রক্ত বের হয়। আছে অসংখ্য তালগাছ– এক পায়ে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। নসরুল্লাহ সামনে পেলে বাবুই পাখির বাসা কুড়িয়ে আনে। এক সারি বাবুইর বাসা বারান্দার চালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। বাতাসে সে বাসা যখন দোলে সেটা এক মনোরম দৃশ্য। এই দৃশ্যে নসরুল্লাহ উচ্ছ্বসিত হলে তরীকুল হাসে। বলে, বাবা তোমার ছাত্ররা এ সময়ে তোমাকে দেখলে কী ভাববে বলোতো?

নসরুল্লাহ হাসতে হাসতে বলে, বলবে আমাদের স্যার ছাত্র হয়ে গেছে।

পাশ থেকে হাসনা বেগম ফোড়ন কাটে, তোর বাবা কোনোদিন বুড়ো হবে না রে?

দরকার নেই বুড়ো হবার।

মফিজুল থাকলে এমন কথা বলতো। তরীকুল মৃদু হেসে চুপ করে থাকে। মফিজুলের জন্য গর্ব হয় নসরুল্লাহর। ছেলেটি মেধাবী, সচেতন– সব ছেলেরা এমন হলে মানুষ মানুষের কষ্ট বুঝতো– মানুষের কষ্ট দূর করতো। নইলে কেউ কাউকে দেখে না– এই না দেখার জন্য তেভাগা জোরদার হয়ে ওঠে। এই না দেখার জন্য বুড়ো হানিফ পথে ঘোরে–

BanglaBook.org

ধনুকের মতো বেঁকে গেছে শরীর, সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। নসরুল্লাহ বুড়ো হানিফকে দেখেছিলো প্রথমে স্কুলের কাছাকাছি বড় আম গাছটার নিচে। উবু হয়ে বসে থাকা মানুষটাকে চিনতে কষ্ট হয়েছিলো। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে চমকে উঠেছিলো ও। দূর থেকে যাকে মানুষ বলে বোঝা যায়নি আসলেই সে একজন মানুষ। নসরুল্লাহর উপস্থিতি টের পেয়ে কোনো রকম ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিলো। ওর সামনে কতগুলো গাছের শুকনো ডালপালা। নসরুল্লাহ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, কী করছেন?

রোজগার করছি।

রোজগার?

এটাই আমার রোজগার।

ফোকলা গালে সরল হাসি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুড়ো নির্বিকার বলে, জ্বালানি কুড়িয়ে না নিলে ছেলের বউ ভাত দেয় না। বলে, বসে বসে খাওয়া চলবে না। রোজগার করে খেতে হবে।

এমন দিন কী গেছে যে ভাত পাননি?

হ্যাঁ, অনেকদিন উপোস থেকেছি। খিদেয় পেট জ্বলে গেছে।

ছেলে কি করে?

ক্ষেতমজুর। দিন এনে দিন খাওয়া।

জমি নেই?

এক টুকরোও না, শুধু ভিটে সম্বল।

আপনার বউ নেই?

না, মরে জ্বালা জুড়িয়েছে। আল্লাহ যে কেন আমাকে নেয় না।

বুড়ো একটা দড়ি দিয়ে ডালপালাগুলো বাঁধতে থাকে। লুঙ্গি মালকোচা মেরে পরা। খসখসে কালো উরু, হয়তো কোনো চর্মরোগ আছে। হাড্ডিসার শরীর, মাথার চুল ধবধবে সাদা। গালের চামড়া কুঁচকে আছে, সেই কুচকানো ভাঁজে ধুলোর পরত। বুড়ো ডালপালা নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলে নসরুল্লাহ খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। বলে, যেদিন ছেলের বউ ভাত দেবে না সেদিন আপনি আমার বাড়িতে আসবেন। আমি আপনাকে ভাত খাওয়াবো।

বুড়োর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বলে, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি, একশবার সত্যি। আপনি আজ একবার আসেন।

আসবো, ঠিক আসবো।

বুড়ো ঘনঘন মাথা নাড়ে। তারপর অদ্ভুত কণ্ঠে বলে, আর জনমে তুমি কি আমার বাপ ছিলে? বড় বেশি আত্মকথনের ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে বুড়ো হানিফ গুটিগুটি পায়ে চলে যায়। নসরুল্লাহ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্কুলের বারান্দায় এসে ওঠে। তখনো ছেলেরা সব আসেনি, আসার সময়ও হয়নি। নসরুল্লাহ প্রতিদিনই স্কুল বসার অনেক আগে এসে যায়– স্কুলের খুঁটিনাটি বিষয় তদারক করে। কিন্তু আজ ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে থাকে। মফিজুল ওকে মানুষের এইসব দুর্দশার কথাই বলে। কিন্তু প্রতিকার কী? ও জানে সেই কবে থেকে মানুষ ধানের ন্যায্য দাবির আশায় লড়ছে– লড়াই শেষ হয় না– অন্তহীন সমস্যা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। নসরুল্লাহর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। অনেক দূর থেকে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বিন্দুর আকারে এগিয়ে আসে ছোটো ছোটো ছেলেরা। ওদের মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ, বর্ষার কাদামাখা রাস্তায় হাঁটতে ওদের পা আটকে যায়। অতদূর থেকে আসতে ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। ওদের বাবা-মা স্বপ্ন দেখে তাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, মানুষ হবে। কিন্তু এতকিছু না হলেও ওরা অভিজ্ঞতা দিয়ে, এমনকি জীবন

BanglaBook.org

পর মনে হচ্ছে এই ডাক একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের। ও দ্রুত বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ক্লাস সিক্সের দুটো ছেলে স্কুলের খেলার মাঠটা পেরিয়ে বারান্দার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, বড় বড় শ্বাস ফেলছে, স্যার? এইটুকুই এর বেশি কথা বের হয় না, বুঝি দম বেরিয়ে আসছে। তবু একটানে ঝটকা মেরে বলে, স্যার হানিফ দাদা–

নসরুল্লাহ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে, জিজ্ঞেস করে না যে কী হয়েছে– ও অপেক্ষা করছে, সময়ের অপেক্ষা। নসরুল্লাহ শুনতে চাইলেই কি ওরা ঝটপট বলে দিতে পারবে?

স্যার হানিফ দাদা– স্যার হানিফ দাদা ঐ রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে আছে।

স্যার, জিহ্বা বেরিয়ে গেছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে–

স্যার, বোধহয় এতক্ষণে নেই।

নসরুল্লাহ ততক্ষণে মাঠ পেরিয়ে গেছে, ছেলেরা পিছে পিছে আসছে। ছেলেদের কথা ওর কানে যায় না। ঐ কণ্ঠ হানিফের কণ্ঠ হয়ে যায়, ভাত খাবার আমন্ত্রণ পেয়ে যে কণ্ঠ খলবলিয়ে উঠেছিলো। চোখে আলো ছিলো না, চোখ জ্বলে ওঠেনি, কিন্তু প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো কণ্ঠ, গভীর মমতায় আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, আর জনমে তুমি কি আমার বাপ ছিলে? প্রশ্নটাই করেছিলো ও, উত্তর জানতে চায়নি, তার আগে চলে যায় নিজের পথে, এখন হানিফ বুড়ো মরে যাচ্ছে এ সত্য প্রধান– তাই ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই কণ্ঠ, নসরুল্লাহ সেই কণ্ঠের কথা বর্ণনা করতে পারবে না। বুক জুড়ে ঝমঝম করছে তা। ঐ শিশুরা ওকে আর কী বোঝাবে? কত মৃত্যু ও দেখেছে– স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক মিলিয়ে অনেক, সেখানে একজন পথের ধারে মরে থাকবে এ আর নতুন কী? না, খুব বেশি দূর যেতে পারেনি হানিফ। মেঠো পথ থেকে নিচে পড়ে আছে, মাটিতে মুখ গুঁজে। নসরুল্লাহ দ্রুত নাড়ি দেখে, তারপর আস্তে হাতটা নামিয়ে রাখে– বুঝতে পারে শরীরের সব স্পন্দন থেমে গেছে। মানুষ কি উটপাখি যে মাটিতে মুখ গুঁজবে? নইলে হানিফ এমন উটপাখির মতো মাটিতে মাথা লুকিয়েছে কেন? ওর কীসের সংকোচ? খাবার জোগাড় করতে না পারার ব্যর্থতা? ছেলের বউয়ের কাছে অপমানের লজ্জা? সমাজের কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করতে না পারার বেদনা? নসরুল্লাহ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হানিফকে দেখে– ও হাত-পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে শুয়ে নেই– উল্টো পিঠ বেঁকে আছে, মেরুদণ্ডের হাড় স্পষ্ট, ঘাড় গোঁজা, নিতম্ব উঁচু হয়ে আছে। নসরুল্লাহর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, এই নিতম্বে হানিফ কতবার লাথি খেয়েছে? কত অসংখ্য বার? সেই নিতম্ব ও এখন বিশাল ভঙ্গিতে আকাশের দিকে উঁচিয়ে রেখেছে– মুখ নয়, চোখ নয়, প্রশস্ত বুক নয়– নিতম্ব ছাড়া হানিফের আর কোনো সম্বল নেই। নসরুল্লাহ দু'হাতে মুখ ঢাকে।

স্যার?

এই শিশুদের কথা ভুলে গিয়েছিলো নসরুল্লাহ। ও হানিফের কাছ থেকে উঠে সরে দাঁড়ায়। ওদের ঘাড়ে হাত রাখে। কিছুক্ষণ আগে ও ভাবছিলো যে এইসব শিশুদের কী শেখাবে? ও কেন দেখেনি যে হানিফ ওর সামনে এক শিক্ষণীয় গ্রন্থ। ও তো শিশুদের শেখাতে পারে হানিফ বুড়োরা কেন এভাবে মারা যাবে? কেন তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে? কেন শেষ বিদায়ের পরও একজন মানুষের নিতম্ব আকাশের দিকে উঁচু হয়ে থাকে? এই প্রদর্শন কার জন্য? চোখে আঙুল দিয়ে কী দেখিয়ে দেয়? এই সমাজে কারা উটপাখি? জীবনের শুরুতেই শিশুদের এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করে দেওয়া উচিত।

স্যার?

তোরা হানিফ বুড়োর ছেলেকে খবর দিতে পারবি?

পারবো স্যার।

BanglaBook.org

তবে যা, আমি এখানে আছি।

ওরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। মুহূর্তে পথের বাঁকে মিলিয়ে যায় দু'জনে। ততক্ষণে চারদিক থেকে শিশুরা আসতে থাকে– স্কুলে ওরা দল বেঁধেই আসে। হেডমাস্টারকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ে, ছোটোখাটো ভিড় জমে যায়। নসরুল্লাহর মনে হয় শিশুদের এই দৃশ্যটি দেখানো উচিত এবং বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। হানিফের লাশ দেখে শিশুদের চোখ ছলছল করে, কেউ কেউ হাতের তালুতে চোখ মোছে– ওরা খুব বিষণ্ন হয়ে যায়। নসরুল্লাহ ভাবলো, শিশুদের মুখ বিষণ্ন থাকা উচিত নয়। ওদের চঞ্চল করে তুলতে হবে, না হাসিখুশি নয়– অভাবের মাটিতে সব সময় হাসিখুশি রাখা যায় না, সেটা সাধ্যের অতীত। নানাভাবে ওদেরকে চঞ্চল করা যায়, কিংবা ক্রুদ্ধ। ওদের মুখের ওপর থেকে নসরুল্লাহ দৃষ্টি সরাতে পারে না। আস্তে আস্তে গাঢ়, গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তোমাদের কান্না পাচ্ছে কেন?

শিশুরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে– ওরা ঠিক প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি, কিংবা এমন ধরনের প্রশ্ন ওরা কখনো শোনেনি– কী উত্তর দিতে হবে ওরা জানে না। তবু একজন সাহস করে বলে, মানুষ মরে গেলে তো কান্নাই পায়।

তখন নসরুল্লাহ ঝট করে চেঁচিয়ে বলে, এমনভাবে মরে গেলে কি কান্না পাওয়া উচিত? মানুষের এমন মৃত্যু হবে কেন? পথের ধারে উল্টে পড়ে আকাশের দিকে পাছা উঁচু করে রেখে?

তখন শিশুরা হুড়মুড়িয়ে হানিফ বুড়োর মৃতদেহ ঘিরে ধরে। ওদের দু'চোখে গভীর বিস্ময়– মৃত মানুষের এমন ভঙ্গি তো ওরা কখনো দেখেনি। মৃত্যু মানে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকা, সাদা কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা, তাকে ঘিরে প্রিয়জনদের কান্না, এমনই তো দেখেছে ওরা। তাহলে হানিফ দাদা এমন পড়ে আছে কেন? স্যার তো ঠিকই বলেছেন। ওরা একবার হানিফকে দেখে, একবার নসরুল্লাহকে। তারপর আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করে, স্যার আপনার কী কান্না পাচ্ছে না?

না।

না, শব্দটা বিশাল চিৎকারের মতো ওদের কানে বাজতে থাকে।

আমার কান্না পাচ্ছে না। আমার রাগ হচ্ছে।

রাগ?

ওরা সমবেত কণ্ঠে বলে।

রাগ হবে না? এভাবে মানুষকে মরে যেতে দেখলে রাগ হয় না?

হয় স্যার, হয়।

ক্লাসে একসঙ্গে উত্তর দেবার মতো করে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে।

কেন এমন করে মানুষ মরে স্যার?

এই কথাটাই আস্তে আস্তে আমি তোমাদের ক্লাসে বোঝাবো। আজ স্কুল ছুটি। তোমরা বাড়ি চলে যাও।

হেডমাস্টারের কথা শুনে ওরা পিছু সরে আসে, কিন্তু বাড়ি যেতে পারে না– পথের ধারে এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে, কেউ উবু হয়ে বসেছে, কেউ ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়েছে– কেউ পেছন ফিরে নয়, সবার সামনে হানিফ বুড়ো। ওরা বিষণ্ন এবং চিন্তাগ্রস্ত, ভাবছে এমন করে মরবে কেন? পথের ধারে উল্টে পড়ে আকাশের দিকে পাছা উঁচু করে রেখে? এই বাক্যটি নিয়ে হাসাহাসি করার অনেক সুযোগ ওদের ছিলো, স্কুলের হেডমাস্টার এমন করে না বললে, আর কারো মুখে একথা শুনলে ওরা হেসে

BanglaBook.org

গড়িয়ে পড়তো, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওরা খুব বিচলিত বোধ করছে। ওদের ভাবনা শেষ হয় না। ওরা দেখতে পায় নসরুল্লাহ তার ছাতা খুলে মৃতদেহকে কিছুটা আড়াল করে দিলো। এখনো বুড়োর ছেলে আসছে না। নসরুল্লাহ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, চনচনে রোদ, শরীর ঘামে ভিজে ওঠে। দু'চারজন গাঁয়ের লোক দাঁড়ায়। মুখে সহানুভূতি জানায়। নসরুল্লাহ ওদের একজনকে বলে মসজিদ থেকে খাটিয়া জোগাড় করে আনতে। লোকটি তখনো পথের বাঁকে মিলিয়ে যায়নি। অকস্মাৎ নসরুল্লাহর ভেতরটা কেঁপে ওঠে, বুড়ো কি ওর নিমন্ত্রণ পেয়ে ভাত খাবার আনন্দে মরে গেলো? এত আনন্দ যে সহ্য করা সম্ভব হয়নি? এত আনন্দ যে সে ধাক্কায় বুকের ধ্বনিটুকু মহাকাশের দিকে ধাবিত হয়ে গেলো? এত আনন্দ যে সে স্বর্গে প্রবেশ করলো? নসরুল্লাহর বুক কুঁকড়ে যায়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তখন ও গালি দিলো, ভাত খাবার আনন্দে তুমি মরে গেলে বুড়ো, অথচ কায়েদে আজম তোমার জন্য একটা পতাকা এনেছে এইভাবে মরে যাবার জন্য নাকি?

তখন বাবা-বাবাগো বলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসতে থাকে হানিফের ছেলে কাদির– মোটামুটি জোয়ান তাগড়া শরীর, চওড়া বুক, কিন্তু গলার স্বর সরু– কান্নার তোড়ে কণ্ঠস্বর আরো বিকৃত। নসরুল্লাহর মনে হয় যেন কোনো নারী বিলাপ করছে। বাবা– বাবা রে– হেই বাবা–। আরো অনেক শব্দ থাকে বাবা শব্দের সঙ্গে সেগুলো নসরুল্লাহ বুঝতে পারে না। মৃতদেহের কাছে এসে কাদির আরো প্রবলবেগে মাথা চাপড়ায়। নসরুল্লাহ কিছুই বলে না, ওকে কিছুক্ষণ কান্নার সুযোগ দেয়, তারপর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছিলো। মরে গিয়ে শান্তি পেলো। কেঁদে আর কী করবি বল? আমি নজু মিয়াকে পাঠিয়েছি খাটিয়া আনতে। খাটিয়া আনলে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যা। ধোয়ানোর ব্যবস্থা কর।

কাদির নসরুল্লাহর হাত চেপে ধরে।

আপনি আমার সঙ্গে থাকেন মাস্টার সাহেব।

আমি তো আছি রে পাগল। তুই বাবাকে নিয়ে বাড়ি যা। আমি বাজার থেকে কাপনের কাপড় নিয়ে আসি।

আমার কাছে টাকা নেই মাস্টার সাহেব।

সেজন্য তোকে ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করবো।

কাদির কৃতজ্ঞতায় নসরুল্লাহর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

এই দৃশ্য দেখে দূরে বসে থাকা শিশুরা হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে, অকস্মাৎ ওদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়। ওরা হেডমাস্টারের কাছে এসে দাঁড়ায়। হেডমাস্টার চলতে শুরু করলে ওরা পিছু নেয়, সেটা একটা ছোটোখাটো মিছিল হয়ে যায়। ওরা একজন স্লোগানের মতো করে বলে, মানুষ এমন করে মরবে কেন?

প্রতিধ্বনি হয়, পথের ধারে উল্টে পড়ে।

মানুষ এমন করে মরবে কেন?

আকাশের দিকে পাছা উঁচু করে রেখে।

নসরুল্লাহ অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকায়। কেউ আর ওকে ভ্রুক্ষেপ করে না। ওরা স্লোগান দিতে দিতে চলে যায়। নসরুল্লাহ হাঁটতে থাকে, কিছুটা আনমনা, কিছুটা আনন্দিত– বুঝে যায় মূলটুকু আসল জায়গায় প্রোথিত করেছে, এখন ওটা আপন নিয়মে পল্লবিত হবে। ওরা কতদূর যাবে? বাজার পর্যন্ত কি?

দুদিন পর ওসমান গনি গম্ভীর মুখে স্কুলে আসে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছেলেরা কেউ নেই। শিক্ষকরা দু'একজন যাই যাই করছিলো, কিন্তু কথায় কথায় আটকে যায়।

BanglaBook.org

ওসমান গনিকে দেখে উঠে পড়ে। ওসমান গনি ঘুণ পোকায় নষ্ট করা চেয়ারটায় বসতে বসতে বলে, নসু ভাই অনেক আশা করে আমি আপনাকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক করেছিলাম। শিক্ষক হিসেবে আপনার খুব সুনাম ছিলো।

স্কুলের জন্য আমি দিনরাত পরিশ্রম করি। আমার স্বভাবে ফাঁকি শব্দটি নেই। তুমি কী বলতে চাও তা সরাসরি বলো।

নসরুল্লাহ গম্ভীর হয়ে ওসমান গনির চোখে চোখ রাখে। ওসমান গনি কিছুটা ঘাবড়ে যায়। সম্পর্কে এই ভাইটির ব্যক্তিত্ব ওকে আকৃষ্ট করলেও আজ ওর মেজাজ ভালো নেই। নিজে ও এই গাঁয়ে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী লোক, অথচ তার ভাই কিনা কম্যুনিস্টের মতো আচরণ করেছে? লোকে ছি ছি করছে– বলছে, এমন লোককে স্কুলে রাখা যাবে না। যে ভাই আপনজনের সম্মানের দিকে তাকায় না, তার জন্য কীসের মমতা? গাঁয়ের ছেলেদের যে আজেবাজে কথা শেখায় সে কী শিক্ষক? ওসমান গনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে, ওর ক্ষোভ প্রশমিত হতে চায় না। রাগে ফেটে পড়ে বলে, ছেলেদের আপনি এসব কী কথা শিখিয়েছেন নসু ভাই?

আমি কি ভুল কিছু বলেছি কিংবা অসত্য? তুমি আমাকে বলো, হানিফ বুড়োর সম্মানজনক মৃত্যু পাওয়া ছিলো না? বিছানার ওপর শায়িত, আত্মীয়স্বজন ঘিরে রেখেছে, কোরান শরিফ পড়া হচ্ছে, মুখে পানি দেওয়া হচ্ছে, মরে গেলে কান্নার রোল উঠবে বাড়িজুড়ে। কৈ এসব কী হানিফ পেয়েছে? ওকে যদি কেউ খুন করতো আমি হয়তো কিছু বলতাম না, কিন্তু ওর মৃত্যুটি স্বাভাবিক মৃত্যু। তুমি তো এ গাঁয়ের নেতা, তুমি কেন তাকে দুমুঠো ভাত খাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারোনি?

আপনি কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছেন?

হা-হা করে হেসে ওঠে নসরুল্লাহ। হাসতে হাসতে বলে, এ শব্দটিকে তোমরা বড় বেশি ভয় পাও দেখছি? জেনে রেখো আমি কম্যুনিস্ট নই। চারপাশে যা দেখছি সেই সত্যটি বলার চেষ্টা করি।

আপনি কি জানেন সব সময় সত্য বলার চেষ্টা না করা ভালো? সবাই সত্য মানতে পারে না?

আমি তা জানি গনি।

গাঁয়ের লোক আপনার বিরুদ্ধে যা তা বলছে।

গাঁয়ের লোক নয় গনি, মাত্র কয়েকজন, যাদের আঁতে ঘা লাগে, তারা। এতে অবশ্য আমি কিছু মনে করি না। একদল লোক থাকে যারা এসব কথা বলতেই পছন্দ করে।

তখন ওসমান গনি গা ঝাড়া দিয়ে গলা খাঁকারি দেয়, কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে বলে, ভবিষ্যতে আপনি এভাবে কথা বললে আমি আপনাকে বাঁচাতে পারবো না। এই দেশে থাকা মুশকিল হবে।

নসরুল্লাহ্ আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?

ওসমান গনি রেগেমেগে বলে, ব্যাপারটি আপনি মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। পাগলের মতো হাসছেন কেবল। আপনার বোঝা উচিত যে আপনার জন্য আমি কতটা হেয় হয়েছি। আপনার বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ রয়েছে।

কী?

আপনি মসজিদে যান না।

এসব কী বলছো? আমার বিশ্বাস, আমার ধর্ম আমি যেভাবে খুশি সেভাবে পালন করবো। কারো কাছে কৈফিয়ত দিয়ে নয়।

BanglaBook.org

ভুল, প্রচণ্ড ভুল। সমাজে বাস করতে গেলে অনেক কিছু মেনে চলতে হয়। আপনি তার বাইরের কেউ নন। যদি তেমন কিছু করতে চান তাহলে আপনি ঘরেই থাকেন। দরকার নেই আপনার স্কুলে আসার, হাট-বাজার করার, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার। পারবেন থাকতে?

আমি নিজেকে সমাজের বাইরের কেউ মনে করি না। তবে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোও পছন্দ করি না।

নসরুল্লাহর এত স্পষ্ট কথাবার্তা ওসমান গনির পছন্দ হয় না। কিছুটা বিরক্তি সহকারে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে। তারপর একসময়ে উঠে দাঁড়ায়, চলি।

দাঁড়াও, আমিও একসঙ্গে বেরুবো।

নসরুল্লাহ খাতাপত্র গুছিয়ে রাখে। দরজায় তালা লাগায়। ওসমান গনি জানে এই লোকটির স্কুল-অন্তপ্রাণ। কিন্তু, কিন্তু মনে করে ও মুষড়ে পড়ে। নসরুল্লাহর বিরুদ্ধে বড় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের অক্ষমতার যন্ত্রণা ওকে দগ্ধ করে। নসরুল্লাহকে যে পরিমাণ কথা শোনানোর জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো তার কিছুই বলতে পারলো না। আসলে নসরুল্লাহর ব্যক্তিত্ব ওকে কাবু করে দেয়, ও সহজে পরাজিত হয়।

দুজনে একসঙ্গে মাঠে নামে– মাঠ পেরিয়ে পথ, মেঠো পথ, পাশাপাশি হাঁটলে প্রায়ই গায়ে গা লেগে যায়। হাঁটতে হাঁটতে নসরুল্লাহ বলে, যখন যেখানে বসবাস করি সেটা আমার আপন জায়গা হয়ে যায় গনি। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমাকেও বলি চোখকানটা খোলাই রেখো। বন্ধ করে রাখলে নিজেরই ক্ষতি।

আমার কাজ আছে। আসি।

ওসমান গনি দ্রুত হাঁটতে থাকে। বেশ অনেকটা সামনে এগিয়ে যায়। নসরুল্লাহ মনে মনে হাসে। ওসমান গনি এমনই, নিজে কোনো ব্যাপার বিচার-বিবেচনা করে বোঝার চেয়ে, অন্যের কথায় কান দেয় বেশি। সেজন্য নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। পরক্ষণে নসরুল্লাহ ওসমান গনির চিন্তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে। ভাবে, এটা এক ধরনের পরচর্চা। এই বাজে চিন্তা ওর না করা উচিত। বরং এখন স্টেশনে গিয়ে কিছু পত্রপত্রিকা পড়তে পারে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় হেমায়েতের বাড়িতে যাওয়া উচিত। ওর ছেলেটা কেন পনের দিন ধরে স্কুলে আসছে না সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার। এতদিন খোঁজ নেওয়া হয়নি ভেবে মনে মনে লজ্জিত হয়। মোড় ঘুরে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে পথ ধরে। জুতো জোড়া খুলে হাতে নেয়, জুতো পরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, পথের বেশির ভাগ জায়গাই ভাঙা, দুবার গর্তে পা পড়ে যায়, কপাল ভালো যে মচকে যায়নি। লুঙি হাঁটুর ওপর ওঠানো। ধান লাগানোর মরসুম শুরু হয়েছে– জমি তৈরি হচ্ছে, লুঙি হাঁটুর ওপর ওঠানো। ধান লাগানোর মরসুম শুরু হয়েছে– জমি তৈরি হচ্ছে মাত্র, এখনও চারা লাগানো হয়নি। জমির ভেতর হাঁটু কাদা, এখন কেউ কেউ জমিতে কাজ করছে– দূরে বাড়িগুলো দ্বীপের মতো, ঘন সবুজ পাতার আড়ালে ঢাকা। এই বিকেলে হাঁটতে ভালোইলাগে নসরুল্লাহর, রোদ চড়া নয় মিঠেকড়া, গা তাতায় না, আমেজ দেয়। ঘুরে ফিরে ওসমান গনি ওর মাথায় ভর করে– গনির কথাগুলো নাড়াচাড়া করে। ও নিজেই শুনেছে যে ছেলেদের ঐসব কথা বলার একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কেউ কেউ সেসব কথা বলেছে, কিন্তু নসরুল্লাহ গায়ে মাখেনি। ও জানে মানুষ সহজে নিজের মনের বেড়ি ভাঙতে চাইলে প্রত্যাঘাত তো খেতেই হবে। এসব গায়ে মাখলে আঘাত না করাই ভালো। প্রত্যাঘাত পাওয়ার সহিষ্ণুতা নিয়েই আঘাত করতে হবে। সুতরাং নসরুল্লাহ ওসমান গনিকে আবার ওর মাথা থেকে নামিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

মাস্টার সাহেব স্লামালায়কুম।

কাদা মাখানো হাত তুলে সালাম দেয় ফকির।

ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছো ফকির?

ভালো গো, খুব ভালো।

খুব ভালো? নসরুল্লাহ অবাক হয়ে তাকায়।

আপনে কুত্থে যাচ্ছেন গো?

হেমায়েতের বাড়িতে।

অ। যান গো।

তুমি বাড়ি যাবে না?

য্যামো। সাঁঝের বেলায়। বর্গাদারের হুকুম।

হি-হি করে হাসে ফকির। হাসতে হাসতে কাদার ওপর নুয়ে পড়ে দু'হাতে মাটি খাবলায়। খলবল করে কাদাপানি। নসরুল্লাহর মনে হয় ও একটা ব্যাঙ, ও ভাত খায় না, মাটি খায়, পানি খায়, শ্যাওলা খায়। তখন ও এক পা কাদায় নামিয়ে ফকিরকে জিজ্ঞেস করে, দুপুরে কী খেয়েছো ফকির?

দুপুরে খ্যামো ক্যান? বেহানে ভাত খেলাম। আবার কী?

খিদে লাগেনি?

খিদে?

হি-হি করে হাসে ফকির। হাসতে হাসতে বলে, না খিদে লাগে না।

ওর সারা শরীরে কাদা। লুঙি মালকোচা করে পরা, খালি গা, হাড্ডিসার। গায়ে জামা নেই– বুকে পিঠে ঘামের আঁকাবাঁকা রেখায় বেশ একটা নকশা হয়েছে। ওর মিশমিশে কালো উরুতে বড় বড় দাগ, হয়তো ছোটোবেলায় পুড়েছিলো কিংবা কে জানে ওর মা রান্না করার সময় ওর উরুতে গরম ডালের হাঁড়ি উল্টে পড়েছিলো কি না? তখন ও দেখতে পায় ফকিরের পায়ের মোটা রগের পাশে একটা কালো জোঁক কামড়ে ধরে আছে, নসরুল্লাহর শরীর শিরশির করে ওঠে। আঁতকে উঠে বলে, ফকির জোঁক তোর রক্ত খাচ্ছে?

জোঁক? এতক্ষণে ও টেরই পায়নি। ও পা সামনে বাড়িয়ে জোঁক দেখে। তারপর নিঃশব্দে উঠে আসে আলোর ওপর, একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে জোঁকটাকে খুলে ফেলে। তারপর নসরুল্লাহর হাত থেকে জুতো কেড়ে নিয়ে জোঁকটাকে মাটির সঙ্গে থেঁতলে মারে। ওর পা থেকে রক্ত ঝরছে। ওর শরীরে আর একটা নতুন দৃশ্যের যোগ হয়। ফকির দূর্বাঘাস চিবিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে দৃশ্যটা অন্যরকম হয়। নসরুল্লাহ তখন আস্তে করে বলে, বাড়ি যা ফকির। ও কথা বলে না, হাত পা ছড়িয়ে আলের ওপর বসে থাকে– নসরুল্লাহ দেখতে পায় ওর পায়ের পাতায় এবং নখে কাদা দিয়ে নকশা তৈরি হয়েছে, আসলে ফকির কি একটি নকশা বহনকারী জীব? নসরুল্লাহ আবার বলে, বাড়ি যাবি না ফকির?

ও খানিকটা বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, আপনে য্যান গো। হামি অক্যুন য্যামো না। ও ক্লান্ত এবং হাঁফাচ্ছে। দু'হাত পেছনে ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে ও শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছে। ওর ঘাড় কাত হয়ে আছে, মাথা সোজা রাখা দায়। আকাশের দিকে চোখ রেখেই ও বলে, বাড়ি যাতি ভালোলাগে না। মায়ের অসুক। ওষুধ ন্যাই, পথ্য ন্যাই। বাড়িত য্যামো ক্যাংকরা?

নসরুল্লাহ দেখতে পায় ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে। ওর মাথায় হাত রেখে বলে, তুই আমার সাথে চল। কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ কিনে দেবো।

BanglaBook.org

ও রেগে বলে, মেলা ফ্যাকফ্যাক করেন ক্যা। হামার মা বাঁচবি না। মিছামিছি কবরেজ ড্যাকা কি অবি?

ঠিক আছে, তুই থাক। আমি তোর মাকে দেখে আসবো।

ফকির কথা বলে না। বড় বড় শ্বাসে ওর বুকের খাঁচা ওঠানামা করে। ওর মুখটা তখনো আকাশের দিকে, গাছের ছায়া ওর মুখে নকশা ফেলেছে, দৃষ্টিতে আকাশের নীলের মাখামাখি, আশ্চর্য নীল– নসরুল্লাহ্ বুঝতে পারে না যে ও কী কিছু ভাবছে কি না, শুধু অনুভব করে ও এখন এই গাঁয়ে নেই, ও দার্শনিক হয়েছে, এখন ও গ্রিসে কিংবা প্যারিসে। নসরুল্লাহ্ ওকে পেছনে রেখে হাঁটতে থাকে। আজ ফকির ওকে বড় বেশি ভাবিয়ে তোলে– মানুষের এই দার্শনিক হয়ে যাওয়ায় ওর বুক তোলপাড় করে। নসরুল্লাহ্ ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। ও আবার নতুন ভাবনায় আক্রান্ত হয়– ফকির দার্শনিক হবে কী করে? ওর তো কোনো শিক্ষা নেই, মেধাও নেই। ওর জীবন সম্পর্কে ধারণাই বা কী? ও কি মৃত্যু নিয়ে কিছু ভাবে? নাকি জন্ম নিয়ে? যেটুকু মানুষের যৌনসুখ তার বাইরে জন্মের কোনো মহিমা আবিষ্কার করতে পারবে কী ও? বড্ড জানতে ইচ্ছে করে নসরুল্লাহর, কিন্তু আবার পিছু হেঁটে ওর কাছে যাবার সাহস হয় না। ও তো বিরক্ত হয়েছে, ওর সঙ্গে রাগ করেছে– আর ওকে ঘাঁটিয়ে তোলা কী ঠিক হবে? ও যতই ব্যাঙ কিংবা কাদাখোঁচা পাখি হয়ে যাক না কেন নিজেকে নিয়ে একটুখানি ভাবার ইচ্ছেটুকুই তো ওর স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মুহূর্তে ও দার্শনিক হতেই পারে– ফকির আলী এই মুহূর্তে দার্শনিক, বিরাট দার্শনিক– ওর দৃষ্টিতে আকাশের ছায়া দেখেছে নসরুল্লাহ। যে মানুষ আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে মুষ্টি খুলে দিয়ে নীলিমা অবলোকন করে সে সেই মুহূর্তে ক্ষেতমজুর থাকে না। এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নসরুল্লাহ্ নিজের ভেতরে আলো অনুভব করে– সে আলো বাইরেও ছড়ায়– দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাখামাখি হয়ে যায় নীলে, মেঘে, সবুজে, মাটির গেরুয়া রঙে। এই আলোর মাখামাখি নিয়ে নসরুল্লাহ্ প্রথমে হেমায়েতের বাড়িতে আসে।

হেমায়েত দাওয়ায় বসে ধামা বুনছিলো– বেত দিয়ে ও চমৎকার ধামা বুনতে পারে, প্রতি হাটে দু'তিনটে ধামা বিক্রি হয় ওর। নসরুল্লাহকে ওর বাড়িতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

মাস্টার সাব–

কেমন আছো হেমায়েত?

এই তো ভালো। বসেন।

ও মোড়া এগিয়ে দেয়। নসরুল্লাহ্ ইতস্তত করে, জুতোজোড়া হাতে, পায়ে কাদা লেগেছিলো বলে জুতো আর পরা হয়নি। হেমায়েতের স্ত্রী ছোটো ছেলেকে দিয়ে পান পাঠায়। ছেলেটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, ওকে এখনো স্কুলে পাঠায়নি হেমায়েত।

বসেন মাস্টার সাব? পান খান?

নসরুল্লাহ্ বসতে বসতে বলে, তোমার ছেলে কৈ? নাসির?

গরু নিয়ে মাঠে চরাতে গেছে। এখনো ফিরেনি।

তাহলে তো সুস্থই আছে। স্কুলে যাচ্ছে না কেন?

হেমায়েত চুপ করে থাকে। নসরুল্লাহ্ তড়িঘড়ি বলে, তোমার ছেলেটি পড়ালেখায় ভালো। তাই তো আমি নিজেই খোঁজ নিতে এলাম যে কি হলো। ওকে কাল থেকে স্কুলে পাঠিয়ে দিও।

না, মাস্টার সাব ওকে আর স্কুলে পাঠাবো না।

বলো কি? কেন পাঠাবে না?

BanglaBook.org

চাষার ছেলের বেশি লেখাপড়া শিখে লাভ কী কন? ওকে ক্ষেতের কাজে লাগিয়েছি। এখন থেকে উপার্জন করতে শিখুক।

নসরুল্লাহ হেমায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, শোনো হেমায়েত, তোমরা যে তেভাগার জন্য আন্দোলন করছো না, এজন্যই লেখাপড়া শেখা দরকার। লেখাপড়া শিখলে মহাজন যেখানে বলবে সেখানেই টিপসই দেবে না। হিসেব জানা থাকলে মহাজনের বদমায়েশি ধরতে পারবে। মহাজন ধানের হিসেবে ঠকাতে পারবে না।

হেমায়েতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, এটা তো ঠিক কথা। ঠিক আছে মাস্টার সাব ওরে আমি মৌসুমে কিছুদিন জমিতে খাটাবো। বাকি সময় স্কুলে যাবে।

নসরুল্লাহ খুশি হয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে আসে। হেমায়েত ওর পিছু নেয়। নসরুল্লাহ ঘাসে পা মুছে জুতো পরে, লোকালয়ে জুতো হাতে নিয়ে হাঁটা বড্ড বাজে ব্যাপার। আরো আগেই ওর পরা উচিত ছিলো, কিন্তু ফকির আলী ওকে এতো বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো যে জুতোর কথা ও বেমালুম ভুলে যায়। পথের দুপাশের ঝোপঝাড় পেরিয়ে যেতে যেতে ও হেমায়েতকে বলে, ফকির আলীর মা কেমন আছে হেমায়েত?

যখন-তখন অবস্থা।

যাই, একটু দেখে আসি।

বেচারা ফকির আলী, মা ছাড়া সংসারে কেউ নাই।

তোমরা ওকে বিয়ে করাওনি কেন?

ও তো করতে চায় না। সংসারের ঝামেলা ওর ভালোলাগে না। আমার তো মনে হয় মা মরে গেলে ও বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবে।

কেন?

পাগল একটা।

পাগল না দার্শনিক? নসরুল্লাহ বিড়বিড় করে, ওর দৃষ্টিতে নীল ছায়া ভাসে কেন? ওকে তো আমি অন্যরকম দেখেছি, যেন এই গাঁয়ের কেউ না কিংবা এই পৃথিবীর? নসরুল্লাহ খুব দ্রুত যেতে চায় ফকির আলীর মায়ের কাছে, কিন্তু ওর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, ভালোলাগছে না, পা জড়িয়ে যায়, ও নিজে মুখ থুবড়ে পড়বে, নাকি ওর পায়ে একটা বিশাল জোঁক কামড়ে ধরে আছে? তেতুঁলতলা পর্যন্ত আসতেই ওরা দেখতে পায় ফকির আলীর ভাঙাচোরা কুঁড়েতে লোক জমে গেছে। হেমায়েতের কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাস করে ওঠে, মাস্টার সাব ফকির আলীর মা বোধহয় নেই। আহা রে!

নসরুল্লাহর কণ্ঠ দ্রব হয়ে যায়। দু'জনে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই অন্যরা ওদের ঘিরে ধরে। পরিবেশ থমথম করছে। পাশের ঘরের কোনো বৌ-ঝি গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। পাশ থেকে কেউ একজন বলে, ফকিরকে খুঁজতে লোক পাঠানো হয়েছে। ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নসরুল্লাহ বলে, আমি ওকে মাঠে দেখে এসেছি।

ওখানে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। অথচ দাফনের ব্যবস্থা করতে হয়।

হেমায়েত তোমরা লাশ ধোয়ার ব্যবস্থা করো। আমি কাফনের কাপড় আনতে যাই।

নসরুল্লাহর কথায় সবাই ওর মুখের দিকে তাকায়। প্রত্যেকের মুখে স্বস্তি ফিরে আসে। ফকির আলীর অনুপস্থিতি সবাইকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলো। কারণ লাশের দায়িত্ব কে নেবে এবং কতক্ষণ এই লাশ নিয়ে বসে থাকতে হবে, এই ভেবে প্রত্যেকের মুখ পাংশুটে হয়ে যায়। ওদেরকে আশ্বস্ত করে নসরুল্লাহ ধীর পায়ে মৃতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

আসে। হঠাৎ ওর খুব রাগ হয়, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে না কেন? একজন মানুষের বুকেও কি শোক থাকতে নেই? তাহলে এই মৃত্যু সবাইকে কি স্বস্তি দিচ্ছে? সবাই কি ভাবছে বুড়ি মরে গিয়ে ভালো হয়েছে? নসরুল্লাহ দ্রুত হাঁটতে থাকে, আবার তেঁতুলতলা পেরিয়ে আসে, গাছটায় হলুদ ফুল এসেছে, মাথাটা ঘন ঝোপে কালো হয়ে আছে, ডালে অসংখ্য কাক বসে আছে– তারস্বরে ডাকছে। নসরুল্লাহর মগজে কাকের ডাক ঢুকে যায়। ওর মনে হয় মানুষ না কাঁদুক, পাখিরা তো কাঁদছে। মানুষের মৃত্যু এমন সহজ হয়ে গেছে যে মানুষের বুকে আর কান্না নেই, হয়তো ফকির আলীর বুকেও আর কান্না নেই। ঐ শূন্য ভিটায় বসে কাকেরা কাঁদবে, অনেক কাক, হাজার হাজার কাক। দু'পাশে দিগন্তজোড়া মাঠ ফেলে নসরুল্লাহ আলপথে হেঁটে যায়। ফকির আলী যেখানে বসেছিলো সেখানে ও নেই। ও কী জানে যে ঘরে গিয়ে আর বলতে পারবে না, মা ভাত দে? মা লুঙি কোথায়? মা রে এক টুকরা ইলিশ মাছ কী বেশি দিতে পারিস না? কাউয়াগুলো এত জ্বালাতন করে ক্যান? তাড়াতে পারিস না? এত কষ্টের ধান, একটা ধানে যেন কাকে ঠোকর না দেয়। তুই সারাদিন লাঠি নিয়ে বসে থাক। তোর অসুখ করেছে? কী হয়েছে, ভালো হয়ে যাবি। গাঁয়ের কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসবো। না হলে তোকে ট্রেনে চড়িয়ে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবো। তুই না বলেছিলি তোর ট্রেনে চড়ার খুব ইচ্ছে। এবার তোর শখ পুরিয়ে দেবো। কু-উ ঝিকঝিক করে ট্রেনটা ছুটলে তুই জানালায় বসে দেখবি গাছগুলো কেমন সরে যায়। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম আসে মা-রে।

নসরুল্লাহর মাথার ভেতর চিন্তাগুলো জট পাকায়। ও নিজে এখন ফকির আলী হয়েছে। ও তো ফকির আলী হবেই, কারণ মায়ের একজন ছেলে চাই যে, ফকির আলীকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতক্ষণ ও ফকির আলী থাকবে, কতক্ষণ? ছেলেরা ফিরে না এলে মায়েদের বুক শূন্য থাকে। শূন্য বুক নিয়ে কিছুতেই মায়েদের বিদেয় দেওয়া উচিত না। আলপথ ছেড়ে নসরুল্লাহ মাঠে নামে, পতিত জমি, গরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে বাজারের দিকে। দু'পাশে কাঁটা বাবলার ঝোপ, ফণিমনসাও আছে। তখন ও দেখতে পায় কয়েকজন লোক ফকির আলীকে সঙ্গে করে এগিয়ে আসছে। ওর গায়ে এখন কাদা নেই, হাতমুখ পরিষ্কার, লুঙি হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে, চুল উসকুখুসকু, উদভ্রান্ত চেহারা। ফকির আলী নসরুল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, আপনি না কহাছিলেন হামার মাক দেখবার য্যাবেন?

গেছিলাম তো।

ক্যাংকা দেখলেন?

শান্তিতে আছেন।

অক্যুন চলেন?

কাফনের কাপড় নিয়ে আসি।

কাফনের কাপড়? কাফনের কাপড়?

ফকির আলী উদভ্রান্তের মতো ছুট দেয়। অন্যেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাস্টারের মুখের দিকে তাকায়। মাস্টার ওদেরকে বলে, যাক, ও যাক। ওকে যেতে দাও। ও না গেলে মায়ের বুক শূন্য থাকবে। ও না কাঁদলে কাকেরা কাঁদবে আমরা তো মানুষ। কাকেরা কাঁদুক এটা কি হয়? মানুষ মরলে মানুষেরই কাঁদতে হবে, কাকেদের নয়। তোমরা সবাই যাও। আমি আসছি।

যারা দাঁড়িয়েছিলো কেউ কিছু বুঝলো না, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। নসরুল্লাহ ওদের পাশ কাটিয়ে বাজারের দিকে যেতে শুরু করে। একটুপর ওরা তৎপর হয়। গফুর বলে, হেডমাস্টার কি পাগল নাকি? ধ্যাৎ পাগল ক্যান হবি? জামাল প্রতিবাদ

BanglaBook.org

করে, মেলা গভীর কথা ক্যল, হামরা বুঝব্যার পারিনি। মুজিবর মাথা নাড়ে, তা ঠিক। মানুষটার মতো মানুষ হয় না। নসরুল্লাহ পেছন ফিরে তাকায় না। ওর চিন্তায় ফকির আলী পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

দু'দিন পর ভোরবেলা ওর কাছে খবরটা আসে। হেমায়েত খবরটা নিয়ে আসে এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, মাস্টার সাব ফকির আলী তেঁতুল গাছে ঝুলিছে।

প্রথম ধাক্কায় নসরুল্লাহ কথাটা বুঝতে পারেনি। চোখ গোল করে বলে, কী বললে?

ফকির আলী তেঁতুল গাছে ফাঁস দিয়েছে।

নসরুল্লাহ বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর বিড়বিড় করে, দার্শনিক ফকির আলী? তেভাগার দাবিতে গাঁয়ে মিছিল করতো, সবার আগে থাকতো। বড় দ্রুত পরাজয় মেনে নিলো ফকির আলী।

মাস্টার সাব যাবেন না?

যাবো। লাশ নামিয়েছো?

না।

পুলিশে খবর দাওনি?

লোক গেছে খবর দিতে।

তুমি যাও, আমি আসছি।

হেমায়েত যেতে শুরু করলে ও বলে, দাঁড়াও আমি আসছি। নসরুল্লাহ হাঁটতে শুরু করে। হঠাৎ ওর মনে হয় ঝুলন্ত ফকির আলীকে ও দেখবে। তেঁতুলগাছের কাকগুলো কি আছে না সব উড়ে গেছে?

পুলিশ আসা পর্যন্ত বসে থাকে নসরুল্লাহ। যারা জড়ো হয়েছে তাদের চোখ বিস্ফারিত, দৃষ্টিতে আতঙ্ক, মুখ শুকনো, কারো মুখে কথা নেই। কাছেধারে কোনো বৌ-ঝি নেই। নিস্তব্ধ দমধরা পরিবেশ। ওর জন্য কেউ কোরান শরিফ পড়ছে না। নসরুল্লাহ জানে কোনো মৌলভী সাহেব ওর জানাজাও পড়বে না। দার্শনিক ফকির আলী একা একা চলে যাবার জন্য কী এমন মৃত্যু বরণ করেছে? এমন স্বেচ্ছামৃত্যু, নিজের হাতে সব বাঁধন কেটে দেয়া? সমাজের কাছ থেকে সব বাঁধন কেটে দিয়ে, নিজের গলায় সে বাঁধন দৃঢ় করছে। ও সম্পূর্ণ নগ্ন, ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, জিহ্বা ঝুলে গেছে– ও ভেংচি কেটে ভয় দেখাচ্ছে। কাকে? নসরুল্লাহর কণ্ঠ ফুঁড়ে শব্দ বেরিয়ে আসে, কাকে? বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সে শব্দ। ফকির আলীর বয়সীরা নসরুল্লাহকে ঘিরে ধরে বসে আছে– ওরা নসরুল্লাহর ঠোঁট নড়া দেখে এবং শব্দটি শুনতে পায়। একজন নসরুল্লাহকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, ও এমন ন্যাংটো হয়ে মরলো কেন মাস্টার সাব? ও তো পাগল ছিলো না?

বুঝিসনি? শোন, ও ভেংচি কেটেছে। যারা ওর রক্ত-মাংস চুষে খেয়েছে তাদেরকে ভেংচি।

আমরা এর শোধ নেবো।

নসরুল্লাহ বিড়বিড়িয়ে বলে, শোধ তো নিতেই হবে। তোরা নিবি, তোদের ছেলেমেয়েরা নেবে, নাতি-নাতনিরা নেবে।

তখন ভিড়ে একটা শোরগাল পড়ে, পুলিশ আসছে। পুলিশের সঙ্গে ওসমান গনিও আসে ফকির আলীর বাড়িতে। ওর মৃতদেহ দেখে মাথা ঘুরে ওঠে ওসমান গনির। এমন মৃত্যু তো ও দেখেনি। এমন মৃত্যু কী করে হলো এ গাঁয়ে? পুলিশ লোকজনের সহায়তায় ওর লাশ নামায়। বারান্দায় এনে রাখা হয় সে লাশ– ফকির আলীর সমবয়সীরা ঘর থেকে একটা ছেঁড়া চাদর এনে ঢেকে দেয় ওকে। তখন একজন আর একজনকে বলে, ঢাকলো

BanglaBook.org

কেন? ওকি কাপড়ের যোগ্য? তখন ওসমান গনি ওদেরকে বলে, ছেলেটা খুব বোকা আর সরল ছিলো রে। নসরুল্লাহ খোঁচা দেয়, সেজন্য এমন বোকার মতো মরে গেলো। ওসমান গনি ধরতে পারে কথার ঢং, কিন্তু কিছু বলে না– এত লোকের সামনে কিছু বলতে চায় না, তাহলে ওদের খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা হবে। যারা এখানে উপস্থিত তাদের মনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া কাজ করছে– কেন ফকির মরবে সে চিন্তাও অনেকে করছে। ওসমান গনি বারবারই নসরুল্লাহর মুখের দিকে তাকায়– এই লোকটিকে ভয়, আবার মৃত্যুর কী ব্যাখ্যা দেবে কে জানে? খুব সূক্ষ্মভাবে এ গাঁয়ের মানুষগুলোর মাথা ও সক্রিয় করে দিচ্ছে, যে মাথা ভোঁতা এবং বোধশূন্য থাকে সবসময়ে– যে মাথায় কোদাল ফেলতে কোনো অসুবিধা হয় না জোতদারদের। ওসমান গনি ভেবে দেখলো লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গেলে নানা ধরনের হাঙ্গামা হবে, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করাই ভালো। ও পুলিশকে টাকা-পয়সা দিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করে এবং ফকির আলীর সমবয়সীদের লাশ দাফনের দায়িত্ব দিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলে যায়। যাবার আগে নসরুল্লাহকে বলে, আপনি যাবেন না নসু ভাই!

গোরটা দেখেই যাই।

সময় লাগবে তো?

কতক্ষণ আর? আজ তো স্কুল ছুটি।

বলেই নসরুল্লাহ অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। ওসমান গনি বুঝে যায়, সুতরাং ওকে আর না ঘাঁটানোই উচিত। ওরা মেঠো পথে নেমে যায়, গাছগাছালির আড়ালে ওদেরকে আর দেখা যায় না।

ফকির আলীর সমবয়সীরা চাঁদা তুলে কাফনের কাপড় কিনে আনে। বরই পাতা দিয়ে পানি সেদ্ধ করে, লোবান জ্বালিয়ে দেয় ওর শিয়রে। ঘরের পাশেই ওর কবর খোঁড়া হয়। জানাজা পড়ার জন্য মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাকতে যায় কেউ। এতকিছু করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলেছে। ওরা অপেক্ষা করে, জানাজা হলে ও গোরে যেতে পারে। তখন মৌলভী সাহেবকে ডাকতে গিয়েছিলো যারা, তারা ফেরত আসে। বলে, মৌলভী সাহেব আসবে না। বলেছে, আত্মহত্যা করে মরলে সে লাশের জানাজা হয় না।

নসরুল্লাহ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কে বলেছে জানাজা হবে না? হতে হবে।

তরুণরা সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, হতে হবে।

দু' একজন বয়স্ক মিনমিনিয়ে বলে, কথাটা ঠিক। এমন লাশের জানাজা হয় না।

পড়লেই হয়। আসেন আমরা পড়বো। অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছি, আর থাকবো না।

নসরুল্লাহ দাঁড়িয়ে পড়ে।

আপনারা সবাই দাঁড়ান। জানাজা আমিই পড়াবো।

তরুণরা লাশ এনে সামনে রাখে এবং সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। যে বয়স্ক দু'জন মিনমিন করছিলো তারাও দ্বিধা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নসরুল্লাহ সুললিত কণ্ঠে সুরা পড়তে শুরু করে, সেই আবেগময় কণ্ঠে ফকির আলীর বাড়িটা একটি মৃতের বাড়ির মর্যাদা পেয়ে যায়। ভাব-গম্ভীর পরিবেশ থমথম করে। আশেপাশের বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা পেছনে এসে দাঁড়ায়, ওদের চোখ ছলছল করে, ওরাও মনে মনে দোয়া পড়ে, আল্লাহর কাছে ফকির আলীর জন্য প্রার্থনা করে। একখণ্ড মেঘে সূর্য আড়াল হয়ে গেলে ম্লান ছায়া বাড়ির ওপর নেমে আসে। ঘরের চালে বসে থাকা কাকটি কণ্ঠ খোলে না। শুধু নসরুল্লাহর প্রার্থনার

BanglaBook.org

কণ্ঠ গমগম করে, ও আল্লাহর কাছে ফকির আলীর আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করে। একটানা, অবিরল কণ্ঠস্বর মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলে জানাজায় দাঁড়ানো মানুষেরা কেঁদে ফেলে। কেউ কেউ ফোঁপাতে থাকে, ফোঁপানোর শব্দ বিস্তৃত হয় বাড়িটার ওপরে– ভাঙা চাল, ফুটো বেড়া এবং ইঁদুরের মাটি তুলে রাখা ভিটে পেরিয়ে শোকার্ত মানুষের হৃদয় ছুটে যায় দিগন্তজোড়া মাঠের ওপর দিয়ে। কতক্ষণ কেটে যায় ওরা কেউ জানে না, মুহূর্ত না অনন্তকাল ওরা কেউ বুঝতে পারে না, শুধু সচকিত হয়ে শোনে বদলে গেছে নসরুল্লাহর কণ্ঠ, বদলে গেছে নসরুল্লাহর ভাষা। বলছে, হে আল্লাহ, হে মাবুদ তুমি এর বিচার করো। হে আল্লাহ ন্যাংটো হয়ে, চোখ উল্টিয়ে জিহ্বা ঝুলিয়ে কাকে ভেংচি কাটে ফকির আলী? ও যাদের ভেংচি কেটেছে সেইসব দুশমনদের তুমি খতম করার শক্তি দাও আল্লাহ। শক্তি দাও আল্লাহ বলে জামাতে একটা বিশাল গুঞ্জন ওঠে। সে শব্দে কেঁপে ওঠে বৌ-ঝিয়েরা। জোড়া জোড়া হাত উঠে থাকে আকাশের দিকে।

জানাজা শেষে ফকির আলীর মুখ খুলে দেওয়া হয় শেষ দেখার জন্য। লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে মুখের ওপর। ওরা আরো গভীরভাবে ভেংচিটা দেখতে চায়। নসরুল্লাহ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষগুলোর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দেখতে পায় ও প্রবল আলোড়ন, মানুষগুলো ছটফট করছে– আজ রাতে কেউ ঘুমুতে পারবে না। ওদের উঠোনে জ্যোৎস্না ভাসবে, গাছ হাওয়া দেবে, শামকুকড়া ডাকবে ঘরের চালে, ওরা দগ্ধ কলজে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকবে। ওদের বৌরা বলবে, চলো ঘুমুতে যাই। ওরা হাত ছাড়িয়ে নেবে। বলবে, বিছানা আমাদের জন্য না।

মাস্টার সাব?

একজনের ডাকে চমক ভাঙে নসরুল্লাহর।

কী বলবি?

এখন গোরে নামাই?

নামা।

ফকির আলী মাটির নিচে ঘুমুতে যায়। ওর বউ ছিলো না। কোনোদিন কেউ ওকে ঘুমুতে ডাকেনি। ও কারো হাত ছাড়িয়ে দেয়নি। ওর কোনো বিছানা ছিলো না। আজ ফকির আলীর বড় সুখ, ও বিছানা পেয়েছে।

হেমায়েতের হাতে ফকির আলীর কুলখানির জন্য কিছু টাকা দেয় নসরুল্লাহ। তারপর নিঃশব্দে নেমে আসে পথে। ফকির আলীর জন্য মনে মনে দরুদ শরীফ পড়ে। তখন বিকেল শেষ, নসরুল্লাহ কিছুটা ক্লান্ত, তবু তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে চায়। হৃদয় বড় চঞ্চল। কিছুতেই বুঝতে পারে না মৃত্যুর পরও কেন ও যোগ্য সমাদরটুকু পাবে না? জীবনের যন্ত্রণা জুড়িয়ে ফেলা কি অপরাধ? যারা জানাজা পড়তে অস্বীকার করে তারা তো জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে না। ফাঁকা রাস্তায় ও প্রাণভরে দরুদ শরিফ পড়তে পড়তে কণ্ঠ খুলে দেয়, জোরে জোরে আওড়ায়। এতদিনের শেখা সবকিছু তোলপাড় করে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে। ওর কোনোদিকে খেয়াল থাকে না, ফকির আলীর জন্য প্রার্থনায় ও নিজেকে মগ্ন করে রাখে। আলপথ ছেড়ে ও রাস্তায় ওঠে, সামনে বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দুজন লোক এসে ওর পথ আগলে দাঁড়ায়, দাঁড়াও মাস্টার সাব।

কে তোমরা?

বড়ো বাড় বেড়েছে তোমার।

কী চাও তোমরা?

তোমার রক্ত। বদমাশ একটা।

BanglaBook.org

ধমাধম ঘুষি পড়ে নসরুল্লাহর ঘাড়ে, মাথায়, চোয়ালে। ও হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে। তবু চেঁচিয়ে বলে, সাহস থাকলে বলো কে তোমাদের পাঠিয়েছে?

পাঠিয়েছে তোমার যম।

ততক্ষণে নসরুল্লাহ চোখে অন্ধকার দেখছে। ও পড়ে যায়। শেষ দু'টো লাথি দিয়ে ছেলে দু'জন চলে যায়। নসরুল্লাহ জ্ঞান হারায়নি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, ও হাত দিয়ে সে রক্ত মোছে– তারপর উঠে বসে। আশেপাশে কেউ নেই, বাঁশঝাড়ের ভেতর বলে অন্ধকার হয়ে গেছে। ও নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে, মুখে যন্ত্রণার কোনো ধ্বনি নেই, প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে প্রত্যাঘাত আসবে। ও নিজে আঘাত করছে সামনাসামনি, মুখোমুখি– ওরা করছে লুকিয়ে। ভালো, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। জানাজা পড়ার খেসারত তো ওকে দিতেই হবে, তার জন্য ওর কোনো দুঃখ নেই, মানসিক দিক থেকে ও প্রস্তুত। যেমন নিঃশব্দে ছেলেগুলো মেরে গেলো, ও নিজেও তেমন নিঃশব্দে ব্যাপারটি হজম করবে। ওকে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। হাঁটতে কষ্ট হলেও ঘরে না ফিরে নসরুল্লাহ সোজা বাজারের ডাক্তারের কাছে আসে। ডাক্তারের সঙ্গে ওর বেশ হৃদ্যতা আছে। ডাক্তার ওকে দেখে চমকে ওঠে, কী করে হলো?

আঘাত পেয়েছি।

আর কোনো কথা নেই। ডাক্তার একটুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর আয়োডিনের শিশি বের করে লাগায়, কাটা জায়গা জ্বলতে থাকে, নসরুল্লাহ ঠোঁট কামড়ে সহ্য করে।

ডাক্তার আবার বলে, আঘাতের পরিমাণ বেশি মনে হচ্ছে। চোয়ালের কাছটা কালো হয়ে উঠেছে।

এমন কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। তেমন কিছু হলে শরীরে টের পেতাম।

ডাক্তার বুঝলো নসরুল্লাহ বলবে না কী হয়েছে। সুতরাং আর কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। এজন্যই ডাক্তারকে নসরুল্লাহর পছন্দ। কারো ব্যাপারে অকারণে নাক গলায় না। যতই ও মুখে বলুক না কেন যে তেমন কিছু নয়, কিন্তু বুঝতে পারছে যে শরীরের ব্যথা বাড়ছে, হয়তো জ্বরও আসতে পারে। ডাক্তার কয়েকটা ট্যাবলেট এগিয়ে দেয়। বলে, শরীরে ব্যথা হলে খাবেন। আর যদি জ্বর আসে তাহলে এটা খাবেন।

নসরুল্লাহ মৃদু হেসে ট্যাবলেটগুলো নেয়। তারপর দাম চুকিয়ে দেয়। যেতে যেতে বলে, মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে ডাক্তার, হাসে নসরুল্লাহও, লুকোচুরিটা ডাক্তার ভালোই বুঝতে পারে, বলার কিছু নেই।

কদিন জ্বর এবং গায়ের ব্যথা নিয়ে বিছানায় থাকতে হলো নসরুল্লাহকে। তরীকুল বারবার জিজ্ঞেস করেছে, বাবা একবার বলো কে এমন করেছে? নসরুল্লাহর এককথা, চিনি না। তরীকুল ধরে নেয় যে বাবা চেনে কিন্তু বলছে না। অসুস্থতার খবর পেয়ে রাজশাহী থেকে মফিজুল আসে। অদৃশ্য শত্রুকে নিয়ে চেঁচামেচি করে, সামনে পেলে ছিঁড়ে ফেলবে এমন ঘোষণাও দেয়, কিন্তু নসরুল্লাহ নির্বিকার, মুখে একটিও কথা নেই। হাসনা বেগম দু'দিন কেঁদেকেটে চুপ করে গেছে। এমন একরোখা লোকের সঙ্গে ঘর করা যে কী যন্ত্রণার সেকথা বারবার বলে। বার্লিতে লেবু চিপে দিয়ে আঁচলে চোখ মোছে। নসরুল্লাহ দুর্বল কণ্ঠে বলে, আমার কী হয়েছে যে তোমরা এমন করছো? মানুষের অসুখ করে না?

মফিজুল শুকনো গলায় বলে, তোমার অসুখ করেনি বাবা।

নসরুল্লাহ মুখ ফিরিয়ে রাখে। ছেলেদের সামনে সত্য বলতে পারে না, মিথ্যে তো নয়ই। ফলে চুপ করে থাকা শ্রেয়।

BanglaBook.org

কদিন পর মফিজুলকে ট্রেনে তুলে দিয়ে স্টেশনের বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে নসরুল্লাহ। মনে হয় কদিন ওয়ে থাকার ফলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। খানিকটা ওজন কমে যাওয়াতে হালকাও লাগে নিজেকে। স্টেশন ফাঁকা, যাত্রীরা নেই, একটা মালগাড়িতে মাল বোঝাই করছে কুলিরা। নসরুল্লাহর বসে থাকতে ভালোলাগে। স্টেশন ওকে সবসময়ে আকৃষ্ট করে– এখানকার ছুটোছুটি, কোলাহল, হৈ-চৈ, চেঁচামেচি ওর অন্যরকম লাগে। যেটা ঠিক উপভোগের নয়, বোধের ব্যাপার– যে বোধ এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ওর মনে হয় মানুষ বড় বেশি বোধহীনভাবে বাস করে। কেউ যদি কিছুটা ভিন্নধর্মী চিন্তা করে, তবে সেটা আক্রোশের ব্যাপার হয়, অন্যের মনে ঘা লাগে। এই ঘা লাগাটা যদি রোধ করা যায় তবে চৈতন্যের গিঁটগুলো দ্রুত খুলবে। কিন্তু কি করে ঘা লাগা রোধ করা যাবে? স্বার্থের ঘা যে বড় বেশি ভয়ানক। ও উঠে পায়চারি করে, প্লাটফরমের এমাথা থেকে ওমাথা। কুলিরা মাল টানতে টানতে হাঁফিয়ে উঠেছে। ওদের গায়ে লাল ফতুয়া, পরনে হাফপ্যান্ট। একজন পাঞ্জাবি সুবেদার হান্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মালের তদারকি করছে। ওর গোরা চেহারায় প্রভুত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে নসরুল্লাহ চমকিত হয়, মনে হয় মুখটা ওর পরিচিত নয়, অনেক দূরের কেউ, ভিন্ন গ্রহের মানুষ। লোকটা কখনো প্লাটফরমের ওপর উঠে আসে, কখনো রেললাইনের ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। ও অস্থির, যেন কাজের তাড়া আছে, ওর পক্ষে ধৈর্য রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ও দু'একবার নসরুল্লাহকে দেখে, কিন্তু কিছু বলে না।

মালের বস্তা নিয়ে দ্রুত যাবার সময়ে আকস্মিকভাবেই নুড়িতে পা পিছলে পড়ে যায় একজন মধ্যবয়সী কুলি– ছিটকে পড়ে পিছলে পড়ে মাথার বস্তা। বস্তার মধ্যে কী আছে ওরা জানে না, কিন্তু রাগে বেঁহুশ হয়ে ছুটে আসে পাঞ্জাবি সুবেদার, শালা, বানচোত বলে ধমাধম কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়। বাবাগো, মাগো বলে চেঁচিয়ে ওঠে মধ্যবয়সী লোকটা। নসরুল্লাহ ছুটে যায়, অন্য কুলিরাও দৌড়ে আসে।

কোথায় ব্যথা পেয়েছেন?

কোমরে।

লোকটি ওঠার চেষ্টা করে ধুপ করে পড়ে যায়।

ঐ বেটা আমার কোমরটা ভেঙেই দিয়েছে।

তখন সুবেদার চেঁচিয়ে বলে, শালা কালা আদমি, কুত্তার বাচ্চা।

খামোশ!

চেঁচিয়ে ওঠে নসরুল্লাহ।

আর একটা কথা বলবি তো টুটি ছিঁড়ে ফেলবো।

সুবেদার এই প্রতিবাদে থতোমতো খেয়ে যায়।

মাস্টার সাব এই বেডা আমাদের মানুষ মনে করে না। সবসময় কুত্তার বাচ্চা বলে।

তোরা ঘাড়ের ওপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে পারিসনি।

দেবো আজ, বলেই কয়েকজন সুবেদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উত্তম মধ্যম বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়– ওর হাত থেকে হান্টার ছিনিয়ে নেয়। এই সম্মিলিত আক্রমণের মুখে সুবেদার কিছু বলে না, কিন্তু তীব্র চোখে নসরুল্লাহর দিকে তাকায়। বুঝে যায় যে একজন মানুষ সাহস দিলে অন্যরা শক্তি পেয়ে যায়। এতদিন তো কুলিদের মুখে রা ছিলো না। এই মানুষটি ওদের নষ্ট করেছে। সুবেদার প্লাটফরমের বেঞ্চের ওপর বসে রুমাল বের করে কেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত মোছে। পায়ের ওপর পা, ভঙ্গিটা এমন যেন কিছু হয়নি। মধ্যবয়সীকে সবাই মিলে ধরে প্লাটফরমের ওপর নিয়ে আসে, ওর আর কাজ করার সাধ্য নেই। নসরুল্লাহ বাকিদের কাজে যেতে বলে।

BanglaBook.org

তোরা তোদের কাজ কর। দেখি বেটা মজুরি দেয় কি না। আমি রইলাম এখানে।

নসরুল্লাহ ধীরে ধীরে মধ্যবয়সীর কোমর মালিশ করে দেয়। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ফলে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উল্টে গেছে। সে জায়গা থেকেও রক্ত পড়ছে। নসরুল্লাহ নুড়ি দিয়ে দুর্বাঘাস ছেঁচে লাগিয়ে দেয়। মধ্যবয়সী একটা বিড়ি ধরায়। নসরুল্লাহ রেললাইনের ওপর এসে দাঁড়ায়, চুপচাপ পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে ও সুবেদারকে দেখে, লোকটার দৃষ্টিতে এখনো তীব্র চাউনি। নসরুল্লাহ বোঝে যে সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ও চুপ করে গেছে, কিন্তু ও সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেবে, কিছুতেই ছাড়বে না।

পরদিন কালো খালাকে নিয়ে নাচোল স্টেশনে এসে নামে আলী আহমদ, সঙ্গে ফজলে গাজী। কালো খালা এখন একদম সুস্থ, স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে। ফজলে গাজী বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে তুলে নিয়েছে, হেঁটেই স্টেশন থেকে রওনা হয় ওরা।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যায় না, গাছগাছালির ঘন ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। নসরুল্লাহর যেখানে গোয়াল, তার থেকে খানিকটা দূরে কালো খালা থাকে। একটাই ঘর– বারান্দায় রান্নাবান্না হয়– শুকনোর সময়ে তোলা উনুনে রান্নাঘর উঠোনে নেমে যায়। শীত-গ্রীষ্মে ফজলে গাজী বারান্দাতেই ঘুমোয়। গ্রীষ্মে নাচোলের মাঠ-ঘাট পুড়লেও এ বাড়ির স্নিগ্ধতা ফুরোয় না– গাছের সঙ্গে মানুষের এক নিবিড় সম্পর্ক।

কালো খালা অনেকখানি জায়গা নিয়ে হাঁসমুরগির খোয়াড় করেছে, বেশ ডিম হয়– সংসারের বড় একটা খরচ এখান থেকে মেটে। তাছাড়া সারা বছর মুড়ি ভাজার কাজ করে। গাঁয়ের কয়েকজন বাঁধা দোকানদার আছে, ওরা নিয়মিত মুড়ি কেনে। ফজলে গাজী ক্ষেতমজুর। এইসব করে যা পায় তা দিয়ে মা-ছেলের দিন খারাপ কাটে না। ওদের সুখীই বলতে হবে। বাড়িটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আলী আহমদ। ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ওটাকে পরিষ্কার দেখা যায় না। সরু এক চিলতে পথ লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়েছে, যেন এই জঙ্গলের মাথার সিঁথি। আলী আহমদ নড়তে পারে না, মনে হয় পড়লে নষ্ট হবে ঘাসের রঙ, সজীবতা, ঔজ্বল্য– ও তো এখানে এক আগন্তুক। কালো খালা খানিকটা সামনে এগিয়ে পেছন ফিরে তাকায়, কী হলো দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আমি আসছি। আপনি যান।

কালো খালা হেসে ফেলে, জঙ্গল দেখে ভয় পাচ্ছো? আমরা কিন্তু জঙ্গলে ভালোই আছি। বাঘ-ভালুক হতে পারিনি, শেয়াল হয়েছি।

কালো খালা হাসতে হাসতে সামনে এগোয়। আলী আহমদের মনে হয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক না থাকলে মানুষ হয়তো পাগল হয়ে যেতো, নয়তো মানুষের বেঁচে থাকার অনেক দিক অসম্পূর্ণ থাকতো। ও ধীরেসুস্থে ঘাস ছুঁয়ে, পাতা ছুঁয়ে, লতা ছুঁয়ে, ঝরা পাতা মাড়িয়ে বাড়িতে এসে দাঁড়ালে একঝাঁক রাজহাঁস কলকল করে ওঠে। সেই শুভ্রতার দিকে তাকিয়ে আলী আহমদ অভিভূত হয়ে যায়, নড়তে পারে না। বারান্দা থেকে নসরুল্লাহ নামতে নামতে বলে, কী ব্যাপার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

অপূর্ব! আপনারা কী চমৎকার আছেন!

হা-হা করে হেসে ওঠে নসরুল্লাহ। বলে, এইটুকুই সব নয় আহমদ। প্রকৃতি দিলেই পেট ভরে না। মানুষ তা খামচে ধরে। সেজন্যই তো এই অঞ্চলে তেভাগা আবার জোরদার হয়ে উঠেছে। আরো কত কথা আছে, সব বলবো তোমাকে।

BanglaBook.org

হাসনা বেগম তেড়ে ওঠে, আসতে না আসতে কী শুরু করলে। আগে ও একটু বিশ্রাম নিক।

এইটুকু তো পথ এসেছি। আমি কিন্তু একটুও টায়ার্ড না।

আমিও তো তাই বলি। ওরা ইয়াং এনার্জেটিক। ওদের আবার বিশ্রাম কী। ঠিক আছে কিছু খেয়ে নাও। তারপর দু'ভায়ে বেরোবো। গোটা এলাকা ঘুরিয়ে দেখাবো তোমাকে। সবচেয়ে মজা কি জানো, পাঞ্জাব থেকে লোক এসে আমাদের গালাগাল করে। বলে, কালা আদমি। বলে, কুত্তার বাচ্চা।

অবাক হচ্ছেন কেন নসু ভাই। এ তো সেই ক্ষমতার লড়াইয়ের খেলা। যে জন্য আমাকে আপনাকে পালাতে হয়। পাঞ্জাবিরা ক্ষমতায়। ওরা আমাদের ছাড়বে কেন?

কথা বলতে বলতে দু'জনে বারান্দায় আসে। হাসনা বেগম নারকেল দিয়ে মুড়ি মাখিয়েছে, রাজহাঁসের ডিম ভেজেছে। সবাই খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর গোল হয়ে বসে। খেতে খেতে গল্প হয়, হাসিঠাট্টা হয়, ফজলে গাজীর জন্য বৌ দেখার প্রস্তাব ওঠে, ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মফিজুলকে পড়ার জন্য ঢাকায় পাঠানো হবে, তরীকুল রাজশাহীতে আসবে এইসব স্বপ্ন দেখা হয়। সবকিছু মিলিয়ে অনেকদিন পর এ বাড়িতে প্রাণের জোয়ার বয়।

হাসনা বেগম বলে, হামিদা বু অসুস্থ হওয়ার পর থেকে মনটা খুব খারাপ ছিলো। কিছুই ভালোলাগতো না। আজ আমার মনে বল ফিরে এসেছে।

নসরুল্লাহ বলে, হামিদা বু শুধু কি সুস্থ হয়েছে? চেহারাও অনেক উজ্জ্বল হয়েছে।

আহমদ আমার খুব যত্ন করেছে। ও না হলে এবার আমি বাঁচতাম না।

কালো খালা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

নসরুল্লাহ হৈ-হৈ করে ওঠে, দেখো দেখি আবার কী হলো? এবার তো ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে সংসার করবেন।

আলী আহমদ তর্জনি উঁচিয়ে শাসায়, আর কোনো কান্না নয় কালো খালা।

কালো খালা হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু হাসি আসে না। হাসতে গেলে মুখ বেঁকে যায়। সে হাসি দেখলে মন খারাপ হয়।

নসরুল্লাহর সঙ্গে গাঁয়ে ঘুরে আলী আহমদের মনের যেটুকু বন্ধ দরজা ছিলো সেটুকুও খুলে যায়। দু'জনে একদিন রামচন্দ্রপুর হাটে গিয়ে রমেন আর ইলার সঙ্গে দেখা করে। সাঁওতাল নেতা মাতলা সর্দারের সঙ্গে পরিচিত হয়। বোঝে সেই রংপুর-দিনাজপুরের মতোই তেভাগার আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। চাষীদের এক কথা তেভাগা চাই। এখানে দু'দিন থাকতে এসে আলী আহমদের দশদিন থাকা হয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাতে উঠানে বসে নসরুল্লাহর নিজের কথা শুনতে শুনতে আলী আহমদ ওর হাত চেপে ধরে বলে, নসু ভাই এই জঙ্গলে থেকে আপনি দেখছি একটা বাঘ হয়ে গেলেন।

নসরুল্লাহ হা-হা করে হাসে। তখন ফজলে গাজী গুটিসুটি কাছে এসে বসে। বলে, তেভাগার জন্য যে সভা হলো আজ, আমিও সেই সভায় গিয়েছিলাম।

কী হলো সেই সভায়?

ঠিক হলো, দরকার হলে আমরা সবাই তেভাগা আদায়ের জন্য জীবন দেবো।

তুই কী বললি?

আমিও লড়াই করবো।

যদি তোকে পুলিশ মেরে ফেলে?

মারবে।

BanglaBook.org

ভয় নেই?

একটুও না। রানীমা বলেছে, নিজেদের দাবি নিজেদের আদায় করতে হয়। তখন ফজলে গাজী নসরুল্লাহর পায়ে হাত দিয়ে বলে, চাচা, আমার যদি কিছু হয় মাকে দেখবেন।

চুপ, পাগল। তোর মা এসব কথা শুনবে। যা, শুতে যা।

কী জ্যোৎস্না! আর একটু বসি।

অকস্মাৎ চারদিক সুনসান হয়ে যায়। হাসনা বেগম ঘুমিয়ে পড়েছে, কালো খালাও। তরীকুল বারান্দার চাটাইয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হয়তো ঘুমোয়নি।

তখন আলী আহমদের কণ্ঠ খুব ধীর লয়ে উঠতে থাকে, মনে আছে নসু ভাই দিনাজপুরের খাঁপুরে যখন জোতদার-পুলিশ আর কৃষকদের সংগ্রাম চলছিলো তখন আমি খাঁপুরে ফুপুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। ফুপা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। ভুলতে পারি না সেই দিনগুলোর কথা। প্রতিদিন আমি বালুরঘাট হাসপাতালে আহতদের দেখতে যেতাম। ওহ্ কী করুণ অবস্থা। মানুষের সেই কাতরানি আমি এখনো কান পাতলে শুনতে পাই। কতজন আমারই চোখের সামনে মারা গেলো– দেখলাম ওদের ঠোঁট কাঁপছে, চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গলা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে, তারপর ফুস করে দম বেরিয়ে গেলো। সেইসব দিনগুলো আমার স্মৃতিতে বড় বেশি উজ্জ্বল। এমন একজন মৃত্যুপথ যাত্রীর শেষ অবস্থা বুঝতে পেরে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আমিও ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। ডাক্তার বন্ধু ওকে জিজ্ঞেস করলো, বলুন আপনার কী চাই? জানেন নসু ভাই, মৃত্যুপথযাত্রী সেই আঁধিয়ার কৃষক কী বললো? সে দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে তার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষার কথা বললো। বললো, আমি তেভাগা চাই।

খুব আবেগ দিয়ে ঘটনাটি বললো আলী আহমদ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সুনসান রাতে ঐ কণ্ঠের রেশ জেগে থাকলো। কেউ কোনো কথা বললো না। ক্ষেতমজুর ফজলে গাজীর বুক তোলপাড় করতে লাগলো। নসরুল্লাহ আর আলী আহমদ ঘুমুতে গেলো। ফজলে গাজী একা বসে রইলো। অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘুম এলো না। সারাদিনের ক্লান্ত শরীর আজ কিছুতেই বিছানায় যেতে চায় না।

BanglaBook.org

৪

প্রতীকের মুখে কথা ফুটেছে।

আধো আধো বোলে অনেক কথা বলে। নিজের কথা দিয়ে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মাকে পুপ্পি বলে, বাবাকে বাবু আর প্রদীপ্তকে দীপ। সবাই ওকে নিয়ে মজা করে, ওর কাছ থেকে নানা ধরনের কথা শোনার চেষ্টা করে– উচ্চারণ শোনা বেশি আনন্দের। প্রদীপ্ত ওকে পাখি দেখিয়ে বলবে, বলো ওটা কি?

ও বলবে, বলো ও তা কি?

ওটা পাখি।

ওতা পাথি।

পাখি শুনে প্রদীপ্ত হেসে গড়িয়ে পড়ে। এখন ও প্রতীকের শিক্ষক, ভাষা শেখায়। মাঝে মাঝে দু'চারটে ইংরেজি শব্দও শেখাতে চায়। আহমদ বাধা দেয়। বলে, উঁহু

ইংরেজি এখন নয়, পরে। আগে বাংলা।

কিন্তু বাবা, বাংলা শব্দ তো ও অনেক শিখেছে।

আলী আহমদ ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আরো শিখতে হবে, ভালো করে শিখতে হবে।

দেখছো না ও এখনো পাখিকে পাথি বলে, বেড়ালকে বলে কাল আর পানিকে আম।

কী যে মজা!

প্রদীপ্ত হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। পুষ্পিতা পাশে এসে বসে– দু'ছেলে ওর গর্ব, আনন্দ। প্রতীক ঝাঁপিয়ে ওর কোলে উঠে যায়। বলে, পুষ্পি আম দাও।

তুই কি আমার বাবা যে এমন করে ডাকিস? তুই আমার সোনার ছেলে, সাতরাজার ধন। তোকে আমি বাটি ভরা ভাত দেবো, কালো গরুর দুধ দেবো, ঘর আলো করা বউ দেবো।

পুষ্পিতা কলকলিয়ে হাসে– প্রতীক মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, প্রদীপ্ত হাততালি দেয়। এইসব দৃশ্য আলী আহমদের খুব ভালো লাগে। কলেজে যাওয়া-আসার রুটিনের মধ্যে এইসব ব্যতিক্রম মনকে থিতিয়ে রাখে। নইলে জীবনযাপন সহজ রাখা কঠিন। মেজাজ খারাপ করতে না চাইলেও মেজাজ খারাপ হয়। গণপরিষদের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করে। খবরটা এই মফস্বল শহরে পৌঁছুনোর পর মফিজুল চেঁচিয়ে বলেছিলো, এ কেমন দেশ আহমদ ভাই? এরা তো মানুষের অধিকার স্বীকার করে না?

আলী আহমদ জবাব দেয় না। চৈত্রের রোদে তেতে-পুড়ে ঘরে ফিরে বিষণ্ন হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এগারো মার্চ হরতাল ডাকে, দেশব্যাপী হরতাল। রাজশাহী কলেজের ছেলেরা গরম হয়ে উঠেছে। প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে, পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহরের বিভিন্ন এলাকা– ছাত্ররা ছোটো ছোটো ছাত্রসভায় বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি ব্যাখ্যা করতে থাকে। কেউ কেউ এসে আলী আহমদের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা আলো করে বুঝে যায়। ও ওদেরকে ভাষার ব্যাপারটি বোঝানোর পাশাপাশি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা পড়তে দেয়। এইসব লেখায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে যে কেন বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, না হলে বাঙালির কী ক্ষতি হবে ইত্যাদি। আলী আহমদের মনে হয় এ এক জাগরণের সময়, এখন না জাগলে ধ্বংস হয়ে যাবে একটি জাতি– তলিয়ে যাবে তার অস্তিত্ব। গতকাল এনামুল বলেছিলো, স্যার এইতো সেদিনের কথা, যেদিন অধ্যক্ষ ডক্টর মমতাজউদ্দিন আহমদ স্যার আমাদের ডেকে বললেন, সিলেটে যে গণভোট হবে তার জন্য তোমাদের সিলেট যাওয়া উচিত। প্রচার কাজ ভালোভাবে না হলে সিলেট যদি আমাদের না থাকে? আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র। আপনি তো জানেন সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট পাকিস্তানের জন্মের এক মাস আগে আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় গণভোট হয়েছিলো তারা পাকিস্তানে যোগদান করবে কি না এই প্রশ্নে। আমার সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষা ফেলে কী করে যাই এসব ভাবছিলাম। তখন মমতাজ স্যার বললেন, তোমার পরীক্ষার ব্যাপারে আমি রয়েছি, কিন্তু সিলেট ভারতে চলে গেলে সমূহ ক্ষতি, তুমি সিলেট যাও। সুলতান ভাইর নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন ছাত্র সিলেট গেলাম। কী তুমুল প্রচার কাজ, যেন জীবন দিতে এসেছি। সামান্য সময়ের ব্যবধানে এই দেশে যদি আমাদের ভাষার প্রশ্নে এমন ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি হয় তাহলে তা আমরা কিভাবে মানবো?

BanglaBook.org

আলী আহমদ ঠাণ্ডা গলায় বলে, মানবে কেন, রুখতে হবে।

একরামুল মাথা নাড়ে, নিশ্চয়ই রুখতে হবে।

হরতালের দিন কলেজের সামনে পিকেটিং হয়। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ক্লাস করতে আসে। ছেলেরা গেটের রাস্তায় শুয়ে পড়ে। কলেজে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। চারদিকে স্লোগান উঠেছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। রোদে পুড়ছে গাছ, কংক্রিট, পুড়ছে ছেলেদের শরীর। শুয়ে থেকে একরামুলের কানে মফিজুল ফিসফিসিয়ে বলে, দেখ, সুরাইয়াকে দেখে মনে হচ্ছে ও আমাদের ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকবে।

ঢুকুক না, তুলকালাম করে ছাড়বো।

ওকে বাধা দিলেই ওর জেদ বাড়ে। যুক্তিতে আসে না।

ও মেয়ে যে সংসারে যাবে জ্বালিয়ে খাবে।

মফিজুল কনুই দিয়ে একরামুলকে গুঁতো দেয়, তোর অত ভাবনা কী? ও তো তোর আর আমার সংসারে আসছে না।

বাবা, রক্ষা করো।

ঠিক তখনই সুরাইয়া ওদের ডিঙিয়ে কলেজে ঢোকে। পিকেটিংরত অন্য ছেলেরা হৈ-হৈ করে ওকে ঘিরে ধরে।

এতো বড়ো সাহস আপনার? ছেলেদের ডিঙিয়ে ঢুকেছেন?

কেন ঢুকবো না। আমি ক্লাস করবো। ক্লাস নষ্ট হোক আমি তা চাই না।

ইস, আমরা জীবন দেবো, আর উনি ক্লাস করবেন? ক্লাস করিয়ে ছাড়বো?

ছেলেটির কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সুরাইয়াকে আহত করে। ও ফুঁসে ওঠে, দেখুন, এভাবে কথা বলবেন না, ভালো করে কথা বলতে পারেন না?

একশো বার বলবো। আপনার সঙ্গে যে এতোক্ষণ কথা বলেছি এটাই খাতির করেছি। কলেজ থেকে বেরোন, বেরোন বলছি। নইলে চ্যাংদোলা করে ধরে ঐ সোনাদিঘিতে ডুবিয়ে আসবো।

সুরাইয়া ওদের মারমুখি আক্রমণে ভয় পেয়ে যায়, অপমানিতও হয়। গুটিসুটি পায়ে বেরিয়ে আসে, মাথা নিচু, কারো দিকে তাকাবার সাহস নেই। যেসব ছেলেমেয়েরা ক্লাস করতে এসেছিলো, কিন্তু এতোক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা ফিরে যায়। মিছিল করার প্রস্তুতি নেয়। স্লোগান ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ঃ বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'।

কয়েকবার স্লোগান দেওয়ার পর মফিজুল সবাইকে থামিয়ে দেয়, এই তোরা কী স্লোগান দিচ্ছিস? তোরা কী ভেবেচিন্তে বলছিস?

সুলতান বলে, হ্যাঁ, ভেবেচিন্তে বলছি।

তাহলে বুঝিস না কেন বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই বললে আমাদেরকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে পড়তে হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন নস্যাৎ হবে।

ঠিক, ঠিক। এখন শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বলবো আমরা।

স্লোগান দিতে দিতে শ'দেড়েক ছেলের মিছিল এগুতে থাকে। উস্কানিমূলক স্লোগান বর্জন করে, ঐ একটি স্লোগান সহকারে মাদ্রাসার কাছে এসে ডান দিকে মোড় নেয়, ফায়ার ব্রিগেডের কাছে এসে আবার সাহেববাজারের দিকে এগুতে থাকে। ফায়ার ব্রিগেডের কাছের মাঠটিতে ছিলো ছোট্ট জটলা। মিছিল তো শান্তিপূর্ণভাবে এগুচ্ছে। কিন্তু ঐ জটলার লোকজন মিছিল দেখেই খিস্তিখেউড় আউড়ে গালিগালাজ করতে করতে বাঁশ নিয়ে ছুটে এসে আক্রমণ করলো। ওরা বলতে লাগলো, এরা দেশের শত্রু, ভারতের চর, কম্যুনিস্ট, মার শালাদের।

BanglaBook.org

ওরা মুসলিম লীগের পোষা গুণ্ডা। ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পেটাতে লাগলো। আহত হলো অনেকে, ওদের রক্ত ঝরলো পথে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। যারা আহত হলো তাদেরকে অন্যরা টমটমে করে ডাক্তার ইসমাইলের চেম্বারে নিয়ে এলো চিকিৎসার জন্য। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। প্রত্যেককেই যত্ন নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার, যিনি এই ঘটনায় রুষ্ট এবং ক্ষিপ্ত। কাজ করছেন আর মুখে খিস্তি খেউড় আওড়াচ্ছেন। বলছেন, যারা এমন কাজ করতে পারে তারা কি মানুষের বাচ্চা, না শূকর ছানা? আমি ভাবতেই পারি না মানুষ এতো নির্মম হয় কী করে?

একজন রোগি পাশ থেকে বলে, এ আর কতটুকু করেছে? মানুষ তো মানুষের বুকে ছুরিও বসায়।

তুমি চুপ করো মোল্লা, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলবে না। এ আমার কাছে অনেক, আমার বুক ভেঙে গেছে। এরা হলো আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক। সব সোনার টুকরো ছেলে।

মোল্লা ডাক্তারের কথার তোড়ে চুপ মেরে গেলেও মিনমিনিয়ে বলে, আমিও তো এটাই বলতে চেয়েছি। গুণ্ডারা যে ছেলেদের বুকে ছুরি বসায়নি এটাই আমাদের ভাগ্য।

হ্যাঁ, তাই বলো। আমাদের ভাগ্য। ওদের রক্ত ঝরেছে, কিন্তু জীবন ঝরেনি। যাও বাবারা তোমরা গিয়ে বিশ্রাম নাও।

ওরা যেতে যেতে শুনতে পায় মোল্লা বলছে, ঝরেনি বলে যে ঝরবে না তা কে বলতে পারে? ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে, আহ্ মোল্লা তুমি চুপ করো। তুমি একটু বেশি কথা বলো।

ওরা টমটমে ওঠে। হোস্টেলে ফিরে আহত মফিজুল বেশ উৎফুল্লই থাকে। রহমানকে বলে, তোর রক্ত একটু বেশি ঝরছে, সে জন্য খারাপ লাগছে সত্যি, কিন্তু আগামী দিনের কথা ভেবে দেখলে আমরাই জিতেছি।

আমিও তাই মনে করি। মার খেলেও আমরাই জিতেছি। জনগণ আমাদের পক্ষে কথা বলছে। শহর থমথমে হয়ে গেছে।

অন্যরাও ওদের সমর্থন করে। একরামুল বলে, ঘটনাটা হয়তো ছোটো, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ব্যাপক।

প্রত্যেকে হৈ-চৈ করে ওঠে। মফিজুল চেঁচিয়ে মন্টুকে ডাকে, অ্যাই মন্টু আমাদের জন্য এক কেটলি গরম চা নিয়ে আয়।

সেদিন আর দুপুরে বাড়ি ফেরা হয় না আলী আহমদের। হোস্টেলে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে ও আলুপট্টি যাবার জন্য রিকসায় ওঠে। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়েছে, চা-সিঙ্গাড়া ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি, তবে তেমন খিদেও নেই। আজকের ঘটনায় ও অত্যন্ত মর্মাহত। এদিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু জামান অসুস্থ, একজন ছাত্রকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। আলী আহমদ এখন সেখানে যাচ্ছে। হাসিখুশি, প্রাণখোলা ছেলে জামান, চমৎকার পড়ায়, ওর বিষয় রসায়ন, তবু আলী আহমদের সঙ্গে প্রাণের টান, ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। কেমন করে কেমন করে যে হয়ে গেলো দুজনের কেউই টের পেলো না। আলী আহমদ ভেবেই পায় না ওর এমন কী অসুখ হলো যে জরুরি তলব পাঠিয়েছে? অবশ্য মাস দু'য়েক ধরে রাতে রাতে জ্বর হয় বলছিলো। তার জন্যে তো ওষুধ খাচ্ছিলো। জামান, নাহ্– আলী আহমদ খারাপ কিছু ভাবতে চায় না। পরক্ষণে ওর মনে হয় জামান হয়তো আজকের ঘটনা শোনার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। ওর স্ত্রী জুলেখা, প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। দুজনের ছোট্ট, সুন্দর, ছিমছাম সংসার– জুলেখা চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। ফুলগাছের টব যে সারাবাড়িকে এতো প্রাণবন্ত করে রাখতে

BanglaBook.org

পারে এ বাড়িটি না দেখলে আলী আহমদ তা ভাবতেই পারতো না। রিকসা এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। ছোট্ট লোহার গেট, খুললেই সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর সরু বারান্দা। মানিপ্লান্টের লতার সঙ্গে তরুলতা মিলিয়ে লাগানো হয়েছে, মাঝে মাঝে ছোটো লাল ফুল ফুটে থাকে চমৎকার। ঘন সবুজের মধ্যে লালের একটা অদ্ভুত নকশা। বারান্দায় উঠে কড়া নাড়ার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় ও। পাপোশে জুতো মুছে নেয়, হাত দিয়ে চুল ঠিক করে, ঠোঁট মোছে, ভাবে আরো হয়তো কিছু করার আছে কিন্তু ভেবে পায় না যে তা কী। মনে মনে ভাবে, জুলেখার সান্নিধ্য মানে কিছু বাড়তি পাওনা, রুচি এবং স্নিগ্ধতার। তার ওপর আছে কড়া লিকারের চা, সঙ্গে পাপর ভাজা কিংবা চিঁড়ে অথবা নারকেলের নাড়ু। জামানের হো-হো হাসি, অনর্গল কথা বলা, যুক্তি খণ্ডন, পরচর্চা, জুলেখার মৃদু ধমক, কখনো উচ্ছল হয়ে ওঠে, বাঁধভাঙা হাসির সঙ্গে খুলে-পড়া চুলের গোছা, ওহ্ কেমন অদ্ভুত স্বপ্নের জগৎ। আলী আহমদের শরীর শিরশির করে, কেমন করে যেন এই এক জায়গায় এসে সমস্ত ভালোলাগা থমকে গেছে, যে ভালোলাগাটুকু অন্য আর কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়, যেটুকু একদম একলা ওর– যেখানে অন্য কারো ভাগ নেই, হাত বাড়িয়ে দখল করে নেবার ব্যাপার নেই। ও দরজায় মৃদু কড়া নাড়ে। দরজা খুলে দেয় কাজের মেয়ে চম্পা। বৈঠকখানা ফাঁকা। বেতের চেয়ারের গদিগুলোয় জুলেখার সুচের কাজ উজ্জ্বল হয়ে আছে। অনেক দিনের দেখা, তবু নতুন। ফুলদানিতে আজ তাজা ফুল নেই, বাসি ফুলের দু'চারটে ঝরে পড়েছে টেবিলের ওপর। আলী আহমদ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। দেয়ালে সুতোর কাজ করা ল্যান্ডস্কেপ, দেখা জিনিসের দিকেই ও চোখ মেলে রাখে। ভেতরের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে জুলেখা ওকে ডাকে, আহমদ ভাই এ ঘরে আসুন।

জুলেখার চোখ ফোলা, চোখের নিচে কালি– রাত জেগেছে এবং কেঁদেছে। আলী আহমদের বুক ধক করে ওঠে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না। জামানের বিছানার পাশে চেয়ার ছিলো, বসতেই জামান দুর্বল কণ্ঠে বলে, চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে বোস।

কেন?

ও চেয়ারটাকে বিছানার আরো কাছে নেয়। বলে, জ্বর আছে? হাত বাড়িয়ে কপালের ওপর রাখে। না, তেমন জ্বর নেই, সামান্য। নিরানব্বই হবে, না ভাবী? কী হলো কথা বলছেন না যে? কী হয়েছে? দু'জনেই চুপ। বাড়িতে ঢোকার পরই বুঝতে পেরেছি যে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কি? না বললে কি করে বুঝবো সমস্যাটা কোথায়? আচ্ছা তো মুশকিল? এ ধাঁধা তো দেখছি ডিডেলাসের গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল। এই জামান কি হলো তোর?

আজ সকালে আমার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে।

রক্ত?

আলী আহমদ কিছুটা বিমূঢ় হয়ে বলে।

হ্যাঁ, রক্ত।

হঠাৎ আলী আহমদ নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে বলে, তাতে কি হয়েছে? মানুষের কি অসুখ হয় না? ভালো হয়ে যাবি।

এ ভালো হবার নয়। এ যে রাজরোগ।

ধুত বাজে কথা বলিস না তো। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

অন্য পাশে মোড়ার ওপর বসেছিলো জুলেখা। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে। এই নতুন পরিস্থিতি কিভাবে সামলাবে ও জানে না। রক্ত ওঠা কিভাবে বন্ধ করবে, কান্নাই বা কীভাবে থামবে? ও দু'জন মানুষকে সরে যেতে দেখে, ছায়া হতে দেখে– মনে হয়

BanglaBook.org

পদ্মার ধারে দেখা অসংখ্য ফড়িং ওরা– ওদের সামনে আকাশ এবং নদী একাকার হয়ে গেছে। ও জামানের ডান হাত তুলে নেয় নিজের হাতে, জামান ঘাবড়াস না। আমি তো আছি। যা করার আমি করবো। ভাবী আপনি এমন করে কাঁদলে আমার পথ কোথায়? এখন কি কান্নার সময়? থামুন। এসব ভালোলাগছে না। চা খাওয়ান।

জুলেখা উঠে রান্নাঘরে যায়। জামান নিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ভয় পেয়েছে। ভয়ে মুখ পাংশু, দৃষ্টি ঘোলাটে। ঠিকমতো কথাই বলতে পারছে না। উচ্ছল, উৎফুল্ল মানুষটি এক সকালেই নিভে ছাই। এই পরিবর্তন আলী আহমদকে খুব কষ্ট দেয়। ওর ইচ্ছে করে জামানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে– বুকে জড়িয়ে উত্তাপ দিলে ও হয়তো আবার আগের জামান হবে।

খালু চা।

চম্পা চা নিয়ে এসেছে, সঙ্গে বিস্কিট। জুলেখা আসেনি। হয়তো রান্নাঘরে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে– ভাবতেই আলী আহমদের চা বিস্বাদ লাগে। একটা বিস্কিটে কামড় দিয়ে সেটা রেখে দেয়, এক চুমুক চা খায়।

জানিস জামান শহরে আজ কী হয়েছে?

হ্যাঁ শুনেছি মুসলিম লীগের গুণ্ডারা ছেলেদের মাথা ফাটিয়েছে।

হ্যাঁ, আজ শহরে রক্ত ঝরেছে।

দারুণ খবর। জামানের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। একই ভঙ্গিতে ও বলে, স্বাধীন দেশের মানুষের এইসবই পাওনা ছিলো।

জুলেখা দ্রুতপায়ে কাছে আসে, তুমি কিন্তু উত্তেজিত হবে না। ডাক্তার বলেছে একদম রেস্ট।

ঠিক আছে তাহলে তোমরা কথা বলো, আমি শুনবো।

জুলেখা এবং আলী আহমদ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। জামান কথা না বললে আড্ডা জমে না। দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে যায়। জামানের চোখ বোজা, ডান হাত কপালের ওপর। আলী আহমদ আস্তে করে বলে, আজ তুই রেস্টে থাক জামান। আমি কাল আবার আসবো।

ও চোখ বন্ধ করে বলে, কালও তো তোরা আমাকে রেস্টে থাকতে বলবি। আমি কি আর আগের মতো চেঁচিয়ে কথা বলতে পারবো?

কেন পারবি না? কী যে বলিস না?

জামান ম্লান হাসে, কথা বলে না। আলী আহমদ নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। লতায় ঘেরা বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, এক পা বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর ইচ্ছে করে না। ও কী করে জামানকে রেখে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামবে– যে জামান লাল রক্তের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। জামান জানে যক্ষ্মা এক ভয়াবহ রোগ, জানে আলী আহমদ এবং জুলেখাও। সেরে ওঠাটা বড় বেশি অনিশ্চিত। ও দু'হাত রেলিঙের ওপর রেখে শরীরের ভার ছেড়ে দেয়, হলুদ আলো নেমে এসেছে রাস্তার ওপর– আর একটু পর গ্যাস বাতিগুলো জ্বলবে, কল্পনা সিনেমা হলে সন্ধ্যার শো শুরু হবে, ওর ঘরে ফিরতে হবে। পুষ্পিতা হয়তো এতক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতীক বলছে, পুষ্পি বাবু কৈ? বাবুকে আনো।

আলী আহমদ এক পা দুপা করে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামে, রাস্তায় প্রচুর ধুলো, অপরিসর কাঁচা রাস্তা– মানুষের পায়ে পায়ে সারাদিন ধুলো ওড়ে। আশেপাশে তেমন বাড়িঘর নেই, প্রায় ফাঁকা এলাকাই বলা যায়। আলী আহমদ রিক্সা নেয় না, ঠিক করে হেঁটেই যাবে। এখন ও কোনো গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় না– ও নিজের কাছে সময় চায়, অনেক সময়। বারবার জামানের মুখ ভেসে ওঠে, কখনো জুলেখার। হাঁটতে হাঁটতে

BanglaBook.org

অন্ধকার নেমে আসে, রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলে ওঠে। গলির মুখে আসতেই মতলুব মিয়ার সঙ্গে দেখা হয়, খালি গায়ে কাঠের আড়তের সামনে পায়চারি করছিলো। আলী আহমদকে দেখে এগিয়ে আসে, এই যে প্রফেসর সাহেব এখন ফিরলেন? আপনিও গিয়েছিলেন নাকি মিছিলে?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। এই লোকটির কণ্ঠে যে ব্যঙ্গ আছে ও তা ধরতে পারে। ওর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। লোকটি ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, প্রফেসর সাহেব ছাত্ররা আজ যা করলো তা কি আপনি সাপোর্ট করেন?

হ্যাঁ করি। কারণ ভাষার দাবি তো একটা ন্যায্য দাবি। মুখের ভাষা কেড়ে নিলে বাঙালির আর থাকে কী?

বাঙালি? বাঙালি আবার কী কথা? আমরা মুসলমান।

আলী আহমদ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা জাতিসত্তায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান।

শালা, বেশি বোঝে। মালাউনের দেশ থেকে এসে মালাউনই হয়ে আছে। ফের বাড়াবাড়ি করলে দেবো এক লাথথি দিয়ে সীমান্ত পার করে।

মতলুব আলীর ঘুষি খেয়ে চোয়াল কেটে যায় আলী আহমদের। ও হাত দিয়ে রক্ত মোছে। বুক মুচড়ে ওঠে, আবার রক্ত! ও মতলুব আলীকে কিছুই বলতে পারে না, ঘুষিটা হজম করে ফেলে। এতক্ষণে দোকানের অন্য লোকেরা মতলুব আলীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রফেসর সাহেব নাকি, কেমন আছেন? মিছিল করে ফিরলেন?

হো-হো করে হাসে ওরা। পুড়ে যায় আলী আহমদের বুক, পুড়তেই থাকে। ও ওদের দিকে তাকিয়ে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে ওর কিছু করা উচিত, ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, নয়তো একটা বিশাল ঘুষি ওদের প্রত্যেকের চোয়ালে– নয়তো, নয়তো কী?

কী অমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মনে হয় আরো কিছু চাচ্ছেন?

একজন আরো দু'পা সামনে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়। আলী আহমদের মনে হয় ওর নিজের ভেতরে যে রক্ত ফুটছে, তা ও দেখতে পাচ্ছে, এ রক্ত অন্য রক্ত– যা বশ মানে না, চুপ করে থাকে না– আধার গুঁড়িয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে যায় কিংবা ফিনকি দিয়ে ছিটকে বেরোয়। লোকটি ওর মুখের ওপর আঙুল নাড়ে, কী কথা বলছেন না যে?

অসহ্য, অসহনীয়। ধাম করে লোকটির চোয়ালে ঘুষি মারে আলী আহমদ। ছুটে আসে অন্যরা, ও এখন একগুঁয়ে ষাঁড়– ডানে-বামে, সামনে-পিছনে তাকাবার সময় নেই। শত্রু পরিবেষ্টিত আলী আহমদ– যেটুকু দিয়েছে, তার কয়েক গুণ খেয়েছে। আশেপাশে থেকে রাস্তার লোকজন জড়ো হয়ে গেলে ওকে ছেড়ে দেয় মতলুব আলীর সাঙ্গপাঙ্গরা। কিন্তু ওর মনে হয় এখন আর ওর বুক পুড়ছে না। শারীরিক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মনে কোনো দুঃখ নেই। আলী আহমদ খুব সচেতনভাবে নিজেকে সোজা রেখে ধীর পায়ে বাড়ি আসে। গেটে ধাক্কা দিতেই ছুটে আসে প্রদীপ্ত, বাবা এসেছো? আমি আর মা তোমার জন্য ভেবেই মরি।

পুষ্পিতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলে, কী হয়েছে?

আলী আহমদ ইশারায় ওকে কিছু বলতে নিষেধ করে। প্রদীপ্তর সামনে ও এই ঘটনা বলতে চায় না। প্রদীপ্ত বারান্দার চৌকির ওপর বসে আতা খাচ্ছিলো, প্রতীককেও দিচ্ছিলো, ও আবার সেই বাটি নিয়ে বসে পড়ে। দুভাই আতা নিয়ে মেতে ওঠে। আলী আহমদ কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে, মাথা যেন ঘাড় থেকে খুলে পড়ে যেতে চায়। পুষ্পিতা ওকে দু'টো পেইন কিলার ট্যাবলেট দেয়। এক গ্লাস দুধ এবং ঘুমের ওষুধ দেয়। ঘুমিয়ে পড়ে আলী আহমদ।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় ওর, তখনো আঁধার কাটেনি, সাদা আলো কুয়াশার মতো

BanglaBook.org

ছড়াতে শুরু করেছে। ওর মনে হয় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে, গায়ে ব্যথাও কম। কপাল ফুলে গিয়েছিলো, ফোলাটা কমেনি। ও কপালে হাত বোলায়। জানালা খোলা, ফুরফুরে বাতাস আসছে, বাতাসে ফুলে ওঠে মশারি, বাতাবি লেবুর গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর এবং আলী আহমদের ফুসফুস। জুলেখার মুখটা মনে পড়ে ওর– কেঁদেকেটে কেমন অস্থির হয়ে আছে। ও জানে ওর কিছু হলে পুষ্পিতাও অমন ফুলো-মুখো বেড়াল হয়ে যাবে। পুষ্পিতার তবু দু'টো ছেলে আছে, কিন্তু জুলেখার তো কোনো অবলম্বন নেই। ওর কী হবে? আলী আহমদের মন খারাপ হয়ে যায়। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশটা বুকের নিচে টেনে নেয়। ভাবে, জুলেখার কথা ভেবে কেন ভোরের স্নিগ্ধতা নষ্ট করছে? জীবন তো এমনই, এতো ভেবে কী লাভ? যা অনিবার্য তাকে তো কেউ রোধ করতে পারবে না। জামানের যক্ষ্মা হয়েছে, এই রোগের তেমন চিকিৎসা নেই। সবাই ভয় পায় এই রোগ, ছোঁয়াচেও। এক সময় আসবে যখন গলগলিয়ে রক্ত বেরুবে– সেই রক্তে ধুয়ে যাবে জুলেখার ভবিষ্যৎ। ওহ্, কী নির্মম সত্য যে জামান মরে যাবে, ভোরের এমন স্নিগ্ধতা রেখে ওকে মরতেই হবে। দু'দিন আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না আলী আহমদ।

ওর কাছ থেকে মার খাওয়ার ঘটনা শুনে তেড়ে ওঠে মফিজুল।

আহমদ ভাই এটা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। আমি ছেলেদের নিয়ে এসে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিতে পারি।

নারে, এতোটা ঠিক হবে না। কখন আবার বাসায় হামলা করবে কে জানে? এইসব লোকজনের কি কোনো মাত্রাজ্ঞান আছে?

ঠিক আছে মানলাম। তবে একদম ছেড়ে দেওয়া যাবে না। আমি ওকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিতে চাই।

হ্যাঁ, এটা হতে পারে।

হতেই হবে। ছেড়ে দিলে মাথায় উঠবে। শাসিয়ে দিলে সমঝে চলবে।

আলী আহমদের এই ঘটনায় পুষ্পিতা খুব ঘাবড়ে গেছে। কারো সঙ্গে লাগালাগির কথা ও চিন্তাই করতে পারে না। প্রতীককে বুকে জড়িয়ে ধরলে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ও আর নিজের অতীতটা ফিরে পেতে চায় না– যেখান থেকে একবার উপড়ে এসেছে সেই পরিস্থিতি আবার? এবার ও কোথায় যাবে? পুষ্পিতা মফিজুলের হাত চেপে ধরে, আর ঝামেলা করিস না মফিজুল। আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

শান্তি? আপনি চাইলেই কে আপনাকে শান্তি দেবে? শান্তির জন্য নিজেদেরই পথ কাটতে হবে। আজ একজনকে ছেড়ে দিলে কাল সে আবার দু'ঘা দেবে।

মফিজুল তেড়ে বেরিয়ে আসে। কাঠের আড়তের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা চারজনে একসঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকায়, বিস্মিত এবং জিজ্ঞাসার দৃষ্টি। মফিজুল মতলুব আলীর মুখের ওপর হাত নাড়ায়, আমাদের কলেজের প্রফেসরের গায়ে হাত তুলেছেন আপনারা, এতো বড়ো সাহস?

সাহসের কী দেখলেন? সাহস তো দেখাইনি?

খবরদার, সাট আপ। আজ সাবধান করে গেলাম। আর কোনোদিন বেয়াদবি করলে আমি এক'শ ছেলে নিয়ে এসে এই কাঠের আড়ত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবো। দেখবো আপনার সাহস কোথায় থাকে।

মতলুব আলী চুপসে যায়। কথা বাড়ায় না।

মফিজুল মাটিতে জোরে লাথ্থি মারে, ভেবেছিলাম সবাইকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে স্যারের কাছে মাফ চাওয়াবো, কিন্তু স্যার নিষেধ করলেন। আজ আমি আপনাদের মাফ

BanglaBook.org

করে গেলাম। ভবিষ্যতে কথা হবে না। অ্যাকশন হবে।

মফিজুল দপ্‌দপিয়ে হেঁটে যায়। মতলুব আলী আগুনের কথা শুনে চুপসে গিয়েছিলো, পাশ থেকে রহিমুদ্দীন ওর পেটে গুঁতো দেয়, আব্বে শালা, একদম খামোশ হয়ে গেলি।

চুপ কর। কাঠের আড়তটা তো তোর না, আমার। কতো টাকার মাল আছে জানিস? ছাত্রদেরকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। পুড়িয়ে দিলে তো পথে বসতে হবে।

দেক না, পোড়াতে এলে কি আমরা চুপ করে থাকবো? দেবো কল্লা নামিয়ে। মতলুব আলী খেঁকিয়ে ওঠে, রাখ, রাখ, পরের ধনে পোদ্দারি করতে হবে না।

তবে প্রফেসরের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি কেন?

গিয়েছি, বেশ করেছি। তোর কী?

মতলুব আলী হাতের তাস টুকরো টুকরো করে ফেলে। বাকিরা বেকুব হয়ে বসে থেকে যে যার বাড়ির পথে চলে যায়।

আলী আহমদ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনটে দিন শুয়ে থাকতে হলো বলে মনে ভীষণ কষ্ট, যে কষ্টের কথা কাউকে বলা যায় না– সেই বাড়িটার কথাই বারবার মনে হয় যেখানে তরুলতা ফুলের রঙের মতো টকটকে লাল রক্ত বেরোয় জামানের বুক থেকে। সেদিনের পর থেকে নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড বোঝাপড়া চলছে। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় জামানের অসুস্থতা। ঐ বাড়িটা ওর কাছে একটা শ্যামল দ্বীপ ছিলো– জামান মরে গেলে এই শ্যামলতাটুকু ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। তখন কী চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসবে? আজও ভোররাতে ঘুম ভেঙে যায়, চৈত্রের শেষ সময়– সারা রাতের পর ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে যায়, তখন মন কেমন করে। কারণ সে বাতাসের সঙ্গে বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, চোখ থেকে ঘুম ফুরিয়ে যায়। বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ ভেসে এলেই একটি মুখ কেন মনে পড়ে, সুগন্ধির সঙ্গে তার কী যোগ, সে কী ওর আকাঙ্ক্ষা? আলী আহমদ ক্রমাগত নিজের ভেতর প্রবেশ করে, দেখতে পায় নিজেকে– বাইরে থেকে যে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। আমি কী সেই নারীর সঙ্গ কামনা করি? সেই সঙ্গটুকু কি আমার প্রতিদিনের ঘরগেরস্থির বাইরে ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণিকের স্বস্তি? আমি পুষ্পিতাকে ভালোবাসি, ও আমার সন্তানের মা, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওর সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই– স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ফাটল নেই। তবু কেন সেই মুখ আমাকে আনমনা করে? আমার স্বপ্ন জুড়ে থাকে? মানুষের অবচেতন কি এমন প্রতারক? মানুষকে রেখে আসে নির্জন দ্বীপে– যে দ্বীপের সাগর থেকে শোঁ-শোঁ গর্জন ভেসে এসে ওকে আরো একাকী করে দেয়? তারপর নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে হাত বাড়াতে প্ররোচিত করে? মানুষের বুকের ভেতর এ কোন ইবলিশ বসবাস করে? কিন্তু এই মুহূর্তে ইবলিশকে তো আমার খারাপ লাগছে না। ওকে শয়তান ভাবতে পারছি না, মনে হয় ও আমার বন্ধু, পরম বন্ধু। কারণ জুলেখার কথা ভেবে আমি সুখ পাই। আমি তো মানুষ। মানুষই তো ভুল করে, অন্যায় করে এবং ক্ষমাও করে। মানুষই লম্পট এবং মানুষই মহান। মানুষই ভালোবাসে এবং মানুষই ঘৃণা করে। মানুষেরই ভালোমন্দের অধিকার আছে। ভালোমন্দের বোধ নিয়েই মানুষ পরিপূর্ণ জীবনযাপন করে। ভাবতে ভাবতে ওর মাথায় আলোর রেখা তৈরি হয়– ও কী করবে বুঝতে পারে না, কী করা উচিত তেমন একটা ধারণা নিজের মধ্যে গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু কেমন করে হবে, তা হয় না। মানুষের মন যুক্তি দিয়ে চলে না, যুক্তির

BanglaBook.org

মধ্যে থাকতেও চায় না। সেটাই যদি হতো তাহলে এতো অস্থিরতা কেন, এতো যন্ত্রণা? আলী আহমদের ঠোঁটে হাসি ফোটে। পাশের ঘর থেকে পুষ্পিতা এসে বিছানার পাশে দাঁড়ায়, মশারি উঠিয়ে দেয়। দরজা খুলতে খুলতে বলে, জেগে আছো দেখছি? রাতে ঘুমুতে পারোনি? যা গরম ছিলো।

একদম উল্টো। আমার চমৎকার ঘুম হয়েছে, একঘুমে রাত শেষ। দেখছো না ভোর বেলাই ঘুম ভেঙে গেলো।

ভালোই হয়েছে। ঘুমুলে শরীর তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়।

আজ কিন্তু কলেজে যাবো।

তাহলে তো তাড়াতাড়ি রাঁধতে হয়। এতোদিন তো বাজার করতে পারোনি। মফিজুল কাল দু'টো মুরগি এনে দিয়েছিলো। একটা জবাই করে দাও। রান্না করে দেবো। এখন চা খাবে এক কাপ?

না, থাক। প্রদীপ্তর স্কুল আছে?

হ্যাঁ, আছে। যাই ওকে ডাকি। উঠে পড়াশোনা করুক।

বলতে বলতে বেরিয়ে যায় পুষ্পিতা। প্রদীপ্তকে ডেকে কুয়োতলায় যায়, বালতি দিয়ে পানি উঠায়। আলী আহমদ ভাবে শুরু হয়ে গেলো পুষ্পিতার প্রতিদিনের রুটিন, ক্লান্তিহীন এ রুটিন– অথবা ক্লান্ত হলেও দায়িত্ব পালন করে যেতেই হয়। তাহলে পুষ্পিতার কি বাড়তি সুবাসের দরকার হয় না? কিছুই কি ওকে আনমনা করে না? নাকি এসবে ওর প্রয়োজন নেই? ওর যেটা বাড়তি লাভ সেটা ওর সন্তান, সারাদিন ওদের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। এই ব্যাকুলতা আলী আহমদের নেই। ও ওদের রেখে সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে, কখনো ওদের কথা মনে পড়ে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পুষ্পিতার মতো ব্যাকুলতা কৈ? তাহলে এই ব্যাকুলতাটুকু কি পুষ্পিতার বাড়তি সুবাস? হয়তো তাই। আলী আহমদ নিজের মনে যুক্তি দাঁড় করায়।

মুরগির মাংস দিয়ে গরম ভাত খেয়ে ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কলেজে আসে ও। ক্লাসে 'বলাকা' পড়াবে। রবীন্দ্রনাথের ওপর ক্লাস থাকলে সেদিন খুব ভালোলাগে– নিজের ভেতরের অর্গল মুক্ত করার আনন্দ পায়, মনে হয় অস্তিত্বের গভীর থেকে শব্দগুলো উড়ে উড়ে আসছে এবং পুষ্প-বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। কিন্তু কলেজের সামনে পৌঁছতেই ছেলেদের জটলা দেখতে পায়, হৈ-চৈ, তর্ক-বির্তক হচ্ছে, ওরা উত্তেজিত। ও পাশ কাটিয়ে ধীর পায়ে টিচারদের কমনরুমে ঢোকে। ঘর খালি, কেবল আকরাম জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, মনে হয় ও চিন্তান্বিত এবং বিরক্ত। কলেজের যে কোনো ব্যাপারে ও খুব জড়িত, ছাত্রদের ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে। আলী আহমদকে ঢুকতে দেখে ঘুরে দাঁড়ায় আকরাম, কেমন আছেন?

ভালো। কী হয়েছে বলুন তো?

কী আর রাজনীতি। ছাত্ররা খেপবে না কেন বলুন? জিনিসপত্রের দাম যে হারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সাধারণ মানুষ তো হিমশিম খাচ্ছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের কোনো সঙ্গতি নেই। শিক্ষার ব্যয় বাড়ার ফলে গরিব ছাত্রদের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে।

ছোটোখাটো বক্তৃতা করে ফেলে আকরাম। আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকরাম এক মুহূর্ত একটু থেমে আবার বলে, জানেন ছেলেরা আজ মিছিল করবে। 'চাল ডাল তেলের দাম কমাতে হবে, খাতা কলম বই পুস্তক ও শিক্ষার ব্যয়ভার কমাতে হবে' এইসব নিয়ে মিছিল বেরুবে একটুপর, এজন্য এরা জড়ো হয়েছে।

তাহলে ক্লাস কী হবে না?

BanglaBook.org

হবে। আমাদের তো ক্লাস নিতে হবে, যে কজনই ক্লাসে আসুক না কেন।

আলী আহমদ রেজিস্টার খাতা, বই গুছিয়ে নেয়। আর দশ মিনিট পর ওর ক্লাস। ক্লাসে কম ছেলেমেয়ে থাকলে ওর ভালোলাগে না। ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে থাকবে, ওরা কোনো গণ্ডগোল করবে না, হাঁ করে টিচারের মুখের দিকে তাকিয়ে লেকচার শুনবে, তবেই না ক্লাস নিয়ে আরাম। নইলে পড়িয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না। তখন আরো তিন-চার জন অধ্যাপক কমনরুমে ঢোকে। আলী আহমদ ক্লাসের দিকে যেতেই ছেলেরা পথ আটকায়, স্যার আজ ক্লাস নেবেন না। আমরা ক্লাস হতে দেবো না।

কেন? তোমরা তো মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরুচ্ছো। যারা ক্লাসে আসবার আসুক।

না, মিছিল ছাড়াও, আমরা কলেজে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভালো, খুব ভালো।

আলী আহমদ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, একটা স্বাধীন দেশে তো এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

ছেলেরা জোর দিয়ে বলে, আমরাও তাই মনে করি। আমাদের কলেজ পাকিস্তানী পতাকার সাথে ব্রিটিশের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক কেন উত্তোলন করবে? এটা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ, আমাদের জন্য সম্মান হানিকর। তাই নয় স্যার?

অবশ্যই। ঠিকই বলেছো।

আমরা এর প্রতিবাদে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিচ্ছি। আপনারাও ক্লাসে যাবেন না।

আবার কমনরুমে ফিরে আসে আলী আহমদ। অধ্যক্ষের কক্ষের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। ছেলেরা নানা ধরনের স্লোগান দিচ্ছে। গেটের কাছে জড়ো হয়ে থাকা ছেলেরা মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণে চলে গেছে। দূর থেকে শোনা যায় ওদের স্লোগান। আলী আহমদ লাইব্রেরিতে চলে আসে, ইচ্ছে কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে বিকেলে বাড়ি ফিরবে। তাক থেকে সাহিত্যের ইতিহাসের কয়েকটি বই নামিয়ে টেবিলে বসে, কিন্তু ঠিকমতো পড়াতে মন বসাতে পারে না। বারবার মনে হয় ছাত্ররাই প্রাণ। ওরাই ধরে রেখেছে রাজনীতির সঠিক পথটি। ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন নিয়ে আজকের ঘটনাটি ওকে দারুণ আলোড়িত করেছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! ওরা, যারা ছাত্রদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে তারা এতদিন ব্যাপারটি নিয়ে প্রতিবাদ জানায়নি, অথচ জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু না, তারুণ্যের শক্তি ভিন্ন, ওরা সব ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে থাকে বলেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে মিছিলে মিশে শহরটা ঘুরে আসতে, তাহলে হয়তো জং-পড়া পায়ের বেড়িটা ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে।

কিন্তু মনের দিকে তাকালে সে বেড়ি শক্ত হয়ে যায়। কত পিছুটান– মনের বয়স বেড়ে গেছে, আর তো তারুণ্য ফিরে আসবে না। মিছিলে স্বপ্ন দেখাটাই সত্য, সত্য নয় রোদ, ধুলো গায়ে নিয়ে পিচঢালা রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে হেঁটে আসা। আলী আহমদ নিশ্বাস ফেলে। ইতিহাসের বইগুলো ও উঠিয়ে রাখে তাকে, কবিতার বই নিয়ে আসে, কেমন যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, মনটা নিজের কাছ থেকে ছুটে যাচ্ছে বারবার। কোনোকিছুতেই মন বসে না। বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। ওর হাসি পায়। যাই যাই করেও অনেক বেলা হলো। বিকেল কি এখন? পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বোদলেয়ারের একটি কবিতার অনুবাদে ওর চোখ আটকে যায়। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ, চোখের পাতা

BanglaBook.org

সরে না, পাপড়ি পড়ে না, ও অনেকবার পড়ে।

আমাকে কামড়াতে দাও, অনেকক্ষণ ধরে,
তোমার ঘন কালো গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল
স্প্রিংয়ের মতো বেশামাল, বিদ্রোহী তোমার চুল
আমি যখন দাঁত দিয়ে কুটকুট করে কাটি
আমার মনে হয়, আমি একটু একটু করে
স্মৃতিগুলোকে খাচ্ছি

এইটুকু পড়ে ওর কেমন অবশ লাগে। ওর মনে হয় ওর স্মৃতিগুলো সব খাওয়া হয়ে গেছে। মানুষ স্মৃতি খেয়ে না ফেললে স্মৃতির ভারে চাপা পড়ে মরে যেতো। মানুষকে স্মৃতি খেয়ে ফেলতেই হয়, বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই হয়। কিন্তু দাঁত দিয়ে কুটকুট করে চুল কাটার ভেতর দিয়ে যে স্মৃতি খাওয়া হয়, সেটা খাওয়া নয়, সে খাওয়া প্রোথিত হয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে– মানুষ এই খাওয়ার উর্ধ্বে উঠতে পারে বলেই স্মৃতি আনন্দ, স্মৃতি বেঁচে থাকার উপকরণ। কবিতাটি পড়ার পরই ওর হৃদয় ভরে ওঠে, শূন্যতা কেটে যায়। কত যুগ আগে এই লেখাটি লিখেছিলেন বোদলেয়ার, যিনি মরে মিশে গেছেন মাটির সঙ্গে, সেই মানুষটি কী প্রবলভাবে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর অবয়ব থেকে ঝরে পড়ছে ফুলের পাপড়ি– ঢেকে দিচ্ছে আলী আহমদের বুকের প্রান্তর, সেখান থেকে সুগন্ধ আসছে, প্রবল গন্ধ। অনেকক্ষণ কবিতা পড়লে বাইরে রোদ পড়ে যায়। লাইব্রেরি বন্ধ করার জন্যে তৈরি হয়েছে লোকজন। আলী আহমদ বাইরে এসে দাঁড়ায়, বারান্দায় একরামুলের সঙ্গে দেখা, স্যার আপনি শুনেছেন কি, আমাদের জামান স্যার খুব অসুস্থ?

জানি। আলী আহমদ মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ও। পা কাঁপে– জুলেখার সামনে কিভাবে দাঁড়াবে? ঐ বিষণ্ন মুখ বারবার, কতবার দেখতে হবে ওকে? মরে যাবে কি তরুলতার লাল ফুল? ও গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। একরামুল পিছে পিছে আসে।

স্যার আপনার শরীর কি খারাপ?

না, এখন তো ভালো আছি।

মতলুব আলীকে আমরা সবাই গিয়ে একদিন শাসিয়ে আসবো।

মফিজুলের ধমক খেয়ে নরম হয়ে আছে। তবে কি জানো এদের তো কোনো চরিত্র নেই, আবার একসময়ে ফোঁস করে উঠবে।

সেজন্যই চাপের মধ্যে রাখতে হবে। ছেড়ে দিলেই ভাববে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। স্যার, আপনি বাসায় যাবেন? রিকশা ডাকবো?

চলো, জামানকে দেখে আসি।

একরামুল উৎসাহ নিয়ে বলে, চলুন স্যার। আমার তো ইচ্ছে করে প্রত্যেকদিন স্যারকে দেখতে যাই।

আলী আহমদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একরামুল রিকশা ডাকে। আলুপট্টির বাড়িটাকে ভয়াবহ নির্জন মনে হয় আলী আহমদের। একি ওর মনের ভুল? নির্জন হবে কেন? নির্জন হওয়া উচিত নয়। জামান তো মরে যায়নি। না মরলেও হাসিখুশি উচ্ছলতার প্রাণ তো নিভে গেছে, তাই বাড়িটা নির্জন। যে ঘটনাটুকু ঘটেছে তা মৃত্যুর চেয়েও বেশি। রিকশাওয়ালার পয়সা মিটিয়ে দিয়েও আনমনা হয়ে থাকে আলী আহমদ। বুকজুড়ে কেবলই অস্বস্তি, কোথাও স্বস্তি নেই– না পারিপার্শ্বিকে, না নিজের মনের কাছে।

একরামুল তাড়া দেয়, স্যার চলুন?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, চলো।

ও দ্রুত গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে। আলী আহমদ তখনো গেটের কাছে, ছোট্ট লোহার গেটটায় মরচে পড়েছে, তরুলতার লতায় ফুল নেই। বেশ কিছু কুঁড়ি ফোটার অপেক্ষায়, হয়তো কালই পাপড়ি মেলে যাবে। আলী আহমদ বারান্দায় উঠতে না উঠতেই জুলেখা দরজা খোলে।

স্যার, কেমন আছে ভাবী?

এসো, ভেতরে। আহমদ ভাই কেমন আছেন?

ভালো। কদিন আসতে পারিনি–

আপনার খবর শুনেছি একরামুলের কাছে। খুব দুঃখজনক।

আমার কথা থাক, জামান কেমন আছে?

চলুন দেখবেন।

জুলেখা ওদের ভেতরে নিয়ে আসে। জামান চিত হয়ে শুয়ে 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়ছিলো। ওদের দেখে হাসে। আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, বাহ্ তোকে তো খুব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে রে।

দেখাবেই। খাচ্ছিদাচ্ছি রেস্টে আছি যে। এ বড় ভালো সময় যাচ্ছে। জানি এত ভালো ভালো নয়।

হয়েছে বক্তৃতা রাখ। কেমন লাগছে মানিক?

দারুণ। এর আগে তো মানিকের কোনো বই পড়িনি। তোর কাছে কেবল শুনেছি।

একদিকে ভালো হয়েছে। যে কদিন শুয়ে থাকতে হবে সে কদিন বাংলা সাহিত্য উজাড় করে ফেল।

বেড়ে বলেছিস। সাহিত্যের কথা থাক। রাজনীতি কেমন চলছে একরামুল?

এখন পর্যন্ত গোল আমাদের পায়ে।

আতাউর ভাই কেমন আছে?

আতাউর ভাইর বিরুদ্ধে হুলিয়া। আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে।

রাজনীতির টুকটাক কথা হয়। একরামুল আজকের ঘটনার কথা বলে। জুলেখা চুপচাপ বসে আছে। শান্ত চেহারায় ঝড়ের ছায়া নেই। চা আর পাপর ভাজা দিয়েছে ওদের। আলী আহমদ জুলেখাকে দেখে, আবিষ্কার করতে চায় একজন নারীর ভিন্ন মুখ, যে সামনে একটি মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু না, জুলেখার চেহারায় তেমন কিছু খুঁজে পায় না। তবু আলী আহমদের সেই মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, যদি কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়, কোনো লাল দাগ বা নীল রেখা, যা মৃত্যুর মতো গভীর এবং অন্ধকারময়। কিন্তু না জুলেখার চেহারা স্বচ্ছ, সেখানে ফকফকে জ্যোৎস্না। যাবার সময় জুলেখা ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলে, আপনি রোজ আসবেন আহমদ ভাই, নইলে আমার ভয় করে। আমি আপনার আসার দিকে পথ চেয়ে থাকি।

বুক কেঁপে ওঠে আলী আহমদের। কথাটা খুব সরলভাবে বলা, কিন্তু জুলেখার লাবণ্যভরা মুখের দিকে তাকালে ওর স্নায়ু শীতল হয়ে যায়, ভীষণ ঘুম পায়। নিজেকে সামলে নেবার জন্যই আলী আহমদ বলে, আসি। একরামুল রিকসা ঠিক করেছে।

জুলেখা মাথা নাড়ে। দ্রুত বেরুতে গিয়ে দরজায় হোঁচট খায় ও। পেছন থেকে জুলেখার কণ্ঠ, ব্যথা পেলেন?

না।

আলী আহমদ পেছন ফিরে তাকায় না। গেট পেরিয়ে আসে, বুঝতে পারে নিজের

BanglaBook.org

কাছ থেকে পলায়ন এক ভয়াবহ ব্যাপার, অদ্ভুতভাবে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। একরামুল রিকসায় বসেছিলো। আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কেন এমন হয়, কেন এমন হবে? এখন কি স্মৃতিগুলো কুটকুট করে দাঁত দিয়ে কাটার সময়?

স্যার?

আলী আহমদ চমকে একরামুলের মুখের দিকে তাকায়।

স্যার, জামান স্যার কি ভালো হবে না?

যক্ষ্মার তো তেমন চিকিৎসা নেই। একে বলা হয় রাজরোগ।

স্যারকে ঢাকায় পাঠালে হয় না?

দায়িত্ব নেবে কে? ওর তো কেউ নেই ঢাকায়।

এভাবে আমাদের চোখের সামনে–

আলী আহমদ একরামুলের কথা পুনরাবৃত্তি করে। বলে, এভাবেই আমাদের চোখের সামনে, এভাবেই।

অকস্মাৎ দু'জনে চুপ করে যায়, কারো মুখে কথা আসে না। সাহেববাজারে এসে দু'জনেই রিকসা থেকে নামে। একরামুল ভুবনমোহন পার্কে ঢোকে, আলী আহমদ মদনের দোকানে। ফজলুল চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো। আলী আহমদকে দেখে হৈ-চৈ করে ওঠে। মদনের দোকানে বসে আলী আহমদের সব অস্থিরতা কেটে যায়, মানুষের সঙ্গ– নির্ভেজাল আনন্দ– মানুষই মানুষের আনন্দ-বেদনা। অনেকগুলো কবিতার পংক্তি আলী আহমদের করোটিতে ভোরের সাদা আলো থেকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মতো– চারদিক আলোকিত করে। মনে পড়ে লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চির কতগুলো লাইন, 'আলোর দিকে তাকাও, ভোগ করো এর রূপ। চক্ষু বোজো এবং আবার দেখো। প্রথমেই তুমি যা দেখেছিলে তা আর নেই, এর পর তুমি যা দেখবে তা এখনো হয়ে ওঠেনি।' কবিতাও এমনি, তুমুল আড্ডার মধ্যেও আলী আহমদের মাথায় কবিতা এখন ভোরের আলো। যা এখনো হয়ে ওঠেনি, সে হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ও নিজেকে মনে মনে তৈরি করতে থাকে।

BanglaBook.org

বছরের মাঝামাঝি সময়ে কলেজের ছাত্র-সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলো। নির্বাচনে একুশটি আসনের মধ্যে তিনটি পেলো একরামুলরা। নির্বাচনে ওদেরকে কম্যুনিস্ট বলে কোণঠাসা করে ফেলা হয়। আরো প্রচার করা হয় বাংলা ভাষা আন্দোলন যারা করেছে তারা ভারতীয় চর। এইসব শুনে মফিজুল উত্তেজিত হয়ে উঠলে আলী আহমদ ওর পিঠ চাপড়ে ঠাণ্ডা করে। মদনের দোকানে বসিয়ে ডালপুরি আর সিঙ্গাড়া খেতে দেয়। বলে, উত্তেজিত হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ওরা যখন এসব বলে তোমাদের পরাজিত করতে চায়, তখন বুঝতে হবে তোমরা একটা বৃহৎ শক্তি। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন মফিজুল। কারণ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অনেক কিছু ওদের হাতে। আর শোনো গণতন্ত্র হলো শৌখিন বুলি। ওটা আওড়ানো যত সহজ পালন করা তত কঠিন। এ দেশের মানুষকে গণতন্ত্রের জন্য কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে।

মফিজুল হা করে আলী আহমদের কথা শোনে, কথাগুলো ওর ভালোলাগে। একঢোকে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা খেয়ে বলে, ঠিকই বলেছেন আহমদ ভাই। গণতন্ত্র থাকলে কি আর আপনার গায়ে হাত তোলে কাঠের আড়তদার মতলুব আলী।

ছোটো ছোটো ঘটনা দিয়েই তো বড় ঘটনা পূর্ণ হয় মফিজুল। তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র। মফিজুল লাজুক হেসে বলে, আমি আবার এত ধৈর্য রাখতে পারি না। এত

সহিষ্ণুতাও আমার ভালোলাগে না। আমি সামনাসামনি মোকাবেলা করতে চাই, তা যদি জীবনের বিনিময়ে হয় তাও।

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, বুঝেছি। আর এক কাপ চা খাবে? সিঙ্গাড়া? দিতে বলবো?

সিঙ্গাড়া থাক। আর এক কাপ চা খাই।

চা খেতে খেতে আরো আলাপ হয়, সবটাই রাজনীতি, ছাত্র-সংসদে ওরা কী পদক্ষেপ নেবে, এইসব। আলী আহমদ মফিজুলের কথা শোনে মন দিয়ে। ওর মনে হয় কখনো তরুণদের কথা শোনা উচিত গভীরভাবে, ওদের কথা শুনলে সময়ের নাড়ি টের পাওয়া যায়, কারণ তরুণরাই বর্তমান, প্রত্যক্ষ এবং অবিভাজ্য। তরুণদের বুঝতে পারলেই সময় থেকে পিছিয়ে পড়ার ভয় নেই, নইলে সে পরিমাণ আধুনিক হওয়া যায় না, যে পরিমাণ আধুনিকতা সময় দাবি করে। মানুষের মুখ এক বিচিত্র পাঠ্যবই। মফিজুলের কথা বলা, ঠোঁট নড়া, চোখের পাপড়ি ফেলা, নাকের বাঁশি ফুলে ওঠা, ভুরু কোচকানো, কপালের ভাঁজ, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র চাইতে কম দুরূহ নয়– এই পাঠ্যবই থেকে শিখতে না পারলে জীবনের অনেক কিছু অজানা থাকে। একজন লেখক এমন হাজারটি পাঠ্যবই পড়তে পারলেই সে জীবন্ত এবং গতিশীল থাকে। এক সময় মফিজুল লজ্জা পেয়ে বলে, কী দেখছেন?

তোমাকে এবং তোমার মধ্যে অনেককে।

কেমন দেখলেন?

বলতে চাই না। এটা একান্তই আমার উপলব্ধি।

একজনের মধ্যে কি অনেকজনকে দেখা যায়?

যায়, যদি চেতনায় সমষ্টি থাকে। আর চেতনায় ব্যক্তি থাকলে প্রত্যেকেই আলাদা।

আপনি কি মদনকে দেখেন?

হ্যাঁ, দেখি। দেখবো না কেন?

এভাবেই কি মানুষ মানুষকে আবিষ্কার করে? বিশেষ করে সৃষ্টিশীল মানুষেরা?

শুধু কি আবিষ্কার? সৃষ্টিশীল মানুষেরা মানুষের মধ্যে ভিন্ন মাত্রা আরোপ করে।

তাই বলুন।

চায়ের কাপে ঝড় তোলে মফিজুল। প্রবল হাসিতে উচ্চকিত হয়ে ওঠে ছোটো দোকান। মদন ছুটে আসে।

কী হলো স্যার?

কিছু না মদনদা। প্রাণের উচ্ছ্বাস।

কথা বলতে বলতে মফিজুল উঠে দাঁড়ায়, যাই। হোস্টেলে একটা জরুরি মিটিং আছে। আপনি কি বসবেন আহমদ ভাই?

হ্যাঁ, বসবো। ফজলুল আসবে। ওর সঙ্গে আমার একটা কবিতার বই ছাপানোর কথা হচ্ছে।

বাহ বেশ ভালো। অগ্রিম অভিনন্দন।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় মফিজুল। আলী আহমদের কানে সে হাসি বাজতে থাকে, ও নোট বইটা তুলে আঁকিবুঁকি কাটে। একটি মুখ আঁকার চেষ্টা করে, একটি লাইন লেখে, তারপর বড় করে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে চায়ের কাপে গুঁজে দেয়। কাপের তলানির চায়ে কাগজটা ভিজে নেতিয়ে যেতে থাকে। আলী আহমদের মনে হয়, যেন খরস্রোতা কীর্তিনাশার বুকে একটি নৌকা তলিয়ে যাচ্ছে। উপমাটা কি ও কবিতায় লাগাতে পারবে? নৌকা কি নদীর বুকে ঘোলা জলে ডুবে খয়েরি হয়ে যাবে? কবিতার তো রঙ থাকতে

BanglaBook.org

হয়, যা নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতর চলাচল করে। ওর মনে হয়, কবিতা আমার নিশ্বাস, কখনো রঙিন করে কখনো উষ্ণ কিংবা শীতল– আমি কবিতা হয়ে যাই অথবা কবিতা আমি হয়। তখন ও দেখতে পায় দরজা দিয়ে ওর বন্ধু এবং কবিতার বইয়ের প্রকাশক ফজলুল ঢুকছে। ওর শরীর শিরশির করে– ভাবে মানুষ কী আশ্চর্য সুন্দর, মানুষই কীর্তিনাশা, এর বুকে নৌকা ডুবলে কোনো ক্ষতি নেই– সে এক নতুন জীবন।

কলেজের নির্বাচিত ছাত্র সংসদের প্রথম সভায় সুলতান প্রস্তাব করে, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এবং এই প্রস্তাব ছাত্র সংসদের কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। একরামুল আর হাসনা বেগম প্রস্তাবটি সমর্থন করে, অন্যরা চুপ করে থাকে। কিন্তু অধ্যক্ষ ডক্টর মমতাজউদ্দীন প্রস্তাবটি সংসদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন না। ফলে প্রায় প্রতিদিনই মিছিল আর হরতাল চলতে থাকে। কড়ই গাছের তলায় ছাত্রসভা লেগেই থাকে। একরামুল চমৎকার বক্তৃতা করে, যেমন যুক্তি তেমন বিশ্লেষণ, ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। একবার ওকে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা শাসিয়ে বলেছিলো, যারা বাংলা ভাষার আন্দোলন করে তারা ভারতের চর। তোরা যদি ভুবনমোহন পার্কে জনসভা করিস তো লাশ হয়ে ফিরে আসতে হবে।

সেদিন পার্কে জনসভা হয়েছিলো এবং বাংলা ভাষার পক্ষে একরামুলের বক্তৃতা শুনে জনসাধারণ অভিভূত হয়েছিলো। সেদিন ও অমন তুখোড় বক্তৃতা করতে না পারলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো। এবারও ছেলেদের মাতিয়ে রাখে ওরা। পরিস্থিতির অবনতি দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ পনেরজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। এর প্রতিবাদে একদিন ছত্রিশজন ছাত্র কলেজের প্রশাসন ভবনে ঢুকে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। বাকিরা সবাই প্রশাসন ভবনের দোতলার বারান্দায়। অনশন শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি খুব ভালোলাগে আলী আহমদের। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে এমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ দেখে ও আশ্বস্ত হয়। ভাবে, এভাবে এগুলেই হবে, শেষ পর্যন্ত ওদের কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং শুধু উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে এমন ভাবাটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। ও গভীর করে শ্বাস টানে, একটি জাতি জাগছে, কীর্তিনাশার প্রমত্ত গর্জনের মতো এই তারুণ্যের গর্জন দুকুল ছাপিয়ে যাচ্ছে, এই জাগাটা শুধু আবেগের নয়, যুক্তিরও। এই জেগে ওঠাকে ধরে রাখতে হবে, তাহলেই বাঙালির অস্তিত্ব গভীর এবং ব্যাপক হবে।

শিক্ষকদের কমনরুমে বসে ও শুনতে পায় মাইকে কিছুক্ষণ পরপর অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার কথা প্রচার করা হচ্ছে। যারা এসব ঘোষণা করছে তারা আবেগময় ভাষায় বক্তৃতাও করছে, ওদের কণ্ঠে যেন জ্যোতি ফুটছে, আলী আহমদের মনে হয় ঐ কণ্ঠে ও না-হয়ে-ওঠা ভোরের আলো দেখতে পায়। দ্য ভিঞ্চি থাকলে হয়তো কণ্ঠ আঁকতে পারতো, কে জানে। ও খুব উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটায়। বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে আবার চলে আসে। অনশনের পঞ্চাশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। শহরের মানুষের মনে এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কলেজের চারপাশে ভিড় জমেছে। কৌতূহলী মানুষকে সরানো যাচ্ছে না। আলী আহমদ পায়চারি করে, উৎকণ্ঠা এড়াতে পারে না। ছেলেদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, কথা হয়নি। ডাক্তার এসেছে ওদের পরীক্ষা করতে। দেখেশুনে ডাক্তার বলে, এদের কয়েকজনকে হাসপাতালে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে একরামুল। বলে, আমরা যাবো না। এটা এক ধরনের চক্রান্ত। আমাদের সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে চায়। আমরা গেলে সাধারণ ছাত্রদের মনোবল ভেঙে যাবে।

BanglaBook.org

কাউকেই হাসপাতালে নিতে পারলো না ডাক্তার। অনশনের সময় দুদিন পেরিয়ে গেছে। তখন রাজশাহীর প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা মাদার বখশ ওদের দেখতে এলেন। সাধারণ কথায় ছেলেদের বরফ গলাতে পারলেন না। ওরা একরোখা, একগুয়ে, কিছুতেই হার মানবে না। মাদার বখশের সঙ্গে আরো অনেকে এসেছেন। অনেক আলোচনার পর অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে মাদার বখশ টেলিফোনে খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দেন যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করবেন। তিনি ছাত্রদের ওপর থেকে বহিষ্কার আদেশ তুলে নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন। এভাবেই অনশন ধর্মঘট ভেঙে যায়।

আলী আহমদ মফিজুলকে নিয়ে বাসায় আসে। রিকসায় খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, জানো মফিজুল আমার মনে হয় তোমাদের এই অনশন ধর্মঘটে ভাষা আন্দোলন আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো।

অবশ্যই। আমিও তা মনে করি।

মফিজুল কিছুটা দুর্বল কণ্ঠে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

বাড়ি ফিরলে পুষ্পিতা হৈচৈ করে ওঠে, তুই পারিসও বাপু। খুব কি কাহিল হয়েছিস? দাঁড়া আগে এক গ্লাস দুধ খেয়ে নে।

দুধ খেতে খেতে মফিজুল গল্প করে। পুষ্পিতা বলে, এত রাজনীতি করলে পড়াশোনা কখন হবে?

চিন্তা নেই। সব হবে ভাবী। ডিগ্রি না নিয়ে কলেজ থেকে বেরুবো না।

হ্যাঁ, যা বোঝাবি তা বুঝতে হবে আমাকে। কয়েকদিন এখানে থেকে যা। এখুনি হোস্টেলে যেতে হবে না।

আলী আহমদ হা-হা করে হাসে, বুঝলে মফিজুল দু'দিনে শরীরের যা খুইয়েছো তোমার ভাবী সেটুকু পুষিয়ে দেবে।

তাও ভালো যে এই শহরে একজন ভাবী আছে। নইলে যে কী হতো!

জুলেখার মনে হয় ওর দিনগুলো গড়াচ্ছে না, দিনগুলো ছুটছে। ও যতই টেনে ধরতে চায়, ততোই বাঁধন আলগা হয়, ফসকে যায়– প্রবল গতি সঞ্চারিত হয় দিনের পায়ে, ওগুলো আর সোনার খাঁচায় থাকছে না। দ্রুত শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে জামানের। চোখ বসে গেছে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ, কাশির সঙ্গে ঝলক ঝলক রক্ত ওঠে– দেখলে ভয় করে, শরীর হিম হয়ে যায়। জামান ঘুমুলে ও উঠোনে এসে গন্ধরাজ গাছটার কাছে দাঁড়ায়। ফুলের সুবাস নয়, যেন তা রক্তের গন্ধ– সাদা ফুল মুহূর্তে লাল হয়ে যায়– ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। নিজের বৈধব্য চোখের সামনে এমন ভয়াবহ বিশাল হয়ে ওঠে যে সে নিরেট দেয়ালে মাথা ঠুকলে তাজা লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে ছোটে। জামানের সহকর্মীরা আসে, ছাত্ররা আসে, ওর নিজের স্কুলের সহকর্মীরা আসে, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন আসে, কিন্তু তবু ওর নিঃসঙ্গতা কাটে না, অন্ধকার ঘোচে না। কেমন করে ঘুচবে, জীবনের সলতের আলোটুকু যদি নিভে যায়। পোষা বেড়ালটা এসে পায়ের কাছে ম্যাঁও ম্যাঁও করে, ধবধবে সাদা বেড়ালটা ওর চোখের সামনে টুকটুকে লাল হয়ে যায়। জুলেখা অবসন্নের মতো মোড়ায় বসে, বেড়ালটা কোলে তুলে নেয়। ঢাকায় ওর বাবার কাছে চিঠি লিখেছিলো, বাবা এসে দেখে গেছে। ঢাকায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, জামান যেতে রাজি হয়নি। এই শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না। চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে ওর বাবা মা থাকে, ঢাকায় গেলে তাদের পক্ষে ছেলেকে দেখতে যাওয়া সম্ভব না। তাই জুলেখা একা এই মৃত্যুর মুখোমুখি। মৃত্যু? বেড়ালটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরেও, পোষা আদুরে বেড়াল নিঃশব্দ,

BanglaBook.org

চুপচাপ, ওর তুলতুলে গা, নরম পশম মৃত্যুর মতো কি? জুলেখার চোখের জল ফুরোয় না। ও আর পাপর ভাজে না, কড়া লিকারের চা বানায় না। কেউ এলে ও আর কাউকে কিছু খেতে দেয় না। প্রত্যেকেই খেতে ইতস্তত করে, এই রোগ বড় বেশি ছোঁয়াচে। কেবল আলী আহমদ জোর করে চা চায়, হাসি-গল্পে পরিবেশ অন্যরকম করতে চায়। কিন্তু পারবে কেন? প্রাকৃতিক নিয়মেই যা বদলাচ্ছে তাকে মানুষ জোর করে ধরে রাখবে কি করে? আলী আহমদের কী সাধ্য আছে তরুলতার শুকিয়ে যাওয়া বন্ধ করার?

পেছনের গেট খুলে পাশের বাসার আলেয়া ঢোকে। জুলেখারই সমবয়সী, দু'বাচ্চার মা, তবে কিছুটা ছেলেমানুষ– বয়সের তুলনায় পক্বতা কম। জুলেখার ওকে ভালোই লাগে। জামান বলে, তোমার বান্ধবী ন্যাকা। ন্যাকা মেয়ে আমার দুচোখের বিষ। জুলেখা হাসতে হাসতে বলে, ন্যাকা না হলে কি প্রেমে পড়তে? জামান সরোষে জবাব দেয়, কী যে বলো, হীরে ছেড়ে কয়লা? আমার রুচি কী এতই খারাপ?

জামানের অসুস্থতার পর আলেয়া আরো অন্তরঙ্গ হয়েছে। যখন তখন আসে, এটা-ওটা রান্না করে আনে। জামানের কিছু খেতে ইচ্ছে করে কি না তা জানতে চায়। জুলেখা এসব কথা ওকে বলতে পারে না। আলেয়া বুঝতে পারে না যে এসব কথা বললে, জুলেখাকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এই বোধটুকুর অভাবই সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

আজ ও ঢুকেই জুলেখার কোলে বেড়াল দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, তোমার এই বেড়াল প্রীতি দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়। জানো বেড়ালের লোম খুব খারাপ।

কী যে খারাপ, আর কী যে খারাপ নয় তা আমার জানতে ইচ্ছে করে না আলেয়া। তোমার দোহাই লাগে তুমি আমাকে উপদেশ দিও না।

জুলেখার চোখ ছলছল করে, যে কান্না ও একটু আগে রোধ করেছিলো তা আবার দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে।

ঐ দেখো আবার তুমি কাঁদতে বসলে। আরে বাবা যা ঘটবে তা নিয়ে উতলা হওয়ার কী আছে।

কী ঘটবে?

জুলেখা জলভরা চোখে তাকায়। আলেয়া থতোমতো করে চুপ হয়ে যায়। আর কিছু বলতে পারে না। তড়িঘড়ি বলে, যাই, ছোটো বাচ্চাটা আবার উঠে যেতে পারে। তোমার জন্য আচার এনেছি, খাও।

রাখো, পরে খাবো। এখন ভালোলাগছে না।

আক্কাস বাজারে যাবে। তোমার কিছু লাগবে?

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিও। দু'টো ডালিম আনাবো।

আলেয়া চলে গেলে জুলেখা আবার নিজের মধ্যে ডুবে যায়, যে ডুবে যাওয়ার মধ্যে সত্য গোপনের চেষ্টা নেই। তবু কেন ও আলেয়াকে চোখ ঠারে? লাভ কী? আসলে অন্যের কাছ থেকে এই সত্য জানতে ইচ্ছে করে না ওর। এটুকু ওর নিজেরই থাক। শুনতে পায় জামান ডাকছে। ও দ্রুত ঘরে আসে। বিছানার পাশে বসে।

খারাপ লাগছে? পানি খাবে?

তুমি ঐ চেয়ারটায় বোসো জুলি।

সেই কবে থেকে তো তোমার সঙ্গে শুতে দিচ্ছো না। কাছে বসতেও দেবে না?

অভিমানের কথা নয় জুলি। যা বলি শোনো। যাও চেয়ারে গিয়ে বোসো।

জুলেখা চেয়ারে গিয়ে বসে। শত চেষ্টা করেও চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। জামান অপলক তাকিয়ে থাকে, তারপর বালিশে মুখ গোঁজে।

BanglaBook.org

আমি কি কিছুই বুঝি না আহমদ যে জুলেখা কেন এই বেড়ালটাকে এত ভালোবাসে?

বাসুক, ও যত রাজ্যের পশুপাখি ভালোবাসুক, তবু তোর মুখ থেকে এসব শুনতে চাইবে না। ওকে এসব বলা অমানবিক, চরম নিষ্ঠুরতা।

আমি তাই হয়েছি আহমদ, নিষ্ঠুর হয়েছি।

বলতে বলতে বদলে যায় জামানের মুখ। প্রথমে সে মুখ বেড়ালের ধারালো থাবা হয়, পরে একটি সুতীক্ষ্ণ ছুরি। আলী আহমদের শরীর শিউরে ওঠে। বারবার মনে হয় জীবনের একটি নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ওর সময়, একদিন এই সময় কবিতা কিংবা গল্প হয়ে উঠে আসবে ওর সৃজনশীলতায়। তখন এভাবে মুখোমুখি বসে থাকা হবে না জামান কিংবা জুলেখার, কিন্তু স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, ব্যথিত করবে ওকে।

চা আর পাপর ভাজা নিয়ে আসে জুলেখা, সঙ্গে জামানের জন্য বেদানার রস।

কী ব্যাপার এমন চুপচাপ বসে আছেন যে আপনারা?

কেউ উত্তর দেয় না। আলী আহমদ এক টুকরো পাপর ভাজা উঠিয়ে কামড় দেয়, মুচমুচ শব্দ ওঠে দাঁতে। জামান বেদানার রসে চুমুক দেয়।

আপনি কিছু খাবেন না ভাবী?

চা খাবো।

জুলেখা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরেছে, সঙ্গে লাল ব্লাউজ। মুখটা যদিও বিষণ্ন, কিন্তু স্নিগ্ন, কেবল তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আলী আহমদ মনে মনে ভাবে, হায় চিল, সোনালি ডানার চিল– সোনালি ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ে যায় যে নারী তার ঘন কালো চুল ছড়িয়ে থাকে দিগন্ত জুড়ে– সেখানে কখনোই অন্ধকার নামে না।

BanglaBook.org

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শহরে। ছেলেদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। তারা মেলা সমস্যার সমাধানের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু বাধ সাধে অবাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ছাত্রদের কিছুতেই সাক্ষাত করতে দেবে না। রাজশাহী কলেজ মাঠে বক্তৃতা করার সময়ে ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্লোগান দেয়, গো ব্যাক লিয়াকত আলী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে মফিজুল একজন। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায় না আলী আহমদ। কলেজ কর্তৃপক্ষ ওকে শাসিয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তো খড়্গহস্ত। বলে দিয়েছে, বাড়াবাড়ি করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইসব শুনে পুষ্পিতা খুব মন খারাপ করে। বলে, আমরা কেন এত ঝামেলায় জড়াবো। ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে তোমার শান্ত হওয়া উচিত। চাকরিটা গেলে খাবো কী? এই দেশে কি আমাদের কেউ আছে? মফিজুলের আর কী হবে? কিছুদিন জেলে থেকে তো ছাড়াই পেয়ে যাবে।

আলী আহমদ পুষ্পিতাকে দেখে, অসহায়, ভয়ার্ত– দু'চোখে বিপন্ন দৃষ্টি। ওর মনে হয় এদের জন্য এখন চুপ থাকা প্রয়োজন। ও ছাড়া তো ওদের কেউ নেই। এক ধরনের অক্ষমতার গ্লানি আলী আহমদকে মরমে মারে। নিজের কাছে নিজেকে একজন পরাজিত মানুষ মনে হয়। সে রাতে ও ঠিকমতো খেতে পারে না, রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায়। আতাউর রহমান আন্ডারগ্রাউন্ডে, একরামুলও তাই। মফিজুল কাছে নেই। সুলতান, হাবিবুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য চলে গেছে। শহরটা অকস্মাৎ কেমন জনশূন্য

মনে হয় ওর কাছে। কেউ নেই যে তার কাছে গিয়ে দুদণ্ড মন খুলে কথা বলে। এই একা হয়ে যাওয়াটা আলী আহমদের জন্য প্রচণ্ড দুঃসময়, এ সময় অতিক্রম করার জন্য ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ও একা একা শহরের রাস্তায় হাঁটে, লাইব্রেরিতে যায়, মদনের দোকানে বসে– ছোটো হয়ে যাওয়া পৃথিবীর রঙ ধূসর। একটাই সান্ত্বনা রাতদিন খেটে কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হচ্ছে। তাই সময় ফুরিয়ে যায়, নতুন সময় এগিয়ে আসে– ঝোড়ো বাতাসে সময়ের উপরিভাগে আলোড়ন ওঠে। ছোটো ছোটো এইসব মনের ওপর এক বিচিত্র দহন। বারবার মনে পড়ে মফিজুলের কথা, এ কেমন দেশ আহমদ ভাই? এরা তো মানুষের অধিকার স্বীকার করে না। কুঁকড়ে যায় বুক, বুক চেপে ধরলে টের পায় নিজেকে– মনে হয় এই অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্যই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দরকার, নইলে তো অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বিপন্ন হলে? শিউরে ওঠে আলী আহমদ, বিপন্ন হলে মরণ– শকুন-শেয়ালের খাবার হতে হবে।

জামানের যখন-তখন অবস্থা। বাড়িভর্তি লোক। মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া কারো কিছু করার নেই। ঢাকা থেকে জুলেখার বাবা এসেছে। বারান্দায় রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে কথা হয় আলী আহমদের। জুলেখার সঙ্গে বাবার আদলের খুব মিল আছে। মোয়াজ্জেম হোসেন লম্বা-চওড়া বিশাল দেহের মানুষ, সারাক্ষণ পান চিবান। কপালে ঘন কালো জোড়া ভুরু। কেমন অদ্ভুত লাগে মানুষটিকে। জামানের এই অবস্থায় বেশ ভেঙে পড়েছে, মেয়ের চিন্তায় ব্যাকুল। বারবার বলে, কী হবে মেয়েটার? কীইবা বয়স?

আলী আহমদ সান্ত্বনা দেয়, আপনি এত ভেঙে পড়েছেন কেন চাচা? দিন কারো জন্য বসে থাকে?

বসে থাকে না। কাউকে গুঁড়িয়ে থেঁতলে দিয়ে পেরিয়ে যায়। এ বয়সে তো আর কম দেখিনি।

আলী আহমদ লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়। বোঝে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে অকারণে কথা বলা উচিত নয়। আত্মীয়স্বজন আসা-যাওয়া করছে। জামানের বাবা সোফায় বসে কাঁদছে এবং মাঝে মাঝে কান্না জড়ানো কণ্ঠে কথা বলছে। জামানকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছে। দু'টো মাত্র ঘর, ঠিকমতো বসারও জায়গা নেই। জামানের মা সংসার সামলাচ্ছে। জুলেখা জামানের বিছানার পাশে পাথরের মূর্তি হয়ে বসে থাকে। ওর চোখে চোখ পড়লে মনে হয় জুলেখা যেন বলতে চায়, এ কেমন সময়? এ কেমন স্তব্ধ সময়? নড়ে না গাছের পাতা, বয় না বাতাস, পড়ে না বৃষ্টি– ওহ্ বৃষ্টি, চারদিক ধোঁয়াটে করা বৃষ্টি। আলী আহমদ বলতে চায়, ভয় পেয়ো না সোনালি ডানার চিল, আমি তো আছি। যেন চেঁচিয়ে ওঠে পাথরের মূর্তি, কোথায় তুমি? কেমন করে আছো? তাই তো এ কেমন থাকা? স্তব্ধ হয়ে থাকাটা কি থাকা? এ কেমন থাকা যে থাকায় চিৎকার করে নিজের উপস্থিতির কথা বলা যায় না। ও তখন মোয়াজ্জেম হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলে, চাচা এ বাড়িতে তো অনেক লোক। আপনি আমার বাসায় থাকবেন চলুন।

আমি বুঝে গেছি সব। ভাবছি কালই চলে যাবো ঢাকায়। তারপর রাজশাহীর পাট চুকিয়ে দিয়ে জুলেখাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আর একবার রাজশাহী আসবো। এবার আর তোমার বাসায় নাই বা গেলাম। জুলেখা দুঃখ পাবে।

এই নিরাসক্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে শিউরে ওঠে আলী আহমদ। বুঝতে পারে

BanglaBook.org

মোয়াজ্জেম হোসেনের বুকে এখন শোক নেই। কীর্তিনাশার দু'কূলপ্লাবী ঢেউয়ে তা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে।

মাস্ তিনেক পরে রাজশাহী স্টেশনে জুলেখাকে বিদায় জানায় আলী আহমদ। জুলেখা ব্যাগ খুলে বাবার বাড়ির ঠিকানা লেখা কাগজটা আলী আহমদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ঢাকায় এলে দেখা করবেন। বাবা একটা স্কুলে চাকরি ঠিক করেছে। কাজটা শুরু করতে পারলে বেঁচে যাবো। এই শহরে আমার দম আটকে আসছে। আমি এখান থেকে পালাতে চাই।

আলী আহমদ চুপ করে শোনে। ও জানে দু'দিন আগে জুলেখার শ্বশুর-শাশুড়ি চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে চলে গেছে। ওকে নিতে চেয়েছিলো, ও যায়নি। শহরের মেয়ের গ্রামে গিয়ে থাকা কি সম্ভব?

জুলেখা মৃদু স্বরে বলে, কিছু বলছেন না যে?

হয়তো আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হবে, হয়তো হবে না, কে জানে। শুধু জানি বিশাল এক স্মৃতি সারাজীবন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

জুলেখার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে, চোখে আঁচল চাপা দেয়। আলী আহমদ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে যায়। একসময়ে বাঁশি বাজে, ট্রেন ছাড়ে। প্লাটফরম্ খালি হয়ে যায়। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মানুষ আর নেই। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই দিগন্তের বিস্তার– এই অসীম শূন্যতায় ও নিজে একটি বিন্দু মাত্র।

BanglaBook.org

৫

রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে মফিজুলের দিন চমৎকার কাটছে। খাপরা ওয়ার্ড শুধু রাজবন্দীদের জন্য– টালির ছাদ দেওয়া বিরাট আটচালা ঘর। জেলের প্রতি পদক্ষেপের অসুবিধা মেনে নিয়েও ও খুশি– কারণ তেভাগা আন্দোলনের অনেক নেতাই খাপরা ওয়ার্ডে আছে। কুষ্টিয়ার হানিফ শেখ আর দিনাজপুরের কম্পরাম সিং-এর সঙ্গে ওর বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। ওদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে যায়– তাছাড়া পড়াশুনা করে সময় ভালোই কাটে। শুধু সন্ধ্যার আগে দরজা বন্ধ করে দিলে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গা ছমছম করে ওঠে। সেলগুলো অস্বাভাবিক ছোটো। হাসপাতালের বেডের মতো লোহার একটি খাট পাতলে এক হাতের মতো জায়গা থাকে নড়াচড়ার জন্য। একটি মাত্র দরজা। মফিজুলের মনে হয় বাকি তিন দিকের দেয়াল লখিন্দরের লোহার বাসরের মতো, কোথাও একটি ফুটো নেই। খাটের নিচে থালা-বাসন, বইপত্র রাখা যায়। কতবার ওগুলো বের করতে গিয়ে মাথায় ঠোক্কর খেয়েছে, কখনো দুচার দিন ফুলেও থেকেছে কপাল। খাটের এক কোণে পেসাব পায়খানার জন্য আলকাতরা লেপা বেতের টুকরি আছে। রোজ সকালে পরিষ্কার করা হয়। যতক্ষণ সুইপার না আসে ততক্ষণ নিশ্বাস ফেলা ভীষণ কষ্টকর হয়। নিজের শরীরের এই বর্জ্য পদার্থগুলো যে এতটা ভয়াবহ তা এই সেলে ঢোকার আগে টের পায়নি ও। নিজের মনেই হাসে ও। এই অভিজ্ঞতার জন্য মজাই লাগে। ঘরের দরজার সামনে আছে এক চিলতে বাঁকানো দেয়াল, যাকে এন্টিসেল বলে। এখানে গোসলের পানি রাখা হয়, যেটুকু পানিতে একজন মানুষের শরীর ভেজে মাত্র সেটুকু পানি, কাক-গোসল আর কি! এসব নিয়ে ও অবশ্য

তেমন মাথা ঘামায় না। এন্টিসেলের দুই দিকে আছে লম্বা আর একটি দেয়াল, মাঝখানে সরু পথ, দু'জন মানুষ কোনোরকমে পাশাপাশি হাঁটা যায়, মুখোমুখি হলে মাথায় ঠোক্কর লাগার সম্ভাবনা। এই দেয়ালের শেষ মাথায় আছে একটি ছোট্ট গেট। মাথায় উপরে মাত্র এক হাত উঁচুতে ছড়িয়ে আছে ঘন কাঁটাতারের ছাদ। মফিজুলের গ্রিক মিথলজির ডিডেলাসের কথা মনে হয়। ডিডেলাসের মতো কেউ যদি পাখা বানিয়ে উঠে যেতে চায় সেজন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা। পালাবার পথ নেই। কিংবা রবীন্দ্রনাথের তালগাছের মতো আকাশে উঁকি মারতে চাইলে কাঁটাতারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে মাথা। এই ছাদ সামনের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। সামনের গেটের পর আছে দুই তিন হাতের মতে প্রশস্ত বারান্দা। এই বারান্দা পুরো ওয়ার্ড জুড়ে আছে এবং বারান্দার দুটি সেলের পরপরই একটি করে গেট। এই বারান্দা আবার বেশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই দেয়ালের পরই জেলের বিশাল দেয়াল, ক্ষমতা থাকলে সেটাকে আকাশসমান উঁচু করে দিতো জেল কর্তৃপক্ষ। মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মফিজুল ধূসর আকাশ দেখার চেষ্টা করতো, ঘাড় ব্যথা হয়ে যেতো, তবু তাকিয়ে থাকাটা এক ধরনের নেশা ছিলো ওর। মাঝে মাঝে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকতো। এ সময়টা ছিলো রাজবন্দীদের মর্যাদা আদায়ের শেষের দিক। ঢাকার জেলখানায় রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট চালাচ্ছে। সামান্য ছিটেফোঁটা খবর পাওয়া যায়। সেটুকু সম্বল করে ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনেকদিন সংগ্রাম করে রাজবন্দীরা আংশিকভাবে তাদের দাবি আদায় করেছিলো।

এখানে আসার পর থেকেই মফিজুল দেখছে ভোরে নাস্তার জন্য দেওয়া হয় একটা আটার রুটি। শুকনা রুটি গলা দিয়ে নামতে চায় না। রুটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'এক গ্লাস পানিও খেতে হয়। মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় কী? পেটে যে ভীষণ খিদে। রাজবন্দীরা দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে দেনদরবার করছে। শেষ পর্যন্ত বছরখানেক পর সরকার রুটির সঙ্গে ভাজি মঞ্জুর করে। যেদিন রুটির সঙ্গে ভাজি এলো সেদিন কী হৈচৈ হয়ে গেলো ওয়ার্ডে। বিশাল দেহের কম্পরাম সিং লোহার থালাটা মফিজুলের নাকের ওপর তুলে বলে, ভায়া দেখো তো সুগন্ধি আসছে কি না? অনেক যত্ন করে খেতে হবে কিন্তু, বহু সাধনার ফল কিনা।

যত্নটা কী কম্পদা?

ধরো একটুখানি মুখে দেবে, চোখ বুঁজবে, জিহ্বা সামান্য নাড়বে, ভাববে তোমার গলা দিয়ে অমৃত নামছে। তারপর আর একটু জিভের মাথায় তুলে দেবে, আলতো করে।

মফিজুল বাধা দেয়, যদি বিস্বাদ লাগে?

সেজন্যই তো ভাবতে হবে অমৃত। বুঝলে স্বাদ-বিস্বাদ কিছু নয়, ভাবাটাই সত্যি, ভাবাটা ধ্যান। কোনোরকমে গলাধঃকরণ করাটা গৌণ, একদম তুচ্ছ ব্যাপার।

শুনতে শুনতে হো হো করে হাসে মফিজুল।

কম্পরাম চোখ বড়ো করে গম্ভীর হয়ে তাকায়, হেসো না, সাধনার ধন নিয়ে হাসতে নেই।

আপনাকে আমার ভাজিটুকু দেই কম্পদা?

না, না, তুমি খাও। তোমরা ইয়ং, তরতাজা। তোমাদের বেশি করে খাওয়া উচিত।

কথা বলতে বলতে থালা হাতে চলে যায় কম্পরাম। মফিজুল ঝটপট খেয়ে ফেলে। ভাত কিংবা রুটি যাই হোক না কেন ও দ্রুত খেতে পারে, পরিমাণে যে কম খায় তাও নয়। থালাটা রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখে উল্টোদিক থেকে খবরের কাগজ হাতে হাজী দানেশ আসছে। বিপ্লবী হিসেবে খ্যাত। দিনাজপুরের ধনী পরিবারের ছেলে, আলীগড় থেকে পাস করেছে, কিন্তু অস্থিমজ্জায় রাজনীতি। ওকে কিছুটা এড়িয়ে চলে

BanglaBook.org

মফিজুল, খুব আন্তরিক হতে পারে না। কেন তা ও নিজেও বোঝে না। ওকে দেখেই দানেশ চেঁচিয়ে বলে, দেখেছো কাণ্ড, আজও খবরের কাগজটা মাঝখান দিয়ে কেটে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে। এ এক অসহ্য ব্যাপার। যেন এইসব খবর জানলে আমরা জেলখানার মহাভারত অশুদ্ধ করে ছাড়বো। পড়বে নাকি? নাও।

ওর হাতে কাগজ দিয়ে চলে যায় দানেশ। মফিজুল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কাগজটা মেলে ধরে। জেল কর্তৃপক্ষ এমনই করে। যে খবর জেলের রাজবন্দীদের জানানো অনুচিত মনে করে তা কেটে ফেলে। ফলে পত্রিকার উল্টো দিকের খবরটাও কাটা পড়ে। বাইরের কোনো আন্দোলনের খবর ওদের কাছে পৌছে না, অন্য জেলে রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচারের খবর ওরা জানতে পারে না, পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষের খবরও কেটে রাখে। মফিজুলের মনে হয় এ এক বিচিত্র মানসিকতা। এভাবে জেলের বিপ্লবীদের কোনো ঘটনা থেকে আড়াল করে রাখা যায় না। বিভিন্ন গোপন পথে খবর চলে আসে, খুব অল্প সময়েই আসে। মেজাজ বেশি খিচে যায় মোটা দাগে চিঠিগুলো কাটা থাকলে। ব্যক্তিগত চিঠিও কেটে কিছু রাখে না। অনেক সময়ে এমন করে কাটে যে অপরপৃষ্ঠার লেখাও মোটা দাগের নিচে চাপা পড়ে যায়। এইসব নিয়ে রাজবন্দীরা বহুবার আপত্তি জানিয়েছে। মফিজুল একদিন নিজে ওর বাবার খুব সাধারণ চিঠি কেটে দেওয়ার প্রতিবাদে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ওদের টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে এসেছিল। আজও স্টেটম্যান পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে দেখে। তেমন কিছু খবর নেই, ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কাগজটা হাতের মধ্যে মুড়ে নিয়ে বারান্দার মাথায় আসে। কাগজটা আর একজন নিয়ে যায়। বাবার চিঠি পেতে খুব ইচ্ছে করে। অনেকদিন নাচোলের খবর জানে না। গতবার নসরুল্লাহ যখন এসেছিলো তখন বলেছিলো ইলা মিত্রের নেতৃত্বে কৃষকরা তেভাগা কায়েম করেছে। কৃষকরা ভীষণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের গোলায় ধান তুলে জোতদারদের হিস্যা পাঠিয়ে দেয়। সেজন্যই নাচোলের খবরের জন্য মফিজুল উদগ্রীব। কম্পাসম এবং অন্যদের কাছ থেকে জেনেছে রংপুর-দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলন কেমন নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। ইলা মিত্র কতক্ষণ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে? যে সরকার হিংস্র থাবা বিছিয়ে রেখেছে পূর্ব বাংলার ওপর। সব খবর নিয়ে যদি এখন ওর বাবার একটা চিঠি আসতো তাহলে এই মুহূর্তে ভীষণ খুশি হতো ও। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর রুটির সঙ্গে ভাজি মঞ্জুরির চেয়েও আনন্দ পেতো। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। চট করে আবার মন খারাপ হয়ে যায়।

ঢাকা জেল থেকে খাপরা ওয়ার্ডে বদলি হয়ে এসেছে খুলনার আনোয়ার ও মীরপুরের নাসির। দু'জনেই রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে ঢাকায় দেড়শ দিনের যে অনশন ধর্মঘট হয়েছিলো তাতে অংশ নিয়েছিলো। দু'জনে বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। মফিজুল বয়সে তরুণ বলে ওরা সবাই ওকে স্নেহ করে। আজও ওকে দেখে নাসির একগাল হেসে বলে, ইয়াংম্যানের খবর কী?

মফিজুল হেসে বলে, খবর তো আজকে একটা। রুটির সঙ্গে ভাজি।

হো হো করে হেসে ওঠে দু'জনে। আনোয়ার বলে, আনন্দ কোথায় জানো তো?

মফিজুল মাথা নেড়ে বলে, বুঝি। আনন্দ আন্দোলনের সাফল্যে।

ঠিক ধরেছো। সাধেই বলি তরুণদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব। এরা বাতাসের বেগে বুঝতে পারে।

মফিজুল ওদের ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার বারান্দার এ মাথায় আসে। ও পায়চারি করতে থাকে। গতকাল থেকে একটি দৃশ্য দেখে খুব মর্মাহত হয়ে আছে ও। কয়েদিরা

BanglaBook.org

তেলের ঘানির লোহার রড কাঁধে নিয়ে ঘুরছে, সরষে পেষানো হচ্ছে, তেল পড়ছে। মফিজুলের মাথা ঝিমঝিম করে– অসহায় বেদনায় এবং ক্রোধে। সেই তো কবে আঙ্কল টমস কেবিন পড়েছে, এখনো তার জের। আর কবে এই ক্রীতদাস প্রথার শেষ হবে? বিরাট ওজনের লোহার রড কাঁধে নেওয়া কি সোজা কথা? একজন কয়েদি মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ঐ অবস্থায় অবিরাম ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে। মফিজুল ভেবে দেখলো এর নাম বোধহয় সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু বলবে কার কাছে? প্রতিকার করবে কে? ব্রিটিশরা যে শাস্তির প্রবর্তন করেছিলো স্বাধীন দেশে কি তার জের চলতে থাকবে? তাও আবার ইসলামি রাষ্ট্র? এখানেও কি মানুষের মূল্য বলদের সমান? ভেতরে ভেতরে এক রকম অস্থিরতা মরমে মারে। আন্দোলনে ফেটে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে মফিজুল। দেড়শ দিন কেন প্রয়োজন হলে দেড় হাজার দিন দাবি আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘট করতে পারবে ও। মৃত্যু? মৃত্যু তো হবেই। ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘট করার জন্য শিবেন রায় কি মৃত্যুবরণ করলেন না? অনশনের একটা বিশেষ সময় পেরিয়ে গেলে যখন মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় তখন জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু অনশনকারীরা সে নিয়ম মানবে কেন? তারা যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে বাধা দেয়। জেলের ডাক্তার শিবেন রায়কে নাক দিয়ে খাওয়াতে এলো। শিবেন প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাধা দিলে নলের দুধ ফুসফুসে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত মুখে আসতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যে শিবেন শেষ। মফিজুল মনে মনে ভাবলো অদ্ভুত একটা শব্দ, কী কঠিন এবং ভয়াবহ। অথচ অসম্পূর্ণ, শেষ হয়েও তো অনেক কিছু শেষ হয় না। শেষের একটা ধারাবাহিকতা আছে।

পেছন থেকে হানিফ এসে ঘাড়ে হাত রাখে।

একা একা দাঁড়িয়ে কী ভাবছো? বাইরে মনের মানুষ রেখে আসোনি তো?

হানিফ ভাই সময় পেলাম কোথায় যে মনের মানুষ খুঁজবো?

রাজনীতি এমন কঠিন। নিংড়ে চুষে খেয়ে ফেলে অনেক কোমল সময়।

মফিজুল প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, এজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই।

গুড। তোমাকে দিয়েই হবে। শোনো জান খাঁ জেলের নির্যাতনের প্রতিবাদে যে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে আমরা ভাবছি আমরা ওকে সমর্থন দেবো। কারণ জান খাঁ শুধু নিজের ব্যাপারটি দেখছে না, ও সব কয়েদিদের ওপর থেকে অকথ্য অত্যাচার তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ওদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আমরা জেল কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করবো।

আমি আছি। আমিও ভাবছি একটা কিছু করা দরকার।

দুপুরের খাওয়ার পর আমরা বসবো। তুমি থেকো।

শুরু হলো অনশন। রাজবন্দীদের দেখাদেখি জেলের প্রায় দেড়শ সাধারণ কয়েদিও অনশন ধর্মঘট শুরু করলো। এর আগে জেল কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের জুম্মার নামাজে সাধারণ কয়েদিদের একসঙ্গে নামাজ পড়া নিষেধ করে দিয়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো রাজবন্দীরা জুম্মার নামাজে গিয়ে রাজনীতি আলোচনা করে। ফলে সাধারণ কয়েদিরা সংগ্রামমুখী হয়ে উঠছে। সে যাই হোক, জেল কর্তৃপক্ষ অনশনকারীদের দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলো না। কয়েদিরা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে জেলখানা মাতিয়ে তুলতো। এর মধ্যে রাজশাহী জেল পরিদর্শন করতে আসে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স আমিরুদ্দিন। রাজবন্দীরা তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এর আগে তারা বিভিন্ন দাবিদাওয়া

BanglaBook.org

নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পাঠায়। এর আগে জেলে নিয়ম ছিলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ড ভিজিটের সময়ে তাদেরকে সরকার সালাম দিতে হবে। অর্থাৎ দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকবে, একজন সিপাই সরকার সালাম বলে চিৎকার করে উঠলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সালাম দিতে হবে। রাজবন্দীরা দেখা করতে চাইলে আমিরুদ্দিন বলে সে কথা বলতে রাজি আছে যদি তারা জেলের নিয়ম অনুযায়ী তাকে সম্মান দেখায়।

রাজবন্দীরা সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে তারা ফাইলে বসবে না অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে বসতে পারবে না এবং সরকার সালামও দেবে না। ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দীদের মর্যাদা আদায়ের জন্য বিপ্লবী যতীন দাস তেষট্টি দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করে। ফলে রাজবন্দীদের ফাইলে বসা এবং সরকার সালাম দেওয়ার রীতি সেই সময় থেকেই উঠে গেছে। পাকিস্তানের নতুন শাসকগোষ্ঠী আবার সেটা চালু করতে চাইলেই হবে কেন? হানিফ শেখ তীব্র ভাষায় জেল কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়ে দেয়। তারা আরো বলে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে কোনো অফিসারের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবো সেটা ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু কাউকে সরকারিভাবে সম্মান দেখাতে আমরা বাধ্য নই। ওদের অনমনীয় মনোভাব দেখে অথবা মনে ভিন্ন কোনো চিন্তা রেখে আমিরুদ্দিন ওদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়। হানিফ শেখসহ দশজন দেখা করতে যায়, মফিজুলও ছিলো। ওকে ভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হিসেবে নেওয়া হয়। জেলের এই ঘটনা ওর কাছে এক দারুণ অভিজ্ঞতা, ও নিজেকে একদম মিশিয়ে ফেলে। এঁদের জেলগেটের মুখে দাঁড়িয়ে আমিরুদ্দিন কথা বলতে শুরু করলে ওরা থামিয়ে দেয়। হানিফ শেখ বলে, আগে আমাদের বসার ব্যবস্থা করুন। এখানেও হার মানতে হলো আমিরুদ্দিনকে। ওদের বসার ব্যবস্থা করতে হলো।

প্রথমেই কয়েদিদের দাবি উত্থাপন করা হয়। রেগে যায় আমিরুদ্দিন, ওদের নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা কেন? আপনারা নিজেদের কথা বলুন।

সীতাংশু দৃঢ় ভাষায় বলে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন একটি কথা। আমরা রাজবন্দী। আমরা কখনোই নিজেদের কথা বলি না। আমরা সব মানুষের অধিকারের জন্যই লড়াই করি। আমরা নির্যাতন, নিপীড়ন দেখলেই প্রতিবাদ করি, সেটা যেখানেই ঘটুক না কেন।

আমিরুদ্দিন চুপসে যায়। চুপ করে থাকে। পাশাপাশিভাবে অমূল্য রাজবন্দীদের সমস্যার কথাও বলে। আমিরুদ্দিন গুম হয়ে বসে শোনে, আমি আপনাদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করবো। জানেনই তো ধাপে ধাপে সবকিছু করতে হয়। আপনাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আপনারা অনশন প্রত্যাহার করুন। আমাকে সময় দিন।

এমন একটি গতানুগতিক ব্যবস্থা মেনে নিয়ে রাজন্দীরা ফিরে আসে। কয়েদিরাও অনশন ভেঙে শান্ত হয়ে যায়। জান খাঁ সহ অন্যদের ওপর যে শাস্তি ছিলো তা উঠিয়ে নেওয়া হয়।

কিন্তু আমিরুদ্দিনের নীল নকশা তৈরি করা ছিলো। এত সহজে হার মানার মানুষ সে নয়। মুখে মিষ্টি কথা বলে ব্যাপারটি ধামাচাপা দিলেও যাবার সময় জেল সুপার বিলকে হুকুম দিয়ে যায়, বারো-চৌদ্দজনকে খাপরা ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় দিয়ে দিতে। যথাসময়ে বিল ওদের কয়েকজনকে সে হুকুম জানিয়ে দেয়। খাপরা ওয়ার্ড ছেড়ে ওদেরকে চৌদ্দ নম্বর সেলে যেতে হবে অর্থাৎ কনডেমড সেলে।

এই খবর শুনে ক্রোধে ক্ষোভে থমথমে হয়ে যায় খাপরা ওয়ার্ড।

BanglaBook.org

এদিকে থমথমে হয়ে উঠেছে শহর– সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখোমুখি হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে মানুষ। মতলুব আলী তড়পায়, সেটা দেখতে হয় আলী আহমদকে। মফিজুল ওকে শাসিয়ে যাবার পর থেকে ও আলী আহমদকে সমীহ করে চলে, পেছনে কোনো কথা বললেও সামনে মুখ খোলে না। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আবার নিজের ভেতর শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। একদিন মতলুব আলীকে ডেকে আলী আহমদ মৃদু ভাষায় বলে, অন্যেরটা অন্যায়ভাবে দখল করতে চাইলে নিজেরও অনেক কিছু চলে যায় মতলুব মিয়া। এতবড়ো কাঠের আড়ত। সামান্য একটু কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিলেই দাউদাউ পুড়ে যাবে। ফায়ার ব্রিগেড ডাকবেন? তার আগেই শেষ। আর এটা করার জন্য হিন্দুদের আসতে হবে না। করবে ঐসব ছেলেরা, যারা মিছিল করে, সভা করে। ওরা কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে যে এই শহরে কারো কোনো জানমালের ক্ষতি হতে দেবে না।

সত্যি স্যার শহরটা কম্যুনিস্ট দিয়ে ভরে গেছে। মুসলমানের দেশে এইসব কি সহ্য হয়?

কথা বলতে গিয়ে মতলুব আলীর জিভ বেরিয়ে যায়। আলী আহমদ ওকে বুঝে গেছে। লোকটার গায়ে জোর আছে, কিন্তু বোকা। সেদিনের পর থেকে জুয়ো খেলে না। বলে, সময় কাটানোর জন্য শুধু তাস খেলি।

আলী আহমদের সঙ্গে দেখা হলেই সালাম দেয়। একদিন ওর বাসায় বড় একটা রুই মাছ পাঠিয়েছিলো। পুষ্পিতা রাখতে চায়নি, কিন্তু জোর করে রেখে গেছে। সে মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট খেয়ে প্রদীপ্ত বলেছিলো, বাবা একটা লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বালাবো। তারপর ঐ কাঠের আড়তের সামনে ঘোরাঘুরি করলে মতলুব চাচা রোজ একটা করে মাছ পাঠাবে।

আলী আহমদ ছেলেকে ধমক দেয়, ছিঃ প্রদীপ্ত এভাবে বলতে নেই। মতলুব আলীকে তুমি তো চাচা বলো।

পুষ্পিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, ও আর কখনো এমন বলবে না।

সেই মতলুব আলী আজও আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে কম্যুনিস্টদের একটা গালি দিয়ে দ্রুত অন্যপাশে চলে যায়। ওর ধারণা এই শহরের সব ধরনের ঝামেলার পেছনে আছে কম্যুনিস্টরা। ওরা ভারতের চর।

আলী আহমদ মতলুব আলীর চলে যাওয়া দেখে হাসে। কিন্তু একজন মতলুব আলী বশ মানলে কি আর সবাই মানবে? স্বার্থান্বেষী মানুষ তো ওৎ পেতেই আছে, কোথাও না কোথাও থাবা বসাবে। মদনের কথা মনে হয় ওর। দু'দিন ওর দোকান বন্ধ ছিলো, কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ওর কথা মনে করেই আলী আহমদ সাহেববাজার আসে। আজ দরজা অর্ধেক খোলা। হয়তো মদন চা বানাচ্ছে, দু'একজন খদ্দর এলে আসতেও পারে। মনে মনে আশ্বস্ত হয় আলী আহমদ। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পায় মদনের পাংশু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া গালের এক অংশ। এ কয়দিনে ওর চেহারা একদম বসে গেছে। মদন আর আগের মদন নেই। ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে মুসলিম লীগের পাণ্ডা সাহেব আলী। টাকা-পয়সার হিসেব হচ্ছে? ব্যাপার কী? ওর সঙ্গে তো মদনের কোনোদিন সদ্ভাব ছিলো না? আলী আহমদের মাথার ভেতর বিদ্যুতের চমক খেলে যায়। তবে কি ও মদনকে হাত করে ফেলেছে? না ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করছে? সাহেব আলী ধূর্ত, মদনকে হাজার বার এক হাটে বিক্রি করে আর এক হাট থেকে কিনতে পারবে। ও দরজায় দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকে, মদন?

কে?

BanglaBook.org

চমকে ওঠে মদন। দ্রুত কোমরে গোঁজা ধুতির খুঁট খামচে ধরে। চোখ গোল হয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। মদনের মাথা ঘাড় থেকে ঝুলে আসে।

সাহেব আলী উঁচু গলায় বলে, ভয় পাচ্ছিস কেন? আহমদ স্যার এসেছেন। বোধহয় তোর খোঁজ করতে। ভয় কী? তুই স্যারকে সব খুলে বল। বলে দে যে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছিস। আমার কাছে বাড়ি দোকান সব বেচে দিলি।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আলী আহমদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আলী আহমদ দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকে। টেবিলের ওপর টাকা ছড়িয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মদনের ছেলে সনাতন, ওর বয়স বেশি না, বিশ-বাইশ হবে হয়তো। ও সাহেব আলীর দিকে ঝুঁকে বলে, বাবা তো আপনার কাছে বাড়ি দোকান বেচতে চায়নি। আপনিই তো জোর করে কিনে রাখছেন?

চুপ হারামজাদা। আর একবার কথা বলবি তো দেবো ধড় থেকে মুণ্ডু ফেলে।

সাহেব আলীর রক্তাভ চোখ, ঝাঁকড়া চুল আর পুষ্ট পেশি দেখে ঘাবড়ে যায় সনাতন। যে কথাটা ও না বুঝে বলেছে তার জন্যে মদনও ঘাবড়ে যায়। তাড়াতাড়ি ছেলেকে বলে, তুই ওধারে গিয়ে বস বাবা। আমি দেখছি।

আলী আহমদ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, কী হয়েছে রে মদন? কদিন দোকান খুলিসনি। তোর খোঁজও পেলাম না।

স্যার?

মদন হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

এই চুপ কাঁদিস কেন?

সাহেব আলী তেড়ে ওঠে।

কী হয়েছে সাহেব আলী?

লোকের ভালো করতে নেই স্যার। ভালো করতে গেলেই অপরাধ হয়। একদল গুণ্ডা তো ওকে আর ওর পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। বাড়ি চড়াও হয়ে আগুন দিতে চেয়েছিলো। আমি সময়মতো না পৌছালে তো জ্যান্ত পুড়ে মরতে হতো সবাইকে।

মিথ্যে কথা, কেউ আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে যায়নি।

সনাতন ছুটে আসতে চায়। মদন বাধা দেয়।

আহ্ থাম।

বাধা দিচ্ছ কেন বাবা? সব তো মিছে কথা।

বুঝিস না কেন সেদিন দেয়নি বলে সময় তো ফুরিয়ে যায়নি। আর একদিন দেবে।

না, দেবে না। আমি বলছি দেবে না। এখন তো ঐ বাড়ি সাহেব আলীর হয়েছে। তুমি দস্তখত করেছো, টিপসই দিয়েছো।

নে, টাকা গুনে নে মদন। আমি যাচ্ছি। আমার মেলা কাজ আছে। কেমন বাপ তুই যে এমন একটা শয়তান ছেলে জন্ম দিয়েছিস। আমি মিথ্যে কথা বলি? এত বড়ো সাহস তোর ছেলের যে আমাকে মিথ্যুক বলে।

আহ্ থামো সাহেব আলী। ছেলেমানুষের কথায় রাগতে নেই।

আলী আহমদ ওকে থামিয়ে দেয়। ও বুঝতে পেরেছে যে সাহেব আলী ওর সামনে আর থাকবে না। ওর কাজ হাঁসিল হয়েছে, এখন কেটে পড়বে। তবে ওর সামনে মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হওয়াটা ওর জন্য বিব্রতকর হয়েছে। মদন তর্জনিতে থুতু লাগিয়ে টাকা গুনছে, ময়লা নোট, গায়ে গায়ে লেগে আছে, গুনতে অসুবিধে হচ্ছে ওর।

মদন টাকা গোনা শেষ করে অনেকটা সময় নিয়ে, তারপর মাথা তুলে ঘাড় কাত

BanglaBook.org

করে, অর্থাৎ ঠিক আছে। সাহেব আলী বেশ দাপটের সঙ্গে বলে, তোর গোছগাছ সব শেষ তো? কাল যাচ্ছিস?

মদন চুপ করে থাকে।

সনাতন তেড়া উত্তর দেয়, যাই না যাই আপনার কি? আপনি বাড়ি পেলেই তো হলো?

ছোঁড়াটার মুখটা বড্ড বেড়েছে দেখছি?

সাহেব আলী ওর দিকে তেড়ে এগিয়ে যেতে চাইলে আলী আহমদ বাধা দেয়। হাত টেনে ধরে।

কাজ যখন গুছিয়ে নিয়েছো সাহেব আলী, এখন আর ঝামেলা করে লাভ আছে?

ঝামেলা কীসের? ওর ধড় ফেলে দিলে, ঠ্যাং ভেঙে দিলে কে কী বলবে? এখন তো এসবেরই সময়। আপনি একটু ভালোমানুষি দেখাচ্ছেন স্যার। এত দরদ ভালো নয়। যার যা প্রাপ্য শাস্তি থাকে তা দিতে হয়।

ঠিক আছে সাহেব আলী তুমি এখন যাও। ওর কথায় রাগ করতে নেই। এই বয়সে ছেলেপেলের মাথা একটু গরমই থাকে।

সাহেব আলী দাঁত কিড়িমিড়িয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে মদন, স্যার?

আমি সব বুঝেছি মদন। আমাকে কিছু বলতে হবে না। সাহেব আলী জোর করে তোকে বাড়িছাড়া করলো।

ওর অনেকদিনের নজর ছিলো আমার ওপর। সেই ছেচল্লিশ সাল থেকেই। তখন কিছু করতে পারেনি। তখন আমরা অনেক ছিলাম যে। দেশভাগের সময়ে অনেকেই চলে গেলো। ওরা আমাকেও যেতে বললো। আমি মাটি কামড়ে থেকে গেলাম। এবারও আমি যেতাম না, যদি না সাহেব আলী–

যাবার আগে ওর মাথাটা আমি ফাটিয়ে দেবো বাবা।

আহ্ সনাতন থাম তো।

আলী আহমদ মৃদু ধমক দেয়।

স্যার, সাহেব আলী আমার বাড়ি দোকান জলের দরে কিনে রাখলো।

দেখলাম তো। যা পেয়েছিস এ তো দু'দিনেই ফুস। তারপর কী করবি?

জানি না।

ওখানে কে আছে?

বড়ভাই আছে। থাকলেই বা কি? ও আর আমাকে কি দেখবে?

বলেছিলাম না সংসার জুয়া খেলা।

আলী আহমদের এই কথায় হুঁহু করে কাঁদে মদন, ওর থলথলে শরীর দুলতে থাকে। সনাতন দপদপিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

স্যার আমরা তো যেতে চাই না। আমরা কেন যাবো? এত বাড়িঘর ফেলে রেখে ওখানে গিয়ে আমরা উদ্বাস্তু হবো।

আলী আহমদ চট করে সনাতনকে বলতে পারে না যে এই দেশে দাঙ্গা বাঁধবে এবং সেজন্য ওকে সবসময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোনো সময়ে ওকে মরতে হবে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত এ দেশ। এখানে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য নেই। মানুষের বিচার হয় অন্যভাবে, আরো নানা উপাদান মিলিয়ে। এমন কোনো দেশ কি হয় না যেখানে মানুষই সত্য, অন্য সব উপাদান গৌণ?

স্যার, আপনি কিছু বললেন না যে?

BanglaBook.org

আলী আহমদ সনাতনের ঘাড়ে হাত রাখে। পিঠ চাপড়ে আদর করে দেয়। বলে, সনাতন তোকে আমাকে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখতে হবে যেখানে মানুষের মূল্যই সবচেয়ে বড় থাকবে। অন্য কোনো কিছু এসে আমাদের মনুষ্যত্বকে আড়াল করবে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে সনাতন, এমন দেশ কোথাও হবে না। মানুষের পক্ষে কি স্বর্গ বানানো সম্ভব? ও শুধু বিধাতাই পারবে। আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালাবো– আরেক জায়গা থেকে, আরেক জায়গায়। এখন তো মানুষ আর যাযাবর নেই স্যার। মানুষ কেন শুধু শুধু চাষের জমি খুঁজবে, ঝর্নার জল খুঁজবে?

কথা বলতে বলতে সনাতন দুহাত দিয়ে চোখের জল মোছে। আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খেয়ে ছেলেটি কি বয়স্ক হয়ে গেলো? কী অদ্ভুত কণ্ঠে কথা বলছে? কত গভীর করে। ওর জন্য আমার কাছে কোনো সান্ত্বনা নেই।

সনাতন মদনকে বলে, বাবা চলো। লোক আসবে, আসবাবগুলো বেচতে হবে না? সময় নষ্ট করে লাভ কী? রাতের ট্রেনেই চলে যাবো স্যার। একজন সাহেব আলী বাড়ি নিলো, দোকান নিলো। আর একজন সাহেব আলী এসে কী চাইবে কে জানে? তখন তো জীবনটা ছাড়া আর কিছু দেওয়ার থাকবে না। পালাতে যখন হচ্ছে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। জীবন দেবো না বলেই তো এতকিছু করছি।

আবার হুঁ-হুঁ করে কেঁদে ওঠে সনাতন। আলী আহমদ বুঝতে পারে কী তীব্র বেদনা ওর বুকে, সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সনাতন যা কিছু বলছে অনেকটা অপ্রকৃতস্থের মতো বলছে, ওর দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত, ওর মধ্যে স্বাভাবিকতা নেই। ও অসুস্থ হয়ে যাবে না তো? বরং মদন অনেক স্বাভাবিক, ও ভয়ে কুঁকড়ে আছে, গুটিয়ে গেছে নিজের ভেতর।

তখন বাইরে থেকে একদল ছেলে হল্লা করতে করতে এসে দোকানে ঢুকে পড়ে। আলী আহমদ দরজায় দাঁড়িয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এই তোমরা কী চাও? কেন এসেছো?

তুই কে রে বেটা বিটকিলি?

ষণ্ডা মতো একটি ছেলে এক ধাক্কা দিয়ে আলী আহমদকে সরিয়ে দেয়। ওর মাথা দরজার সঙ্গে ঠুকে যায়। মদন আর সনাতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাকি তিনচারজন ছেলে দোকানের কেটলি, চামচ, চায়ের কাপ, পিরিচ সব বড় একটা চটের ব্যাগে ঢোকাতে থাকে। আলী আহমদ ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলে, তোমরা কার জিনিস নিচ্ছো? দোকান কিন্তু সাহেব আলীর কেনা হয়ে গেছে।

সাহেব আলী?

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় ছেলেগুলো। তারপর তড়িঘড়ি কাজ গুছিয়ে বলে, সাহেব আলী কিনেছে তো কী হয়েছে? সাহেব আলী আমাদের বাপ।

তারপর একদৌড়ে দরজা পেরিয়ে যায়। আলী আহমদের মাথা টনটন করছে, ফুলে উঠেছে। ও খানিকটা পানি ঘষে দেয় ফুলো জায়গায়।

মদন এগিয়ে আসে, বেশি ব্যথা পেয়েছেন?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, তোমাদের চেয়ে বেশি না।

সনাতন উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ওর চোখ লাল হয়ে গেছে– ও শুধু নিরুপায়ভাবে চুপ করে থাকে। চেঁচিয়ে বলে, বাবা চলো, অনেক হয়েছে। তোমার কপাল ভালো যে তোমার ট্যাক থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়নি।

মদন অসহায়ভাবে ছেলের দিকে তাকায়, বয়সকালে আমিও তোর মতন ছিলাম রে সনাতন– রাগী, বদমেজাজি। গুণ্ডামিও কম করিনি। অনেকবারই মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

BanglaBook.org

তবে এখন এমন লাল কুঁচ হয়ে গেলে কেন?

জানি না। দেখতে দেখতে থিতিয়ে গেলাম। এক জীবনে অনেক দেখা হলে মানুষ সইতে পারে না। পিছু হঠে যায়। আমি এখন পিছু হঠার দলে। চল যাই।

আলী আহমদ মনে করে এই দুজন মানুষকে এমন করে দেখা ওর বিরল ভাগ্য। মানুষ তৈরি করতে হলে এমন করে দেখতে হয়, না দেখলে মানুষের আদল নিজের কারখানায় ঠিকমতো তৈরি করা যায় না। তা অসম্পূর্ণ থাকে।

চলো, আমি তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

বাপ-ছেলে কোনো কথা বলে না। নীরবে হাঁটতে থাকে। তিনজনের কারো মুখে কথা নেই। রাস্তা প্রায় ফাঁকা, খুব বিক্ষিপ্তভাবে দু'চারজন হাঁটছে, রিকসা কম, টমটম একদম নেই। আশেপাশের বাড়ির সামনে দু'চারজন তরুণ ছেলে জটলা করছে, ওরা দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে জড়িত। ওদের তাকানো দেখলে বোঝা যায়। আকাশে চিল, তাল গাছের মাথায় ঝিমুচ্ছে শকুন। আলী আহমদ আর মদনকে ফেলে সনাতন অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। মদন আস্তে আস্তে বলে, এই বয়সী ছেলেদের সাহসটা একটু অন্যরকম থাকে না স্যার?

হ্যাঁ, তা থাকে।

মদন জোর দিয়ে বলে, আমিও খুব সাহসী ছিলাম। জমির গণ্ডগোল বাঁধলে দা নিয়ে বাঁইবাঁই ছুটতাম। কারো কথা শুনতাম না। মা পেছন থেকে ডাকতো। কে সে ডাক শোনে। আমার রক্তে তখন প্রলয়ের ডাক।

বাহ্ বেশ সুন্দর করে বললে তো।

কী যে বলেন, আমরা মূর্খ মানুষ। বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আমাকে দিয়ে লেখাপড়া হলো না।

আলী আহমদ বলে, বয়সকালে আমি তোমার মতো সাহসী ছিলাম না মদন। আমার বুকের ভেতর ভয় বেশি।

ভয় নয় স্যার। আসলে আপনার এইসব অন্যায় সহ্য হয় না। লেখাপড়া জানা মানুষ কিনা। আপনারা আমাদের মতো গায়ের জোরের সাহসী না। আপনাদের সাহস অন্যখানে। আপনাদের সাহস থাকে মগজে।

আলী আহমদ চমকে ওঠে মদনের কথায়। কী বলছে ও? ওর কি আজ দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো? নাকি অভিজ্ঞতা মানুষকে এমন পরিপক্ব করে?

এই যে স্যার আপনি আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন কেন? আপনার ভয় করছে না? আপনার ভয় করবে না, আপনি মানুষকে ভালোবাসেন যে। আপনি কলেজে পড়ান, কত সম্মানী, জ্ঞানীগুণী মানুষ। আর আমি? আমি তো একজন চায়ের দোকানদার। তবু আমার জন্য আপনার চিন্তার শেষ নেই।

আহ্ মদন, মদন তুমি মানুষকে খুব ভালো বোঝো। তুমি খুব ভালো বন্ধু হতে পারো।

মদনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আলী আহমদ।

তুমি যাও সব গুছিয়ে নাও। সন্ধ্যায় স্টেশনে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

মদন কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায়। হঠাৎ করে আলী আহমদের পায়ের ধুলো নেয়, তারপর কান্না চাপতে চাপতে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। আলী আহমদ কিছুক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকে। বড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছায়া দিয়ে রেখেছে, দুচারটে পাপড়ি ছড়িয়ে আছে নিচে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে শরীরের ভার ছেড়ে দেয় আলী আহমদ। মনে হয় এই শহরে কিছু ভালো মানুষ ছিলো বলে রক্ত ঝরেনি এই দাঙ্গায়, মানুষ চলে যেতে পারছে

BanglaBook.org

একটি নিরাপদ আশ্রয়ে। আলী আহমদের পা ওঠে না, ওর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে, সত্য করে তুলতে ইচ্ছে করে এই দাঁড়িয়ে থাকা। এখানে দাঁড়িয়ে ও দেখতে থাকবে এই দাঙ্গা কবলিত শহর– মানুষ মানুষের নিধনের জন্য ছুটছে উন্মত্ত উল্লাসে। আলী আহমদ চোখ বোজে, ওর চোখের সামনে দিনের আলো নিভে যায়। চোখ বুজলেই তো অন্ধকার হয়, এখন অন্ধকার চারদিকে।

সন্ধ্যায় স্টেশনে তেমন আলো ছিল না। গিজগিজ করছে মানুষ, সঙ্গে বাক্স-প্যাটরা, পোঁটলা, পুঁটলি, ধাক্কাধাক্কি, চেঁচামেচি– একসঙ্গে এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনেক মানুষ, ঘরবাড়ি উপড়ে নিয়ে। প্লাটফরমে দেখা হয় মদনের সঙ্গে, মদন ওর হাত জড়িয়ে ধরে, কেঁদে ফেলে। সনাতনের মতো ও রাগতে পারে না। একটুক্ষণ স্থিত হয়ে বলে, স্যার আমার বউ আর মা আপনাকে দেখতে চেয়েছে। কামরায় আলো নেই। তাতে কি? কথা তো শুনতে পাবে ওরা।

ট্রেনটা অনেকক্ষণ থেমে আছে। ছাড়ার বেশ দেরি আছে। সনাতন বিকেলের দিকে এসেই জায়গা দখল করেছে। মদনের ছয় ছেলেমেয়ে। কামরার দিকে যেতে যেতে মদন ফিসফিসিয়ে বলে, আমার বউর শরীরটা খারাপ স্যার। ভরা মাস। পথে যে কী হবে বলতে পারি না। মুহূর্তে থমকে দাঁড়ায় আলী আহমদ। অনুচ্চ স্বরে বলে, কী বললি?

বউর বাচ্চা হবে স্যার। সময় খুব কাছে।

তাহলে কয়দিন থেকে গেলেইতো পারতি।

মা এবং বউ কিছুতেই থাকতে রাজি না। ওরা বলে, যা আছে ভাগ্যে তা হবে। এত ভাবনা কি? নদী পেরুনোর আগে নাকি কিছু হবে না। আমার বৌয়ের খুব সাহস। দশটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে ও। এটি এগারো নম্বর।

আলী আহমদ দ্রুত স্মৃতি ওল্টায়, আবার ট্রেন এবং একজন প্রতীকের জন্ম। উহ্!

কী হলো স্যার?

না, কিছু না।

এই যে এটা আমাদের কামরা।

মদন জানালা দিয়ে মাথা ঢোকায়, মা আমার স্যার এসেছে।

আলী আহমদের মনে পড়ে ও দুপুর থেকে মদনকে তুমি বলতে শুরু করেছে। মদনের জন্য ওর শুধু ভালোবাসা নয়, সম্মানও বেড়েছে। মদনের কণ্ঠে কামরা নীরব হয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েগুলো হৈচৈ করছিলো।

বাবা, আমি আমার ছেলের কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি। বাবা, আপনি ওর জন্য যা করেছেন তা ভুলবার নয়। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

অন্ধকার থেকে ভেসে আসা কথাগুলো অদ্ভুত লাগে আলী আহমদের। ওর মনে হয় চোখ বুজলেই কেবল অন্ধকার হয় না, চোখ বুজলে আলো থাকে, আলো কণ্ঠস্বর হয়ে যায়। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি আর কী করেছি, আমি আর কী করতে পারি? এখন আমার কিছু করার খুব ইচ্ছে করছে।

কী করবেন বাবা? আর তো কিছু করার নেই।

আগে যদি জানতাম যে বৌদির সন্তান হবে, তাহলে আরো কয়দিন থেকে যেতে বলতাম।

এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বাবা। ভগবান সহায় হবেন।

আপনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন স্যার।

আর একটি মেয়েলি কণ্ঠ ক্ষীণ স্বরে কথা বলে। আলী আহমদ বুঝতে পারে যে

BanglaBook.org

মদনের বৌ। আলী আহমদ কিছু বলতে পারে না। ছেলেমেয়েগুলো আবার হৈচৈ শুরু করেছে। ওরা বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। কামরায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমন ভ্যাপসা গরম।

কচিকণ্ঠের আবদার, মা জল খাবো।

আহ্ চুপ কর।

এখন জল খেতে নেই দাদুভাই।

আমার এখানে বসে থাকতে ভালোলাগছে না। আমি নিচে আমি?

না, এখন নিচে নামতে হবে না।

আমি তোমাদের স্যারকে দেখবো।

নিচ থেকে মদন ধমক দেয়, বেশি কথা বলে না রতন।

বাবা সজল আমাকে খামচে দিয়েছে।

স্যার চলুন ওধারে যাই। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এলো।

বাবা, কোনোদিন মালদহ এলে আমাদের বাড়ি যেতে ভুলবেন না। ও মদন ঠিকানা দিয়েছিস তো বাবাকে।

দিয়েছি মা।

সনাতন এসে কামরায় ঢোকে। এতক্ষণ ও দুচারজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলো। গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বাজে। সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়ে। মদন গাড়িতে ওঠে।

একসময় প্লাটফরম ফাঁকা হয়ে যায়। অনেকেই হিন্দুদের চলে যাওয়া দেখতে এসেছিলো, শুভাকাঙ্ক্ষী দু'চারজন বিদায় দিতে এসেছিলো। অনেকে খুশি, কারো মন ভারাক্রান্ত। আলী আহমদের মনে হয় ও এদের কারো দলেই পড়ে না, ওর ভেতর বেদনা আছে, হয়তো বা দুঃখবোধও, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা ওর ভেতরে কেবলই প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে, অনেক ধরনের প্রশ্ন। এক ধরনের দার্শনিক বোধ ওকে আক্রান্ত করে রেখেছে, জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলো ওকে তাড়িত করছে। ও ভাবছে এই চলাটা চলা নয়, জীবনের এই পরিণতি নয়, এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। তবে কি আমরা ভুল পৃথিবীর মানুষ? জীবনের উল্টোরথে চেপে বসেছি? বুকের তল থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে আলী আহমদের, হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফরমের নিচে এসে দাঁড়ায়।

সাব, বাদাম খাবেন?

না, বাদাম খাই না।

খান না সাব। আজ বেচাবিক্রি কম। মার হাতে দুইটা টাকা না দিতে পারলে রাতে মার ঘুম আসবে না। চুপচুপ করে কাঁদবে।

কাঁদলে তুই শুনতে পাস?

পাই। মার কান্নায় ঘুম ভেঙে যায়।

দশ বছরের ছেলেটি ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কিছুতেই যেতে দেবে না। এই ছেলেটি মার নিঃশব্দ কান্না শুনতে পায়। ওর তো শুনতে পাওয়ার কথা নয়। এই বয়সে তো গভীর ঘুম আচ্ছন্ন করে রাখবে ওকে।

সাব, নেন সাব।

কত বিক্রি করেছিস?

আটআনা।

ঠিক আছে আমাকে দেড় টাকার বাদাম দে।

দেড় টাকা?

BanglaBook.org

ছেলেটির দু'চোখে বিস্ময়। একমুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ঢোক গিলে বাদাম মাপে।

থাকিস কোথায়?

শিরোইল।

বাপ নাই?

আছে, মানুষ না জাউরা। জুয়া খেলে, তাড়ি খায়।

কয় ভাইবোন?

সাতজন। ঘরে ঘুমের জায়গা হয় না। ঘর তো না কবর। জ্যান্ত মানুষ আমরা কবরে থাকি। সাব মাঝে মাঝে মনে হয় এই ট্রেনে উঠে পালিয়ে যাই। পারি না, কেবল মার কথা মনে হয়।

ঠিক আছে, বাড়ি যা।

আপনি একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন সাব।

তোর সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় যাবো না হয়।

আলী আহমদ ছেলেটিকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে থাকে। হেঁটেই বাড়ি পৌছে যাবে ও। ঠোঙাভরা বাদাম, প্রদীপ্তর জন্য কোনোদিন দু'পয়সার বেশি বাদাম কেনেনি। এত বাদাম দেখে ও খুশি হবে। গলির মোড়ে মতলুব আলী ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, যাক বাঁচা গেলো। শুনলাম অনেকগুলো মালাউন আজ বিদায় নিয়েছে। আপনিও দেখতে গিয়েছিলেন?

দেখতে যাইনি, বিদায় দিতে গিয়েছিলাম।

ওকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আলী আহমদ দ্রুত এগিয়ে যায়। মতলুব আলী খানিকটা অপমানিত বোধ করে। পেছন থেকে শুনতে পায় মতলুব আলীর কণ্ঠস্বর, শালা এমন ভাব করলো যেন আমি একটা খারাপ কথা বলেছি। খুব বাহাদুর হয়েছে। শালা নিজেই সাচ্চা মুসলমান না।

কথাগুলো তীব্রভাবে আলী আহমদের বুকে এসে বেধে। ও গেটের কড়া নাড়ে, সে শব্দ শুনতে পায় নিজের ভেতর। প্রদীপ্ত দৌড়ে এসে গেট খোলে।

বাবা এসেছো?

ও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। শুধু বাদামের ঠোঙ্গাটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। নিজের ঘরে এসে চুপচাপ জানালার কাছে দাঁড়ায়। একটু আগে একটি দশ বছরের ছেলে ওকে ওর বাড়িতে নিতে চেয়েছে, একটু আগে ও আর একজন লোকের কাছে সাচ্চা মুসলমান হতে পারেনি। কোনটি সত্য? মানুষকে ভালোবাসা নাকি মানুষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখা? লেবু ফুলের গন্ধ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আলী আহমদকে খুঁজতে থাকে পুষ্পিতা।

কী ব্যাপার এমন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছো? কী হয়েছে?

আলী আহমদ আকস্মিকভাবে দু'হাতে পুষ্পিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ওর কাঁধে মুখ রেখে বলে, পুষ্পিতা আমার কোনো দেশ নেই।

BanglaBook.org

৬

নাচোল থানার গ্রামগুলোতে তেভাগা চালু করা হয়েছে। কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ। জমিদার রমেন মিত্র তার নিজের পাঁচশ বিঘা জমিতে তেভাগা করে দিয়েছে। ইলা মিত্র ব্যস্ত। কৃষকদের সঙ্ঘটিত করার কাজে তার সাফল্য আশাতীত। সবাই খুশি, ওদের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার। জোতদারদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। পুলিশ ছাড়া তো ওদের কেউ নেই। ওরা পুলিশ ডেকে এনেছে, ওদের টাকা-পয়সা দিচ্ছে। ফলে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে যায় পুলিশের অত্যাচার– বিভিন্নভাবে তারা কৃষকদের নিগৃহীত করছে। গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অকারণে শারীরিক অত্যাচার করছে, বৌ-ঝিদের ওপর ঝামেলা করছে। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে তেতে উঠছে কৃষকরা। ইলা মিত্র ওদের বুঝিয়েছে, এখনই আমরা ওদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়তে যাবো না। আমাদের আরো ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা একটা মহৎ কাজ চালু করেছি। অনেক ভেবেচিন্তে এগুতে হবে।

ভেবেচিন্তেই এগোয় ওরা। সাঁওতাল পাড়ার হাঁড়িয়া খাওয়ার উৎসবে ঢোলের শব্দ নীরব হয়ে গেলে বেজে ওঠে ফটিকলালের বাঁশি। মাতলা সর্দার মহুয়া গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে হাঁড়িয়ার ঝাঁঝালো আমেজের সঙ্গে উপভোগ করে বাঁশি– বাঁশিটা যেন বিশাল ঢোলের মৃদু লয়ের সঙ্গে পৌঁছে যায় কৃষকদের কাছে, সে শব্দে টানটান হয়ে ওঠে ওদের স্নায়ু, বুঝতে পারে ডাক এসেছে, সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক। মাতলার করোটিতে পতপত ওড়ে কৃষক সমিতির লাল পতাকা– বাঁশের মাথায় বেঁধে অনেক উঁচুতে উড়িয়ে দিলে বুঝতে হবে ডাক এসেছে। ওর চেতনায় কখনো খোঁয়ারি হয় না– হরেকও এমন, যতই নেশা করুক, খোঁয়ারিতে আক্রান্ত হয় না, ধাম করে উঠে ছুটতে পারে। ছুটে কোথায় যাবে– চণ্ডিপুর, মল্লিকপুর, গোমস্তাপুর, রামচন্দ্রপুর হাট, গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে– না ওদের সামনে কোনো সীমানা নেই। ওরা মহৎ কাজে নেমেছে– মাতলার ঠোঁটে মৃদু হাসি, রানীমা তাই বলে এবং রানীমা যা বলবে তা ওদের কাছে বেদবাক্য। ওদের কত গভীর করে ভালোবাসে– ভালোবাসা পেলে মানুষ ভালোবাসার কাঙাল হয়। এই তো সেদিন জমিদার রমেন মিত্র রানীমাকে বিয়ে করে নিয়ে এলো, কতইবা বয়স, অথচ কত আপন হয়ে গেছে ওদের। রাতদিন ঘুরে ঘুরে কাজ করে সাঁওতাল পাড়ায়, বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় সমস্যার কথা। ওরাও তো ইলাকে আপন করে নিয়েছে, কতো সহজে ওদের রানীমা বানিয়েছে। রানীমার মতো কতজনের নেতৃত্বেই তো তেভাগা কায়েম হলো। এখন তো ওদের সুখের সময়, ভাবতেই মাতলার মাথায় ফুল ফোটে– পাখি ডাকে, বটের ডালে একঝাঁক হরিয়াল যেন। ফটিকলালের বাঁশি কেঁপে কেঁপে বাতাসে ছড়িয়ে যায়– ফকফকে জ্যোৎস্না ঘরের চালে, মহুয়ার মাথায় আটকে আছে। আকাশে এক টুকরো মেঘও নেই। মাতলার ইচ্ছে করে না ঘরে যেতে। এমন খোলা জায়গা ছেড়ে কেন ঘরে যাবে? ও ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে, বুঝতে পারে ফটিকলালের বাঁশি থেমে গেছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেউ কথাও বলছে না– আশেপাশে যারা শুয়ে আছে তাদের নিশ্বাস ওঠানামা করে– মাতলা সর্দারের গায়ের ওপর দু'একটা মহুয়া ঝরে পড়ে। ভোররাতের দিকে একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় মাতলার, ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়। চিত হয়ে শুয়ে বুকের ওপর হাত রেখে ও প্রভু জিঁয়োকে স্মরণ করে, তবু ভয় কাটে না, জিভ তেতো লাগে। মাতলা উঠে বসে এবং মাথাটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখে, রোদ ওঠেনি, চমৎকার বাতাস, তবু শরীরে ঘাম। ও স্বপ্নটা যেন চোখের সামনে দেখতে পায়– রানীমা একটি ক্ষুদ্র লাল পিঁপড়ে হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ সে পিঁপড়েটিকে পদদলিত করছে, কিন্তু পিঁপড়েটি আবার গুটিগুটি

BanglaBook.org

পায়ে মানুষের পায়ের নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে। এক একটি পা দৈত্যের আকারে রানীমাকে থেঁতলে দেবার জন্য উদ্যত। মাতলার খারাপ লাগতে থাকে। ও ঘাসের ওপর থেকে গামছা কুড়িয়ে নেয়, সেটা কোমরে বাঁধে এবং কোমরে গুঁজে রাখা লাল পট্টিটা মাথায় বাঁধে। লাল পট্টিটা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে ও বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হাঁটতে থাকে রামচন্দ্রপুর হাটের দিকে, অনেকটা পথ, তবু ওকে যেতেই হবে। মেঠো পথের দু'পাশে যতদূর চোখ যায় কেবলই সবুজ ধানের শিষ, মাঝে গ্রামগুলোর প্রান্তরেখা, ঘন গাছপালার আড়ালে সবুজ হয়ে চকমক করে, কিন্তু ঐটুকু বহিরাবরণ, ভেতরটা ফাঁকা, সেখান থেকে নিষ্পেষিত পিঁপড়েরা ফোকর গলিয়ে বেরিয়ে আসছে। মাতলা সর্দার দ্রুত হাঁটে, বাতাসে চুল ওড়ে, লালপট্টির প্রান্ত ঘেঁষে ঝুলে পড়া চুলের গোছায় সুড়সুড়ি লাগে নাকে, গালে– মাতলার মন ভালো হয়ে যায়। স্বপ্নটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, রানীমার জন্য এখন আর কোনো আশঙ্কা নেই। রানীমার জন্য শত শত সাঁওতাল প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে ওরা বল্লম, সড়কি, রামদা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হরেক বলে, রানীমার জন্য ও মরতেও পারে। হরেক যা বলে তা শুধু মুখের কথা নয়, বুকের কথাও। ওর মতো সাহসী ছেলে হয় না। এ গাঁয়ের অনেক জোয়ান ছেলেই সাহসী, কিন্তু ওর জুড়ি মেলা ভার।

সামনে পৌষের ধান কাটার উৎসব আছে। রানীমা বলেছে, এবার সে নিজে ক্ষেতে থাকবে। একমুঠি ধান ভাগ বাটোয়ারা না করে জোতদারের গোলায় উঠবে না। পৌষের ধান কাটা, পৌষের ধান কাটা শব্দগুলো ঠাকুর জিঁয়োর কাছে প্রার্থনা করার মতো মাতলার বুকে বাজতে থাকে। ও ভুলে যায় যে ওকে অনেক দূরে যেতে হবে। ও বুঝতে পারে যে যাওয়াটাই সত্য, এখন ওর কোনো কষ্ট নেই। পথ ওকে কাঁধে তুলে নিয়েছে, ওকে আর হাঁটতে হচ্ছে না। জোড়া তালগাছের নিচে ফজলে গাজীর সঙ্গে দেখা। মাথায় শুকনো কাঠ নিয়ে ঘরে ফিরছে। মাতলা সর্দারকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

সর্দার এমন খুশি হয়ে কোথায় যাচ্ছেন? কোথাও নেমন্তন্ন আছে?

নেমন্তন্ন? মাতলা ভুরু কোঁচকায়। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। নেমন্তন্ন তো একটা আছে। তবে আজ নয়। আর একদিন। বড় একটা উৎসব।

উৎসব?

হ্যাঁ রে, পৌষের ধান কাটার উৎসব।

ফজলে গাজী মাথা থেকে কাঠের বোঝা ধাম করে নিচে ফেলে দিয়ে বলে, সে নেমন্তন্ন তো আমারও আছে। আমিও যাবো।

গাঁয়ের সব কৃষকরা যাবে। আমরা ধান কাটবো।

তারপর ধান ভাগ হবে।

মাড়াই হবে।

নতুন চাল হবে।

নতুন চালের পায়েশ হবে।

আমরা সবাই পায়েশ খাবো।

ফজলে গাজী হি হি করে হাসতে হাসতে বলে, পায়েশের গন্ধে জোতদাররা পাগল হয়ে যাবে।

মাতলা সুর করে বলে, ঠিক বলেছিস জোতদাররা পাগল হবে।

ফজলে গাজী যোগ করে, ওরা তো ক্ষ্যাপা কুকুর হয়েই আছে।

ওদের আমরা বল্লমের মাথায় গেঁথে তুলবো।

হি-হি গেঁথে তুলবো।

BanglaBook.org

ফজলে গাজীর চিকণ কণ্ঠ ছড়িয়ে যায় ধান ক্ষেতের ওপর। তারপর দু'জন দু'দিকে চলে যায়। এভাবেই গ্রামগুলোতে পৌষের ধান কাটার উৎসব আলোচিত হতে থাকে। কৃষকের খুশির শেষ নেই।

আনন্দ নিয়ে ঘরে ফেরে ফজলে গাজী। মাতলার সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ খুব একটা হয় না। যখন দেখা হয় তখন সেটা সবসময়ে আনন্দেরই হয়। লোকটা দারুণ, বোকা ফজলে গাজী এর বেশিকিছু ভাব প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু নিজের হৃদয়কে অস্বীকার করা যায় না। দেখতে পায় সেখানে মাতলার জন্য প্রবল পক্ষপাতিত্ব। উঠোনে ওর মা হাঁসমুরগিগুলোকে কুঁড়ো মাখিয়ে দিচ্ছিলো, ওকে দেখে ফিরে তাকায়। ফজলে গাজী বারান্দায় চুলোর পাশে শুকনো কাঠের বোঝা নামিয়ে রাখে। চুলোয় তখন আগুন নেই। ভাত ফোটানো হয়ে গেছে। ফজলে গাজী বারান্দায় বসে গামছা দিয়ে মুখ মোছে। হাঁসেদের খাওয়া দেখে। চাড়ির গামলায় হাঁসগুলো মুখ ডুবিয়ে কলকলিয়ে খাচ্ছে, খাচ্ছে। এই হাঁসগুলোর জন্যও খুদকুঁড়ো দরকার এবং তেভাগার সংগ্রাম এই হাঁসগুলোর জন্যও। আমি উপার্জন করে না আনতে পারলে ওগুলো খাবে কী? এই দুপুরে, প্রচণ্ড তাতানো দুপুরে ফজলে গাজী এমন একটা কথা চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, মা?

ওর মা চমকে মুখ ফেরায়, কী হয়েছে?

মা, আপনের এই হাঁসগুলোর জন্যও তেভাগা চাই। তেভাগা চাই। পৌষের ধান কাটায় আমাদের নেমন্তন্ন। নিজের হিস্যা বুঝে পেলে কী যে মজা।

ফজলে গাজী গম্ভীরা গানের ঢঙ্গে মাটিতে পা ঠুকে মাজা দোলাতে থাকে।

ওর মা ছেলের কাণ্ড দেখে মুখে আঁচল চাপা দেয়। জোরে হাসতে পারে না। ফজলে গাজী আপন ছন্দে নেচে যায়, নাচ থামে না।

কী যে পাগল ছেলে! অ্যাই থাম, থাম। তোর চাচা দেখলে কী বলবে।

আজ পথে মাতলা সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বুঝেছি, সেজন্যই এত ফূর্তি। রানীমাকে দেখলে না জানি কী করতি।

মা, ভাত খাবো। খিদে পেয়েছে। কী রান্না হয়েছে? বেশি করে পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে মাসকালাইয়ের ডাল রেঁধেছেন তো? আলু আর সজনে ডাঁটার ভাজি?

যা বলে গেছিস তার সব হয়েছে। নেয়ে আয়। বেশি করে পানি ঢাললে শরীরটা জুড়োবে।

মাগো–

ফজলে গাজী মায়ের মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে হয়ে যায়। হঠাৎ করে ওর চোখে আতঙ্ক, ও অন্য ফজলে গাজী হয়ে যায়।

কী হলো? কিছু বলবি?

না, মাথাটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। ঘুরছে। মনে হচ্ছে আমরা, আমরা চড়ুই হয়েছি। জোতদাররা ধান কেটে নিয়ে যাবে, আর আমরা খুঁটে খাবো, খুঁটে খাবো। আমি এখন চড়ুই হয়েছি।

পাগল ছেলে।

ওর মার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। ছেলেটা কথা কম বলে– যখন বলে, দ্রুত বলে। দু'বার তিনবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে। আকস্মিকভাবে সবকিছু ওর সামনে বদলে যায়। ও কোনোকিছু বেশিক্ষণ নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। শেষ বয়সে এই ছেলেটিকে কেন্দ্র করেই ওর দিনগুলো কাটছে। কাটছে কী? কত রাতই তো বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। তবু তো বেঁচে আছে, এই বেঁচে থাকা সত্যি।

BanglaBook.org

মাত্র দু'জন মানুষ বলে সংসারে অভাব নেই, পেটপুরে খেয়ে দিন কাটে, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হয়। এই সঞ্চয়টুকু ফজলের বিয়ের জন্য। যে মেয়েটি ওর সংসারে আসবে তাকে ও সোনার নথ আর নাকফুল গড়িয়ে দেবে। আলী আহমদকে বলে রেখেছে। বিয়ের কথা পাকা হলেই আলী আহমদ শহর থেকে জিনিসদুটো বানিয়ে দেবে। পুষ্পিতা বলেছে ফজলের বৌকে ও একটা শাড়ি কিনে দেবে। নসরুল্লাহ মেয়ে দেখেছে। কিছুদিন ধরে বাড়িতে এসব কথাবার্তাই হয়। ফজলে গাজী কখনো উৎফুল্ল হয়, কখনো চুপচাপ বসে থাকে, কী যেন ভাবে, কী যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওর মা তা বুঝতে পারে না। কেবল একটাই ভয়, বিয়ে করে ছেলেটি যেন পর হয়ে না যায়। বৌটি যেন লক্ষ্মী মেয়ে হয়, যেন গুছিয়ে সংসার করতে পারে। ছেলের সুখ দেখেই মরতে চায় কালো খালা।

ইদানীং ফজলে গাজীর ব্যস্ততা বেড়েছে। ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যায়, কোনোদিন রাত হয়। কেরোসিন না থাকলে কুপি জ্বলে না, চাঁদের আলোয় ভাত খায় ও, ভালোইলাগে। ও তেভাগার গল্প করে– কেমন করে মানুষজন একজোট হয়ে গেছে– রানীমা কেমন অদ্ভুত বক্তৃতা করে– কেমন করে ওদের মনের কথা বলে, এইসব সোজা সরল ফজলে গাজী মাথার মধ্যে গেঁথে নিয়ে ঘরে আসে। বাড়ির লোকজন আগ্রহ নিয়ে এইসব গল্প শোনে। বেশি আগ্রহ নসরুল্লাহর– শুনতে শুনতে সে নিজেও রংপুর-দিনাজপুরে ঘটে যাওয়া তেভাগার গল্প বলে। একসময়ে শোনা, একসময়ে বলা, এই করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরতেই নসরুল্লাহ ওকে ডাকে। হাসনা বেগম ওকে এক পেয়ালা পায়েশ খেতে দেয়। চুলোর আগুন নিভিয়ে ওর মাও নসরুল্লাহর দাওয়ায় এসে বসে। ফজলে গাজীর খিদে পেয়েছিলো, একটানে পায়েশ খেয়ে গামছায় মুখ মোছে।

নসরুল্লাহ কথাটা পাড়ে, তোর জন্য আজ মেয়ে দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ভারি লক্ষ্মী মেয়ে।

ফজলে গাজী চুপ করে থাকে। জানে নসরুল্লাহর পছন্দ হলে ওর মা দ্বিমত করবে না। আর ওর নিজের কিছুই বলার নেই। ঘরে বৌ এলেই ও খুশি। ওর নিজের এখন বড্ড ইচ্ছে করছে ঘরে কেউ আসুক, ওর পাশে থাকুক, দু'জনের মধ্যে সুখদুঃখের কথা হবে। আস্তে আস্তে সংসার বাড়বে, গুটিগুটি পায়ে হাঁটবে কেউ এই উঠোন জুড়ে।

আমার জন্য তোরও একটা ঝামেলা হয়েছে ফজলে।

ঝামেলা?

ফজলে গাজী অনেকটা স্বপ্নভঙ্গের মতো নসরুল্লাহর মুখের দিকে তাকায়। ঝামেলা শব্দটি ওর স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না। ও এখন ঝামেলা চায় না, চায় স্থিতি।

নসরুল্লাহ একমুহূর্ত থেমে বলে, না ঝামেলা তেমন কিছু না। আমার কারণে তোকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না, এই আর কি।

না দিলে আমি বিয়ে করবো না। তবু আপনাকে কেউ কিছু বলুক তা আমি সহ্য করবো না।

না রে পাগল অতদূর কিছু গড়ায়নি। তোর জন্য ভালো মানুষের মেয়ে পেয়েছি। আমাদের করমালি মিয়া, দিতেথুতে কিছু পারবে না। আমি তো জানি বেচারা গরিব মানুষ।

ফজলে গাজী লাফিয়ে ওঠে, থুঃ, শ্বশুরের টাকা কে চায়। আমার দরকার বৌ। বৌ পেলেই হয়। শুধু চাই, যে মেয়ে আসবে সে যেন আমার মাকে সম্মান করে।

কথাগুলো বলে ফজলে গাজী বারান্দা থেকে নেমে যায়। কালো খালা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বলে, আমার হাবা ছেলেটার মনে এত কিছু! ও আল্লাহ আমার ছেলেটার কপালে

BanglaBook.org

সুখ দিও। ভাইজান আপনি বিয়ের কথা পাকাপাকি করেন। তারপর দিনক্ষণ ঠিক হবে। আলী আহমদকে খবর দিতে হবে।

নসরুল্লাহও উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, ও আমাকে অবাক করেছে। ওর কলজেটা যে এমন সমুদ্র তা আমি এতদিনে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুক নিয়ে ঘর ভরাতে চাইবে। লোকে বলে, ও একটা বোকা, হাবা। ও আমার চেয়েও জ্ঞানী ফজলের মা। ওকে আমরা চিনতে পারিনি।

ফজলের মা ছেলের প্রশংসায় বিগলিত হয়ে যায়। তার চোখে জল আসে। হাসনা বেগম বলে, ফজলকে ডাকি। আজ আমরা সবাই একসঙ্গে ভাত খাবো।

ও মা, আমার ভাতের কী হবে!

কালো খালার আপত্তি টেকে না। হাসনা বেগম হাত চেপে ধরে বলে, আপনার ভাত কাল সকালে খাবেন।

ফজলে গাজী দু'হাতে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে আসে, বলে সব সমস্যার সমাধান করে দিলাম। এখন সব ভাত আমরা মিলেমিশেই খাই। বেশি থাকলে কাল সকালে হাঁসের ডিম ভেজে পান্তা খাবো।

বারান্দায় গোল হয়ে বসে ওরা। মাঝখানে কুপি জ্বলে। হাসনা বেগম ইলিশ মাছের বড় টুকরো ফজলে গাজীর পাতে তুলে দেয়। ও খুশি হয়। খেতে ওর ভালোলাগে। পৌষের ধান উঠলে ও এবার নবান্ন উৎসব করবে। উৎসবের পরে ঘরে বৌ আসবে। বৌ ওকে এমন করে ইলিশ মাছের টুকরো পাতে তুলে দেবে।

রানীমা দিন ঠিক করে দিয়েছে। আজ ধান কাটা হবে। চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ছেলেরা প্রস্তুত, প্রত্যেকের মাথায় লাল পট্টি বাঁধা, প্রত্যেকের হাতে কাস্তে, বেশ উৎসবের আয়োজন। কখনো কখনো থেমে থেমে স্লোগান দিচ্ছে কৃষকরা। ইলা দাঁড়িয়ে তদারক করছে। রহমান অন্য এলাকায় গেছে। কচকচিয়ে ধান কাটা হচ্ছে, আঁটি বাঁধা হচ্ছে। সাদা কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। ধানের শিষের ওপর থেকে টুপটাপ শিশির ঝরে, ভিজে যায় কৃষকের পা। এইসব দৃশ্য দেখে ইলার বুক ভরে যায়– ও মানুষকে এক করতে পেরেছে, মানুষের অধিকার আদায়ের পথ তৈরি করতে পেরেছে– এর চেয়ে বড় আর কিছু ওর চাওয়ার নেই। তখন চারদিক থেকে গোল ওঠে, দারোগা আসছে, দারোগা আসছে। নাচোল থানার তফিজউদ্দীন দারোগা গরুর গাড়িতে চেপে আসছে, পেছনে পেছনে হেঁটে আসছে তিনজন পুলিশ। ইলা বুঝলো, জোতদাররা থানায় খবর দিয়েছে। দারোগা নিজেই চলে এসেছে।

হরেক দৌড়ে আসে ওর কাছে, রানীমা পুলিশের অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। আর নয়।

হাঙ্গামা করিস না হরেক।

হাঙ্গামা নয় রানীমা। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। পুলিশের চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে হাঁড়িয়া উৎসবে বাজানো হবে।

পাগলামি করিস না হরেক। এখন পাগলামির সময় নয়। আগে আমাদের কাজ উদ্ধার হোক।

তখন দারোগা মাঠের কিছু দূরে গরুর গাড়ি থেকে নামলে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ছেলেরা দারোগার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। ওদের চিৎকার শুনে দৌড়ে চলে যায় হরেক।

BanglaBook.org

ইলা মিত্র অনেক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় এই ছেলেদের বশে আনা এখন কঠিন হবে।

পুলিশের নির্মম অত্যাচার কম বেশি সব পরিবারের গায়েই লেগেছে। ওরা আজ দারোগাকে বানিয়েই ছাড়বে।

দৌড়ে আসে অন্য ছেলেরা, রানীমা ক্যাম্পে চলে যান।

আমরা এদিকটা সামলাবো।

তা হয় না। তোমাদের রেখে আমি যাবো না। তোমরা তালগাছের মাথায় লাল পতাকা উড়িয়ে দাও। সবাইকে জানিয়ে দাও যে প্রস্তুত হয়ে আসতে।

আমরা যাই। দারোগা ঘাসুরা প্রাইমারি স্কুলে গেছে। ওখানে ফালু আর বাদানকে আটক করেছে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ছেলেরা লাঠিসোটা, বল্লম, সড়কি হাতে দৌড়ে চলে যায়। দারোগার আগমনের খবর প্রবল উত্তেজনায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, ওরা মাত্র চারজন, আমরা অনেক, আজ প্রতিশোধ নেবো। ওদের জুলুম সয়েছি।

চারদিক থেকে ঘেরাও হতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তফিজউদ্দীন দারোগা। এই অপ্রত্যাশিত রণসজ্জা অসহ্য, অকল্পনীয়। চিৎকার করতে থাকে দারোগা, সঙ্গে সঙ্গে দোলে তার ভুঁড়ি, চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে, উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে থুতু ছিটোয়, তর্জনি উঁচিয়ে রাখে– কখনো তোতলানি এসে যায়। তবু চিৎকার থামে না, তোমাদের এত সাহস যে তোমরা আমাকে আক্রমণ করতে এসেছো? তোমরা রাষ্ট্রের দুশমন, ভারতের দালাল। তোমরা চাও আমাদের নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে, আমাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট করতে। তোমরা নষ্ট ক্ষত, স্বেচ্ছাচারী, নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছো। তোমাদেরকে পায়ের নিচে পিষে মারলে তবে উচিত শাস্তি দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও, নইলে পরিণাম খারাপ হবে। তোমাদের লজ্জা করে না অন্যের জমির ধান কেটে নিতে?

চেঁচিয়ে ওঠে হরেক, খবরদার আর একটা কথাও বলবে না। এতক্ষণ যা বলেছো তার জন্য তোমার জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিলো। তোমার পুলিশ বাহিনী আমাদের ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, আমরা সহ্য করেছি। তোমাদের জানা উচিত যে আমরা অন্যের জমির ধান কাটি না। আমরা জোতদারদের জুলুমের প্রতিবাদ করছি। নিজেদের হিস্যা বুঝে নিচ্ছি। জোতদারদের ভাগ দিয়ে দিচ্ছি।

তফিজউদ্দিন দারোগা সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, চুপ কর কুকুরের দল।

সাঁওতালদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, খবরদার।

ফজলে গাজী চেঁচিয়ে বলে, এটা এখন আমাদের এলাকা। রানীমা আমাদের জন্য আইন করে দিয়েছেন। তোমরাই দেশের শত্রু। তোমরা আমাদের রক্ত শুষে খাও।

তফিজউদ্দিন কনস্টেবলদের ধমকে ওঠে, ওদের বাঁধো। থানায় নিয়ে চলো। ওদেরকে জ্যান্ত রেখে শেয়াল দিয়ে খাওয়াবো।

কনস্টেবলরা ওদের দিকে এগোতেই হাজার কণ্ঠে গর্জন, সাবধান! খবরদার!

হরেক চেঁচিয়ে বলে, কোথায় তোমাদের পা-চাটা জোতদাররা? ওদের ডাকো তোমাদের বাঁচাবার জন্য?

শুয়োরের বাচ্চারা, বেজন্মা, কুকুর। ছোটোলোকের বেশি বাড় বেড়েছে।

দারোগার কথা শেষ হতে না হতেই হাজার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, মুখ সামলে কথা বলো

BanglaBook.org

দারোগা। লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে সাঁওতালরা, কাছে, আরো কাছে। দিগবিদিক শূন্য হয়ে যায় দারোগার মাথা, চোখের সামনের মানুষগুলো বুনো বরাহের পাল, মাটি ফুঁড়ে ছুটে আসছে। ওদের আসা রোধ করতে হবে। মরিয়া হয়ে গুলি চালায় তফিজউদ্দিন। মুহূর্তে পড়ে যায় একজন কৃষক।

দিগন্ত তোলপাড় করে স্লোগান ওঠে। তারপর ক্ষিপ্ত মানুষের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর। কেড়ে নেয় অস্ত্র এবং থেঁতলে ফেলে চারজনকে। পিপীলিকার মতো পিষ্ট হয় ওরা। যতক্ষণ না ওরা একদম নিস্তব্ধ হয়ে যায় ততক্ষণ গণ-পিটুনি থামে না। তারপর ওদের শরীরের ওপর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয় থুতু।

একসময় ফজলে গাজী বলে, জালিমদের যোগ্য শাস্তি হয়েছে। পুঁতে ফেলো ওদের মাটির নিচে।

হরেকও এই মতে সায় দেয়। হাজার কণ্ঠও গর্জে ওঠে, পুঁতে ফেলো শকুনদের- রক্তচোষা বাদুরদের। তারপর ওদের পুঁতে ফেলে যে যার ঘরে ফেরে। ঘরে ফেরা হয় না ফজলে গাজীর। হরেক ওর হাত চেপে ধরে বলে, চল আজ আমরা দু'জনে ক্যাম্পে থাকবো। পরিস্থিতি কী হবে কে জানে। যে ধান কাটা হয়েছে তা তো গোলায় ওঠাতে হবে। জোতদারদের বাড়িতে পাঠাতে হবে। কত কাজ! এখন কী ঘরে ফেরার সময় আছে?

ফজলে গাজী হাসে। দু'জনে গল্প করতে করতে মাঠ পেরিয়ে, ক্ষেত পেরিয়ে ক্যাম্পে আসে। ইলা উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। মাতলা সর্দার নেই, অন্য কাজে গেছে। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। সবার জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। চাল-ডালের সঙ্গে আলু এবং মিষ্টিকুমড়া দেওয়া হয়েছে। ইলা আজ নিজ হাতে ওদের খাবার পরিবেশন করবে। যেটুকু ধান কাটা হয়েছে তা ক্যাম্পে এনে বোঝাই করা হয়েছে। কাল আবার নাকি ধান কাটা হবে। এত ঘটনার পর আজ বিশ্রাম।

রাত্রে ঘুমুতে পারে না ইলা। ছেলেরা যা করেছে তার জন্য ওর কোনো সায় ছিলো না। তবু দারোগা ও পুলিশ হত্যার ঘটনাটি ঘটে গেছে। সবটাই ঘটেছে ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে। কিন্তু এখন? এখন কী হবে? পুলিশ কী সহজে ছাড়বে? যদি না ছাড়ে কী ওদের করণীয়? ভেবে কিছু কুলিয়ে উঠতে পারে না। কতটা কী হবে সেটাও ধারণার বাইরে। ইলা ঘরে পায়চারি করে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসে- পৌষের হিম শরীর জাপটে ধরে- কাঁচা ধানের সোঁদা গন্ধ ফুসফুস পর্যন্ত পৌছে যায়। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে- ওদের হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, ইলার মাথা ঝিমঝিম করে, ও খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে বসে পড়ে।

ঘুম নেই ফজলে গাজীর মায়ের চোখে। দু'দিন ধরে ছেলেটা ঘরে ফিরছে না। দারোগা হত্যার খবর পেয়ে নসরুল্লাহ ফজলে গাজীর খবরের জন্য গেছে। এদিকে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। আলী আহমদকে আনার জন্য তরীকুল রাজশাহী গেছে। হয়তো কালকেই এসে যাবে। সোনার নথ, নাকফুল পরিয়ে বৌ আনবে ঘরে। আনন্দে-আশঙ্কায় কালো খালার বুকের ভেতর উথালপাতাল করে। জীবন আবার নতুন করে শুরু হবে- ঘরে নতুন মানুষ, নতুন করে হাসিগান বয়ে যাবে। দূর থেকে খেঁকশিয়ালের ডাক ভেসে আসে। শেয়ালগুলো বড্ড উৎপাত করে- যখন তখন হানা দেয় হাঁসমুরগির খোপে, ফাঁক পেলে মুখে নিয়ে দৌড় মারে- ছেঁড়া পালক কুড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসায় কালো খালা। ওপাশের ঘর থেকে হাসনা বেগম উঠে আসে, উঠোনে নামে।

রহিমা বু জেগে আছেন যে?

ঘুম তো আসে না। ছেলেটা ঘরে ফিরলো না। কোনো হাঙ্গামায় পড়লো না তো?

BanglaBook.org

না, না কী যে সব ভাবছেন। তরীকুলের বাপ গেছে। ঠিকই ওকে ধরে নিয়ে আসবে। আপনার ছেলে তেভাগার জন্য মেতে উঠেছে। শোনেন না, বলে, হাঁসের কুঁড়োর জন্যও তেভাগা চাই। যান শুয়ে পড়েন। আপনার পায়ের নিচে তো আবার সরষে। সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ। রাতেও জাগলে শরীর খারাপ করবে।

কালো খালা দু'কান ভরে হাসনা বেগমের কথা শোনে। কেমন গলগলিয়ে কথা বলে যাচ্ছে, শুনতে ভালোলাগছে, ছোটোবেলায় ওর মা এমন করে কথা বলতো, একটানা কতদিন পর আজ এই চাঁদনি রাতে ওর উঠোনে মা এসে দাঁড়িয়েছে, কালো খালার চোখ ছাপিয়ে জল আসে। ছেলের জন্য বুকের ভেতর হু-হু করে শব্দ ওঠে, নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

পরদিন দুপুর নাগাদ নসরুল্লাহ ফিরে আসে একা, বিধ্বস্ত-উদভ্রান্ত। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা, যেন এক রাতে বয়স বেড়ে গেছে অনেক। কারো সঙ্গে কথা না বলে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। বিছানায় শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে। আর্তনাদের মতো কালো খালার কণ্ঠস্বর, আমার ফজু কৈ? আমার ফজলে? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়ে না। হাসনা বেগমও বারবার জিজ্ঞেস করে, কী হলো তোমার? খবর কী? কিছু বলছো না কেন? তবু নড়ে না, বালিশ থেকে মাথাও ওঠায় না। জ্বর এসেছে নাকি? হাসনা বেগম কপালে হাত রাখে, না মাথা তো ঠাণ্ডাই দেখছি। গোসলের পানি দেবো? ভাত খাবে না?

পরে, এখন আমাকে একা থাকতে দাও।

কালো খালা নিজের ঘরের বারান্দায় বসে গুনগুনিয়ে কাঁদতে থাকে। হাসনা বেগম তার ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ, উদাস। পুরো বাড়িতে শোকের ছায়া থমথম করে। রাখাল গরু নিয়ে ফিরেছে। চাঁড়িতে খৈল, ভুষি দিয়েছে, গরুগুলো আজ আর ঝাঁপিয়ে পড়ে খায় না। প্রবল অনীহায় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে। নসরুল্লাহ মুখ না খোলায় পুরো বাড়ি থমথমে হয়ে আছে। কালো খালা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে একবার হাসনা বেগমের দাওয়ায় যায়, আবার নিজের দাওয়ায় ফিরে আসে। একটুপর বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়, পায়ে হাঁটা পথটায় শুকনো পাতা বিছিয়ে আছে, দু'পাশের ঘাস আরো লম্বা হয়েছে। কালো খালা সরু রাস্তার মাথায় আসে, চারদিকে তাকায়– পথেঘাটে লোকজন নেই– চারদিক শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। ওর বুক মুচড়ে ওঠে, একজন মানুষ পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বেড়ে যায়, কেউ যদি বলে যেতো ফজলে গাজীর খবর, যদি বলে যেতো ও ধানের বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরছে? ওকে দেখা গেছে পথের মোড়ে? কিন্তু কেউ তো নেই কে ওকে খবর দেবে? ও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ফিরে আসে বাড়ির ভেতর– ও আর সহ্য করতে পারছে না– ও নসরুল্লাহকে টেনে তুলবে বিছানা থেকে, বলতে হবে যে কি হয়েছে? কিন্তু উঠোনে ঢুকে ও থমকে দাঁড়ায়। নসরুল্লাহ বারান্দায় এসে বসেছে, যেন একজন শোকার্ত মানুষ, ওর সর্বস্ব গেছে, কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কালো খালা বারান্দার ওপর ধড়াম করে বসে পড়ে, বলো কী হয়েছে? বলতেই হবে?

কী হয়েছে? শুনতে চান কী হয়েছে? বিড়বিড় ধ্বনি থেকে উচ্চকিত হয় নসরুল্লাহর কণ্ঠ, পুড়ে যাচ্ছে গ্রামগুলো। গুলির মুখে মরে যাচ্ছে মানুষ।

কী বললে? চিৎকার করে ওঠে কালো খালা। আমার ফজু, আমার ফজলে কোথায়?

জানি না। ঐ পর্যন্ত আমি যেতেই পারিনি। মানুষজন যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। মিলিটারি এসেছে গ্রামে। দারোগা হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে। আহারে সোনার গ্রামগুলো ছারখার হয়ে গেলো।

বিস্ফারিত চোখে নসরুল্লাহর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কালো খালা। যেন ঐ মুখটা পুড়ে যাওয়া গ্রাম হয়ে গেছে, সেই গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে। কোথায় যাবে ওরা?

BanglaBook.org

কতদূর? যাবার তো জায়গা নেই। হত্যার প্রতিশোধ হলে এদেরকে খুঁজে খুঁজে মারবে। নসরুল্লাহ বলে, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। আর একটু হলে ওদের সামনে পড়ে যেতাম।

তুমি বেঁচে গেছো, না? ওরা তাহলে ধান ওঠাতে পারেনি। ওরা মাথায় উঠিয়েছে ধান-পোড়া ছাই। আমার ছেলে আমার জন্য ছাই নিয়ে ঘরে ফিরবে।

কেমন ধীর, শান্তভাবে কথা বলে কালো খালা। তারপর স্থির পায়ে উঠে চলে যায়। নসরুল্লাহ কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। ওর চোখের সামনে তেভাগা আন্দোলন ওলোটপালোট খায়। কিছুদিন আগেও ইলার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কত দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলো ইলা। বলেছে, দেখবেন আমাদের জয় হবেই। কেউ আমাদের পিছু হঠাতে পারবে না। কিন্তু কী নির্মম পরিহাস। এখন ওদের পালাতে হচ্ছে। তেভাগাকে সফল করেছিলো এই এলাকার মানুষ, কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না। গত কয়েক মাস ধরে কী প্রবল উত্তেজনা বয়ে গেছে গ্রামের মানুষের মধ্যে, কী গভীর প্রত্যয় ছিলো সকলের চোখেমুখে। ইলা নিজেও কী ভেবেছিলো এভাবে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে? কোথায় এখন ওরা? গুলির সামনে থেকে কতদূরে পালাতে পেরেছে? কতদূর? নাচোল থানার তেভাগা আন্দোলন দমন করতে পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনী তলব করেছে। নসরুল্লাহর বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস ঝরে। জানে, প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে ধরে নিয়ে আসবে সেনাবাহিনীর লোকেরা।

সন্ধ্যার আগে রাজশাহী থেকে আলী আহমদ আর তরীকুল আসে। ওরা ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত। ট্রেনের মধ্যে লোকের মুখে মুখে খবরটা শুনেছে, সবাই আতঙ্কিত– ভয়ে চুপসে আছে। কেবল আলী আহমদ আর তরীকুল চেঁচিয়ে কথা বলে, এ কেমন সরকার? জুলুমও করবে আবার সেনাবাহিনী পাঠাবে? আলী আহমদও চেঁচিয়ে বলে, পাঠাইবেই তো? ওরা কি জনগণের সরকার? ওরা আমাদের কেউ না। ওরা প্রভু, আমরা ক্রীতদাস।

তরীকুল বিষণ্ন হয়ে যায়, আমরা কি এতই নেমে গেছি আহমদ ভাই।

পরিস্থিতি দেখে বুঝতে পারো না।

বাড়ির থমথমে পরিবেশ দেখে তরীকুল ফিসফিসিয়ে বলে, ফজলে ভাইর কিছু হয়নি তো?

আহ্ চুপ। হাসিখুশি থাক।

তরীকুল মা, মা বলে ডাকতে ডাকতে বারান্দায় ওঠে। নসরুল্লাহ ঘরে শুয়েছিলো, হাসনা বেগম রান্নাঘরে। দু'জনে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।

কী রে কোনো খবর আছে? খোঁজ পেলি ফজলে গাজীর?

দু'জনেই বোঝে ওদেরকে একটা ভুল প্রশ্ন করা হয়েছে। ওরা কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে কালো খালা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আসে, আমার ফজু? ফজলে কৈ?

আলী আহমদ দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে কালো খালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কাঁদছেন কেন খালা? কী হয়েছে? ফজলে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। সময়মতো বাড়ি ফিরবে। আমি তো ওর বৌর জন্য নথ আর নাকফুল গড়তে দিয়েছি। পুষ্পিতা ডিজাইন পছন্দ করে দিয়েছে। খুব সুন্দর ডিজাইন।

তুমি আমার ফজলেকে খুঁজে দাও। আমার ফজলে–

আমি আর তরীকুল কাল সকালে ফজলেকে খুঁজতে যাবো। আপনি শান্ত হন খালা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। মুড়ি আছে ঘরে? মুড়ি আর হাঁসের ডিম ভেজে দিন।

হাতমুখ ধুয়ে নাও বাবা। আমি এক্ষুণি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ফজলের বিয়ে। আমি কতো কী বানিয়েছি। তিলের নাড়ু, খাজা, চন্দ্রপুলি পিঠে, নারকেলের বরফি। আমার কি এখন দম ফেলার সময় আছে।

BanglaBook.org

বলতে বলতে কালো খালা রান্নাঘরের দাওয়ায় ওঠে। ঘর থেকে মাটির হাঁড়িগুলো বের করে আনে। ওদের সামনে রাখে। ডালা ভর্তি মুড়ি দেয়।

তোমরা খেতে থাকো। আমি ডিম ভেজে আনছি।

হাত গুটিয়ে বসে থাকে আলী আহমদ আর তরীকুল। কারো গলা দিয়ে খাওয়া নামে না, যদিও পেটে খিদে। ওরা দেখতে পায় কালো খালা কাঁচা মরিচ কাটে, পেঁয়াজ কাটে, ডিম গোলায়। কড়াইয়ে তেল ঢালে, ছ্যাঁৎ করে ওঠে গোলানো ডিম। কাঠের আগুন হঠাৎ করে দাউদাউ জ্বলে ওঠে। সে আগুনের দিকে তাকিয়ে নিভে যেতে থাকে আলী আহমদের চোখের সামনের আলো। কালো খালার শরীরটা একটা বিরাট গুহা, ওখানে অন্ধকার জমাট হতে থাকে।

পরদিন দু'জনে বেরিয়ে যায় ফজলে গাজীর খোঁজে। নসরুল্লাহ অনেকক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করে উদ্দেশ্যহীনভাবে, খবরের আশায় স্টেশনের দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হয় না। দৌড়াতে দৌড়াতে মতিউর আসছে, নসরুল্লাহ রাস্তার পাশে দাঁড়ায়, মতিউর ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে। বলে, খুব খারাপ খবর মাস্টার সাহেব। কয়েকশ সাঁওতালসহ ইলা মিত্র মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছে।

ধরা পড়েছে?

নসরুল্লাহর অস্ফুট আর্তনাদ মতিউরের কানে যায় না। ও নিজের মতো করে কথা বলতে থাকে, জানেন সাঁওতালরা পথ ভুলে এ পথে এসে পড়েছিলো। পড়বি তো পড় একদম মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে। উঃ মাগো! আর যাবে কোথায়? মিলিটারি ওদের ঘেরাও করে ফেলে। রানীমা সাঁওতাল মেয়েদের পোশাক পরেছিলো, আর ওদের ভাষা তো অনর্গল বলতেই পারে। চেনার কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু ধরিয়ে দিলো–

মতিউর দম নেয়।

কে, কে ধরিয়ে দিলো? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করে নসরুল্লাহ।

মতিউর বড় করে শ্বাস নিয়ে বলে, জলিল। ওয়াজেদ মণ্ডলের ছেলে জলিল।

দাঁত কিড়মিড় করে মতিউর।

নসরুল্লাহ হতাশ ভঙ্গিতে বলে, যেই ধরিয়ে দিক, ধরা যে পড়েছে এটাই সত্যি। এখন উপায়? রানীমাকে শনাক্ত করার জন্য অনেক লোককে দেখানো হয়েছে। মিলিটারিগুলোর কী বীভৎস চেহারা! দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে।

যাদের দিয়ে শনাক্ত করানো হচ্ছে তারা কি ইলাকে চিনিয়ে দিচ্ছে?

তা আমি বলতে পারবো না। আমি তো ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ওরা একটা তাণ্ডব কাণ্ড ঘটিয়েছে। যাই।

মতিউর ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে যায়। নসরুল্লাহ ভীষণ বিপন্ন বোধ করে। ও কী করবে? ওর কি করা উচিত? মনে হয় ফজলে গাজীর কথা। ফজলে কি ইলার দলে আছে? তাহলে তো ও ধরা পড়েছে। নসরুল্লাহর শরীর শিরশির করে ওঠে। দ্রুত রোহনপুরের দিকে হাঁটতে থাকে। ঐ পুরো দলটাকে ওর দেখা দরকার– দেখা দরকার ইলাকেও, যে ইলা দেখা হলেই বলে, মাস্টার সাহেব আপনি দারুণ লোক। আপনার কথা অনেকের কাছে শুনেছি। আপনি যদি এভাবে মানুষের সংস্কারের বেড়িটা ভেঙে দিতে পারেন তাহলে সেটা হবে এই সমাজের সবচেয়ে বড় লাভ।

ইলার কথাগুলো নসরুল্লাহর দু'কান ভরে বাজতে থাকে। এত সাহসী মেয়ে ও আর দেখেনি। ইলা ওর জীবনে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। এখন কী হবে? মিলিটারি তো ওকে ছাড়বে না। নসরুল্লাহর ভয়ে হাঁটু কাঁপে। দ্রুত হাঁটতে গিয়েও পারে না। পায়ের গতি শ্লথ

BanglaBook.org

হয়ে যায়। বেশ খানিকটা যাবার পর দেখতে পায় একজন কনস্টেবল সাইকেলে চেপে আসছে। ওকে দেখে সাইকেল থেকে নামে।

আপনার কাছে যাচ্ছিলাম মাস্টার সাহেব?

আমার কাছে? কেন?

আপনি তো এই এলাকার একজন বিপ্লবী মানুষ। সবাই ধরে নিয়েছে যে কম্যুনিস্ট ইলা মিত্রের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আপনি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন।

আমি যাকেই চিনি বা না চিনি, তাতে আপনাদের কী?

আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে?

মানে?

বেশি কথা বলতে পারবো না। চলুন।

নসরুল্লাহ আর কথা বলে না। যেভাবে হাঁটছিলো সেভাবে হাঁটতে থাকে। পুলিশ কনস্টেবল কখনো সাইকেলে চাপে, কখনো ওর পাশে পাশে হাঁটে। ওকে ছেড়ে সাইকেল নিয়ে সাঁ করে চলে যেতে পারে না। হাসপাশ করে, গাছের নিচে দাঁড়ায়। ওর আচরণ নসরুল্লাহর মজাই লাগে, কিন্তু কথা বলে না। ওর রাগ হয়, রাগ বাড়তে থাকে, একই সঙ্গে কৌতূহলও আছে। কেন ওর তলব পড়েছে তা কিছুটা আঁচ করতে পারে। ও মনে মনে ঠিক করে নেয় যে ইলাকে ও কোনোদিনই দেখেনি। একবার ভাবে না গেলে কী হয়? কেন ওকে যেতে হবে? ভেবে ও দাঁড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ কনস্টেবল চোখ বড় করে তাকায়, কী হলো দাঁড়ালেন যে?

আমি যাবো না।

যাবেন না? না গেলে বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। তাও যদি না যান তাহলে গরুর মতো গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবো।

নসরুল্লাহ তীব্র চোখে লোকটির দিকে তাকায়, তারপর হাঁটতে শুরু করে। এই লোকটির সঙ্গে কথা বলাই উচিত হয়নি। মাথার ওপর প্রখর রোদ, হাঁটতে কষ্ট হয়, মেজাজও খারাপ হয়ে যায় নসরুল্লাহর। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওর মাথা চক্কর দিতে থাকে। কয়েকশ সাঁওতাল গাদাগাদি করে বসে আছে, এক কোণে ইলা মিত্র, লোকজন দিয়ে ওকে শনাক্ত করা হচ্ছে। নসরুল্লাহকে দেখে উল্লসিত হয় থানার অফিসার এবং স্থানীয় জোতদাররা। খুশি হয়ে অনেকে আগ বাড়িয়ে ডাকে, এই যে আসুন মাস্টার সাহেব। নসরুল্লাহ দুপা এগিয়ে চুপচাপ দাঁড়ায়। দেখুন তো এই সাঁওতাল মেয়েলোকটাকে চেনেন কি না?

না, চিনি না।

নসরুল্লাহর চোখের পাতা নড়ে না। ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন অদ্ভুতভাবে সাঁওতাল রমণী হয়ে গেছে ও, বোঝার উপায় নেই। খুব কাছের কেউ বলে না দিলে এই উর্দুভাষী সৈনিকগুলো জানবে কী করে?

একে আপনি দেখেননি?

কখনো না।

ভালো করে দেখুন। সাঁওতাল মেয়েলোকের পোশাক পরে থাকলেও এ কিন্তু সাঁওতাল মেয়েলোক নয়।

আমি ভালো করে দেখেছি।

থানার ছোট দারোগা রেগে ওঠে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

নসরুল্লাহ চুপ করে থাকে।

কথা বলছেন না যে?

BanglaBook.org

আমি আর একটি কথাও বলতে চাই না। আমার যা বলার তা আমি বলে দিয়েছি।

বুঝতে পারছি আপনি একে চেনার পরও মুখ খুলবেন না।

নসরুল্লাহ মুখ ঘুরিয়ে রাখে। শুনতে পায় ছোটো দারোগা দাঁত কিড়মিড় করছে। বলে, ঠিক আছে আমিও দেখবো কত ধানে কত চাল।

কিছুক্ষণ পর গরু-ছাগলের মতো লাঠি-পেটা করে ওদের নিয়ে যাওয়া হয় নাচোল থানার দিকে, যে থানায় তফিজউদ্দীন দারোগার প্রেতাত্মা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নসরুল্লাহ ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অসহায় বোধ করে। একজন বিপন্ন মানুষের যন্ত্রণায় ও নিজেকে দগ্ধ করে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। খুব খিদে পেয়েছে। মুদির দোকান থেকে দু'পয়সার মুড়ি কিনে খায়। পথে পথে ঘুরে বাড়ি ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায় নসরুল্লাহর। ওর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে আলী আহমদ আর তরীকুল। দু'জনে ওকে খোঁজার জন্য এগোয়। দূর থেকে ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে তরীকুল, বাবা।

চিৎকারটা আর্তনাদের মতো ওর কানে লাগে। ওর বুক কেঁপে ওঠে। দ্রুত হেঁটে ওদের কাছে আসে।

কী হয়েছে?

তরীকুল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আলী আহমদ ধীরেসুস্থে বলে, ফজলে গাজীকে পাওয়া গেছে।

পাওয়া গেছে? কোথায় ও?

ফণিমনসার কাঁটায় গেঁথে আছে। পিঠ ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে।

ওহ্, মাগো! ওর মা জানে?

না, বলিনি। আপনি ছাড়া আর কে বলবে? আমি বলতে পারবো না।

লাশ কোথায়?

ফণিমনসার ঝোপেই আছে। লোক রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি চলুন। গ্রামগুলোতো গ্রাম নয়, প্রেতপুরী হয়ে গেছে। সবাই ভয় পায়।

আমাদের তাড়াতাড়িই যেতে হবে। পুলিশ আবার লাশ গুম করে ফেলতে পারে।

তিনজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। একসময়ে থমকে দাঁড়ায় নসরুল্লাহ, ওর মাকে আমি কী জবাব দেবো?

হা-হা করে হেসে ওঠে আলী আহমদ, যার সর্বস্ব গেছে তার কাছে আবার জবাবদিহি কী?

চারদিকে পোড়া ঘরবাড়ি, পুড়ে যাওয়া গাছের মাথা, জনশূন্য গ্রাস– যারা দু'চারজন আছে তারা ম্রিয়মাণ, পাংশু এবং বিবর্ণ। প্রথমে পালিয়েছিলো, দু'দিন পরে ফিরে এসেছে। ভিটের মায়া এক অবাক মায়া। কোথাও পাখি ডাকছে না, কাকও না। এই অস্বাভাবিক নীরবতা গুমরে মরে চারদিকে। বারবার নসরুল্লাহর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এই মৃত্যুর জন্য কি জীবন হাতে নিয়ে ছুটে এসেছে এই স্বাধীন ভূখণ্ডে? এক ভয়াবহ দাঙ্গা পেরিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে এসে এ কেমন মৃত্যু যে মণিমনসার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পচে যায় শরীর?

ফণিমনসার ঝোপ থেকে ফজলে গাজীকে টেনে তুলতে কষ্ট হয় ওদের। কলাপাতায় মুড়ে দু'তিনটে বাঁশ জড়ো করে বেঁধে তার ওপর রেখে ফজলে গাজীকে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। খুব তড়িঘড়ি করে লাশ ধুয়ে কাফন পরিয়ে ঘরের পেছনে কবর দেওয়া হয় ওকে। ওর মা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। একবার আলী আহমদকে ডেকে বলে, তুমি না বলেছিলে তোমরা থাকতে আমার ভাবনা কী? তাহলে আমার ফজলেকে দাও?

BanglaBook.org

আলী আহমদ পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। এরপর থেকে কালো খালার মুখে আর কথা নেই। মূর্তির মতো বসে থাকে যেন চোখের পাতা নড়বে না, নিশ্বাস পড়বে না– যতদিন খুশি ততদিন এভাবে বসে থাকবে কালো খালা।

কবর দেওয়া শেষ হলে বাড়ির পুরুষরা দাওয়ায় এসে বসে, কারো মুখে কথা নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। শেয়ালের ডাকও শোনা যায় না। কলিমুল্লার বাড়ি থেকে ভাত, ডাল আর আলুভাজি দিয়ে গেছে। তরীকুল মাকে খাবার দিতে বলে। সারাদিনের ধকলে ওর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। হাসনা বেগম ভাত বাড়ে। তরীকুল, আলী আহমদ খেতে বসে। হাসনা বেগম কালো খালার হাত ধরে টানে, বুবু চলেন কিছু মুখে দেবেন?

সুবোধ বালিকার মতো উঠে আসে কালো খালা। নিঃশব্দে ওদের পাশে বসে। দু'মুঠো খেয়ে উঠে যায়। ফিরে গিয়ে নিজের দাওয়ায় বসে থাকে। বেশ রাতে হাসনা বেগম কালো খালার ঘরে আসে, বুবু আজ আমি আপনার কাছে ঘুমুবো।

ঘুমুবে? চলো ঘুমাই। আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

নিজেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে যায়। যেন তার জীবনে কোথাও কোনো ঘটনা ঘটেনি, যেমন কাটছিলো তেমনই কেটে যাচ্ছে। ঘুম আসে না হাসনা বেগমের, অন্ধকারে চোখ মেলে রাখতেও কষ্ট হয়। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসে এবং ঘুম ভাঙে বেশ বেলাতেও। দেখে কালো খালা বিছানায় নেই, ঘরের দরজা খোলা। ওদিকের ঘরের দরজা বন্ধ। হয়তো কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি। নসরুল্লাহ খুব ভোরে ওঠে, আজ হয়তো ঘুম ভাঙেনি, কালকের ধকলে ক্লান্ত। হাসনা বেগম কুয়োতলায় যায়, মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। রান্নাঘরের চুলো থেকে বাসি ছাই ওঠায়। ঘর ঝাঁট দেয়। হঠাৎ ওর মনে হয় কালো খালাকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গেলো কোথায়? হাসনা বেগম ধপ করে বসে পড়ে, কেমন অবশ লাগে শরীর। তারপর সামনে গিয়ে বাইরে খুঁজতে আসে। গোয়ালের দিকে নেই, হাঁসমুরগির খোঁয়াড়ও খোলা হয়নি। হাসনা বেগম এগুতে থাকে এবং দেখতে পায় কালো খালা ফজলে গাজীর কবরের পাশে পড়ে আছে। শিশিরে মাখামাখি শরীর। গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে ও, শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। হাসনা বেগম চিৎকার করে ওঠে। নসরুল্লাহ দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে সে আর্ত-চিৎকার শোনে।

অবচেতন কালো খালা বিছানায় শোয়ানোর পর থেকে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। সবটাই তার ফেলে আসা জীবনের কথা, ফজলে গাজীর নাম কোথাও নেই। আলী আহমদ ভেবে দেখলো জীবনের জন্য প্রবল আর্তনাদ করছে কালো খালা, কী করুণ, কী মর্মান্তিক সে আর্তনাদ। এই আর্তনাদের মধ্যে ঢুকে আছে স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়েরা এবং ফজলে গাজী। কারো জন্য আলাদা করে কোনো দুঃখ নয়, সবাইকে একসঙ্গে করে, এক সমগ্রতায় একটি বিন্দু হয়েছে কালো খালা। হাসনা বেগম বালতিতে করে পানি এনে মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে। নসরুল্লাহ নাড়ি ধরে বসে আছে। বেলা গড়ায় কিন্তু জ্বর কমে না। অবচেতন থেকে চেতনে আসার লক্ষণ নেই, উপরন্তু নাড়ির স্পন্দন কমে আসে। নসরুল্লাহর ভয় করতে শুরু করে। আলী আহমদকে বলে, তুমি এখানে বসো। আমি কবরেজ ডেকে আনি।

আমি যাই বাবা।

বারান্দা থেকে তরীকুল বলে।

না, তুই গেলে হবে না। তোর কথায় যদি সঙ্গে সঙ্গে না আসতে চায়? ওদের আবার সতেরো রকম তালবাহানা থাকে।

তা ঠিক।

BanglaBook.org

হাসনা বেগম সায় দেয়।

নসরুল্লাহ বের হয়, কবিরাজের বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। ওর ইচ্ছে করে ছুটে যেতে, পারে না, বুকে হাঁফ ধরে। হিসেব করে দেখে পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়ে গেছে। কত জল গড়িয়ে গেলো এই শরীরের ওপর দিয়ে। শিশিরে পায়ের পাতা ভিজে যায়। মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটতেই ভালোলাগে ওর, স্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে নেয়। যখন বোঝে ঠাণ্ডা লাগছে, দু'চারটে হাঁচি আসে, তখন আবার স্যাণ্ডেল পরে। গায়ের চাদর ভালো করে জড়িয়ে নেয়। এমন করলে হাসনা বেগম রাগ করে। বলে, বয়স হচ্ছে টের পাও না? নিউমোনিয়া বাধালে বুঝি শান্তি হবে?

নসরুল্লাহ চুপ করে থাকে। বকুনি গায়ে মাখে না। মাঠে গিয়ে খালি গায়ে হাঁটলে হাসনা বেগম দেখতে পায় না, কিন্তু বাধ সাধে ঐ হাঁচি। হাঁচিতে বড় ভয় নসরুল্লাহর। আজও হাঁচি পেয়ে বসে, পরপর কয়েকটা দিয়েও রক্ষা নেই। নাক সুড়সুড় করে। নাক ডলতে ডলতে যখন এগুচ্ছে তখনই মতিউরের সঙ্গে দেখা।

কোনো খবর আছে মতিউর?

থানার দারোগা রানীমাকে ভীষণ নির্যাতন করেছে।

মানে?

মানে, মেরে আধমরা করে ফেলেছে।

তবে বাপের বেটি রানীমা। মুখ খোলেনি। একটি কথাও বলেনি।

পুলিশ তো হরেককে বুটের লাথ্থি দিতে দিতে বলেছে, বল ইলা মিত্র দারোগাকে খুন করার অর্ডার দিয়েছিলো?

হরেক কী বলেছে?

নসরুল্লাহ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে।

কেউ মুখ খোলেনি। সবাই বোবা হয়ে গেছে। মারের চোটে গোঙায় কিন্তু কথা বলে না। আমি জানি কেউ কথা বলবে না।

তুমি কেমন করে জানো মতিউর।

আমি তো ওদের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি কৃষক সমিতির সদস্য। ওদের নাড়ির খবর জানি।

কে জানে কী হবে ওদের।

নসরুল্লাহ আপন মনে বলে। মতিউর চলে গেলে ওর মনে হয় ওর গায়ে শক্তি নেই, হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। ওকে আর কতদূর যেতে হবে? প্রতিটি পদক্ষেপে লড়াই করে কি জীবনকে ঠেলা যায়? কত আর এভাবে?

তবু নসরুল্লাহকে কবিরাজের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয়। গিয়ে খবর পায় কবিরাজ আগের দিন রোগী দেখতে অন্য গ্রামে চলে গেছে। কখন ফিরবে কেউ জানে না। বুকটা মুচড়ে ওঠে। এতটা পথ এই শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া? এখন ওর মনে হয় ওর দ্রুত ফিরে যাওয়া উচিত। কিছু করতে না পারলে কাছে থাকতে তো পারে। বাজারের ডাক্তার তিনদিন আগে রাজশাহী গেছে, এখনো ফিরলো না। এক এক সময় আসে যখন মানুষকে প্রচণ্ডভাবে অসহায় হয়ে যেতে হয়। নসরুল্লাহর এখন তেমন সময়।

দুপুরের আগেই জ্ঞান ফেরে কালো খালার। ঘোলাটে চোখে তাকায়। পানি খেতে চায়। হাসনা বেগম চামচ দিয়ে একটু একটু পানি দেয় মুখে। তখন রাখাল ছেলেটি দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে খবর দেয়, সর্বনাশ চাচা মিয়া। গুণ্ডারা মশাল নিয়ে আসছে আমাদের বাড়ি পোড়ানোর জন্য। শিগ্রি পালান, পালান।

BanglaBook.org

কি হয়েছে বলবি তো?

জানি না, জানি না। আমি গরুগুলা বাইরে নিয়ে গেলাম।

ও এক দৌড়ের ওপর থাকে। নসরুল্লাহ দ্রুতপায়ে বাইরে আসে, সঙ্গে আলী আহমদ এবং তরীকুল। ওরাও দেখতে পায় তিনজন লোক মশাল নিয়ে ছুটে আসছে। আলী আহমদ বাড়ির ভেতর ছুটে গিয়ে কালো খালা ও হাসনা বেগমকে নিয়ে নিরাপদ দূরে চলে যায়। তরীকুল ঘরের ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় দু'চারটে জিনিস সরাতে পারে মাত্র। নসরুল্লাহ ছেলেগুলোর সামনে পথ আগলে দাঁড়ায়।

কী হয়েছে তোমাদের?

আপনার বাড়িতে আগুন দেবার হুকুম দিয়েছে।

কে?

থানার ছোটো দারোগা।

কেন?

আপনি যে বদমাইশি করেছেন।

বদমাইশি?

একজন ওর মুখের ওপর আঙুল নাড়িয়ে ভেংচি কেটে বলে, ঐ যে ইলা মিত্রকে চিনেও না চেনার ভান করেছেন। সরেন, পথ ছাড়েন।

ওরা নসরুল্লাহকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর কাছে গিয়ে মশালটা ছুঁড়ে দেয় ওর ঘরের খড়ের চালের ওপর। দাউদাউ জ্বলে ওঠে আগুন।

তরীকুল তখনো ছুটে ছুটে ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করছে। আলী আহমদও ওর সঙ্গে কাজ করছে। হাসনা বেগম ছুটে এসেছে। কালো খালা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে। আবার অজ্ঞান হয়েছে। আশেপাশে থেকে দু'চারজন মানুষ এসেছে। সবাই মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। নসরুল্লাহ পানি টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে যায়, মাথা ঘোরে, মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে একটা প্রবল জেদ কাজ করে, বারবারই মনে হয় পরাজিত হবে না। বড় ঘরটা পুড়লেও রান্নাঘর গোয়াল আর আলো খালার ঘরটা রক্ষা করা যায়। সবাই পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, পোড়া ঘরের দিকে তাকিয়ে নসরুল্লাহর দুচোখ জলে ভরে যায়। যারা আগুন নেভাতে এসেছিলো তারা ওকে আশ্বাস দেয়। বলে, ভাববেন না মাস্টার সাহেব। আমরা দু'দিনে আপনার ঘর তুলে দেবো। আপনি শুধু বাঁশ আর খড়ের টাকাটা জোগাড় করেন। গায়ের খাটনি আমাদের।

নসরুল্লাহ ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে। ওরা চলে গেলে নসরুল্লাহ আলী আহমদের দিকে তাকায়। মাথা নাড়িয়ে বলে, আলী আমাদের কোনো দেশ নেই। না, ভুল। আছে, আমাদের সব আছে। শুনলেন না ওদের কথা। আমাদেরকেও ওদের মতো সাহস রাখতে হবে।

তাহলে এভাবেই বেঁচে থাকা?

এভাবেই এভাবেই গড়ে উঠবে আমাদের দেশ। আলী আহমদ বলে।

পরক্ষণে ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। শুনতে পায় কালো খালা চিৎকার করে কাঁদছে। নসরুল্লাহ বিড়বিড় করে, শুনেছো আলী আহমদ থানায় ইলা মিত্রের ওপর ভীষণ নির্যাতন করা হচ্ছে।

হবেই তো। ধ্বংস, কান্না, নির্যাতন– এসব নিয়েই আমাদের এখনকার সময়।

তবু তুমি বলবে, এই আমাদের স্বদেশ।

নসরুল্লাহ বুক চাপড়ায়, অবরুদ্ধ কান্না, ক্ষোভ, ক্রোধ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটাতে চায়। আলী আহমদ দীপ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলে, এখনই ইচ্ছে করলেই আমরা নতুন ভূমি

BanglaBook.org

গড়তে পারি না।

ওহ্ হো।

নসরুল্লাহ কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি আর কত দেখবো। আর দেখতে চাই না।

আলী আহমদ পোড়া ভিটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাবতে কষ্ট হয়। ওর কান্না পায় না, শুধু ও ভাবতে চায়। তীব্র ঘূর্ণির মতো ভাবনা পাক দিয়ে ওঠে করোটিতে। মনে হয় এই ধ্বংস তো শেষ নয়, এটা তো শুরুও হতে পারে। ওরা তো বলে গেছে নতুন ঘর উঠিয়ে দেবে। ওর মাথার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটা স্লোগান, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই। ওরা কি তখনো এমন জোট বেধে বলবে, ভাববেন না মাস্টারমশায়, আমরা একটা রাষ্ট্রও গড়বো।

স্লোগান আলী আহমদের করোটি মুখর করে তোলে। ও শুনতে পায় কালো খালার বুকফাটা আর্তনাদ, দেখতে পায় নসরুল্লাহর নিঃশব্দ অশ্রুপাত, হাসনা বেগমের হাহাকার, তরীকুলের বিষণ্ন মুখ। এইসব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ওর করোটি প্রবলভাবে আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে। বুঝতে পারে আলোরও ভাষা আছে, তা শব্দ করতে পারে, কথা বলে। এই ধ্বংসযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে আলী আহমদের সামনে এখন তেমন আলোকিত ভুবন।

৭

খাপরা ওয়ার্ডে এখন রাত। মফিজুলের কিছুতেই ঘুম আসে না, বিছানা থেকে ওঠে, পায়চারি করে, লোহার শিকের ওপর মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। চৈত্রের শেষ, কিন্তু বেশ গরম। ওর গায়ে জামা নেই। চৌদ্দ নম্বর সেলে পাঠানোর প্রতিবাদে ওরা বিকেল পর্যন্ত সভা করেছে। প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত খাপরা ওয়ার্ড ছেড়ে চৌদ্দ নম্বর সেলে যাওয়া চলবে না। প্রতিরোধ করতে হবে। জেলে রাজবন্দীদের একসঙ্গে থাকার অধিকার দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আদায় করা হয়েছিলো। এখন কয়েকজনকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সে অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে।

একজন বলে, আমরা আমাদের অধিকার কিছুতেই হারাতে পারি না।

খাপরা ওয়ার্ড ছেড়ে কেন যাবো আমরা? চৌদ্দ নম্বর কনডেমড সেল। ওটা রাজবন্দীদের জন্য নয়।

ওটা যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠ রোগিদের জন্য।

ওখানে জেলে মৃতদের লাশ পোস্টমর্টেম করা হয়।

ফাঁসির আসামিদের রাখা হয়।

কঠিন শাস্তি পাওয়া এবং দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত আসামিদের জন্য রাখা সেলে আমরা যাবো কেন?

রাজবন্দিদের মর্যাদা আদায়ের জন্য বিপ্লবী যতীন দাস জীবন দিয়েছিলেন।

শিবেন রায় অনশন ধর্মঘটে মারা গেছেন। দীর্ঘদিনের অনশন অনেক রাজবন্দীকে চিররোগি করেছে। আমরা জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় হুকুম মেনে নিলে আমাদের পূর্বসূরিদের অপমান করা হবে।

সুতরাং না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে যার বিছানায় ঘুমুতে যায়। মফিজুল ঘুমুতে পারে না, কারণ ও বোঝার চেষ্টা করছে যে এর খেসারত কী পরিমাণ দিতে হবে! এবং

BanglaBook.org

কীভাবে? মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি চলছে দেশজুড়ে– মানুষকে কথা বলতে দেবে না– মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। গত সপ্তাহে থানার নির্যাতনে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে ইলা মিত্রকে। জেলের বিভিন্ন জনের কাছে ইলার অবস্থার খবরাখবর পায় ওরা। শুনে ক্রুদ্ধ হয় সবাই, সহানুভূতি জানায়। কিন্তু রাজবন্দিদের কীইবা করার আছে? বাইরে এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে কি না খবরই পায় না, উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে খবর আসে না। কাজের ফাঁকে কোনো কোনো ফালতু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, মুসলিম লীগ সরকারে মানুষ নাই গো। এটা কি মুসলমানের দেশ? মুসলমানের দেশে মেয়েলোকের ওপর কি এমন নির্যাতন হয়? আহা বেচারা!

মফিজুল ওদের এইসব কথা কান পেতে শোনে। বুঝতে পারে সাধারণ মানুষের ঘৃণা তীব্র হচ্ছে, এইসব ঘৃণা জমতে জমতে পাহাড় হবে। মানুষকে তখন বলতে হবে না কি করতে হবে, ওরাই বুঝে যাবে যে কী করণীয়। ও আবার বিছানায় আসে, ঘুমুতে চেষ্টা করে। বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাক, মশা ভনভন করছে, বাবা-মার কথা মনে হয় ওর। কয়েকদিন আগে একটা চিঠি পেয়েছে, তার অর্ধেকটাই কালি দিয়ে কাটা। পড়তে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, এখন সেই পুরনো মেজাজ খারাপটা নাভির কাছ থেকে বুকের দিকে উঠে আসতে থাকে। বারবার মনে হয়, ইলা মিত্রের গ্রেফতারে বাবা দুঃখ পেয়েছে। বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলে ওর খুব ভালোলাগতো। জেল হাসপাতালে অসুস্থ ইলাকে একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই। চাইলেই ভোঁ করে দৌড় দিয়ে কিছুই করা যায় না। অনেক রাতে ঘুম আসে ওর। স্বপ্ন দেখে, ওর বাবা একদম বুড়িয়ে গেছে। চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। বাবার চোখ লাল এবং ফোলা, অনেক কেঁদেছে। ও বারবার জিজ্ঞেস করে, বাবা তোমার কী হয়েছে? একটা কথাও বলে না ওর বাবা।

সকালে ঘুম ভাঙলে প্রচণ্ড অবসাদ ওকে কাহিল করে রাখে। টের পায় মুখটা তেতো হয়ে আছে। ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। ও চিৎপাত বিছানায় শুয়ে থাকে। গতকাল হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসটি পেয়েছে অমূল্যর কাছ থেকে। শুয়ে শুয়ে বই পড়তে থাকে। ডুবে যায় একটি ভিন্ন জগতে, নাকি আপন ভুবনে? পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলে যায় মফিজুল একসময়ে বইটা বুকের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে। হীরেন সেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। হীরেন সেনের বাড়ি যশোরে। কালকের সভায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বলেছিলো, আমরা যদি চৌদ্দ নম্বর সেলে না যাই তাহলে যে কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে দিলাম। কেউ হীরেন সেনের কথায় কান দেয় না। দিনাজপুরের রাজবন্দী ডাঃ গণেশ সরকার বলেছিলো, জেলের আদেশ আমাদের অমান্য করা উচিত নয়। এখন আমরা চৌদ্দ নম্বর সেলে যাই। তারপর একসঙ্গে থাকার জন্য আবেদন করবো। কিন্তু না গণেশের কথাও কেউ শোনে না। শুনবে কেন? রাজবন্দিরা তো যে কোনো পরিস্থিতির জন্য সবসময়ে প্রস্তুত। তাদের কি পেছনে তাকাবার সময় আছে। মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি চণ্ডালের মতো, ওরা নিষ্ঠুর, মানবিক বোধের উর্ধ্বে। ফালতুদের কাছ থেকেই শোনা গেছে যে, কথা আদায়ের জন্য থানার লোকেরা ইলার যোনিপথে সেদ্ধ গরম ডিম ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। ইলা এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। একটি স্বাধীন দেশে কী মর্মান্তিক ঘটনা! মফিজুলের গা শিউরে উঠে। এই সরকার দমননীতির রোলার চালিয়ে দেশ শাসন করবে। এরা মানবাধিকার শব্দের তোয়াক্কা করে না। ওরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা কি জেল কর্তৃপক্ষের কানে গেছে? হয়তো যেতে পারে। এটা কোনো গোপন বৈঠক ছিলো না। মফিজুল গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা থেকে ওঠে। টের পায় থমথমে পরিস্থিতি, সবাই চুপচাপ,

BanglaBook.org

যেন একটা কিছুর অপেক্ষায় আছে। মনসুর হাবিব বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। মফিজুলকে দেখে হাসে। বলে, কী স্বপ্ন দেখলে আজ?

বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি।

বাহ্, তাহলে তো ভালো স্বপ্ন।

না, স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে। বাবা বোধহয় ভালো নেই।

মাই গড, তোমারও এমন সংস্কার আছে?

সংস্কার নয়। এটা এক ধরনের আশঙ্কা। খারাপ স্বপ্ন দেখে খারাপ ভাবনা। এই আর কি।

মফিজুল পাশ কাটাবার চেষ্টা করে। বলে, আপনার শরীর কেমন?

ভালোই আছি। নো প্রবলেম। তবে আমার মনে হয় কি জানো, আমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি নিয়ে আর একবার বসা উচিত।

আপনার কি কোনো দ্বিধা আছে?

চুপ করে থাকে মনসুর। তাকে কিছুটা চিন্তান্বিত দেখায়। মফিজুল জোর দিয়ে বলে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আর দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

আগামীকাল আমাদের সেলে যাবার দিন।

দেখা যাক কী হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে কথা না বলে নিশ্চয় কিছু করবে না।

কে জানে, কী করবে? ইলা মিত্রের ঘটনাতেই বুঝতে পারছি যে সরকারের সহিষ্ণুতা কতটুকু!

মনসুরের কণ্ঠে চমকে ওঠে মফিজুল। ঐ কণ্ঠে ভয়, কিন্তু সে ভীতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করবে না। হেঁটে নিজের বিছানার দিকে চলে যায় মনসুর। মফিজুলও আর কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ পর সুবেদার আকবর খাঁ আসে ওয়ার্ডে। বলে, চৌদ্দ নম্বর সেল চুনকাম করা হচ্ছে। আপনাদেরকে পরশু দিন নিয়ে যাওয়া হবে।

সুবেদারের বেশ ঔদ্ধত্য ভঙ্গি, মনে হয় কর্তৃপক্ষ ওদের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছে এবং কী করবে এ নিয়ে সময় নিচ্ছে। মফিজুলের মনে হয় সুবেদারের বড় বড় মোচের আড়ালে ধূর্ত হাসি খেলে বেড়াচ্ছে, যেন বলতে চায় কতো ধানে কতো চাল বুঝিয়ে ছাড়বো। ওরা কেউ সুবেদারের সঙ্গে কথা বলে না, শোনার কথা শুনে রাখে। অমূল্য ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, আমাদের কিছুটা সম্মান দেখানো হচ্ছে। সেল চুনকাম করা হচ্ছে।

হানিফ বলে, ওদের যা খুশি তা ওরা করুক। আমরা আমাদের মতো করবো।

পাঞ্জাবি সুবেদার তখনো বুটের খটখট শব্দ করে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে শব্দ বাজতে থাকে ওয়ার্ড জুড়ে। কিছুক্ষণ পরে খবর পাওয়া গেলো যে আরশেদ ও দিলীপকে ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওরাও কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেছে।

শহীদ চেঁচিয়ে বলে, ওদের সরিয়ে নেওয়া হলো কেন? নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে।

ওরা বোধহয় আমাদের বিরুদ্ধে স্পাইং করেছে।

নিশ্চয় আমাদের সব কথা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে লাগিয়েছে।

লাগাক না। আমরা কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে।

হো-হো করে হাসে সবাই। তারপর উপেক্ষা করে সুবেদার আকবর খাঁর উপস্থিতি। বেচারা কোন মুলুক থেকে এসে এ দেশের মালিক হয়ে বসেছে– না বোঝে এ দেশের মানুষকে, না বোঝে এ দেশের সংস্কৃতি।

BanglaBook.org

দুপুরের খাবারের পর মফিজুল কম্পরাম সিংয়ের বিছানায় এসে বসে।

কম্পদা আজ আপনার গল্প শুনবো।

গল্প নয়।

জানি, বলবেন জীবনের কথা।

কম্পরাম যে গাম্ভীর্য নিয়ে গল্প নয় বলেছিলো, তা মুহূর্তেই উবে যায়। হো-হো করে হাসে, তুমি খুব শার্প ছেলে।

কিন্তু কম্পদা, সব গল্পই কিন্তু জীবনের ঘটনা। এমনকি রূপকথাও। মানুষের ঘটনাকেই আমরা কল্পনায় রাজা-উজির, দৈত্য-দানো, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি, তেপান্তরের মাঠ ইত্যাদির মধ্যে সাজিয়েছি।

ঠিকই বলেছো। এই যেমন আমার ঘটনা শুনলে তোমার কাছে মনে হবে রূপকথা।

হ্যাঁ, তা সত্যি। তারপর আরো একশো বছর পরে এইসব ঘটনার মধ্যে কত রঙ লাগবে। মানুষ তার আপন ঢঙে সাজিয়ে নেবে। নিজের মতো করে গল্প তৈরি হবে।

আমি, যেমন আমি কম্পরাম সিং, বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামে কৃষকের ঘরে ঘরে আমার যাতায়াত। মাঝে মাঝে ভুলে যেতাম যে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙা থানার উত্তর পারিয়া গ্রাম আমার জন্মভূমি। সবসময়ে মনে হতো সবটাই আমার জন্মভূমি, এ দেশের প্রতি ধূলিকণায় আমার জন্ম। আর এ মাটির হাজার হাজার কৃষক, আমারই ভাই, আমার আপনজন। মনপ্রাণ ঢেলে কৃষক সমিতির কাজে নেমে পড়লাম। সে সময়ে কৃষক সমিতির নির্দেশে তোলাবাটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। জমিদারের কর্মচারীরা প্রত্যেক হাটে গরিব মানুষের কাছে থেকে তোলা নিতো, কারো রেহাই ছিলো না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এই নিপীড়ন মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। কিন্তু আর নয়। দিনাজপুরের কৃষকরা জমিদারের এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। এক তরফাভাবে মার খাওয়া মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে মানুষ এভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির ভলান্টিয়াররা কুচকাওয়াজ করে। হাটের দিনে আমরা গিয়ে সুবিধামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি। লোকেরা হাঁ করে শোনে। আন্দোলন দিন দিন বাড়তে থাকে। আমি লাহিড়ীহাটের তোলাবাটি আন্দোলন পরিচালনা করি। বুঝতেই পারো জমিদাররাও চুপ করে বসে থাকবে না। তারা থানার লোকদের সঙ্গে যোগসাজস করে আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরলো। তিন মাস জেল খাটলাম। কিন্তু আমার গ্রেফতারে ফল হলো উল্টো। কৃষকরা আরো বেশি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলো। লাহিড়ীহাট ভেঙে দিয়ে তারা নতুন হাট বসালো। সেই হাটের নাম হলো সমিতির হাট। জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম সারা উত্তরবঙ্গে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলন দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রবল হয়। কারণ ঐ এলাকার মতো বড়ো জোতদার আর কোথাও ছিলো না। এমন নিঃস্ব ভূমিহীন চাষীও এত বেশি সংখ্যক আর কোথাও ছিলো না। আধিয়ার চাষীরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে লড়াইতে নামে। আমার মাথার ওপর হুলিয়া ঝুলছে। পলাতক অবস্থায় থেকে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছি, সে এক কঠিন অবস্থা– খাওয়ার ঠিক নেই, বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই। দু'বছর পর হুলিয়া প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করার সুযোগ পেলাম। এদিকে সংসারের অবস্থা কাহিল। একমাত্র ছেলে অনেকদিন ধরে রোগে ভুগছিলো। সামনে মে দিবস উপলক্ষে লাহিড়ীহাটে সভা। হাজার হাজার লোক জমায়েত হবে। সভায় বক্তৃতা করতে হবে। আগের দিন রাতে ছেলে মারা গেলো। কী করবো ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। কারণ আন্দোলন যে পর্যায়ে উঠেছে তাতে পিছিয়ে থাকা চলবে

BanglaBook.org

না, লোকের মনোবল যেন ভেঙে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। কেবলই মনে হতে লাগলো যে ছেলেকে পুড়িয়ে সোজা সভায় চলে যাবো, এর অন্যথা হবে না। করলাম তাই। সাদা থানপরা বিধবা পুত্রবধূর হাত ধরে শ্মশান থেকে সোজা চলে গেলাম সভায়। চারদিকে লোকে লোকারণ্য, লাল ফেস্টুন দিয়ে সভামঞ্চ সাজানো। আমাকে ঐ অবস্থায় সভায় দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলো মানুষ। আমি ওদের বললাম, আপনাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি পুত্রশোক ঝেড়ে ফেলেছি। আজ মে দিবস। এই পবিত্র দিনে আমি আপনাদের মাঝে না এসে থাকতে পারি না। এ আমার দায়িত্ব।

মানুষের মাঝে এসে আমি ভুলে যাই যে আমার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে কিছুক্ষণ আগে চিতার আগুনে ছাই করে দিয়ে এসেছি। আমি ভুলে যাই যে একটি সদ্য বিধবা মেয়ে সভামঞ্চে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে।

হঠাৎ কম্পরাম সিং হো-হো করে হেসে বলে, জীবনের গল্প এমনই চমকপ্রদ মফিজুল।

মফিজুল কথা বলে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কম্পরামের মুখের দিকে। ষাটের ওপর বয়স– এই এতটা বয়স সংগ্রাম করেই কাটালো, তবু ক্লান্তি নেই। এই খাপরা ওয়ার্ডে উচ্ছল, হাসিখুশি দিন কাটায়। যে কোনো সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আপসহীন।

কী ব্যাপার দেখছো কী?

আপনাকে।

আমাকে দেখার কী আছে?

আপনাকে না দেখলে আমি বুঝতে পারতাম না যে মানুষ কিভাবে নিজের মধ্যে সময়কে ধরে রাখে। তারপর কী হলো বলুন?

তারপর? তারপর রূপকথার গল্পের শেষে পাওয়া যায় যে যুদ্ধ জয় করে রাজা সুখেশান্তিতে রাজ্যশাসন করতে লাগলো। কিন্তু আমার রূপকথা অন্যরকম। আমার দেশের মুসলিম লীগ নেতারা রাজ্যজয় করে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলো। তারা ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি ইত্যাদি সংগঠনগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ চালাতে থাকে। শত শত কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আমাকে গ্রেফতার করে রাজবন্দী হিসেবে এই খাপরা ওয়ার্ডে পাঠানো হয়।

মফিজুল সঙ্গে সঙ্গে বলে, ভাগ্যিস এখানে পাঠিয়েছিলো। এখানে না পাঠালে তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতো না।

কম্পরাম হো-হো করে হাসে।

হাসবেন না কম্পদা। মাঝে মাঝে রূপকথার মতো মানুষদের দেখতে ইচ্ছে করে। যারা একসময়ে বাস্তব ছিলো, কিন্তু এখন গল্প হয়ে বেঁচে আছে।

আমার জীবনেও কি তেমন দিন আসবে?

এত তাড়াতাড়ি নয়। আপনাকে আমরা দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে পেতে চাই।

কম্পরাম নিশ্বাস ফেলে, বড় অনিশ্চিত জীবন। কে জানে কার ঘণ্টা কখন বাজবে।

আপনার মুখে এমন কথা মানায় না কম্পদা। আপনি শুয়ে থাকুন। আমি চলে যাই।

মফিজুল কম্পরামের বিছানার কাছ থেকে উঠে আসে। ওয়ার্ডের অন্যরা কেউ ঘুমিয়ে গেছে, কেউ চোখের ওপর বই খুলে রেখেছে। তখন ভর দুপুর, বাইরে চৈত্রের গরম বাতাস। মফিজুল কিছুক্ষণ বারান্দায় হাঁটে, ঘুমুতে চায়, কিন্তু ভেতরে প্রবল উত্তেজনা, ঘুম আসে না। কম্পরামের সংগ্রামী জীবন বারবার মনের দুয়ারে হানা দেয়। কেউ কেউ এভাবে জীবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত মানুষের জন্যই ভাবে, বিনিময়ে কোনো কিছু না চেয়েই। কম্পরাম

BanglaBook.org

পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছে, পুত্রশোক উপেক্ষা করেছে, পলাতক জীবনযাপন করেছে, এখন জেলের ঘানি টানছে, তবু উদ্যম আছে, নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্পৃহা আছে। বয়স বাড়তে থাকলেও এরাই পারবে জীবনকে উল্টেপাল্টে দেখতে। মফিজুল বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে 'স্পার্টাকাস' পড়তে শুরু করে, এও এক সংগ্রামের কাহিনী। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন মানুষ, তবু মনে হয় চরিত্রগুলো তার চারপাশের, তার আপনজন।

বিকেলে খবর পায় নাচোল কেসের আসামি যদু মাঝি মারা গেছে। অসহনীয় নির্যাতনের পর ওদের রাজশাহী জেলে আনা হলেও ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি। এমনকি হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়নি যদু মাঝিকে, ঠিকমতো পথ্যও পায়নি। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অবজ্ঞা, অবহেলায় জেলের ভেতর ঠেসে রয়েছে। শোনা যায় আরো অনেকের অবস্থা খারাপ। অল্প দিনের মধ্যে আরো কেউ কেউ মারা যাবে। এখনো সময় আছে, যত্ন নিলে অনেকেই বেঁচে যেতে পারে। নইলে অনেকের ভাগ্যই অনিশ্চিত।

ব্যাপারটি রাতে সবাই আলোচনা করে। যদু মাঝির মৃত্যুতে সবাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কম্পরাম বলে, এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। প্রয়োজনে আমরা অনশন ধর্মঘট করবো।

ঠিকই বলেছেন। এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

এরা ভেবেছে কী? এভাবে দমননীতি চালিয়ে কতকাল শাসন করবে?

ক্ষোভের তোড়ে বিভিন্ন কথার স্রোতে ভেসে যায় ওয়ার্ড। উত্তেজনা একসময়ে কমে। আগামীকাল কী করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রত্যেকে ভাববে, এই ধরনের আলোচনার পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়। ইলা মিত্রের অবস্থা উন্নতির দিকে এই আশাটুকু নিয়ে ওরা ঘুমুতে যায়।

ভোরে কিচেনের রাজবন্দীরা রুটি, চা নিয়ে আসে। প্রত্যেকের মেজাজ কম বেশি খারাপ, রাতজাগার ক্লান্তিও আছে। খাটের কোণায় রুটির থালা, চায়ের কেটলি রেখে সবাই আলোচনায় বসেছে। ওদের আলাদা করে দেওয়া হবে এই এক বিষয়ের উপরই আলোচনা শুরু হয়। চা খেতে খেতে হাই ওঠে মফিজুলের। বিছানার ওপর বসে আছে। এর-ওর আলোচনা শুনছে। চৌদ্দ নম্বর সেল চুনকাম করা হচ্ছে বলে যে দু'দিন সময় দিয়ে গিয়েছিলো সুবেদার আকবর তার আজ শেষ দিন। সেজন্য সবাই আলোচনায় বসেছে। সভাপতি হানিফ শেখ। প্রত্যেকেই কথা বলতে চায়, আলোচনা দীর্ঘ করে ফেলে। এদিকে বেলা প্রায় নয়টার কাছাকাছি। আজ আবার সুপার বিলের পরিদর্শনের তারিখ, নয়টায় এসে পড়তে পারে। সভা শেষ করা দরকার। হানিফ চেঁচিয়ে বলে, আপনারা সংক্ষেপ করুন। আমাদের হাতে সময় নেই।

হানিফ শেখের কথা শেষ হতে না হতেই ওরা শুনতে পায় খাপরা ওয়ার্ডের বাইরে অনেকগুলো বুটের আওয়াজ। খটখট শব্দে এগিয়ে আসছে। ওরা সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায় সুপার মিঃ বিল, ডাক্তার, দুজন ডেপুটি জেলর, সুবেদার আকবর খাঁ, কয়েকজন মেট এবং সিপাইসহ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকছে। বিলের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ভেতরে ফুঁসছে, চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। সুবেদার আকবর খাঁ মোচ পাকায়, তীক্ষ্ণ চাউনি সবার মুখের ওপর ঘুরে বেড়ায়। বিল সোজা হকের সামনে গিয়ে ইংরেজিতে বলে, আপনারা তৈরি হন। আপনাদের কয়েকজনকে আলাদা করে দেওয়া হবে।

হক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে।

BanglaBook.org

বিলের হাতের হান্টার বাতাসে নড়ে ওঠে।

বসতে হবে? সাট আপ দ্য ডোর।

বিল চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় যে খাপরা ওয়ার্ডে দরজা একটা। দরজা বন্ধ করে দিলে ওরা সহ সবাই আটকা পড়ে যাবে। তাই আদেশ দিয়েই দ্রুত বেরিয়ে যেতে চায়। গেটে দাঁড়িয়েছিলো তিনজন রাজবন্দী। ওরা গেটটা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিলো, পুরোটা বন্ধ হয়নি। এর মধ্যে বিল গিয়ে বাবর আলীর হাতে হান্টার দিয়ে আঘাত করে, ওর কব্জি ভেঙে যায়, এদিকে বিল বুট দিয়ে দরজায় লাথ্থি মেরে বেরিয়ে যায়। একই সঙ্গে সুবেদার আকবর খাঁও বেরুতে চায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো সদানন্দ। ও সুবেদারের পাগড়ি ধরে টান দিতেই পাগড়ি হাতে চলে আসে। পাগড়ি রেখেই বেরিয়ে যায় সুবেদার। বিল বাইরে বেরিয়েই হুইসেল বাজিয়ে দেয়– বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ ছড়িয়ে যায় পুরো ওয়ার্ডে। বাঁশির শব্দে প্রায় চল্লিশজন সিপাই লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে খাপরার বারান্দায় এসে হাজির হয়। মফিজুলরা ভেতর থেকে গেট আটকিয়ে দেয়। সিপাইরা কেউ আর ঢুকতে পারে না, কিন্তু ওরা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে লাঠি ছুঁড়ে মারতে থাকে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওরা গরাদের ওপর লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। ভেতরের ওরা এতক্ষণে বুঝে যায় যে সবটাই পরিকল্পিত। বিল তৈরি হয়ে এসেছে। হুকুম না মানার শাস্তি দেবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। রাজবন্দিরা লোহার খাট দিয়ে জানালার কপাট আটকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওদের লাঠির সামনে এগুতে পারে না। ওরা লাঠির ধাক্কায় খাটগুলো ফেলে দেয়। এরপর ওরা ওদের কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি, শিশি, দোয়াত ইত্যাদি জিনিস জানালার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতে থাকে। মফিজুল দেখতে পায় খাট ফেলে দেওয়ার ফলে কালি সরকার আর নাসির খাটের নিচে পড়ে গেছে। ও প্রাণপণ চেষ্টায় খাট সরিয়ে ওদের বের করার চেষ্টা করে। তখুনি শুনতে পায় বিল চিৎকার করে বলছে, ফায়ার। জানালার গরাদের ফাঁকে বন্দুকের নল লাগিয়ে সিপাইরা তৈরি হয়ে যায়। মফিজুল সঙ্গে সঙ্গে খাটের আড়ালে বালিশের নিচে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে ওঠে খাপরা ওয়ার্ড, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কান ফাটা আর্তনাদ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে, সে রক্ত গিয়ে লাগে দেয়ালে-ছাদে। এক ধরনের বোঁ বোঁ আওয়াজে কানে তাল লেগে যায় মফিজুলের। পরক্ষণে ও অনুভব করে খাটের বাইরে পায়ের পাতা ছিলো, সে পাতা ভেদ করে গুলি চলে যায়। ওর ডান দিকে হানিফ শেখ– তার বাহুর উপরের দিকটা ছিঁড়ে গেছে, প্রচুর রক্ত পড়ছে, অল্পক্ষণে ঢলে পড়ে হানিফ শেখ। মফিজুল বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ আগেই এই লোকটি বলেছিলো, তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের সময় নেই। মফিজুল মাথা ওঠায়, বুক ধ্বক করে ওঠে। ওর সামনে ওর প্রিয় কম্পদা, কম্পরাম সিং রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিশাল শরীর রক্তে প্রায় ডুবেই গেছে। চারদিক থেকে রক্তের স্রোত এসে কম্পরামের শরীরে আটকে যায়। থকথকে হয়ে ওঠে রক্তের স্রোত। কেউ কেউ পানি, পানি করে চেঁচাচ্ছে। কে কার কথা শুনবে। পানি দেওয়ার জন্য কেউ সুস্থ নেই। মফিজুলের পায়ের পাতা টনটন করে, পা টেনে ওঠানোর ক্ষমতা নেই। শুধু ও উঠে বসে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে লোহার খাট, রাইফেল নির্গত স্পিলিন্টার, বুলেট, থালা-গ্লাস, কাপড়চোপড়, বইপত্র। আর্তনাদে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। জীবিতরা পানি, পানি করছে। কিন্তু কে কাকে পানি দেবে, পানিই বা কোথায়? যারা কম আঘাত পেয়েছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে অন্যদের কাছে এগুবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেখানেও বাধা পড়ে। গুলি চালনা শেষ করে খাপরা ওয়ার্ডের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে ওরা। মোটা বাঁশ দিয়ে আহতদের পেটাতে শুরু করে। সেই আঘাতে সিলেটের রাজবন্দি অনন্তর মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায়। লাঠির বাড়িতে

BanglaBook.org

রাজবন্দিরা খাপরার মেঝেতে গড়াগড়ি যায়। যারা গুলিবিদ্ধ হয়নি তারা লাঠির আঘাত এড়াতে পারে না। প্রত্যেকে কমবেশি আহত হয়। হান্টার হাতে বিল আবার ওয়ার্ডে ঢোকে, মফিজুলের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাঁশের বাড়ি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের শরীরটা একটা লোহার খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। বিল ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হকের সামনে চলে চায়। সে হয়তো হককে খুঁজছিলো। কারণ হকের কাছে গিয়েই তার মাথায় হান্টার দিয়ে বাড়ি মারে। সে দৃশ্য দেখে মফিজুল চোখ বুঁজে ফেলে। কিন্তু হকের চিৎকারে ওর অস্থির লাগে। মফিজুল মাথা উঁচিয়ে দেখে হক চিৎকার করে উঠে আবার ধপাস করে পড়ে যায়। মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। বিল এরপর পড়ে থাকা রাজবন্দিদের বুটের লাথি দিতে দিতে বেরিয়ে যায়। পাশের খাটের ওপর পড়েছিলো বিজন। তার পেটে গুলি লেগেছে, পেট ফুলে উঠেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলো। এক ফাঁকে মফিজুলকে বলে, শোনো মফিজুল, মনে রাখতে হবে যে আমরা মরিনি, আমরা জয়লাভ করেছি, ভবিষ্যৎ আমাদের।

মফিজুল সাড়া দেয়, ঠিক বলেছেন। আমাদের মৃত্যু নেই।

এরপর বিজনের কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে কি না মফিজুল বুঝতে পারে না। মনে হয় হয়তো বিজন নেই, হয়তো আছে, শেষ নিশ্বাসটুকুর জন্য ধুকধুক করছে হৃৎপিণ্ড। ওর দৃষ্টি কম্পরামের ওপর ফিরে আসে, বুঝতে পারে বিশাল বপুতে আর কোনো উত্তাপ নেই, সে শরীর শীতল হয়ে গেছে– ডুবে গেছে রক্তের সমুদ্রে। দেখতে পায় নীল মাছি উড়ে এসেছে, ওয়ার্ডে মাছির ভনভন শব্দ। রশিদউদ্দীন হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে আসে, মফিজুল কেমন আছো?

এই এতক্ষণে মফিজুলের কান্না পায়। ওর চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। তবু মুখে হাসি টেনে বলে, আমি ভালো আছি, রশিদ ভাই আপনি?

উরুতে গুলি লেগেছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

হক ভাই চিৎকার করছে। চলুন তার কাছে যাই।

দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। হাতের তালু, হাঁটু রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। রক্তের ঝাঁঝে বমি পায়। গলা শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়েও ঠিকমতো এগুনো যায় না। পিছলে যায় হাঁটু। কোনোরকমে হকের কাছে পৌঁছে ওরা হাত দিয়ে হকের মাথা চেপে ধরে। গোঙানির শব্দটা কেমন ভয়ঙ্কর মনে হয়। মফিজুলের ইচ্ছে করে ছুটে কোথাও চলে যেতে। কতক্ষণ এভাবে কেটে যায় ওরা জানে না। কতটুকু সময়? একটা যুগ না এক শতাব্দী? নাকি কতগুলি মুহূর্ত মাত্র?

জেলে পাগলা ঘণ্টি বাজছিলো। বাইরের সেপাইরা রাইফেল নিয়ে ছুটে এলো ভেতরে। একজন বলে, আমি মিলিটারিতে ছিলাম। যুদ্ধও করেছি। কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দি করে এভাবে হত্যা করার নজির আছে কি না জানি না। উহ্ কী ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা! অন্যজন ওকে থামিয়ে দেয়, আহ্ চুপ করেন। দরদ দেখাবার সময় এখন নয়। জানতে পারলে আমাদেরও আস্ত রাখবে না। ওরা একে দু'য়ে চলে যায়। মফিজুল ওদের অসহায় চলে যাওয়া দেখে। কিছুই বলতে পারে না। জেলে পাগলা ঘণ্টি পড়লে ওদের ভেতরে আসতে হয়, তাই এসেছে। এসে মর্মাহত হয়েছে।

আহতদের অসহ্য চিৎকারে অনেকক্ষণ পর ডাক্তার এলো। ক্যাথিডার দিয়ে ওদের পেসাব করালো এবং সবাইকে মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে দিলো।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মফিজুলের আর কিছু মনে থাকে না। জ্ঞান ফিরলে দেখতে পায় নাচোলে ওদের পাশের গ্রামের কুখ্যাত আকবর ডাকাত বসে আছে। মাথায় হাত বুলিয়ে

BanglaBook.org

দিচ্ছে। ও চোখ খুললে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, কেমন আছেন? মফিজুল ভাই আপনি এখানে আমি তা জানতাম না।

মফিজুল অবসাদে আবার চোখ বোঁজে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। আকবর বলে, আপনি ঘুমান। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। ভেবে পাই না যে এরা কি মানুষ, না অন্যকিছু। লোকে আমাকে বলে ডাকাত, তবু তো আমি এখন পর্যন্ত মানুষ খুন করিনি। কিন্তু এরা কী? এদের কী বলা হবে? জানেন মফিজুল ভাই খাপরার রক্ত ধোয়ার জন্য আমাদেরকে আনা হয়। কাজ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে দেখি। কাজ শেষ করে আপনার এখানে এসে বসি। কখন আপনার জ্ঞান ফিরবে এই আশায় ছিলাম। সাবাস আপনারা, এমন ঘটনা আমি দেখিনি। মাগো, মানুষ এভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন দিতে পারে? আপনারা মানুষ না ফেরেশতা। আকবর উঠে গিয়ে মফিজুলের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। মফিজুল চমকে তাকায়।

কী করছেন আকবর ভাই? বয়সে আপনি আমার কত বড়!

বয়স কিছু না, বয়স কিছু না। বুদ্ধিতে, সাহসে, বিদ্যায় তো আপনি আমার চেয়ে বড়।

আপনি এখানে কী করে এলেন আকবর ভাই?

সে অনেক ঘটনা। আমাদের মল্লিকপুরের মুসলিম লীগের বড় পাণ্ডা শয়তান কসিরুদ্দিন আমার আর আমার বড় ভাইয়ের সম্পত্তি দখল করতে চাইলে ছাড়িনি। জমির ওপরই জবাই করে দিলাম। বুঝলেন এই প্রথম মানুষ খুন। অনেকদিন ধরে অত্যাচার করছিলো, আর সহ্য হলো না। দিলাম শেষ করে।

বলেন কি? এখন কী হবে?

যা হবার হবে? তার জন্য আমি প্রস্তুত। লোকজন মুখে কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু আমি জানি সবাই খুশি হয়েছে। ঐ শয়তানটার নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়ার খুশি। জানেন না তো দাঙ্গার সময়ে হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করে কিছু রাখেনি। পয়সা দিয়ে পুলিশদের হাত করে রাখে। থাক এসব কথা, আপনি ঘুমান। একটুপর আমাকে আবার চলে যেতে হবে।

মফিজুল ওর হাত চেপে ধরে, আপনি আরো কিছুক্ষণ থাকেন আকবর ভাই। জানেন কি আমাদের বন্ধুদের লাশ কী করেছে?

সব লাশ নিয়ে গেছে।

কোথায় সরিয়ে নিলো?

আকবর মাথা নাড়ে, জানি না।

বালিশে মাথা এলিয়ে দেয় মফিজুল। ক্ষণিকের এই উত্তেজনা আবার দপ করে পড়ে যায়। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, পা নড়াতেই পারছে না। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। ওর আর আকবরের কথা মনে আসে না।

বিকেল তিনটের দিকে ওদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের পুরো দোতালা আহত রাজবন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সারি সারি বিছানায় মানুষগুলো যন্ত্রণায় কাতরায়। মফিজুলের পাশের বিছানায় অনন্ত, তারপরে কম্পরাম। বিশাল বপুর মানুষটি যেন সারা খাটজুড়ে শুয়ে আছে। গুলিতে উরু ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দূর থেকে মনে হয় হাজার হাজার স্প্লিন্টার ঢুকে আছে ওখানে। মুখ থেকে গোঙানির ধ্বনি বের হয়। মনে হয় না কম্পরাম চেতনে আছে। নিজের খাট থেকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে মফিজুল। ওর পায়ে ব্যান্ডেজ সেজন্য উঠে কাছে যেতে পারে না, কপালে হাত রাখতে পারে না। নার্সরা আসে, কী সব করে, ডাক্তার ফিসফিসিয়ে কথা বলে, ভাবভঙ্গি দেখলে

BanglaBook.org

ক্রোধ বাড়ে। মফিজুলের ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে গালি দিতে, কিন্তু অনন্ত ওকে শাসন করে। বলে, ধৈর্য ধর। আমরা প্রতিশোধ যদি নিতে না পারি, তাহলেও হাজার হাজার মানুষ বেঁচে থাকবে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তেমন দিন আসবে মফিজুল। আমার গভীর বিশ্বাস এইসব অত্যাচার, নির্যাতন প্রতিবাদহীন যাবে না। মানুষ জালিমদের কলজে টেনে বের করবে। জনগণ প্রতিশোধের আগুন জ্বালাবে।

মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া অনন্ত দেব অল্প একটু কথা বলে হাঁফিয়ে ওঠে। মুখ লাল হয়ে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে মফিজুল অনুভব করে নিজের ক্রোধকে কত কষ্টে দাবিয়ে রাখছে অনন্ত দেব।

মফিজুলের মনে হয় এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে ওর আঘাতই সবচেয়ে কম। বরিশালের আবদুস শহীদের হাঁটুতে স্পিলিন্টার ঢুকে জোড়ার হাড় ভেঙে দিয়েছে। বেচারা পা সোজা করতে পারে না। পা সোজা রাখার জন্য একখণ্ড ভারী কাঠ পায়ের সঙ্গে লাগিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সে এক দৃশ্য বটে। তার পাশের বেডে শুয়ে থাকে আমিনুল ইসলাম। পায়ের গোড়ালির উপরিভাগে বুলেট লেগে একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছে যে আমিনুল খোঁড়া হয়ে যাবে। স্বাভাবিক পা আর ফিরে পাবে না। সমস্ত মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে হক। বিলের লাঠির আঘাতে আহত হবার সাতদিন পর হকের জ্ঞান ফিরে আসে। এখনো ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ চালায়। উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকে হকের খাট। দূর থেকে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে মফিজুল। সবচেয়ে কষ্ট হয় কম্পরামের জন্য, ওর প্রিয় মানুষ। এখন পর্যন্ত চোখ খুলে তাকায়নি। গোঙানির ধ্বনিটা কখন যে শরীরের কোন জায়গা থেকে ওঠে নিজেও টের পায় না।

কদিন ধরে ভালো ভালো খাবার দেওয়া হচ্ছে। ছাগলের কলিজা, মাখন, মাছের ঝোল ইত্যাদি। কিন্তু খেতে রুচি হয় না। সবকিছু ছাপিয়ে খাপরা ওয়ার্ডের রক্ত চোখের সামনে জমাট হয়ে ওঠে। গুলিবিদ্ধ শরীর যেন পচে না যায় সেজন্য পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে আসার পর ওর তেমন ঘুম হতো না, তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। যেদিন গভীর ঘুম হলো সে রাতেই মারা গেলো কম্পরাম। রাত্রিবেলা কখন তার মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হলো টেরই পেলো না ও। সকালে দেখলো শূন্য বিছানা। তাকাতেই বুক ধড়াস করে ওঠে। নার্সদের জিজ্ঞেস করে জানলো, ওর আশঙ্কা সত্যি। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলো মফিজুল। ছাগলের কলিজা খেতে ভালোলাগে, কিন্তু সেদিন আর কিছুই খাওয়া হলো না। বারবার বাবা-মার কথা মনে পড়লো। অনেকদিন ওদের কোনো চিঠি পাচ্ছে না। কেমন আছে সে খবরও জানে না। কম্পরামের সাদা বিছানার মতো হাসপাতালের দিনগুলো বিবর্ণ হয়ে গেলো।

খাপরা ওয়ার্ডে গুলি চালানোর খবর শোনার পর থেকে একটা লাল রঙের মহানন্দা নদী আলী আহমদের চোখের সামনে দিয়ে বইতে থাকে। স্বপ্নে বাস্তবে নদীটা ওকে ভূতের মতো তাড়া করে। জেলখানার লোকজনকে ধরে মফিজুল বেঁচে আছে এই খবরটা পেয়েছে, দেখা করার সুযোগ নাই। পুষ্পিতার খুব মন খারাপ। বিভিন্ন ঘটনার চাপে ও বিপর্যস্ত। কয়েকদিন জ্বরে ভুগেছে। প্রতীকেরও জ্বর। প্রত্যয় স্কুলে যেতে চায় না। ফজলে গাজীর মৃত্যুর খবর শুনে এবং মফিজুলের পায়ে গুলি লেগেছে শুনে ও কেমন বোবার মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করে। একদিন দুপুরবেলা ওর পাশে শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, বাবা আমাকে একটা পিস্তল কিনে দাও।

BanglaBook.org

কী করবি?

মানুষ মারবো।

কয়জনকে মারবি?

প্রদীপ্ত চুপ করে থেকে বলে, তুমি কি ভেবেছো বাবা যে মারার মতো এত লোক আছে যে মেরে কুলিয়ে ওঠা যাবে না?

আলী আহমদ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তুই এত বুঝিস না বাবা। এই বয়সে এত বেশি বুঝতে নেই।

কে বললো বুঝতে নেই? আমি তো অনেক বড়ো হয়েছি। ক্লাসের সব ছেলেদের চেয়ে আমি লম্বা।

তা ঠিক, কয়দিন পর তুই আমার চেয়ে লম্বা হয়ে যাবি। তখন তোকে আমি বাবা ডাকবো।

যাহ্।

প্রদীপ্ত লজ্জায় বালিশে মুখ লুকোয়। আলী আহমদ হিসেব করে দেখলো ছেলের বয়স বারো হতে আর কয়েক মাস বাকি। দ্রুত সবকিছু বুঝতে শিখছে– অভিজ্ঞতা ওকে আরো বুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু উপায় কী? আলী আহমদ চাইলেও তো এইসব ঘটনা থেকে ছেলেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। আলী আহমদের মনে হয় সরিয়ে রাখা উচিতও নয়। ছেলে দু'চোখ মেলে দেখুক– দেখে দেখে নিজে শিখুক। এই ওর দেশ, ওর রাজনীতি, ওর ধর্ম, ওর অর্থনীতি, ওর সংস্কৃতি। এই জানাটাই ওর জন্য হবে গভীর এবং মর্মস্পর্শী। এই জানাটাই হবে সত্যিকারের জানা। আলী আহমদ ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকে, দীপু।

ও মাথা তোলে, বাবা।

অনেকদিন তুই আর আমি রেললাইন ধরে বেড়াইতে যাই না রে।

ঠিক বলেছো বাবা। চলো, আজ যাবে?

যাবো। চল যাই।

আচ্ছা বাবা, রেললাইন তোমার এত প্রিয় কেন?

আলী আহমদ একটু থেমে বলে, ঐ সমান দুটো লাইন দেখলে আমার কবিতার লাইন মনে আসে।

দারুণ বাবা। আমি সেদিন তোমার কবিতার খাতা খুলে অনেকগুলো কবিতা পড়েছি। বুঝতে পারিনি।

আলী আহমদ হা-হা করে হাসে।

বাবা তোমার বইটা কবে বেরুবে?

আলী আহমদ নিশ্বাস ফেলে, বেরিয়েই তো যেতো এতদিন– এতসব ঘটনায় আমার কি মাথার ঠিক আছে।

বাবা চলো আমরা অন্য কোনো শহরে চলে যাই।

চাইলেই কি আর যাওয়া যায়! আমারও ইচ্ছে ঢাকায় চলে যাই। ঢাকায় গেলে তোকে একটা ভালো স্কুলে পড়াতে পারবো। আমার অনেকগুলো বই বের হবে। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করবো। আরো কত কি।

ভাবতেই স্বপ্নের মতো লাগে আলী আহমদের। ছেলেকে বলা হয় না যে আরো কত কি বলতে– ওর জুলেখার কথা মনে হয়েছে। জুলেখার জন্য বুকের ভেতর চাপা বেদনা আছে। ও বুঝতে পারে না কেন? হয়তো কিছু না, হয়তো গভীর কিছু না, কিন্তু মন খচ

BanglaBook.org

খচ করে। বোদলেয়ারের কবিতার কথা মনে হয়। যে কবিতায় বোদলেয়ার বলেছে, 'আমি ভালোবাসি মেঘ, যে সব মেঘেরা ভেসে যায়। ঐ ওখানে...ঐ সেখানে...বিস্ময়কর মেঘেরা।' জুলেখা ওর জীবনে মেঘ– অনেক দূরের, কখনো আষাঢ়ের, কখনো বৈশাখের...শুধু বিস্ময় হয়ে ওর জীবন জুড়ে থেকে যাবে।

বাবা।

প্রদীপ্তর ডাক ওর কানে যায় না। বড় বেশি একতরফা এই ভালোলাগা, সেইজন্য বড় জীবন্ত এবং গভীর। আপন মনে লালন করার আনন্দ যে কী তৃপ্তিদায়ক তা কাউকে বোঝানো যাবে না। আলী আহমদ নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে যায়। প্রদীপ্ত ওকে ঠেলা দেয়, বাবা? ও বাবা?

ও চমকে তাকায়, কী হয়েছে রে?

তুমি না বলছিলে বাইরে যাবে? চলো। রোদ পড়ে গেছে।

ঠিক আছে ওঠ। তৈরি হয়ে নে।

প্রদীপ্ত লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে যায়। অল্পসময়ে দুজনে তৈরি হয়ে বের হয়। প্রদীপ্ত রেললাইনের স্লিপারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। ওর ভারি আনন্দ, ও যেন মুক্ত পাখি, খোলা আকাশ পেয়েছে। আলী আহমদের মনে হয় ইকারুসের মতো ওর পিঠে দু'টো ডানা লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? সূর্যের কাছাকাছি ওর যেতে হবে না, ও শুধু একটা আপন জগৎ গড়বে– যেখানে উড়ে গেলে ডানা গলে যাবার ভয় নেই, শুধু একদিন মানুষ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। প্রদীপ্ত কি ওর মতো বন্দি মানুষ হবে? যার চারদিকে হাজার রকম বেড়ি– কোনো স্বাধীনতা নেই। নাকি মুক্ত মানুষ হবে? যার চারদিকে কোনো বেড়ি থাকবে না– নিজের ইচ্ছেমতো নিজেকে তৈরি করা যাবে– শিক্ষায়, সৃজনশীলতায়, মননচর্চায় একজন পরিপূর্ণ মানুষ করে। তখন ওর নসরুল্লাহর কথা মনে হয়, মজলে গাজীর কথা মনে হয়, খাপরা ওয়ার্ডের সেইসব মানুষগুলোর কথা মনে হয়– কী প্রবল বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে ওরা লড়েছে, প্রদীপ্ত ওর যৌবনে-প্রৌঢ়ত্বে কি একটি নিরাপদ আবাস পাবে? আলী আহমদের মাথাটা বোঁ করে ওঠে– ওর ডানে খোলা মাঠ– মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় থাকলেও দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছুয়– কত ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেকে। কিছু করা হলো না এই গ্লানি মুহূর্তে ওকে আচ্ছন্ন করে। ও নিজেও কখন যে লাইনের মাঝখানে চলে এসেছে টের পায় না। প্রদীপ্ত হাত ধরে টানে, বাবা চলে এসো। একটা মালগাড়ি আসছে। ধীর লয়ে এগিয়ে আসছে মাল গাড়িটা, লাল রঙের অল্প কয়েকটা বগি। দু'জনে পাশে দাঁড়িয়ে গাড়িটার চলে যাওয়া দেখে। সন্ধ্যায় প্রদীপ্তকে নিয়েই দিশারী সাহিত্য মজলিশের আড্ডায় আসে আলী আহমদ। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে এই সংগঠন। 'দিশারী' নামে পত্রিকা বের করা হবে। তার তোড়জোড় চলছে। পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার ওপর মূল প্রবন্ধ লিখছে আলী আহমদ। লেখাটা এখনো শেষ হয়নি। কেউ কেউ ওকে একটি কবিতা দেওয়ার জন্যও বলছে। কিন্তু পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতে ও রাজি হয়নি। একই সংখ্যায় দু'টো লেখা লিখতে ওর রুচিতে বাধছে। আড্ডা জমে উঠেছে। ওকে দেখে সবাই হৈ-হৈ করে ওঠে। আমিন জিজ্ঞেস করে, লেখা কতদূর?

হচ্ছে। আলী আহমদ মৃদু হাসে।

হচ্ছে বললে হবে না। দ্রুত লিখতে হবে। আপনারটা লিডিং আর্টিকেল। দেরি হলে আবার ছাপার কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে।

শুরুতেই আক্রমণ। ও আগে সুস্থ হয়ে বসুক। এক কাপ চা দাও। তারপর তো কথা।

BanglaBook.org

ফজলুর কথায় আমিন উচ্চস্বরে কালুকে ডেকে চা দিতে বলে। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া, কেমন একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রদীপ্ত বারবার কাশছে। ওর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ফলে আলী আহমদের বেশিক্ষণ আড্ডা দেওয়া হলো না। ছেলেকে নিয়ে বেরুতে হলো। সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাত বেশি নয়। পথে লোক চলাচল বেশ। আলী আহমদের মনে হয় ধুলোওড়া এই রুক্ষ শহরটা ওর চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে। প্রথম যেদিন এই শহরে এলো তার সঙ্গে আজকের এই শহরের অনেক- অনেক তফাৎ। এত জল গড়িয়েছে যে সে জলে বদলে গেছে শহরের চরিত্র, মানুষ এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা। আলী আহমদের চিন্তা ছিন্ন করে প্রদীপ্ত ওকে ডাকে, বাবা?

বলো।

তুমি আমাকে একটা খেলনা বন্দুক কিনে দাও না বাবা।

এখানকার দোকানগুলোতে খেলনা বন্দুক তো আমার চোখে পড়েনি দীপু।

তাহলে কি তুমি আমাকে ঢাকায় গেলে কিনে দেবে? ঢাকায় নিশ্চয় আছে। ঢাকা অনেক বড় শহর না বাবা?

হ্যাঁ, অনেক বড়।

প্রতীককেও একটা বন্দুক কিনে দিও বাবা।

দেবো। দুজনকেই দেবো।

উহ্, খুব মজা হবে। দুজনে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবো।

যুদ্ধ যুদ্ধ?

হ্যাঁ বাবা। বড় হয়ে আমি একটা সত্যিকারের বন্দুক কিনবো।

কেন দীপু? বন্দুক দিয়ে কী হবে?

আলী আহমদের গম্ভীর কণ্ঠে দীপুর উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে। ও কথা বলে না। চুপ করে থাকে। তারপর দুজনে চুপচাপই বাড়ি ফেরে। পুষ্পিতা তখন প্রতীককে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইছিলো। কিন্তু প্রতীকের চোখে ঘুম নেই। ও বারবার মার কাঁধের ওপর থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে, বাবা আর ভাইয়া কই?

গেটে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ও মায়ের কোল থেকে নেমে ছুটে যেতে চায়। পুষ্পিতা প্রতীককে বুকে নিয়ে দরজা খুলতে যায়, দরজা খোলে- দরজার সামনে দুজন প্রিয় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তবু অন্ধকারে ওদের অবয়ব অচেনা হয়ে ওঠে। এপার থেকে পুষ্পিতার মনে হয় আলী আহমদ নয়, অন্য কেউ। প্রদীপ্ত বলে, মা আলো আনোনি কেন, ঠিকমতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে? উহ্, যা অন্ধকার।

আলী আহমদ ছেলেকে বলে, তুই আমার হাতটা ধর দীপ, হোঁচট খাস না যেন।

শব্দ করে হেসে ওঠে পুষ্পিতা, বাবাদের হাত ধরে হাঁটতে না পারলে বাচ্চারা আনন্দ পায় না।

ওরা ঢুকে গেলে পুষ্পিতা দরজা বন্ধ করে দেয়- মানুষকে আড়াল করে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

রাজশাহী কোর্টে ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। খাপরা ওয়ার্ডে গুলির ঘটনা নিয়ে শহরবাসী বিচলিত, ক্রুদ্ধ, এর মধ্যে এই মামলা আগুনে ঘৃতাহুতি। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতির জন্য সোচ্চার প্রতিবাদ করা যাচ্ছিলো না। কোর্টে কিছু বলাও ছিলো নিষিদ্ধ। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদের নিদর্শন হিসেবে কালো ব্যাজ লাগিয়ে কোর্টে

BanglaBook.org

যায়। এদিকে রাজশাহী জেলের মহিলা রাজবন্দিরা ইলা মিত্রকে বলে পুলিশ তোমার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে তার একটি পূর্ণ বিবৃতি তোমাকে দিতে হবে। একটি শব্দও যেন এদিক ওদিক না হয়।

জেলে অসুস্থ ইলা মিত্র। নির্যাতনের ফলে ভালো করে হাঁটতে পারে না। মামলার দিনে পুলিশ বেষ্টিতে ঘোড়ার গাড়িতে করে কোর্টে হাজির হয়। কিন্তু মনোবল অটুট। কোর্টে উপস্থিত হয়ে জবানবন্দীর আকারে একটি বিবৃতি দেয়। লোমহর্ষক সে জবানবন্দী। ইশতেহার আকারে তা ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। যে পড়ে, সে শিউরে ওঠে, কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতা।

সে ইশতেহার পড়ে গুম হয়ে থাকে আলী আহমদ, আর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে পুষ্পিতা। কান্না থামলে বলে, মানুষ মানুষকে এমন করে নির্যাতন করতে পারে? ধর্ষণসহ এত অত্যাচার করার পর আবার যোনিপথ দিয়ে গরম সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো?

ওহ্, কথাগুলো উচ্চারণ কোরো না পুষ্পিতা।

পুষ্পিতা শাড়ির আঁচলে নাক- চোখ মুছতে মুছতে বলে, ইলা মিত্র তাঁর জবানবন্দীতে যে নির্যাতনের কথা লিখেছে তা ভাবতে যে আমার কষ্ট হচ্ছে? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

আলী আহমদ গভীর শ্বাস ফেলে বলে, তবু এসবই সত্য। এই শহর থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখা হলো। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার না হতে হলে আমি হয়তো রাজনীতির অনেক কিছু শিখতে পারতাম না।

প্রদীপ্ত কাছে এসে দাঁড়ায়, বাবা মা কাঁদছে কেন? মার কীসের দুঃখ?

পুষ্পিতা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, আমার কোনো দুঃখ নেই দীপু।

তবে কাঁদছো কেন?

মানুষ যে মানুষ থাকছে না এই ভেবে।

যাহ্ তা কি হয়?

আলী আহমদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, হয় দীপু। বড় হলে বুঝবে।

প্রদীপ্ত দুজনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

যেদিন বিচারের রায় হবে সেদিন আলী আহমদ নিজে কোর্টে উপস্থিত হয়। কোর্ট প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। এদিকে জেল হাসপাতালে ইলা ভীষণ অসুস্থ। ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। এক রকম বিনা চিকিৎসায় নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এসব রোগের সঙ্গে কিছুদিন টাইফয়েডে ভুগে আবার কালাজ্বরে পড়েছে। রাজবন্দিরা তাকে যথাসাধ্য সেবাযত্ন করে। এতকিছুর মধ্যে বিচারের তারিখ পড়লে আবার কোর্টে যেতে হয়। দূর থেকে তাকে বালিকার মতো লাগে। আলী আহমদের মাঝে মাঝে খটকা লাগে। এই ছোটোখাটো নারী কী অসামান্য সাহসে কাঁপিয়ে দিয়েছে পুরো এলাকা। সবার মুখে তার নাম। তার জন্য পুলিশের বুটের লাথিতে প্রাণ দিলো সাঁওতালরা। একজন মানুষও স্বীকার করেনি যে দারোগা ও পুলিশকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে ইলা মিত্র। সাধারণ মানুষের কী গভীর ভালোবাসা পেয়েছে এই বালিকার মতো নারী। শিরীষ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে আলী আহমদ। জেলা সেশনস জজ এস. আহমেদ এজলাসে এলেন। তিনি আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পাকিস্তান পেনাল কোডের ৩০২/১৪৯ ধারা অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হয়েছে। বিচারক তাঁর রায়ে বলেছেন, আসামিদের সবাই আইনসম্মত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেনি এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলো। তবে এটা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি যে ঠিক কার অথবা কাদের আঘাতে মৃত্যু

BanglaBook.org

সংঘটিত হয়েছে। সেজন্য আদালত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকছে। আলী আহমদ কিছুটা আশ্বস্ত হয়। ফাঁসির আদেশের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো। বীরেন সরকার ইলা মিত্রের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে। বেরুবার সময়ে তার সঙ্গে দেখা হলে আলী আহমদ জিজ্ঞেস করে, বীরেনদা এখন?

বীরেন উত্তেজিত। বলে, হাইকোর্টে আপিল করা হবে। ব্যস্তভাবে চলে যাওয়া বীরেন সরকারের পিঠের ওপর আলী আহমদের দৃষ্টি আটকে থাকে। সাদা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে। আলী আহমদ শ্লথ পায়ে হাঁটতে থাকে, রিকশা নেয় না। 'দিশারী' পত্রিকা বেরিয়েছে। ওর লেখা ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যার কাজ চলছে। ওকে একবার পত্রিকা অফিসে যেতে হবে, কিন্তু কোনো তাড়া অনুভব করে না। কেবলই মনে হয় সব কাজ ফুরিয়েছে। আবার নতুন করে শুরু, আবার শুরু। এই কীর্তিনাশার শহর, এই লাল ধুলোর শহর থেকে ওর এবার ছুটি। ও পদ্মার ধারে চলে আসে। গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। শিরীষের ডাল থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে হলুদ পাতা।

শহরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। চালের দাম বেড়েছে, দু'আনা সেরের লবন ধাম করে ষোল টাকা সেরে উঠে গেছে। গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসছে মানুষ। স্টেশনে গৃহহীন মানুষের ভিড়। শহরবাসী বিমূঢ়। যারা নুন-মরিচ দিয়ে ভাত খায় তারা ঘোলা চোখে তাকিয়ে থাকে।

ছাত্ররা বলে, সবই রাজনীতির খেলা। সরকার এভাবেই জনগণকে আছাড় মারে।

দিশারী অফিসে তুমুল তর্ক জমে ওঠে। এই দুর্ভিক্ষ কেন মানুষের জীবনে অনিবার্য হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়। চুপচাপ বসে থাকে আলী আহমদ। মনে হয় মিছেই এইসব লেখালেখি, কি হচ্ছে, কতদূর এগুনো যাবে, অনবরত যে শুনতে হয়, একমুঠ ভাত দেন আম্মা? কতজন কে দেবে? যারা দেবে তাদের সামর্থ্য কতটুকু? একসময় তর্ক পাশ কাটিয়ে উঠে আসে আলী আহমদ। একা একা রাস্তায় হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কেবলই মনে হয়, মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে। মানুষ কি তখন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অনির্দিষ্ট শূন্যে তাকিয়ে থাকবে? নাকি হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দেবে সামনে? কোটি কোটি থাবা? আলী আহমদ চোখ বুঁজলে মানুষের থাবা দেখতে পায়। ওর তখন সাহস বেড়ে যায়। ও ওর দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'কান ভরে ভাতের জন্য মানুষের আর্তনাদ শোনে।

BanglaBook.org

দু'দিন পর কলেজে গিয়ে খবরটা পায় ও। প্রচণ্ড খুশিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। ঢাকায় বদলির অর্ডার এসেছে। এখানকার পাট চুকলো। পুষ্পিতাও শুনে খুশি। প্রদীপ্ত বাবাকে জড়িয়ে ধরে। বাবার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে।

বাবা আমরা কিভাবে যাবো ঢাকায়?

প্রথমে ট্রেনে। তারপর স্টিমারে করে নদী পার হবো। তারপর আবার ট্রেন। একেবারে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়ে নামবো।

উহ্, কী মজা! নদী পার হওয়াটা দারুণ হবে না বাবা?

হ্যাঁ দারুণ। স্টিমারের ধাক্কায় ছোটো ছোটো ঢেউ ভেঙে পড়ে। সূর্যের আলো সে ঢেউয়ের ওপর পড়লে রূপোলি মালার মতো লাগে।

হয়েছে, বাবা ছেলেতে মিলে আর কাব্য করতে হবে না। কালকে ওর পরীক্ষা। ভুলে গেছিস দীপু?

না, মা ভুলিনি।

এইসব কথা শেষ হতে না হতে হুড়মুড়িয়ে মফিজুল ঢোকে, রোগা হয়ে গেছে, একমুখ দাড়ি। ওকে দেখে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। আলী আহমদ বুকে জড়িয়ে ধরে। পুষ্পিতা বলে, ছেড়ে দিয়েছে তোকে?

হ্যাঁ, ছেড়ে দিলো। বেরিয়ে সোজা এখানে চলে এলাম। কাল ভোরের ট্রেনে বাড়ি যাবো।

তোর খুব খিদে পেয়েছে না রে?

তা পেয়েছে।

কি খাবি বল?

লুচি আর আলু ভাজি।

আমি এখুনি বানিয়ে আনছি। তুই গোসল করে নে। দীপু ওকে গামছা লুঙি দে।

অনেকদিন বাবার কোনো চিঠি পাইনি। বাড়ির খবর কি?

সবাই ভালো আছে।

আলী আহমদ কথা বলতে বলতে উঠে যায়। ও মফিজুলের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। মফিজুল এতকিছু ভাবে না। মুক্তির আনন্দে ও উৎফুল্ল। শিস বাজাতে বাজাতে ও গোসল করতে যায়। ফিরে এসে আলী আহমদকে বলে, আপনি ঢাকায় বদলি হওয়াতে ভালোই হলো। আমি ঠিক করেছি অনার্স আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বো। বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবে না। কি বলেন আহমদ ভাই?

আমারও তাই মনে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো হবে। আর তোর বাবা পড়ালেখা নিয়ে কবে আবার আপত্তি করলো।

ঠিক বলেছেন। এই দীপু আয়না চিরুনি নিয়ে আয় তো। কতদিন পরিপাটি করে চুল আঁচড়াই না।

দীপু দৌড়ে ঘরে গেলে মফিজুল অকারণে হা-হা করে হাসে। বলে, আজ আমার খুব ভালোলাগছে আহমদ ভাই। মনে হচ্ছে জীবনের চারদিকে খোলা। ভাবছি বাড়ি থেকে ফিরে এসে আমিও আপনার সঙ্গে ঢাকা যাবো। আপনি একা একা সংসার গোছাতে পারবেন না।

পুষ্পিতা সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, ঠিক বলেছিস। তুই সঙ্গে থাকলে আমাদের সাহস বাড়বে। নতুন জায়গায় কি হবে আমি তো ভেবেই পাই না।

আলী আহমদ হাসে, ভয়ের কি? আমরা তো অচেনা দেশকেই আপন করেছি। আমাদের মরে যেতে হয়, আমাদের ঘর পুড়ে যায়, ফেনের জন্য আর্তনাদ করি, ফণিমনসার ঝোপে আমাদের লাশ গেঁথে থাকে, বুটের লাথিতে মুখে রক্ত ওঠে, সব সংস্কার ভেঙে দিয়ে আমরা নগ্ন বিবৃতি দেই– বলি, দেখো সভ্যতার বড়াই করে তোমরা কেমন বর্বর আচরণ করতে পারো, যে আচরণ পশুবৃত্তিকেও হার মানায়, ঘর বন্ধ করে গুলি চালিয়ে রক্তের মহানন্দা বানাতে বুক কাঁপে না– তবু তো আমরা, এই স্বদেশের দিগন্ত দেখি, কীর্তিনাশার গর্জন শুনি, পুঁইয়ের মাচার ওপর দোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং ভাতের জন্য মানুষের আর্তনাদ ভুলে হিংস্র থাবা মুষ্ঠিবদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখি।

মফিজুল অবাক হয়ে আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুষ্পিতার নিশ্বাস পড়ে না। আলী আহমদের এমন গাঢ় স্বরে উচ্চারণ ওকে অভিভূত করে।

মফিজুল আলী আহমদের হাত চেপে ধরে। বলে, আপনি নিজেকে চিনেছেন আহমদ ভাই। আমাদের সবার উচিত আপনার মতো করে নিজেকে জানা।

BanglaBook.org

৮

ডোমপাড়ার বুলু দাস অহির প্রিয় মানুষ।

সারাদিনে একবার দেখা না হলে ও স্বস্তি পায় না। পাড়ার ছেলেরা হাসাহাসি করে। ডোমের সঙ্গে বন্ধুত্বে ওদের আপত্তি। অহি গ্রাহ্য করে না। যার সঙ্গে ও প্রাণের টান অনুভব করে, তাকে ও নির্দ্বিধায় ভালোবাসে। লোকের কথায় সে ভালোবাসার খাদ নষ্ট হয় না। মিশমিশে কালো বুলু দাস, বিশাল গোঁফ ঠোঁটের নিচে ঝুলে থাকে। তাড়ি খেয়ে প্রায় সারাদিনই নেশা করে। গভীর নেশায় আচ্ছন্ন হলে অন্য মানুষ হয়ে যায়। তখন ভিন্ন চোখে অহিকে দেখে। অহির বুকের তল কেঁপে ওঠে। বুলু দাস ঠা-ঠা হাসে। অহিকে বলে, নেশা না করলে কাজ করতে পারি না রে। অহি সরলভাবে বলে, তা হলে খাও, বেশি বেশি করে খাও। বুলু দাস ওকেও ভালোবাসে। সন্ধ্যা হলে রেললাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় দু'জনে। চাঁদনি রাত হলে বুলু দাস গলা ছেড়ে গান গায়। তখন এই ঢাকা শহর অহির ভীষণ আপন হয়ে যায়। ওর মনে হয় শহরটা ওর একলার।

মাঝে-মধ্যে মা ওকে বকাবকি করে। বলে, ঐ মাতাল ডোমটার সঙ্গে তোর এত কি? এ উত্তর ওর জানা আছে। কিন্তু বলতে পারে না। সে কথা ওর বুক পর্যন্ত আটকে থাকে। গলা ফুঁড়ে বেরোয় না। ও কেবলই অনুভব করে বুলু দাসের জন্য ও একটা টান বোধ করে। এই টান ওর বুকের ভিতর একটা স্পষ্ট ছবি হয়ে আটকে থাকে। ও পরিষ্কার দেখতে পায় বুলু দাস ওর প্রাণহীন দেহ মমতায় বুকে নিয়ে এক অলৌকিক রাস্তায় দৌড়ে যাচ্ছে। ওর মাংস ক্ষয়ে পড়ছে, রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে, তবুও সে শরীর থেকে বেরুচ্ছে জ্যোতি, ছড়িয়ে পড়ছে পথের দু ধারে, আলোকিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার লোকালয়। মায়ের অহি, বুলু দাসের অহি অন্য সবার অহিউল্লা এক থেকে বহু হয়ে যায়। এক অস্থির তাড়না মরমে মারে। ওর ভুবন বুলু দাস ছাড়া একদম নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। ও তখন রিনির মুখের দিকে তাকিয়ে এক অবিশ্বাস্য মৃত্যুর ছায়া অবলোকন করে। ভয়ে অহির কান্না পায়।

রিনি বলে ঘুম থেকে উঠলে ওর শরীরটা একদম ঝরঝরে লাগে। তখন ওর গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে। খিদের সময় কাঁদলে যেমন খিদে কমে যায়, এ-ও তেমনি। সুখের সময় সুখ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অহির কাছে ব্যাপারটা একদম উল্টো। ঘুম থেকে উঠলে ওর সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, জড়িয়ে যায় অনুভূতি। নিজেকে ডোমপাড়ার কাদায় পড়ে থাকা, লোম-ওঠা কদাকার শুয়োরের মতো মনে হয়। যেন থলথলে মাংসপিণ্ড একটা। এসব ভাবলে অহির ভেতরে তীব্র আলো জ্বলে উঠে। এই আলো ওকে নেশাগ্রস্ত করে। তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকা ওর প্রিয় মানুষ বুলু দাসের মতো। অহি বোবার মতো পা ছড়িয়ে দরজার উপর বসে থাকে। মাথার ওপর ছেঁড়া চট ঝোলে। রিনি নিঃসাড় ঘুমোয়। মা কাজে যাবার জন্য ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সানকি বেধে নেয়। ওদের জন্য কোনো খাবার নেই। শুধু রিনির জন্য এক বাটি পান্তা থাকে। ও খাবার না পেলে এক অসম্ভব স্বরে চিৎকার করে। আট বছরের রোগা কাঠির মতো শরীরে কোথা থেকে এত শক্তি এসে জড়ো হয় ভেবে পায় না ওরা। ওর মা এবং অহি দুজনেই তখন অবাক হয়ে ওকে দেখে। বুঝতে পারে না কোনো-কোনো পরিস্থিতি মানুষকে এমন অস্বাভাবিক মানুষে বদলে দেয় কেন? স্বাভাবিক সময়ে এইসব পরিবর্তনগুলো কোথায় থাকে? কোনো কিছু ভাবলে সে জিনিস সারাদিন অহির মগজে আটকে থাকে। বার বার ওর কাজে ভুল হয়। তবু ও ভাবতে চেষ্টা করে রিনির এই আচরণটুকু। অহি জানে ভেবে এর উত্তর পাবে না। তবু ভাবতে হয়। এই বাড়তি জিনিসটা কি এখনও অহি বুঝতে পারে না। তখন

BanglaBook.org

রিনির মুখের ওপর ভেসে ওঠা মৃত্যুর ছায়া ওকে গ্রাস করে। ও বিমূঢ় হয়ে থাকে।

অহি বিরাট করে হাই তোলে। যেন ভোরবেলার পুরো বাতাস ওর শরীরের জন্যে দরকার। অহির বয়স চৌদ্দ। বাড়-বাড়ন্ত শরীর। শরীর দেখে মনে হয় না যে অভাব ওর পিছু ছাড়ে না। ওর শরীর নিয়ে রিনির মনে হিংসা আছে। রিনির অসুখ লেগেই থাকে। মেজাজ তিরিক্ষে। কাউকে সহ্য করতে পারে না। মা ভাত নিয়ে ঘরে ফিরলে লুফে নেয় ভাতের থালা। রিনি জানে এই সংসারে ঐ ভাতের থালার ওপর ওর দাবি সবার আগে। তবু ওর ভয়। এই বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেলো। রিনিকে ওর অসুস্থতার কারণেও একটু বেশি ভালোবাসে অহি। চায়ের দোকান থেকে লুকিয়ে বিস্কিট নিয়ে আসে ওর জন্য। দোকানে যেতে ভালো লাগে না, কাজ করতেও না। তবু ঐ চায়ের দোকানের কাজটাই সম্বল। নিজের ভাত জোটে, মায়ের কষ্ট লাঘব হয়। পরের বাড়িতে কাজ করে ওর মা তো তিনজনের ভাত আনতে পারে না। কয়লার চুলো জ্বালাতে ওর কষ্ট হয়– ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে ওঠে– কাশিতে বুক ভেঙে আসে। তবু এটা ওর জন্য জরুরি। এই অনুভূতি ওকে অস্থির করে। তখন ও বুলু দাসের কাছে আসে। বলে, বুলুদা কয়লার চুলো জ্বালাবার সময়ই আমি রিনির অসুখের কষ্ট বুঝতে পারি।

বুলু দাস হা-হা করে হাসে। ওর মুখের খোট্টাই ভাষা বাতাসে উড়ে যায়। অহি সব বোঝে না, বোঝার চেষ্টা করে। বুলু দাস খুব নিজস্ব ভঙ্গিতে আধো বাংলায় ওর সঙ্গে কথা বলে, নিম্ন স্বরে এবং আন্তরিক উপলব্ধিতে। অহির মনে হয়ে যে, বুলু দাস ছাড়া ওকে আর কেউ এমন অভিভূত করতে পারে না। যে ওর কেউ না, যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, শুধু এক অদ্ভুত প্রীতির বন্ধন, সে কখনো ওর বাবার মতো হয়ে যায়, কখনো ভাই, কখনো মা, বোন কিংবা নানা, অথবা তেমন কোনো পূর্বপুরুষ, যার রক্ত বংশপরম্পরায় ওর ধমনিতে প্রবাহিত। এই এক বোধে ও হালকা মেঘের মতো আকাশে উড়ে যায়। বৃষ্টি হয়ে ঝরে অনুর্বর লোকালয়ে, ফসলে ভরে তোলে পতিত জমি। তীব্র বিবমিষা টকটকে লাল হয়ে প্লাবিত করে অহির চেনা জগৎ। ওর হাতে চায়ের কেতলি স্থবির হয়ে যায়, থেমে যায় চামচের টুং টাং শব্দ। যেন অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চায়ের দোকান, এখানে মানুষের নিশ্বাসেরও শব্দ নেই। অহি এমন অবস্থায় বয়স্ক হয়ে যায় বলেই মাঝে-মধ্যে দোকানের মালিকের হাতে পিটুনি খায়।

পিটুনি এখন ওর গা সওয়া। মালিক ওকে বুঝতে পারে না। এতে অহির কোনো দুঃখ নেই। যেদিন পিটুনি খায় সেদিন বুলু দাসের কাছ থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।

বুলুদা ইচ্ছে হয় তোমার কাছ থেকে যাই। তোমার মতো হয়ে যাই।

আমার মতো? কেন রে?

এমনি। তুমি কাজ করো, নেশা করো, গান গাও। তোমার আর কি।

শুধু এইটুকু।

না এইটুকু না। আরো কিছু। অন্য কিছু।

কী?

জানি না।

অহির কথা ফুরিয়ে যায়। ও বুলু দাসের মুখোমুখি ঘাসের ওপর বসে থাকে। সন্ধ্যার লোকাল ট্রেন হুসহুসিয়ে চলে যায়। অহির বুকের ভেতর ঘটাং ঘটাং শব্দ। দূরে আম গাছের ডালে প্যাঁচা ডাকে একটা। ডোমপাড়ার কোলাহল স্তিমিত। মাঝে-মধ্যে দু-একটা অসংলগ্ন চিৎকার শোনা যায়। নেশার ঘোরে প্রচণ্ড গালাগালি। বুলু দাসের কোলের ওপর

BanglaBook.org

মাটির হাঁড়িতে তাড়ি। নেশা ওকে কাবু করে না। ও অন্য ডোমদের মতো নয়। কখনো রাগে, মেজাজে খিস্তি-খেউড় আওড়ায় না। মনে হয় নেশা করলে বুলু দাস আরো শান্ত, আরো নিশ্চুপ হয়ে যায়। মানুষ ধ্যানে বসলে যেমন, অনেকটা তেমন। বুলু দাস হা-হা হাসিতে চারপাশ ভাসিয়ে দিয়ে বলে, লোকে যেমন প্রার্থনার সময় উপুড় হয়ে থাকে, নেশা আমার তেমন প্রার্থনা। অহির মনে হয়, সত্যি কি? যে নেশায় মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নেই মানুষ তা হলে তেমন নেশা করে না কেন?

অহি, আজ কি তোকে বেশি মেরেছে?

কষে দুটো থাপ্পড় দিয়েছে। মাথাটা এখনো ঝিমঝিম করেছে।

ঘুষি দেয়নি?

না।

লাথি?

না।

তা হলে আজ কমই খেয়েছিস।

হ্যাঁ, অন্য দিনের চাইতে কমই।

অহি।

বলো।

মার খেলে তোর কষ্ট হয়।

তোমার কাছে এলে ভুলে যাই।

অহি।

বলো।

বুলু দাস আর কথা বলে না। অহি উন্মুখ হয়ে থাকে। বুলু হাঁড়ি মুখের কাছে নিয়ে চুমুক দিয়ে খায়। এক চুমুকে অনেকখানি গলগলিয়ে চলে যায়।

এ জন্য তোমার উপর আমার রাগ হয়।

কেন?

একটা কিছু বলতে চেয়ে থেমে যাও।

হাঁড়িটা ঠক্ করে ঘাসের উপর রাখে বুলু দাস।

মালিক তোকে মারে কেন অহি?

ঠিকমতো কাজ করতে পারি না যে।

কেন পারিস না?

জানি না।

আমি জানি।

কি?

তুই অন্য ছেলেদের মতো নস তো, সে জন্য। চায়ের দোকানে তোকে মানায় না।

ধুর, কি যে বলো। নেংটির আবার রাজার চেয়ারের শখ।

ওর কথায় হা-হা করে হাসে বুলু। আশেপাশে লোক চলাচল নেই। নির্জন হয়ে গেছে। রাত বাড়ছে। গভীর, ভারি রাত। অহি ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে।

শুয়ে পড়লি যে? ঘরে যাবি না?

না।

পাগল! তোর মা কেঁদে-কেটে মরবে।

অহি কথা বলে না। হাতের তালুর উপর ওর মাথা। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। শরীরের

BanglaBook.org

খোলা জায়গায় ঘাসের সুড়সুড়ি লাগছে। বাবার কথা মনে হয় ওর। কে বা কারা বাবাকে খুন করলে এমন ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিলো ওর বাবা। কালছে রক্ত জমাট বেধেছিলো চারদিকে। কেন বাবা খুন হয়েছিলো কিছুই জানতে পারেনি ও। সে রহস্য ওর বুকের মধ্যে এখনো জমাট কালচে রক্ত। মা বলে, বাবা মুসলিম লীগের পক্ষে গুণ্ডামি করতো। সেজন্য অন্য পার্টির লোকেরা বাবাকে খুন করেছে। রাতের অন্ধকারে বাবার পিঠে আমূল বসিয়ে দিয়েছে ছুরি।

বাবা প্রতিবাদ করতে পারেনি, রুখে উঠতে পারেনি। মা বলে, যে মানুষটি অন্যদের এমন করে মেরেছে তাকেও একই পথে যেতে হলো রে। আল্লার বিচার আছে না?

বছর দুয়েক আগে এইসব ঘটে। অহির চেতনায় দগদগে ঘা। একটুও শুকোয়নি। অহি দেখেছে ওদের ঘরে ছুরি, ভোজালির শানানো ধার। কখনো বোঝেনি ওগুলো মানুষের ওপরই ব্যবহৃত হতো। বাবাকে কারা ব্যবহার করতো? কারা বাবাকে এমন নিষ্ঠুর বানিয়েছিলো? পা থেকে উঠে আসা এক শিরশির অনুভূতি অহিকে আচ্ছন্ন করে।

অহি।

বুলু দাসের ডাক ও শুনতে পায় না।

অহি, অহিউল্লা।

কোনো কিছু ওর মগজে ঢোকে না। ওর কেবলই মনে হয় কি ভীষণ অর্থহীন বাবার মৃত্যু। যারা মুসলিম লীগের কথা বলে, তাদের কাছে বাবার জীবনের এককড়ি দাম নেই। এই মৃত্যুর দায়ভার বহন করতে হচ্ছে ওকে, রিনিকে এবং ওর মাকে।

অহি।

বুলুদা, বাবাকে তোমার মনে আছে?

কেন থাকবে না।

কী মনে আছে? মরে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো, সে কথা?

ছিঃ এমন করে বলছিস কেন?

বাবা অন্যের হুকুম তালিম করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। তাতে বাবার কি লাভ হয়েছে?

এক দল মারে, অন্য দল মরে। এতে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন নেই রে।

এখন যে আমাদের খুব কষ্ট হয় ভাত জোটাতে।

অহি উঠে বসে। হাঁটুর উপর থুতনি রাখে। পিঠটা চুলকাচ্ছে। শুকনো ঘাস লেগে থেকে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। বুলু দাস শূন্য হাঁড়িটা দূরে ছুঁড়ে মারে।

তোর মা ভাবছে অহি।

আমাকে নিয়ে মায়ের খুব ভয়।

হবেই তো। তুই এক ছেলে।

তা নয়। মা ভাবে বাবাকে যারা মেরেছে, আমাকেও তারা মেরে ফেলতে পারে।

তুই বাড়ি যা।

যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি ফিরবে?

হ্যাঁ রে।

বুলু দাস উঠে দাঁড়ায়। জানে ও না উঠলে অহিকে বাড়ি পাঠাতে পারবে না। ওর মা এতক্ষণে বুলু দাসের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে শুরু করেছে। বহুবার এমন হয়েছে যে অহিকে পৌঁছুতে গিয়ে প্রচণ্ড গালাগাল শুনতে হয়েছে। না, বুলু দাস গায়ে মাখেনি। অহির ভালোবাসা ওর বর্ম। অহি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দু'টো উপরে তুলে ঝাঁকিয়ে নেয়।

BanglaBook.org

মাগো, আজ যা আঁধার।

ভয় করছে?

কিছুটা।

চল, তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

তোমাকে দেখলেই মা রাগ করবে।

না, আমি তোদের ঘর পর্যন্ত যাবো না। দোকানের কাছ থেকেই কেটে পড়বো।

মা তোমার সঙ্গে রাগ করলে আমার খুব খারাপ লাগে।

আমি গায়ে মাখি না।

বুলু দাস হেসে ওঠে। ঐ হাসি অহির কানে লেগে থাকে। মনে হয় কোথায় যেন এমন হাসি শুনেছিলো, কোথায় যেন এমন হাসি ও শুনতে পাবে। সারাক্ষণ ওর বুকের ভেতর এমন হাসি বেজেই যাবে। ও আগে আগে হাঁটছে, পেছনে বুলু দাস। এক সময় ও পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

আচ্ছা বুলুদা, মা কেন মনে করে বাবার শত্রুরা আমাকে মেরে ফেলবে?

তোর বাবার শত্রু কারা?

জানি না তো। তুমি জানো?

না, আমিও জানি না।

যারা বাবাকে গুণ্ডামি করতে বলতো তারা কি শত্রু?

তা কেন হবে? তারা তো টাকা-পয়সা দিতো।

কিন্তু ওরা তো জানতো গুণ্ডামি করা ভালো না। গুণ্ডামি করলে মরতে হয়।

বুলু দাস কথা বলে না। ওর নেশা জমে উঠেছে। মাথা কাজ করছে না। অহির এত কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর ওর পক্ষে দেওয়াও সম্ভব নয়। এইসব ও নিজেও ভালো করে বোঝে না। বুঝতেও চায় না। অহিকে ওর মাঝে-মাঝে ভয় করে। ছেলেটার ভেতরে জিজ্ঞাসা জমাট হয়ে থাকে। আগুনের মুখে তা লাভার মতো বেরুতে থাকে। ও আলাদা, অন্য রকম। বুলু দাস নিজেও ওকে তেমন বুঝতে পারে না। এত জিজ্ঞাসা নিয়ে ও কেমন করে চায়ের দোকানের ফাইফরমাশ খাটবে? মার তো ওকে খেতেই হবে। ও সাবধান হলেও ভুল হতেই থাকবে। ওর অবচেতন ওকে ঢেকে রাখবে। ভুল করাবে।

তুমি আর এসো না। এইটুকু আমি যেতে পারবো।

বুলু দাস কোনো কথা না বলে পিছু ফেরে। রাত হয়ে গেছে, ওর নিজেরও দাঁড়াবার ইচ্ছা নেই। অহি নিজেকে চাঙ্গা করার জন্য শিস বাজায়।

কুপিটা দরজার মুখে প্রায় নিভু নিভু। ও ঝাঁপ সরিয়ে নিঃশব্দে ঢোকে। মা জেগেই ছিলো। ওকে ঢুকতে দেখে খেঁকিয়ে ওঠে, ঐ ডোমটার ওখান থেকে ফিরলি বুঝি?

বুলুদাকে তুমি কেবল ডোম ডোম করো কেন মা?

শুধু ডোম, মাতালও একটা।

মা!

অহি তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে ওঠে।

বল কি বলবি?

আমি ভেবে দেখেছি ঐ ডোমটা আমার বাবার চাইতে ভালো।

কি বললি? তোর বাবাকে ডোমের সঙ্গে তুলনা করলি?

ঠিক বলেছি।

অহি!

BanglaBook.org

ওর মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। অহি চুপ করে যায়। গায়ের গেঞ্জি খুলে দড়ির উপর মেলে দেয়। শুনতে পায় ওর মা গুনগুনিয়ে কাঁদছে। অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখা যায় না। দরজার কাছে একটা কুপি টিমটিম জ্বলছে। অহি অন্ধকারে হাতড়ে ভাতের সানকি টেনে নিয়ে গপগপিয়ে খায়। কি দিয়ে খাচ্ছে কতটুকু খাচ্ছে কিছুই জানে না। খেতে পারছে এটাই সত্য। এতোক্ষণে বুঝতে পারে কী ভীষণ খিদে পেয়েছিলো। মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের জন্য অনুতাপে মন ভরে যায়।

মা।

জবাব নেই। কান্না স্তিমিত হয়ে গেছে। রিনির পাশে শুয়ে পড়েছে ওর মা। সারাদিনের খাটুনিতে একদম কাহিল থাকে। অহির উচিত মাকে আরো কিছু শান্তি দেওয়া। কিন্তু কিভাবে দেবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। চায়ের দোকানে যা পায় সব মাকে দেয়। এক পয়সাও নষ্ট করে না।

মাগো।

চুপ কর। জ্বরে মেয়েটার গা পুড়ে যাচ্ছে।

আবার জ্বর এসেছে?

অহি ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দেয়। ওর সামনে জমাট অন্ধকার। অন্ধকার রিনির মুখ। ও কী এমনি ভুগতে ভুগতে মরে যাবে? রিনি কি বাঁচবে না? অহির শরীর শক্ত হয়ে যায়। ও প্রাণপণে ভাবনাটা তাড়াতে চায়। না, কিছুতেই রিনিকে মরতে দেবে না। যে করেই হোক ওর ওষুধের ব্যবস্থা করবে। নিজের উপর ক্রোধ হয়। অসীম, অসহায় ক্রোধ। মনে হয় এখনো পিঠের নিচে ঘাস লেগে আছে। ও উঠে বসে। পিঠ চুলকায়। পা চুলকায়। অস্বস্তি কাটে না। অক্ষম ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখ ভেসে ওঠে। অহি বালিশে মুখ গোঁজে। আমার বাবা একটা ক্রীতদাস ছিলো, নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ছিলো না। বড়ো অর্থহীন বাবার মৃত্যু! বাবার জন্য কারো বুকে শোক নেই। জীবিত থাকতে বাবা যাদের জন্য হাত ছিলো, তারা কেউ ওর মাকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। বাড়ালে রিনি মরতে বসতো না। বাবা কার জন্য জীবন দিয়েছিলো? অহি মুখ খুলে শ্বাস নেয়। মাঝে-মধ্যে ওর এমন হয়। বুকে চেপে থাকে। সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারে না। ওর মনে হয় কে যেন ডাকছে, অহি, অহিউল্লা। এখন ওর চোখ বুঁজে আসে। ঘুম এলে সেই স্বপ্নটা দেখে। বুলু দাস ওর লাশ বুকে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে।

আসলে মা ওর বাবা সম্পর্কে যে কথা বলে সবটাই শ্বাস আটকে ধরানো। অসুখটার সেখান থেকেই শুরু। অসুখটা হলো যন্ত্রণা এবং ছটফটানি। কোনোকিছুতেই সারবে না। সারার পথ নেই। ভোরবেলা কাজে যাওয়ার আগে ও পা ছড়িয়ে দরজায় বসে থাকে। মা বেরিয়ে যাবার আগে ওর মাথায় আলতো করে হাত রাখে।

যাবি না?

ও ঘাড় কাত করে। জানে যেতে হবে। সবার আগে গিয়ে কয়লার চুলোটা ওকেই জ্বালাতে হয়। আজ অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে ওর। রাতে ঘুমুতে পারেনি। কেবলিই ঘুম ভেঙেছে। আধো ঘুম, আধো জাগরণে ঘামে ভিজে গেছে শরীর। ঘুমের মধ্যে রিনি কেঁদেছে অনেকবার। ওর মা ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছে, এই যন্ত্রণাময় জীবনের জন্যে দোষারোপ করেছে ওর বাবাকে। সব মিলিয়ে অহির ছটফটানির অসুখ বেড়েছে। দেরিতে ঘুম ভেঙেছে ওর মায়েরও। তারও কাজে যাবার ইচ্ছে নেই। লাল চোখ মেলে অহির দিকে তাকায়।

কাজে যাবি না?

না।

অহি উপুড় হয়ে শোয়।

BanglaBook.org

রিনির জ্বর কমেছে?

না।

ওর মায়ের রুক্ষ কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাস করে। ঐ গলা দিয়ে বুঝি আর কথা বেরুবে না, গলা চিরে বেরুবে রক্ত, গলগলানো রক্ত। দরজার ঝাঁপটা সরিয়ে দিলে এক ঝলক আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় অহির। উঠতে ইচ্ছে করে না।

রহিমুদ্দিন আজ তোকে আস্ত রাখবে না।

আমি আর ওর দোকানে কাজ করবো না।

কোথায় করবি?

জানি না।

আগে ঠিক করে নে। তারপর ছাড়বি।

না। আগেই ছাড়বো।

অহি বিছানায় উঠে বসে।

ঐ ডোমটা তোকে নষ্ট করছে।

মা গজগজ করতে করতে বাইরে যায়। অহি জবাব দেয় না। হঠাৎ করেই মনে হয় ঐ ডোমটা মায়ের একটা আশ্রয়। ওর উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে মা কিছুটা শান্তি পায়। গরিবের যেমন ভাতের অভাব তেমন গায়ের ঝাল মেটানোর জায়গার অভাব। ইচ্ছে করলেই তো আর যা খুশি তা করতে পারে না।

ওর বাবা তো নিজের ইচ্ছেকে অন্যের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিলো। বাবার কোনো স্বাধীন ইচ্ছে ছিলো না। অন্যের হুকুম পালন করতে করতেই বাবা মরলো। ঐ ডোমটা তবু নিজের মতো চলে। অন্যের হুকুম তামিল করে না। ডোমটার একটা হৃদয় আছে। কিন্তু বাবা? ভাবলেই অহির খুব দুঃখ হয়। সব ছেলেই বুঝি তার বাবাকে বিশাল করে দেখতে চায়। কিন্তু অহির সামনে তেমন কৈ? যাকে অবলম্বন করে ও একটা সম্পূর্ণ মানুষ পেতে পারে?

মা! মাগো!

ঘুম থেকে উঠে রিনি কাঁদতে শুরু করে। অহি একলাফে ওর কাছে যায়।

কাঁদিস না সোনা। কি হয়েছে?

মা কই?

মা তোর জন্যে মুড়ি কিনতে গেছে।

আমি মুড়ি খাবো না।

কি খাবি?

রিনির কান্না বেড়ে যায়। অহি ওকে কোলে উঠিয়ে নেয়। কাঁদতে কাঁদতে ওর হেঁচকি ওঠে। অহি বুঝতে পারে না কি করবে? একদৃষ্টে ওকে দেখে, কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।

রিনি, সোনা, সোনা রে।

আমার খিদে পেয়েছে।

রিনির কান্নাজড়ানো কণ্ঠ জড়িয়ে যায়। অহির ভয় করে। এখন, এই মুহূর্তে রিনি যদি মরে যায় তা হলে ও কী করবে। নিজের শরীরের ভেতর প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করে। বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে। প্রবল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। রিনির কান্না আর নেই। ওর মাথা নেতিয়ে আছে অহির ঘাড়ের উপর। ও ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করে। বাইরে বেলা বাড়ছে। কড়া রোদে ভেসে যাচ্ছে বস্তি। স্টেশন থেকে মালগাড়ির শব্দ আসছে। আজ থেকে ও আর চায়ের দোকানে কাজে যাবে না। বাবার মতো ওকে কেউ কিনতে

BanglaBook.org

পারবে না। অহির শরীরের ঝাঁকুনি থেমে যায়। চারদিক তোলপাড় করে ওঠে প্রবল শব্দ। যেন শহর জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা। ভোজালি হাতে ছুটে আসছে দৈত্যের মতো মানুষ। অহি একা দাঁড়িয়ে আছে, বিশাল, বিশালাকায় হয়ে। সবাই থমকে যাচ্ছে ওকে দেখে। ওর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ছে। বুকে হাত রেখে বলছে, এমন মানুষই তো চাই যাকে কেউ কিনতে পারে না। যাকে কেনার সাধ্য কারো নেই। ওহ্ কী আনন্দ! অহির শরীর শিরশির করে। নিবিড় করে চেপে ধরে রিনিকে। ওকে কিছুতেই মরতে দেবে না।

ভাইয়া!

বল কী? কী করবো?

আমাকে মাদুরে শুইয়ে দাও।

তোর কষ্ট হচ্ছে রিনি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

সব জায়গায়, সবখানে। আমার জন্য ওষুধ আনো ভাইয়া।

ওষুধ?

অহি থমকে যায়। কেমন করে আনবে? রিনি বিড়বিড় করে।

ভাইয়া মা কই? মা কেন আসে না?

এখুনি আসবে।

আমি মুড়ি খাবো না। তুমি ওষুধ আনো ভাইয়া।

তুই একা থাকতে পারবি রিনি?

রিনির চোখ বুঁজে যায়। ও ঘাড় কাত করে। ছোট্ট ময়লা বালিশে একরাশ চুল ছড়িয়ে থাকে। ও কী আবার ঘুমিয়ে গেলো? না কী–। অহি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আজ ও রিনির জন্য ওষুধ কিনে ঘরে ফিরবে।

অহি চায়ের দোকানের সামনে আসে। রহিমুদ্দিন ওকে দেখে খেঁকিয়ে ওঠে।

নবাবজাদার এখন আসা হলো? হারামজাদার বাবুগিরি আর কমলো না? কী ঘুম থেকে উঠতে পারিসনি বুঝি? না কী তাড়ি গিলেছিলি?

রহিমুদ্দিনের গোলগাল কালো থলথলে চেহারা সোনালি রোদে চকচকে। কয়লার চুলোর আগুন আজ গনগনে। উজ্জ্বল আলো দারুণ দেখাচ্ছে। অহির মনে হয় আজকের সকালটা ভালো। এমন রোদ অনেক দিন ওঠেনি। রহিমুদ্দিন একটানা যে কথাগুলো বলে গেলো তার জবাব ও দেয় না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দোকানে খদ্দের জমজমাট। টেবিল, বেঞ্চ খালি নেই। রহিমুদ্দিনের চারদিক সামলাতে হচ্ছে বলে মেজাজ খিঁচড়ে আছে। দোকানে নূরু একা। চা দিয়ে সামলাতে পারছে না। অহির বারবার মনে হয়, আজকের সকালটা দারুণ। মানুষের ফূর্তির শেষ নেই। চারদিকে কী আনন্দ! পরক্ষণে ওর বুক ধড়ফড় করে ওঠে। রিনি বুঝি মরে যায়, রিনি বুঝি মরে গেছে।

কি দাঁড়িয়ে আছিস যে? কাজে হাত লাগা।

না।

না?

রহিমুদ্দিন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

তা হলে এসেছিস কেন?

আমাকে পাঁচটা টাকা দেন।

টাকা?

BanglaBook.org

হ্যাঁ। রিনির খুব অসুখ।

ইস্ নবাবপুত্রের বায়না কত। টাকা যেন গাছে ধরে।

আমার টাকা লাগবেই লাগবে।

অহি রহিমুদ্দিনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শান্ত সুবোধ অহির ঘাড়ের রগ মোটা হয়ে যায়। চৌদ্দ বছর বয়সের কেউ সাধারণত এমন উদ্ধত হয় না। রহিমুদ্দিনের মেজাজ খিঁচড়ে যায়। ওকে ধাক্কা মারে।

যা হারামজাদা, বের হ।

না।

অহি ক্যাশ বাক্সের ওপর হাত রাখে। টান দিয়ে ঢাকনা খুলে ফেলে। রহিমুদ্দিন দ্রুত সামলে নেয়। ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয় দরজার দিকে। অহি পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফুঁসতে থাকে।

আমার বোনটা কি মরে যাবে? আমি টাকা পাবো আপনার কাছে।

টাকা? বের হয়ে যা বলছি। ভালো চাস তো বের হ।

খালি চায়ের কাপ ঠেলে রেখে উঠে আসে সোহরাব।

বেশি সাহস হয়েছে তোর। চলে যা ভালোয় ভালোয়।

অহি আগুন-চোখে তাকিয়ে থাকে। ঘরের প্রতিটি মানুষ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কারো চোখে সহানুভূতি নেই। সবাই রহিমুদ্দিনের লোক। ও তখন চিৎকার করে বলে, টাকা না দিলে আমার বোনের ওষুধ কেনা হবে না।

উঠে আসে মতিন। পাড়ার মাস্তান। সবাই ওকে ভয় পায়। অহি ভেবে পায় না মতিন কবে থেকে রহিমুদ্দিনের লোক হলো। মতিন তো ওর বাবার বন্ধু হতে পারে। তা হলে ওর শত্রু হবে কেন? তা হলে কি ওর মায়ের কথাই ঠিক যে ওর বাবার শত্রুরা ওকে মেরে ফেলবে? মতিন কী এই মুহূর্তে ওর বাবার শত্রু? ভাবতে না ভাবতেই মতিনের শক্ত হাতের ধাক্কায় ও রাস্তায় ছিটকে পড়ে। অহির মাথাটা বোঁ করে ওঠে।

আর হাঙ্গামা করতে আসবি না। যা বাড়ি যা।

অহি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যে মতিন ওর সঙ্গে কোনোদিন দুর্ব্যবহার করেনি, সে হঠাৎ করে বদলে গেলো কেন? টাকার দাবি করছে বলে?

রিনির ওষুধ–

বাড়ি যা বলছি। ওষুধ তোর মা দেখবে। কাজ করে আনবে।

আমিও তো কাজ করার টাকা চেয়েছি। মাগনা কাজ করিনি।

ফের মুখে মুখে কথা। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে ফেলবো একদম।

মতিন নিজের কাজে চলে যায়। অহির মুখ ধুলোয় কিচ্ কিচ্ করে। ও পথের ওপর একদলা থুতু ফেলে। পাশেই ছিলো সুরোতের কাঠ-চেরাইর ঘর। দুজন লোক দিনভর কাঠ চেরাই করে ওর ঘরে। সুরোত কাছেধারে নেই। অহি ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। শরীরের ভেতরটা চিড়চিড় করছে। ও একটা মোটা গুঁড়ি বেছে নিয়ে বসে। বুকে হাঁফ ধরেছে। একটুক্ষণ দম নিলে ওর ভালো লাগে। হেরে যাওয়ার গ্লানি ওকে বিষণ্ন করে রাখে। লম্বা করাতের গা বেয়ে কাঠ গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে পড়ছে। পড়তে পড়তে জমে গেছে। অহি একদৃষ্টে দেখে। ওর রাগ কমে না। বরং গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে জমছে। এখন ও কী করবে? কোথায় যাবে?

কী রে মুখ গোমড়া কেন?

করাতের হাতল হাতে ধরে শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করে হাশেম। বড় করে দম নেয়। বেচারার বুকের হাড় কেমন ঠেলে উঠেছে। নিঃশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করে।

BanglaBook.org

কি রে কথা বলছিস না যে?

অহি গুঁড়ির গায় লাথি দেয়।

আমার কিছু হয়নি চাচা।

হয়নি বললেই হলো–।

হাশেমের হাতে করাত ঘর্ঘর শব্দ করে ওঠে। অপর পাশে মকবুল। দুজনের হাত সচল হয়ে উঠলে অহি গুঁড়ি ছেড়ে উঠে পড়ে। বুকের ভেতরে ঝাঁঝালো রোদ। সে রোদে পুড়ে যায় রিনির পাণ্ডুর মুখ। অহি হাঁটতে হাঁটতে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে আসে। একটু পরে ট্রেন আসবে। লোকজন হুড়োহুড়ি করছে। ও প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ভেতর হাজার কান্নার শব্দ। পেটে চিনচিনে খিদে। বেলা বেড়েছে, কিছু খাওয়া হয়নি ওর। স্টেশনে ট্রেন ঢোকে। একজন সাহেবের ব্যাগ রিকসায় উঠিয়ে দিয়ে আট আনা পয়সা পায়। ও নেড়েচেড়ে দেখে। মাঝখানে গোল ফুটো করা তামার পয়সাটা ওর প্রিয়। একসঙ্গে অনেকগুলো কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে রাখতে ভালো লাগে ওর। এই পয়সা দিয়ে কী রিনির ওষুধ হবে? আরো দু-একটা ব্যাগের আশায় এদিক-ওদিক তাকায়। না, যাত্রী তেমন নেই। বেশির ভাগই চলে গেছে। যারা আছে তাদের কুলির দরকার নেই। ওরা নিজেরাই নিজেদের বোঝা টানবে। অহির মন খারাপ হয়ে যায়। চেষ্টা করলে ও হয়তো রিনির ওষুধের টাকাটা জোগাড় করতে পারতো। পা ঝুলিয়ে প্লাটফরমের ওপর বসে থাকে। মা কি রিনিকে মুড়ি কিনে দিয়েছে? বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না ওর। আস্তে-আস্তে স্টেশন ফাঁকা হয়ে যায়। ইতস্তত ঘোরাফেরা করে কেউ কেউ। যাদের কোনো যাবার জায়গা নেই কিংবা যারা অহির মতো ঘরছাড়া, জ্বালা জুড়োবার জন্য বসে থাকে চুপচাপ। অহির মনে হয় বাবা ওর মায়ের প্রতি অবিচার করেছে। মায়ের স্মৃতিতে বাবার গুণ্ডামির ঘটনা ছাড়া আর কিছু নেই। ভালো কিছু থাকলেও মা সেটা ওকে বলে না। ও বাবাকে মন থেকে তাড়াতে চায়। করাত হাতে হাশেমের মুখ ভেসে ওঠে। মানুষটা দিনান্ত পরিশ্রম করে। অহির জীবন কি অমন হবে? পাঁজর-ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বুকের চামড়া? মুখ হাঁ-করা নিঃশ্বাস!

ও প্লাটফরম ছাড়িয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকে। মাঝে-মধ্যে ওর এমন ভাঙাচোরা পথ ভালো লাগে। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত নুড়িতে পায়ে ব্যথা লাগে। ওর মন বলে ঘরে ফেরা উচিত। বিবেক বলে, না। অহির চৌদ্দ বছর ভীষণ দ্বন্দ্বে সংকুচিত-প্রসারিত হয়। ও লাফিয়ে লাফিয়ে স্লিপার পেরিয়ে যায়। আজ ওর ছুটি। আজ ও স্বাধীন মানুষ।

চানখার পুলের কাছে মোল্লার দোকানের সামনে হঠাৎ করে বুলু দাসের সঙ্গে দেখা হয় ওর। বুলুই আগে দেখে ওকে।

অহি? কাজে যাসনি?

না। ওখানে আর কাজ করবো না।

কেন রে?

ভালো লাগে না।

কোথায় যাচ্ছিস?

বাড়ি। আচ্ছা বুলুদা জ্বরের ওষুধ কিনতে কত পয়সা লাগে?

কার জ্বর?

রিনির।

চল দেখি ওষুধের দোকানে।

দু'জনে মোল্লার ফার্মেসিতে ঢোকে। প্রেসক্রিপশন নেই। দোকানদার জ্বরের কথা শুনে অনুমান করে একটা ওষুধ দেয়। ওষুধের দাম চার আনা। বুলু চার আনা দিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় অহির। ওর দৃষ্টি চকচকে করে। বুলু দাস বুঝতে পারে ওর মনোভাব। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, খুব হয়েছে এখন বাড়ি যা। দিনে তিনবার করে খাওয়াবি। দেখবি রিনি ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

অহি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন বাড়ি ফেরা যায়, বুক টান করে, গর্বে, অহংকারে। ইচ্ছে করে বাবাকে ডেকে দেখাতে যে বাবা দেখুক, তার মেয়েকে ও ওষুধ কিনে দিতে পারছে। এমন করেই বাবার সঙ্গে ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। যে কাজ ওর বাবার, সেটা ও করলে এই বোধ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওর কণ্ঠে গান ভাসে। গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদে, রাস্তার পিচে রোদ ভাসে। আজকের দিনটা সুন্দর, দিনটা ওর নিজের, এমন একটা ভাব মনে আসার আগেই মনে হয় রিনি বাঁচবে তো? রিনিকে বাঁচাতে পারবে তো ও?

অহি দ্রুত হাঁটে। নিজের ওপর ওর বিশ্বাস বাড়ছে।

ওর হাঁটা দেখে বুলু হাসে। বলে, তোর খুব তাড়া না রে অহি?

হ্যাঁ, রিনির জন্য খারাপ লাগছে। তাছাড়া তোমাকে তো বলা হয়নি যে মা নতুন একটা বাসায় কাজ নিয়েছে।

কোথায় রে?

চৌদ্দ নম্বর মাহুতটুলি। আমাদের বাসার কাছেই। সাহেব কলেজে পড়ায়। আগে রাজশাহীতে ছিলো।

লোক ভালো হলে তো তোদের জন্য ভালো।

মা বলেছে ওরা লোক নাকি ভালো। বাসাটা মায়ের পছন্দ হয়েছে।

তুই দেখেছিস?

না, আমি দেখিনি। তুমি তো জানো মা যে বাসায় কাজ করে আমি সেখানে যাই না।

যাকগে, যা বাড়ি যা। রিনির জ্বর ছাড়লে আমাকে খবর দিবি।

তোমাকেই তো খবর দেবো বুলুদা। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

অহি রাস্তার মধ্যে থমকে দাঁড়ায়। বুলু কথা না বলে হেসে মাথা নাড়ে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে চলে যায়। অহি বুলুর চলে যাওয়া দেখে। তারপর ওষুধটা হাতে নিয়ে ছুটতে থাকে। আচমকা ছুটতে গিয়ে একটা রিক্সার ধাক্কা এড়াতে আলী আহমদের সঙ্গে ধাক্কা খায় ও। ওষুধের শিশিটা ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। ও বিস্ফারিত চোখে পড়ে যাওয়া ওষুধের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ ছলছল করে।

আলী আহমদ ওর মাথায় হাত রাখে, ব্যথা পেয়েছো?

ও মাথা নেড়ে বলে, না।

কার জন্য ওষুধ কিনেছিলে? শিশিটাতো ভেঙে গেলো।

ও অস্থিরভাবে হাত কামড়ায়, আমি এখন কি করবো? ওষুধ না পেলে যে রিনি বাঁচবে না?

ঠিক আছে আমি তোমার ওষুধ কিনে দেবো। চলো আমার সঙ্গে।

দেবেন? সত্যি দেবেন?

কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অহির মুখ। মুহূর্তে আলী আহমদের মনে হয় এই ছেলেটি অন্যরকম। ও আর দশটা কিশোরের মতো নয়। ওর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, ও যেটা অর্জন করেনি কিন্তু ভেতরে রয়ে গেছে। আলী আহমদ মনে মনে ভাবে, এই ছেলেটিকে প্রদীপ্তর বন্ধু হতে বলবে। এখনো কারো সঙ্গে তেমন করে মিশতে পারেনি প্রদীপ্ত। একা একা থাকে। আলী আহমদ নিজে খুব দ্রুত ঢাকাকে আপন করেছে। রাজশাহী ছেড়ে আসার পর কয়েকদিন মন খারাপ ছিলো। এখন সেটা নেই। এখন মনে

BanglaBook.org

হয় ঢাকা খুব প্রাণবন্ত, গতিশীল। এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে।

স্যার?

আলী আহমদ অহির ডাকে চমকে তাকায়। বলে, হ্যাঁ চলো। তোমার নাম কি?

অহিউল্লা। সবাই অহি ডাকে।

বাহ্ বেশ মিষ্টি নাম। কোথায় থাকো?

মাহুতটুলির ওদিকে। বস্তিতে।

চলো আজ তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাবো। আমার ছেলে দীপু– তোমার চেয়ে একটু ছোটোই হবে। আমি চাই ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হোক।

ছোটোদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে ভালোলাগে না।

তোমার বন্ধুরা কি তোমার চেয়ে বড়ো?

হ্যাঁ।

আলী আহমদ ওর কথায় চমকিত হয়। হেসে বলে, ঠিক আছে তুমি আমার ছেলের সঙ্গে পরিচিত হও। ভালো না লাগলে বন্ধুত্ব হবে না। যাবে?

আচ্ছা চলুন।

অহি খানিকটা অনিচ্ছায় ঘাড় নাড়ে।

ওষুধ কিনে দু'জনে রিক্সায় ওঠে। অহি সারাক্ষণ রিনির গল্প করে। ওষুধ পাওয়ার কৃতজ্ঞতাটুকু ও এভাবে পুষিয়ে দিতে চায়। তারপর ও প্রদীপ্তর কথা জিজ্ঞেস করে– ও কি পড়ে এসব কথা নয়, প্রদীপ্ত কেমন ছেলে এটাই ওর কাছে মুখ্য বিষয়। আলী আহমদ ওর সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়।

আলী আহমদের বাড়িতে অহি ওর মা'কে দেখে চিৎকার করে ওঠে, মা তুমি?

এটাই তো আমার নতুন বাসা।

ওহ! আমি যাই।

দরজা থেকেই ও ছুট দেয়।

আলী আহমদ ওকে চেঁচিয়ে ডাকে, এই অহি দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ডাকবেন না খালু। ও আসবে না। আমি যেখানে কাজ করি ও সেখানে যায় না।

আলী আহমদ দরজায় দাঁড়িয়েই থাকে। দেখে অহি বেশ খানিকটা ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দূর থেকেও আলী আহমদের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়। ঐ দৃষ্টি ওকে আবিষ্ট করে। তারপর ও দ্রুত চোখের আড়াল হয়ে গেলেও আলী আহমদ দাঁড়িয়েই থাকে, কেবলই মনে হয় এমন একটি কিশোর ও রাজশাহীতে দেখেনি। ও আলাদা, আরো অনেকের সঙ্গে মেলানো যায় না। প্রদীপ্ত এসে ওর পেছনে দাঁড়ায়, কি দেখছো বাবা?

তোর জন্য একজন বন্ধু খুঁজছি দীপু।

ওমা বন্ধু খুঁজতে হবে কেন? আমার ক্লাসের সবাই আমার বন্ধু।

সবাই বন্ধু হয় না দীপু। সত্যিকারের বন্ধু একজন দু'জনই হয়।

প্রতীকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পুষ্পিতাও গেটে এসে দাঁড়ায়।

কি হলো, বাপ-বেটার কীসের জটলা?

বাবা আমার জন্য বন্ধু খুঁজছে মা।

তাই নাকি? কে গো ছেলেটি?

যার মা'কে আমরা অহির মা ডাকি সেই অহি।

পুষ্পিতা ও প্রদীপ্ত একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, অহি? ওর মা আমাদের বাসায় কাজ করে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ দীপু অহি। অহিউল্লাহ।

বাবা?

ও একটি চমৎকার ছেলে।

ও তো লেখাপড়া জানে না।

একদম জানে না তা নয়। তবে ও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অনেককিছু বোঝে।

প্রদীপ্ত থমকে বাবার মুখের দিকে তাকায়।

আলী আহমদ বলে, ঠিকই বলছি। অহি আজ পালিয়ে গেলো। কিন্তু আমি পালাতে দেবো না। ওকে আমি আবার ধরে নিয়ে আসবো। দীপু লেখাপড়া দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না। মানুষের ভেতর হাজার রকম শক্তি থাকে, তাকে আবিষ্কার করতে হয়। যদি এইটুকু না পারো তাহলে জানবে মানুষ হিসেবে তুমি অনেক পিছিয়ে আছো। অহির মা কি কাজ করে সেটা দিয়ে কি তুমি অহিকে বিচার করবে?

না, বাবা, না।

প্রদীপ্ত লজ্জা পেয়ে যায়।

শুধু এইটুকু জেনো অহির মা একজন স্বাধীন মানুষ। নিজে উপার্জন করে ভাত খায়। কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। যে মানুষ পরের ওপর নির্ভরশীল নয় তার আত্মমর্যাদা অনেক বেশি।

আমি বুঝেছি বাবা যে মানুষকে এভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়।

হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছো। আমি চাই তুমি সত্যিকার মানুষ হও।

প্রদীপ্ত বাবার হাত ধরে বাড়িতে ঢোকে। ওদের ছোট্ট বাড়ি। এক চিলতে উঠোন পেরিয়ে দু'টো ঘর। পুষ্পিতার কোলে প্রতীক। চারজনের সুখের সংসার। কখনো এখানে মেঘ জমেনি।

BanglaBook.org

৯

বাবাকে অহির ভয় করতো। ভয়ের স্মৃতি ওর মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে। তিন-চার কিংবা চার-পাঁচ বছর বয়সে বাবা যখন বুকে জড়িয়ে ধরতো কিংবা ঘাড়ে উঠিয়ে নাচাতো তখন ওর খুব ভয় করতো। বাবার দশাসই চেহারা, ঝুলিয়ে রাখা গোঁফ এবং ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বাবরির মধ্যে রহস্যময়তা ছিলো। গম্ভীর চেহারা এবং রাগী দৃষ্টির আড়ালে বাবার কোথাও কোনো গোপন ভালোবাসার জায়গা ছিলো কি না অহি কোনোদিন টের পায়নি। সম্ভবত ওর মাও না। মায়ের কাছ থেকে বাবার গল্প শুনে অহি এটা বুঝেছে মা বাবার একটি দিকই মনে রেখেছে। ভাবতে অহির খুব কষ্ট হয়। ও অনেক ভেবে দেখেছে, মায়ের ভাষায় ঐ ডোম বুলু দাসের চাইতেও ওর বাবা একটুও ভালো ছিলো না।

ওর মনে পড়ে যায়, মা ভাবে বাবাকে যারা কিনেছিলো কিংবা যারা বাবার শত্রু তারা ওকে মেরে ফেলতে পারে। কেন মারবে? ওর কি দোষ? মারা কি এতই সহজ? শুনলে বুলু দাস হাসে। হ্যাঁ মারা খুব সহজ। কারণ যারা মানুষ কেনে তাদের কোনো চরিত্র থাকে না। তারা সব পারে। না, মায়ের মতো এই নিয়ে অহির মনে কোনো ভয় নেই। যেহেতু ও বাবার মতো কেনা ক্রীতদাস নয়, সেজন্য ও নিজেকে ভিন্ন মানুষ মনে করে। এক আশ্চর্য শক্তি

ওর ভেতরে কাজ করে। বিড়বিড় করে, মাগো আমি তেমন মানুষ হতে চাই যাকে কেউ কিনতে পারে না। পরক্ষণে নিজের মনে খটকা লাগে। এমন মানুষ কি হয়? আবার নিজেই ঝেড়ে ফেলে সব। হ্যাঁ হয়। নিশ্চয়ই হয়। নিজের মধ্যে যার শক্তি বেশি সে-ই তো হতে পারে। মানুষ যদি নিজের শক্তির মধ্যে না-টিকে ভেসে যায় তা হলে সে কি মানুষ? অহি বড় বেশি উল্টেপাল্টে চুলচেরা বিচার করে। আর করে বলেই ওর যন্ত্রণা বেশি।

আলী আহমদ কী ওকে কিনতে চেয়েছিলো? ও ভেবে পায় না। সেদিনের ঐ ঘটনা ওকে মাঝে মাঝে ভাবায়। কিন্তু ও মন থেকে আলী আহমদকে ঝেড়ে ফেলেছে। ওর মা বলেছে, সাহেব তোকে যেতে বলেছে।

ওর ঝাড়া জবাব, যেতে বললেই যাবো নাকি?

ওর মা বিরক্ত হয়ে বলে, যাবি না যাবি তা তোর খুশি। তবে মানুষগুলো ভালো।

অহি কথা বলে না। ভাবনায় পড়ে। আলী আহমদের বাড়ি ওর যাওয়াও হয় না। সারাদিন কাজ করে সময় কৈ?

এখন ও সুরোত আলীর করাত কলে কাজ নিয়েছে। কাঠ-চেরাই ছাড়াও সুরোত আলীর কাঠ বিক্রির ব্যবস্থা আছে। অহিকে ওগুলো দেখতে হয়। কিন্তু ওর ভালোলাগে কাঠ চেরাই করতে। ও সুযোগ পেলেই ওদের দু'জনের কারো একজনের জায়গা দখল করে নেয়। করাতের ঘর্ঘর শব্দে কেমন মসৃণ হয়ে কেটে যায় কাঠ। কী যে ভালোলাগে ওর। আজ ওকে রোদে বসে ছোটো লাকড়ি গোছাতে হচ্ছে। একটু পরে খদ্দের আসবে। সুরোত আলী খুব ব্যস্ত। বিক্রির জন্যে নতুন কাঠ এসেছে, সেগুলো দেখাশোনা করছে। মানুষটা মোটামুটি ভালো। দিল খোলা। রাগ কম। অকারণে হা হা করে হাসে। রহিমুদ্দিনের মতো শকুনের দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকে না। কখনো অহিকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। এখন অহির দিনগুলো খারাপ যাচ্ছে না। শুধু রিনির চিন্তায় ও আচ্ছন্ন। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে রিনি এক রহস্যময় অলৌকিক পথে এগুচ্ছে। ওর মুখে পাণ্ডুর পেলবতার সঙ্গে সঙ্গে এক আলো থাকে। সে আলো সবার মুখে থাকে না এবং সে আলো সবাই দেখতেও পায় না। কিন্তু অহি পায়। ঘুমে-জাগরণে সেই আলো ওর চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়। সেদিনের ওষুধের পর রিনি কিছুদিন ভালো ছিলো। ও বিশ্বাসই করতে পারেনি ওর জন্য ওষুধ এসেছিলো। অত জ্বরের মধ্যেও চোখ বড় করে তাকিয়েছিলো।

আমার ওষুধ এনেছো? আমি ওষুধ খাবো?

হ্যাঁ খাবি। তুই ভালো হয়ে যাবি রিনি।

কথা বলতে বলতে জল আসে অহির চোখে। ও জানে রিনিকে মিছে সান্ত্বনা দেওয়া। রিনিকে ভালো করার সাধ্যি ওর নেই। এই বয়সে অহি বুঝে গেছে সবকিছু করার সাধ্য সবার থাকে না। যেমন ওর বাবার সাধ্য ছিলো না নিজেকে অন্যের হুকুম থেকে বিচ্ছিন্ন করার। এই চকচকে রোদে অহির সারা মুখ বেয়ে ঘাম নামে।

কাজ মোটামুটি শেষ। ও ছায়ায় এসে বসে। ঘরের বেড়ার ধারে টিনের নিচে একটুখানি ছায়া। অহির গায়ে গেঞ্জি নেই। ওটা ও আগেই খুলে রেখেছিলো। আসার সময় রিনি খুব করে বলে দিয়েছে ডালপুরি খাবে। কেমন করে কিনবে অহি? হাতে একটাও পয়সা নেই। ওর খুব তেষ্টা পায়। ও উঠে গিয়ে চাপকল চেপে মুখ লাগিয়ে পানি খেয়ে আসে। তখন ও দেখে পাইকাররা যেখানে দাঁড়িয়ে কাঠের ওজন করছিলো সেখানে ধুলোর মধ্যে একটা সিকি রোদে ঝকঝক করছে। জীবনে এত আনন্দ অহির বুঝি আর হয়নি। সিকিটা তুলে নিয়ে ও পকেটে ঢোকায়। মা বলে, রাস্তায় পয়সা বা টাকা কুড়িয়ে পেলে তা ফকিরকে দিয়ে দিতে হয়। অহির বুক ফেটে হাসি আসে। এই মুহূর্তে রিনির চেয়ে বড়

BanglaBook.org

ফকির আর কে? দু'টো ডালপুরি খাবার জন্য যার বুক আঁকুপাঁকু করছে? মায়ের কাছে বায়না করে লাভ নেই। ওর যত আবদার অহির কাছে। রিনির জন্য তবু অহি আছে। অহি সাধ্যমতো চেষ্টা করে। কিন্তু অহির জন্য কেউ নেই। ও কারো কাছে আবদার করতে পারে না। বাবাকে এত বেশি ভয় করতো যে কোনোকিছুর চাওয়া তো দূরের কথা, কাছে যেতেই ভালো লাগতো না। এখন এই প্রচণ্ড রোদে অহির কতকিছু মনে হচ্ছে। কিন্তু কাকে বলবে? কথা বলার তো কেউ নেই। বুলু দাস গেছে মামার বাড়ি বেড়াতে। অহি খুব একা হয়ে পড়েছে। একা হয়ে পড়লেই ওর ভেতরটা সারাক্ষণই তোলপাড় করে। বুলু দাসের অনুপস্থিতি ওর জন্য দারুণ ক্ষতির।

ছায়ায় বসে সে দেখতে পায় বেলা হালকা হয়ে আসছে। কাঠের স্তূপের ওপর ছায়ার পলেস্তারা। করাত কলের দু'জন এখন জিরিয়ে নিচ্ছে। কারোই খাওয়া হয়নি। বিকেলে ঘরে ফিরে ওরা একবার খায়। অহি পকেটের পয়সার ওপর হাত রাখে। বেশ অনেকগুলো ডালপুরি হবে। মাকেও খাওয়াতে পারবে। সবাই মিলে একসঙ্গে খেলে খুব ভালোলাগে। কিন্তু এই ভালোলাগা অহির খুব কমই ঘটে। অহির দিন এবং রাতগুলো বড়ো নির্মম।

সুরোত আলী দুপুরের খাবার খেতে গেছে। আড়তের পেছনেই বাড়ি। ভাত খেয়ে একটু ঘুমিয়ে বেলা পড়লে আসবে আবার। ওর বাবাও দুপুরবেলা প্রায়ই ঘুমোতো। প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকতো ওর বাবার। মাঝে-মধ্যে ছোট্ট অহি বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে শব্দ শুনতো। ও কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে ঘুমন্ত মানুষের শরীর থেকে কেমন করে এমন শব্দ আসে। ঘুমুলে কি সুরোত আলীর নাক ডাকে? খুব জানতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু কেমন করে জিজ্ঞেস করবে ও? অহির ভয় করে। এক বুলু দাস ছাড়া ও কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। তার ওপর বয়সে অনেক অনেক বড় কারো সঙ্গে তো প্রশ্নই ওঠে না। বসে থাকতে থাকতে অহির বার-বার হাই ওঠে। না, ঠিক ঘুম পাচ্ছে না, কেমন অবসাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। হয়তো রিনি আর কোনোদিন ভালো হবে না। মাও মরে যাবে। নিজেও চলে যাবে অন্য কোথাও। কোথায়? নিজেও জানে না কোথায়? অহি বেড়ার সঙ্গে হেলান দিয়ে চোখ বোঁজে। বার-বার ভেসে ওঠে সুরোত আলীর বিশাল ভুঁড়ি। লোকটা খেতে ভালোবাসে। মাঝে-মধ্যে অহিকে নিয়ে বাজারে যায়। বড় বড় মাছ কেনে। অহির মনে আছে ওর বাবাও খেতে ভালোবাসতো। এখনো মা অনুযোগ করে বলে, তোর বাবা যা রোজগার করতো সব খেয়েই উড়িয়ে দিতো। তখন একটু হিসেবি হলে এখন আমাদের এত কষ্ট হতো না। সুরোত আলীর ভুঁড়ির দিকে তাকালে বাবার কথা মনে হবে এমন হওয়া উচিত না। একজন মানুষের একটি বিশেষ জায়গা অন্য জনের মধ্যে প্রবেশ করা ঠিক নয়। এই যেমন বেড়ার ছায়ার রিনির মুখ ভেসে না উঠলে তো ওর কষ্ট হতো না। আসলে দুঃখ এমন করেই আসে। একজনের অংশ অন্য জনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দুঃখ দীর্ঘ হয়।

সুরোত আলী আজ কি দিয়ে খেয়েছে? বড় মাছ না মুরগি? ওর বাবাকে ওর মা তিন-চার রকমের তরকারি দিতো। শীতের দিনে সবচাইতে মজা হতো। সুরোত আলীর বউ একদিন ওকে পাঙ্গাস মাছের পেটি দিয়ে ভাত দিয়েছিলো। কী যে মজা ছিলো! কিন্তু ঐ একদিনই। ভাবলে অহির জিভে জল আসে। কাঠ চেরাই আর হবে না। মকবুল চাপকলে হাত-মুখ ধুয়ে পানি খাচ্ছে। হাশেম গামছায় মুখ মুছছে। ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

কিরে এমন হাত-পা ছেড়ে বসে আছিস? খিদে পেয়েছে? নে, খাবি?

হাশেম গামছার খুঁট খুলে শুকনো রুটি বের করে দেয়। অহি নেয় না। মাথা নেড়ে না করে। মাও ওকে শুকনো রুটি দেয়, নইলে বাসি ভাত বাসি তরকারি। ওর কী সবসময় এ সবই খেতে হবে? ভালো কিছু কী ওদের জন্য নেই?

BanglaBook.org

হাশেম কড়কড় করে শুকনো রুটি চিবোয়। অহি কান পেতে সেই শব্দ শোনে। লোকটা ওর সামনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। লুঙি হাঁটু পেঁচিয়ে আছে। অহির গা ঘুলিয়ে ওঠে। হাশেমের মুখে তৃপ্তির-ছাপ, রুটি চিবোতে কোনো অনীহা নেই। এই জীবনে হাশেম এসবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অহি পারে না, পারছে না। ওর কেবলই মনে হয় ভিন্ন কিছু চাই। সুরোত আলী এলে করাত কল বন্ধ হয়ে যায়। দিনকার টাকা নিয়ে চলে যায় হাশেম আর মকবুল। অহির কাজটা তেমন জরুরি নয় বলে ও রোজ হিসেবে পায় না। পায় সপ্তাহেরটা। আজ ওর তারিখ নয়। অহি কুড়িয়ে পাওয়া চার আনা সম্বল করে নূরুর দোকানে আসে। অনেক ডালপুরি কিনে বাড়ি ফেরে ও। দরজার কাছে পা ছড়িয়ে বসেছিলো রিনি। অহিকে দেখেই হাতের ঠোঙ্গাটা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। ওদিক থেকে ওর মা ঝংকার দিয়ে ওঠে। মেয়েটার স্বভাব আর ঠিক হলো না।

চুপ করো মা!

অহি রেগে যায়।

খাবার দেখলে মেয়েটা জানি কেমন হয়ে যায়।

কিই-বা খাওয়াতে পারো। এই নিয়ে আবার কথা।

অহি ঠোঁট ওল্টায়।

কি করবো, সবই আমার কপালের দোষ।

অহির মা কিছুক্ষণ নাকের পানি চোখের পানি মোছে।

তোর বাপ তো নিজে খেয়েই মরলো। আমাদের জন্য কী কিছু রাখলো?

এইসব প্রসঙ্গ উঠলে ও মায়ের কাছে গোল হয়ে বসে বাবার গল্প শুনতে চায়। আজ ওর মন ভালো নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বস্তির ঘর, চারদিকে লোক থাকে। কারো-না-কারো সঙ্গে দেখা হয়। কেউ-না-কেউ কথা বলে। হঠাৎ করে অহির মনে হয় কারো মধ্যেই হৃদয় নেই। সবাই বড় বেশি বোঝে। আসলে এ ভাবনা ও তাড়াতে চায়। এমন একপেশে ভাবনা ওর ভালোলাগে না। কিন্তু কিছু করার নেই। একবার পেয়ে বসলে জাপটে থাকে। কোণার দিকে বড় কড়ুই গাছটার নিচে এসে ও দাঁড়ায়। ছেলেরা দল বেঁধে গোল্লাছুট খেলছে। দেখতে অহির ভালোলাগে। রিনি এখন খেলতে পারে না। খেলার আগে ওর চিকিৎসা দরকার। শুধু দোকানে জিজ্ঞেস করে ওষুধ খাওয়ালে হবে না। ওর মাথা কেমন করে। হাঁটতে-হাঁটতে পুকুর পাড়ে আসে। হারু মুন্সি ছিপ দিয়ে মাছ মারছিলো। ওকে ডেকে কাছে বসায়। হারু মুন্সি ওর বাবার বন্ধু। এক সময় ওদের ঘরে খুব যেতো, এখন যায় না। তেমন খোঁজ-খবরও নেয় না। বাবা নেই বলে হারু মুন্সির বন্ধুত্বও শেষ।

কেমন আছিস অহি?

ভালো।

রিনির জ্বর কমেছে?

এই জ্বর কমার নয়।

অহির কণ্ঠে তেতো ভাব। হারু মুন্সি তা টের পায়। ফাতনা থেকে চোখ না-উঠিয়ে বলে, কেন রে?

চিকিৎসা নেই। সেজন্য জ্বরের পোয়াবারো। মশার মতো রক্ত চুষছে।

হারু মুন্সি অকস্মাৎ হো-হো করে হেসে ওঠে।

বলে, তুই তো বেশ মজা করে কথা বলতে শিখেছিস। তোর বাবাও এমন মজা করে কথা বলতো।

আমি বাবার মতো হতে চাই না।

BanglaBook.org

হারু মুন্সি মুহূর্তে ফাতনা থেকে চোখ উঠিয়ে বলে, কেউই কারো মতো হয় না। সবাই নিজের নিজের মতো হয়।

অহি ঠিক বুঝতে পারে না যে হারু কিছুটা আহত হলো কি না। হারু ওর বাবার বন্ধু ছিলো। এখন সেই যৌবন নেই বলে গুণামিতে তেমন সুবিধে করতে পারে না। কিন্তু খারাপ বুদ্ধিতে জুড়ি নেই তার। একটানে চমৎকারে একটা বড় পুঁটি ওঠায় মুন্সি। পুঁটির গায়ে লাল রেখা। রূপালী রোদে চিক্ চিক্ করে। হারু মুন্সি মাছগুলো একটা মাটির হাঁড়িতে জমাচ্ছে, পানি দেওয়া আছে হাঁড়িতে। মাছগুলো বেশ খলবল করছে। অহি বসে থাকে। মাছ ধরা এবং মাছ দেখতে ওর ভালোলাগে।

তোর বাবা এবং আমি মাঝে মাঝে বিকেলে মাছ ধরতে বসে সারারাত এবং পরদিন সারাবেলা কাটিয়ে দিতাম। ধরা পড়তো ইয়া বড় রুই। তোর মা বড় বড় পেটি ভেজে পাঠিয়ে দিতো। কী যে ভালোলাগতো। একটা উৎসবই হতো বলতে পারিস।

এবার একটা টাকি মাছ ওঠায় হারু মুন্সি। বেশ বড়। খুশিতে চকচক করে হারুর চোখ।

বুঝলি বাবা অহি টাকি মাছের ভর্তা আমার খুব ভালোলাগে। তোর চাচি বেশি করে পেঁয়াজ আর ঝাল দিয়ে দারুণ বানায়।

এমনভাবে বলে যেন জিভ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়বে। অহির মন খারাপ হয়ে যায়। কেবলই মনে হয় এমন উৎসাহ-ভরা কথায় ওর জন্য কোনো আনন্দ নেই। যে কথায় ওর আনন্দ হয় না সেটা শুনে ওর লাভ কি? আঁধারের ছায়া পড়েছে পুকুরের পানিতে। দূর থেকে আজানের ধ্বনি আসছে। হারু মুন্সির ওঠার তেমন চাড় নেই। ফাতনা নড়ছে এবং টানছে।

তুই এখন কি করছিস বাবা?

সুরোত আলীর কাঠের দোকানে কাজ করছি।

ভালো। তোর মা ভালো আছে তো?

হ্যাঁ।

তোর মা খুব ভালো রান্না করতো। এখন কেমন করে?

এখন তো অন্যের বাড়িতে রান্না করে।

অহির কণ্ঠ খুব তিক্ত শোনায়। হারু মুন্সি বোকার মতো হাসে।

সবই ভাগ্য বাবা। মানুষের জীবনই এমন।

আপনার ফাতনা তো আর দেখা যাচ্ছে না।

ওতে অসুবিধা নেই। আমি হাতের টানেই মাছের ঠোকর টের পাই। অনেকদিনের অভ্যেস তো।

হারু মুন্সি আবার হাসে। আজকে হারু মুন্সিকে হাসিতে পেয়েছে। এই হাসিও অহির জন্য বিরক্তিকর। ওর মনে হয় এইসব যাতনার মধ্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। চলে যাওয়াই ভালো। ও হাই তুলে আড়িমুড়ি ভাঙে।

তুই যাবি নাকি বাবা? তুই ছিলি ভালো লাগছিলো। কথা বলার লোক পেলে ভালোলাগে। সময় ভালো কাটে। মন আনন্দে থাকে। তোর বাবাও মানুষ পছন্দ করতো।

কেমন পছন্দ করতো? খুন করতে?

কি বললি?

চমকে ওঠে হারু মুন্সি।

তুই বলতে পারলি এমন কথা?

মায়ের কাছে শুনেছি আপনি আর বাবা মিলে অনেক মানুষ মেরেছেন।

BanglaBook.org

চুপ কর বেয়াদব।

হারু মুন্সি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অহি খিকখিক করে হাসে। এতক্ষণে ও মজা পেয়েছে। এখন ওর মজা করার সময়। হারু মুন্সির একতরফা আনন্দে এখন ছাই। কটমট করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। রাগে ফুঁসছে।

তোর মা মেয়েমানুষটা চিরকাল তোর বাপকে জ্বালিয়েছে।

এসব নিয়ে জ্বালালে ঠিকই করেছে।

ছোঁড়া তুই বড় ডেঁপো হয়েছিস। বেশি কথা বলছিস।

অহি নিশ্চুপ থাকে। একজন গুণ্ডা আর একজন গুণ্ডাকে সমর্থন করছে, গুণ্ডামির সপক্ষে থাকছে, এদের হৃদয়ে কোনো অনুতাপ নেই। ওর করুণা হয়। এক ধরনের দয়াও। এই মুহূর্তে অহি খুশি যে হারু মুন্সির আনন্দ নষ্ট করে দিতে পেরেছে। বুলু দাস থাকলে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতো, খুব ভালো করেছিস। পুরুষের মতো কাজ করেছিস।

অনেক দিন অহি জিজ্ঞেস করেছে, পুরুষের মতো কাজ কেন?

তুই বুঝবি না অহি। আগে বড় হয়ে নে। দেখবি সব শালার মধ্যে একটা করে পশু আছে। পশুবৃত্তির গুঁতোগুঁতিই তো ওদের আনন্দ।

এই মুহূর্তে অহি ঘাড় বাঁকা করে হারু মুন্সিকে দেখে। ওর মধ্যে এখন কোন পশু কাজ করছে? ও দ্রুত হাতে ছিপ গোছাচ্ছে। একটু আগেও একটা বড় সরপুঁটি উঠিয়েছে। অন্ধকারে সেটা বড়শি থেকে খুলেছে। হাঁড়ির মধ্যে এখন অনেক মাছ।

রিনির খুব জ্বর। ও পুঁটি মাছ খেতে ভালোবাসে। আর মেয়েটা খাবার জন্য যা করে! মনে হয় দুনিয়ার খাবার এনে দিলে ওর ঐটুকু পেটে এঁটে যাবে।

হারু মুন্সির ভেতরের পশুটা জাগেনি। অহির কথার অর্থ বুঝতে পারে। তাই জবাব দেয় না। নির্বিবাদে ছিপ গুটিয়ে হাঁড়ি ঝুলিয়ে নেয় হাতে। অহি গাছের আড়ালে চলে গেছে। এই ইঁচড়ে পাকা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছে তার নেই। বুকের ভিতর মরে যাওয়া পশুটা জেগেছে, তড়পাচ্ছে। মনে হয় একবার জেগে ওঠে। দীর্ঘদিন জেল খেটে অনেক সাহস কমে গেছে। শেষের দিকে কর্তা-ব্যক্তিরা তেমন গরজ দেখায়নি। বিশেষ করে অহির বাপের মরার পর সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। হারু মুন্সি অন্ধকারে পথে এগোয়। তখুনি অহির ইটের টুকরোটা এসে লাগে হাঁড়ির গায়ে। দু'টুকরো হয়ে ভেঙে যায় হাঁড়িটা। মাছগুলো ছড়িয়ে পড়ে পথের ওপর। বিমূঢ় হয়ে যায় হারু মুন্সি। চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলো বলে কিছু বুঝতে পারেনি। ঢিলের শব্দও কানে তেমন ঢোকেনি। বরং রাগ হয় বাবলুর মায়ের ওপর। আসার সময়ে এই মাটির হাঁড়িটা আনার ইচ্ছে ছিলো না। বলেছিলো এনামেলের পাতিল দিতে। শোনেনি বাবলুর মা। কেন যে তার এই অনীহা হারু মুন্সি বুঝতে পারে না। এলোমেলো হাতে কতগুলো মাছ ওঠায় ও। কিন্তু কয়েকটা মাত্র। বাকি সব এদিক-ওদিক ঘাসের মধ্যে চলে যায়। এত শখের মাছ। দুপুরের পর থেকে সারা বিকেলের পরিশ্রম। যা খুঁজে পায় লুঙির কোঁচড়ে বেঁধে মাটির হাঁড়ির শাপ-শাপান্ত করতে করতে চলে যায়। তখন গুটি পায়ে এসে হাজির হয় অহি। দু'টো মাছ খুঁজে পেলেও ওর লাভ। রিনির মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু মাকে কি বলবে? মা যে হারু মুন্সির নাম শুনতে পারে না। মুহূর্তে অহি এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। এসব ভেবে এখন লাভ নেই। অনেক খুঁজে ঘাসের মধ্যে বড় সরপুটিটা ও পায়। আরো পায় দু'টো টাকি এবং তিনটে খলসে। ওর ভারি আনন্দ হয়। যেন হারু মুন্সির ছিন্নভিন্ন আনন্দের ওপর নতুন নির্মাণ। মাছগুলো নিয়ে ঘরে ফিরলে ওর মা খেঁকিয়ে ওঠে।

সারাদিন পর ঘরে ফিরে আবার বেরিয়ে গেলি?

BanglaBook.org

অহি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, মাছগুলো রিনিকে ভেজে দাও তো মা।

মাছ?

ওর মা কুপিটা নিয়ে এগিয়ে আসে। অহি মাছগুলো মাটিতে ঢেলে দেয়।

ভাইয়া তুমি দু'টো ডালপুরি খাও।

রিনি ওর দিকে ঠোঙ্গা বাড়িয়ে দেয়।

তোর মাছ খেতে ভালোলাগে না রে রিনি?

হ্যাঁ খুব।

ওর মা ঘরের কোণে মাছগুলো কুটতে বসেছে। অনুচ্চস্বরে বলে, ওর আবার জ্বর এসেছে। আমার আঁচলে দু'টো পয়সা আছে। একটুখানি বার্লি কিনে নিয়ে আয়। রেঁধে দেবো।

অহি মায়ের আঁচল থেকে পয়সা খুলে বেরিয়ে যায়। গায়ে আঁশটে গন্ধ। আগে হাত-মুখ ধোওয়া দরকার। ও কলের কাছে এসে দাঁড়ায়। ভিড় দেখে চলে আসে। এই সময়টায় এমনই ভিড় থাকে। সারাদিনের কাজের পরে ঘরে ফেরা লোকজনের এটাই সময়। অহির মনেই হয় না যে ওর খাওয়া হয়নি। ওর একদম খিদে পায় না। প্রতিদিন এমন হলে তো ভালোই হতো, খিদের জ্বালা থাকতো না। বস্তির ঘরে ঘরে কুপি জ্বলছে। খিস্তি-খেউড়ে বস্তির বাতাস ভারী। অহি মতির দোকান থেকে দু'পয়সার বার্লি কেনে।

গত সপ্তাহে তোর মা দু'পয়সার তেল নিয়েছে। পয়সা দেয়নি।

কাল দিয়ে যাবো মতি ভাই।

ভুলিস না যেন আবার।

অহি প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ-ঘাট। গর্তে পা পড়ে গেলে ব্যথা লাগে। পায়ের গোড়ালি মচকে যায় অহির। পা টেনে টেনে আবার কলের ধারে আসে। ভিড় কম। লোকজন ঠেলেঠুলে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। এতক্ষণ পর স্নিগ্ধ সতেজ ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে। মনে হয় রিনির মুখে কোনো মৃত্যুর ছায়া নেই। ও ভড়বড়িয়ে বাড়ছে। পরিপূর্ণ যুবতী হয়েছে। রিনি এক অদৃশ্য আলো। এই আলোটুকু বুকে নিয়ে অহি ঘরে ফেরে। রিনি তখনো জেগে আছে। মাছ ভাজার শব্দ আসছে ওর মায়ের তোলা চুলা থেকে।

ভাইয়া তুমি ডালপুরি খাও।

তুই এখনো নিয়ে বসে আছিস। রিনি তো খুব লক্ষ্মী হয়ে গেছে মা।

ওর বার্লিটা দে। রেঁধে ফেলি।

অহি লক্ষ করে মায়ের মুখটা শুকনো। চোখ বসে গেছে। মাকে খুব ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। মার কি শরীর খারাপ? না খাটুনি বেশি হচ্ছে? অহি রিনির পাশে বসে ডালপুরি খায়। সন্ধ্যাটা খুব ভালো। এমন সন্ধ্যা কতদিন ওদের জীবনে আসেনি। মাছ ভাজা হয়ে গেলে অহি মায়ের কাছে যায়।

মা?

কি রে?

তোমার শরীর খারাপ?

হ্যাঁ একটু জ্বরজ্বর লাগছে।

কালকে কাজে যেও না।

তাহলে তো ঐ বাসায় একটা খবর দিতে হবে। নইলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

ঠিক আছে আমি গিয়ে বলে আসবো।

তুই যাবি? তুই না যেতে চাস না?

BanglaBook.org

তুই না যেতে চাস না?

তোমার জন্য তো যেতেই হবে।

অহি মায়ের পিঠ ঘেঁষে বসে। ওর মনে এখন আর দ্বিধা নেই। বরং এক ধরনের আনন্দ এই ঘরে প্রবাহিত হতে থাকে। এমন সময় ওর জীবনে কমই আসে। এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছাকাছি বসা, এমন উষ্ণ আন্তরিকতা খুঁজে পাওয়া, যা সাংসারিক চাপে বেশির ভাগ সময়ই কোথায় লুকিয়ে থাকে। এইসব সময়ে মা প্রায়ই বাবার কথা বলে। খুব দুঃখ করে বলে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে, তবু বলতে মা ভালোবাসে।

ভাইয়া?

কি রে?

অহি উঠে রিনির কাছে যায়। কেমন কুঁকড়ি মেরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ও। অহি কাছে আসতে উঠে বসে। ওর পাণ্ডুর মুখে চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে।

ভাইয়া আমি ভালো হবো না।

অহি ওকে কোলে তুলে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। মিথ্যে সান্ত্বনার কথা রিনিকে বলতে পারে না। ওর কেবলই মনে হয় ও বড় বেশি ছোটো। ছোটো মুখে বড় কথা মানায় না।

ও কেমন করে বলবে যে রিনি ভালো হয়ে যাবে? জ্বরে রিনির গা পুড়ছে। সে তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে অহির শরীরে। ওদের মা বাটিতে করে বার্লি নিয়ে আসে।

আগে মাছ ভাজা দাও।

মাছ খেলে পেট খারাপ করবে।

না, আমি মাছ খাবো।

কালকে খাবি।

না, এখুনি।

রিনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

ওর মা অহিকে বকতে শুরু করে। অহি উঠে গিয়ে মাছ এনে রিনির সামনে দেয়।

কাঁটা বেছে খেতে পারবি তো? না বেছে দেবো?

সর আমি বেছে দিই।

অহি ওর মাকে জায়গা ছেড়ে দেয়। আস্তে করে বলে, ওষুধ যখন নেই তখন ওকে ওর মতো ছেড়ে দাও মাগো।

ওর মা নিঃশ্বাস ফেলে। অহি কুপির আলোয় রিনির খাওয়া দেখে। চেহারায় পরম তৃপ্তি। রিনি কী সুখী! ওর জন্য বেঁচে থাকা কত যে আনন্দের। রিনি অহিকে হিংসা করে ওর স্বাস্থ্য ভালো বলে। বহুদিন এই নিয়ে ভাইবোনে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু আজ ওর মুখে আশ্চর্য প্রশান্তি। ও সবকিছুর উর্ধ্বে। অহি ইচ্ছে করলেই ওর কাছে যেতে পারবে না, ওকে ছুঁয়ে দেখতে পারে না। বার্লি খেয়ে, মাছ খেয়ে, রিনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ করে তখন অহির মনে হয় মা ওর একলার। মা আর কারো নয়। ও অবুঝের মতো বলে, ভাত দে মা।

খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ খুব।

দুপুরের ঠাণ্ডা ভাত দেয় ওর মা। সঙ্গে বেগুন ভাজি এবং একটা টাকিমাছ। অহি গোগ্রাসে খায়। ওর মা-ও ভাত বেড়ে নিয়েছে। লাল সানকিতে ঝকঝকে ভাত মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। কী প্রিয় খাবার, তৃপ্তিদায়ক। নিজের ওপর প্রচণ্ড ভালোবাসা জন্মায় অহির। মায়ের জন্য বুকটা কেমন টাটায়। ও লক্ষ করে মায়ের সানকিতে কোনো মাছ নেই।

BanglaBook.org

মা তুমি মাছ নাওনি?

তুই খা বাবা।

এইটুকু খাও।

আরে পাগল আমার খাওয়া তো শেষ।

তবু খাও।

টাকি মাছের মাথাটা অহি মাকে দেয়। ওর মা অনিচ্ছায় নেয়। জানে ঐটুকু না খেলে ছেলে তাকে ছাড়বে না। মাছ-মাংসের স্বাদ কবেই উবে গেছে। এখন বেঁচে থাকার জন্য শুধু কটা ভাত হলেই চলে। সানকি বোঝাই পানি খেলে পেটটা ভরে যায় দুজনের। ওর মা হাঁড়িকুড়ি গুছিয়ে রাখছে। অহির মনে হয় আজ ওর ঘুম আসবে না। আজ ওর মায়ের কাছে গল্প শোনার রাত। সেই রূপকথা বাবার। বাবা ছাড়া ওদের জীবনে গল্প নেই।

এবার বল তো অহি মাছগুলো কোথায় পেলি?

হারু মুন্সি ধরেছিলো–

চেয়েছিস?

মায়ের চোখ জ্বলে ওঠে। অহি জানে মা হারু মুন্সিকে দেখতে পারে না। বলে রাহু মুন্সি। লোকটা নাকি রাহুর মতো গ্রাস করে, অন্তত ওর মায়ের তাই ধারণা। মায়ের নিষ্প্রাণ কঠিন দৃষ্টি অহিকে আতঙ্কিত করে। ওর ভীষণ ভয় করে। ওর বাবা এতিমখানায় মানুষ হয়েছিলো। ওদের কোনো গ্রামের বাড়ি আছে কি না ওর জানা নেই। এই শহরে ওর মায়ের একজন চাচা আছে মাত্র। সে অহিদের খোঁজ-খবর নেয় না। অহির মাও যায় না। অহির মাথার মধ্যে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেলেও মায়ের কঠিন দৃষ্টিতে দৃষ্টি ফেলে। যত ভয়ই লাগুক এখন ঐ দৃষ্টি মেনে নিতে হয়। ও আর কোথায় ওর আশ্রয় খুঁজবে?

মাগো?

অহির চোখ ছলছল করে।

মাগো আমাদের কেউ নেই কেন?

ওর মা অহিকে বুকে টেনে নিয়েছে। দু'জনের বুকের ভেতর জমানো কষ্ট। দু'জনের বুক ফেটে যায়। জীবনযাপনের এই টানাপোড়েনে বড়ো ফাটল। অহি মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। ওর মা মাথার কাছে বসে আপন মনে বহুবার বলা সেই গল্পটা আবার শুরু করে।

তোর বাবা সব সময় ঘরে বড় বড় দা, ভোজালি এবং আরো কি সব রাখতো। আমি সবকিছু জানতেও পারতাম না। একদিন শহরে দাঙ্গা বেঁধে গেলো। এর দু'দিন আগে থেকে মহল্লায় গুণ্ডারা আমাদের ঘরে বসে কি কি সব ফিসফাস করতো। টাকা-পয়সা লেনদেন হতো। এক একজনের হাসি শুনলে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যেতো। আমি তোকে বুকে নিয়ে কেবল আল্লাহকে ডাকতাম। দাঙ্গা বাধার পর আমি বুঝে গেলাম ওরা দাঙ্গা বাধানোর ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিলো। সেইদিন তোর বাবার সে কী চেহারা! ভাবলে এখনো ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে। দাঙ্গা কারা বাঁধায় এবং কেন বাঁধে আমি এখন তা বুঝি অহি। কিন্তু বুঝে লাভ কী? যারা বাঁধাবার তারা স্বার্থের জন্য ঠিকই বাঁধাবে, যারা কাজটা করবে তারাও টাকার লোভ ছাড়তে পারবে না। এগুলো হতেই থাকবে রে অহি, হতেই থাকবে।

অহি মাদুরের ওপর উঠে বসে। ঘরে আলো নেই। অনেক আগে কুপি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেড়ার ফাঁকে কিছু চাঁদের আলো ঘরে ঢোকে।

মাগো?

BanglaBook.org

সেদিন ভোজালি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় আমি তোর বাবার পা জড়িয়ে ধরেছিলাম। নিষেধ করেছিলাম। শুনলো না। যখন ফিরে এলো সে কী বীভৎস চেহারা! মাগো ভাবলে এখনো আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

বাবা কত মানুষ খুন করেছে মা?

সে হিসেব কি আর আমি জানি।

বাবাকে পুলিশে ধরতো না?

শুনেছি নেতারা টাকা দিয়ে সব ঠিক করে ফেলতো।

বাবাকে কারা খুন করলো?

জানি না।

তোমার কাউকে সন্দেহ হয় না?

হয়।

কাকে?

উত্তেজনায় অহি থরথর করে কাঁপে। ওর মা চুপ করে থাকে।

মা, বলো না?

অহি মাকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

বলো, মাগো বলো।

এ কথা আমি আর কাউকে বলিনি রে।

আমাকে বলো?

এ আমার মিছে সন্দেহও হতে পারে।

কে সে?

রাহু মুন্সি।

কেন সন্দেহ হয়?

তোর বাবা খুন হবার আগের দিন দু'জনে খুব ঝগড়া হয়েছিলো টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে। রাহু বলছিলো তোর বাবা নাকি ওকে ঠকিয়েছিলো। লোকটা আমাকেও নালিশ করেছিলো। যাবার সময় খুব করে শাসিয়ে গিয়েছিলো।

বাবা মরার পর তুমি জিজ্ঞেস করোনি?

করেছিলাম। অস্বীকার করে। বলে, তোর বাবা নেতাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। তাই খুন হয়েছে। তবু আমার মন থেকে সন্দেহটা যায় না অহি। লোকটা এজন্য আমাকে দেখতে পারে না। ওকে আমি খুব ভয় পাই। তুই ওর কাছে কখনো যাবি না সোনা। সুযোগ পেলে তোকেও মেরে ফেলবে।

মায়ের ভয়ার্ত কণ্ঠ অহির বুকে বিঁধে থাকে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর কোনো মীমাংসা ওর মনে স্পষ্ট হয় না। কেমন নিশ্চুপ হয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর মতো এক অর্থহীন মৃত্যুচিন্তা অহিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওর বুক তোলপাড় করে ওঠে। ও আবার মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শোয়। ওর মা ওর মাথায় হাত বুলোয়।

রাহু মুন্সি একটা আস্ত শয়তান। একফোঁটা মায়াদয়া নেই। তোকে মাছ দিলো কেন রে?

দেয়নি। শয়তানি করে নিয়েছি। ঐ ব্যাটা বুঝতেই পারেনি যে কোথা থেকে কি হলো। ভেবেছে মাটির হাঁড়ি বুঝি ভেঙে গেছে।

অহি পুরো ঘটনা খুলে বলে।

এমন কাজ আর কখনো করবি না। বাপের মতো গুণ্ডা হতে হবে না।

BanglaBook.org

অন্ধকারে মায়ের কণ্ঠ চাবুকের মতো শোনায়। অহি মরমে মরে যায়। ঐ গুণ্ডা শব্দটায় ওর প্রবল বিবমিষা। কেবলি মনে হয় ভোরবেলা মাকে কেমন করে মুখ দেখাবে।

তখুনি রিনি কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। দু'জনেই উঠে ওর কাছে যায়। রিনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর মা। দু'বার হেঁচকি তুলে শক্ত হয়ে যায় রিনির শরীর। অন্ধকারে ওরা কেউ বুঝতে পারে না যে রিনি মরে গেছে। এই বোঝাটুকুর জন্য ওদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ওর মায়ের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ঘুম ভাঙে অহির।

রিনি আমার মরে গেছে বাবারে!

বিলাপের ধ্বনিতে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুহূর্তে কত অপরিচিত হয়ে গেছে রিনি। নিমীলিত চোখের তারায় আশ্চর্য প্রশান্তি। অহির বারবার মনে হয় রিনি কী সুন্দর! কী সুন্দর! ও চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। এখন কোনো দুঃখ নেই, মলিনতা নেই, রিনি এখন অহির চোখের সামনে রূপকথায় শোনা পরী হয়ে যায়। মায়ের কান্না অহির কানে ঢোকে না, লোকজন এসে ভিড় করেছে, সেটাও কোনো ব্যাপার নয়। শুধু রিনির পরী হয়ে ওঠা ওর চোখের সামনে সত্য হয়ে থাকে।

এই বোধ নিয়ে ও জানাজায় যায়। আজিমপুর কবরস্থানে যায় এবং সবাই চলে যাওয়ার পরও কবরের পাশে বসে থাকে। যেন ওর সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ওর বড় হয়ে ওঠাটাও থামিয়ে দিয়েছে রিনি। অহি আনমনে ঘাসের মাথা ছেঁড়ে।

বাবাকে যেদিন কবর দেওয়া হয় সেদিন ও হারু মুন্সির হাত ধরে এখানে এসেছিলো। মৃত্যু ওকে তেমন আলোড়িত করেনি। আজ ও ভীষণভাবে মৃত্যু চিন্তায় কাতর। বাবা চলে গেছে, রিনি চলে গেছে, মাও কী যাবে? তার আগে ও নিজে? বুক কেমন করে অহির। সব কেমন অর্থহীন মৃত্যু। চলে যাওয়াটাই সত্য, পেছনে আর কিছু ফেলে যায়নি ওরা। আচ্ছা এমন মৃত্যু কী হয় না যার কথা মানুষ সব সময় মনে রাখবে? যে মৃত্যু তোলপাড় করবে সবাইকে? অহি উঠে হাঁটতে থাকে। শীতের ছোট বেলা বলে সূর্য দ্রুত মাথার ওপর উঠে যায়। রোদ ওর ভালো লাগে। ঘরে ফেরার ইচ্ছে নেই। কাজেও যাবে না। মেডিক্যাল পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে আসে ও। হঠাৎ ওর মনে হয় আসলে ওর মা দুঃখী। মায়ের বুকের ভেতর শোক জমতে জমতে পাথর হয়েছে। একটা মানুষের এত দুঃখ পাওনা হয় কেন? ওর আর হাঁটতে ভালো লাগে না। গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। মা বলেছিলো পাকিস্তানে ওদের কোনো দুঃখ থাকবে না। মানুষ তো দুঃখ পাবার জন্য নতুন দেশ বানায়নি। কিন্তু কই দুঃখ তো ওদের পিছু ছাড়ে না। অনেক কিছুই অহি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আসলে শুধু আশা আর স্বপ্নের মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। পারলে অন্যের সেবা করতে গিয়ে অপঘাতে মৃত্যু হতো না ওর বাবার, চিকিৎসার অভাবে মরে যেতো না রিনি। একটা অস্থির যন্ত্রণা অহির ভেতরে ছটফট করে ওঠে।

ও আবার হাঁটতে থাকে। পরিষদ ভবন ছাড়িয়ে, মেডিক্যালের ছাত্রদের ব্যারাক ছাড়িয়ে, রশীদ বিল্ডিং পেরিয়ে আসার পর ওর বুকের খিচুনি কমে। ও বড় করে শ্বাস নেয়। ওর ইচ্ছে করে কোনো পথে হাঁটা নয়, এক দৌড়ে মায়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দেয়। কিন্তু অহির পা ওঠে না। কতবার ও মায়ের চোখের পানি মোছাবে? ও হাঁটতে হাঁটতে সুরোত আলীর কাঠের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

১০

একদিন খুব ভোরে মফিজুল এসে হাজির হয় আলী আহমদের মাহুতটুলির বাসায়। তখন প্রদীপ্ত প্রতীক ঘুম থেকে ওঠেনি। পুষ্পিতা রান্নাঘরে যায়নি। অহির মা কাজে আসেনি। আলী আহমদ ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে বারান্দায় বসে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজছিলো। গেট খুলে মফিজুলকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে ও, তুমি এসে গেছো? আমি তোমার কথা ভাবছিলাম।

ব্যাপার কি আহমদ ভাই? খুব মুড়ে আছেন মনে হয়?

উহু তেমন মুড়ে থাকার মতো ঘটনা নেই। তবে তোমাকে দেখলে সাহস বাড়ে।

সুলতান ভাইর চিঠি পেয়ে চলে এলাম। লিখেছে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে ঢাকার পরিস্থিতি থমথমে। তুই চলে আয়। একসঙ্গে লড়বো।

আমিও এসব নিয়েই ভাবছিলাম। ভালোই হয়েছে।

আমি কিন্তু মায়ের দেওয়া মোয়া-মুড়ি-নাড়ু এসব পৌঁছাতে এসেছি। নাস্তা খেয়েই ফজলুল হক হলে চলে যাবো। সুলতান ভাইর ওখানে থাকবো।

বেশ ছেলে, প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করে এসেছো।

আপনি রাগ করবেন না আহমদ ভাই। বাসায় থেকে হবে না। হলে সবার সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে।

বুঝেছি, বুঝেছি। আর সাফাই গাইতে হবে না। জানি তো হলে গেলে তোমার টিকিটিও ধরা যাবে না।

খুব যাবে। আপনি দেখে নেবেন।

মফিজুল হৈ-চৈ করে প্রদীপ্তকে ঘুম থেকে ওঠায়, ওঠ দীপু। তুই না তিলের নাড়ু খেতে ভালোবাসিস?

নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়া হয় না মফিজুলের। পুষ্পিতা কিছুতেই ছাড়ে না ওকে। বলে, দু'টো দিন না থেকে তুই কিছুতেই যেতে পারবি না। সবার কথা না শুনে তোকে ছাড়ি কি করে?

অতঃপর গোসল সেরে নাস্তা খেয়ে লম্বা ঘুম দেয় মফিজুল। আলী আহমদ কলেজে যায়, প্রদীপ্ত স্কুলে।

বিকেলে চায়ের আসর বসে তিনজনের। পুষ্পিতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার খবর জিজ্ঞেস করে। তারপর শুরু হয় আলী আহমদের সঙ্গে রাজনীতির আলাপ। এক কথা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে কোনো আপস নেই। বুঝলেন আহমদ ভাই আন্দোলন যে পর্যায়ে যেতে পারে সে পর্যায়েই আমরা যাবো।

আমিও তাই ভাবছি। এ তো শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নই নয়। এ আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। হেরে গেলে চরম মূল্য দিতে হবে।

ঠিক। ভাবী আর এক কাপ গরম চা।

মফিজুল চেঁচিয়ে কথা বলে। তখন প্রদীপ্ত অহির সঙ্গে বাড়ি ফেরে। প্রদীপ্ত দৌড়ে বাবার কাছে যায়, বাবা তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। অহি ভাইর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে।

তাই নাকি? নিয়ে এসো ওকে। বসতে দাও।

প্রদীপ্ত ওকে একটা মোড়া দেয়। নিজেও মোড়া টেনে বসে।

জানো বাবা আজ স্কুলে ফুটবল খেলা হয়েছিলো। আমাদের দল জিতেছে। আমি একমাত্র গোল করি। যারা হেরেছে তাদের দলের কয়েকটা ছেলে পথে আমাকে আক্রমণ করে। ভাগ্যিস অহি ভাই সেখানে ছিলো। অহি ভাই তাড়া করলে ওরা তিনজন পালিয়ে যায়।

BanglaBook.org

আলী আহমদ মনে মনে হাসে। এমন করে ঘটনাটা ঘটবে তা কী ও ভেবেছিলো? মুখে বলে, তোমার একটা ভালো অভিজ্ঞতা হলো, না দীপু?

হ্যাঁ, বাবা।

ব্যথা পাসনি তো?

পুষ্পিতার কণ্ঠে উদ্বেগ।

মফিজুল হেসে ওঠে, দু'চারটে না খেলে কি আর পিঠ শক্ত হয়? না কী রে দীপু?

যাহ্, কি যে বলেন? ওরা তো কেবল আমাকে ধরেছিলো। এর মধ্যে অহি ভাই এসে পড়ে।

আমি এখন যাই। অহি ওঠে দাঁড়ায়।

না, না বোসো। আমি আসছি।

পুষ্পিতা ওকে এক বাটি মোয়া-মুড়ি এনে দেয়।

অহি মুখ নিচু করে খায়। আজ ওর এই পরিবেশ ভালো লাগে। ইচ্ছে করে সবার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলতে, যেভাবে বুলু দাসের সঙ্গে কথা বলে ঠিক তেমন করে। কিন্তু হয় না। লজ্জা করে। ও নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে।

দীপুর স্কুল তো তুমি চেনো অহি ছুটির সময় ওর সঙ্গে দেখা করতে পারো। অবশ্য যদি তুমি এই বাসায় না আসতে চাও।

দীপুকে আমি বন্ধু করে নিয়েছি। দেখা তো হবেই।

অহি মিষ্টি করে হাসে। তারপর যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দরজায় ওর মাকে দেখা যায়। মুখে হাসি। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে। মায়ের সঙ্গে অহির চোখাচোখি হয়। তারপর ও সবাইকে সালাম দিয়ে নেমে যায়।

মফিজুল অবাক হয়ে বলে, ছেলেটি কিন্তু একটু আলাদা। ওর চোখে ভাষা আছে। আপনার প্রশ্নের উত্তর কী চমৎকারভাবে ঘুরিয়ে দিলো।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে, আমি ওকে চিনেছি।

BanglaBook.org

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন অহি প্রদীপ্তকে নিয়ে বুলু দাসের সঙ্গে লাশকাটা ঘর দেখতে আসে। ওর অনেক দিনের ইচ্ছে এখানে আসার। আধো-অন্ধকার ঘর। টেবিলের ওপর পচে-ফুলে ওঠা লাশ। উৎকট গন্ধ। বুলু দাস আগেই ওদের নাকে গামছা বেঁধে দিয়েছিলো। কিন্তু ঐ গন্ধের সামনে গামছা কিছুই না। লোকটা তিন-চার দিন আগে ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেছে। কেউ আসেনি লাশের খোঁজে। এখন এই লাশের গতি করবে বুলু দাস। অহি প্রদীপ্তর হাত ধরে মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দূরে কামিনী ফুলের গাছ। তার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। টান দিয়ে গামছাটা খুলে ফেলে। যেন কেউ দুহাতে ওর কণ্ঠ রোধ করে রেখেছিলো। লাশকাটা ঘর অহির মনের মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে গেঁথে যায়। ছোটো ঘর। পুবদিকে একটা জানালা মাত্র। মাঝখানে একটা টেবিল। সাধারণ ঘর। তবু কী আশ্চর্য তীব্র। স্নায়ু অবশ করে দেয়। ছিনিয়ে নেয় সাহস। অহির বুক ধুকপুক করে। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। প্রদীপ্ত বড় করে শ্বাস নিয়ে বলে, আমার ভীষণ ভয় করছিলো।

কখনো এসব দেখিসনি তো তাই। আমি ভয় পাইনি। আমার খারাপ লেগেছে।

ভালোই হয়েছে দেখে। বাবা তো বলে সব কিছুর মধ্য দিয়ে জ্ঞান বাড়ে।

তোর বাবা ভালো মানুষ রে।

বাবাকে গিয়ে বলবো যে আজ আমি মর্গ দেখে এসেছি।

বলবি। বাড়িতে সব কথা বলা দরকার। শোন, মর্গ দেখার কথা শুনে ওঁরা যদি রাগ করে তাহলে তুই কিন্তু আর আমার কাছে আসিস না।

মোটেই রাগ করবে না। তুমি তো আমার বাবাকে জানো না।

অহি ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, প্রদীপ্ত তুই খুব ভাগ্যবান। আমি এমন বাবা পাইনি। যাকগে। শোন প্রদীপ্ত তুই আজ বাড়ি চলে যা। আমার অন্য কাজ আছে।

আচ্ছা।

প্রদীপ্ত চলে যায়। ততক্ষণে বুলু দাস হাতের কাজ রেখে ওর কাছে আসে।

বলেছিলাম না সহ্য হবে না। খুব তো মড়া দেখার শখ।

অহি কথা বলে না। হাঁ করে বুলুর দিকে তাকিয়েই থাকে। কেবলই মনে হয় এই লোকটা মানুষ না। ওর মধ্যে অন্য কোনো শক্তি আছে। সেজন্য ও এত কিছু পারে। অবলীলায় সয়ে যায় লাশকাটা ঘর, পচে-ফুলে-ওঠা মৃতদেহ।

হাঁ করে দেখছিস কি?

বুলুদা ঐ ঘরটায় ঢুকলে তোমার ভয় করে না?

বুলু দাস হা-হা করে হাসে। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে অহির পিঠ চাপড়ে দেয়।

তোমার মতো মানুষ আমি কম দেখেছি বুলুদা। মায়া করো বলেই তো পচা লাশটার গতি তোমার হাত দিয়ে হয়।

দূর বোকা, এটা তো চাকরি। যা, তুই বাড়ি চলে যা।

বুলু দাস লাশকাটা ঘরে ফিরে গেলে অহি রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে বুলু দাস শুধু চাকরি করে। ওর মধ্যে চাকরির অতিরিক্ত অন্য কিছু আছে। না, বুলু দাস অত ছোট নয়। ও অনেক উঁচুদরের মানুষ, অনেক বড়। অহি তার প্রিয় মানুষটিকে আপন কল্পনার নানা রঙে সাজায়। বড় মজা নিজের সঙ্গে এই খেলা। ওর ভাবতে ভালো লাগছে যে বুলু দাস লাশকাটা ঘরের সিংহাসনে বসে মৃতের রাজ্যের রাজত্ব করছে। বুলু দাসের মাথায় বিশাল এক মুকুট। অহি নিজে রঙিন পাখাটা দিয়ে ওকে বাতাস করছে। সারা ঘরে সুগন্ধী। কেবলই বুক ভরে শ্বাস নিতে ইচ্ছে করে। মায়ের কাছে শোনা রূপকথার গল্পও কল্পনায় আনন্দের ছবি হয়ে যায়। ইচ্ছে করে বুলু দাসের গলা ধরে রেললাইনের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে। ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি নেই। চাচা, মামা নেই। ওর বাবা এতিমখানায় মানুষ হয়েছিলো এই বোধ ওকে ভীষণ দুঃখ দেয়। মুহূর্তে ওর খুশি মিলিয়ে যায়। চোখ ছলছল করে। চারদিকে কেবলই শোক। আসলে ও নিজেই লাশকাটা ঘরে থাকে। ভারী দুর্গন্ধ এই ঘরে। শোক ছাড়া বাতাস নেই। ওর খুব পিপাসা পায়। রাস্তায় কোথাও পানি নেই। পানি খাবার জন্য ওকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। রিনি মরার পর থেকে মা-ও জানি কেমন হয়ে গেছে। একদম কথা বলে না। বাতাস ভারী হয়ে আসে। ও কোথায় যাবে? ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। এই বোধ হঠাৎ করে এলে ভীষণ বিচলিত হয়। আজ ওর কী যে হলো!

কাঠের দোকানে এসে দেখে সুরোত আলী নেই। কিছুটা আশ্বস্ত হয়। আজ তেমন কাজ নেই। খদ্দের শূন্য দোকান। কেবল করাতের ঘর্ঘর শব্দ এলাকা জুড়ে উঠছে আর নামছে। সেই সঙ্গে ওঠানামা করছে হাশেম আর মকবুলের বুকের পাঁজর। অহি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে কাঠের গুঁড়ি, মসৃণ তক্তা আর ওদের শরীরের ঘাম। সবকিছুর মধ্যে একটা যোগসাজস আছে, সবকিছু মিলিয়ে একটা কিছু হয়। কোনোটাই

BanglaBook.org

আলাদা নয়। যেমন বিচ্ছিন্ন নয় লাশকাটা ঘর এবং মৃত্যু। মৃত্যু এবং ফুলে-ওঠা মানুষ এবং বুলু দাস। বুলু দাস এবং ওর বাবা। ডোম এবং গুণ্ডামি। মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং মানুষের বুকে ছুরি বসানো। অহির মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে এবং ওর মুখের মধ্যে টক থুতু প্লাবিত হয়ে যায়। তখন থেমে যায় করাতের শব্দ। দু'জনের হাতের কাজ বন্ধ। দু'জনে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কোথায় ছিলি রে?

ও কথা বলে না। থুতু ফেলার জন্য পেছনে ফিরে দাঁড়ায়।

মালিক তোকে খুঁজেছিলো।

কেন?

বোধহয় বাজারে নিতে চেয়েছিলো।

খুব রেগেছে বুঝি?

জানি না।

বেশি রাগ করবে না।

কেমন করে জানলি?

যা পয়সা দেয় এই পয়সায় কেই-বা কাজ করবে।

তা ঠিক।

দু'জনে মাথা নাড়ে। অহি কী করবে বুঝতে না পেরে ফেলে রাখা কাঠের স্তূপের ওপর এসে বসে। সামনে মজা পুকুর। কচুরিপানায় ভরে আছে। বেগুনি ফুল ফুটে আছে পুকুর জুড়ে। হাশেম মিয়া এক কোণায় নেমে হাত মুখ ধুচ্ছে। লোকটার হাত-পা নাকি জ্বালা করে। একটু পর পর হাত মুখ না ধুলে স্বস্তি পায় না। মানুষের কত বিচিত্র অভ্যেস থাকে। অহি আবার নিঃসঙ্গ হতে থাকে। ওর হাত-পায়ে জ্বালা নেই। ওর জ্বালা বুকে। ওখানে কোনো পানি পৌছায় না। রিনির মৃত্যুর পর থেকে এমন হচ্ছে। বুকের মধ্যে কেবল একটা হারাই হারাই ভাব। বাবার মৃত্যু ও তেমন করে বোঝেনি। তখন কষ্টের কোনো উপলব্ধি ছিলো না। এখন কষ্ট বোঝে এবং সে কারণেই নিঃসঙ্গ হয়। মানুষ কেমন পাল্টে যায়। কত বিচিত্র বোধ এসে প্রবেশ করে। ভেবে অবাক হয় অহি। নিজের এই পরিবর্তন এবং পরিবর্তন বোঝাটা এতো নিজস্ব যে কাউকে বলাও যায় না। কি বলবে, কিই-বা বলার আছে। অহি একা একা বড় হতে থাকে। এই করাতকল, কাঠের আড়ত, চায়ের দোকান, বস্তিরঘর, অলিগলি, বড় রাস্তা, রেললাইনের ধার, রমনার বিশাল-বিশাল গাছ, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন– এ সবের মধ্যে ওর বেড়ে-ওঠা এতই কি স্বাভাবিক যে রহমতউল্লার ছেলে অহিউল্লার আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই? ও এমনই অজ্ঞাত পরিচয়হীন যে ওর বেড়ে ওঠায় কারো কোনো কৌতূহল নেই। আপন মনেই হো-হো করে হাসে অহি। হাশেম গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়ায়।

হাসছিস কেন রে?

একটা কথা মনে হলো তাই।

তুই এক আজব ছেলে।

হাশেম কাজে চলে যায়। একটু আগে মকবুল ওকে পাগল বলেছে। এরকম পাগলামি করলে ও নাকি জীবনে কিছুই করতে পারবে না। জীবনে কিছু করা মানে যে কী সেটা অহির কাছে পরিষ্কার নয়। মকবুল নিজে যা করছে এটা কী বিরাট কিছু করা? না কী বিয়ে করে ঘর সংসার করাটাই শেষ কথা? ও তো রাস্তার ছেলে, গরুর মতো চরেবরে খেয়ে ঘরে ফেরে। ওর স্কুলে যাওয়া নেই, বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখা নেই। ও বেশি কিছু আর কিই-বা করতে

BanglaBook.org

পারবে? তখন ও আবার হো-হো করে হাসে। ও পারে ভালো কোনো কাজের জন্য মরে গিয়ে একটা কিছু করতে। কিন্তু সেটাই-বা কী করে সম্ভব? অহি হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুচিন্তা ওকে বিষণ্ন করে ফেলে। না, মিছেমিছি মরে যাওয়ার সাধ ওর নেই।

তখন দু'জন খদ্দের নিয়ে সুরোত আলী এসে উপস্থিত হয়। মোটা মানুষ, অল্প হাঁটলে বুকে হাঁফ ধরে। ঘাম জমে কপালে ঘাড়ে। বেচারা কেমন হাঁসফাঁস করছে। অহি কাছে এসে দাঁড়ায়। সুরোত আলীর নির্দেশে খদ্দেরদের কাঠ দেখায়। দরদাম ঠিক হলে কাঠ মেপে দেয়। যতক্ষণ মাপা হয় ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সুরোত আলী। ভিজে কাঠের সোঁদা গন্ধ ভালো লাগে অহির। কাঠগুলো টেনে টেনে দাঁড়িপাল্লার ওপর ওঠাতে ওর ক্লান্তি আসে না। মনে হয় এক আলগা শক্তি ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওর বিষণ্নতা কেটে যায়। ঠেলাগাড়ির ওপর কাঠ উঠিয়ে চলে যায় লোকেরা। সুরোত আলীর মুখে তৃপ্তির হাসি। টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে রাখে।

অহি দোকান থেকে চা আর ডালপুরি নিয়ে আয়।

আট আনা পয়সা দেয় অহির হাতে।

কোনো কিছু কি খাবার জো আছে। জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে।

অহি হাঁ করে কথা শোনে। লোকটা এত ভালো-ভালো খাবার খায়, তবু এমন আক্ষেপ কেন?

কী দাঁড়িয়ে রইলি যে?

সুরোত আলী ধমকে উঠলে অহি দ্রুত চায়ের দোকানে যায়। এক কাপ চা আর আটটা ডালপুরি নিয়ে আসে। সুরোত আলী গরম ডালপুরিতে কামড় দিয়ে বলে, জানিস আজকে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা বিরাট মিছিল করেছিলো?

কেন?

ওরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়।

কোনোকিছু না-বুঝে অহি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করার সাহস নেই। কী জিজ্ঞেস করতে হবে সেটাও বোঝে না। কেবলই মনে হয় বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলে ওদের কী হবে? সুরোত আলীর মুখভরা ডালপুরি। অহি আড়চোখে মুখ নড়া দেখে। দৃশ্যটা ওর খুব পরিচিত লাগছে। মনে করতে অনেকক্ষণ সময় নেয়। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পচা লাশটার মুখটা অমন ফোলা ছিলো। সুরোত আলী অবিকল তেমন ফুলিয়েছে গাল। অহি চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, মিছিল করলে কী হয়?

সুরোত আলী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকায়। তারপর কোৎ করে ডালপুরি গিলে বলে, মিছিল করলে দাবি আদায় হয়।

আপনি কখনো মিছিল করেছেন?

হ্যাঁ করেছিলাম। পাকিস্তানের জন্য কত মিছিল করেছিলাম। তবেই না দেশ স্বাধীন হলো।

সুরোত আলীর চোখে-মুখে অহংকার বিচ্ছুরিত হয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা পানির মতো এক চুমুকে শেষ করে ফেলে। অহির খুব পিপাসা পায়। ইচ্ছে করে এক কলসি পানি খেতে। ও অনেকক্ষণ ধরেই পানি খেতে চাচ্ছে। কিন্তু পানি খাওয়া হয়নি। আচমকা প্রশ্ন করে, সেদিন মিছিল করে দেশ স্বাধীন করলেন তা হলে এখন আবার মিছিল কেন?

হবে না? দাবি থাকলেই মিছিল হবে। এসব রাজনীতির কথা। তুই ছোটো মানুষ, বুঝবি না। যা ছড়িয়ে থাকা লাকড়িগুলো গুছিয়ে রাখ। মানুষজন তো সুযোগ পেলেই কুড়িয়ে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

অহি কাজে যায়। করাতের শব্দ প্রবল হয়ে ওর মাথার মধ্যে ঢোকে। কোন সকালে নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছে। এখন ওর খিদে পেয়েছে। ও লাকড়ি গোছানোর ফাঁকে ফাঁকে ঘাস এবং ধুলোর মধ্যে পয়সা খোঁজে। সেদিনের মতো যদি চার আনা পয়সা পেয়ে যায় তা হলে কী যে আনন্দ হতো। ও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। সুরোত আলী দেশ স্বাধীন করার যে আনন্দ পেয়েছে ও তেমন আনন্দে অহংকারী হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু না, আজকে আর ঘাসের ধুলোয় কোনো পয়সা নেই। ও মনে মনে খুব দমে যায়। আড়চোখে সুরোত আলীকে দেখে। লোকটা হাতল-ভাঙা চেয়ারটার ওপর দু'পা তুলে মাথা হেলিয়ে চোখ বুঁজে আছে। লোকটা কি এখন স্বাধীনতার আনন্দে আছে? এখন কি দু আনা পয়সা চাইলে দিয়ে দেবে? অহির মনে হয়, হয়তো দেবে, দেয়া উচিত। বড় লোকের কি উচিত বলে কিছু আছে? ওদের তো খুশি অখুশিই সব। অহি চিন্তায় পড়ে যায়। চাইবে কি চাইবে না? ভেবে ঠিক করে চেয়ে দেখতে দোষ কি? না দিলে না দেবে। কত কারণেই তো মন খারাপ হয়। না দিলে এখনো না হয় হবে। কি আসে যায়। ও কাজ গুছিয়ে সুরোত আলীর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ায়। লোকটা পায়ের শব্দ ঠিকই টের পায়। চোখ না খুলেই বলে, মাথার পাকা চুলগুলো তুলে দে তো অহি। মাথাটা কেমন সুড়সুড় করছে।

লোকটার এই এক অভ্যেস। যখন তখন মাথা টিপাবে। চুলে বিলি কাটতে বলবে। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে করে দু'হাতে চুল মুঠি করে ধরে মাথাটা আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দিতে। জন্মের সাধ মিটিয়ে দেবে। পেটে প্রচণ্ড খিদে। ওর রাগ হয়। পাকা চুল তুলতে গিয়ে দু'টো কাঁচা-পাকা চুল তুলে ফেলে। রেগে ওঠে সুরোত আলী। থাপ্পড় মারার জন্য হাতটা উঠিয়ে নামিয়ে ফেলে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গালি দেয়।

শুয়োরের বাচ্চা চোখে দেখিস না।

অহি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

আমার খিদে পেয়েছে।

নবাবপুত্তুরের সারাদিন কেবল খিদে।

মাথা ঘোরায় বলেই তো পাকা চুলের সঙ্গে কাঁচা চুল উঠে আসে।

হারামজাদার ঠোঁটের আগায় কথা জমা হয়ে থাকে। নে, এই চার পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে খেয়ে আয়।

সুরোত আলী পকেট থেকে পয়সা বের করে দেয়। অহি পয়সা নেয় না। চুল টানতেই থাকে।

কি হলো নিবি না?

আরো দু পয়সা দেন।

কেন? আরো কেন?

আপনার মনে এখন দেশ স্বাধীনের খুশি না?

বলিস কি?

সুরোত আলী কথা না বলে পকেট থেকে পয়সা বের করে দেয়। অহি আলতোভাবে আরো দু একবার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আমি এখন যাবো?

যাবি আর আসবি। দেরি হয় না যেন।

অহি পয়সাগুলো হাতের মধ্যে নাচাতে নাচাতে বড় রাস্তায় এসে ওঠে। এই প্রথম সুরোত আলী ওকে পয়সা দিলো। এর আগে চেয়ে কোনোদিন পায়নি। মুড়ি কিনে চিবুতে চিবুতে ফিরে আসার সময় ও দেখতে পায় মিছিল যাচ্ছে। এর আগে ও কখনো মিছিল দেখেনি। ছেলেগুলো গলা ফাটিয়ে কি যেন বলছে। ওর ইচ্ছে করছে এই দলের সঙ্গে মিশে

BanglaBook.org

যেতে। হাঁটতে হাঁটতে এই দলের সঙ্গে চলে যাবে সেখানে যেখানে মিছিলটা গিয়ে শেষ হয়। পরক্ষণে লজ্জা লাগে। ও কোনোদিন স্কুলেই গেলো না। সে এতসবের কি বোঝে? ও মুড়ির ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে ফিরে আসে। সুরোত আলী তেমনিভাবে বসে আছে। করাতের শব্দ নেই। দু'জন মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছে এখন। ওর হাতে মুড়ি দেখে খেঁকিয়ে ওঠে।

এখনো খাসনি যে?

মিছিল দেখলাম।

ভেতরের উত্তেজনা কমাতে পারে না ও। সুরোত আলী ওর কথা কানেই তোলে না। অন্য প্রসঙ্গে যায়।

এই মৌসুমে কাঠের ব্যবসাটা ভালোই হবে মনে হয়।

মিছিলে অনেক লোক ছিলো।

অহির ভেতরে উত্তেজনা দপ দপ করে। ও সুরোত আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু সুরোত আলীর কোনো আগ্রহ নেই দেখে অন্য প্রসঙ্গে যায়।

আজ বিকেলে তোকে নিয়ে শ্যামবাজারে যাবো। বড়ো দেখে রুই কিনবো একটা। সকালে বাজারটা সুবিধেমতো করতে পারিনি।

অহি হাশেম ও মকবুলের কাছে এসে বসে। ওদের দিকে মুড়ির ঠোঙ্গা বাড়িয়ে দেয়।

মুড়ি খান।

কোথায় পেলি?

কিনেছি।

মালিক পয়সা দিয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ।

তোর মন খারাপ নাকি রে অহি?

না। আজ একটা মিছিল দেখলাম।

তেল-মরিচ দিয়ে যদি মুড়িটা মাখানো যেতো তো খুব ভালো লাগতো।

দু'জনেই দুই মুঠি গালে পোরে। অহির এবার একদম মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওদের গামছার ওপর মুড়িগুলো ঢেলে দিয়ে ঠোঙ্গাটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে।

কি হলো রে? খা।

আপনারা খান।

তুই খাবি না?

ভালো লাগছে না।

তবে আমরাই খেয়ে ফেলি।

দু'জনে দ্রুত মুড়ি চিবুতে শুরু করে। অহি কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দেয়। একদৃষ্টে ওদের চেহারা দেখে। শুকনো মুড়ি চিবুতে ওদের একটুও কষ্ট হয় না। কী বিচিত্রভাবে নড়ছে ওদের চোয়াল। কোটর থেকে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। মিছিলের লোকের মুখগুলো এদের চাইতে আলাদা। ওর তখনি মনে হয় মকবুলের মতো লোক দিয়ে মিছিল হবে না। ধুত, আসলে এটাও বোধহয় সত্যি নয়। সবাইকে দিয়েই মিছিল হবে। মিছিলে না গিয়েও ও আজ যেমন উত্তেজনা বোধ করছে, এই উত্তেজনা মানুষকে একেবারে পাল্টে দেয়। মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যায় বলেই বদলে যায় দেশ, বদলে যায় মাটি, গাছ, পাথর সবকিছু। তখন এই দু'জন লোকের ওপর ওর ভীষণ মায়া হয়। ওরা খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

BanglaBook.org

তোর খিদে পায়নি অহি?

না।

খেয়েছিলি বুঝি?

হ্যাঁ।

তোর মা কেমন আছে রে?

ভালো।

আহা রে তোর বোনটা মরে গেলো! তোর মায়ের খুব কষ্ট, বেচারি। তবে দেখতে দেখতে দুঃখ সয়ে যায়। কতদিন যেন হলো?

ছয়মাস।

মনে হয় এই তো সেদিন।

দু'জন মানুষ খুব ঘটা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবটা এমন যেন রিনির মৃত্যু ওদের বুকে গেঁথে আছে। অহি তীক্ষ্ণ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার প্রথম মেয়েটা মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। এখনো ওর কথা ভুলতে পারি না।

মকবুল মুখ করুণ করে বলে। শোকটা প্রবলভাবে উথলে উঠেছে। অহির রাগ হয়। লোক দু'টো কেমন বোকার মতো কথা বলছে। আসলে এসব কথা বলে এক ধরনের আরাম পায়। নাকি অহির মুড়ি ওদের পেটে এখনো জাঁকিয়ে আছে বলেই ওরা অহিকে এমন অর্থহীন কথা শোনাচ্ছে? ও নিজেই বা এসব অর্থহীন ভাবনা ভাবছে কেন? এসব কথার মধ্যে তো আন্তরিকতাও থাকতে পারে? লোক দু'জন আবার কাজে লেগেছে। শুরু হয়েছে ঘর্ঘর শব্দ। গড়িয়ে পড়ছে কাঠের গুঁড়ো। অহি অনুভব করে ওর আর এখন একদম খিদে নেই। পিপাসাও নেই। হঠাৎ করে ওর কাছে সবকিছু শূন্য হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় বুলু দাসের সঙ্গে বেড়াতে যায়। রিনি মারা যাবার পর থেকে ওর আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। যতক্ষণ পারে বাইরে কাটিয়ে আসে। ওর মা-ও ফেরে দেরিতে। ইচ্ছে করেই দেরি করে। রিনি মারা যাবার পর মায়ের খালি ঘরে ফিরতে ভালোলাগে না। প্রদীপ্তরা ওর মাকে আসতে দেয় না। মাঝে-মাঝে অহি গিয়ে নিয়ে আসে।

অহির মনে হয় রিনির মৃত্যু শুধু তাকে বদলেই দেয়নি, ঘরছাড়াও করেছে। ওর মা কার জন্যই বা ঘরে ফিরবে? বাবা নেই যে পাঁচটা তরকারি রেঁধে দেবে, রিনি নেই যে বার্লি রেঁধে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেবে। অহির জন্য ভাত রেঁধে দিলেই হয়। ও যখন খুশি তখন এসে খায়। বিকেলে সুরোত আলীর বৌ ওকে ভাত দিয়েছে। তরকারি তেমন ছিলো না, তবু পেটপুরে খেয়েছে। কখনো খাওয়াটাই প্রধান, কি খেলো সেটা গৌণ হয়ে যায়। বুলু দাস হেঁড়ে গলায় গান গাইছে। অহির সঙ্গে ও বাংলায় কথা বলে। কিন্তু যখন গান গায় তখন ও কিছু বুঝতে পারে না। সে ভাষা আলাদা। বুলু দাসের নিজের ভাষা। রাস্তায় টিমটিমে আলো জ্বলছে। রাস্তার এপাশ ওপাশ শেয়াল দৌড়ে যায়। ও কান পেতে গান শোনে। ওর একটুও ভালো লাগে না। নদীতে মাঝিরা যে গান গায় সে গান ওর ভালোলাগে। নিজের প্রাণেও সে কথা অনুভব করে। হঠাৎ করে ওর রাগ হয়। চেঁচিয়ে বলে, থামো বুলুদা।

বুলু দাস আজ প্রচুর টেনেছে। কণ্ঠ জড়ানো। অহি চেঁচিয়ে উঠলে থমকে যায়।

কেন, থামবো কেন?

ভালো লাগছে না শুনতে।

তোর ভালো না লাগলে আমার কি? আমি গাইবো।

BanglaBook.org

বুলু দাস আবার চেঁচিয়ে গান ধরে।

ঠিক আছে গাও, আমি চলে যাচ্ছি।

অহি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলে বুলু দাস এসে ওর হাত ধরে।

যাচ্ছিস কেন? শোন তাড়ি না খেলে আর গান না গাইলে লাশকাটা ঘরে যাওয়া যায় না রে।

কি বলছো?

অহির দু'চোখ বিস্ফারিত হয়।

ঠিকই বলেছি রে।

বুলু দাসের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর গুনগুনিয়ে গান গায়।

আচ্ছা বুলুদা তুমি যদি কোনোদিন আমাকে লাশকাটা ঘরে পাও তো কি করবে?

বালাই ষাট। অমন কথা মুখেও আনবি না।

ধরো এ্যাকসিডেন্টে মরে গেলাম। তারপর আমাকে তো আর কেউ খোঁজ করবে না। ফুলে ঢোল হয়ে মর্গে পড়ে থাকবো।

চুপ কর অহি।

অহি আর কথা বলে না। নিজেও বুঝতে পারে যে কথাগুলো ও বলছে সেগুলো খুব সুখকর কথা না। কথাগুলো বলতে ওর নিজের বুক কেঁপে উঠেছিলো।

রাস্তার এই গ্যাস বাতিগুলো সব একসঙ্গে নিভে গেলে কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারদিক ভরে যাবে না রে অহি।

তখন আশেপাশের শেয়ালগুলো আমাদের কামড়াতে আসবে।

ভালোই হবে। আমরা শেয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

শেয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ হয় নাকি?

কেন হবে না?

শেয়াল তো দাঁত দিয়ে তোমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে। তুমি কি করবে?

বুলু দাস চুপ করে থাকে। অহি খুক্ খুক করে হাসে।

ধরো যদি হাজার হাজার গ্যাস বাতি জ্বলে উঠে রাস্তাটা ঝলমলে আলোয় ভরে যায় তখন কেমন হবে বুলুদা?

বুলু দাস কথা বলে না। একটা গ্যাস বাতির সামনে এসে দাঁড়ায়।

তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না বুলুদা?

আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।

কি?

মানুষ কখনো খেঁকশিয়াল হয়ে যায় এবং মানুষকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়।

কেমন?

আমি তখন তোর বয়সী। গেণ্ডারিয়ায় সভা হবে। আমাদের মতো খেটে-খাওয়া লোকদের এক মিছিল যাচ্ছিলো রাস্তা দিয়ে। মিছিল দেখতে আমার ভালো লাগতো। মিছিল দেখার জন্য রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বেশ খানিকটা পথ ওদের সঙ্গে হেঁটেও গেলাম। হঠাৎ গুণ্ডারা আক্রমণ করলো। তোকে কি বলবো অহি ভাবতে এখনো আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠে।

কি করলো গুণ্ডারা?

মিছিলের সামনে যে যাচ্ছিলো, সাহস দিচ্ছিলো, সেই ছোটোখাটো গাট্টাগোট্টা মানুষটাকে কুপিয়ে মেরে ফেললো।

BanglaBook.org

কুপিয়ে?

অহির কণ্ঠে আর্তনাদ। সে শব্দ রমনার গাছের শাখার উপর দিয়ে মুহূর্তে উড়ে যায়। গ্যাসের বাতি তেমনি জ্বলে। অহির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

একদম কুপিয়ে অহি। চোখ বন্ধ করলে এখনো সে দৃশ্য আমি দেখতে পাই। মানুষটার নাম ছিলো সোমেন চন্দ। সেই থেকে মিছিল দেখলে আমি পালিয়ে যাই। তুইও কোনোদিন মিছিলে যাবি না।

ওরা গুণ্ডাদের তাড়া করেনি?

করেছিলো। কিন্তু ততক্ষণে তো গুণ্ডাদের কাজ শেষ। ওরা তো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিলো। এদের হাতে তো কিছু ছিলো না।

গুণ্ডারা মারলো কেন?

যারা মিছিলের লোকদের দেখতে পারতো না, তারা ওদের মারিয়েছিলো।

বুলুদা?

কি রে অহি?

বুলু খুব মনোযোগে ওর দিকে তাকায়। অহির কণ্ঠ গাঢ়, যেন কোনো নতুন প্রত্যয় থেকে শব্দগুলো বেরুচ্ছে।

কিছু বলবি অহি?

আমার বাবা কি ঐ গুণ্ডাদের দলে ছিলো।

ছিলো।

বুলুদা?

দুঃখ পাস না অহি।

অহি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাঁদিস না অহি।

গুণ্ডার ছেলে বলে আমাকে তোমার ঘৃণা হয় বুলুদা?

তুই একটা পাগল। তুই একটা সোনার টুকরো ছেলে। তোর মতো ছেলে হয় না রে অহি। তুই আমাকে একটা কথা দে?

বলো কি কথা।

আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

না, আগে বলো।

তুই কখনো মিছিলে যাবি না।

অহি চুপ করে থাকে। সকালের দৃশ্যটা ওর মনে গেঁথে আছে। মিছিলের লোকগুলোর তেজোদীপ্ত চেহারা ওকে অনুপ্রাণিত করে। ও বুলু দাসের কথা মানতে পারে না।

কিছু বললি না যে?

সে দিনের মিছিলে তুমিও তো ছিলে। কই তুমি তো মরোনি?

তর্ক করলে অনেক করা যায় অহি।

আমি মিছিলে যাবো বুলুদা। তুমি আমাকে নিষেধ করো না।

তোর যা খুশি।

আচ্ছা বুলুদা আমার বাবাকে তোমার কেমন লাগতো?

এসব কথা থাক অহি। আয় আমরা অন্য কথা বলি।

আসলে গুণ্ডাদের কেউ ভালোবাসে না।

BanglaBook.org

বলতো এই যে ঘোড়ার গাড়িটা গেলো এটা কার?

আমি জানি না।

রাস্তায় প্রচুর ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা চলে যায়। ঘোড়ার খুরের বিচিত্র শব্দ হচ্ছে, ভালোই লাগে অহির। কিছু কিছু শব্দ হঠাৎ করে ওকে অন্যরকম করে দেয়। ও দ্রুত ভুলে যেতে পারে কষ্টের কথা। বাবাকে কেউ ভালোবাসেনি এই বোধ যে মুহূর্তে ওকে কুরে খেতে শুরু করেছিলো তখনই ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ ওকে বদলে দেয়। ও নিজেই উৎসাহ ভরে বলে, তুমি বলো তো বুলুদা ঐ গাড়ি কার?

আমিও জানি না। নওয়াবদের হবে হয়তো।

কোথায় যাচ্ছে?

বোধহয় পরিবাগে।

আমার এমন একটা গাড়ি থাকলে খুব মজা হতো।

অহি নিজের বাসনার কথা অকপটে বলে।

কিন্তু না, গাড়ি নয়। আমার একটা ঘোড়া থাকলে খুব ভালো লাগতো। বিশাল একটা ঘোড়া। টগবগিয়ে ছুটতাম শহরের এ মাথা থেকে ও মাথায়। নিজেকে রাজার মতো লাগতো রে অহি।

সবাই নিজেকে রাজার মতো দেখতে চায় কেন বুলুদা?

বুলু দাস চুপ করে থাকে। প্রশ্নটার উত্তর ওর জানা নেই। এমন একটা প্রশ্ন ও নিজেও ভাবেনি। অহির স্বভাবই এই। মাঝে-মধ্যে এমন প্রশ্ন করে যে জবাব দেয়া যায় না। বুলুর ধারণা ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে হয়তো বিরাট কিছু হতো। ওর মধ্যে পাগলামি আছে এবং সেই পাগলামিগুলো সাধারণ মানুষের মতো নয়।

অহি, চল ঘরে ফিরি।

চলো। রাত কত হলো?

জানি না।

তুমি চাঁদ দেখে বুঝতে পারো না?

না।

তোমার নেশার ঘোর অনেকটা কেটেছে।

কেমন করে বুঝলি?

তোমার কথা আর তেমন জড়ানো নয়।

নেশার মধ্যে থাকাটা খুব আরামের রে অহি। যতক্ষণ থাকি মনে হয় স্বর্গে আছি।

আমি একদিন খেয়ে দেখবো?

এখন না। আরো পরে।

কবে?

সময় হলে আমি তোকে খেতে দেবো।

ঠিক তো?

একদম ঠিক।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ আসে। চারদিকে গাছের সারি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। লোক চলাচল কমে এসেছে রাস্তায়। ক্বচিৎ কখনো কেউ সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে। অহি নিচু হয়ে ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে সে পাতা বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

অহি?

BanglaBook.org

বলো।

ভাবছি বিয়ে করবো।

বিয়ে? কাকে?

সোহাগিকে। ওকে নিয়ে ঘর করার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

তুমি ওকে ভালোবাসো বুলুদা?

পছন্দ করতে শুরু করছি।

সোহাগি জানে?

না।

সোহাগির বাবা যদি তোমার সাথে বিয়ে না দেয়?

কেন দেবে না? একশোবার দেবে।

বুলু দাস জেদের সঙ্গে কথা বলে।

ভালোই হবে বুলুদা। তোমার বিয়ে আমার ভাবতে খুব ভালো লাগে। আমি খুব মজা করবো।

তোকে ঢোল বাজাতে দেবো।

ওটা আমি পারবো না।

রঙ খেলতে পারবি?

পারবো।

আচ্ছা করে সোহাগির গায়ে রঙ ঢেলে দিবি।

তুমি মারতে আসবে না তো?

ধুত বোকা!

দু'জনে হো-হো করে হাসে। সে হাসিতে রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। দৌড়ে যায় শেয়াল।

তোমার সঙ্গে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে। আর কোথাও সুখ নেই।

আবার মন খারাপ করলি। শোন, আমার বিয়েতে কী কী হবে তোকে বলি। দু'টো শুয়োর কাটা হবে। আগুন জ্বালিয়ে ঝলসানো হবে। হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি আসবে। মাদল বাজবে, ঢোল বাজবে। নাচ হবে, গান হবে। ভোররাতে বাসর হবে। সারারাত উৎসব করে লোকজন ঘুমুতে যাবে। পরদিন দুপুর গড়ালে সবার ঘুম ভাঙবে।

তোমাদের এই সব কিছু আমার খুব ভালোলাগে বুলুদা। আমাদের বিয়েতে এতকিছু নেই।

মন খারাপ করিস না। তোর বিয়েতে আমি একটা উৎসব করবো।

অহি চুপ করে থাকে। বিয়ে শব্দটা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে অজস্র পরীর নৃত্য।

ঘরে ফিরে দেখে মা শুয়ে আছে। কুপিটা প্রায় নিভু নিভু। অহি বাইরের কল থেকে একবারে হাত মুখ ধুয়ে এসেছে। শার্টের হাতায় মুখ মোছে। পা ভেজা। বিয়ে শব্দটা তখনো ওর মগজে। ঘরে ঢোকার পর কুপিটা নিভে যায়। ওর মা ডাকে।

কে অহি?

হ্যাঁ।

এতরাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি বাবা?

রমনার ওদিকে হাঁটছিলাম।

কুপিটা জ্বালিয়ে ভাত খেয়ে নে।

BanglaBook.org

কুপি জ্বালানোর দরকার নেই। আমি দরজার কাছে বসে খাবো। বাইরে তো চাঁদের আলো আছে।

ও অন্ধকারে হাতড়িয়ে ভাতের সানকি উঠিয়ে নেয়। দরজার ঝাঁপটা একপাশে সরিয়ে রাখে। পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর ভাতের সানকি রেখে খায়। ওর অভ্যেস, খাবার সময় ও গুনগুনিয়ে শব্দ করে। এ অভ্যেস ওর ছোটোবেলা থেকে। একলা খেতে বসলেই এমন হয়। আজ ওর মনে এক ভিন্ন আনন্দ। কেন যে বিয়ে শব্দটা ওকে এমন তাড়িত করছে ও বোঝে না। রিনির মৃত্যুর পর এই প্রথম ওর মনে এক অনাবিল আনন্দের স্রোত।

ভাত খাওয়া শেষ না হতেই ওর মা উঠে এসে ওর পাশে বসে।

তুমি উঠে এলে যে?

এমনি। ভাবলাম দেখি তুই কীভাবে খাচ্ছিস।

অন্ধকারে আর কি দেখবে?

ওর মা চুপ করে থাকে।

অন্ধকারই আমাদের সম্বল।

অহি হাসে। ওর মা চুপ করেই থাকে।

তুমি কোনো কথা বলছো না যে মা?

মনটা ভালো নেই।

কেন?

হারু মুন্সি এসেছিলো। তোকে অনেক গালাগালি করলো। অবশ্য আমিও অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

লোকটাকে খুন করলে কেমন হয়?

অহি, না।

ওর মা ওর হাত চেপে ধরে। এত জোরে যে অহি ব্যথা পায়।

তোকে আমি খুনোখুনির মধ্যে যেতে দিতে চাই না বাবা।

ওকে খুন করলে বাবার খুনের শোধ নেওয়া হবে। তুমি না বলেছিলে–

আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই বাবা। আমার মনে হয় শুধু।

অহির মা লম্বা করে শ্বাস ফেলে।

তোমার মনে হলে সেটাই সত্যি।

থাক বাবা। আমরা গরিব মানুষ। কোনো রকমে দিন গেলেই বেঁচে যাই।

না মা তা বুঝি না।

তবে কি?

জানি না। চলো ঘুমাই।

অহি উঠে পড়ে। কলসি থেকে সানকিতে পানি ঢেলে খায়। ওর মা ওঠে না। অহির মনে হয় মায়ের কিছু হয়েছে। মা আজ আনমনা। মার কণ্ঠস্বর শুনলেই ও মায়ের বদলে যাওয়া টের পায়।

মা ঘুমুবে না?

যাই।

ওর মা ঝাঁপ বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ে। আজ সহজেই অহির ঘুম পায়। শুতে না শুতেই চোখের পাতা বুঁজে আসে। শুনতে পায় মা ওকে ডাকছে।

অহি, বাবা অহি!

কি মা?

BanglaBook.org

আমি না-থাকলে তোর কি খুব কষ্ট হবে?

ধুত কী যে বলো। তুমি থাকবে না কেন?

ও ঘুমিয়ে পড়ে। ওর মা আরো হয়তো কিছু বলেছিলো। ও শুনতে পায় না। ও শুনতে চায় না। ভীষণ ঘুম ওকে অন্য জগতে নিয়ে যায়।

১১

আজ স্কুল ছুটি। অনেক বেলাতেও ঘুম ভাঙে না প্রদীপ্তর। স্বপ্ন দেখে অহির সঙ্গে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে ও কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ আর ফুরোয় না। চমৎকার মেঠো পথ। রাস্তার দুধারে অজস্র লজ্জাবতী ফুল ফুটে আছে। অহির চেহারায় লজ্জাবতী ফুলের গোলাপি আভা। একসময় অহি ওকে পেছনে রেখে দৌড়ুতে থাকে। প্রদীপ্ত ওকে ধরতে পারে না। অহি যেন কোথায় চলে যায়। তখন ওর ভীষণ ভয় করে। ও কাঁদতে শুরু করলে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু না স্বপ্নের কান্নায় চোখে কোনো পানি ছিলো না। শুধু ঘুম ভাঙার পর বুক ভার হয়ে থাকে প্রদীপ্তর। ও বিছানা থেকে উঠতে পারে না। তবে প্রদীপ্ত খুশি যে অহি ওকে শহরের অনেক জায়গা চিনিয়েছে, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। রমনা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বর্ধমান ভবন দেখেছে। ফুলবাড়িয়া স্টেশন, সদরঘাট, লালকুঠি, ফরাশগঞ্জ, ইসলামপুর ঘুরেছে। অহি বাখরখানি খেতে ভালোবাসে। প্রদীপ্ত ওকে বাখরখানি খাইয়েছে। অহি কত যে গল্প করতে পারে। ওর গল্পের শেষ নেই। প্রদীপ্তর মনে হয় ও বেশ বড় হয়েছে। এইসব ভাবনার মধ্য শুনতে পায় মফিজুলের কণ্ঠ। চিৎকার করে ডাকছে, দীপু, দীপু?

আলী আহমদ বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলো, পুষ্পিতা রান্নাঘরে। মফিজুলের ডাক শুনে বেরিয়ে আসে। বলে, দীপু, দীপু করছিস ও কি লেপ ছেড়ে বেরিয়েছে?

মফিজুল আলী আহমদের সামনে মোড়া টেনে বসে।

আজ তো পল্টনে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা। ভাবছি দীপুকে নিয়ে যাবো।

না, না, এসব করিস না মফিজুল।

পুষ্পিতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে।

কতকাল আর আঁচলের তলে রাখবেন ভাবী?

যতদিন রাখা যায়। চা খাবি তো?

নাস্তাই তো খাইনি। ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসেছি।

মুখ ধুয়েছিস? নাকি সেটাও হয়নি?

মফিজুল হেসে বলে, হয়নি। বাথরুমে যাচ্ছি।

শুয়ে শুয়ে এসব কথা শোনে প্রদীপ্ত। তারপর লেপ ছেড়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বারান্দায় আসে।

আলী আহমদ ছেলের দিকে তাকায়।

বাবা আমি নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা শুনতে যাবো।

যাবি। আমি তোকে নিয়ে যাবো।

তুমিও যাবে?

BanglaBook.org

যাবোই তো।

মা?

তোর মাকে আমি বোঝাবো।

ওহ্ কী মজা!

প্রদীপ্ত নিমের দাঁতনটা হাতে নিয়ে মুখ ধুতে চলে যায়। আড়চোখে রান্নাঘরের দিকে তাকায়, পুষ্পিতার পিঠ দেখা যাচ্ছে।

মায়ের জন্য খুব মায়া হয় প্রদীপ্তর।

সকালে অহি যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন ওর মা কাজে চলে গেছে। প্রতিদিনই ও খুব ভোরেই ঘুম থেকে ওঠে। আজ কেন যে দেরি হয়ে গেলো। অথচ মাকে ওর জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিলো যে তুমি আমাকে যেন কি বলতে চেয়েছিলে– বলতে চেয়েছিলে রাহু মুন্সি থেকে দূরে থাকতে– আরো কি সব। কাল ঘুমে আমাকে খেয়ে ফেললো আমি সবটা শুনতে পাইনি মাগো। অহির মন খারাপ হয়ে যায়। কাজে যেতে হবে। এমনিতে দেরি হয়ে গেছে। মুখ ধুয়ে সানকিতে ঢেকে রাখা পান্তা খেয়ে নেয়।

কাঠের দোকানে পৌছুতেই সুরোত আলী খেঁকিয়ে ওঠে।

নবাবপুত্তুরের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে, না?

অহি কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুরোত আলী পয়সা বের করে দিলে চায়ের দোকানে আসে। দোকানে তুমুল আলোচনা। আজ পল্টনে কে নাকি বক্তৃতা দেবে। কথা শুনে অহি বোঝে লোকটার নাম খাজা নাজিমুদ্দীন। হট্টগোলে মাথা ধরে যায়। এমনিতে মন খারাপ। তার ওপর এইসব চেঁচামেচি, একটুও ভালোলাগে না। ও গ্লাস ভর্তি চা নিয়ে চলে আসে।

কাঠগুলো সব রোদে নামা।

অহি কাজে লাগে। একটু পর খদ্দের আসবে। আজ করাতকল বন্ধ। দু'জনেরই শরীর খারাপ। দিন-মজুরির কাজ। শরীর খারাপ থাকলেই রোজগার বন্ধ। বেচারাদের কী যে কষ্ট। ওর তবু মা আছে। আর কিছু না হোক সানকি ভরে ভাত পায়। ওদের কে দেবে? আসলে করাতের শব্দ না থাকলে ওর মনে জোশ থাকে না। সব কেমন মরা মরা লাগে। কাঠ টানতে টানতে ও হাঁপিয়ে ওঠে। চা খেয়ে মেজাজ ঠিক হয় সুরোত আলীর। লোকটা মস্ত চা-খোর। কিছুক্ষণ পর পরই চা চাই তার। সুরোত আলী ওকে কাছে ডাকে।

আজকে শীতটা বেশি না রে?

না তো শীত কই!

তোর হাড়ে টের পাস না। আমি ঠিকই টের পাই।

আজ খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা। যাবি শুনতে?

নাজিমুদ্দীন কে?

হারামজাদা তাও জানিস না? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

অহি চুপ করে থাকে। সেদিনের মিছিলের কথা মনে হয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা কি মিছিলের ছেলেদের মতো সব মানুষকে উদ্দীপিত করবে? সে কেমন বক্তৃতা হবে যে ও নিয়ে সবার মধ্যে উত্তেজনা?

বিকেলে তুই আমার সঙ্গে যাবি বক্তৃতা শুনতে।

আমি কখনো বক্তৃতা শুনিনি।

BanglaBook.org

সেজন্যই তো শুনবি।

শুনলে কি হয়?

দেশের অবস্থা বোঝা যায়।

সুরোত আলীর উত্তর ওর ভালো লাগে না। খদ্দের এসে গেলে সে ব্যস্ত হয়ে কথা বলে। দরদামে বনিবনা হয় না বলে কাঠ বিক্রি হয় না। আবার নীরবতা। সুরোত আলী চেয়ারের ওপর পা উঁচিয়ে বসে এবং অহি মাথা টিপে দেয়। কাজটি ওর পছন্দ হয় না। রোজ রোজ কেবল মাথা টেপা একদম জঘন্য। ছেড়ে দেবে সুরোত আলীর দোকান।

অহি?

জ্বী।

তুই তো কিছুই জানিস না। আটচল্লিশ সনে নাজিমুদ্দীনের সরকার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে স্বীকার করে প্রস্তাব পাস করেছিলো পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে। গণ পরিষদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করবে। কথা দিয়েছিলো।

তারপর তো চার বছর পার হয়ে গেলো।

সেটাই তো আশ্চর্য রে। ব্যাপারটা ওরা বেশ ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে।

এবার কিছু হবে বুঝি?

কে জানে।

এসব দিয়ে আমাদের কি? আমাকে একটা শীতের কাপড় কিনে দেবেন?

ইস্ নবাবপুত্তুর! টাকা যেন গাছে ধরে।

আমার তো গরম কাপড় নেই। সকালে-রাতে খুব শীত করে।

তার আমি কি করবো!

আমার দুঃখের কথা কার কাছে বলবো?

যার কাছে খুশি তার কাছে। আমার কাছে না।

সুরোত আলী চেঁচিয়ে বলে। অহির হাত দুটো শক্ত হয়ে যায়। ও চুল ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে দেয় সুরোত আলীর মাথায়। উঁই বলে লোকটা লাফিয়ে ওঠে। অহি তখন এক দৌড়ে রাস্তায়। শুনতে পায় সুরোত আলী চিৎকার করে গালাগাল করছে। এক ধরনের মুক্তির আনন্দ ওকে আপ্লুত করে। কারো কাছে কিছু চাওয়ার গ্লানি এখন আর ওর নেই। ও মনের আনন্দে শিস্ বাজাতে বাজাতে রাস্তায় হাঁটে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে অপেক্ষা করবে। দুপুরের আগেই ট্রেন আসবে। মাল টেনে একটা রোজগার করতে পারলেই দুপুরের খাওয়া হয়ে যাবে। তারপর সভায় যাবে। বক্তৃতা শুনে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করবে মা ওকে কী বলতে চেয়েছিলো। মায়ের কথা খুব মনে হয় ওর। ওর উচিত নিজের ভালো কিছু আয়-রোজগার করে মাকে অন্যের বাড়ির কাজ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। মা আর কতকাল কষ্ট করবে? মায়ের দায়িত্ব নেওয়ার মতো যথেষ্ট বড় কি ও হয়নি? মায়ের কথা ভাবতেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়। কেবলই মনে হয় মায়ের জীবনে শোকটাই বেশি। তাকে আর কতটুকু আনন্দ দিতে পারবে ও?

স্টেশনটা বেশ ফাঁকা। দু-চারজন এদিক-ওদিকে শুয়ে বসে আছে। বেশির ভাগই ভিখারি। প্লাটফরম থেকে খানিকটা দূরে চার-পাঁচটা ছেলে ডাঙ্গুলি খেলছে। অহি ওদের ওখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে। ওদের মুখে খিস্তি-খেউড়। কখনো এর-ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মারামারি হচ্ছে। আবার মিলে যাচ্ছে। মন্টু নামের ছেলেটা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

তোর নাম কি রে?

অহি।

BanglaBook.org

খেলবি নাকি?

না।

কেন?

কখনো খেলিনি।

বলিস কি?

ছোটোবেলা থেকেই তো কেবল এখানে ওখানে কাজ করলাম। খেলার সময় ছিলো না।

মন্টু হি-হি করে হাসে।

তা আজ কাজ নেই?

ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

এখন কি করবি?

আর একটা জোটাবো।

আমাদের দলে ভিড়ে যা।

তোরা কি করিস?

আমরা রাস্তার ছেলে রাস্তায়-রাস্তায় থাকি।

খাস কি?

কখনো মানুষের পকেট কাটি, কখনো স্টেশনে মাল টানি। কখনো সায়েবদের কাছে দু-চার পয়সা চাই।

ঘুমাস কোথায়?

এই স্টেশনে।

তোদের মা-বাবা নেই?

না। তুই থেকে যা আমাদের সঙ্গে।

আমার যে মা আছে। ঘরে না ফিরলে মা ভাববে।

ইস্ কচি খোকা যেন।

সবাই মিলে হি-হি করে হাসে। ওরা অহিকে ঘিরে ধরছে।

বেশ মজা পাচ্ছে ওকে নিয়ে। অহির মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। একবার মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে মারামারি করবে। পরক্ষণে পিছিয়ে যায়। অতগুলোর সঙ্গে পারবে না।

আয় ডাঙ্গুলি খেলা শিখিয়ে দেই। তাহলে তুই আর খোকা থাকবি না। আমাদের মতো বড় হয়ে যাবি।

আবার হাসি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। ও রেগে যায়।

ইচ্ছে করে ওদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে। ঘৃণাভরে বলে, তোদের মা-বাবা নেই। তোরা রাস্তার ছেলে। আমি তোদের মতো না।

আমাদেরও মা ছিলো। চলে গেছে অন্যের সঙ্গে।

অহি আর দাঁড়ায় না। ওখান থেকে চলে আসে। বুঝতে পারে না যে ওরা দুঃখের সঙ্গে কথাটা বললো নাকি ঘৃণার সঙ্গে? ওর বুক পুড়ে যায়, পুড়তেই থাকে। পেছন থেকে শুনতে পায় ওদের হাসি। বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করে ওকে ব্যঙ্গ করছে। কী ধার সেইসব শব্দের! তখন ও বুঝে যায় ওদের আসলে ভালোবাসার বোধ নেই। ওরা ওদের জীবন থেকে সেইসব ঝেড়ে ফেলেছে। ওরা ওদের মতো ভালোই আছে।

অহি প্লাটফরমের ওপরে এসে বেঞ্চে বসে। লোকজন এসেছে। স্টেশনে ব্যস্ততা বাড়ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ট্রেন আসবে। একটি খুব ছোটো ভিখারি ছেলে এসে অহির

BanglaBook.org

সামনে হাত পাতে। ও বিব্রত হয়ে ঐ বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় যেন ছোটোবেলার রিনি। যেন বলছে ডালপুরি নিয়ে আসতে। পরক্ষণে মনে হয় ওকে কি পয়সা ভিক্ষা দিতে পারে এমন লোকের মতো দেখাচ্ছে? অহি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

আমার কাছে পয়সা নেই রে? থাকলে ঠিকই তোকে দিতাম।

বাচ্চাটি চলে যায়। চারদিকে মানুষের হৈ-চৈ। কুলিরা দৌড়াদৌড়ি করছে। অহি নিষ্পলক দেখে। বুকটা শূন্য হয়ে থাকে।

ট্রেন এলে এক টাকা রোজগার হয় ওর। এতেই ও খুশি। ও বেরিয়ে যাবার সময় খেয়াল করে ডাঙ্গুলি খেলা ছেড়ে ছেলেগুলো মারামারি করছে। এখন আবার কি হলো? ও একটু দূরে দাঁড়িয়ে মারামারি দেখে। এক একজনের চেহারা কেমন বদলে গেছে। কী হিংস্র দেখাচ্ছে ওদের। ওর শূন্যতা কমে যায়। কেবলই মনে হয় বেঁচে থাকার জন্য ঐ হিংস্রতা দারুণ প্রয়োজন। ও স্টেশনের কাছের এক হোটেলে আট আনার ডালভাত খায়। ওর মায়ের জন্য আট আনা রেখে দেয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে পল্টন ময়দানে আসে। পল্টন লোকে-লোকারণ্য। কেমন বিহ্বল হয়ে যায় ও। এত মানুষ একসঙ্গে ও আগে কখনো দেখেনি। চারদিকে তাকায়। না, একটাও চেনা মুখ নেই। এতসব মানুষ কোথা থেকে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেলো? ওর বুক ঢিপঢিপ করে। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, একটু পরে বক্তৃতা শুরু হবে। চারদিকে প্রবল করতালি হয়ে গেলো। কেন ও বুঝতে পারলো না। ওর গা ঘেঁষে বসে বুড়ো একজন লোক। সাদা দাড়ি আর সফেদ পাঞ্জাবিতে ভারি পবিত্র দেখাচ্ছে মানুষটিকে। ও বার বার মানুষটির মুখের দিকে তাকায়। খুব ইচ্ছে হয় আপন করে কিছু একটা ডাকতে। সঙ্গে সঙ্গে বলে, চাচা তালি দিলেন কেন?

কি জানি। সবাই দিলো আমিও দিলাম।

চাচা আপনি কোথায় থাকেন?

নারিন্দা।

আর কথা হয় না। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন। শীতের বিকেল। রোদের তেজ কমে এসেছে। অহির শীত করছে। ও গুটিসুটি বসে থাকে। কে যেন বক্তৃতা করছে। ও বোঝার চেষ্টা করছে। কিছুই বুঝতে পারছে না।

চাচা এটা কি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা?

না।

তিনি কি বাংলায় বক্তৃতা করবেন?

বৃদ্ধ ওর দিকে তাকিয়ে হাসেন, না, বাংলায় করবেন না।

তবে কিসে করবেন?

উর্দুতে। উনি তো বাংলা জানেন না। নওয়াব পরিবারের লোক কিনা! খান্দানি–

আর কিছু শোনা যায় না। প্রবল শব্দে করতালি বাজে। বৃদ্ধ সেদিকে উৎসাহিত হয়ে যান। অহি আঙুল কামড়ায়। কোনোকিছু বুঝতে না পাবার কষ্টে ও ম্রিয়মাণ। তখন শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা। বৃদ্ধ ওর ঘাড়ে হাত রাখে। আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে বুঝিয়ে দেয় কার বক্তৃতা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে, প্রধানমন্ত্রী তার প্রিয় লোক। এদের মতো লোকের জন্যই পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধ অতি উৎসাহে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। একটা অক্ষরও বুঝতে না পারায় অহি বিরক্ত হয়ে যায়।

কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বুঝবি কি করে বাঙ্গাল কোথাকার!

আপনি বুঝতে পারছেন?

BanglaBook.org

বৃদ্ধ ঢোক গেলে। অহির ঘাড় থেকে হাত নামিয়ে চাদরের নিচে ঢোকায়।

সব বুঝতে না পারলেও কিছু কিছু পারছি। আহ্ কী চমৎকার গলা।

তখন প্রবল শব্দে ওদের চারপাশে না, না ধ্বনি ওঠে। কিন্তু বড় অল্প সময়ের জন্য। জনসমুদ্রে তা আবার হারিয়ে যায়। অহি উঠে যাবার জন্য উপায় খোঁজ করে। কিন্তু বৃদ্ধ ওকে টেনে বসায়।

বস্, যাচ্ছিস কোথায়?

ভালো লাগছে না।

ছোটোলোকদের এসব ভালো লাগবে নাকি?

ওরা না, না করলো কেন?

করবে না? কারো কি আদব-লেহাজ আছে? সব বেতমীজ।

বৃদ্ধের চাপা ক্ষুব্ধ স্বর কিড়মিড় করে। অহি বোঝে, পারলে ওদের গলাটা চেপে ধরতো। পেছনে হৈ-চৈ হচ্ছে। অনেকে উঠে চলে যাচ্ছে। অহি বৃদ্ধের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে। ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে, মানি না, মানবো না। বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না। অহি ওদের পিছে পিছে আসে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দেয়। রাস্তাজুড়ে ছোটো ছোটো জটলা। সবার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। সবাই বিক্ষুব্ধ। স্লোগান দিতে-দিতে হঠাৎ অহির মনে হয় কি কথা ছিলো যে সবাই রাগে ফেটে পড়েছে? আরো মনে হয় ঐ বৃদ্ধ লোকটির কথা। যে কথায় সবাই প্রতিবাদ করছে সেই কথাটি ও লোকটি মেনে নিচ্ছে কি করে? সে কি এই দেশের মানুষ না? ওর মন খারাপ হয়। লোকজন এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। থমথম করছে শহর। ইতোমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে যে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছে। সেই উচ্চারণ শুনে থমকে দাঁড়ায় ও। পেছন থেকে কে যেন বলছে, শুয়োরের বাচ্চা বলে কিনা উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

আরো কিছু অশ্লীল গালি দু'কান ভরে শুনে ওর হাসি পায়। এই প্রথম মানুষ প্রকাশ্যে গালি-গালাজ করছে। খিস্তি-খেউড়ে ভেসে যাচ্ছে পথঘাট। কে শুনতে তো খারাপ লাগছে না। সর্বত্র মানুষের উচ্চকণ্ঠ অন্ধকারের ভৌতিক পরিবেশ তাড়িয়ে দিয়েছে। এই উত্তেজনা, এই ক্ষোভ, এই ঘৃণা অহির বুকে গেঁথে যায়।

তখন শুনতে পায় পেছন থেকে আলী আহমদ ডাকছে ওকে, অহি, অহিউল্লাহ?

প্রদীপ্ত দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে।

তুমিও মিছিলে গিয়েছিলে অহি ভাই?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

আমিও গিয়েছিলাম।

আলী আহমদ ওর ঘাড়ে হাত রাখে, কেমন আছ অহি?

ভালো স্যার।

আসো না কেন আমাদের বাসায়?

প্রদীপ্তর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়।

দীপু বলেছে আমাকে।

যাই স্যার?

আচ্ছা, এসো।

আবার কবে দেখা হবে অহি ভাই?

আমিই যোগাযোগ করবো।

দীপু ঘাড় নাড়ে। তারপর যে যার পথে চলে যায়।

নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবার আগে দেখে নেয় যে পকেটে আট আনা পয়সা

BanglaBook.org

আছে কি না। মাকে প্রায়ই পয়সা এনে দেওয়া ওর অভ্যেস। ওর মা খুশি হয়। মায়ের খুশি মুখ দেখতে পেলে কী ভালোলাগে। কিন্তু ঘরের দরজায় হারু মুন্সিকে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লোকটা এখানে কি করছে? মা কি কাজ থেকে ফিরেছে?

কোথায় ছিলি রে বিকেলে?

বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

লোকটা তো সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো।

অহি চুপ করে থাকে। ওর মনে হয় ঘরের ভেতর আরো দু-চারজন আছে।

ঘরে লোক মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। চল পুকুর ধারে যাই। তোর সঙ্গে কথা আছে।

এখানে বলেন?

চল না একটু বসি।

মা কি ফিরেছে?

ফিরেছে।

আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলে আসি।

হারু মুন্সি খপ্ করে ওর হাত ধরে।

আয়।

অহি সে মুঠি ছাড়াতে পারে না। লোকটার সঙ্গে হাঁটতে বাধ্য হয়। মনে অস্থিরতা। পছন্দ হচ্ছে না লোকটার আচরণ।

আমার মনে হয় এ সব কথা নিয়ে গণ্ডগোল হবে।

হওয়া উচিত। ভাষা নিয়ে লড়াই হলে আমি সে লড়াইয়ে লড়বো।

কার পক্ষে?

অহি থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়ে বলে, কেন, আমার নিজের পক্ষে, বাংলার পক্ষে।

তোর বাপ হলে উল্টোটা করতো। ঐ ছোটোলোকদের কথা তোর বাবা শুনতেই পারতো না।

আমি বাবার মতো না। আমি অন্য রকম। আপনি কার পক্ষে?

যারা ছোটোলোকদের মাথায় আগুন জ্বালায় তাদের পক্ষে। ছোটোলোকগুলো তো সবকিছু ধ্বংস করার জন্য লাফালাফি করে।

আপনি নিজে কি?

হারু মুন্সি কথা বলে না। প্রবল বেগে কাশে। অহি নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়। চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মনে হয় লোকটা কেন ডেকে এনেছে শোনা দরকার। ওর এতটা বয়সে ও কাউকে ঘৃণা করেনি। এই প্রথম ও হারু মুন্সিকে ঘৃণা করতে শুরু করে। ঘৃণা ওর মধ্যে প্রবেশ করে ওকে ভিন্ন অহি করে। ও বুঝতে পারে না যে এখন থেকে ঘৃণার মধ্যে ওর দিনযাপন শুরু হলো।

মাগো কী অন্ধকার! আমি আর আপনার সঙ্গে যাবো না। আমাকে কি বলতে চেয়েছিলেন বলেন।

বলছিলাম তোর মায়ের কথা।

কি হয়েছে আমার মায়ের?

বেচারা তো সারাজীবন কষ্ট করলো। এখনো রাতদিন খাটতে হয়।

আমি চেষ্টা করবো মাকে আর যেন বেশিদিন খাটতে না হয়।

কবে আর করবি? কবরে গেলে?

BanglaBook.org

আমার মা আমি বুঝবো। আপনার এত দরদ কীসের?

ও, ভালো করতে গেলে উল্টো হয়। তোর বাপ এমন ভালো মানুষ ছিলো আর তুই একটা কেউটে হয়ে জন্মেছিস। অসভ্য ছোটোলোক কোথাকার।

গালাগাল করবেন না। কি বলবেন বলেন?

বলবো আর কি, তোর মায়ের কষ্ট দেখে কাদেরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। লোকটার তো বউ মরে গেছে। বেচারি খেয়ে-পরে বাঁচবে।

কি বললেন? বিয়ে?

অহি হারু মুন্সির হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

হ্যাঁ, সত্যি। বিয়ে।

ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলে ও। তারপর হারু মুন্সির হাত ছেড়ে অন্ধকারে দৌড়ুতে থাকে। এক দৌড়ে ঘরে এসে দাঁড়ায়।

মা, মাগো।

কুপিটা তেমন জ্বলছে। ওর মা হাঁটুর উপর থুতনি রেখে বসে আছে। চোখে জল। গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। অহি মায়ের সামনে উবু হয়ে বসে।

মাগো!

ভাত খাবি বাবা?

মাগো!

ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

আমি তোমার পর হয়ে গেছি।

না বাবা, না।

অহির মা ওকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। কান্নায় বুক ভেসে যায়। হাতে একটা খাবারের প্যাকেট নিয়ে ফিরে আসে কাদের। ককর্শকণ্ঠে বলে, এত কান্নাকাটির কি হলো? মরে নাই তো কেউ।

অহি চমকে ওঠে। ঐ ককর্শকণ্ঠ ওকে স্তব্ধির করে দেয়। মনে হয় মৃত্যু ছাড়া কি মানুষের কোনো শোক থাকতে নেই? ও তো ভাবছে মায়ের এই বিয়ে ওর কাছে মৃত্যুর চাইতেও বেশি। কাদের কি করে বুঝবে এই কষ্ট? অহি পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের করে।

তোমার জন্য এনেছিলাম মাগো।

তুই রাখ বাবা।

অহি জোর করে মা-র হাতে পয়সা গুঁজে দেয়।

তুমি রাখো মাগো।

তারপর খুব দ্রুত হাতে ঘরের কোণ থেকে নিজের লুঙ্গি আর শার্টটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। শুনতে পায় পেছনে থেকে ওর মা ডাকছে। ও দাঁড়ায় না। প্রচণ্ড অভিমান হয়। ভাবে ঐ ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকে আর কি হবে?

ও সোজা বুলু দাসের কাছে চলে আসে। বুলু দাস আঙিনায় মহুয়া গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে।

অহি তুই?

তুমি কেমন আছো বুলুদা?

খুব ভালো রে। সোহাগির সঙ্গে বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেছে। আসছে পূর্ণিমায় তারিখ ঠিক হবে।

BanglaBook.org

অহির চোখ ছলছল করে। কথা বলতে পারে না। পাছে বুলু দাস বোঝে যে ও কাঁদছে।

কি রে কথা বলছিস না যে? তুই খুশি হোস নি?

হয়েছি।

ওর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বুলু দাস বিস্মিত হয়।

দেখি তোর কি হয়েছে? ওমা কাঁদছিস কেন?

আজ আমার মায়ের বিয়ে হয়ে গেলো বুলুদা।

তাই নাকি?

বুলু ওর ঘাড়ে হাত রাখে। কোনো সান্ত্বনার কথা বলে না। কাঁদুক, কেঁদে ও নিজেকে হালকা করুক। কেঁদে কেটে চুপ করে গেলে অহির মনে হয় এতে দুঃখ পাওয়ার কোনো মানে হয় না। তার চাইতে ওর মা ভালো থাকুক, সুখে থাকুক। ও চোখের জল মুছে বলে, বুলুদা তুমি না বলেছিলে আমি বড় হলে তাড়ি খেতে দেবে? আজ বড় হয়েছি। আমার তাড়ি খাবার সময় হয়েছে। দাও আমাকে।

ঠিক আছে দেবো। চল, ঐ মাঠে যাই।

বুলু ঘর থেকে তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে আসে। দু'জনে মাঠের মাঝখানে বসে। মাটির খুপরিতে তাড়ি ঢালে বুলু। খাবার আগে অহি বলে, বুলুদা আজ থেকে আমি রাস্তার ছেলে হয়ে গেলাম, না?

বুলু কথা বলে না। অহি গলায় তাড়ি ঢাললে ওর জন্য প্রচণ্ড মায়া হয়। অহি হড়হড় করে বমি করলেও বুলু কিছু বলে না। এক সময় ও ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। বুলু তখন বাড়ি ফিরে যায়।

সারারাত ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে থাকে অহি।

BanglaBook.org

সারাদিন এদিক ওদিক কাটিয়ে রাত্রিবেলা স্টেশনে এসে ঘুমোয় ও। শীতটা একটু বেশি লাগে। শীতে কুঁকুড়ে থাকে। কিছু করার নেই। সবকিছুই একসময় গা-সওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়েছিলো মায়ের কাছে গিয়ে কাঁথাটা চেয়ে আনবে। পরক্ষণে নিজেকে শাসিয়েছে। মা ওকে দেখলে দুঃখ পাবে, কাঁদবে, ঐ লোকটা বিরক্ত হবে। দরকার নেই অশান্তি সৃষ্টি করে। এখন নিজের পথ বুঝে নেওয়া ভালো। সেদিনের বক্তৃতার পর থেকে শহরে দারুণ উত্তেজনা। মিছিল আর সভা-সমিতিতে গম্ গম্ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। অহি মিছিলে যায়, বক্তৃতা শোনে। ঘোরের মধ্যে নেশার মতো ভালোই কেটে যায় ওর সময়। অহি বুঝতে পারে অনেককিছু ও বোঝে না, তবু এসব কিছুর সঙ্গে কেমন করে যেন এক হয়ে যায়। ওর বুকে এখন কষ্ট নেই। একদিন স্টেশনে ঘুমোতে যাবার আগে মণ্টুর সঙ্গে দেখা হয়। ও একা। সঙ্গে আর কেউ নেই।

তুই এখানে কি করছিস রে?

ঘুমুতে এসেছি।

কেন, তোর না ঘর আছে?

ছিলো। এখন নেই।

ভুটুস হয়ে গেছে বুঝি?

অহি কথা বলে না। হাত দিয়ে বেঞ্চিটা ঝেড়ে পুছে নেয়।

তোর মা আছে শুনে সেদিন আমার খুব হিংসে হয়েছিলো। এখন তোর জন্য মায়া হচ্ছে।

অহি চুপচাপ শুয়ে পড়ে।

কিরে কথা বলবি না?

মণ্টু ওর পাশে বসে।

সেদিন তুই যাদের আমার সঙ্গে দেখেছিলি ওরা কেউ আমার সঙ্গে নেই। এখন থেকে আমি তোর বন্ধু হবো রে।

অহি মণ্টুর হাত চেপে ধরে। ওর হাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা। শীতে একদম জমে গেছে। দু'জনের কারো গায়েই গরম কাপড় নেই।

মণ্টু আজ শীত বেশি পড়েছে না রে?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

চল ওয়েটিং রুমের ভেতরে যাই।

চল।

ওরা গলা ধরে হাঁটে।

আমি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের ক্যান্টিনে একটা কাজ নিয়েছি। টেবিলে টেবিলে চা দেই, কাপ-পিরিচ ধুই– এইসব। মালেক ভাই বলছিলো আর একটা ছেলের দরকার। কাল তোকে নিয়ে যাবো। তুইও আমার সঙ্গে কাজ করবি।

খুব ভালো হবে রে মণ্টু।

ক্যান্টিনে সারাদিন ছাত্ররা থাকে। মিটিং হয়, কথা হয়। কত কথা যে ভেবে পাবি না। জানিস, সবাই বলে রাষ্ট্র ভাষার জন্য পরিষদ তৈরি হয়েছে। সব দলের লোক আছে সেখানে। একটা সাংঘাতিক কিছু হবে।

কি হবে মণ্টু?

সেটা আমিও জানি না রে।

ওয়েটিং রুমের সামনে থেকে দু'জনে ফিরে আসে। ঘরটা তালা দেওয়া। দু'জনে একটা কোণায় গিয়ে খুব জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ে। একে অন্যকে উত্তাপ দিতে চায়।

BanglaBook.org

ক্যান্টিনে ব্যস্ত সময় কাটে অহির। কাজটা ওর মনের মতো। এখানে যারা আসে তাদের ও আগে কখনো দেখেনি। শুধু মফিজুলকে চেনে। মাঝে-মাঝে ও চা দেওয়ার ফাঁকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের দেখে। প্রত্যেকের একদম ভিন্ন চেহারা। কিন্তু ওদের কণ্ঠস্বর এক, দৃষ্টি এক এবং যা বলে তা এক। এটা কেমন করে হলো? কেমন করে সম্ভব? ওদের ডাকে চমক ভাঙলে ও আবার দৌড়ে চা আনতে যায়।

মফিজুল প্রতিদিন এখানে আসে। মাঝে-মাঝে অহির সঙ্গে কথা বলে। অন্যদের দেখিয়ে বলে, ও একটা দারুণ ছেলে।

অহি লজ্জা পেয়ে দ্রুত সরে যায়। একদিন মফিজুল বলে, তোমার সঙ্গে দীপুর অনেকদিন দেখা হয় না। ওর খুব মন খারাপ।

অহি লাজুক হেসে বলে, এখন যে সময় পাই না।

ঠিক আছে আমি একদিন দীপুকে এখানে নিয়ে আসবো। ও খুশি হবে।

অহি ঘাড় নাড়ে। তখন ও অবাক হয়ে শোনে একজন চিৎকার করে বলছে, বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দীনের ফাঁসি চাই।

অহি মফিজুলকে জিজ্ঞেস করে, বিশ্বাসঘাতক মানে কি?

যে কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করে।

মফিজুল ওর মুখের দিকে তাকায়। অহি ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি হওয়াই দরকার।

তারপর ধীর পায়ে চলে যায়। মফিজুল মনে মনে বলে, ছেলেটার তল পাওয়া কঠিন।

বিকেলে বুলু দাস এসে ওকে ডাকে।

কি রে অনেকদিন তুই আমার কাছে যাস না?

সময় পাই না বুলুদা।

হুঁ, খুব কাজের ছেলে হয়ে গেছিস।

বুলুদা সেদিন তুমি কিছু মনে করোনি তো?

অহির লজ্জিত ভঙ্গিতে বুলু হো-হো করে হাসে।

তুই পাগল।

আমি আর কোনোদিন তাড়ি খাবো না বুলুদা।

আমিও দেবো না।

জানি তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো। তোমার মতো কেউ আমাকে ভালোবাসে না।

তোর কি হয়েছে বল তো? আজ কেমন করে কথা বলছিস?

এখন আমি খুব ভালো আছি। আমার আর আগের মতো মন খারাপ হয় না।

মিছিলে যাস?

হ্যাঁ বুলুদা, সব সময় যাই। না গেলে ভালোলাগে না।

শহরটা কেমন যেন পাল্টে গেলো। আমার এই এতটা বয়সে শহরটাকে এমন পাল্টে যেতে দেখিনি।

তোমার ভালোলাগে না?

আমার ভয় করে।

অহি হো-হো করে হাসে।

তুমি জানি আজ কেমন করছো বুলুদা।

তোর খুব সাহস হয়েছে না রে?

হ্যাঁ খুব। এখন কিচ্ছুতে ভয় পাই না। আমার মা কেমন আছে তুমি জানো বুলুদা?

জানি না রে।

আমিও জানি না।

তুই মাঝে-মধ্যে গিয়ে দেখে আসতে তো পারিস।

যাবো একদিন। দেখো না এখন একদম সময় পাই না। ঐ যে মণ্টু ডাকছে, যাই।

অহি দৌড়ে চলে যায়। বুলু দাস রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। অহির জন্য ওর খুব কষ্ট হয়। এতটুকু বয়সে ছেলেটি জীবনের কতকিছু পেরিয়ে গেলো।

এখন কেমন ছটফটে, চঞ্চল হয়েছে। বুলু দাসের মনে হয় এতদিনে ও বোধ হয় নিজের একটা জগৎ খুঁজে পেয়েছে।

BanglaBook.org

১২

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সভা হবে। বিশাল। মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিন জনশূন্য। মালেকের কাছে বলে অহি এবং মন্টুও এসেছে বক্তৃতা শুনতে।

স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিছিল করে প্রদীপ্ত এসেছে। ও দারুণ উত্তেজিত। শহরের এতসব ঘটনা ওকে প্রতিদিন অন্যরকম করছে। বাড়িতে বাবা ওকে নানা কিছু বুঝিয়ে দেয়। আলী আহমদ নিজেও ছাত্রদের নিয়ে সভা করে। ওদের নানা প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রদীপ্ত সেসব কথাও শোনে।

দূর থেকে অহিকে দেখে ও চিৎকার করে ডাকে। ওহি ওকে হাত ইশারায় কাছে আসতে বলে। তারপর তিন জনে জায়গা নিয়ে বসে যায়। স্কুলের ছেলেদের চেয়ে অহির সঙ্গ বেশি প্রিয় মনে হয় প্রদীপ্তর। মাঘ মাসের মাঝামাঝি। শীতের রোদ ওদের বেশ আরাম লাগে। পিঠ রোদে দিয়ে বসেছে। ক্যান্টিনে বসে যারা চা খায় তাদের অনেকে বক্তৃতা করছে। কী আবেগ, কী গমগমে কণ্ঠ। অহির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অথচ কয়েক-দিন আগে পল্টনে শোনা বক্তৃতাটা ওর শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিলো। বিরক্ত লাগছিলো ওর। আজ ওর আনন্দ হচ্ছে।

শুনলে কেমন মন ভরে যায়, না প্রদীপ্ত?

হ্যাঁ।

প্রদীপ্ত প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। মন্টু আস্তে করে বলে, আমরা তো রাস্তার ছেলে, আমাদেরকে কী এসব মানায়?

একশোবার মানায়।

প্রদীপ্ত জোরের সঙ্গে বলে।

আমরা কী বাংলায় কথা বলি না মন্টু?

বলি।

তা হলে তোর কেন মনে হচ্ছে মানায় না?

এমনি বললাম।

আর বলবি না। যা আমাদের নিজের তাকে নিয়ে প্রশ্ন রাখতে নেই।

ঠিক বলেছে প্রদীপ্ত। আমারও তাই মনে হয়।

মন্টু অবাক হয়ে অহির মুখের দিকে তাকায়। ওর মতো বিশ্বাস মন্টুর নেই। ও এত গভীর করেও কিছু ভাবে না। ও আর কথা বলে অহির মনোযোগ নষ্ট করতে চায় না।

সভা শেষে এক বিশাল মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে ওরা হাত ধরে রাখে, পাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক ফাঁকে অহি বলে, জানিস যখন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলি তখন দম একটুও ফুরায় না। মনে হয় একনাগাড়ে হাজার বার বলতে পারি।

প্রদীপ্ত বলে ঠিক বলেছেন, অহি ভাই।

হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেলো। চল কেটে পড়ি।

ধুত, আয় তো।

অহি মন্টুর হাত ধরে টান দেয়।

তিনজনে জনস্রোতে মিশে যায়। প্রদীপ্তর মনে হয় ওরা আর বালক নেই। ওর বাবা তো জানে না যে প্রদীপ্ত স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিছিলে চলে এসেছে। আজ বাবাকে গিয়ে

BanglaBook.org

ও বলবে, মিছিলে এসে ও বড় হয়ে গেছে। খুব বেশি বড় না হলেও অহির সমান তো হয়েছেই, ঐটুকু হতে পেরেই ওর আনন্দ হচ্ছে। ওরা বড়দের সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে পারছে। প্রদীপ্তর মনে হয় ওর চারদিকে খোলা। যেদিকে খুশি সেদিকেই এগুতে পারে। এখন ওর শুধু ঠিক করা যে ও কোনদিকে যাবে।

বিকেলে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা মুসলিম লীগ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করে এবং বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সভাতেই ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়।

আর কতদিন পরে অহি?

আজ তো ৪ তারিখ। আরো ষোল দিন পরে।

এখনো অনেক দেরি।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যাবে। দেখছিস শহরের মানুষ কেমন মেতে উঠেছে।

মন্টু চুপ করে থাকে। ও অহির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। কেবলই মনে হয় ডাঙুলি খেলার দিনগুলো বুঝি অনেক বেশি ভালো ছিলো। ওর অন্য বন্ধুরা ওর খোঁজে এসেছিলো, কিন্তু অহি ওকে যেতে দেয়নি। অহি এখন ওকে বেশি ভালোবাসে। সারাদিন ওরা তেমন সময় পায় না। অহির আগ্রহ বেশি, তাই মন্টু নিজে বেশি কাজ করে ওকে যাবার সুযোগ করে দেয়। অহি যেন ওর মায়ের পেটের ভাই। কেমন প্রাণের টান অনুভব করে।

২১ তারিখের ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্রদের যেমন, সাধারণ মানুষেরও তেমনি উৎসাহের অন্ত নেই। পূর্ণ উদ্যমে চলছে প্রস্তুতি। ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি সম্বলিত ব্যাজ বিক্রি করে ২১ তারিখ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

দেয়ালের লিখনে, পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহর। মানুষের আলোচনার বিষয় একুশে। জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এদিকে ঐ একই তারিখে গণপরিষদে বসবে পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন। ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে সরকার ক্রমাগত একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করলো। তীব্র প্রতিক্রিয়া। থমথমে হয়ে যায় পুরো শহর। ক্ষোভে, আক্রোশে পরিপূর্ণ বুকের কন্দর নিয়ে জেগে রইলো মানুষ। অহি ভাবলো, আমার মতো রাস্তার ছেলের মৃত্যুর বদলে কি বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে? আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে যায় সারারাত।

খুব ভোরবেলা জনশূন্য রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে থাকে অহি। মন্টুকে ডেকেছিলো। কিন্তু এত ভোরে ও ঘুম থেকে উঠতে রাজি হলো না। ভোরের বাতাসে ও বড় করে হাই তোলে। শীত লাগছে না। ও ফাঁকা রাস্তায় খানিকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে। শরীর গরম হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলে যে আজ আর ক্যান্টিনে ফিরবে না। ও হাঁটতে হাঁটতে ইউনিভার্সিটির চত্বরে আসে। বেলা বেশ হয়েছে। ছেলেরা ইতস্তত জটলা করছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়েরা আসছে। স্কুলের ছেলেদের দেখলেই অহি প্রদীপ্তকে খুঁজতে থাকে। যত বেলা বাড়ছে, প্রতিবাদের, বিক্ষোভের স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। একটু পর সভা শুরু হলো। ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কি না এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। অহির অস্থির লাগছে। ওর বুলু দাসের কথা খুব মনে হয়। আজ তো বুলু দাসের কাজ নেই। এখনো কি ঘুমুচ্ছে? সোহাগির সঙ্গে বিয়েটা কি হয়েই গেলো?

BanglaBook.org

পরক্ষণে তুমুল স্লোগানে ভেঙে পড়ে এলাকা। দশজন দশজন করে মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। শুরু হয় গ্রেফতার বরণের পালা। দশজন করে বের হয় আর রাস্তায় অপেক্ষমাণ পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। অহি একপাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। তখন প্রদীপ্ত দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে, অহি ভাই?

আমি তো তোকেই খুঁজছি প্রদীপ্ত।

আমি তো অনেকক্ষণ আগে এসেছি। তোমাকেই খুঁজছিলাম।

আমরা এখন কি করবো অহি ভাই।

এদের সঙ্গে থাকবো। অন্য কোথাও যাবো না। দেখছিস না কেমন গ্রেফতার বরণ চলছে।

অহির বুক কাঁপে থরথর করে। দেখতে দেখতে অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে ট্রাক চলে যায় লালবাগ থানায়। এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ওদের চোখ জ্বালা করে। ওরা দৌড়ে পুকুরের পাশে চলে আসে। আঁজলা ভরে পানি তুলে চোখে ঝাপটা দেয়। অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেউ কেউ ঝাঁপ দেয় পুকুরে। অহি আর প্রদীপ্ত কারো কারো জন্য রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে আসে। চোখ মুছিয়ে দেয়। নিজেদের যন্ত্রণা তেমন নয়। ভুলে যায় সেটুকু। এই যন্ত্রণা এবং উত্তেজনায় ছাত্ররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বেলা বাড়ে। সূর্য মাথার ওপর খাড়া। শীতের দুপুর বলে ঝাঁঝালো রোদ নয়। দু'টো পর্যন্ত চলে গ্রেফতারবরণের পালা। এর মাঝে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হতে থাকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে। ওরা নিজেরা বুঝতে পারে না কিভাবে এখানে এলো। ওরা এখন মেডিক্যালের হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে। মণ্টু ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

অহি? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? মাগো তোর কী যে সাহস। আমি তো ভয়েই বাঁচি না।

অহি ওর কাঁধে হাত রাখে।

ভয় কি মণ্টু? আয়।

না, আমি যাবো না। আমি এদিকেই থাকি।

মণ্টু ভেতরের দিকে চলে যায়।

অহি দেখলো এখন আর ছাত্ররা একা নয়। স্রোতের মতো মানুষ এসে মিলিত হয়েছে। শত শত মানুষ। দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরোলেই তাড়া করে পুলিশ। বেলা সোয়া তিনটার দিকে এম. এল. এ. ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। পরিষদ ভবনের কোণে চৌরাস্তায় মেশিনগান পাতা হয়েছে। তৈরি হয়েছে কাঁটাতারের ব্যারিকেড।

উত্তাল হয়ে ওঠে জনতার স্লোগান। কেউই আর কোনো বাধা মানতে চায় না। মিছিল এগিয়ে আসতে চাইলেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাড়া করতে করতে ঢুকে পড়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে। শুরু হয় খণ্ড যুদ্ধ। মানুষ ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জে দমাতে না পেরে পুলিশ গুলি চালায়। পড়ে যায় রফিকউদ্দীন। বুলেটে উড়ে যাওয়া খুলি থেকে ধোঁয়া বেরোয়; গলিত মগজ বেরিয়ে পড়ে। আহত হয় বরকত। ওকে ধরাধরি করে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায় ছেলেরা। সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে ছেলেরা কাঁদে। মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা এম্বুলেন্সে করে আহতদের তুলে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

তখন ফুলার রোডে নিহত অহিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদে প্রদীপ্ত আর মণ্টু। রক্ত লেগে যায় মণ্টুর শরীরেও। অহির বুক ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। এই প্রথম মণ্টু একজনের জন্য বুক উজাড় করে কাঁদছে। বাবা যখন মারা গেছে ও তা বোঝেনি। মায়ের অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেজন্য ও কাঁদেনি। রাস্তায় যতদিন ঘুরেছে তখন কারো জন্য কাঁদার মতো অবস্থাই হয়নি। আজ অহি ওর বুক উজাড় করে দিয়েছে। প্রদীপ্ত বিমূঢ় হয়ে গেছে। ও কখনো মৃত্যু দেখেনি। বিস্ফারিত চোখে শুধু অহিকেই দেখে। নিথর হয়ে গেছে অহি। ওর শরীরটা তখনো গরম। ও বুঝতে পারে কান্না কী! ছোটোবেলা থেকে কখনো ওকে এমন করে কাঁদতে হয়নি। ওদের কাঁদার রেশ কমে আসার আগেই বুটের লাথিতে ছিটকে পড়ে ওরা। দেখে দু'জন পুলিশ অহির লাশটা ট্রাকে উঠিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রদীপ্ত দেখতে পায় না মফিজুলকে। গুলি মফিজুলের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ও। বুটের লাথি খেয়ে উল্টে পড়ে যাওয়া প্রদীপ্তকে হাত ধরে টেনে ওঠায় মণ্টু। প্রদীপ্তর মাথা ঘুরছে। আশেপাশে কোনোকিছু দেখার মতো অবস্থা ওর নেই। ততক্ষণে আর একটি পুলিশ ভ্যান এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় মফিজুলের লাশ। ও রেখে যায় রাস্তার ওপর জমাট রক্ত। পুলিশের গাড়ি দেখে মণ্টু ভয় পেয়ে প্রদীপ্তকে টেনে গাছের আড়ালে চলে যায়। ও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, মণ্টু পানি? মণ্টু চারদিকে তাকায়, কোথায় পানি? অবসন্ন কণ্ঠে বলে, যুদ্ধ থামুক। তারপর পানি দেবো।

পরিষদ ভবনে তখন তুমুল বিতর্ক চলে। গতকাল বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। বাইরের পরিস্থিতি থমথমে। সবাই জানে কি ঘটছে। কিন্তু সরকার পক্ষের সদস্যরা নীরব, কিছুটা উদ্বিগ্ন। অন্তত বিবেকের কাছে সত্যকে চাপা দিতে পারছে না। উপরন্তু মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের মাইক থেকে ভেসে আসছে প্রতিবাদের গর্জন। শীতের বিকেল হলেও কারো কারো কপালে ঘামের বিন্দু। এদিকে ওদিকে তাকায়। হয়তো ফ্যানটা ছাড়লে ভালো হতো, কিন্তু ইতস্তত করে। ফ্যান ছাড়তেও ভয়। পাছে ভেঙে যায় বিরাট কিছু। বুকে ধুক্‌পুকানি নিয়ে বসে থাকে সবাই। বিপন্ন সদস্যরা চমকে ওঠে মওলানা তর্কবাগীশের কণ্ঠে। রাগে, উত্তেজনায় বদলে গেছে মানুষটা। হাত নেড়ে তীব্র ভাষায় কথা বলছে। পরিষদ কক্ষের চার দেয়ালে আটকে থাকে না সে কণ্ঠ। সবাই উপলব্ধি করে মওলানা এখন তারুণ্যের কাঠিন্যে নির্মম। বলেছেন : 'জনাব স্পিকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশাভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে ইনকুয়ারি, তারপর হাউস চলবে।'

মওলানার প্রতিবাদে মৃদু গুঞ্জন ওঠে কক্ষে। সরকার পক্ষের সদস্যদের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ। একে অন্যের দিকে তাকায়। কেউ কেউ প্রতিবাদ করার ইচ্ছে পোষণ করে। কিন্তু মুহূর্তে তেমন সরব হয়ে উঠতে ইতস্তত করে। বাইরে কি হচ্ছে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকলেও ছাত্রদের ওপর গুলির খবর ওদের কাছে পৌঁছে গেছে। মওলানার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার কণ্ঠেও আক্রোশ। পরিষদ কক্ষের ভেতর পুতুলের মতো বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার কণ্ঠে ঘৃণা উপচে উঠে। স্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে আসে শব্দরাজি : 'জনাব স্পিকার, স্যার, দেশে এক গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনসভা, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, ছাত্ররা এই আদেশ অমান্য করেনি। তারা ১৪৪

BanglaBook.org

ধারা ভঙ্গ না-করে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিলো এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়েছিলো। স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, দুঃখজনক, এবং লজ্জাজনক ব্যাপার হলো এই যে, এই অবস্থায় পুলিশ ছাত্রদের ওপর হামলাই চালায়নি, ছাত্রদের হত্যাও করেছে। এই ধরনের গুরুতর পরিস্থিতিতে পরিষদের স্বাভাবিক কাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

ধীরেন দত্তের আবেগজড়িত কণ্ঠ অনেকের হৃদয় স্পর্শ করে। তার চেহারার বয়স্ক বলিরেখায় দৃঢ় প্রত্যয় থির হয়ে থাকে। স্পিকার নির্বিকার কণ্ঠে বলে, বলুন আমার কি করার আছে? লাফিয়ে দাঁড়ান মনোরঞ্জন ধর। দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই। আমরা তাঁকে এখানে এসে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বলছি।

কক্ষে পিনপতন নিস্তব্ধতা। মনোরঞ্জন ধর কেশে গলা পরিষ্কার করে নেন। বলতে থাকেন, আমি এবং গোবিন্দ ব্যানার্জি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় দুইশত ছাত্রকে আহত অবস্থায় দেখেছি। একটি মৃতদেহ দেখেছি, যার মাথার খুলি উড়ে গেছে, মগজ চুইয়ে পড়ছে। ড. জুবেরি এবং উপাচার্য ড. এস. এম. হোসেন কাঁদানে গ্যাসে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে আমরা শুনেছি। এই শোকাবহ পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে পরিষদের অধিবেশন চালাতে পারি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন কি না তা কি আমি জানতে পারি? এ মারাত্মক অবস্থার কেন সৃষ্টি হলো? সরকার কি ছাত্রদের মৃতদেহের উপর প্রশাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চান? তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করেছে। এই দাবি কি অপরাধ?

কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সাদা দেয়ালে। ঘরে গুঞ্জন উচ্চকিত হয়। স্পিকারের অসহিষ্ণু কণ্ঠ : অর্ডার, অর্ডার, আমি আশা করি আপনি পরিষদের বিধিমালা অনুসরণ করবেন।

মনোরঞ্জন ধর তীব্রকণ্ঠে বলেন, আমি আপনাকে সকল বিধি প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি পরিষদের নেতাকে, যিনি একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে অনুরোধ করছি।

আবেগে গমগম করে মনোরঞ্জন ধরের কণ্ঠ। পরিষ্কার ভাষায় বলেন, যেসব কর্মকর্তার নির্দেশে আমাদের ছাত্রদের কুকুর-বেড়ালের মতো হত্যা করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠান এবং তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

আবার উঠে দাঁড়ান তর্কবাগীশ। গায়ে পশমি চাদর। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। সৌম্য শান্ত চেহারায় আজ প্রচণ্ড বিদ্রোহী আদল। হাত মুঠি পাকিয়ে বলেন, পরিষদের নেতা আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি না দিলে আমরা পরিষদের অধিবেশন চলতে দেবো না। সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই।

স্পিকার কিছুটা বিব্রতকণ্ঠে বলেন, আমি আশা করি, পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিকভাবে পরিষদের কাজ চালাবেন। সদস্যরা যদি পরিষদের নেতার কথা শোনেন তাহলে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করবো।

তর্কবাগীশ একই ভঙ্গিতে আবার দাঁড়িয়ে যান, আপনার অর্ডার বুঝি না, আপনার অর্ডার মানবো না। পরিষদের নেতা প্রথমে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন, তারপর পরিষদ চলবে। স্পিকার চেঁচিয়ে ওঠেন, অর্ডার, অর্ডার, পরিষদকে অমান্য করার অধিকার আপনার নেই, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

তর্কবাগীশ নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। পরিষদের অন্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেবলই মনে হয়, এরা কারা? কাদের সঙ্গে আমরা জনগণের স্বার্থ নিয়ে বসেছি? যারা নিজের আখের গোছানো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না? মওলানার মাথায়

BanglaBook.org

খুন চেপে যায়। ইচ্ছে করে সবকিছু তছনছ করে ফেলতে। অনমনীয় কণ্ঠে বলেন, পরিষদের নেতা আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন, তারপর পরিষদের কাজ চলবে।

স্পিকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, অর্ডার, অর্ডার, আপনি কি কাউকে কথা বলতে দেবেন না? আপনি পরিষদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন।

তর্কবাগীশ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। একই সুরে বলেন, পরিষদের নেতা গিয়ে তদন্ত করে আসুন, তারপর পরিষদ বসবে, তার পূর্বে নয়।

স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার, জনাব তর্কবাগীশ আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি যদি পরিষদকে অমান্য করেন তা হলে পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের কার্যবিধির ১৬ (২) বিধির আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো।

তর্কবাগীশ উপেক্ষার হাসি হাসেন, যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমাদের দাবি, পরিষদের নেতা গিয়ে দেখে এসে আগে বলুন পরিস্থিতি কী।

স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার, অনুগ্রহপূর্বক আসন গ্রহণ করুন। অন্যদের কথা বলায় বাধা সৃষ্টি না করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ততক্ষণে হৈ-চৈ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরিষদের নেতা নূরুল আমিন পরিষদে উপস্থিত ছিলেন না। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তিনি পরিষদে আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে গোলমাল কিছুটা কমে আসে। তিনি বলেন, মিস্টার স্পিকার, স্যার মি মনোরঞ্জন ধর যা বলেছেন তা আমি শুনেছি, আমার মনে হয় ঘটনাকে তিনি অতিরঞ্জন করে বর্ণনা করেছেন।

মনোরঞ্জন ধর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, আমি একবিন্দুও বাড়িয়ে বলিনি। তাঁর মিথ্যা বলা উচিত নয়। জাতির সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা করা তাঁর উচিত নয়।

তাঁর কথায় বাধা পড়ে প্রবল চিৎকারে। বিপক্ষে তুমুল আপত্তি ওঠে। পক্ষের লোকেরাও ছাড়ে না। শুরু হয় গোলমাল। নূরুল আমিন পরিস্থিতি শান্ত করে বলেন, তিনি চারজন ছাত্রের মৃত্যুর কথা বলেছেন। এই বিবরণই তিনি দিয়েছেন।

মনোরঞ্জন ধর একই ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকেন, হ্যাঁ, আমি কয়েকটি মৃতদেহ দেখেছি, আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি এবং এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যাবার আহ্বান জানাচ্ছি। জনসাধারণের জীবন নিয়ে খেলা করা তাঁর উচিত নয়।

মনোরঞ্জন ধরের কঠোর ভাষায় রেগে যান নূরুল আমিন। বলেন, এটা জনগণের জীবন নিয়ে খেলা নয়। কিভাবে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষদ অবহিত আছেন। ঢাকার জেলা প্রশাসক গত সন্ধ্যায় যে ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন তা ন্যায়সঙ্গত কি না সেটি একটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো নির্দেশ জারি হলে দেশের নাগরিককে তা মানতে হবে। তা না-করে এক শ্রেণীর জনগণ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে এবং অমান্য করলে আইন-শৃঙ্খলা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আমি যতদূর জানি সকাল দশটা থেকে অ-ছাত্র যুবকদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে ছাত্ররা পুলিশ কর্ডন ভেঙে শহরে মিছিল বের করার চেষ্টা করে। ছাত্ররা যাতে মিছিল করে রাস্তায় আসতে না পারে এবং জনগণের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না-করে সেজন্য পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাহারা দিচ্ছিলো। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেনি।

নূরুল আমিনকে বাধা দিয়ে গোবিন্দলাল ব্যানার্জি বলেন, পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলো।

নূরুল আমিন বলতে থাকেন, আমি যতদূর জানি রাস্তা দিয়ে যারা যাতায়াত করছিলো ছাত্ররা তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। তাদের গাড়ি ভেঙে দেয়।

BanglaBook.org

মনোরঞ্জন ধর বাধা দিয়ে বলেন, পুলিশ ছাত্রদের হোস্টেলের একটি অংশে আক্রমণ চালায়। নূরুল আমিন এই কথার উত্তর দেন না। নিজের মতো বলে যান, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে পথচারীদের গাড়ি থামানোর জন্য রাস্তায় বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ও সম্মানিত ব্যক্তি আহত হন। কয়েকজন পুলিশও আহত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আহত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

পেছন থেকে কে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বুলেট সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা আমি জানি না। আমার যতদূর মনে হয় শুধু লাঠিচার্জ করা হয়েছে। বুলেট সম্পর্কে আমি তদন্ত চালাচ্ছি। শীঘ্রই পরিষদকে জানাবো। তবে এটা ঠিক ১৪৪ ধারা জারি অবস্থায় আইন ভাঙার অধিকার কারোই নেই। কেউ যদি নিজের কার্যকলাপ নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তবে তাকে বাধা দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এটা ভাষার কোনো প্রশ্ন নয়, এটা আইন লঙ্ঘন করার প্রশ্ন। আগে তারা যে সব মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে করেছিলো পুলিশ তাতে বাধা দেয়নি।

গোবিন্দ ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করেন, কোন জায়গায় কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়েছিলো? রাস্তায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে?

নূরুল আমিন বলেন, ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এলে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। আমার জানামতে ছেলেরা পুলিশকে ঘিরে ফেলে এবং ইটপাটকেল ছোঁড়ে। ফলে পুলিশের জন্য আত্মরক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর পরে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করবো এবং পরিষদকে জানাবো।

দু-একজন বলে উঠেন, এখনই তা করুন।

নূরুল আমিন ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেন, এই মুহূর্তে আমি তা পারবো না।

বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, স্যার, এই পরিস্থিতিতে কেউই নিশ্চিত থাকতে পারে না। পরিষদের সম্মানিত নেতা বলেছেন যে, জেলা প্রশাসক ১৪৪ ধারা জারি করেছেন এবং তা অমান্য করার চেষ্টা হয়েছে। সমস্ত বিষয়গুলো স্বীকার করে নিয়েই প্রশ্ন করা যায় যে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থ কি না? পরিষদের নেতা পুলিশ কর্মকর্তাদের আহত হবার কথা বলেছেন। পরিষদে আসার সময় কয়েকজন ছাত্র আমাদেরকে আহত ব্যক্তিদের দেখাতে নিয়ে যায়। আমার বন্ধু মনোরঞ্জন ধর বলেছেন, তিনি কয়েকটি মৃতদেহ দেখেছেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য আমি সবাইকে দেখতে যেতে পারিনি। শুধু হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আহত ছ'জন ছাত্রকে দেখেছি। পরিষদের সম্মানিত নেতা বলেছেন, তিনি একটি তদন্ত অনুষ্ঠানে সম্মত আছেন। কিন্তু স্যার, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে সব ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে তাদেরকে দেখে আসার জন্য আমি পরিষদের সম্মানিত নেতাকে বিনীত অনুরোধ জানাই। আমরা তাঁর সঙ্গে যাবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, 'স্যার, তিনি কি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছেন?'

নূরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, ঘটনার পটভূমি না জেনে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আসল ঘটনা না জেনে হাসপাতালে গিয়ে লাভ কী? প্রথমে আমাদের জানতে হবে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কি না, ঘটে থাকলে তা কিভাবে ঘটেছে, কে এর জন্য দায়ী, কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে

BanglaBook.org

কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে আমি অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এজন্যই আমি বলছি যে প্রথমে তদন্ত অনুষ্ঠান করবো এবং পরে সিদ্ধান্তে আসবো। বসন্তকুমার দাস আবার বলেন, সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এ আচরণ কাম্য নয়। আমরা জানি না হাসপাতালে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের দেখে আসায় ক্ষতি কী? তিনি নিজে ছাত্রদের অবস্থা দেখে তদন্ত অনুষ্ঠান করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের আচরণ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে যাবে।

স্পিকার আর কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, অর্ডার, অর্ডার, আমার মনে হয় এ রকম পরিস্থিতিতে পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েকজন সদস্য বাইরের দুঃখজনক ঘটনায় উদ্বিগ্ন। কিন্তু এটাও সত্য পরিষদের কার্যবিধি অনুসারে আমাকে পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য আমি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করছি। আমি আশা করি পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ব্যাপারে সমঝোতায় পৌছুবেন।

পরিষদের কাজ পনের মিনিট স্থগিত থাকে।

অধিবেশন আবার বসলে নূরুল আমিন বলতে শুরু করেন। এতবড় ঘটনার পরও তাঁর কণ্ঠে কোনো আবেগ প্রশ্রয় পায় না। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতি বিষয়ক কোনো ভাবালুতা তাঁর নেই। তিনি নিজের অবস্থানে কঠোর এবং নির্মম। বলেন, স্যার, পরিষদের কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছে। কিভাবে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে আমি একটি প্রতিবেদন পেয়েছি, আমাদের সে বিষয়টি–

বাক্যটি শেষ করার আগেই বাধা দেন আলী আহমদ খান। তিনি বলেন, স্যার, পুলিশের গুলি চালনার ফলে যে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কী কোনো তথ্য পেয়েছেন? তিনি শুধু কয়েকজন ছাত্র আহত হবার খবর পেয়েছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণের ভেতর কয়েকজন ছাত্র গুলিতে নিহত হয়েছে।

স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দিন।

নূরুল আমিন কালো শেরওয়ানি পরে আছেন। ভুরু কুঁচকে আছে। স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পায়। যেন বলতে চান এইসব আবর্জনা দূরীভূত হোক। কিন্তু বলতে পারেন না। নিজেকে সংযত রাখতে হয়। প্রথমে মুখে হাতের তালু চাপা দিয়ে হাই তোলেন, তারপর বলতে শুরু করেন। একই কথা বার বার বলা তাঁর নিজেরও আর ভালো লাগছে না।

স্যার, পরিষদের কয়েকজন সম্মানিত সদস্য চান যে আমি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখে আসি। আমার মনে হয় আহতদের দেখে এলে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমি আগেই বলেছি ঘটনার তদন্তের জন্যে আমি একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করবো। তদন্তে যদি কোনো পুলিশ অথবা সরকারি কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হয় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা আহত হয়েছে তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। আমি সত্যিই মর্মাহত। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমি কোনো খবর পাই নি। আমি আশা করি পরিস্থিতি এখন শান্ত হবে। সব সময় আমরা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হতে পারবো না। নিরপেক্ষভাবে সবকিছুর মূল্যায়ন করতে হবে। আমি আশা করি তদন্ত অনুষ্ঠান এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তায় পরিষদ সন্তুষ্ট হবেন।

কিন্তু নূরুল আমিনের এই ধরনের হট্‌কারি বক্তব্যে আগুন আরো তীব্র হয়। কৌশলে বক্তৃতার ভাষা ব্যবহার করা যায় কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করা যায় না। ছাত্রদের নিহত

BanglaBook.org

হবার কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যান। ধৈর্য রাখা আর সম্ভব হয় না মওলানা খোন্দকার আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা, ছয়জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাবো এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মাধ্যমে সকল সদস্যের কাছে পরিষদ কক্ষ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

বেরিয়ে যান তর্কবাগীশ। কোনোদিকে তাকান না। পেছনে গুঞ্জন। তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো কক্ষের চার দেয়ালে ধ্বনিত হয়। উসখুস করে অনেকে। অপেক্ষা করে কি হয় দেখার জন্য। তখন আসরের নামাজের জন্য আবার পনের মিনিটের বিরতি হয়।

অধিবেশন আবার শুরু হলে শামসসুদ্দিন আহমদ অসম্ভব আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন, জনাব স্পিকার, স্যার, আমি এইমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বিবৃতি শুনেছি। স্যার, পরিষদে আসার আগে আমি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এবং কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকি। দুইজন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশজন ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি ব্রিটিশ রাজত্বের রুদ্র-মূর্তি দেখেছি, কিন্তু কলকাতা বা অন্য কোথাও শুনিনি যে, পুলিশ হোস্টেল বা কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের হত্যা করতে পারে। স্যার, এতকিছু ঘটার পর আমরা পাখার নিচে বসে শুধু আলোচনা করতে পারি না, যেখানে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। আমি দেখেছি যে, বুলেটের আঘাতে একটি ছাত্রের মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, গতরাতে আমরা একদিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারির কথা শুনেছি। কিন্তু আজ দশটায় আবার শুনলাম যে এক মাসের জন্যে জারি করা হয়েছে। এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমি জানি না এমন কী ঘটনা ঘটলো যার জন্য সময় একমাস বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলো। ১৪৪ ধারা জারির কারণে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। আমি জীবনে অনেক নৃশংসতা দেখেছি, কুড়িবার আমার ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, আমি নিজে অনেকবার ১৪৪ ধারা অমান্য করেছি। কিন্তু আজকের ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। পরিষদে আসার সময়ে কলেজ প্রাঙ্গণের সামনে এক বিরাট জনতা দেখতে পাই। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? কয়েকজন ছাত্র এগিয়ে এসে বললো, স্যার ওদিকে যাবেন না। গুলি হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় হয়েছে? ওরা বললো, হোস্টেলের ভেতরে। আমি ভেতরে গেলাম। আমার বন্ধু মনিরুদ্দীন আহমদ সেখানে ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সে দৃশ্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার আহ্বান জানাচ্ছি। স্যার, বাঙালি এবং অবাঙালি সবাই বলছেন, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। উর্দুভাষী একজন বলেছেন, বাংলাও রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী।

একটি স্বাধীন দেশের জনসাধারণের অবশ্যই কথা বলার অধিকার আছে। স্যার, ব্রিটিশ আমলেও আমরা এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারিনি। সুতরাং আমি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। মন্ত্রীগণ যদি পরিষদের অধিবেশন অব্যাহত রাখার জন্য জোর করেন, তবে আমরা বিতর্কে অংশগ্রহণ করবো না।

তাঁর ভাষণ পরিষদ সদস্যদের হৃদয় স্পর্শ করে। সরকার পক্ষের অনেকেই কিছুটা বিব্রত, কিছুটা বিচলিত। কিন্তু প্রতিবাদ জানায় না। নীরব শ্রোতা হয়ে থাকে।

বসন্তকুমার দাস বলেন, স্যার, পরিষদের নেতা তদন্ত অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই তিনি তা বলেছেন। কিন্তু স্যার, সকল

BanglaBook.org

সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আপনাকে আজকের অধিবেশন মুলতবি রাখার অনুরোধ করছি।

অধিবেশন মুলতবি রাখার আবেদন নূরুল আমিন উপেক্ষা করেন। তিনি কিছুটা তিক্তকণ্ঠে এবং উষ্মার সঙ্গে বলেন, স্যার, যারা আহত হয়েছে আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছি। কিন্তু সম্মানিত বিরোধী দলের নেতা এবং জনাব শামসুদ্দিনের অনুরোধ অনুযায়ী অধিবেশন মুলতবি রাখলে একটি নজির সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার জন্য নজির সৃষ্টি না করতে আমি তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রশাসন পরিচালনাকালে দেশে অনেক ঘটনা ঘটতে পারে, তাঁর জন্য আমরা যদি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখি তা হলে নিজেদেরকে একটি জটিল অবস্থায় জড়িয়ে ফেলবো। আমি সম্মানিত সদস্যদের পরিষদের কাজ চালিয়ে যাবার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছি। মূল কাজের ক্ষতি হচ্ছে, এজেন্ডার কোনো বিষয় আমরা আলোচনা করিনি।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে উঠে জানতে চাইলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে জানলেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? বসন্তকুমার দাস বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথা শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তবে, স্যার, এটি একটি বিশেষ বিষয়। সুতরাং আমার মতে অধিবেশন মুলতবি থাকা উচিত।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে তিনি আবার বললেন, যেহেতু পরিষদের মাননীয় নেতার সঙ্গে কোনো সমঝোতা হয়নি, সেহেতু আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা পরিষদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে পারবো না। আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করছি।

বিরোধী দলের সদস্যরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। জেগে থাকে জুতোর শব্দ। ফাগুনের দিন প্রায় ফুরিয়ে আসে। যারা চুপচাপ বসে আছে তারা উদ্বিগ্ন। এক ধরনের মন্থরতায় ঘরের বাতাস ভারী।

উঠে দাঁড়ান গোপালগঞ্জের পরিষদ সদস্য শামসুদ্দিন আহমদ খোন্দকার। বলেন, স্যার, অবিভক্ত বঙ্গের আইন পরিষদের আপনিও একজন সদস্য ছিলেন। আপনি জানেন যে বিভিন্ন কারণে অবিভক্ত বঙ্গের পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখা হয়েছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে নূরুল আমিন প্রতিবাদ করেন, কলকাতায় দাঙ্গার সময়ও পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

আলহাজ্ব শরফুদ্দিন আহমদ বলেন, আমি পরিষদের নেতার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমার মনে হয় সদস্যগণ একমত হলে পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখলে কোনো ক্ষতি হবে না। উঠে দাঁড়ান যশোর থেকে নির্বাচিত সদস্য ভোলানাথ বিশ্বাস। তিনি বলেন, আমি ঘটনা নিজে দেখেছি। আহত ব্যক্তিদের সেবা করেছি। এখন পরিষদের বিতর্কে অংশ নেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

স্পিকার তখন কৈফিয়ত দেন, পরিষদের উভয় দলের সদস্যের মধ্যে সমঝোতা হলে আমি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখতে পারতাম। কিন্তু সমঝোতার অভাবে আমি কিভাবে সরাসরি কাজ বন্ধ রাখতে পারি? পরিষদের নেতা অধিবেশন চালাতে চাইলে আমি তা বন্ধ করতে পারি না।

শামসুদ্দিন আহমদ খোন্দকার বলেন, স্যার, আপনি পরিষদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আমার মতে আগামীকাল পর্যন্ত

BanglaBook.org

পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখা উচিত।

স্পিকার বললেন, আমি একা সব দায়িত্ব নিতে পারি না।

মসিহুদ্দিন আহমদ বললেন, স্যার, প্রশ্নোত্তর শেষ হবার পর অধিবেশন মুলতবি রাখা যায়। নূরুল আমিন বললেন, এটা একটি ভিন্ন বিষয়।

মসিহুদ্দিন আহমদ জোর দিয়ে বলেন, স্যার, আমি মাননীয় স্পিকারকে পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রাখার আবেদন জানাচ্ছি।

নূরুল আমিন সহজে নতি স্বীকার করতে রাজি নন। তিনি তাঁর মনোভাবে অটল থাকেন। বলেন, কিছু কাজ পরিচালনার পর পরিষদ মুলতবি রাখা যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব শাখার মন্ত্রী আবদুল আলী সিলেট টেনেন্সি (সংশোধনী) বিল পেশ করলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্পিকার পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি রাখলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের একটি ছোটোখাটো রণক্ষেত্র পেরিয়ে সদস্যরা যে যার ঘরে ফিরলেন। নূরুল আমিন দেখলেন, দেখতে চাইলেন না। বিরূপ বিবমিষা তার গলার কাছে আটকে থাকে। মানুষের ভাবালুতা এবং বাজে সেন্টিমেন্ট তাকে অসুস্থ করে। মরিসঁ মাইনরের ভেতর তার সুদর্শন চেহারা শক্ত হয়ে থাকে। এই জাতির কিছুই হবে না, এমন একটা সিদ্ধান্তে আসার পর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় এবং তিনি সিগারেট জ্বালান। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি উড়িয়ে দেন আজকের ঘটনা। ভাবেন, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে বড় কাজ হয় না। তাঁর সামনে কত অসংখ্য কাজ। নিজস্ব ভুবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তার মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তারও কিছুক্ষণের মধ্যে রাত আটটার পর হাসপাতালে মারা গেলো বরকত।

পরদিন নয়, ২৩ তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় বেরুলো একটি সংবাদ।

'বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব যে ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয়। একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শুনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পরে জানা যায় যে, বালকটি মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদের মধ্যে ফুলার রোডে গুলিতে নিহত হয় এবং তাহার লাশ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়।'

খবরের কাগজে খবরটা পড়ে গুম হয়ে থাকে আলী আহমদ। এমনিতেই দু'দিন ধরে তার জ্বর। একুশ তারিখের ঘটনায় টিয়ার গ্যাস এবং লাঠিচার্জে আহত হয়েছে। পায়ে এবং পিঠে আঘাত পেয়েছে। হাঁটতে কষ্ট হয়। মফিজুল তার কাছাকাছি ছিলো, পরে ভিড়ে কোথায় ছিটকে চলে যায় টের করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত মফিজুলের কোনো খবর নেই। আলী আহমদ নতুন করে কিছু ভাবতে পারে না। কাগজে খবরটা পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রদীপ্ত, বাবা এ যে আমাদের অহি, অহিউল্লাহ্।

চুপ, আস্তে। শুনতে পাবে।

রান্নাঘরে বসে অহির মা গুনগুনিয়ে কাঁদছে। বারবার বলছে, আমার অহির একটা খবর এনে দেন ভাইসাব।

আলী আহমদ কথা বলে না।

ও দীপু তুমি না বললে অহি তোমার সঙ্গে ছিলো?

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে।

ওরে আমার অহিরে।

কান্নার সুর ওঠে অহির মায়ের কণ্ঠে। বাড়িতে শোকের ছায়া। অহি নেই এই কথাটা এখন পর্যন্ত অহির মা'কে বলছে না কেউ। বলে কি হবে? লাশ কোথায়? লাশের খবর তো ওরা জানে না।

১৩

মর্গে অহির বিকৃত চেহারাটা প্রথমে চিনতেই পারেনি বুলু দাস। চেনা লাগছে? কে এ? বুলু দাসের শরীর কাঁপে থরথর করে। হ্যাঁ অহি-ই তো? একদম অহি। কোনো ভুল নেই। বুলু ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারপর ওর পায়ের পাতায় হাত রাখে। চেপে বসে যায় হাত। গন্ধ আসছে তীব্র। কোনোকিছুই বোধে নেই ওর। বুলু স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে হেড জমাদার চিৎকার করে কি যেন বলছে, বুলুর কানে তা ঢোকে না। ও উবু হয়ে অহির মুখের ওপর ঝুঁকে থাকে। ইচ্ছে হয় বুকে জড়িয়ে ধরতে। প্রচণ্ড ব্যাকুলতায় বুলু দাসের কান্না থেমে যায়। হঠাৎ ওর মনে হয় অহির নিঃশ্বাস বইছে, বুকের পাঁজর ওঠানামা করছে। বুলু দাস হাঁটুতে মুখ গোঁজে। ওর সামনে মর্গের ছোটো ঘরটা দিগন্ত-সমান হয়ে যায়।

বুলুদা আমি অহি?

বুলুর ঠোঁট কাঁপে। অহিকে বুকে তুলে নেয়।

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো বুলুদা?

মায়ের কাছে। ঘরে। একটি ঘর নয়। একজন মা নয়। অনেক মা।

আমার মা কেমন আছে বুলুদা?

তোর আর এখন কোনো মা নেই। তুই এখন সব মায়ের ছেলে।

বুলু দাসের চোখে জল নেই। ও বুক ভরে শ্বাস টানতেই অনুভব করে অহির শরীর থেকে তীব্র জুঁই ফুলের গন্ধ আসছে। সেই গন্ধে ছুটে আসছে হাজার হাজার মানুষ। মুহূর্তে অহির শরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে হাতে কোথায় চলে যায় বুলু দাস হদিস করতে পারে না। ও বিমূঢ় হয়ে থাকে। এত লোক অহিকে ভালোবাসে? এত ভালোবাসা অহির জন্য? গর্বে-অহংকারে বুলুর বুক ভরে যায়। ওর কেবলই মনে হয় অহি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে গেছে। অহি মরেনি। অহির লাশ নিয়ে ও যখন বেরিয়ে আসে হেড জমাদার চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। বুলু দাস কোনো দিকে তাকায় না। সোজা চলে যায় ভ্যানের দিকে।

তখন দৈনিক মিল্লাতে সম্পাদকীয় লেখা হয় 'ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুসলমানের লাশ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশ জুলুমের ফলে শাহাদাত প্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের ফেরত দেওয়া হয় নাই। শরিয়ত মোতাবেক তাহাদের শেষকৃত্য যদি সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবনের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।'

বাইরে উত্তাল মিছিল। প্রতিবাদ, প্রতিরোধে ক্ষিপ্ত মানুষ। পুরো শহর মারমুখি।

BanglaBook.org

আন্দোলনের তীব্রতার ফলে শহরের নিয়ন্ত্রণ সামরিক বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যখন বুলু দাস অহিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গায়েবানা জানাজা। সকাল দশটা। মোনাজাত করছেন ইমাম সাহেব, 'হে আল্লাহ আমাদের অতি প্রিয় শহীদদের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়, আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায়, তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।'

বুলু দাসের বুক কাঁপে। ও বুঝতে পারে অহির এই পচে যাওয়া দেহটা এখন মূল্যহীন। যে মোনাজাত হচ্ছে তা এখন দেশের সব মানুষের। ও কি করবে? ওর কিছু করার নেই। মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। কালো পতাকার সঙ্গে সঙ্গে ওড়ে শহীদের রক্তমাখা জামা। হাইকোর্টের সামনে শোভাযাত্রার ওপর প্রথমে হয় লাঠিচার্জ এবং পরে গুলি। ভ্যানের ভেতর কেঁপে ওঠে অহি।

বুলুদা, আবার গুলি?

গুলি?

রক্তের স্বাদ কি ওদের মেটেনি বুলুদা?

বুলু নির্বিকার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভ্যান ছুটে যায়। পাশে দু'জন পুলিশ। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অহিকে? কোথায় ফেলে দেবে এই পচা লাশ? ওদের কাছে অহি লাশ ছাড়া আর কি? আর সব পচা লাশের সৎকারই তো করতে হয় বুলু দাসকে।

বুলুদা, আবার শহীদ হলেন একজন। জ্বলে যাচ্ছে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিস। আহত হয়ে কাৎরাচ্ছে অসংখ্যজন।

অহি, চুপ কর।

আমি মরেই কথা হয়ে গেছি বুলুদা। কেউই আর আমাকে চুপ করাতে পারবে না।

কেঁপে ওঠে বুলু। থরথর করে কাঁপে ওর হাঁটু। পুলিশ দু'জন ওর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে পাছে বুলু এই লাশ নিয়ে পালিয়ে যায়। একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে?

কিছু না।

বুলু নির্বিকার তাকিয়ে থাকে বাইরে।

লাশ নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করো না।

তার দরকার হবে না।

মানে?

এই পচা লাশ দিয়ে আমি কি করবো?

একজন বিদ্রূপ করলো, ও কি এখন শুধু লাশ আছে। ও তো মরে ভূত হয়ে মানুষেব ঘাড়ে চেপেছে। আমাদের জ্বালিয়ে খাবে।

বুলু ওদের কথার জবাব দেয় না। ওরা যখন অহিকে মাটি চাপা দেয়, তখন পরিষদে আবার তুমুল তর্ক।

পূর্ববাংলা বিধান পরিষদের বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিনের সভা বসে। বিকেল ৪টা ৫ মিনিট। ২২ ফেব্রুয়ারির বিকেলে নতুন কিছু নেই। তেমন শান্ত শহরের বাতাস, শান্ত কাকের স্বর, শুধু মানুষগুলো বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে আসা পাথরের মানুষ। শোকার্ত এবং উদ্দীপিত। পরিষদ কক্ষও এর বাইরে নয়।

BanglaBook.org

স্পিকার আবদুল করিম আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা পৌরসভার প্রতিনিধি খাজা নসরুল্লা বললেন, স্যার, আমি পরিষদের অধিবেশন আধঘণ্টার জন্য মুলতবি রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিরোধী দলের ডেপুটি লিডারের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। তিনি রাজি আছেন। আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

অধিবেশন ৪টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত মুলতবি থাকে।

আবার যখন শুরু হলো উঠে দাঁড়ালেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তাঁর মুলতবি প্রস্তাবটি উপস্থাপন করবেন। শুরু হলো প্রচণ্ড গোলমাল। সবাই কথা বলতে চাইছেন। কেউ কারো কথা শুনতে রাজি নন। তর্কবাগীশ কথা বলুন এতেও অনেকের আপত্তি।

স্পিকার জানালেন, জনাব খয়রাত হোসেন এবং জনাব তর্কবাগীশের নামে মুলতবি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

খয়রাত হোসেন বলেন : আমি একটি শোক প্রস্তাবও পেশ করেছি।

স্পিকার : কোন বিধির আওতায়?

খয়রাত হোসেন ঠাণ্ডা মাথায় ধীরস্থিরভাবে বলেন, স্যার কালকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা বিশেষ প্রস্তাব বা যে কোনো ভাবে নিতে পারেন। আমি পরিষদের কার্যবিধি বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করছি না। গতকালকের ঘটনায় সবাই মর্মাহত। আমার মনে হয় সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হবেন।

স্পিকার গলা চড়িয়ে বলেন, আপনাকে অবশ্যই পরিষদের নির্দিষ্ট বিধির আওতায় প্রস্তাব পেশ করতে হবে। ৯৫ বিধির আওতায় একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিধির উপ-বিধি ২-এ সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, এমন প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপন করা যাবে না যা প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত নয়।

খয়রাত হোসেন কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠেন। বলেন, স্যার এটা প্রাদেশিক সরকারেরই ব্যাপার। এই সরকার গুলি করে ছাত্রদের মেরেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মারেনি।

স্পিকার শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আমি দুঃখিত, এ বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয় যে শোক প্রস্তাব প্রাদেশিক সরকারের বিষয়।

খয়রাত হোসেন রেগে গিয়ে বলেন, ইংল্যান্ডের রাজা মরলে আমরা শোক প্রস্তাব পাস করতে পারি, আর দেশের ছেলেরা শহীদ হলে পারি না?

স্পিকার মাথা নাড়েন। বলেন, সেটা বিশেষ প্রস্তাব ছিলো না। এ বিধির আওতায়ও ছিলো না।

খয়রাত হোসেন হাত নেড়ে বলেন, ঠিক আছে, ইংল্যান্ডের রাজা মরলে যে আইনে শোক প্রস্তাব করা হলো সেই আইনে করা হোক।

দুঃখিত, বিধির বাইরে কাজ করে নজির সৃষ্টি করা যেতে পারে না।

না স্যার, এই পরিষদে এ ধরনের শোক প্রস্তাব অনেকবারই পাস হয়েছে। সে সমস্ত যে বিধিতে হয়েছে, আমারটা সে ভাবে হতে পারে।

স্পিকার ঠাণ্ডা গলায় বলেন, সেসব প্রস্তাব পরিষদের নেতা উত্থাপন করেছেন।

খয়রাত হোসেন ছাড়বার পাত্র নন। মরিয়া হয়ে বলেন, তা হলে আমি অনুরোধ করছি যে আপনি এই প্রস্তাব পরিষদের নেতার পক্ষ থেকে উত্থাপন করুন।

স্পিকার বলেন, ঠিক আছে, আপনি আমার ঘরে এসে ব্যাপারটি আলোচনা করতে পারেন।

শোক প্রস্তাব আর উত্থাপন করা হয় না। খয়রাত হোসেন চুপচাপ বসে থাকেন। মেজাজ খারাপ। মওলানা তর্কবাগীশ তাঁর মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, গতকাল

BanglaBook.org

পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন নিহত এবং বেশ কিছু সংখ্যক আহত হয়। এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য আজকের নির্ধারিত কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করার আবেদন জানাচ্ছি।

স্পিকার বলেন, এই প্রস্তাবে কারো কোনো আপত্তি আছে কী?

নূরুল আমিন প্রবলভাবে আপত্তি তোলেন, হ্যাঁ স্যার, আমি এই মুলতবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

স্পিকার : আমি পরিষদের অধিবেশন–

তাঁর কথায় বাধা দেন মনোরঞ্জন ধর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, স্যার, পরিষদ কার্যবিধির সব বিধির আওতায় আপনাকে মওলানা তর্কবাগীশের বিবৃতিটি পড়ে শোনানোর অনুরোধ করছি।

স্পিকার বিবৃতিটি পড়তে শুরু করেন জনসভা এবং মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারার আওতায় একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গতকাল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবি করে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজের কিছু ছাত্র উক্ত নির্দেশ ভঙ্গ না করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দেয়। এর দ্বারা কোনো রকমেই ১৪৪ ধারার আওতায় নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয় নাই। গতকাল কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই পুলিশ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং মেডিক্যাল কলেজ গেটে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে এবং প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই ঘটনার ফলে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টি আলোচনার জন্য মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদন জানানো হয়েছে। আপনারা যারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তাঁরা উঠে দাঁড়ান।

স্পিকারের আহ্বানে অনেকে উঠে দাঁড়ান। দরকার ছিলো পঁয়ত্রিশ জন সদস্যের সমর্থন। কিন্তু সদস্য সংখ্যা কম হওয়াতে মুলতবি প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হলো না। তখন খয়রাত হোসেন দ্বিতীয় মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করার চেষ্টা করেন।

স্পিকার আপত্তি করে বলেন মুলতবি প্রস্তাবের জন্য আমি আপনার কাছ থেকে কোনো কপি পাইনি। জনাব আলী আহমদ খান এবং মওলানা তর্কবাগীশের দুটি প্রস্তাব পেয়েছি। আমি দুঃখিত। আপনি মুলতবি প্রস্তাব পেশ করার কোনো নোটিশ দেননি।

এরপর আলী আহমদ খান উঠে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর ভাষা এবং আবেদন তর্গবাগীশের মতো। স্পিকার বিবৃতিটি পড়ে শোনান। তারপর বলেন, এ প্রস্তাব আলোচনায় আপনাদের কারো কোনো আপত্তি আছে কি না?

নূরুল আমিন আপত্তি করেন, স্যার, এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতিতে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনার অনেক সুযোগ আমরা পাবো।

এবারও প্রয়োজনীয় পয়ঁত্রিশ জন সদস্যের সমর্থন না পাওয়ায় প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয় না।

কংগ্রেস দলের উপনেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে জনস্বার্থ বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সামগ্রিকভাবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

স্যার, আজকের মর্নিং নিউজ পত্রিকায় হিন্দু এম.এল.এ– গণের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'বক্তৃতা' নামক শিরোনামে সংবাদ ছাপা হয়েছে।

স্পিকার বলেন, বিষয়টি আপনি আমাদের বিস্তারিত বলুন।

BanglaBook.org

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলতে শুরু করেন, মর্নিং নিউজে সংবাদ ছাপা হয়েছে যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে ৪৫ মিনিট পরে বেরিয়ে এসেছি। তারপরই উগ্রপন্থীরা উৎসাহিত হয়ে ১০ জনী মিছিল বের করে গ্রেপ্তার বরণ করতে শুরু করে। এইভাবে ১০০ জনের মতো ছাত্র গ্রেপ্তার হয়।

এই বিবরণ অসত্য, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর মাধ্যমে একদল লোকের বিরুদ্ধে অন্যদলকে উস্কানি দেওয়া হবে। আসল ঘটনা হচ্ছে আমি গতকাল মোটেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যাইনি। আমি আড়াইটার দিকে মি. লাহিড়ীর সঙ্গে রিকশায় করে পরিষদ ভবনের দিকে যাচ্ছিলাম। মেডিক্যাল কলেজের কাছে কয়েকজন ছাত্র আমাদের মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। তারা আমাদের কিছু টিয়ারগ্যাসের শেল দেখায় এবং পুলিশের নির্যাতনের কথা বলে। তারা বিষয়টি সরকারের গোচরে আনার জন্য আমাকে বলে। এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে সদস্যদের পদত্যাগের দাবি জানায়। আমরা সেখানে ৫ মিনিটের বেশি ছিলাম না। বিষয়টি সরকারের নজরে আনবো কথা দিলে ওরা খুশি হয়ে চলে যায়। ঘটনাটি এইটুকুই। কিন্তু অন্য দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি উত্থাপন করছি। মর্নিং নিউজ-এর সংবাদে এমন কথাও বলা হয়েছে যে গুলি চালানোর পরপরই মনোরঞ্জন ধর, নেলী সেনগুপ্তা, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি প্রমুখ কয়েকজন হিন্দু এম.এল.এ এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন মুসলিম এম.এল.এ-ও হোস্টেল প্রাঙ্গণের মাইক থেকে ভয়ানক উত্তপ্ত বক্তৃতা করেছেন। বলা হয়েছে, দেশ বিভাগের পর এই প্রথম কংগ্রেস দলের সদস্যরা গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। আমি শুনেছি মি. ধর ও মি. ব্যানার্জিও সেখানে যাননি।

তবে এটা স্পষ্ট যে এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য সকলের মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানো এবং এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করা। আমি জানতে চাই এই প্রতিবেদনের জন্য দায়ী প্রতিবেদক ও সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবছেন?

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পর মনোরঞ্জন ধর উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বলতে শুরু করেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন এটা আমারও কথা, এবং বেশি কিছু বলার নেই। তবে এটা স্পষ্ট যে গত দিনে যা ঘটেছে তাকে বিকৃত করার জন্য জনস্বার্থ বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি কাজ করছে। ঘটনার মোড় অন্য দিকে ফেরানোর জন্য কিংবা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে সবকিছু বানচাল করার জন্য পত্রিকাটি ইচ্ছাকৃতভাবে এই অপকর্ম করেছে। আমি আশা করি, পরিষদের নেতা, যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, ভবিষ্যতের শান্তির কারণে পত্রিকাটির অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্পিকার বলেন, মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মর্নিং নিউজ পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার আর কিছু নেই।

এরপর বিরোধী দলের কোনো মুলতবি প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয় না।

নূরুল আমিন বলেন, আমি ৯৫ বিধির আওতায় একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই।

স্পিকার বলেন, আপনার প্রস্তাবটি কি?

আমি প্রস্তাব করছি যে এই পরিষদ পাকিস্তান গণপরিষদের কাছে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করছে।

আলহাজ্ব শরফুদ্দীন আহমদ বলেন, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। একই সঙ্গে

BanglaBook.org

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমি পরিষদ সদস্য, ছাত্র ও জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি। একশো ফুট দূর থেকে শোনা যায় যে মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, রক্তের বিনিময়ে তারা বাংলা ভাষা চায়। স্বাধীন দেশে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

এরপর খয়রাত হোসেন বলেন, স্যার আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। পরিষদ নেতার প্রস্তাবের সঙ্গে সংশোধনীর আকারে এই বিষয়টি যোগ করা হোক যে তিন দিনের মধ্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

স্পিকার বলেন; আপনার সংশোধনী যথাযথ নয় বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

খয়রাত হোসেন আপত্তি করেন, কেন স্যার, রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে আমার সংশোধনীটা যুক্ত করা অযৌক্তিক নয়।

স্পিকার বলেন, প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে সংশোধনীটা সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই গ্রহণযোগ্য নয়।

খয়রাত হোসেন নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে দৃঢ় গলায় বলেন, আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার সংশোধনী গ্রহণ করবেন।

সংশোধনীটা পরিষদের বিধিমালা পরিপন্থী।

স্পিকারের উত্তরের ভঙ্গি এমন যে আলোচনাটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত।

এরপর আলী আহমদ খান বলেন, আমি এ সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। গতকাল ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে দেশবাসী মর্মাহত। আজকে সরকার পক্ষ থেকে যে বিশেষ প্রস্তাব এসেছে তা প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা মাত্র। বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় সরকার ১৪৪ ধারার আশ্রয় নিয়েছিলো। এখন যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা আগে আনলে এত রক্তপাত হতো না এবং জীবনহানী ঘটতো না। ৪ তারিখে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিল করেছিলো। তারপর এমন কি ঘটলো যার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এতগুলো জীবন নষ্ট করা হলো? ছাত্ররা কলেজ এবং হোস্টেলের সীমানার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সেখানে ঢুকে গুলি করা হয়েছে। এখন সাধু হবার চেষ্টা করছেন। এখন আমি একটি সংশোধনী আনতে চাই যে ১৪৪ ধারা জনসাধারণকে উস্কানি দিচ্ছে সেটা প্রত্যাহার করা হোক।

স্পিকার ঠাণ্ডা মাথায় বলেন, বিষয় অনুযায়ী আপনাদের কথা বলতে হবে। গতকালের ঘটনা সম্পর্কে বলার সুযোগ অন্য সময়ে হবে। এখন গণপরিষদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ জানিয়ে প্রস্তাব এসেছে সেটা নিয়ে বিতর্ক হবে। বিধি মোতাবেক এই প্রস্তাবের সংশোধনী আনতে হবে। আমি আশা করি আপনারা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর এমন কিছু করবেন না।

নূরুল আমিনের প্রস্তাবের উপর কতগুলো সংশোধনী প্রস্তাব এলে স্পিকার সবকটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। নূরুল আমিনের বিশেষ প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হয়।

এরপর স্পিকার বললেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হলো।

সন্ধ্যায় পিচঢালা পথে গড়িয়ে যায় মরিস মাইনর। নূরুল আমিনের ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্তির হাসি। বিড়বিড় করেন, যতই ওরা চেঁচাক, জয় আমারই। যারা কাঁচা আবেগে গড়াগড়ি যায় তারা বেশি দূর এগোতে পারে না। এগুনোর জন্য চাই আবেগহীন ঠাণ্ডা মাথা। হৃদয় দিয়ে কিছু হয় না, যদি সে হৃদয় উপরে উঠতে সহায়তা না করে।

BanglaBook.org

গাড়ির নরম গদীতে মাথা হেলান তিনি। ভালো লাগছে সবকিছু, ভালো লাগছে এই শহরের নিস্তব্ধতা। কোলাহল মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কোলাহলে জীবনের বিস্তার নেই। বিস্তারের জন্য চাই শান্ত নির্জনতা। এই যেমন গাড়িটা চলছে বাধাহীন, নির্ঝঞ্ঝাট। নূরুল আমিন তার নিজস্ব চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। তার মতে জীবনের কল্যাণ নিহিত ধাপে ধাপে উঠে যাওয়ার প্রশান্তিতে। এখন এই প্রশান্তি আমার বুকে, নূরুল আমিন সিগারেট জ্বালান। ধোঁয়া ছেড়ে আয়েশ করেন। গাড়ি চলতেই থাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

পরদিনও শহর নিস্তব্ধ। পূর্ণ হরতাল পালিত হচ্ছে। ফুলবাড়িয়া পশু হাসপাতালের সামনে জনতার ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ মুসলিম লীগ পরিষদ দল থেকে পদত্যাগ করলেন। নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের দাবি করে আজাদ পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়। তখন রাজপথে হাঁটে অহি। অনেকদূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে। ক্লান্তিতে হাই তোলে। পিপাসা পেয়েছে। ও মেডিক্যালের ক্যান্টিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে মণ্টু। ও হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কী ভাবছে? অহি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

মণ্টু?

অহি তুই? তুই কোথা থেকে এলি?

মণ্টু, কেমন আছিস?

অহি ওরা যে আমাকে আর প্রদীপ্তকে লাথ্থি দিয়ে তোর লাশটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো? তা হলে তুই মরিস নি অহি?

মণ্টু আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াবি?

বোস। আমি পানি নিয়ে আসছি।

মণ্টু দৌড়ে পানি নিয়ে আসে। অহি ঢক্‌ঢক্ করে পানি খেয়ে আবার গ্লাস বাড়িয়ে দেয়। মণ্টু আবার পানি আনে। পানি আনতে আনতে হাঁপিয়ে ওঠে মণ্টু।

অহি তোর কি হয়েছে? কত পানি খাবি?

পিপাসা মিটছে না তো?

কেন মিটছে না? তুই কি চাস?

তখন মালেক এসে দাঁড়ায়।

এখানে কি করছিস মণ্টু?

মালেক ভাই অহি? অহি এসেছে?

কোথায় অহি? তুই পাগল হলি?

দেখতে পাচ্ছেন না মালেক ভাই?

অহি মরে তোকে পাগল বানিয়েছে। আল্লাহই জানে তোকে আবার হাসপাতালে পাঠাতে হয় কি না।

মালেক চলে যায়। মণ্টু মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মন খারাপ করিস না মণ্টু। যারা আমাকে ভালোবাসে না তারা আমাকে দেখতে পায় না।

কেন বাসবে না? বাংলায় যারা কথা বলে তারা সবাই তোকে ভালোবাসে।

না রে মণ্টু, না বহু লোক আছে এই ভাষায় কথা বলে, যারা এই ভাষাকে ভালোবাসে না। এবং এই ভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকেও ভালোবাসে না।

BanglaBook.org

থাক অহি বলিস না। আমার শুনতে কষ্ট হয়।

অহি প্রবলভাবে হাসে।

অহি তুই আজ আমার সঙ্গে থাক।

না রে যাই।

কোথায়?

অহি কথা বলে না। মণ্টু আর ওকে খুঁজে পায় না। অহির জন্য কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে সেদিনের বুটের লাথিতে ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত বুলোয়। কেবলই মনে হয় বড় অল্প সময়ের জন্য ওর অহির সঙ্গে মেলামেশা, অথচ কেমন বদলে দিয়ে গেছে ওকে। মণ্টু ইচ্ছে করলেও আর আগের মতো হতে পারে না।

প্রথম যেখানে রক্ত ঝরেছিলো সেখানে রাতারাতি শহীদ মিনার গড়ে তোলে ছাত্ররা। দুদিন পর সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রয়ে যায় বারো নম্বর ব্লকের বেড়ায় লাগানো একটি পোস্টার, 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?' ঐ পোস্টারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে অহি। হাত বুলিয়ে দেয়। মায়ের কথা মনে হয়। যেতে ইচ্ছে করে মায়ের কাছে। বাবার কথা মনে হয়। কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বাবাকে? অহির বুক মোচড়ায় রিনির জন্য। কী অসহায় আর দুঃখী ছিল মেয়েটা। এখন যদি রিনি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়? যদি বলে, ভাইয়া আমি ফিরে এসেছি। মা কোথায় ভাইয়া? আমি মায়ের কাছে যাবো। তখন ও কি বলবে রিনিকে? কেমন করে নিয়ে যাবে মায়ের কাছে? অহির ইচ্ছে করে টান মেরে পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলতে। ও হাত বাড়ায়।

প্রদীপ্ত এসেছিলো ভাঙা শহীদ মিনার দেখতে। মণ্টুর সঙ্গে কথা বলছিলো ও। মণ্টু প্রদীপ্তকে অহির কথা বলে, জানিস প্রদীপ্ত অহি ফিরে এসেছে?

পাগল। অহি তো মরে গেছে।

কিন্তু আমি ওকে দেখতে পাই। তুইও পাবি। হয়তো ও আসবে। তুই থাক আমার কাছে। তখন অহিকে দেখে ও চমকে ওঠে। তারপর দ্রুত কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, অহি ভাই?

প্রদীপ্ত, ভালো আছিস?

হ্যাঁ, তুমি কেমন আছো?

ভালো নেই। এখন এই পোস্টারটা ছিঁড়বো।

মণ্টু অহির হাত চেপে ধরে।

কি করছিস অহি? ওটা ছিঁড়বি না কী?

তাই তো চেয়েছিলাম।

কেন?

সব তো মিথ্যে।

কী মিথ্যে?

ঐ যে লিখেছে বীরের এ রক্তস্রোত.....

মণ্টু হো-হো করে হাসে।

হাসছিস যে?

তুই যেন কেমন করে কথা বলছিস?

আমার কথা বিশ্বাস হয় না মণ্টু?

না। কিছুই মিথ্যা না। তোরা যে জন্য প্রাণ দিলি তার মূল্য চিরকাল থাকবে।

BanglaBook.org

মণ্টু তুই তো কেমন করে কথা বলছিস। এসব কথা কি আমাদের মুখে মানায়?

চল ক্যান্টিনে যাই। চা খাবি?

না।

কোথায় যাবি?

জানি না। তুই কোথায় যাবি প্রদীপ্ত?

জানি না। তুমি নেই আমার খুব কষ্ট হয় অহি ভাই।

কষ্ট হলে আমার কথা মনে করিস। আমি তোর কাছে আসবো।

সত্যি?

হ্যাঁ। আমি তোর কাছে থাকবো।

সবাই যে তোমাকে নিয়ে টানাটানি করে সেটা আমার ভালোই লাগে। আমার খুব গর্ব হয়।

তুমি আমার গর্ব অহি ভাই। তুমি আমাদের সবার গর্ব।

ছাই। জেনে রাখিস কেবল কষ্টের মধ্যে, দুঃখের সময় আমায় পাবি।

আর কখনো না?

আর কখনো তো আমাকে দরকার হবে না। যাই।

দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। দূরে বুটের ভারি শব্দ উঠছে। বুঝি তেড়ে আসছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক। কদিন ধরে ছেটোখাটো যুদ্ধ চলছে শহরে। চারদিক থমথমে। ওরা একটুও ভয় পায় না। ওরা ভাঙা শহীদ মিনারের কাছে এসে দাঁড়ায়। নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে শহীদ মিনারের অস্তিত্ব। দু'জনে চোখ মোছে। প্রদীপ্ত বলে, তাতে কি? প্রত্যেকটা ইটের মধ্যে তো অহি আছে।

মণ্টু ওর হাত চেপে ধরে, শুধু আমি আর তুই ওকে দেখতে পেয়েছি। আর কেউ না।

আমরা যে ওকে ভালোবাসি। আমি জানি মণ্টু অহি আমাদের মধ্যেই থাকবে। আমরাই ওকে বড় করে রাখবো।

অহি বলেছে ও আবার আসবে।

আসবে তো, আসতেই হবে। এই ভাঙা শহীদ মিনার তো আমাদেরকেই গড়তে হবে। তখন অহি আমাদের শক্তি হয়ে যাবে। আমি তো কোনোদিন ভুলতে পারবো না মণ্টু যে ভাষার জন্য প্রাণ-দেয়া অহি, অহিউল্লাহ আমাদের বন্ধু ছিলো।

মণ্টু ঘাড় নাড়ে, আমিও পারবো না। ওকে আমি সারা জীবন মনে রাখবো।

BanglaBook.org

১৪

তন্নতন্ন করে ঢাকা শহরের সম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজেও মফিজুলের হদিস করতে পারে না আলী আহমদ। দুশ্চিন্তায় রাতে ওর ঘুম আসে না। সুলতানের সঙ্গে থাকতো ও। একুশ তারিখের পর থেকে সুলতানও কোনো খোঁজ জানে না। হাবিবুরকেও কিছু জিজ্ঞেস করলে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। প্রতিদিন ঘরে ফিরে আলী আহমদ অবসন্ন বোধ করে। ওর বুক ফেটে যায়। বারবারই মনে হয় যেসব লাশ পুলিশ গুম করছে মফিজুল হয়তো তার

মধ্যে পড়েছে। ঢাকা শহরের কোথাও মফিজুলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুলতান এবং হাবিবুরও একই কথা বলছে। আলী আহমদ ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়, বলে, ওর বাবাকে আমি কি বলবো? যদি লাশ পেতাম, উত্তর দিতে পারতাম, তবু একটা সান্ত্বনা থাকতো ওর বাবার জন্য। কিন্তু এখন? কি করে উচ্চারণ করবো যে মফিজুলের কবর হয়েছে কি না তা আমরা জানি না?

নিঃশব্দ সময় বয়ে যায়। কেউ কথার জবাব দেয় না। সবাই জানে এইসব প্রশ্নের জবাব হয় না, বলার কিছু থাকে না। কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব, কেবল অভিজ্ঞতাকে দীর্ঘ করা, কেবল এই ত্যাগের জন্য সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা। এইসব ত্যাগ যোগ হয় আর একটির সঙ্গে, জমতে থাকে, ইতিহাস হয়ে যায়।

প্রদীপ্ত বলে, বাবা আমি যদি দেখতে পেতাম যে অহি ভাইর লাশের মতো মফিজুল কাকুর লাশও উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ–

পুষ্পিতা তীব্রভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, আহ্ দীপু চুপ কর।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে ও। সেই বুকফাটা কান্নায় নিস্তব্ধ হয়ে যায় বাড়ি। আলী আহমদ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। প্রদীপ্ত খাতায় আঁকিবুকি কাটে, অহির মুখ আঁকতে চেষ্টা করে। প্রতীক ওর বর্ণমালা শেখার বইটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর প্রদীপ্তকে বলে, মা কাঁদলে আমার সবকিছু ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

প্রদীপ্ত বলে, ছিঁড়ে ফেল। বাবা তোকে আর একটা নতুন বই কিনে দেবে।

বাবা বলে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। আমি যাবো না স্কুলে। পড়ালেখাই শিখবো না।

তখন পুষ্পিতার কান্নার রেশ কমে আসে। আলী আহমদ বিছানায় উঠে বসে। ইচ্ছে হয় সারা রাত জেগে একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে।

BanglaBook.org

মাসখানেক পরে নসরুল্লাহ ঢাকায় আসে। লোকমুখে ঢাকার খবর শুনেছে, অনেকদিন মফিজুলের কোনো খবর নেই। ছেলেকে তো চেনে সে। এতবড় আন্দোলনে তার ছেলে চুপ করে বসেছিলো, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। দ্বিধার মধ্যে নানাকিছু ভাবতে ভাবতে চলে আসে নসরুল্লাহ। আলী আহমদের বাড়ি খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হয়। রিকশাওয়ালা ভালো ছিলো বলে রক্ষে। ও নিজেই আগ বাড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে বাড়ির হদিস বের করছে। গেটে প্রদীপ্ত দাঁড়িয়েছিলো, বেশ লম্বা হয়েছে, লিকলিকে স্বাস্থ্য। নসরুল্লাহকে দেখে দৌড়ে আসে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে, দাদু কেমন আছেন?

ভালো। তোরা কেমন আছিস? তোর বাবা কৈ?

বাবা বাড়িতেই আছে, চলেন।

তুই তো আমার সমান লম্বা হয়ে গেছিস রে? পড়াশোনা কেমন চলছে?

প্রদীপ্ত কেবল মাথা নেড়ে জবাব দেয়। ওর গলার কাছে কান্না আটকে থাকে। একটু পর বাড়িতে কি পরিস্থিতি হবে ভাবতেই ওর বুক চেপে আসে।

নসরুল্লাহকে দেখেই পুষ্পিতা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নসরুল্লাহ কিছু না বুঝে বারান্দায় মোড়া টেনে বসে।

আলী আহমদ তাড়াহুড়া করে বলে, আপনি আগে হাতমুখ ধুয়ে নিন চাচা।

আমি তেমন ক্লান্ত নই। কি হয়েছে বলো। এত কিছু দেখছি যে আমার জন্য ভাবতে হবে না। সবকিছুই সইতে পারবো।

নিরেট ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলে পুষ্পিতার মাথায় হাত রাখে নসরুল্লাহ, ভেঙে পড়েছিস কেন মা? শান্ত হ। এক কাপ চা খাবো রে। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে ভীষণ।

পুষ্পিতা রান্নাঘরে চলে গেলে আলী আহমদের কাছ থেকে নিঃশব্দে সব শোনে নসরুল্লাহ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, লাশটাও রাখতে পারলে না তোমরা? তারপর শান্তভাবে বলে, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে পুলিশ মফিজুলকে কোথাও আটকে রেখেছে। একদিন ছাড়া পাবে ও।

পুলিশ যাদের আটক করেছিলো তাদের টঙ্গির ওদিকে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলো। তাছাড়া আমি জেলখানাতেও খোঁজ নিয়েছি। সুলতান আর হাবিবুরও খুঁজতে কোথাও বাকি রাখেনি।

তাহলে বুঝতে হবে আমার মফিজুল মিশে গেছে সারা পূর্ব বাংলায়। কোনো এক জায়গায় ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মৃত অথবা জীবিত।

কথা বলতে বলতে নসরুল্লাহ ঘাড় নিচু করে। তারপর জ্বলজ্বলে চোখে আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ওর মা'কে আমি কি বলবো?

পুষ্পিতা চা নিয়ে এসে নসরুল্লাহর হাতে দেয়। আলী আহমেদ দীপ্ত কণ্ঠে বলে, চাচীকে আপনার কিছু বলতে হবে না চাচা। ফজলে গাজীর মা'কে আপনি কিছু বলেছিলেন?

ফজলে গাজী গেছে, মফিজুল গেছে। এবার আমার পালা।

আমারও হতে পারে। তবে পালা যারই হোক আমরা এভাবে লড়ে যাবো। আমরা পিছিয়ে থাকবো না।

এতক্ষণে নসরুল্লাহর চোখ ভিজে ওঠে। লম্বা করে চায়ে চুমুক দেয়। নসরুল্লাহ চোখের জল মুছতে চায় না।

আলী আহমদ বিড়বিড়িয়ে বলে, আমরা কোনো মায়ের কাছে গিয়ে বলবো না যে, তোমার সন্তানের জন্য কাঁদো। সন্তানের জন্য শোক করো।

পুষ্পিতা কঁকিয়ে ওঠে, উহ্ এমন করে বোলো না। কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমরা মায়েরা কি এভাবে সন্তান হারানোর জন্য সন্তানের জন্ম দিয়েছি?

নসরুল্লাহ আর আলী আহমদ পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিচিত্র আঁকাবাঁকা রেখা মুখজুড়ে ফুটে উঠেছে। পুষ্পিতা সন্তান হারানো এক মা– বেদনায় বিপর্যস্ত। মহানন্দা নদী ওর দু'চোখে বয়– জল কখনো ফুরোয় না। পুষ্পিতার মুখের আড়াল থেকে আলী আহমদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত হলুদ সরষে ক্ষেত।

দিনগুলো ধূসর হয়ে যায় আলী আহমদের। হঠাৎ করে মনে হয় সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। ক্লাসে গৎবাধা লেকচার দিতে হয়। মাঝে-মাঝে ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, মফিজুলের ইচ্ছে ছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার। এইসব ছেলেরা ক্লাসে শান্ত, মন দিয়ে লেকচার শুনছে, কিন্তু আন্দোলনে কেমন দুঃসাহসী, ভয়হীন। ওদের সবার মুখ মফিজুল হয়ে গেলে আলী আহমদের গলা ধরে আসে, কথা বলতে কষ্ট হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, স্যার আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ও ঢোক গিলে মাথা নাড়ে।

তাহলে আজ আমাদের ছুটি।

BanglaBook.org

ওরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। শূন্য ঘরে একা দাঁড়িয়ে থাকে আলী আহমদ। মনে পড়ে রাজশাহী থেকে চিঠি আসে নসরুল্লাহর, উত্তর দেওয়া হয় না। ও বোঝে নসরুল্লাহ ওর কাছে মানসিক আশ্রয় চায়। কিন্তু ও নিজেই তো আশ্রয়হীন, আশ্রয় দেবে কি করে? সেদিনের ঘটনা ভাবলে ওর চারদিক তোলপাড় করে ওঠে। টেবিলে বসলে লেখা আসে না। মনে হয় কি হবে লিখে, কেন লেখা, কার জন্য লেখা? এই শূন্য ঘর ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ও ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পায় ছেলেদের কলরব। মনে পড়ে প্রদীপ্ত স্কুলের পড়া দেখাতে নিয়ে এলে ওর মাথা কেমন ভার হয়ে যায়। পুষ্পিতা প্রতীককে বর্ণমালা শেখায়, ও দুষ্টুমী করে, লিখতে চায় না। পুষ্পিতা বলে প্রতীকের দিকে খেয়াল দিতে। খেয়াল দেওয়া হয় না। আলী আহমদ ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। ও কিছুতেই নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

কখনো একা একা ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে আরমানিটোলা মাঠে এসে বসে। শার্টের পকেটে নসরুল্লাহর চিঠি, ভাবলে কষ্ট হয়। কি উত্তর দেবে নসরুল্লাহকে? নসরুল্লাহ আশা করে আছে যে পুলিশের হেফাজতে আছে মফিজুল, একদিন কোথাও না কোথাও থেকে বেরিয়ে আসবে। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলে আলী আহমদের বুক খালি হয়ে যায়। ঐ মিছিলে তো ও নিজেও ছিলো, ও জানে ঐ মিছিল থেকেই মফিজুল হারিয়ে গেছে মৃত্যুর অন্ধকারে। ও এখন দূরের নক্ষত্র– শহরের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে আলো। বেশি মন খারাপ হলে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায়। প্রদীপ্ত প্রতীক বলধা গার্ডেনে যেতে ভালোবাসে। পুষ্পিতারও খুব পছন্দের জায়গা। ও বলে, ঢাকা শহরে এই একটি জায়গাই আছে। এখানে গাছগুলো অন্যরকম, পাতার রঙ আলাদা, মনে হয় মাটিটাও অন্য মাটির মতো নয়। এখানে পা রাখলে শরীর জুড়িয়ে যায়।

ঠিক বলেছো। শুধু শরীর নয়, মনও জুড়িয়ে যায় পুষ্পিতা। একমাত্র এখানে এলেই আমি মফিজুলের কথা ভুলতে পারি। নইলে যন্ত্রণা আমাকে পুড়িয়ে মারে।

ওহ্ মফিজুল, সোনার ছেলে।

পুষ্পিতার গলা ভারী হয়ে যায়। দু'জনে আনমনে হাঁটতে থাকে। দৌড়ে আসে প্রতীক, বাবা ঐটা কি পাখি?

বউ কথা কও।

উহ্ কী সুন্দর! বাবা আমাকে ধরে দাও।

প্রদীপ্ত বলে, পাখি ধরা যায় না জিতু।

বললেই হলো, একশোবার ধরা যায়।

প্রদীপ্ত ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, জানো বাবা অহি ভাই প্রথম যেদিন আমাকে এই বাগানে নিয়ে আসে সেদিন আমি অহি ভাইকে বলেছিলাম, অহি ভাই আমাকে একটা পাখি ধরে দাও। অহি ভাই আমাকে পাখি ধরে দেবার জন্য গাছে উঠেছিলো। তারপর পাখিটা উড়ে চলে গেলে বলেছিলো, পাখি ধরা সহজ না প্রদীপ্ত। এই বাগানে এলে অহি ভাইর জন্য আমার খুব কষ্ট হয় বাবা।

দেখো কাণ্ড, আমরা কষ্ট ভুলতে এখানে এসে সবাই মিলে কষ্টের কথাই বলছি।

আলী আহমদ খুব আবেগ দিয়ে কথাটা বলে। পুষ্পিতার চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। অহি মারা যাবার পর অহির মা ওদের বাসা ছেড়ে দিয়েছে। এখন কোথায় আছে আর কোনো খবর নেই।

বাবা চলো বাড়ি যাই।

প্রতীক আলী আহমদের হাত ধরে টানে।

BanglaBook.org

বাবা পুকুর ঘাটে একটু বসবে না?

আজ থাক।

মা'তো নীলপদ্ম না দেখে ফিরবে না?

প্রদীপ্ত পুষ্পিতার দিকে তাকায়। পুষ্পিতা ঘাড় নাড়ে, আজ থাক দীপু।

ঠিক আছে বাড়িতেই চলো।

ওরা গাছের ছায়ায় ভেজা পথ মাড়ায়। পায়ের নিচে শুকনো পাতা মাটির সঙ্গে দেবে যায়। বলধা গার্ডেনের অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাথার ভেতর গেঁথে নিয়ে ঘরে ফেরার পর আলী আহমদ নিজের মধ্যে বিস্তৃত হতে থাকে। ওর মনে হয় সামনে দীর্ঘ পথ, বড় বেশি প্রশস্ত।

সময় গড়িয়ে যায়। ইদানীং লেখালেখিতে বেশ মনোযোগ এসেছে। কলেজে যাবার পথে কখনো কবিতার লাইন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সংবাদ, ইত্তেফাকে লেখা ছাপা হয়েছে। কলেজের ম্যাগাজিনেও কবিতা বেরিয়েছে। বন্ধুরা প্রশংসা করে। হাসান বলে, ভালো লিখছিস রে। পড়লে মন ভরে যায়। হাসান পত্রিকায় কাজ করে, ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। নিজেও কবিতা লেখে। অনেক প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। প্রকাশকদেরও চেনে। বলেছে, কবিতার বই বের করে দেবে। এই চিন্তা মাথায় রেখে ও একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি করার কথা চিন্তা করছে। স্টেশনের পেছনেই ঢাকা কলেজ, মাঝে-মাঝে রেলের গুমগুম ধ্বনিটা বুকের ভেতর তোলপাড় করে দেয়। মনে হয় সেই কবে নৌকা পেরিয়ে চলে এলো এই দেশে, বেশি দিনের কথা তো নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়েছে বিপুল, দেখা হয়েছে অনেক। এই দেখাটাকে কাজে লাগাতে হবে। এইটুকু কাজে লাগানোই তো লেখকের জন্য জরুরি– এইটুকু কাজে লাগিয়ে দীপুর মতো ছেলেমেয়েদের বলে যাবে, দেখ এই আমাদের ইতিহাস, রক্তে ভেজা বড় বেশি জীবন নিংড়ানো। এক অদ্ভুত রেল গড়িয়ে যাচ্ছে জীবনের ওপর দিয়ে।

কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে ঘোড়ার গাড়ি থেমেছে কলেজের গেটে। ইডেন কলেজের মেয়েরা এসেছে প্র্যাকটিক্যাল করতে। কারণ ওদের কলেজে ল্যাবরেটরি নেই। অনেকদিন পর জুলেখার কথা মনে হয় ওর। ঢাকায় এসেছে অথচ দেখা হলো না। ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। কেমন আছে জুলেখা? বোদলেয়ারের মেঘ নাকি রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি? কি নামে ডাকবে? কি নামে ডাকা যায়? ক্লাসে আজ রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গিয়ে বারবার আনমনা হয়ে যায় আলী আহমদ। ক্লাস শেষে নিজে নিজে খুব লজ্জা পায়। নিজেকে শাসায়, বয়স কত হয়েছে ভুলে যাচ্ছো? নিজেকেই উত্তর দেয়, বুঝি না, হৃদয়ের কি বয়স বাড়ে? বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে, না হৃদয়ের বয়স বাড়ে না। বয়স বাড়লে আবেগতাড়িত হবে কেন? আবেগ কেন যুক্তিকে পরাস্ত করবে? কেন বয়সের হিসেবের কথা উড়িয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের দখিনা বাতাস? সেদিন ঘরে ফিরে একসঙ্গে তিন চারটে কবিতা লিখে ফেলে!

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসে। একুশ উদযাপনের তোড়জোড় চলছে। কলেজের ছেলেরা এবং ইডেনের মেয়েরা মিলে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়বে বলে ঠিক করে। হাসান ব্যস্ত, ওর নাগাল পাওয়া যায় না। একুশ উপলক্ষে একটি সংকলন বের করবে। রাতদিন প্রেসে থাকে, রাতেও টেবিলের ওপর ঘুমোয়। খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই। শহীদ মিনার তৈরি ছাড়াও সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

BanglaBook.org

ওরা আলী আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করে নিয়েছে কি ধরনের গান গাওয়া হবে। একুশে উদযাপন উপলক্ষে চারদিকের এতসব আয়োজনে ও নিজের মধ্যে প্রবল প্রেরণা পায়। ও ছাত্রদের বলে, দেখ গত বছর এই দিনে আমাদের ছেলেরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু তোমরা জানবে ভাষার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম ছিলো প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলদের জয়। অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে তোমরা অবশ্যই গাইবে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' জানো আমার মনে হয় একটি পংক্তি সম্বল করেই আমি আমৃত্যু কাটিয়ে দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ আমার গভীরে এক শক্ত শেকড়, কিছুতেই উৎপাটিত করতে পারবে না কেউ। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে রেখে দেখবে সাহসী হবে, নির্ভীক হবে। যতই জুজুর ভয় আসুক পরাস্ত হবে না।

ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে। এবং সেই মুগ্ধতা নিয়ে শহীদ মিনার গড়তে যায়। কিন্তু কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়া হয় না ওদের। ইডেনের প্রিন্সিপাল, ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল এবং উর্দুর অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদেরকে বাধা দেয়। হৈ-চৈ, হট্টগোল বেধে যায়। ওদেরকে ওখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

প্রিন্সিপালের ঘরে আলী আহমদ এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। বলে, আমরা জীবিকার খাতিরে অনেককিছু করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু ছেলেদের এভাবে বাধা দেওয়ার কাজটাও ঠিক হয়নি।

প্রিন্সিপাল রেগে ওঠে, এসব কি বলছেন আপনি?

খুব কি অন্যায় কিছু বলেছি?

আপনার দেশপ্রেম সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ভারত থেকে এসেছেন কিন্তু এখনো ভারতের চর হয়ে আছেন দেখছি।

ভারত থেকে আমি মুসলমান হওয়ার অপরাধেই বিতাড়িত হয়েছি।

নামে মুসলমান হলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না।

বেশ তো আপনারাই খাঁটি মুসলমান হয়ে দেশ রক্ষা করুন।

আলী আহমদ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরে ওকে সমর্থন করার কেউ নেই। সবাই ওর বিপক্ষে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দরজার বাইরে ছাত্ররা জড়ো হয়ে গেছে। কলেজ প্রাঙ্গণেও ইতস্তত জটলা। ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে। কলেজ প্রাঙ্গণে ইট-বালুর স্তূপ। আলী আহমদ কারো দিকে তাকাতে পারে না। অপমানে, গ্লানিতে ওর শরীর রি রি করে। এই অবস্থাতেই গেটের সামনে জুলেখার মুখোমুখি হয় ও। ক্রোধের উত্তেজনায় হঠাৎ থতমত খেয়ে যায় ও। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তড়িঘড়ি বলে, আপনি?

চিনতে পারছেন না?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, আপনাকে কি ভোলা যায়!

জুলেখা প্রসঙ্গ পাল্টায়, রেগে আছেন কেন? কি হয়েছে?

সে তো অনেক কথা। এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।

ঠিকানাতো দিয়ে এসেছিলাম। ঢাকায় এসেছেন অথচ যোগাযোগ করেননি।

সেদিন স্টেশনে একটা চিরকুট দিলেন। তারপর যে কোথায় রাখলাম–

বুঝেছি, হারিয়েছেন। নিন।

জুলেখা ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে ঠিকানা লিখে দেয়।

আসবেন কিন্তু।

BanglaBook.org

আলী আহমদ গাঢ় কণ্ঠে বলে, আসবো।

জুলেখা সে কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে বলে, শহীদ মিনার কতদূর হলো দেখতে এলাম। আমার বড় বোনের মেয়ে ইডেনে পড়ে। ও কলেজ থেকে এখানে এসেছে।

যান, দেখুন।

আলী আহমদ আর কিছু বলে না। জুলেখা চলে যায়। ও নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। বসন্ত শুরু হলেও সকালের রোদ এখনও তেমন চড়া নয়, বেশ আমেজের। হাঁটতে ভালোলাগে, কিন্তু মনটা তেতো হয়ে আছে। কী জঘন্য পরিবেশ। যাদের সঙ্গে কাজ করতে হয় তাদের সাংস্কৃতিক মান কতো নীচে! এরা নিজেদের বুঝতে পারে না। যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান হতে না পারাটা এদের কাছে এক বিরাট অপরাধ। ছাই! আলী আহমদ জুলেখার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দটুকুও উপভোগ করতে পারে না। তেতো হওয়া মনটা বিষিয়েই থাকে। কিন্তু সেদিন ওর আর বাড়ি ফেরা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বেরিয়েছে। মিছিলে কায়সারের সঙ্গে দেখা, আলী আহমদের হাত ধরে টেনে বলে, চলেন। বুঝেছি শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়াতে আপনার মন খারাপ হয়েছে।

আলী আহমদ হাঁটতে থাকে। মিছিল শহর ঘুরে আরমানিটোলা ময়দানে আসে। আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে সভা হবে। গতকাল রাত বারোটা থেকে স্লোগান দেয়া হচ্ছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এখনো সেই স্লোগানে সভা-প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত হচ্ছে। কায়সার মৃদু স্বরে বলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষতো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সভা, মিছিল করা যাবে না বলে কালাকানুন তৈরি করেছে। আমরা তা মানছি না। প্রতিবাদে সভা করে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছি।

ভালো করেছো। প্রতিবাদ না করলে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না। ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যা করেছে তা আমাকে মর্মাহত করেছে। শুধু তাই নয় আমাদের চারপাশের অনেকের সাংস্কৃতিক মান এত খারাপ যে ঘৃণা হয়।

আমি এসব জানি আহমদ ভাই। মন খারাপ করবেন না। আমরা একটি লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছবো।

অনেকেই বক্তৃতা করছে। ওরা কখনো শোনে, কখনো নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ছোটো ছোটো কথা। মওলানা ভাসানী জেলে। বক্তারা ভাসানীর মুক্তি দাবি করছে। শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা শুরু করলে আলী আহমদ কান খাড়া করে। হালকা-পাতলা শরীর, কিন্তু কণ্ঠস্বর গমগম করছে– শেখ মুজিবের বক্তৃতা আরমানিটোলা ময়দানের মানুষগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়।

বক্তৃতা শেষে বেশ কতগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ভিড়ের মধ্যে কায়সারকে হারিয়ে ফেলে ও। সভা শেষ। একা একা বাড়ি ফেরে আলী আহমদ। তখন বিকেল গড়িয়েছে। সূর্যের আলো কমে এসেছে, এতক্ষণে টের পায় সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে অনুষ্ঠান আছে। ওখানে যেতে হবে। পুষ্পিতা ভাত নিয়ে বসেছিলো, উদ্বিগ্ন। ওকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বলে, এত দেরি করলে? ভীষণ ভয় করছিলো।

জীবন তো একটাই। মরলে কি হবে পুষ্পিতা?

কি বাজে কথা বলছো।

পারবে না ছেলে দু'টোকে মানুষ করতে?

ভালো হবে না বলছি।

BanglaBook.org

পুষ্পিতা ক্ষেপে ওঠে। আলী আহমদ হার মানে, সত্যি এসব কথার কোনো মানে হয় না। ভাত দাও। সন্ধ্যায় তোমাদের নিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে যাবো।

আমি বেরুতে পারবো না। প্রতীকের জ্বর এসেছে। তুমি দীপুকে নিয়ে যাও। ও অনুষ্ঠানে যাবে বলে স্কুলের পড়া শেষ করছে।

তাই নাকি। লক্ষ্মী ছেলে তো।

খেতে বসে আলী আহমদের সামনে জুলেখার মুখ ভেসে ওঠে। মনে হলো জুলেখা খানিকটা রোগা হয়েছে। তাতে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে। বাড়তি মেদ ঝরে গেলে মানুষ শাণিত হয়, জুলেখা এখন তেমন শাণিত। কালো পাড়ের সাদা শাড়িতে ওকে স্নিগ্ধ এবং একই সঙ্গে প্রতিবাদী মনে হয়েছে। আলী আহমদের বুকের ভেতর বিদ্যুৎ ঝলসায়, জুলেখা এখন ওর কাছে সৌন্দর্য এবং সংগ্রাম। এতক্ষণে ওর মনে হয় এ বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি এভাবেই মানুষের প্রেরণা হবে। মানুষের বুক থেকে কখনোই এ চেতনা হারাবে না। শুধু বদলাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত।

সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হল লোকে ভরে যায়। অনেকে এসেছে অনুষ্ঠান দেখতে– অনেক পরিচিত মুখ। জুলেখাকেও দূর থেকে দেখতে পায় ও। প্রদীপ্ত ভীষণ খুশি। ঢাকায় আসার পর এ ধরনের অনুষ্ঠান ওর দেখা হয়নি। তখন মঞ্চে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গাওয়া হচ্ছে। হলে পিন পতন নিস্তব্ধতা। সবাই মনপ্রাণ দিয়ে গান শোনে, যেন শোনা নয় হৃদয়ের তলদেশ ভরে দিচ্ছে সে সুর।

অনুষ্ঠান শেষে হাসানের সঙ্গে দেখা হলে এক কপি একুশের সংকলন দেয় ওর হাতে। আলী আহমদ ওকে জড়িয়ে ধরে, চমৎকার। চমৎকার কাজ করেছো।

হাসান মৃদু হাসে, শুরুতেই চমৎকার বললেন? আগে দেখুন, কেমন হয়েছে?

আলী আহমদ পকেট থেকে টাকা বের করে বলে, আর এক কপি দাও। আমি কিনলাম।

হাসান খুশি হয়ে আর এক কপি বই দেয়। বাড়ি ফিরে আলী আহমদের কেবলই মনে হয় যেসব মানুষের সাংস্কৃতিক মান নীচু তাদের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়া কেন? এই তো, এরা সব আছে, যারা টিকিয়ে রাখছে যা কিছু নিজেদের আপন, তা। তাহলে আর ভয় কাকে?

অনেক রাত জেগে বইটা পড়ে শেষ করে ও। শেষ রাতের দিকে প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে যায়। বারবারই মনে হয়েছে শুধু সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচারে নয়, সময়ের দলিল হিসেবেও টিকে যাবে বইটা।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নানা ঘটনা ওকে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে ফেলে। শহীদ মিনার নির্মাণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজের বেশ কয়েকজন ছেলের রাসটিকেট হয়। 'একুশের সংকলন' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। দু'জনের এম.এ. ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়। কলেজের প্রিন্সিপাল ওকে প্রচণ্ডভাবে শাসায়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাসপোর্ট কেড়ে রাখার ব্যবস্থা করবে বলে হুমকি দিয়েছে। এতকিছু আলী আহমদ নীরবেই হজম করে। যদিও কান ঝাঁ-ঝাঁ করে, রক্তে বিছুটির জ্বালা। আলী আহমদের মনে হয়, এক জীবনে ওর অনেক পাওনা হয়ে গেছে।

ঘরে ফিরে পুষ্পিতার হাতে 'একুশের সংকলন'টি দিয়ে বলে, সরকার এই বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো। এই ইতিহাস প্রদীপ্ত এবং প্রতীকের জন্য প্রয়োজন হবে।

পুষ্পিতা বলে, এত মন খারাপ করছো কেন?

BanglaBook.org

মন খারাপ করছি কৈ? এই বইয়ে আমাদের সবার পরিচয় লুকিয়ে আছে পুষ্পিতা। আমাদের পরবর্তীকালের ছেলেমেয়েদেরকে এই পরিচয় জানতে হবে।

বুঝেছি, তোমার শরীর খারাপ। চোখমুখ অমন লাল দেখাচ্ছে কেন? ইস জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। মিছিল, মিটিং নিয়ে কদিন যা অনিয়ম করলে। এসো, শোবে এসো।

না, না, আমি এখন শোব না। কতদিন রাজশাহীর খবর জানি না। ওরা কেমন আছে কে জানে? আমি চিঠি লিখবো।

পুষ্পিতার কথা শোনে না আলী আহমদ। ও নসরুল্লাহকে চিঠি লিখতে বসে। দীর্ঘ চিঠি লেখে, প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অনাগত দিনের আশায় ভরা চিঠি।

সাতদিন জ্বরে ভুগে শরীর দুর্বল হয়ে যায় আলী আহমদের। দিনগুলো বিষণ্ন এবং ধূসর। পুষ্পিতা মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত দেয়। খেতে ভালোলাগে না। মনে হয় শরীরের চেয়ে মনের অবসাদ বেশি। মানুষ কি প্রতিমুহূর্তে প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে পারে?

পুষ্পিতা রাগ করে, খাও, জোর করে খেতে হবে। দুর্বল হয়ে গেছো।

এক লোকমা ভাত মুখে পুরে ও বলে, লড়াই করতে করতেই আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি পুষ্পিতা। মধ্যবিত্তের সংকটই এমন। প্রতিদিনের নুন-ভাতের জন্য লড়াই নয়। লড়াই করতে হয় স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য, যা কুরে কুরে খায় শক্তি।

তোমার না অনেক সাহস। কেন ভেঙে পড়ছো?

মাঝে মাঝে কিছুই ভালোলাগে না।

পুষ্পিতা খুব সরলভাবে বলে, জীবন এমনই।

কিন্তু বাক্যটি আচ্ছন্ন করে আলী আহমদকে, জীবন এমনই। যে পরিবেশে সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থতা নেই, রাজনীতি নির্মম, ক্রুর সেখানে জীবন এমনই। তাহলে আর মন খারাপ কেন? পুষ্পিতা ওর পাতে আরো দু'টুকরো মাছ উঠিয়ে দেয়। আলী আহমদ হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, একদম পারবো না খেতে। একটুও ইচ্ছে করছে না।

রান্না ভালো হয়নি?

তোমার রান্না খারাপ বলবে এমন কেউ এ দেশে আছে নাকি?

পুষ্পিতার মুখে আনন্দের হাসি। ও নিজেও জানে ওর রান্নার হাত চমৎকার। আলী আহমদ অকপটে তা স্বীকার করে, এখানে কোনো ছলনা নেই।

দুপুরবেলা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে ও। প্রদীপ্ত নতুন ক্লাসে উঠেছে, ভীষণ কৌতূহলী, পড়াশোনাও করতে চায়। নানা ধরনের বই সংগ্রহ করতে হয় ওর জন্য। এ বছর প্রতীককে স্কুলে দেয়া হয়েছে। দু'ভাই একসঙ্গে ফেরে বিকেলে। পুষ্পিতার দুপুরগুলো এখন একদম নিরিবিলি। তবু ওর ব্যস্ততার শেষ নেই। ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে মেতে থাকে, বিকেলের খাবারের জন্য নাড়ু-পিঠা বানায়, নয়তো সেলাই নিয়ে বসে, নকশি কাঁথায় ফুল তোলে। আজ ইজিচেয়ারে শুয়ে পুষ্পিতার ঘর-সংসার দেখে আলী আহমদ, মনে হয় ওকে নতুন করে আবিষ্কার করা হলো, যেন পুষ্পিতা এমন ছিলো না, এমন হয়েছে। জুলেখা কি করে এমন দুপুরে? ওর তো সংসার নেই। যাদের সঙ্গে ও থাকে তাদের নিয়ে কি এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে? চোখ বুজলে মেঘ এবং জুলেখার মুখ ভেসে ওঠে ওর সামনে।

একদিন বিকেলে ঠিকানা খুঁজে জুলেখার বাসায় হাজির হয় আলী আহমদ। কখনো ভাবে এটা কি শুধুই ভালোলাগা? না কি প্রেম? না কি ওর অবচেতনের খেলা– যাকে কেন্দ্র করে মানুষ নিজের সঙ্গে নিজেই লুকোচুরি খেলে? আসলে তো আবেগটা ওর একতরফা,

BanglaBook.org

একজন মানুষকে কেন্দ্র করে কিছু ভালোলাগা গজিয়ে ওঠা। ওঠা কি অন্যায়? আলী আহমদ নিজেই উত্তর দেয়, কেন অন্যায় হবে? আমি তো সামাজিকভাবে কারো ক্ষতি করছি না? শুধু একটু ভালোলাগা লালন করে দিনগুলোকে অন্যরকম বানানো।

দরজায় কড়া নাড়ে ও। দরজা খোলে জুলেখার বোনের মেয়ে। আলী আহমদের মনে হয় মেয়েটি বোধহয় ইডেনে পড়ে।

আমি মিসেস হকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

জ্বি, আসুন।

মেয়েটি ইতস্তত করে ওকে বৈঠকখানায় বসায়। একটুপর জুলেখা আসে। হাতে মেহেদি লাগানো, চমৎকার একটি ছাপার শাড়ি পরে আছে। দারুণ স্নিগ্ধ লাগছে। চেহারায় একধরনের দ্যুতি দেখে হকচকিয়ে যায় আলী আহমদ।

জুলেখা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন আহমদ ভাই?

ভালো। আপনি?

জুলেখা একটু চুপ করে থেকে লাজুক হেসে বলে, গত পরশু আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

অভিনন্দন। বাহ্ এ তো ভীষণ খুশির খবর।

হঠাৎ করেই হলো। বাবা খুব চাপাচাপি করছিলেন।

ভালোই করেছেন। আপনার জীবনের তো এখনো দীর্ঘপথ বাকি। একলা চলা খুব কঠিন।

আমি আগামীকালই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো। ও বাসায় নেই। থাকলে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।

ঠিক আছে, আর একদিন আলাপ হবে।

বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।

জুলেখা উঠে গেলে আলী আহমদের বুকটা খচ করে ওঠে। ভার হয়ে যায়। নিজেকে শাসনও করে, জুলেখার মঙ্গল চাইলে তোমার তো খুশি হওয়ার কথা আলী আহমদ। পারছি কি? কষ্ট হচ্ছে যে? কেমন করে এই কষ্টটুকু পার হবো? এই খবরটুকুর জন্যই কি এসেছিলাম? তুমি কি খুব স্বার্থপরের মতো ভাবছো না আলী আহমদ?

পরক্ষণে বাখরখানি, কাবাব, মিষ্টি, দই ইত্যাদি একগাদা খাবার নিয়ে আসে জুলেখা।

বাব্বা, এ্যাতো?

সব খেতে হবে কিন্তু।

জুলেখার ঠোঁটে মিষ্টি লাজুক হাসি। এই হাসিটুকু জুলেখা বিয়ের পরে অর্জন করেছে। আলী আহমদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ঐ হাসিটুকু ওর ঠোঁটে লেগেই আছে। আলী আহমদের আবার কষ্ট বাড়ে। মনে হয় কোনো খাবারই ও খেতে পারবে না। সব খাবার বুকের মাঝখানে গিয়ে আটকে থাকবে।

কি হলো, আপনি কিছু ভাবছেন মনে হয়। নিন, খান। ভাবী ভালো আছে তো? ছেলেরা?

হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। প্রতীককে স্কুলে দিয়েছি।

বাচ্চারা দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায় না?

তাই তো মনে হচ্ছে। দোয়া করি এবার যেন তাড়াতাড়ি মা হয়ে যান।

মুহূর্তে জুলেখার ঠোঁট থেকে মিষ্টি হাসি মুছে যায়। ও বোবা চাউনিতে তাকায় আলী আহমদের দিকে।

BanglaBook.org

আপনি কষ্ট পাবেন এই ভেবে কিন্তু আমি কথাটা বলিনি। আপনি মা হলে আমি খুব খুশি হবো।

জুলেখা চোখ মুছে বলে, আমিও মা হতে চাই। সন্তান না থাকার জন্য আমার বুক শূন্য হয়ে থাকে। কী যে কষ্ট পাই।

আলী আহমদের মনে হয় এতক্ষণে ও নিজের কষ্টটুকু পার হতে পেরেছে। এখন আর ওর বুক ভার হয়ে নেই। খাবারগুলো এখন আর কোথাও আটকে থাকবে না।

জুলেখার জন্য প্রবল মমতা হয়।

পরক্ষণে ও হেসে বলে, দেখুন দেখি এমন খুশির খবরটাকে আমি কেমন ভারাক্রান্ত করে ফেললাম।

আপনি তো সত্যি কথাই বলেছেন। যাকগে। আমি কিন্তু স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সংবাদ পত্রিকায় ঢুকেছি। আপনি ওখানে আসবেন। আমার স্বামী সাংবাদিক।

ভালোই তো হলো। দু'জনেই খবরের জগতে।

আমি কিন্তু গোটা কয়েক গল্প লিখেছি। আপনাকে দেখাবো।

সত্যি তাই? খবরের পর খবর। আমার তো পাগল হওয়ার জোগাড়। এত খুশি রাখবো কোথায়?

আলী আহমদের উচ্ছ্বাসে জুলেখার ঠোঁটের হাসি ফিরে আসে। ও দ্রুত অনেককিছু খেয়ে ফেলে। মনে হয় জুলেখার সঙ্গে সময়টা ভরে উঠেছে। ফিরে আসার সময় ওর বুকে আর কোনো কষ্ট থাকে না।

বছরের শেষের দিকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ৫০-৫১ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে এই নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিলো ৫৩ সাল পর্যন্ত। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের বিরোধী দলগুলো এক হয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। তারা একুশে ফেব্রুয়ারির একুশ সংখ্যাকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে ২১ দফা কর্মসূচি দেয়। এর আগেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী বানায়। কারণ বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে খাজা নাজিমুদ্দিন তখন পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি। মুসলিম লীগ সরকার ভাবে এই পরিবর্তনের ফলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ জয়লাভ করবে। যুক্তফ্রন্ট তার একুশ দফার একটি সুস্পষ্ট নির্বাচনি কর্মসূচি জনসাধারণের সামনে পেশ করে। এই দফাগুলির মধ্যে আছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি, রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং বিনাবিচারে আটক রহিতকরণ ইত্যাদি। অন্যদিকে মুসলিম লীগের কোনো জোরালো কর্মসূচি নেই। পাকিস্তান বিপন্ন, ইসলাম বিপন্ন ইত্যাদি বস্তাপচা বুলি জনসাধারণের মনে আর তেমন ছাপ ফেলে না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নূরুল আমিনের ভূমিকার কথা লোকে ভোলেনি। এখন স্লোগান ওঠে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই– নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই। এই নূরুল আমিন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কাগজ পড়তে পড়তে এই পুরো ছবিটি আলী আহমদের মনে ভেসে ওঠে। ওর বারবারই মনে হতে থাকে যে মুসলিম লীগের জন্য এবার এক কঠিন সময়। পরিস্থিতি আঁচ করতে পারে মুসলিম লীগ সরকার ঘোষণা দেয়, নির্বাচন তিন সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলার ধুয়া তুলে ব্যাপকহারে বিরোধী দলের কর্মীদের গ্রেফতার করতে থাকে। ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে কী করা যায়? যার হাতে ক্ষমতা সে তো

BanglaBook.org

ইচ্ছেমতো আইনের হেরফের করে। সোহরাওয়ার্দী তরুণদের বললেন, সরকার একজনকে গ্রেফতার করলে তার জায়গায় দশজনকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের এই নীতিহীনতার জবাব দিতে হবে ব্যালটে। আমরা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করতে চাই।

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশের তরুণ সমাজ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলিম লীগ ভেবেছিলো নির্বাচন পিছিয়ে দিলে তারা সুবিধে করতে পারবে, কিন্তু সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করলো বিরোধী দল। মওলানা ভাসানী পুরো ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ এক তারিখ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের শহীদের জন্য প্রতিটি গ্রামে প্রভাতফেরির ব্যবস্থা করলেন। বদলে গেলো নির্বাচনি প্রচার কাজের চরিত্র। একটি সত্য আলী আহমদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো যে একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হচ্ছে। সেদিন ষড়যন্ত্রকারীরা শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু মানুষের প্রাণের আবেগ রুখবে কি করে? জাতির মর্মমূলে গড়ে উঠছে বিশাল শহীদ মিনার। ভাবতেই নিজের ভেতর চাঞ্চল্য অনুভব করে আলী আহমদ। এরপর নির্বাচনের ফলাফল দেখে ও স্তম্ভিত হয় না। মনে হয় যেমনটি ঘটা উচিত ছিলো তেমনিই ঘটেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা ফজলুল হক। এপ্রিলের দুই তারিখে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন চলছে। এক অদ্ভুত প্রেরণা কাজ করে আলী আহমদের মধ্যে। ওর ধারণায় এই গরিব দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন ত্বরান্বিত হবে না বলেই সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জাতির চেতনা শাণিত হলেই রাজনৈতিক সাফল্য সম্ভব। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, যারা মনে করে বাঙালি নাম উচ্চারণ করা মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে। এই বক্তব্য শুনে চমকে ওঠে আলী আহমদ। কী গভীর এবং সুদূরপ্রসারী বক্তব্য। বক্তৃতা শোনার পর ও মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। একুশ দফার দাবি ছিলো বর্ধমান ভবনকে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করতে হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা বর্ধমান ভবন দখল করে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ওপর একটি আলোকচিত্র ও চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জয়নুল আবেদিন। সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মওলানা ভাসানী। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। পল্টনের খেলার মাঠে কবিয়াল রমেশ শীলের কবিগান চলে সারারাত ধরে।

তিনটি দিন ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে যায় আলী আহমদের। ওর সঙ্গে প্রদীপ্তও রাতভর রমেশ শীলের গান শোনে। মানুষের উৎসাহের অন্ত নেই, কারো কোনো ক্লান্তিও নেই। আলী আহমদের বারবার মনে হয়, সংস্কৃতির গোলায় ফসল উঠেছে। আর ভয় নেই। গান শুনে ভোরে ঘরে ফিরলে পুষ্পিতা ভুরু কুঁচকে তাকায়, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে একটুও ক্লান্ত না। আরো দু'চার রাত জাগতে পারবে?

ঠিক বলেছো মা। ওহ্ যা দারুণ গান হচ্ছে না। আমার একটুও ঘুম পায়নি।

বাহাদুর ছেলে আমার। তা এখন কি ঘুমুতে হবে না স্কুলে যেতে পারবি?

স্কুলে যেতে পারবো। কীসের ঘুম? প্রতীক ওঠেনি?

বলতে বলতে ও দৌড়ে বাথরুমে যায়। বালতি থেকে পানি নিয়ে ঝপাঝপ গায়ে ঢালে। ওরা শুনতে পায় ও গুণগুণিয়ে গান গাইছে।

BanglaBook.org

এই প্রথম প্রদীপ্ত গান গায়।

একদিন 'সংবাদ' অফিসে জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে যায় আলী আহমদ। জুলেখা ওর স্বামী মতিউরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়।

জানো, ইনি আলী আহমদ। লেখক, কলেজে পড়ান।

আপনার লেখা পড়েছি। চমৎকার হাত। পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম।

আলী আহমদ কিছুটা বিব্রত হয়, লাজুক হেসে মাথা নাড়ে। প্রশংসার উত্তরে কি বলতে হয় তা ওর জানা নেই।

ওর বিব্রত অবস্থা দেখে জুলেখা প্রসঙ্গ পাল্টায়, ইলা মিত্রকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছে জানেন তো?

হ্যাঁ, শুনেছি। আমি ভাবছি আজকালের মধ্যে দেখতে যাবো।

আমরা গিয়েছিলাম। অবস্থা খুব খারাপ। হাঁটতেই পারে না। আসলে নাচোল থানার সেই ভয়াবহ অত্যাচারের পর তো চিকিৎসাই হয়নি। রাজশাহী জেলে একরকম বিনা চিকিৎসায় জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তারপর টাইফয়েড আর কালাজ্বরে ভুগেছে। এখন অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যায়। হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারে না।

শুনতে শুনতে শরীর কেমন অবশ লাগে আলী আহমদের। রাজশাহীর দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে– নসরুল্লাহর পোড়া বাড়ি, ফজলে গাজীর মৃত্যু এবং নিখোঁজ মফিজুল এসে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন থমকে গেছে। এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। কোথায় এর শেষ ও নিজেও জানে না।

তখন মতিউর উচ্চকণ্ঠে একজনকে ডাকে, এই যে সাবের ভাই আসুন। আপনার সঙ্গে একজনকে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি আলী আহমদ। আর ইনি শহীদ সাবের।

শহীদ সাবের? আলী আহমদ হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ হাত। ও মৃদু হেসে বলে, আপনার লেখা আমি পড়েছি। অনেকদিন কবিতা দেখছি না?

ও কিছু বলার আগেই জুলেখা বলে, সাবের ভাই কিন্তু ইলা মিত্রকে নিয়ে দারুণ কবিতা লিখেছেন। ইলা মিত্রের যখন বিচার হয় উনি নিজেও কিন্তু তখন রাজশাহী জেলে ছিলেন। রাজনৈতিক বন্দী।

মতিউর বলে, ভাগ্যিস যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায়। তাই তো আমাদের রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেয়েছেন।

শহীদ সাবের হা-হা করে হেসে ওঠে। সে হাসিতে চমকে ওঠে আলী আহমদ। ওর ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ করমর্দন এবং এ হাসি– একদম অন্যরকম। মানুষটাকে ওর ভালোলাগে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে পারে না। এইসব মানুষের কাছে অনেককিছুই প্রকাশ করা যায় না। হাসতে হাসতে শহীদ সাবের চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে আলী আহমদ বলে, ওকে বলা হলো না যে কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত ওর 'আরেক দুনিয়া থেকে' লেখাটি আমার দারুণ লেগেছে।

মতিউর লাফিয়ে উঠে বলে, আমারও। জানেন তো এই লেখা পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে সাহিত্যে স্বাগত জানিয়েছেন। জেল জীবনের এমন চমৎকার বর্ণনা হয় না।

তাই নাকি? এ তথ্য আমার জানা ছিলো না।

জুলেখা করুণ মুখে বলে, লেখাটি আমার পড়া হয়নি।

আমার কাছে পত্রিকাটির কপি আছে। দেবো আপনাকে। সাবেরের রসবোধ কেমন শুনুন। এক জায়গায় লিখছে "লিয়াকত আলী মার্কিন দেশ ভ্রমণে যাবার সময় সঙ্গে কি

BanglaBook.org

নিয়েছিলেন জানো তো?" চক্রবর্তী ছাত্রটিকে শুধালেন।

টুলু জবাব দেয় ১৩৫টি সিগারেট লাইটার।

চক্রবর্তী ঘাড় নাড়েন। না, সঙ্গে নিয়েছিলেন একখানা লিস্ট। পাকিস্তানের সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের নামের তালিকাখানা তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে দেখিয়ে বলেছেন, এই দেখো, এত কমিউনিস্ট ধরে রেখেছি।'

ছাদ ফাটিয়ে হাসে মতিউর, সঙ্গে জুলেখাও। জুলেখার উচ্ছল হাসি মোহিত করে আলী আহমদকে। ঐ হাসিমুখ বুকের মধ্যে রেখে পথে নামে ও।

বিকেলে হাসপাতালে ইলাকে দেখে বিমূঢ় হয়ে যায় আলী আহমদ। শরীরের হাড় কয়েকটি চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে– আয়ত চোখজোড়া কোটরগত। শাদা বাড়ি, ব্লাউজপরা ইলা শুভ্রতার প্রতীক। আলী আহমদের মনে হয় লিয়াকত আলীর তালিকায় কি ইলার নাম এক নম্বরে ছিলো? ইলা ওকে চিনতে পারে না। অনেকেই ওকে দেখতে আসছে। অনেককেই চেনে না আলী আহমদও। ও মাথার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে এক ঠোঙা কমলা। নির্যাতনে, নিপীড়নে বিপর্যস্ত ইলাকে দেখে কুঁকড়ে থাকে আলী আহমদের হৃদয়। এই দেশ ওর চোখের সামনে ধূসর হয়ে যায়।

একটুপরে কয়েকজন ছাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে রমেন মিত্রকে ঢুকতে দেখে অবাক হয় আলী আহমদ। রমেন ওকে দেখে আঙুলের ইশারায় চুপ থাকতে বলে। রমেন মিত্র এই একই মামলার এক নম্বর আসামী। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ ধরতে পারেনি। আলী আহমদ হিসেব করে দেখলো যে বেশ কয়েকবছর পর ওদের দেখা হলো। একজন বন্দী, অপরজনের নামে হুলিয়া।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! রমেন মিত্র গভীর মমতায় ইলার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মাত্র কিছুক্ষণ সময়, বেডের চারপাশে উৎকণ্ঠিত সবাই। ছাত্ররা পুলিশের নিরাপত্তা ভেদ করে নিয়ে এসেছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না, চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। মাত্র কতটুকু সময়, তবু মনে হয় এই একটু সময়ই অনন্তকালকে ধরে রেখেছে। ইলা ধরে রেখেছে রমেনের হাত। শক্তি নেই, তবু ছাড়তে চায় না সে হাত। রমেন আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, কেমন আছেন? এখন কি ঢাকায়?

আলী আহমদ মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

রমেনদা চলুন?

ছাত্ররা তাগাদা দেয়।

ইলা নিষ্প্রভ করুণ কণ্ঠে বলে, যেতে হবে?

সেই কণ্ঠে চমকে ওঠে উপস্থিত সবাই।

রমেন মিত্রের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ইলা অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

রমেনদা চলুন আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ইলা হাত ছেড়ে দেয়। দুজনের চোখে জল। ছেলেরা যে সতর্কতার সঙ্গে পলাতক রমেনকে নিয়ে এসেছিলো সেই একই সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

আলী আহমদের মনে পড়ে মাত্র ক'দিন আগে মওলানা ভাসানী এসেছিলেন ইলাকে দেখতে। বলে গেছেন, ও আমার মেয়ে। ওর চিকিৎসার সব দায়িত্ব আমার।

আজ এসেছে স্বামী দেখতে। চারপাশের কত মানুষ ইলাকে ঘিরে রেখেছে।

আজ এমন অভাবনীয় দৃশ্যের দর্শক হয়ে আলী আহমদ ক্ষয়ে যেতে থাকে। জীবন

BanglaBook.org

দিয়ে অর্জিত এইসব অভিজ্ঞতা সাহিত্যে ফুল হয়ে ফোটে, সুবাস ছড়ায়। ও নার্সের হাতে কমলাগুলো দিয়ে বলে, রস করে খাওয়াবেন।

নার্স ফিকে হাসে। বলে, বেচারি!

হাসপাতালের ঘণ্টা বাজে। এবার যেতে হবে। ওর মনে হয় সময় যে কোথা দিয়ে চলে গেলো ও টেরই পেলো না। সন্ধ্যা নেমেছে। একবার ভাবে হাসানের বাসায় গিয়ে আড্ডা দেবে। রিকসা ডেকেও মন স্থির করতে পারে না। খানিকটা গিয়ে রিকসা ওর বাড়ির দিকে ফেরায়। পরীক্ষার খাতা জমে আছে একগাদা। ওগুলো দেখতে হবে। তাছাড়া প্রদীপ্তর লেখাপড়া দেখে দিতে হয়। ও একা কুলিয়ে উঠতে পারে না। আলী আহমদ মনে মনে ভাবে, মানুষ যত দূরেই যাক, নিজের বলয়ে ফিরে আসতেই ভালোবাসে।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইলা মিত্র প্যারোলে মুক্তি পেলো। কলকাতায় চিকিৎসার জন্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আলী আহমদের মনে হলো ওর বুক ফুঁড়ে গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। খুব কাছাকাছি সময়ে এমন আনন্দের ঘটনা আর ওর জীবনে ঘটেনি।

খবর শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পুষ্পিতার চোখ, মানুষটা এ যাত্রা বেঁচে গেলো গো। ওখানে চিকিৎসা হবে, স্বামী ছেলেকেও কাছে পাবে।

ঠিকই বলছো।

আলী আহমদ সায় দেয়। এতদিনে ওর মনে হয় ওর নিজের একটা গ্রামোফোন থাকলে আজ প্রাণ ভরে গান শুনতো।

যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে। আলী আহমদের মনে হয় দেশে বেশ একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। 'সংস্কৃতি সংসদ' নাটক মঞ্চস্থ করে, গণসঙ্গীতের আসর করে। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ সাহিত্য সভার আয়োজন করে। পাটুয়াটুলিতে সওগাত অফিসে পাক্ষিক সাহিত্য সভা হয়। নাসিরুদ্দীন সাহেব দরাজ-দিল লোক, সভার সব খরচ বহন করেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ হয়, সেই সঙ্গে শুরু হয় তীব্র আলোচনা, সমালোচনা। কখনো আলোচনা এমন তুঙ্গে ওঠে যে তা খুব জমে যায়। তীব্র, কঠোর সমালোচনা সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে। আলোচনায় হাসান খুব প্রাণবন্ত। আলী আহমদ অংশ গ্রহণ করে কম, প্রায়ই চুপ করে শোনে। ও চুপচাপ মানুষ, খুব সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। শুনতে ওর ভালোলাগে। সেসব নিয়ে গভীরে ভাবতে ভালোলাগে। হাসান মাঝেমাঝে অনুযোগ করে, আপনি কিছু বলেন না কেন আহমদ ভাই?

শুনতেই ভালোলাগে। সবাই যা বলে সেটা আমি নির্জনে নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখি।

বাহ্ বেশ তো। আমরা তো বকবক করেই নিজের চিন্তাগুলো উড়িয়ে দেই।

আলী আহমদ হা-হা করে হাসে। বলে, উড়িয়ে দিচ্ছো কৈ? তুমি তো আমাদের ইতিহাসকে ধরে রেখেছো।

দেখবেন সামনের একুশ কেমন জাঁকালোভাবে উদযাপন করি।

দারুণ হবে। একুশের এই আবেগকে আমাদের ধরে রাখতে হবে।

ঠিক বলেছেন।

বলতে বলতে হাসান লাফিয়ে রিকশায় ওঠে, নওয়াবপুরে যাচ্ছি। ওদিকে যাবেন আহমদ ভাই?

BanglaBook.org

না। আমার একটু কাজ আছে। তুমি যাও।

আলী আহমদ রিকশা নিয়ে বলধা গার্ডেনে আসে। অনেক দিন এখানে আসা হয়নি। ওর ধারণা এখানে এলে ওর ভেতরের অনেককিছু খুলে যায়, নিজেকে দেখতে সুবিধে হয়। চুপচাপ শান-বাঁধানো পুকুরঘাটে বসলে যতদূর চোখ যায় ততদূরই স্বচ্ছ পানির মতো মনে হয়, যেন টলটল করছে। গাছগাছালির ফাঁকে নীল আকাশটাও স্বচ্ছ, মনে হয় ওখানেও জলের স্রোত। চারদিক থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক ওকে আনমনা করে দেয়।

এদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এপ্রিলের দুই তারিখে শেরে বাংলা ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু নির্বাচনের দেড় মাসের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় না। মন্ত্রিসভায় যুক্তফ্রন্টের প্রধান অঙ্গদল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব নেই। দলের ভেতরে কোন্দল চলছে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর থেকে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ চক্র যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কিছুদিনের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের আপস রফা হয় এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য এই ক্ষমতার খেলা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর নীল নকশা তো করাই ছিলো, তারা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা ছাড়বে না। যুক্তফ্রন্টের নেতারা হয় এই চক্রান্তের শিকার। মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের এক সাজানো রিপোর্ট নিয়ে শুরু হয়ে যায় তোলপাড়। কালাহান পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ফজলুল হকের বিবৃতি বিকৃত করে পরিবেশন করে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের নামে করাচিতে পাক-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ববাংলা এই চুক্তির প্রবল বিরোধিতা করে। যা কেন্দ্রের শাসন পছন্দ করতে পারেনি। এদিকে আদমজী মিলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা লাগিয়ে পশ্চিমাগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বলেই ফেলেন যে, এ.কে.ফজলুল হক ভারতের যোগসাজশে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। ফলে মাত্র পয়তাল্লিশ দিনের ব্যবধানে ভেঙে দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা। ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করে পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রের শাসন চালু করা হয়। সেনাবাহিনী টহল দেয়। শেরে বাংলা ফজলুল হককে নিজ গৃহে অন্তরীণ করা হয়। সশস্ত্র পুলিশ তার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। ঢাকা এবং প্রদেশের বিভিন্ন শহরে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় ষোলশত জন কারাবন্দী হয়। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ত্রিশজন পরিষদ সদস্য আছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

অনেক রাত জেগে আলী আহমদ রাস্তায় বুটের শব্দ শোনে। ও ঘুমুতে পারে না। কখনো চেঁচিয়ে ওঠে সৈনিকরা। সে শব্দ শুনে দাঁত কিড়মিড় করে আলী আহমদ। বলে, কুকুরের দল। পুষ্পিতা ওর হাত ধরে টানে, চলো, ঘুমুতে চলো।

আজ আমাকে ঘুমুতে বোলো না। তুমি যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ও জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিস্তব্ধ, নিষ্কম্প শহর। যেন কান পাতলে শোনা যাবে মানুষের দীর্ঘশ্বাস– হাজার, হাজার মানুষ বুঝি রাত জেগে শ্বাস ফেলছে। সে রাতে আলী আহমদের দু'চোখের পাতা এক হয় না।

আস্তে আস্তে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিপন্থী কাজের ওপর নিষ্পেষণ শুরু হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পূর্ববর্তী সরকার ঘোষিত ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়।

'ইত্তেফাক' অফিসে প্রি-সেন্সরশিপ অর্ডার আসে। অনুমতি ছাড়া কোনো সংবাদ ছাপা যাবে না।

রাত জেগে কেবল রবীন্দ্রনাথ পড়ে আলী আহমদ। বারবার মনে হয় রবীন্দ্রনাথই এখন ওর একমাত্র আশ্রয়। অন্য কোনোকিছুতেই মন বসে না। বাঙালির অর্জিত বিজয়কে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নস্যাৎ করা হলো। এই সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালিই পারে বাঙালি জাতিকে আশ্রয় দিতে। এই জাতিকে আবার কতকাল অপেক্ষা করতে হবে আর একটি অভ্যুত্থানের জন্য। আলী আহমদ বারান্দায় বসে নির্নিমেষ আকাশের দিকে তাকায়, রাতের আকাশ। বিড়বিড়িয়ে বলে, রবীন্দ্রনাথ আছে বলেই এখন আমার বেঁচে থাকার সময়। নইলে এই বৈরি সময়ের চারদিকে তো গভীর অন্ধকার।

১৫

বর্ষার প্রবল বন্যায় ভেসে গেলো সারা দেশ। গত কয়েক দশকে এত বড় বন্যা আর হয়নি। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য 'সংস্কৃতি সংসদ' নাটক মঞ্চস্থ করে। সংস্কৃতি কর্মীরা সবাই ব্যস্ত। একদিকে নাটক মঞ্চস্থ করে টাকা সংগ্রহ, অন্যদিকে রিলিফের জোগাড় করা। আলী আহমদ নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় দেশের বড় দুর্দিন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক দুর্যোগ। একদিন কলেজের ছেলেদের নিয়ে ত্রাণকাজে যায়। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় ওর। দেখে গাছের নিচে বসে আছে লোকটি, সামনে একটা পুটলিতে দুটো লুঙি, একটা গেঞ্জি, একটা গামছা। ওর দৃষ্টি বিভ্রান্ত, কাঁচা পাকা চুল এলোমেলো, পায়ে ধুলো, বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে নিশ্বাস পড়ে।

আলী আহমদ ওকে চিঁড়ে এবং গুড়ের একটা প্যাকেট দেয়। লোকটি তাকায়, কিন্তু হাত বাড়িয়ে নেয় না। আলী আহমদ ওর সামনে প্যাকেটটা রেখে চলে যায়।

খিদে থাকলেও লোকটির কোনোকিছু খাবার ইচ্ছে নেই। ও কিছুক্ষণ পরপর চমকে ওঠে। প্রবল কলকল শব্দ ওকে দিশেহারা করে দেয়, ও পালাতে চায় কিন্তু নড়তে পারে না। কে একজন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কিছু খাচ্ছো না যে? তোমার খিদে পায়নি?

ও একমনে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। মাথার উপর গাছটি ঘন সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত বলে ওর তেমন গরম লাগছে না। অন্তত রোদের তাপে চামড়া পুড়ছে না। আর একজন বলে, থাক, বেশি ঘাঁটাস নে। হয়তো পাগল।

ওরা ওর সামনে এক প্যাকেট বিস্কুট রেখে যায়। ও শুনতে পায় ওরা বলতে বলতে যাচ্ছে যে এবারের বন্যা শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা। ওরা যতদূর যায় ওর দৃষ্টি ওদের পিঠ ছুঁয়ে থাকে। ওর মনে হয় ওদের বয়সী ওর একটি মেয়ে আছে। ভিন্ন গাঁয়ে ওর বিয়ে হয়েছে। পানি বাড়ার পর মেয়েটি কেমন আছে ও কিছুই জানে না। কোনো খবরই পায়নি। হয়তো কোনো আশ্রয় শিবিরে উঠেছে। লোকটার ঠোঁট কাঁপে। বলতে থাকে, ও ভালো থাকুক, ভালো থাকুক। বলতে বলতে ওর চোখে জল আসে। আর কাউকে ও ভালো রাখতে পারেনি।

ও পিঠের নিচে পুঁটলি রেখে গাছের কাণ্ডে হেলান দেয়। প্রবল কষ্ট বুকটা খামচে

BanglaBook.org

ধরে রেখেছে, পাঁজরে ব্যথা। ওর ঘুমুতে ইচ্ছে করে কিন্তু ঘুমুনোর জায়গা নেই। ও আশ্রয় শিবিরে যেতে চায় না। মানুষের ভিড়ে ওর দম আটকে আসে। ও জানে ও এইসব মানুষেরই একজন, ওর কোনো আলাদা ঠাঁই নেই, তবু ওর এত মানুষ ভালোলাগে না। দুটো মেয়ে হবার পর ও সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিলো। ওর বউ খুব কেঁদেছিলো একটি ছেলের জন্য, ও কিছুতেই রাজি হয়নি। ওর একটাই উত্তর, এই দুনিয়ায় মানুষের ভিড় বাড়াইয়া লাভ কি বউ? লাভ-লোকসান বুঝি না, আমার একডা পোলা দরকার। পোলা না থাকলে সংসার খালি লাগে। ও হেসে গড়িয়ে পড়তো। বলতো, কি যে কও?

ও বউকে বেশি কিছু বোঝাতে চাইতো না। ও কিছু নিজস্ব নিয়ম মেনে চলতে চায়, এই চলাতে বাধা পড়লে ও ক্ষেপে যায়। ও সবার ওপর বিরক্ত হয়। এখন এই যে দলে দলে লোক ওকে রিলিফ দিয়ে যাচ্ছে, এটাও ওর পছন্দ নয়। ওর এত কিছু প্রয়োজন নেই। একসময় ও এইসব ফেলে রেখে চলে যাবে, কোথায়? একে দু'য়ে ওর সামনে প্রায় দশ-পনেরোটা পুঁটলি জমেছে। ও একটাও খোলেনি। খাবারের গন্ধে আশেপাশে অনেকগুলো কাক ভিড় করেছে। একটা কাকের পা খোঁড়া, লাফিয়ে হাঁটে ওটা। দেখতে মজাই লাগে। একটি ছেলে ওর সামনে উবু হয়ে বসে বলে, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? ক্যাম্পে যাবেন না?

না

কেন?

বেশি ভিড়।

এই প্যাকেটে রুটি আছে। আমরা নিজেরা বানিয়েছি। রাখেন। খাবেন কিন্তু, আপনি তো কিছু খাননি।

ভুখ নাই।

ও।

ওর সঙ্গের ছেলেটি যেতে যেতে বলে, ওর বোধহয় অনেককিছু হারিয়েছে। সেজন্য বেশি শোকে পাথর হয়ে গেছে। আহারে বেচারা!

অন্য দুটি ছেলে ওকে পুরনো জামা দিয়ে যায়। ও চোখ বুঁজে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে থাকে। ওর ভীষণ পিপাসা পেয়েছে, বুকে জ্বালা। কেউ যদি এক মগ পানি দিয়ে যেতো। লোকটির মনে হয় তাহলে ও তার জন্য রাতভর প্রার্থনা করতো।

আলী আহমদ অন্যদিকে রিলিফ দিয়ে আবার লোকটির কাছে আসে। লোকটিকে ওর অন্যরকম মনে হয়। ও লোকটির মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলে, তুমি কোন গাঁয়ের লোক গো?

গাঁ?

ও চোখ বড় করে তাকায়। শুনতে পায় নদীর শব্দ। পাড় ভেঙে এগিয়ে আসছে নদী। ঝপঝপিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটি, প্রবল ঘূর্ণি ঘোলা করে দিয়ে মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। লোকটি চোখ নামিয়ে বলে, গাঁয়ের নাম ফুলতলি।

তোমার আর কেউ নেই?

বউ, মাইয়া আছিলো।

জমিজমা?

না।

বসতবাটি?

অহন নাই।

হালের গরু?

BanglaBook.org

আমি নিজেই তো একডা গরু।

লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আলী আহমদ কিছু বলার আগেই বলে, নিজের জমিতে হাল টানতে টানতে একদিন দেখলাম জমি নদীর মধ্যে তলাইয়া গেলো।

তাই নাকি? তা তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

কোনহানে

শহরে।

কাম দিবেন?

চেষ্টা করবো।

লোকটি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে তাকায়। তারপর বলে, না থাউক। শহরে ফাঁপর লাগে।

সারাদিন তো দেখলাম তুমি একঠায় বসেই থাকলে। কিছুই তো খেলে না।

আমারে এট্টু পানি খাওয়াইবেন?

পানি? আচ্ছা দেখি।

আলী আহমদ পানির খোঁজে যায়। চারদিকে অসংখ্য মানুষ ছোটাছুটি করছে। সবাই ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে। বাড়িতে ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো বউ এবং ছোটো মেয়েটি, যে কেবল কিশোরী হয়ে উঠেছিলো। বলতো, বাবা লও পান্তা খাও, বাবা তোমার পান, বাবা ওজুর পানি দিয়া রাখছি, বাবা হাট থাইকা কদমা আর তেতুঁল আইনো। লোকটি এখন দু'কান ভরে কেবলই বাবা, বাবা শুনতে পায়। ও ভাবে, এই ডাক শুনতে শুনতে ওর এখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠা উচিত, কিন্তু ও কাঁদতে পারছে না। নদীর গর্জনে ওর কান্না আড়াল হয়ে যায়। ও বুক চেপে ধরে।

এই যে পানি নিন। আপনি পানি খেতে চেয়েছিলেন না? স্যার পাঠালেন।

ছাত্রটি ওর দিকে জগ এগিয়ে দেয়। ও এক নিশ্বাসে পানিটুকু খেয়ে ফেলে।

তখন সন্ধ্যা হবো, হবো। চারদিকে থমথমে ভাব। অকস্মাৎ এলাকা অনেক নীরব হয়ে গেছে। লোকটি পা ছড়িয়ে দেয়। ওর সামনে রিলিফের স্তূপ। ওর কোমরে ব্যথা, বুকেও ব্যথা, আরো কোথায় যেন ও ঠিক টের পায় না। ওর মাথা বুকের দিকে ঝুলে আসে। বাড়ি ফেরার আগে আলী আহমদ আবার লোকটির কাছে আসে। বলে, আকাশে মেঘ, বৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া রাত হয়ে এলো। আপনি কোথাও যাবেন না?

লোকটি এবার চেঁচিয়ে ওঠে, আমি কোনহানে যামু? কোনহানে এইসব জিনিস নিমু? নদী আমার সব নিছে। আমি হাটে গেলে নদী আমার বউ, মাইয়া, ভিটা গেরাস করছে। আপনারা খালি কন যাইতে, আমি কোনহানে যামু?

নদীতে ভেঙে পড়া মাটির চাকের মতো মুখ-গহ্বরে ওর জিহ্বা নড়ে এবং ধপ করে থেমে যায়। ওর দু'চোখে প্রবল ঘূর্ণি। ওর ক্রোধ ওকে নদীর মতো গ্রাস করে ফেলে।

আলী আহমদ অন্ধকারে লোকটির মুখ আর পরিষ্কার দেখতে পায় না। ওর খুব কষ্ট হয়, বুকের ভেতরে অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে। লোকটি তখন এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় এবং দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

পরদিন বাজার থেকে ফেরার পথে দেখা হয় শহীদ সাবেরের সঙ্গে। অন্যমনস্ক হেঁটে যায় পথে, হাতে সিগারেট জ্বলতে থাকে। সাবের প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিল। ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষে পড়ার সময়ই গ্রেফতার হয়।

BanglaBook.org

মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির বদৌলতে বন্দী হয় প্রগতিশীল চিন্তার বাহক সাবের। প্রথমে চট্টগ্রাম জেল, তারপর রাজশাহী জেলে বদলি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় ছাড়া পেয়ে বেরিয়েছে। চার বছরের জেল জীবন। জেলে বসেই ইন্টারমিডিয়েট পাস করে। তারপর জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে কিছুদিন স্কুলে চাকুরি করে। এখন 'সংবাদ'-এর সহকারী সম্পাদক। সংবাদ অফিসে যাওয়া-আসার সূত্রে সাবেরের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে আলী আহমদের। কখনো গভীর চোখ তুলে তাকিয়ে বলে, শুনেছেন তো সরকারের ভাষ্য? বামপন্থী মানেই রাষ্ট্রদোহী।

তারপর হা-হা করে হাসে। আলী আহমদ চুপ করে থাকে। সাবেরের হাসি শোনে। আজ পথে দেখা হতেই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে আসে, কেমন হলো আপনার রিলিফের কাজ?

ভালো। দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

অভিজ্ঞতায় তো আপনি লাভবান হবেন। গল্প লিখতে পারবেন। কিন্তু দেশের কি লাভ?

মানে? আলী আহমদ থতমত খেয়ে বলে।

এই যে রিলিফ দিয়ে এলেন, তাতে তো জনগণের ভিক্ষার হাত শক্তিশালী করে এলেন। এসব করার পাশাপাশি বন্যার স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমি পত্রিকায় উপ-সম্পাকীয় লিখবো ঠিক করেছি।

ভালো, খুব ভালো। আপনি শুরু করুন। আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমিও আপনার মতো ভাবছি। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেয়ে স্থায়ী সমাধান অনেক বেশি কাম্য।

আলী আহমদের কথা শেষ হতে না হতেই সাবের হাঁটতে শুরু করে। অর্ধেক পুড়ে যাওয়া সিগারেট জোরসে টানে। তারপর ফেলে দেয়। কিছুই ভালো লাগে না। জেলে আটক থাকাকালে বাবার বারবার অনুরোধেও বণ্ড সই করে বেরিয়ে আসতে রাজি হয়নি। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেনি। কিন্তু এখন ক্রমাগত নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে ওকে। এত সমস্যা চারদিকে, অথচ সামান্যতম সমস্যা সমাধানে অপারগ সরকার। সাধারণ মানুষ যেমন ছিলো তেমনই আছে। এদিকে ওর বাবা রিটায়ার করেছে। সাংসারিক দায়িত্ব অনেক। ফেডারেল ইনফরমেশন সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো রেজাল্ট হয়নি। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে আসে ও। বাম পায়ের হাঁটুর ওপর ডান পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। সকাল থেকে মন ভালো নেই। ভালো না থাকার কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই ভালো নেই। কখনো মেঘলা দিনে মন ভালো থাকে না– কখনো বুক ভেঙে প্রচণ্ড কান্না আসে। ইদানীং মনটা খুব দ্রুত খাঁ খাঁ করে ওঠে। তখন নিজের ওপর রাগ হয়। বাইরে গুমোট ঘরেও তিষ্টানো দায়, তবু নড়ে না ও। বিছানাকেই প্রিয় জায়গা মনে হয়। পুরনো বাড়িটার নোনা-ধরা দেয়ালে, ছাদে দৃষ্টি ইতস্তত ঘোরে। সাদা দেয়ালে ঐ দাগগুলোর মতো হতাশা গ্রাস করছে ওকে। এই কী চেয়েছিলো? এই কী স্বপ্ন ছিলো? চার বছর বিনা বিচারে জেল খেটে এখন ও দারুণভাবে বিপর্যস্ত। একটু পরে ও পা বদল করে। ডান পায়ের ওপর বাম পা রাখে। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। দিয়াশলাই নেই। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। উঠতেও ইচ্ছে করে না, অথচ সিগারেটের জন্য মাথায় দারুণ টান ধরেছে। আসলে সক্রিয় না হলে কোনোকিছু হাতের মুঠোয় আসে না। ওর হাসি পায়। ছাত্র ফেডারেশনের রাজনৈতিক কর্মী শহীদ সাবের কি অবাস্তব ভাবনা ভাবছে! সংগ্রাম যার জীবনের লক্ষ্য সে কি না অনায়াসে সবকিছু হাতের মুঠোয় পেতে চায়। হঠাৎ হা-হা করে হেসে ওঠে ও। প্রচণ্ড হাসিতে ঘর ভরিয়ে দেয়। একা

BanglaBook.org

থাকার এই সুবিধে, যা কিছু খুশি তা করা যায়– কেউ ছুটে আসবে না, কেউ পাগল ভাববে না, কারো কাছে বিব্রত হতে হবে না। কিন্তু পরক্ষণে আবার চুপসে যায়। এই কী চেয়েছিলো ও? এই একা থাকার স্বস্তি তো ওর কাম্য নয়। সব বোধ কেমন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এক প্রচণ্ড শূন্যতা চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। ও ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। মাঝে মাঝে বুকে কেমন চাপ লাগে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ঘরে একটুক্ষণ পায়চারি করে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট আর দিয়াশলাই কিনে আনে। পাশের বাড়ির ছেলেটি ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

সাবের ভাই কেমন আছেন?

আমীর তুমি? অনেকদিন দেখিনি তোমাকে?

পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

কেমন হলো পরীক্ষা?

ভালো।

এসো আমার ঘরে।

আমীর ওর পিছে পিছে ঘরে এসে ঢোকে।

জানেন সাবের ভাই আপনার ঘরে আসতে আমার ভয় করে।

কেন?

বাবা বকে।

আমার অপরাধ? সাবের কৌতুকে ওর দিকে তাকায়। আমি কি বাঘ না ভালুক?

আমীর গম্ভীর হয়ে বলে, তারচেয়েও বেশি।

তাই নাকি? সাবের হো-হো করে হাসে– আবার সেই প্রাণখোলা ঘর ফাটানো হাসি। এমন করে হাসতে পারলে ওর বুকের ভার কমে কিছুটা স্বস্তি হয়। কিন্তু হাসতে পারে না, হাসা হয় না। বিষণ্নতা জাপটে ধরে রাখে।

আপনি এমন বুক-ভরা হাসি কেমন করে যে হাসেন? আপনার কখনো অসুখ হবে না।

আমীরের চোখে চোখ রেখে সাবের বলে, আমি জানি আমার কোনোদিন হার্টের অসুখ হবে না, আমার অসুখ হবে মগজের।

যাহ্ কী যে বলেন?

ঠিকই বলি আমীর। তুমি ইন্টারমিডিয়েট দিয়েছো, তোমার এখন অনেক কিছু বোঝার বয়স হয়েছে। তুমি নিজেও জানো তুমি আমাকে কেন ভয় পাও। জানো না?

আমীর সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে।

আমি রাজনীতি করি, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। সবচেয়ে বড় কথা কম্যুনিস্ট। জেল খেটেছি। এসব কারণে তোমার বাবাদের মতো লোকেরা তোমাদেরকে আমার সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না।

আমীর মাথা নীচু করে থাকে।

তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই আমীর। এটাই বাস্তব সত্য। তুমি একা লজ্জা পেলে এই সমাজের কিছু আসবে যাবে না।

উত্তেজিত সাবের কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ পায়চারি করে। আমীর মাথা নীচু করে নখ খোটে। সাবেরের লেখা ওর খুব ভালোলাগে, সাবেরের সঙ্গে ও মিশতে চায়, কিন্তু বাবার শাসন ওকে দমিয়ে রাখে। ও মাথা উঠিয়ে দ্রুত বলে, সাবের ভাই দুঃখ পাবেন না। আপনার লেখা আমার খুব ভালোলাগে।

সাবের হো-হো করে হেসে ওঠে।

BanglaBook.org

হাসবেন না সাবের ভাই। আমি বুঝি কম। কিন্তু কলকাতার 'নতুন সাহিত্যে' প্রকাশিত আপনার লেখা 'আরেক দুনিয়া থেকে' আমার দারুণ লেগেছে। আপনি তো জেলে বসে লিখেছিলেন তাই না?

হ্যাঁ।

সাবের পায়চারি করতে করতে মাথা নাড়ে। ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। দেয়ালে টিকটিকি শব্দ করে, তারপর ঝপ করে পড়ে যায়। আমীর নোনা-ধরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। ও সাবেরকে আড়চোখে দেখে। ওর মনে হয় মানুষটির এক তীব্র আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণ ব্যক্তিত্বের। ও জানে মুসলিম লীগ সরকারের কাছে সাবের এক ভীতিকর জীব, কম্যুনিস্ট। ওর বাবা যখন সাবের সম্পর্কে বলে তখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গালি দেয়। ভাবলে আমীরের গা শিউরে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে ও ভাবে জেলে ছিলো বলেই সাবেরের হাত থেকে একটি লেখা বেরিয়েছে। জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই বৃথা যায় না।

সাবের গম্ভীর, চিন্তাযুক্ত। সিগারেট জ্বালায় একটা। সামনে অন্ধকার পথ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বুকে সাহস আছে, প্রতিরোধের শক্তি আছে, তাই পথ চলতে পারছে। কিন্তু এ শক্তি ফুরিয়ে গেলে মুখ থুবড়ে পড়তেই হবে। পারিপার্শ্বিকের কোনো সহযোগিতার হাত নেই। বৈরী পরিবেশ আঘাত করার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। ভেবেছিলো সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর খুব অনায়াসে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের ভাত হবে, আশ্রয় হবে। কিন্তু কোথায় কী? সবই তো কালো ধোঁয়া ও বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আপনি কি ভাবছেন সাবের ভাই?

যাকগে এসব কথা। তুমি চা খাবে?

চা? ঘরে তো চা নেই?

না, মোড়ের দোকানে বসবো।

দোকানে? না থাক।

ও ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার সঙ্গে তোমাকে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

বারবার এই কথা বললে আমার খুব কষ্ট হয় সাবের ভাই।

আমীরের কণ্ঠ রুদ্ধ। ছেলেমানুষীতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

ছিঃ আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি।

সাবের ওর ঘাড়ে হাত রাখে। চুল এলোমেলো করে দেয়।

বোকা ছেলে, মন ভালো করে ফেলো। যখন সুযোগ পাও আমার কাছে এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমারও ভালোলাগে।

দেখবেন, আমি একদিন সবার শেকল ভেঙে বেরিয়ে আসবো।

বাহ্ এইতো চাই।

আমীর উঠে দাঁড়ায়। ওর দু'চোখে তারুণ্যের দৃষ্টি শাণিত। সাবেরের মনে হয় ওর চাউনিতে গাঢ় নীল রঙ আছে। সে রঙের প্রতিভাস এই ঘর আলোকিত করে ফেলে। এই রঙ সামনে থাকলে পথ চলায় ভুল হয় না, পথ হারায় না। আমীর সাবেরের সামনে একরাশ আলো রেখে চলে যায়। ওর মনে হয় জীবনের এতগুলো বছর স্নিগ্ধ হয়ে গেলো, কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। আলো হতাশা কাটিয়ে দেয়, বিষণ্নতা ধুয়েমুছে সাফ করে। ও আবার সিগারেট ধরায়। দেয়ালে নতুন টিকটিকি। সাবের আবার চৌকির ওপর চিৎপাত হয়। ছবি বদলে গেলে ওর মনে কবিতার লাইন আসে। বালিশের নিচ থেকে ডায়রিটা টেনে লিখে : তিনটে কথা/ আমার জন্য আছে/ যদি আমি/ হারিয়ে ফেলি পাছে/ ভাবছি বসে অনেকগুলি কথা/ সোনার মতো/ কয়েকটি তার কথা।

BanglaBook.org

কবিতাটি লিখে আবার কাটে। ক্রস করে রেখে ডায়রি বন্ধ করে দেয়। গতকাল মায়ের একটি চিঠি এসেছে। কক্সবাজারের ঈদগাঁ গ্রাম থেকে মায়ের চিঠি এলে ও বিষণ্ন হয়ে যায়। এই চিঠি ওর স্বস্তি নয়, আনন্দ নয়। বাবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং মায়ের নিঃসঙ্গ জীবন দুটোই সাবেরের জন্য এক প্রচণ্ড মানসিক চাপ। ভাবলে পারিপার্শ্বিকের রঙ বদলে যায়। মা ওকে ফেরার জন্য লিখেছেন। কোথায় বাড়ি? সব যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার বাড়ি নেই, আমার কেউ নেই– ও বিড়বিড় করে। ইদানীং এমন হয়। একটা কথা মগজে গেঁথে গেলে সেটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ওকে। ওটা থেকে মুক্তি পেতে সময় লাগে, তখন এক অসহ্য যন্ত্রণায় বুক মোচড়ায়। সিগারেট একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে। এর মতো প্রিয় জিনিস আর হয় না। সিগারেটকে ও একজন মানুষের মতো ভাবছে, প্রিয় মানুষ। তখন ওর মনে হয় এখনো কারো সঙ্গে প্রেম করা হলো না। পঁচিশ বছর একজন যুবকের প্রেমে পড়ার জন্য যথেষ্ট বয়স। কোথা দিয়ে কেমন করে এত বয়স গেলো টেরই করতে পারলো না। মাথা কেমন ঝিমঝিম করে। ইদানীং রেবাকে ভালোলাগে, রেবার হাসি বুক জুড়িয়ে দেয়, কিন্তু রেবাকে তা বলা হয় না। বলতে সংকোচ লাগে। মাঝে-মাঝে হতাশ হয়ে যায়, হয়তো কোনোদিনই কাউকে বলা হবে না যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কেমন করে বলতে হয়? নিজে নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠে। এই বলার প্রস্তুতি নিতে নিতেই যৌবন ফুরিয়ে যাবে। করিমও এই কথা বলে, তোকে দিয়ে কিছু হবে না সাবের?

ও চুপ করে থাকে। পরক্ষণে জেদের সঙ্গে বলে, ভালোবাসার জন্য বুকে আমার তৃষ্ণা আছে। ঐ দিয়ে কি হবে? মুখে যদি কথা না ফোটে?

করিম বিরক্তির সঙ্গে বলে, তোর মতো ছেলে আমি দেখিনি। ভেতরে গুমরে মরবি, অথচ তোর সংকোচ কাটবে না।

সাবের করিমের হাত চেপে ধরে।

আমিও নিজেকে বুঝি না করিম। যন্ত্রণা লালন করতে ভালোলাগে। এক ধরনের আনন্দ পাই। তখনো সাবেরের দৃষ্টিতে ফ্যাকাশে হলুদ রোদের আভা থাকে। করিমের মায়া হয় ওর জন্যে। সাবেরের মনে হয় কোনোকিছু ঠিকমতো পাওয়ার আগেই ওর নাগালের বাইরে চলে যায়। এই চলে যাওয়াটা আয়ত্তে আনতে পারে না বলে ওর যতো কষ্ট। বাবার সঙ্গে মায়ের জটিল সম্পর্ক কৈশোরে ওর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা নষ্ট করেছে। ও অনেক কিছু বুঝতো না, অনেক কিছুই জানতে পারেনি। এই না বোঝার যন্ত্রণায় ও ছটফটিয়েছে। তারপর এক সময় নিজের মনের মধ্যে গুম হয়ে গেছে। ভেবেছিলো, রাজনীতির উজ্জ্বল আলোয় সব অন্ধকার কেটে যাবে, কিন্তু দেখলো যৌবন আরো যন্ত্রণাময়। রাজনীতি বিষাক্ত সাপ, সুস্থ চিন্তা নেই, পরিবেশ নেই, আছে উৎপীড়ন, আছে যন্ত্রণা, প্রতারণা। এখানে রাজনীতির জন্য অমিত যৌবন দরকার, অসুরিক শক্তি দরকার, নইলে অচলায়তন ঠেলে এগুনো যায় না। স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি ও চায়নি। ও চেয়েছিলো সত্যিকার অর্থে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু সে পথের প্রবল কাঁটা ওকে ক্ষতবিক্ষত করে। ও ক্রমাগত ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে।

খুব ভোরে নওয়াবপুরের রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটে সাবের। ওর প্রিয় রাস্তা, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, খালি পা ইত্যাদি ওকে স্বস্তি দেয়। এমন জিনিস ওর আনন্দ যা অন্যের কাছে কিছুটা পাগলামির মতো। অত ভোরে রাস্তায় লোক কম থাকে, গাড়ি, রিকশা নেই। রাজার মতো মনে হয় নিজেকে। ইচ্ছেমতো সড়কজুড়ে হাঁটা যায়। তখন বিষণ্নতা কেটে যায়, সারারাত ধরে মাথায় যে পোকাগুলো কিলবিল করে সেগুলো নিস্তেজ হয়ে থাকে। রাজনীতির ওপর ওর এখন ঘৃণা। এই বোধে আক্রান্ত হলে ওর মাথা ঝিম হয়ে থাকে। সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সেজন্যই ও খুব ভোরে কখনো প্রায় অন্ধকার থাকতে

BanglaBook.org

নওয়াবপুরের রাস্তায় আসে। এখানে এলে ও কৈশোরে চলে যায়, যেন একটা বিশাল মাঠের মাঝ দিয়ে ও আর হাস্না দৌড়াচ্ছে। ছোটো নদীটার ধার পর্যন্ত পৌঁছাতেই হবে ওদের। ঐখানে বন-বরইয়ের গাছ আছে। হাস্নার কোঁচড় ভরে বন-বরই দিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। এক ভীষণ নির্জন দুপুরে হাস্নাকে চুমু খেয়ে সারারাত ঘুমুতে পারেনি ও। কী আনন্দ, কী উত্তেজনা! ভয়ে হাস্না কেঁদে ফেলেছিলো। ও নিজেও বিমূঢ় হয়েছিলো অনেকক্ষণ। ভয়ে ভয়ে হাস্নার হাত ধরে বলেছিলো, তুই রাগ করেছিস হাস্না?

হাস্না শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে লাল করে ফেলে। সাবের বুঝতে পারেনি যে অত কান্নার কী হয়েছিলো। অস্থির হয়ে আবার জিজ্ঞেস করেছিলো, তুই রাগ করেছিস হাস্না?

হ্যাঁ। হাস্নার চোখ-মুখের কপট গাম্ভীর্য ও ধরতে পারেনি।

আমি আর কখনো অমন করবো না হাস্না, সত্যি বলছি।

সাবেরের অনুনয়ে হাস্না ফিক করে হেসে ফেলে, তুই একটা গাধা।

সেই চুমু খাওয়ার কথা কোনোদিনই কাউকে বলা হয়নি। বুকের ভেতরে কেবলই কথা চাপা পড়ে। এতকিছু একদিন ফসিল হয়ে যাবে। সাবের বিড়বিড় করে, আমি নিজেও কী একদিন ফসিল হবো! করিম বলে, তুই বড্ড চাপা ছেলে সাবের। কখনো মনের কথা বলে হালকা হতে হয় রে। নইলে অসুখ হবে।

কি অসুখ হবে? কি অসুখ হয়? সাবের নির্জন রাস্তায় একা একা কথা বলে। বাড়িঘর, দোকানপাট, লাইটপোস্ট সাক্ষী, আমি একদিন ফসিল হবো। তখন নওয়াবপুরের রাস্তাটা ওর কাছে সেই ছোটো নদী হয়ে যায়। সেখানে এখন আর হাস্না নেই। জীবনের একটা বিশেষ সময়ের পর আর হাস্নারা থাকে না। ওরা হারিয়ে যায়। জীবনভর খুঁজেও কোথাও আর পাওয়া যায় না। এই রাস্তায় যদি একদিন হাস্নার সঙ্গে দেখা হয়? আহ্ জুড়িয়ে যাবে হৃদয়। সাবের চুলের মধ্যে হাত বুলোয়। সেই একদিনের সেই একবারের স্মৃতি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। জীবনে কোনো কোনো ঘটনা কি একবারই ঘটে? হাস্না আর কোনোদিন ওর সঙ্গে নদীর ধারে আসেনি। সেই ঘটনার কয়েকমাস পর ওর বিয়ে হলে ও স্বামীর সঙ্গে কলকাতা চলে যায়। এখন হাস্না কেমন আছে? এত বছর পরও ওকে কেন নতুন করে মনে পড়ছে? কি যে খারাপ লাগে ইদানীং। সবকিছুর অর্থ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ও যেন ক্রমাগত চেনা জগৎ থেকে ছিটকে পড়ছে। চলে যাচ্ছে এক নির্জন দ্বীপে। সে দ্বীপে পাখি নেই, ফুল নেই, আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আহ্ আমার কেন এমন হয়? সাবের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর থেকে ওর কিছু ভালোলাগছে না। কেবলই কিশোর বয়সটা ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। হাস্নার মুখ ভেসে ওঠে। যদিও সে মুখের কোনো নির্দিষ্ট রেখা নেই, এলোমেলো তালগোলপাকানো চেহারা। কখনো মায়ের ওপর রাগ হয়। মা বাবার চাকরিস্থলে না গিয়ে সরাজীবন নানার সংসারে কাটালো। নানা ওর মাকে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছিলো। কেন মা বাবার কাছ থেকে দূরে থাকতো? ও কিছু বুঝতে পারে না। বাবা কি অভিমানে আবার বিয়ে করলো! এইসব ভাবনাগুলো ও তো কবেই বাতিল করে দিয়েছিলো, অথচ ইদানীং এগুলোই মাথার মধ্যে বেশি করে ভর করে। কষ্ট বাড়তে বাড়তে লম্বা দড়ি হয়ে কষ্ট পেঁচিয়ে ধরে। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'হাত উপরে তুলে ও চিৎকার করে, মুক্তি চাই, মুক্তি।

সেই সময় আমীর ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, সাবের ভাই আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

নিজের সঙ্গে।

আপনি তো বেশ মজার লোক।

BanglaBook.org

তখন সাবের আমীরের চোখে চোখ ফেলে। দেখে নীল রঙ– দেখে আমীরের চোখে পঞ্চাশের ঢাকার ছবি।

তুমি যে আমার সঙ্গে কথা বলছো তোমার বাবা বকবে না?

আমি বাবার শেকল ভেঙেছি সাবের ভাই।

সত্যি বলছো?

সাবের চেঁচিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। তখন ওর চমক ভাঙে। কোথায় আমীর? আসলে ও নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলো। রাস্তায় লোক চলাচল বেশি হতে শুরু করলে ও ফিরে আসে। গলির মোড়ের চায়ের দোকানে ঢোকে। প্রতিদিনের খদ্দের ও। ওকে দেখে হাবলু একগাল হেসে কাছে এসে দাঁড়ায়।

কি দিমু স্যার?

আগে পানি।

হাবলু জানে কতক্ষণ বসে যে ঐ এক গ্লাস পানি খাবে সাবের। তারপর ডালপুরি সঙ্গে তিন কাপ চা। মানুষটি ওকে অবাক করে। কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। গ্লাসের পানি শেষ না হলে ডালপুরি দেওয়া নিষেধ। অপেক্ষা করতে হয় হাবলুকে, খেয়াল রাখতে হয়। একদিন দোকানে কেউ ছিলো না, মালিকও না। ও চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে সাবেরের সঙ্গে আলাপ জুড়েছিলো।

আপনার বউ নাই ক্যান স্যার?

কে বললো তোকে যে বউ নাই?

বউ থাকলে কেউ দোকানে নাস্তা খায়?

ও তাই তো! তুই ঠিক ধরেছিস।

সাবেরের হাসি ছাদ ছুঁয়ে যায়।

আমার বিয়েতে তোকে দাওয়াত দেবো? যাবি?

হ্যাঁ।

উজ্জ্বল হাসিতে হাবলুর চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাবের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কত দ্রুত মানুষের অভিব্যক্তি পাল্টে যায়। হাবলুর চেহারার এই আনন্দ ও আর কোথাও দেখেনি, কোথাও না, কারো মুখে না। সেদিন থেকে হাবলু ওর কাছে একজন ভিন্ন মানুষ, একদম আলাদা। ভিড়ের মধ্যে ওকে চিনে নেওয়া যায়। সাবের ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে বলে ঠিক করে। কিন্তু প্লটটা ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারছে না। এইসব ঘর ছাড়া ছেলেগুলো ওকে বড় বেশি বিব্রত করে। এদের কথা ভাবতে ভাবতে ও একদিন নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলো। নতুন দেশ ওকে আশীর্বাদ করেছিলো। এখন ও দলছুট, ওদেরই মতো স্বপ্ন-বিচ্যুত ঘরছাড়া বালক। সাবের ঢকঢক করে পানি খায়। বুকে তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। মগজে প্রচণ্ড শূন্যতা। ওকে দিয়ে আর বুঝি কিছু হলো না। এই এক জীবনে ওর পক্ষে আর কিছু সম্ভব নয়। ও নিজের হাত মুঠো করে, আঙুলগুলো কেমন বিবর্ণ, শক্তিহীন। খুব কষ্ট হয়। গ্লাসটা ঠক করে টেবিলের ওপর রাখে।

হাবলু?

ও দৌড়ে আসে।

আর এক গ্লাস পানি?

আপনে তো এত তাড়াতাড়ি খান না।

সাবের কথা বলে না। ও হাবলুর চোখ দেখে। যেন ও আর একজন আমীরকে দেখেছে।

স্যার, আপনের কি হইছে?

BanglaBook.org

তখন ও শুধু হেসে মাথা নাড়ে। হাবলুর মাথায় হাত রাখে।

যা, আমার জন্য পানি নিয়ে আয়।

আরো এক গ্লাস পানি খেতে খেতে ওর মনে হয় আজ বিকেলে ও রেবার কাছে যাবে, ভালোবাসার কথা বলবে। আজ বিকেলে ও নিজেকে উজাড় করে দেবে।

দুপুরে 'সংবাদ' অফিসে করিম ওকে চেপে ধরে।

তোকে আজ খুশি খুশি দেখাচ্ছে সাবের?

তুই একটু বেশি দেখিস।

তোর মুখে আলগা জ্যোতি রে। যে কেউই তোকে দেখলে বুঝতে পারবে।

মনে হচ্ছে আজ দখিনা দুয়ার খোলা।

বাহ্ বেশ। এমন থাকলেই তো পারিস। না কেবল গুম হয়ে থাকা।

তুই তো জানিস করিম আমি মুহূর্তে ছিটকে পড়ি আনন্দলোক থেকে। কেন এমন হয় নিজেও বুঝি না রে।

বাদ দে এসব কথা। আজ তোকে আমাদের চা-সিঙ্গাড়া খাওয়াতে হবে।

কেন?

আমরা সবাই ঠিক করেছি তোর উপ-সম্পাদকীয় সেলিব্রেট করবো। যা লিখেছিস না, দারুণ।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তোর লেখা।

তখন হৈ-চৈ করে আরো অনেকে এসে পড়ে।

সাবের ভাই চা-সিঙ্গাড়া।

সাবেরের মুখ লাল হয়ে ওঠে। প্রশংসায় ও লজ্জা পায়।

লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সাবের ভাই। আজকের প্রশংসা আপনার একদম ন্যায্যপাওনা।

আমরা কি কখনো এমন করে আপনাকে কোনোদিন বলেছি?

সবাই যখন চায়ের কাপে ঝড় তুলেছে তখন সাবের বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আজকের দিনটি সত্যি ভালো। এমন দিন প্রতিদিন হয় না কেন?

করিম উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, ওর লেখা উপ-সম্পাদকীয় পড়লে মনে হয় যে বিষয়ে ও লিখেছে সে বিষয়ের ওপরই ও মাস্টার। পড়লে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

সাবের আনমনে শোনে। ভালোইলাগে। কখনো মনে হয় ওরা কি একটু বেশি বলছে? এসব কি ওর প্রাপ্য? বুক চেপে গিয়েছে। আনন্দ নেই। আজ ওর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা কিন্তু একগলা বিষণ্নতা আটকে আছে। শ্যাওলার মতো বিষণ্নতা, আনন্দ পিছলে পড়ে যায়। সাবেরের সাধ্য নেই যে ধরে রাখে।

এই তোর কি হলো?

করিম কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। সাবের মৃদু হাসে।

তোকে নিয়ে পারা গেলো না। তুই বড় বেশি নিজের মধ্যে ডুবে থাকিস। এমন করলে মরে যাবি। একটু বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর।

স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে করিম।

করিম ভাই আপনারা যে কি শুরু করলেন। আনন্দের মুহূর্ত নষ্ট করা খুব বাজে ব্যাপার। তাহের রাগ করে উঠলে বাকিরা ওকে সমর্থন করে। সাবের শূন্য দৃষ্টিতে চা খায়। তরুণ ছেলেগুলো নিজেদের আলোচনায় মুগ্ধ। ওরা এখন বৃহৎ শক্তিগুলোর মাথামুণ্ডু চিবিয়ে খাচ্ছে। সাবের ওদের দেখে। ওরা এখন কেউ আর স্ব-চেহারায় নেই। ওর মনে হয় প্রতিটি

BanglaBook.org

মুখে ভিন্ন মানচিত্রের আদল, এবড়ো-খেবড়ো, রক্তাক্ত, যুদ্ধরত। মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে ওরা বুলেটবিদ্ধ স্বদেশ। সে স্বদেশে সবুজ পত্রাদি ঝরে যায়, স্রোতস্বিনী রুদ্ধ, পাখির ডাক নেই, সে স্বদেশ বারুদের গন্ধে ম ম। বুলেটের শব্দে কম্পমান। মনে পড়ে নিজের জন্ম সময়ের কথা। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরের এক শীতার্ত রাতে ওর জন্ম। অথচ তখন কক্সবাজারের অখ্যাত গ্রাম ঈদগাঁর শান্ত অনাবিল গ্রামীণ জীবনের নারকেলি-হাওয়ার সন্ধ্যায় সূর্যসেন কিংবদন্তীর নায়ক। মায়ের ঘুম পাড়ানিয়া গানের কণ্ঠে ভেসে আসে বুলেটের শব্দ। বারুদের গন্ধ। সূর্যসেন স্বদেশ প্রেমের এক জ্বলন্ত শিখা। মানুষের মুখে মুখে তার নাম। স্বাধীনতা চাই, চাই স্বদেশের মুক্তি। গোলামির রাজত্ব আর নয়, ভেঙে ফেলো শেকল, উড়িয়ে দাও শাসন-শোষণ। ওর দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সব কেমন মিথ্যে হয়ে গেলো। এই পঞ্চাশের দশকে বসে ওর আবার সূর্যসেন হতে ইচ্ছে করে। জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। ব্রিটিশ নেই, আছে মুসলিম লীগ। শুধু পুরনো বোতলে নতুন মদ। এসব ভাবলে মাথা কেমন ঝিম মেরে যায়, দৃষ্টি হলুদ হয়ে আসে। অসম্ভব যন্ত্রণায় বুক মোচড়ায়। করিম ওকে বুঝতে পারে। ওর মুখের ভাঁজ বদলে গেলেই বলবে, তুই আবার রাজনীতিতে ফিরে যাচ্ছিস সাবের? তুই না সব ছেড়ে দিয়েছিস?

ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া যায়? সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করি, মন তো সারাক্ষণ কুরে কুরে খায়। অন্য ছেলেরা হৈ-হৈ করে চা-সিঙ্গাড়া খেয়ে উঠে যাচ্ছে। ওদের সরব কণ্ঠে আগুনে-দীপ্তি। সাবেরের মনে হয় এই বয়সটা ও হারিয়েছে। এখন ওর চারদিকে স্থবির সময়। এই সময় নড়তে চায় না, ঠেললে এগোয় না। কেবল চেপে বসে। মন খারাপ হয়ে যায়। বারবারই মনে হয় এর থেকে ওর মুক্তি নেই।

নিজের ডেস্কে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন পায়। কদিন ধরে এই ফোনটা পাচ্ছে। নারী কণ্ঠ, যেমন মিষ্টি তেমন সুরেলা। শুনলে বুকের ভেতর সুখের কাঁপন জাগে। ওর গল্পের দারুণ ভক্ত। বিশেষ করে 'বিষকন্যা' গল্পটা নাকি দারুণ ভালোলেগেছে। অথচ পরিচয় দেয় না, নাম বলে না। আজ ও দুই তিন বার হ্যালো, হ্যালো করার পরও সাবের সাড়া দেয় না। নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দের পতন শোনে। মনে হয় যেন শরীরের চরাচর বৃষ্টিপাতে ভেসে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে সে কণ্ঠ বলে, আপনি কথা না বললে রেখে দিচ্ছি?

বলুন, আমি তো শুনছি। বুক জুড়িয়ে শুনছি।

তাই?

খিলখিল হাসি ভেসে আসে। সাবের মনে মনে বলে, আহ্ কী সুখ! আজকের দিনটাই আনন্দের।

আপনি কেমন আছেন?

ভালো, ভীষণ ভালো। আজকের দিনটা দারুণ আনন্দের।

কেমন!

একি আর বলে বোঝানো যায়।

তা তো ঠিকই। আপনারা বলে বোঝান না, লিখে প্রকাশ করেন। লেখকদের নিয়ে এই এক জ্বালা।

এটাই তো বাড়তি লাভ। এজন্যই এমন মধুর, বুক জুড়ানো কণ্ঠে প্রশংসা শুনতে পাই।

আপনি এত সুন্দর করে কথা বলেন যে মনে হয় দিনভর শুনি। এখন কি লিখেছেন?

একটা গল্পে হাত দিয়েছি।

বলুন না বিষয় কি?

BanglaBook.org

না, এখনই বলবো না। কাগজে পড়বেন।

কেন আগে শুনলে কি খুব কাছের মানুষ হয়ে যাবো?

কাছের মানুষ তো হয়েই আছেন।

কেমন করে? আমাকে তো দেখলেনই না!

দেখার আর দরকার নেই। যেভাবে কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌছলেন মনে হয় আপনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের...

ওপাশের কণ্ঠ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কেবল নিশ্বাস ভেসে আসে। কেউ সামনে না থাকলে, কারো চেহারার অভিব্যক্তি দেখতে না হলে ওর অর্গল খুলে যায়। কথা গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন সাবের নিজের উপর খুশি হয়।

কি কথা বলছেন না যে?

বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি।

সাবের হো-হো করে হাসে। হাসি থামলে ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে আসে, আপনার হাসি বড় নির্মল। যেন সাফল্য ধুয়ে মুছে দেয়।

আপনার হাসি এত সুন্দর, যেন স্বর্গীয় মাধুর্য আছে।

বাহ্ আমরা পরস্পরকে বেশ প্রশংসা করছি।

এভাবেই ভালোবাসা টিকে থাকে। মুগ্ধতা ভালোবাসার প্রাথমিক শর্ত।

লাইনটা কেটে যায়। আর কথা নেই।

রিসিভার হাতে নিয়ে হঠাৎ করে সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ভীষণ ওলোট-পালোট অবস্থা। এই একটি টেলিফোন ওকে অন্য মানুষ করে, আবেগসর্বস্ব, ভালোবাসাময়, পরিপূর্ণ মানুষ। তখন নিজের ওপর আস্থা বাড়ে। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে কারো সামনে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি আমার। কিন্তু হয় না কেন? পারে না কেন? রিসিভার রেখে দেওয়ার পর মন কেমন খারাপ হয়ে যায়। আবার সেই সর্বগ্রাসী শূন্যতা হা-হা করে। ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে করিম এগিয়ে আসে, কিরে খুব জমিয়েছিস মনে হয়?

এখনো বায়বীয়। কথা কয়, ধরা দেয় না।

আমরা তো ওটুকুও পারলাম না। একেই বলে কপাল।

করিমের কৃত্রিম অনুযোগ সাবের উপভোগ করে। আজ সবকিছুই ভালোলাগছে, মৃদু হাসে ও।

করিম ওর ঘাড়ে হাত রাখে, কেমন বুঝছিস?

হ্যাঁ, বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।

ঐ কণ্ঠ শুনলে তুই পাগল হয়ে যাবি। আর হাসিস না, আমি বর্ণনা করতে পারবো না। সাবের দু'হাতে বুক চেপে ধরে চেয়ারে হেলান দেয়।

যাক তোর উন্নতি হচ্ছে দেখে আমার ভালোই লাগছে।

ভাগ এখন শালা। আনন্দ লালন করছি।

করিম চলে গেলে সাবের খবর কাগজে ডুবে যায়। পড়া হয় না। মুদ্রিত পৃষ্ঠা মুছে যায়। ভেসে ওঠে আঁকাবাকা সোনালি রেখা, আঁকা হয় একটি মুখ। মনমতো হয় না। কতবার আঁকা হয়, কতবার ভেঙে যায়। এই অদৃশ্যকে বাস্তবে আনার প্রাণান্ত প্রয়াস কেমন এক ভয়ঙ্কর খেলা বলে মনে হয় ওর কাছে। পরক্ষণে সেই কণ্ঠের ওপর রাগ হয়। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বলে গাল দেয়। এইভাবে ফোন না করে কী হতো 'সংবাদ' অফিসে চলে এলে? দু'জনে মুখোমুখি, দৃষ্টির মধ্যে অন্তহীন খোঁজা। হাসি প্রবহমান স্রোতস্বিনী, সময়ের কোনো হিসেব নেই। কী দারুণ মুহূর্ত। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে যায় শরীর। তখন ও কাগজ ফেলে দিয়ে দ্রুত

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসে। মগজে রাগ বাড়ছে। পকেটে সিগারেট নেই। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নওয়াবপুর রোড ধরে হাঁটে। ঘরে ফিরে একটা নতুন লেখা লিখতে বসবে। ইদানীং বেশিরভাগ সময় 'সংবাদ' অফিসের টেবিলের ওপর রাত কেটে যায়। ঘরে ফেরা হয় না। ঠিক করেছে সম্পাদককে বলে এই অফিসেই থাকার ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাহলে ঘর ভাড়াটা অন্তত বেঁচে যাবে। ঐ নোনা-ধরা দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে মেঝের চাইতে এই জায়গা অনেক ভালো। অফিসের পেছনে যেখানে কাগজের স্তূপ রাখা হয় সেখানে অল্প একটু জায়গায় কোনোরকমে গুটিসুটি শুয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ও ভেবে দেখলো জীবন ধারণের জন্য ওর প্রয়োজন এত কম যে এরচেয়ে কমে কেউ বাঁচতে পারে না। কত রাত ভাত না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে, একটুও খারাপ লাগেনি। যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেটি সিগারেট। বেশিরভাগ সময় বন্ধুরা কিনে দেয়। মাঝে-মাঝে আমীর নিয়ে আসে। এসেই বলে, সাবের ভাই আপনার একটা ছোট্ট জিনিস আছে।

সাবের ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

নিজে অভ্যেস করেছো?

মোটেই না।

তাহলে কোথায় পেলে?

পয়সা জমিয়ে আপনার জন্য কিনতে আমার ভালোলাগে।

সাবের এমন কথায় অভিভূত হয়ে যায়। লোকে ভালোবাসা দিলে ওর মরে যেতে ইচ্ছে করে। রাজনীতি ছেড়ে দেবার পর থেকে ওর মনে হয় ও অনেক দূরের মানুষ– অনেক দূরের। মগজের মধ্যে হাজার চাপ। ও আর মানুষ নেই– ও আর মানুষ থাকবে না। ইদানীং কবিতার লাইন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। একটা অনুবাদে হাত দিয়েছে, ঠিকমতো এগুচ্ছে না। আবার কখনো তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। গল্পের বই 'এক টুকরো মেঘ' বেরিয়ে গেছে। প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছে, কিন্তু কিছু ওকে স্পর্শ করে না। নওয়াবপুর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে টিপু সুলতান রোডে এলে আমীরের সঙ্গে দেখা হয়।

সাবের ভাই?

ও চমকে উঠে। ইদানীং এমন হয়, আচমকা কোনো শব্দ বা ডাকে বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। কেমন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখন।

কি হয়েছে সাবের ভাই? অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?

তুমি কি সবসময় আমার পিছু পিছু ঘোর নাকি আমীর?

না তো? তা কি করে হয়?

তাহলে যখন-তখন আমাকে অমন করে ডাকবে না। তোমার বাপ সরকারের পা-চাটা কুকুর, তুমিও তাই হবে। এটা একটা নরক, আমরা সবাই নরকের কীট।

সাবের ভাই?

আমীরের আর্তচিৎকার সাবেরের কণ্ঠে ঢোকে না। ও দ্রুত হেঁটে চলে যায়। মনে হয় ছেলেটির চোখের নীল আগুন সাপের মাথার ফণা। ছোবল মারতে আসছে। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে যাবে। এখান থেকে পালাতে হবে। কোথায়? জানি না, জানি না। নিজের ঘরে এসে মাথা টিপে বসে থাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই আগুন চেপে ধরে রাখে হাতের তালুতে। অসহ্য যন্ত্রণা, কুঁকড়ে যেতে থাকে বুক। তবু আনন্দ, আনন্দ। সাবের পাগলের মতো ঘর ফাটিয়ে হাসে।

তখন আমীর এসে ঢোকে, রাগে এবং অপমানে ক্ষুব্ধ। সাবেরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

BanglaBook.org

কিন্তু খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সাবেরের কাণ্ড দেখে ও ভয় পেয়ে যায়।

সাবের ভাই?

এসো, আমীর এসো। দেখ আনন্দ-বেদনাকে কেমন পুড়িয়ে দিচ্ছি।

সাবের ভাই?

আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমাকে আসতেই হবে। মানুষের কল্যাণধর্ম, শুভবুদ্ধি এভাবে পুড়ে যাবে আমীর।

না। আমীর চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, যাবে, তোমার বাবার মতো লোকেরা তা করবে।

আমরা বাধা দেবো।

পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

সাবেরের কণ্ঠ হিসহিস করে।

সিগারেট খাবেন?

কি দেবে? বিষ? সাবের আবার হা-হা করে হাসতে থাকে।

দেখছো না আমি বিষ খেয়ে হজম করতে পারিনি। তাই আমার সারা শরীরে পচন।

সাবেরের চেহারা ম্লান হয়ে যায়। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নোনা-ধরা দেয়াল থেকে আস্তর খসে পড়ে। ছবির মতো দেয়ালে আটকে থাকে টিকটিকি। আমীর নির্নিমেষ দেখে মানুষটিকে। খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় সাবের। বলে, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো আমীর? বোসো না?

আমীর চৌকির ওপর বসে। সাবেরকে এখন একদম অন্যরকম লাগছে। কোনো হতাশা, পাগলামি নেই, সুস্থ স্বাভাবিক আচরণ। বলে, আমি আগামীকাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মানে, এই ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবেন?

যাবো কোথাও। যেখানে শুধু হাঁটু মুড়ে ঘুমানো যায়।

এটুকুই চেয়েছিলেন কেবল?

আমীরের ঝাঁঝালো কণ্ঠ। সাবের কথা বলে না। মুখে ছায়া কেঁপে যায়, স্থির হয়– দৃষ্টিতে ধূসর বিষণ্নতা। ঠোঁট নড়ে, কথা বের হয় না। আমীরকে যেন দেখতে পায় না। অনেক দূরে একটা বিন্দুর মতো ওর অবয়ব। আমীর আবার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, মনে নেই আপনি লিখেছিলেন 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি।

সাবের তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। আমীর সাবেরের চোখে চোখ রেখে আবৃত্তি করতে থাকে– ওগো মা আমার, প্রাণ দিয়েছো খুনীদের হাতে/ আর দেখ আমি কারাগারে/ মাগো তুমি কেঁদ না কেঁদ না/ আমার জন্য কেঁদ না, দেখ দেখ/ আমি স্থির অটল, আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দেওয়া/ নিষিদ্ধ জগতের এই লাল ইশতেহার।

দীর্ঘ কবিতাটির পুরোটাই আবৃত্তি করে আমীর। ওর ভরাট কণ্ঠ, নিস্তব্ধ ঘরে দুম করে ইউক্রেনের পুলটি উড়িয়ে দেয়, যেন সেই ভরাট কণ্ঠ বুলেটের গতিতে তাড়িয়ে দিচ্ছে জার্মান নাৎসী পশুদের। চট্টগ্রাম জেলে বসে কবিতাটি লিখেছিলো শহীদ সাবের। কবিতার শেষে আছে ইলা মিত্রের কথা। আমীর পুরো কবিতাটি শেষ করলে ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। ও একদৃষ্টে শহীদ সাবেরকে দেখে। ভাঙাচোরা চেহারা, গর্তে বসে যাওয়া চোখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে।

BanglaBook.org

দুই চোখে দীপ্র দৃষ্টি। আমীরের মনে হয় বদলে যাচ্ছে মানুষটি। মানুষটি এখন সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। মানুষটি আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নে দোলায়িত, মানুষটি সুখ-গড়ার কারিগর। একটু পর সাবের জানালার শিক ধরে দাঁড়ায়। ঘামে জামা ভেজা। পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। যেন মুসলিম লীগের নির্যাতন– পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন। রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতা– প্রতারণা। স্বপ্ন ভঙ্গ– নৈরাশ্য– হাজার জোনাকির নিভে যাওয়া। আমীর বিড়বিড় করে। সাবেরের পিঠ থেকে ওর দৃষ্টি সরে না। সে পিঠ বেয়ে ঘামের স্রোত বয়। আমীরের খুব মায়া হয়। ওর কেবলই মনে হয় মানুষটি মরে যাবে– মানুষটিকে আর বাঁচানো যাবে না। ১৯৩০-এর যে আগুন বুকে নিয়ে মানুষটি জন্মেছিলো সেই একই আগুন বুকে নিয়ে মানুষটি মরবে, মরতেই হবে। আমীরের মনে হয় যে ঘামের রেখা পিঠ বেয়ে নামছে, সেটা ঘাম নয়, রক্ত। সাবেরের রক্তাক্ত পিঠ ক্ষতবিক্ষত পূর্ব বাংলা। আমীর যেন দৃশ্যটি দেখতে পায়। ওর বুক ভেঙে এলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সাবের বিস্মিত হয়, সে কান্নার শব্দ ওকে বিচলিত করে। ও আমীরের কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর মাথায় হাত রাখে।

কাঁদছিস কেন?

আমীর চুপ করে থাকে।

বলবি না?

আমার বাবার মতো লোকেরা তোমার গলা চেপে রেখেছে। সেজন্য তুমি মরে যাচ্ছো সাবের ভাই।

দু'জনের কেউই বুঝতে পারে না যে সম্পর্কটা ওরা অনেক সহজ করে ফেলেছে।

আমাকে মেরে ফেললে কি হবে, তুই তো আছিস। তোদের মতো অনেকে আছিস।

কিন্তু তুমি? তুমি তো–

আমার অনেক ত্রুটি আছে। আমি কোনোকিছু ধরে রাখতে পারি না। রাজনীতির জন্য চাই সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, তা আমার নেই বলে আমি হেরে যাচ্ছি রে। আমি পরাজিত মানুষ।

কিন্তু তোমার কবিতা–

কবিতায় আমি সত্যি কথাই বলেছি, বিশ্বাসের কথা বলেছি। তাই পরাজিত মানুষের গ্লানি আমার বুকজুড়ে। চল চা খেয়ে আসি।

চলো।

দু'জনে বেরিয়ে যায়। মোড়ের দোকানে গিয়ে বসে। আজ আর আমীর বাবার ভয়ে অস্থির নয়, ভীত নয়। অনর্গল সাবেরের সঙ্গে কথা বলে। সাবের চুপচাপ শোনে। আমীরের কথা শুনতে ভালোইলাগে, ওর মুখে এক অনির্বচনীয় আলোর জ্যোতি খেলছে। চায়ের দোকানে ভিড় কম। উর্দু গানের রেকর্ড বাজছে না। হাবলু হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর দিকে তাকিয়ে সাবেরের বুক জ্বলে ওঠে। ও সাবেরের বিয়েতে যেতে চেয়েছিলো। সাবেরের বলতে ইচ্ছে করে, আমার বিয়ের ফুল হয়তো এবার ফুটবে রে। একজন টেলিফোনে আমাকে ভালোবাসার কথা বলে। তুই যাবি তো আমার সঙ্গে? বরের বেশে আমাকে কেমন দেখাবে বল তো?

স্যার!

কিরে হাবলু?

আপনের বিয়া–

BanglaBook.org

হবে রে হবে। এবার হবে।

আমীর হো-হো করে হেসে ওঠে।

জানিস আমীর হাবলুও আমার বিয়ের বরযাত্রী হবে।

আমীর হাসতেই থাকে। ওর হাসি থামে না। সাবের মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে যায়। আমীরের হাসি বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধে। ওর মুখটা এখন একদম অন্যরকম। সহানুভূতিহীন নির্মম ও।

কয়দিন ফোনের খেলা বেশ চলে। প্রতিদিন ফোন আসে। কোনো কোনো দিন তিন-চার বারও। সাবের এখন অফিসেই থাকে। রাতেও ফোন আসে। দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। মাঝে-মাঝে সাবের অস্থির হয়ে ওঠে।

তুমি কি এখনো ধরা দেবে না?

ধরা দিলে যদি তোমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়?

না, না, আমি তোমাকে দেখতে চাই। তুমি আমার প্রেরণা, আমার কবিতা।

আমাকে তাই থাকতে দাও।

কেটে দেয় লাইন! আর কথা হয় না। বিষণ্ন হয়ে যায় ও। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করে। এমন করে লাইন কেটে দিলে রাগ হয় ওর। সারারাত জেগে সিগারেট খায়। একটার পর একটা। তখন বড় বেশি নির্মম আচরণ করে নিজের সঙ্গে। এখন এই টেলিফোনের খেলা আর ভালো লাগে না, মন চায় মানুষ দেখতে– সামনা-সামনি একজন তরতাজা মানুষ। যে শুধু ভালোবাসার কথা বলে লেখার উৎসাহ জোগাবে না, যে কাছে এসে দাঁড়াবে। অন্তত কপালে একটি চুমু খেয়ে বলবে, মহৎ কিছু লিখে কালজয়ী হও। আহ্ এটুকু কেন স্বপ্ন হয়ে থাকে? কেন সত্যি হয় না? সারারাত নির্ঘুম কেটে যায়। আকাশ মেঘহীন, দূরে তারা জ্বলে, সেই মিষ্টি মধুর হাসির মানুষটিকে ঐ তারার মতো মনে হয়।

তারপর দিন যায়, রাত যায়। ঐ ফোন আর আসে না। শেষ কথা বলেছিলো, ভুলে যেও আমাকে। আমি আর একজনের ঘরণী হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছি। চরম নিষ্ঠুরতা! কী হৃদয়হীন খেলা। সাবের নির্বাক হয়ে যায়। কারো সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। একদিন করিম হাসতে হাসতে বলেছিলো, কিরে তোর আর সেই ফোনটি আসে না যে? ও নির্বিকার উত্তর দিয়ছিলো, সে যে অনেক দূরের তারা তাই।

খুব দুঃখ পেয়েছিস, না?

করিমের আন্তরিকতা ওকে স্পর্শ করে না। মগজে প্রচণ্ড ঘূর্ণি। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কোনোকিছু তেমন মনে থাকে না। কবিতা লিখতে পারে না, গল্পও না। সম্পাদকীয়র সিরিয়াস বিষয় খাপছাড়া হয়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে।

একদিন সম্পাদক ডেকে বলেন, তুমি কদিন ছুটি নাও সাবের। তোমার শরীর বোধহয় খারাপ। দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে এসো।

ও ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না। কতকিছু বলতে চায়, বলা হয় না। মাথা কাজ করে না। শুধু একটার পর একটা সিগারেট টানে। ইদানীং খিদেও পায় না। জোর করে খেলে বমি আসতে চায়। চারদিকের সবকিছু নরক হয়ে যাচ্ছে। কখনো গভীর রাতে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বুক শূন্য হয়ে গেলে ঘুম আসে।

একদিন 'সংবাদ' অফিসে চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে বসেছিলো। ঘরে ও একা।

BanglaBook.org

জুলেখা মতিউর কেউ আসেনি। সিগারেট পুড়ে যায় সাবেরের। ওর কিছু করার নেই মনে হতে থাকে কেবল। সম্পাদক ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে বললেই হলো আরো কী! কেন যাবে ও? এইসব ভাবনার মাঝে আলী আহমদ এসে ঢোকে। ও কিছুটা উৎফুল্ল, কোনো একটা আশার আলো ওর মধ্যে কাজ করছে। সাবেরের মুখোমুখি বসে বলে, সাবের সাহেব আপনি না এ দেশের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চেয়েছিলেন? পত্রিকায় খবর দেখে তো মনে হচ্ছে একটা পথ হবে।

আমি ইদানীং খবরকাগজ পড়তে পারি না। বমি পায়। তো পথটা কি?

আলী আহমদ সাবেরের কণ্ঠস্বর ভ্রুক্ষেপ না করেই বলে, দু'তিন বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘকে অনুরোধ করা হয়েছিলো এখানকার পানি সমস্যার সমাধানের জন্য যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থার সুপারিশ করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের টেকনিক্যাল মিশন পাঠানোর জন্য। অল্প দিনেই ক্রুগ মিশন আসবে।

হা-হা করে হেসে ওঠে শহীদ সাবের। বলে, ক্রুগ মিশন? জুলিয়াস ক্রুগের নেতৃত্বে। ঐ বেটা ট্রুম্যান কেবিনেটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলো। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মিশন দিয়ে বন্যা সমস্যার সমাধান হবে? বুঝলেন এও রাজনীতির খেলা। ঐ বেটা একটা রিপোর্ট দিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রসবিত হবে অশ্বডিম্ব।

শহীদ সাবের দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে। আলী আহমদের তখন মনে হয় সাবেরের শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ও তড়িঘড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, আপনার শরীর কি খারাপ?

সাবের বিরক্তির সঙ্গে বলে, খারাপ হবে কেন? ভালোই তো আছি।

আলী আহমদ কিছু বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়। চলে যাবে ভাবছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে হাতে এক ঠোঙা মিষ্টি নিয়ে ঢোকে মতিউর। চেঁচিয়ে বলে, হুররে, বাবা হয়েছি।

ওরা দু'জনে অবাক হয়ে বলে, বাবা?

আজ সকালে মিটফোর্ড হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে জুলেখা।

সাবের হেসে বলে, দারুণ খবর। মেয়ে হয়েছে। এক মুহূর্তে চিন্তা করে বলে, ওর নাম রাখবেন বন্যা।

তারপর আলী আহমদের মুখের ওপর হাত নেড়ে বলে, না আপনার বন্যা সমস্যার বন্যা নয়। এ বন্যা রবীন্দ্রনাথের।

বন্যা উচ্চারণ করতে করতে সাবের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মতিউর বলে, সাবের ভাই ভালোই বলেছেন। মেয়ের নাম বন্যা রাখবো। নিন, মিষ্টি খান।

মতিউর ওর সামনে মিষ্টির ঠোঙা এগিয়ে দেয়। আলী আহমদ মিষ্টি মুখে পুরলে মতিউর বলে, জানেন মেয়েটা না খুব মিষ্টি হয়েছে। জুলেখার মতো।

মতিউরের দৃষ্টিতে আনন্দ উপচে পড়ে। আলী আহমদের মাথার মধ্যে অলৌকিক জ্যোৎস্না, জুলেখা মা হয়েছে।

BanglaBook.org

১৬

চারদিকে খাঁ-খাঁ দুপুর। রাজপথে একা হাঁটে অহি। আশেপাশে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া। কতদিন মন্টুর সঙ্গে দেখা হয় না। কতদিন এই শহরে থেকেও নেই ও। কেমন নতুন লাগছে, কিছুটা অপরিচিত। সবই তো ঠিক আছে। তা হলে বদলে গেলো কী? গরমে অহির মাথা চক্কর দেয়। ঘাড়ে গলায় ঘাম জমে থাকে। ও হাতের তালুতে ঘাম মোছে। কত পরিচিত পথঘাট, কত আপন। কত দিন বুলু দাসের সঙ্গে এইসব রাস্তায় কাটিয়েছে। এই শহরটা ছাড়া অহি কিছু বোঝে না।

চানখাঁর পুলে এলে বুলু দাসের সঙ্গে দেখা হয় ওর।

কোথায় যাচ্ছ বুলুদা?

অহি তুই?

চিনতে পারছো না? তুমি কিন্তু মোটা হয়েছো।

গুলিটা তোর কোথায় লেগেছিলো রে?

ধুত, রাখো এসব কথা। তুমি কেমন আছো?

ভালো রে। আমার একটা ছেলে হয়েছে।

সত্যি? কী মজা আমি দেখতে যাবো।

যাবি? চল এখন যাই।

এখন থাক। সন্ধ্যায় যাবো।

এখন কি করবি? চল না যাই। কত দিন তোকে দেখি না।

তুমি আগের মতো তাড়ি খাও বুলুদা?

খাই তো। সেই একুশের গুলির পর ভেবেছিলাম খাবো না। কিন্তু কথা রাখতে পারিনি। না খেলে অস্থির লাগে। না খেয়ে পারি না। বরং খেলে তোকে হারানোর কষ্টটা ভুলে থাকি।

আমি তো এখন দুঃখ না বুলুদা। আমি তো সবাইকে সাহস দিই। দেখোনি মানুষের–

এসব কথা থাক অহি। আমার অনেক কিছু সয়ে না। সবাই তোর মৃত্যুটা ব্যবহার করে। আমি সেটা পারি না রে। তুই আমার কাছে আগের অহি। মরে গিয়ে আমাকে দুঃখই দিয়েছিস। আর কিছু না, আর কিছু না।

বুলু দাসের চোখ ছলছল করে। পারলে অহিকে বুকে তুলে কোথাও পালিয়ে যেতে চায়। অহি মিটি মিটি হাসে।

তুমি যে কী পাগল।

তুই একদম অন্য রকম হয়ে গেছিস।

জানো আমি বাবাকে খুঁজছি। একদিন বাবাকে দেখলাম ফুলবাড়িয়ায়। কথা বলতে পারিনি। সেই থেকে খুঁজছি। নিশ্চয় পেয়ে যাবো একদিন।

খুঁজবি? খুঁজবি কেন?

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তুই তোর বাবা থেকে অনেক আলাদা অহি।

তাতে কি বুলুদা? তবু বাবা তো।

বুলু দাস চুপ করে থাকে। অহি বুঝতে পারে ওর উত্তরটা বুলুর পছন্দ হয়নি। বুলু ঘাড় কাত করে সূর্যের দিকে তাকায়। বেলা দেখে।

তোমার খিদে পেয়েছে, না?

হ্যাঁ রে। তা ছাড়া ছেলেটার জ্বর। ওষুধ কিনতে হবে।

BanglaBook.org

অহি বুলুর হাত চেপে ধরে। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, জ্বর? তুমি ওর জন্য ঠিকঠাক মতো ওষুধ কিনো কিন্তু।

তুই ভয় পাস না। রিনির মতো ওকে আমি মরতে দেবো না।

জানো বুলুদা আমার কেবলই তেষ্টা পায়। ভীষণ তেষ্টা।

জল খাবি?

খেলে কি হবে? কত খাই কিছুতেই তৃষ্ণা ফুরোয় না। আমার বুক জ্বলে যায়।

জ্বলবেই তো। বুকে যে বুলেট বিঁধে আছে।

আমি যাই বুলুদা?

কোথায়?

জানি না।

রাজপথে মিলিয়ে যায় অহি। গাড়ি-ঘোড়া, দোকানপাট কোনোকিছুতে ওর পথ আটকায় না। ও চলে যাচ্ছে অবলীলায়। বুলু দাস পিছন ফিরে হাঁটে। ও হিসেব করে দেখলো মাত্র তিন বছরে ও নিজে অনেক বদলেছে। যে সরকার বায়ান্নোর একুশে গুলি ছুঁড়েছিলো তারা নির্বাচনে হেরেছে। এখন নতুন সরকার দেশে। বুলু দাস ছেলের জন্য ওষুধ কেনে। ওর এখন সংসার হয়েছে। ঘরে বৌ আছে, হাতের কাছে তাড়ি আছে, নেশায় চুর হওয়া যায়। এতকিছুর মধ্যেও অহি ওকে হিম করে রাখে। কিছুতেই ভোলা যায় না। কেমন করে যে অহি ওকে এমন মায়ার বাঁধনে বাঁধলো! বুলু দাসের অবচেতনে ও শুয়োরের রগরগে লাল মাংস, রক্তের মতো টকটকে এবং উষ্ণ।

ফুলবাড়িয়ায় সুরোত আলীর কাঠের দোকানের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে অহি। করাতকলে কাজ হচ্ছে। মকবুলের চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হাশেমের জায়গায় অন্য একজন। জোয়ান তাগড়া লোক। করাতের ঘর্ঘর শব্দে মৃসগ হয়ে কাটছে কাঠ। সুরোত আলী দোকানে নেই। পুকুরটার কচুরিপানার বেগুনি ফুল উজ্জ্বল হয়ে আছে। অহি ট্যাপকল থেকে পানি খায়। নতুন বছর শুরু হয়েছে। দুদিনের মধ্যে জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে ফেব্রুয়ারি। অহি ফিরে আসে রাস্তায়। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। শীতের বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। গ্যাস বাতি জ্বলে উঠেছে। বায়ান্নোর এমন দিনে উন্মাতাল ছিলো এই শহর। অহি ওর প্রিয় জায়গাগুলো মাড়িয়ে যায়। মুহূর্তে ফুরিয়ে যায় পথ। ওর বুকের ভেতর মিছিল গর্জে ওঠে। পল্টনে লোক নেই। শূন্য ময়দান ধু-ধু করে। অহি মাঠের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে। মাথার ওপর কুয়াশা ঝরে। চারদিকে অন্ধকার। মৃত-প্রায় শহর। ও বিড়বিড় করে, এই শহর মিছিলের। মিছিল না থাকলে ভালো লাগে না। ও হাত উপরে উঠায়, আবার গর্জে উঠুক এই শহর। তখন একঝাঁক কাক কা-কা শব্দে উড়ে যায় পুব থেকে পশ্চিমে। অহির বুক কেঁপে ওঠে। ও চিৎপাত শুয়ে পড়ে ঘাসের ওপর। এই প্রিয় শহর ছেড়ে ওর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

ফেব্রুয়ারি এসে গেলো। ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারিতে একা-একা ঘোরে অহি। বাবাকে খোঁজা ওর শেষ হয়নি। সেই যে কবে এক ঝলক দেখেছিলো বাজারে, তারপর আর দেখা হয়নি। ওর বুকে প্রবল আশা। একদিন না একদিন ও নিশ্চয় বাবাকে খুঁজে পাবে। একদিন ও মাকে দেখতে গিয়েছিলো। দেখেছে ওর মা সুখে সংসার করছে। প্রতিদিনের খাবারটা ভালোভাবেই চলে যায়। তেমন অভাব নেই। মার কোলজুড়ে ছেলে। হাসিখুশি তরতাজা। মা ওকে বড় করে কাজলের টিপ দিয়ে রাখে। অহির ইচ্ছে করে যে বলে, মাগো তোমার ছেলেকে আর কেউ কেড়ে নেবে না। কিন্তু বলা হয় না। বলে মায়ের দুঃখ বাড়াতে চায় না। ওর মা ভালো আছে, এটা ওকে আনন্দই দেয়। মা অনেক কষ্ট করেছে।

BanglaBook.org

ও-তো মাকে কেবল দুঃখ পেতেই দেখেছে। এখন মা ভালো আছে, ভালো থাকুক। অহির গলা ধরে থাকে, দুঃখে নয় আনন্দে। ফেব্রুয়ারির এই ভীষণ নির্জন, কোলাহলহীন শহরে অহি এই প্রথম খুশি হয়। মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসে ও। বড় লোভ হয়েছিলো মা বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে। ও রেললাইনের পাশের মাঠে এসে বসে থাকে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আজ অমাবস্যা। এমন রাতে বুলু দাসের নেশা জমতো বেশি। অহিকে ছাড়তেই চাইতো না। একদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরলে মা ওকে খুব মেরেছিলো। মেরে নিজে কেঁদেছিলো অনেকক্ষণ। রাতে ভাত না-খেয়ে ঘুমিয়েছিলো ও। সবকিছু কেমন তাজা হয়ে আছে। কিছুই ভোলেনি। সহজে কোনোকিছু ও ভোলে না। বুদ্ধি হবার পর থেকে যা-কিছুই ঘটনা সব ওর মনে আছে। মুখ ভার হয়ে থাকে, চোখে জল আসে। ও একবার ভাবে, বাবা যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো সে জায়গা ঘুরে আসবে, পরক্ষণে ভাবে, থাক, গিয়ে কাজ নেই। এই নীরব শহরটা আজ ওকে স্মৃতি-তাড়িত করছে।

ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে এখনো খুঁজে পায়নি অহি। শহর আবার মুখর হয়ে উঠছে, না মিছিল আর প্রতিবাদে নয়। শহর মুখর হয়েছে আলাপ-আলোচনায়, তুমুল তর্ক-বিতর্কে, চায়ের টেবিলে বাক-বিতণ্ডায়। অহির মনে হয় ওর পিঠে পাখা গজিয়েছে। ও উড়তে পারছে। উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে নদী-নালা-খাল-বিল-মাঠ-ঘাট পেরিয়ে। এ বছর অতিবর্ষ। ১৯৫৬-তে ফেব্রুয়ারি ২৯-এ শেষ হবে। আর ঐ তারিখে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। অহি হিসেব করে দেখলো আর মাত্র তিনদিন বাকি। শীতের কুয়াশায় সকালটা ধোঁয়াটে হয়ে থাকে। শিশিরে ভিজে যায় ওর পা। শিশির ওর খুব পছন্দ। ছোটোবেলায় মাকে ফাঁকি দিয়ে খুব ভোরে পালিয়ে যেতো মাঠে হাঁটতে। কতদিন বুকে ঠাণ্ডা বসে যেতো। মা গরম সরষের তেল আর রসুন মালিশ করতে করতে ওকে গালাগাল করতো। এখন ওকে কেউ বকে না। ও ইচ্ছে মতো শিশিরে গড়াগড়ি যায়। সারা শরীরে শিশির মেখে সূর্যের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকে। শহরের কোলাহল ওর কানে ঢোকে না। কে যেন বলে, এতদিনে বায়ান্নোর শহীদদের আত্মা শান্তি লাভ করবে। অহি চমকে মুখ ফেরায়। এই লোকটাকে ও চেনে। বহুদিন দেখেছে। সরকারি কলেজে মাস্টারি করে। ওর সঙ্গের লোকটি বলে, নূরুল আমীন সরকারের ভরাডুবির মধ্যে দিয়েই বায়ান্নোর শহীদরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠিক বলেছেন, আর একজন এগিয়ে আসে। অহি চারদিকে মুখ ফেরায়। চারদিক থেকে কথা ভেসে আসছে। ও প্রাণপণে এইসব কথা এড়িয়ে যায়। মানুষের প্রাণে এখন আশা, উৎসাহের জোয়ার অথচ শহরের এই কোলাহল অহির একটুও ভালোলাগে না। ও পালাতে থাকে। দূরে কোথাও। বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে অন্য পাড়ে চলে যাবে। জিঞ্জিরার কোনো এক ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকবে। সবকিছুতেই ওর এখন ভয় করে। ওর সাহস কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক প্রবল হয়ে উঠলে ওর হাঁটতে কষ্ট হয়।

কিন্তু পালানো অহির হয় না। নওয়াবপুরের মোড়েই বাবার সঙ্গে দেখা হয় ওর। শৈশবের বাবা, কৈশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বপ্ন থেকে ছিটকে ফেলে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো ওকে। মায়ের স্মৃতিতে আর যাই থাক স্বস্তি ছিলো না।

রহমতুল্লাহ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, অহি? আমার অহি? কত বড়ো হয়েছিস তুই?

ও নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

কী রে হাঁ করে দেখছিস কী?

BanglaBook.org

তুমি অবিকল তেমন আছো?

হা-হা করে হাসে রহমতুল্লাহ।

তুই কিছুই ভুলিসনি দেখি।

না, ভুলিনি। তোমার সেই চোখ– তার দৃষ্টি, সেই নাক– তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, সেই পেট– তেমন ফোলানো, তোমার হাত– তেমনই খস্ খসে, মোটা ভুরু। তুমি অবিকল তেমন আছো।

আমরা বদলাই না অহি।

বুঝেছি।

অহি গম্ভীরভাবে বলে।

কি বুঝলি?

তুমি আবার নিজেকে বিক্রি করেছো।

বিক্রি বলছিস কেন? আমাকে তো সবসময় ওদের দরকার হয়। আমরা না হলে রাজনীতি জমে না রে। এখানে বেচা-বিক্রির প্রশ্ন নেই। নিয়মটাই এমন। যে যখন ক্ষমতায় আসুক না কেন, আমরা তেমনই থাকি।

রহমতুল্লাহ হা-হা করে হাসে।

তুমি হাসছো বাবা? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

জানি আমার ছেলে হয়েও তুই অন্যরকম হয়েছিস। কিন্তু এটাও জানি যে তোকেও ওদের দরকার। তোদের রক্ত না হলে কোনো দাবি আদায় হয় না। জেনে রাখিস বারবার রক্ত ঝরবে, বারবার।

রহমতুল্লাহ চলে যায়। অহি দাঁড়িয়ে থাকে পথের পাশে। নিজেও বিড়বিড় করে, আমিও জানি রক্ত ঝরবে। তবুও মৃত্যুই কাম্য যদি তা ত্যাগের জন্য হয়।

অহি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। গুলিস্তানের কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়ায়। ওর ভীষণ মন খারাপ। বাবাকে এমন করে ও চায়নি। ও চেয়েছিলো একজন পরিবর্তিত বাবা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যার নতুন উপলব্ধি ঘটবে। না, রহমতুল্লাহ পুরনো পেশাকেই ভালোবাসে, যেখানে কোনো গৌরব নেই। এর জন্য তার কোনো গ্লানিও নেই। এসব কিছুর মধ্য দিয়েই এগুবে এই শহরটা। তারপর আবার একদিন ভীষণ ভয়ানক শব্দে গর্জে উঠবে। কবে? কখন? সেই দিন দেখার প্রতীক্ষায় অহি উন্মুখ হয়ে ওঠে। এইসব ভাবনার মধ্য দিয়ে ও দীর্ঘ পদক্ষেপে আবদুল গনি রোড পেরিয়ে যায়।

চঞ্চলতায় পেয়ে বসে অহিকে। ও মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের কাছে এসে দাঁড়ায়। ফুলার রোড ঘুরে এসেছে। সবই অবিকল তেমন আছে। শুধু তৈরি হয়ে থাকে ইতিহাস। এইখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলো বরকত। মুসলিম লীগ সরকার গুলি করেছিলো। এই বছর যুক্তফ্রন্টের আবু হোসেন সরকার ঐ জায়গায় শহীদ মিনার স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। আকৈশোর কত দিন এই পথে হেঁটে গেছে অহি। কখনো কি ভেবেছিলো এমন হবে? এই বছরের একুশে ঘরের ছাদে কালো পতাকা উড়লো, খালি পায়ে শোভাযাত্রা করলো নারী-পুরুষ, আজিমপুর গোরস্তানে শহীদের মাজারে ফুলের মালা দিলো সবাই, বিকেলে জনসভা হলো। অহি সারাদিন ঘুরেছে। দেখেছে মৌন শোকে নিথর শহর, দেখেছে কবরস্তানে মোনাজাতরত মানুষের চোখ, চোখের জল। পুলিশের আর সরকারি গাড়ি ছাড়া আর কোনো গাড়ি নেই। অহি বারবারই উপলব্ধি করে শোক আর শপথের এই দিনে মানুষের বুকের ভেতর উস্কে ওঠে আগুন। ওর ভালোইলাগে। বাবার জন্য দুঃখ ভুলে যায়। বোঝে ওর বাবারা একঘরের মানুষ। ওদের দিয়ে মিছিল হবে না। ওরা মিছিলের

BanglaBook.org

লোক নয়। অহির অস্থিরতা কমে যায়। দারুণ প্রশান্তি ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ও হাঁটতে হাঁটতে আজিমপুর গোরস্তানে আসে। ঘাস গজিয়েছে কবরে। অসংখ্য শুকনো ফুল চারদিকে ছড়ানো। অহি ওখানে চুপচাপ বসে থাকে।

আজ ২৯ ফেব্রুয়ারি। আজ বাংলাভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি হলো। কিন্তু মন খারাপ হয় অহির। অসম্ভব আনন্দে উদ্বেলিত হওয়ার কথা ছিলো ওর। কিন্তু তেমন সাড়া জাগছে না। ভালোলাগার বোধে বিশাল একটা বাঁধ বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। অহি ফাল্গুনের মিঠেকড়া রোদে পিচ-ঢালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কী করবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না। ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গেলে বুঝতে পারবে অন্যরা কী ভাবছে। বুদ্ধিজীবীরা কী ভাবছে? রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার স্বীকৃতি কি তারা এভাবে চেয়েছিলো?

২১৪।-(১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধান-দিবসের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের যে সকল সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই সকল কাজে উক্ত ভাষা সংবিধান দিবস থেকে আরম্ভ করে কুড়ি বছর মেয়াদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকবে, এবং উক্ত কুড়ি বছর মেয়াদ অতিবাহিত হবার পর সংসদ আইন দ্বারা যেরূপ কাজ নির্দিষ্ট করবেন সেই কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের বিধান করা যাবে।

(২) সংবিধান-দিবস থেকে আরম্ভ করে দশ বছরের মেয়াদ অতিবাহিত হলে ইংরেজি ভাষা পরিবর্তনকল্পে সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিয়োগ করবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদে এমন কিছুই নাই, যা উক্ত কুড়ি বছর মেয়াদ অতিবাহিত হবার আগে কোনো প্রাদেশিক সরকারকে এই প্রদেশে যেকোনো একটি রাষ্ট্র ভাষার দ্বারা ইংরেজি ভাষাকে পরিবর্তন করা থেকে বিরত রাখতে পারবে।

অহি দেখতে পায় যারা সংবিধানের এই ধারাগুলো পড়েছে, বদলে গেছে তাদের সবারই দৃষ্টি। কেমন এক অদ্ভুত আঁকাবাঁকা রেখায় প্রতিটি মানুষের মুখ এক ভিন্ন মানচিত্রের আকারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সবাই বোঝে এটা একটা কাগুজে স্বীকৃতি। বিশ বছরের আগে তা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু বিশ বছর পরেও ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু রাখার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবেই বহাল আছে।

অহির বুক ভার হয়ে থাকে। নির্মেঘ আকাশ চক্ চক্ করে। রাজপথে ছায়া নেই। হেঁটে যায় মানুষ, গাড়ি চলে যায়। ফাঁকিটা ও বুঝতে পারে। বোঝে এতগুলো জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বীকৃতি সবার কাছে পৌঁছতে প্রয়োজন হবে আরো রক্তের।

মুহূর্তে থমকে দাঁড়ায় ও। চিৎকার করে বলে, আবার গর্জে উঠবে এই শহর। গর্জনশীল স্রোতস্বিনী হয়ে ভাসিয়ে দেবে জনপথ। বুলেটে-বারুদে মাখামাখি হয়ে এই শহর নতুন শহর হবে।

তখন দেখতে পায় প্রদীপ্ত ওর দিকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে। বাতাসে ওর চুল উড়ছে, ওর বুক টানটান। ও হাত উঁচু করে রেখেছে। অহি ওর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে। প্রদীপ্ত কাছে এসে দাঁড়ায়।

তোমাকে দেখে দৌড়ে এলাম অহি ভাই। কতদিন তোমাকে দেখিনি। কেমন আছো তুমি?

কেমন আছি? ভালো তো নেই। ভালো থাকতে পারছি না।

কী হয়েছে?

BanglaBook.org

বুকটা কেবল পুড়তে থাকে রে। তুই কোথায় যাচ্ছিলি?

কোথাও না। এই শহরে আমি একা একা ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে আমার ভালোলাগে। তুমি নেই বলে আমার খুব কষ্ট হয়।

দেখবি আমি সময় করে ঠিকই তোর সঙ্গে থাকবো।

তাহলে চলো বলধা গার্ডেনে যাই। গাছের ছায়ায় বসে দু'জনে কিছুক্ষণ কথা বলি।

চল।

দু'জনে হাঁটতে থাকে। প্রদীপ্ত শহরের কথা, নতুন বই পড়ার কথা, স্কুলের কথা একনাগাড়ে বলে যেতে থাকে। অহির সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলতে পেরে ওর ভালোলাগছে। তীব্র এক আনন্দের অনুভব ওর বুকে নেশার মতো জমে ওঠে। ও অহির হাতটা ধরার জন্য হাত বাড়ালো। অহি নেই। ও চারদিকে তাকায়। অহি নেই। কখন চলে গেলো ও টেরই পায়নি। হঠাৎ ওর মনে হয় চিৎকার করে অহিকে ডাকে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হয় না। ওর চোখ ছলছল করে। ও বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে আসে।

আলী আহমদ ছেলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যে ওর কিছু হয়েছে। জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলি?

বাবা, অহি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। আমরা দু'জনে একসঙ্গে হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখলাম অহি ভাই আমার সঙ্গে নেই। এই শহরে অহি নেই ভাবতে খুব কষ্ট হয় বাবা।

অহি? কে বলেছে অহি নেই? আলী আহমদ ছেলের দিকে সরাসরি তাকায়। এই শহরে অহি আছে দীপু। ওকে থাকতেই হবে। আমি জানি ও কেন তোকে দেখা দিয়েছে।

কেন বাবা? প্রদীপ্ত বাবার কাছ ঘেঁষে বসে।

বাংলা ভাষার কাগুজে স্বীকৃতি হয়েছে রে। অহি জানে ওকে আবার লড়তে হবে।

পাশ থেকে পুষ্পিতা চেঁচিয়ে ওঠে, তোমরা এসব কি বলছো? তোমরা বাপ-ছেলে মিলে কি পাগল হলে?

মা আমার খিদে পেয়েছে?

পাবেই তো, সারাদিন টো-টো করলে খিদে পাবে না? একটি মরা ছেলেকে নিয়ে কেবল গবেষণা।

পুষ্পিতা রাগে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে যায়। প্রদীপ্ত মায়ের পেছন পেছন রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়ি পেতে বসে। কিন্তু ভাত খেতে পারে না। গলার কাছে সবকিছু আটকে যায়। পুষ্পিতা রেগেমেগে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্ত ভয়ে মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। থালার ভাত ফেলে রেখে একদৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। মায়ের বকা ও আর শুনতে পায় না। বালিশে মুখ গুঁজে চোখের জল সামলায়।

বিকেলে পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে প্রদীপ্ত। ছোট্ট লাইব্রেরি, কিন্তু নানারকম বইয়ে ঠাসা। বই নিয়ে বসলে কেমন করে যে সময় কাটে টেরই পায় না। এখানেই আমীরের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে। সেদিন আমীর শুকনো মুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে টেবিলে, সামনে বই নেই। প্রদীপ্ত অবাক হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়, কি হয়েছে আমীর ভাই?

মনটা ভালো নেই প্রদীপ্ত।

কেন?

চোখের সামনে একজন মানুষকে পাগল হয়ে যেতে দেখছি।

বলেন কী?

হ্যাঁ, রে। মানুষটি আমার খুব প্রিয়। যদি সাবের ভাই সত্যি পাগল হয়ে যায়...

BanglaBook.org

বাকিটুকু আর বলা হয় না। দু'হাতে মুখ ঢাকে আমীর। প্রদীপ্তর খুব কৌতূহল হয়। ও পাগল দেখেছে, কিন্তু মানুষ একটু একটু করে কীভাবে পাগল হয় তা ওর জানা নেই।

আপনার প্রিয় মানুষটিকে আমাকে দেখাবেন আমীর ভাই?

না। তুই কাউকে পাগল হতে দেখেছিস প্রদীপ্ত?

দেখিনি। সেজন্য তো দেখতে চাই।

তোর তো খুব সাহস। ভাগ এখান থেকে।

আমীর রেগে যায়। প্রদীপ্ত বেরিয়ে আসে। সামনের অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর আবার মন খারাপ হয়ে যায়। আজকের দিনটা ওকে কেবলই বিষণ্ন করে দিচ্ছে। ওর চোখের সামনে একটি বিষণ্ন শহর জেগে থাকে। ওর কিছুই ভালোলাগে না।

১৭

চারদিকে আবার দুর্ভিক্ষ– আবার ফেনের জন্য আর্তনাদ। এই তো কয় বছর আগে রাজশাহীতে শুনে এসেছিলো সেই ধ্বনি– এখনো কানে বাজে। আলী আহমদ আনমনে পথ হাঁটে। কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। রাজনীতির খেলা বদলে যাচ্ছে– কিন্তু স্থির হয়ে থাকছে মানুষের জীবন। কেন এই দৈন্যদশা? কবে কাটবে অন্ধকার?

আলী আহমদ লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। বন্যার সময় দেখা সেই লোকটি না? কোনো কোনো মানুষের মুখ হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে যায়, তাকে সহজে ভোলা যায় না। এই লোকটি তেমন। মুহূর্তে আলী আহমদ ভেবে নেয় যে লোকটিকে ওর চেহারার জন্য মনে আছে, নাকি আচরণের জন্য? আসলে ও একটু আলাদা মানুষ বলেই ওকে আলী আহমদ মনে রেখেছে। লোকটি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আছে। কোলের ওপর কাপড়ের পুঁটলি, হাতজোড়া সেই পুঁটলির ওপর জড়ো করে রাখা। কোনদিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না। আলী আহমদ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে চমকে ওর দিকে তাকায়।

চিনতে পারছো আমাকে?

হ। লোকটি মাথা নাড়ে।

শহরে এলে তাহলে?

লোকটি তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, না আইসা করমু কি? প্যাডতো মানে না? ঐহানে যে খিদার আগুন আছে তাতো পোড়ায়ে মারে।

অনেক জায়গায় তো সরকারি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে।

আমি লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাই না। কাম দিবেন? কাম দ্যান? অহনতো হাত দুইখানে, পা দুইখানে বল আছে।

কাজ? আলী আহমদ একমুহূর্ত ভাবে। তারপর বলে, এসো আমার সঙ্গে। তোমার নাম কী?

কুদ্দুস। কুদ্দুস মোল্লা।

কুদ্দুসকে রিকশায় নিয়ে ও প্রথমে বাসায় আসে। জিজ্ঞেস করে, কয়দিন ভাত খাওনি?

দুই দিন।

অন্য কিছু খাওনি?

BanglaBook.org

ক্যাবল পানি।

মুড়িও না।

কুদ্দুস বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, না।

আলী আহমদ আর কথা বাড়ায় না। মনে মনে ঠিক করে, বিকেলে ওকে নাসিরউদ্দিন সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে। তার পত্রিকা অফিসে লোক লাগবে। ছোটোখাটো যাহোক একটা কিছু করতে পারবে কুদ্দুসের জন্য, এ ভরসা ওর আছে। যে লোক রিলিফ নেয় না, লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায় না, তার জন্য তো কিছু করাই উচিত।

পুষ্পিতা কুদ্দুস মোল্লাকে ভাত দেয়। আলী আহমদ ওকে সামনে বসিয়ে খাওয়ায়। বড় এক বাটি গরুর মাংসের তরকারি দিয়ে প্রায় এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলে কুদ্দুস মোল্লা। ওর মনে হতে থাকে সরকারের আশ্বাস বাণী, 'একটি প্রাণীকেও অনাহারে মরিতে দেওয়া হইবে না।' ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচশ রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষাবস্থা আছে সে সমস্যাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে। কিন্তু এ দেশে বন্যা হবে, খরা হবে, দুর্ভিক্ষ হবে– মানুষ ডুববে, মরবে, না খেতে পেয়ে হাড্ডিসার হবে। এইসব ইস্যু রাজনীতির উপাদান হবে, এইসব সমস্যা নিয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা হবে, মিছিল হবে, একদল ক্ষমতায় আসবে এবং কুদ্দুস মোল্লারা ভিটে থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফুটপাতের মানুষ হবে। রাজনীতি ওর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে– কিন্তু ওরা কখনো অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারবে না।

সাব পানি দ্যান?

কুদ্দুস মোল্লা ওর দিকে শূন্য গ্লাস বাড়িয়ে ধরে। ওর হাতের কাছে জগ। ও কুদ্দুস মোল্লার গ্লাসে পানি ঢেলে দেয়। ঢকঢকিয়ে পানি খাবার পর আলী আহমদ দেখতে পায় কুদ্দুস মোল্লার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার ভাষা।

বিকেলে নাসিরউদ্দিন সাহেবের প্রেসে দারোয়ান হিসেবে কুদ্দুস মোল্লার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এত সহজে জীবনের এমন একটা বিরাট কিছু ঘটে যাওয়ায় ও বিমূঢ়। ওর প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। আলী আহমদ ফেরার সময় পাঁচটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দেয়।

ও নিতে চায় না। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে।

আরে রাখো না। বেতন পেলে শোধ দিয়ে দিও। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার আগে ভাত খেতে হবে না? জানো তো শহরে কেউ কাউকে খেতে দেয় না।

আপনি যে দিলেন?

আমি শহুরে হতে পারিনি যে তাই।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় আলী আহমদ। পথে শহীদ সাবেরের সঙ্গে দেখা হয়। সাবের ইদানীং অনবরত সিগারেট টানে, চোখ লাল হয়ে থাকে। ওকে দেখেই ঝট করে বলে, যাবেন?

কোথায়?

কাগমারিতে।

মওলানা ভাসানীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে?

প্রথমে রাজনৈতিক সভা, তারপর সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

সাবের সিগারেটে জোর টান দিয়ে হো-হো করে হাসে। আলী আহমদ জিজ্ঞেস করে, হাসছেন কেন?

হাসছি কেন? জানি না তো। আপনি যাবেন?

BanglaBook.org

আমি তো আমন্ত্রিত নই।

ইত্তেফাক পড়েননি বুঝি? সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য সবশ্রেণীর লোককে পত্রিকার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শহীদ সাবের অকারণে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, যাতায়াতের জন্য অল্প ভাড়ায় বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলী আহমদ দেখতে পায় শহীদ সাবেরের মুখটা কুঞ্চিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। চোখ বড় করে বলে, আরো কি নিতে বলেছে জানেন?

আলী আহমদ প্রশ্ন না করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। মুহূর্তে দ্বিধা না করে সাবের বলে, বলেছে, বিছানা এবং মশারি নিয়ে যেতে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ওরা করবে।

আবার তুমুল বাধ-ভাঙা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। একসময় হাসি থামিয়ে বলে, আমার মশারিটা ছেঁড়া এবং ময়লা। কেমন করে নেবো বলুন তো? ঠিক আছে, একটা মশারিতেই হবে। আপনি নিলেই চলবে। আমি আপনার মশারির নিচে ছোট্ট হয়ে গুটিসুটি শুয়ে থাকবো। দেখবেন একটুও ডিস্টার্ব করবো না।

সাবেরের কথায় আলী আহমদের খুব মায়া হয়। চোখের সামনে লোকটির এই অদ্ভুত পরিবর্তন মাঝে-মাঝে ওকে পীড়িত করে, ওর কষ্ট হয়।

কি কথা বলছেন না যে? শুতে দেবেন না?

ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন।

আলী আহমদ ওর হাত জড়িয়ে ধরে। সাবের সহজ গলায় বলে, তাহলে আসি। কাল বাস স্টেশনে দেখা হবে।

বলেই হনহনিয়ে চলে যায় ও। হাতে পুড়তে থাকে সিগারেট, শেষ অংশটুকু জোরসে টান দিয়ে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একবার পেছন ফিরে তাকায়। আলী আহমদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়। সাবের চোখের আড়াল হয়ে গেলে আলী আহমদ খুব অসহায় বোধ করে।

পরদিন বাসে সারাটা পথ চুপচাপ থাকে সাবের। কাগমারির রাস্তায় প্রায় পঞ্চাশটি সুন্দর তোরণ বানানো হয়েছে। মীর্জাপুর থেকে সম্মেলনের স্থান পর্যন্ত বার মাইল পথ বেশ রঙিন হয়ে উঠেছে। কয়েকটা তোরণ পেরিয়ে যাবার পর সাবের বলে, দেখেছেন কাণ্ড? কয়টা তোরণ পেরিয়ে এলাম বলেন তো? ঠিক আছে, যে ক'টা গেলো থাক গিয়ে। এখন থেকে গুনতে শুরু করি। এক, দুই করে কিছুক্ষণ গুনে বলে, ধুত, যত্তসব! তোরণগুলো ফুলের মালা হলে তো গলায় পরতে পারতাম।

সাবেরের ঠোঁটে হাসির রেখা দেখে আলী আহমদ। বাসে অন্যরা ধুম আড্ডা দিচ্ছে। সবার মুখে কথার তুবড়ি। আলী আহমদ নিজেও মাঝেমাঝে আলোচনায় অংশ নেয়, কিন্তু সাবের একদম চুপ। ধুলো-ওড়া পথ। বাসের ভেতর ধুলো চিকচিক করছে। সাবেরের হাতে সিগারেট পুড়ছে।

টাঙ্গাইল থেকে দু'মাইল দূরে কাগমারি। সন্তোষের মহারাজার পরিত্যক্ত বাড়িতে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিরাট আয়োজন। বেশ সাড়া পড়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে কবি-সাহিত্যিকরা এসেছে। রাজনীতি এবং সংস্কৃতির এই সম্মিলন আলী আহমদের ভালো লাগে। দু'টোই জীবনের প্রবহমান ধারা। সন্তোষের এই এলাকায় এসে এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। মওলানা ভাসানী তার বক্তৃতায় পররাষ্ট্র নীতি ও আঞ্চলিক

BanglaBook.org

স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে জোরালো বক্তব্য রাখেন। বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামালায়কুম' বলে বিদায় জানাবেন।

এই বক্তব্য লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। ও আগ্রহ নিয়ে শোনে, ভাবতে থাকে– সন্তোষের এই এলাকা ওর কাছে নতুন মনে হতে থাকে। কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হয়। ও আর সাবের নীরব দর্শক– শুনছে আর দেখছে। চা-মুড়ি খাচ্ছে। বিকেলে দরদ দিয়ে লালন সঙ্গীত গায় শিল্পীরা, সে সুর শুনলে বুকের গভীরে মোচড় দিয়ে ওঠে। সাবের ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো আহমদ সাহেব। এই সুর আমার বুক ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। নিজেকে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আমার। চলুন ঢাকা ফিরে যাই।

আজ আর কেমন করে যাবো? গাড়ি তো নেই। কাল যাবো।

না, আজই এক্ষুনি।

কি পাগলামি করছেন।

পাগলামিই তো করবো।

সাবের তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে। রাস্তা পর্যন্ত এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আলী আহমদ বিরক্ত হয়ে পিছু নেয়। ঘাড়ে হাত রেখে বলে, চলুন গান শুনি। ঢাকা কাল সকালে যাবো।

এই কোমল কথায় সাবের আকস্মিকভাবে আলী আহমদকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। তারপর চোখ মুছে বলে, চলুন যাই। আসলেই পাগলামি হচ্ছে। সম্মেলন শেষ না হলে যাবো না। কাল সন্ধ্যায় রমেশ শীলের গান আছে, শুনতেই হবে। তাছাড়া হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতাই তো শুনলাম না। না শুনে যাবোই না।

সাবেরের ভেজা ফ্যাসফেসে কণ্ঠ আলী আহমদকে স্পর্শ করে। ও কথার মোড় ঘোরানোর জন্য বলে, বলুন তো পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামালায়কুম বলে বিদায় জানানো মানে কী?

মানে হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালদের পাছায় লাথ্থি। তারপর হো-হো করে হাসে। বলে, আপনি যেন কী? কেবল আমার নাড়ির ভেতর হাত ঢোকাতে চান। ঢাকায় ফিরে আপনাকে আচ্ছারকম শিক্ষা দেবো। জানেন, আমি ভেবে রেখেছি যে আমি যদি পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হই তবে আপনাকে সংস্কৃতি মন্ত্রী বানাবো। আপনি মানুষকে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবেন।

আলী আহমদ মিটিমিটি হাসে। সাবের রেগে যায়, হাসছেন যে? কি ভাবছেন?

ভাবছি, সংস্কৃতি মন্ত্রী হলে আমাকে কেমন মানাবে।

মোটেও তা ভাবছেন না। ভাবছেন, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি কি না।

দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকেছে। পোকাটা বের করে ফেলুন।

আলী আহমদের কথা লুফে নিয়ে সাবের বলে, ঠিক বলেছেন। একটা ভীষণ পোকা অনবরত কাটছে আমার মগজ। মাথাটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আহমদ সাহেব।

থরথর করে কেঁপে ওঠে সাবের। অস্বাভাবিক চাউনিতে তাকিয়ে থাকে। আলী আহমদ অস্বস্তি বোধ করে। ভাবে, সত্যি সাবের পাগল হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষটি কী একজন শক্তিশালী লেখকের সম্ভাবনা নিয়ে এভাবে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুজনে মাঠে এসে বসে। সাবের কখনো গান গায়, কখনো কবিতা আবৃত্তি করে, কণ্ঠে বিষাদ। সে বিষাদ স্পর্শ করে আলী আহমদকে। ও এই বিষাদ উড়িয়ে দিতে

BanglaBook.org

চায়। সাবেরের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলে, বলুন তো এই সম্মেলন থেকে আমরা কি শিখলাম?

সাবের কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আমি কি আপনার ছাত্র যে আপনি আমার সঙ্গে মাস্টারি করছেন? বেশ তাহলে শুনুন, দেখুন তো আমি আপনার উপযুক্ত ছাত্র হতে পেরেছি কি না? প্রথমত, এই সম্মেলনের একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে। যেটা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক। দ্বিতীয়ত, দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে উঠিয়ে এনে সুধীজনের সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে, এই সমন্বয় আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা বাড়ানোর জন্য খুব দরকার। আরো একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে এই সম্মেলন অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক সম্মেলন। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। কী ঠিক উত্তর দিতে পেরেছি?

আলী আহমদ সাবেরের দু'হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, কেন আপনি মিছেমিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে? কেন বলছেন যে আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? এমন চমৎকার চিন্তা যে করতে পারে সে কখনো পাগল হয়?

সাবের গানের সুরে বলে, হয়, হয়। দেখবেন হয়।

কথা বলতে বলতে ও ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। বলে, দেখছেন আকাশে কত তারা? আজ রাতে ঘরে ফিরবো না। এখানেই থেকে যাবো।

কী বলছেন?

দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। আর একটি কথা বললে কিন্তু আমি ভীষণ রেগে যাবো। আপনি এখান থেকে চলে যান।

সাবেরের কণ্ঠে ভয় পায় আলী আহমদ। আর একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে আসে। হাঁটতে হাঁটতে আলী আহমদ অনুভব করে সাবের ওকে রুক্ষ, রূঢ় ভাষায় চলে যেতে বলেছে, ও ইচ্ছে করলেও সাবেরকে ঘরে নিতে পারবে না। পরক্ষণে ওর বুকের ভেতর খামচি লাগে, ও থমকে দাঁড়ায়, সাবের কি পথের মানুষ হয়ে গেলো? ও কি আর ঘরে ফিরবে না?

পরদিন দু'জনে ঢাকায় ফিরে আসে। বাসে সাবের ওর সঙ্গে একটা কথাও বলে না। ফিরেও তাকায় না। একমনে সিগারেট টানতে থাকে। আলী আহমদের মনের ভেতর সম্মেলনের জের। বারবারই রাজশাহীর কথা মনে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের সময়কার দিনগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাগমারি সম্মেলনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ যোগ আছে। সেদিন ওরা স্লোগান দিয়েছিলো 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই', বুঝে অথবা না বুঝে। যদি কেউ বুঝে বলে থাকে, তবে এ সত্য কী অনিবার্য হবে আমাদের জীবনে? আমি তো সত্য বলে ভাববার চেষ্টা করছি। আলী আহমদের ভেতরটা কেঁপে যায়। ও জানালার শিক চেপে ধরে। হু-হু করে বাতাস আসছে, যেন মহানন্দার জল ছুঁয়ে আসা শীতল বাতাস। ও সাবেরের মুখের দিকে তাকায়। সে মুখ নির্বিকার, ভাবলেশহীন– সিগারেটের ধোঁয়ার রেখা ওর চোখের সামনে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে। শহরে পৌঁছে সাবের ওর সঙ্গে একটাও কথা না বলে হনহনিয়ে হেঁটে চলে যায়। আলী আহমদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কেমন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছে সাবের। আলী আহমদ আনমনে ঘরে ফেরে।

সামনে প্রদীপ্তর ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কলেজ থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বসে। নানা বিষয় পড়ায়। ও যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ রাত জেগে বসে থাকে পুষ্পিতা। মাঝেমাঝে প্রদীপ্তর রাগ হয়। বলে, সারাদিন সংসারের খাটনি খেটে আমার জন্য রাত জাগতে হবে না মা। তুমি ঘুমোও।

BanglaBook.org

পুষ্পিতা হাসে। বলে, তোর জন্য বসে থাকতে তো আমার খারাপ লাগে না রে। ঘরে গরম, ঘুম আসে না। তার চেয়ে বারান্দার এই ঠাণ্ডা বাতাস অনেক ভালো।

প্রদীপ্ত আর কথা বলতে পারে না। হ্যারিকেনের আলোয় গুণগুণিয়ে পড়া মুখস্থ করে। একসময় চোখ জড়িয়ে এলে পুষ্পিতা ওকে বিছানায় নিয়ে যায়। মশারি খাটিয়ে দেয়। ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেন নেভানোর আগে একটুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকায়। ও গুটলি পাকিয়ে শুয়েছে, বুকের কাছে হাঁটু জড়ো করা। গোঁফের চিকন রেখা এবং শক্ত চোয়াল দেখলে বোঝা যায় ও কৈশোর ছাড়িয়েছে। ও এখন যৌবনের দুয়োরে। পালিয়ে আসা দিনের কথা মনে হয় পুষ্পিতার। এখন ও কি মায়ের সঙ্গে যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইবে? সেদিন ও কত অবলীলায় প্রতীকের নাম রেখেছিলো জিতু। বলেছিলো, ও তো যুদ্ধে জিতেছে। ঘটনাটা আলী আহমদ পুষ্পিতাকে অনেকবার বলেছে। পুষ্পিতা হাঁটু গেড়ে বসে প্রদীপ্তর কপালে চুমু দেয়, দীপু, আমার দীপু। পরক্ষণে ওর ভয় করে, ছেলেটি বড় হচ্ছে, ছেলেটি ওর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুষ্পিতার মন খারাপ হয়। কষ্ট হয়। ও ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেন নিভিয়ে নিজের বিছানায় আসে। আলী আহমদ পাশ ফিরতে ফিরতে বলে, দীপু ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ।

রাত কত? এভাবে রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ করবে?

পুষ্পিতা ভিন্নস্বরে কথা বলে, হ্যাঁ গো ছেলেটা কি আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে?

আলী আহমদ হাত বাড়িয়ে পুষ্পিতাকে কাছে টানে। বলে, ঘুমোও। কষ্ট বাড়িয়ো না। ওকে তো তোমার আঁচল ছিঁড়তেই হবে। নইলে ও বড় হবে কি করে?

বড় হওয়া মানে কি মায়ের আঁচলের বাঁধন ছেঁড়া?

ধরো, একরকম তাই।

পুষ্পিতা নিশ্বাস ফেলে। কোনো কথা না বলে বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়।

BanglaBook.org

মাস দুয়েক পরে নওয়াবপুর রোডে শহীদ সাবেরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে আলী আহমদ। নোংরা জামাকাপড়, উস্কখুস্ক চুল, রুক্ষ চেহারা, চোখে ক্লান্তি, দু' আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছে। শহীদ সাবেরকে চিনতে ওর কষ্ট হয়। সাবের ওর পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই আলী আহমদ হাত চেপে ধরে।

সাবের ভাই?

সাবের এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়।

সাবের ভাই?

থুঃ।

একদলা থুতু ছিটোয় সাবের।

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

সাবের ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ধপ্ করে নিভে যায়। ও মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে। আলী আহমদ একটুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দ্রুত গিয়ে আবার হাত ধরে।

সত্যি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না সাবের ভাই?

আপনি ভুল করছেন। আমি শহীদ সাবের নই।

আলী আহমদের চোখ ফেটে পানি আসে। ও আর কি বলবে বুঝতে পারে না। এমন পরিস্থিতি ওর জীবনে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত ও তা জানে না। দেখতে পায় গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সাবের। হাতে সিগারেট, পায়ে স্যান্ডেল নেই। জট-পাকানো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আলী আহমদ বুঝতে পারে সাবের সত্যি পাগল হয়ে গেছে। ওর বুকের ভেতর ধ্বস নামে। ও রিকশা নিয়ে জুলেখার বাড়িতে আসে। তখন দুপুর গড়িয়েছে। ওকে দেখে বিস্মিত হয় জুলেখা।

আলী আহমদ ঘরে ঢোকে না। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, সাবেরের খবর জানেন?

জুলেখার দৃষ্টি কেঁপে যায়। বলে, জানি। মতিউর ওর চিকিৎসার জন্য ছুটোছুটি করছে। পাবনা পাঠানোর কথা হচ্ছে।

যাই।

বসবেন না?

না। কিছু ভালোলাগছে না। আর একদিন আসবো।

জুলেখার কোল থেকে ওর মেয়ে আলী আহমদের দিকে হাত বাড়ায়। আলী আহমদ ওকে আদর করে। জিজ্ঞেস করে, কি নাম রেখেছেন মেয়ের?

বন্যা।

বাহ্, সুন্দর।

আলী আহমদ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ওর চোখের সামনে শহরটা ধূসর হয়ে যায়।

BanglaBook.org

১৮

কালো খালার দীর্ঘ চিঠি পেয়ে পুষ্পিতার মন খারাপ হয়ে যায়। কত গুছিয়ে আবেগ দিয়ে দুঃখের কথা লিখেছে কালো খালা। চোখ মুছে পুষ্পিতা বলে, আমি রাজশাহী যাবো।

আলী আহমদও ভেবে দেখলো প্রায় বছর তিনেক রাজশাহী যাওয়া হয়নি। প্রদীপ্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছে। মায়ের কথা শুনে ও লাফিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, আমরা রাজশাহী যাবো। জিতুর তো রাজশাহীর কথা মনেই নেই।

বাবা, আমিও রাজশাহী যাবো।

প্রতীক আলী আহমদের হাঁটু জড়িয়ে ধরে।

ঠিক আছে যাবো।

আলী আহমদ সবাইকে আশ্বস্ত করে। ও বোঝে যাওয়া-আসা না থাকলে মানুষের আত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, রাজশাহী গিয়ে জিতুকে একটি ঘোড়ার গাড়ি কিনে দিও বাবা।

সত্যি দেবে? খুব মজা হবে।

প্রতীক হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, গাড়ি দিয়ে কি করবি?

গাড়িতে করে এই শহরে ঘুরে বেড়াবো। দেখো না নওয়াবরা কেমন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে।

বাবা, জিতুর নওয়াব হওয়ার শখ হয়েছে।

প্রদীপ্তর ঠাট্টা শুনে রেগে যায় প্রতীক। চেঁচিয়ে বলে, ভালো হবে না কিন্তু ভাইয়া।

প্রদীপ্ত ওর মাথায় চাটি মেরে দৌড়ে উঠোনে নেমে গেলে প্রতীকও পিছু পিছু ছোটে।

পুষ্পিতা দিনভর কেনাকাটা করে। সবার জন্য কাপড়চোপড় কেনে। রাত জেগে পিঠে নাড়ু বানায়। ভোরবেলা কুদ্দুস আসবে। ও বাসায় থাকবে। ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছে। আগামীকাল যাত্রা। পুষ্পিতার মনে আনন্দ, গুণগুণিয়ে গান গায় ও– যেন কতদিন পর বাবার বাড়ি যাচ্ছে।

খুব সকালে ঘুম ভাঙে আলী আহমদের। পুষ্পিতা নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে। ও ওকে ডাকে না। ট্রেন দশটায়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আলী আহমদ দরজা খুলে বাইরে আসে। বারান্দায় বসে কুদ্দুসের অপেক্ষা করে। বেশ বেলা উঠে যায়, কিন্তু কুদ্দুসের দেখা নেই। ও প্রদীপ্ত আর প্রতীককে ডাকাডাকি করে ওঠায়। সবাই মিলে কুয়োতলায় যায়, হাতমুখ ধোয়। পুষ্পিতা উঠেছে। ভাত রান্না করেছে। ধোঁয়াওঠা ভাত গামলায় করে বারান্দার চৌকিতে এনে রেখেছে। আলু ভর্তা আর ঘি দিয়ে খাওয়া হবে।

কুদ্দুস আসছে না দেখে আলী আহমদের উৎকণ্ঠা বাড়ে। ও গেট খুলে রাস্তায় নামে। একটুখানি হেঁটে গলির মুখে আসতেই ওর গা ছমছম করে। ও মুহূর্তে একটি বাড়ির আড়ালে চলে যায়। রাস্তায় সৈন্য টহল দিচ্ছে। থমথমে, স্তব্ধ চারদিক। বুটের শব্দ আলী আহমদের বুকের ওপর হাতুড়ির মতো পড়ে। কোথাও মানুষ নেই। ও দ্রুতপায়ে ফিরে আসে। গেটের কাছে আসতেই দেখতে পায় পাশের বাসার মোয়াজ্জেম গেট ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে আছে। ওকে দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে, আপনার তো সাহস কম নয়? বেরিয়েছেন কেন?

কী ব্যাপার? আমি কিছুই জানি না। কোনো খবর পাইনি।

মার্শাল ল জারি হয়েছে, মার্শাল ল। মোয়াজ্জেম দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, মধ্যরাতে ইস্কান্দার মীর্জা বিশেষ ঘোষণায় দেশব্যাপী সামরিক আইন ঘোষণা করে। জান ঘরে ঢুকে পড়ুন।

আলী আহমদ দু'পা এগুতেই মোয়াজ্জেম পিছু ডাকে, শুনুন আহমদ সাহেব, রাস্তায় কি দেখলেন?

আলী আহমদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মিলিটারির টহল। কাঁধে রাইফেল, বুটের খটখট শব্দ। জনপ্রাণী শূন্য রাস্তা। তারপর দু'হাতে নিজের মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলে, তবু আমরা তো বেঁচে আছি।

ও নিঃশব্দে গেট বন্ধ করে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠে। পুষ্পিতা তখনো ব্যস্ত। ওর কণ্ঠে গান। প্রদীপ্ত আর প্রতীক বারান্দার চৌকিতে বসে হাতের আঙুলে লুকোচুরি খেলছে। আলী আহমদের স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা কি হয়েছে?

পুষ্পিতাও কাছে এসে দাঁড়ায়। আলী আহমদ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, যাওয়া হবে না।

কেন? যাওয়া হবে না কেন?

তিনজনের কণ্ঠ উপেক্ষা করে আলী আহমদ মাথা নাড়িয়ে বলে, সামরিক আইন।

প্রদীপ্ত বিস্ময় প্রকাশ করে, সামরিক আইন?

প্রতীক আলী আহমদের হাত ঝাঁকিয়ে বলে, বাবা সামরিক আইন কি?

BanglaBook.org

আলী আহমদ ওর প্রশ্নের জবাব দেয় না। চুপচাপ নিজের পড়ার টেবিলে এসে বসে। ও জানে এই মুহূর্তে ওর একমাত্র মানসিক আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। ও দ্রুত হাতে রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট'-এর পাতা ওল্টায়।

আস্তে আস্তে খবর হতে থাকে। ইস্কান্দার মীর্জা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ বরখাস্ত করেছেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেছেন। সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। সংবিধান রহিত করেছেন। সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন।

খবরের কাগজে এতকিছু পড়ে পেছনের দিকে তাকায় আলী আহমদ। গত মাসে পরিষদের ভেতরে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার শাহেদ আলী দলাদলি-কোন্দলের ফলে আহত হয়। তার দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয় এবং ২৬ তারিখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শাহেদ আলী মৃত্যুবরণ করেন। এর কদিন পরে সামরিক শাসন। অথচ বলা হয়েছিলো আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্টো মার্শাল ল রেগুলেশন জারি করে বলা হয়েছে কোনো ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা এবং দেশের সংহতি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হলো। ব্যাপকহারে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করা হয়।

আলী আহমদ পায়চারি করে। ও জানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ। ওরা বড় গলায় বলছে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক কোন্দল বন্ধ করার এটি একমাত্র পথ। আলী আহমদের জিভে বিদ্রূপ শাণিত হয়ে ওঠে। মাথা কেটে মাথা ব্যথার উপশম করা আর কী! ভালো, সাধু ভালো! মানুষ কি আর বুঝবে না যে সাধারণ নির্বাচনকে আড়াল করা হলো!

সামরিক আইন প্রদীপ্তকে খানিকটুকু হলেও নিজেকে বুঝতে শেখায়। ও এখন সতেরো বছরের তরুণ। এই বয়সে অনেকে হয়তো রাজনীতি বোঝে, কিন্তু ও তেমন করে বোঝে না। ও বুঝতে পারে যে রাস্তায় হাঁটতে ওর ভয় লাগে। কেবল মনে হয় ওর এতদিনের চেনা শহরটা দখল হয়ে গেছে। এ শহর ওর শহর নয়। ভিন্ন ভাষী অপরিচিত সৈনিকগুলো কটমটে দৃষ্টিতে তাকায়। অকারণে ওকে ওকে– মারধোর করে। শহরে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। দেখেশুনে প্রদীপ্ত প্রথম প্রথম বিপন্ন বোধ করতো, কিন্তু কয়েকদিন ধরে সৈনিকদের দেখলেই ওর করোটিতে ক্রোধ জন্মায়। ও নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওদের খুলি উড়িয়ে দিতে। ওদের রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে ওদেরকে বুলেটে ঝাঁঝরা করে ফেলতে। ওর এইসব কথা শুনলে আলী আহমদ খুশি হয়। ও চায় প্রদীপ্তর চেতনার গ্রন্থিগুলো এভাবে খুলে যাক, ও বড় হোক। নিজে নিজে বুঝতে শিখুক।

ওর এই মানসিক অবস্থার মধ্যেই ঘটে গেলো ঘটনাটা।

দুপুরের পরে ও নওয়াবপুর রোডে দেখেছিলো শহীদ সাবেরকে, একটা ছেঁড়া চট গায়ে জড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাবা একদিন ওকে দেখিয়েছিলো, বলেছিলো সাবেরের অনেক কথা। তাই দেখেই ও দৌড়ে কাছে গিয়েছিলো। মানুষটির জ্বলজ্বলে তীব্র দৃষ্টি দেখে ও ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। সিগারেট পুড়তে থাকে শহীদ সাবেরের দু'আঙুলের ফাঁকে। তারপর এক দলা থুতু ছিটিয়ে হেঁটে যায় সাবের। প্রদীপ্তর মাথা কেমন করে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে চায়, কাকে থুতু দিলেন আপনি? তেমনি কেউ কী আছে যে বুঝবে এই থুতুর অর্থ কী?

মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে ওঠে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দেখেছিলো পুষ্পিতার জ্বর। মায়ের কথা মনে পড়তেই ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে থাকে। গলির মুখে ঢুকবার

BanglaBook.org

সময় দেখতে পেলো একজন সৈনিক জনৈক রিকশাওয়ালাকে বেত দিয়ে মারছে। লোকটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বারবার সৈনিকটির পা চেপে ধরতে যাচ্ছে। প্রদীপ্ত ছুটে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দু'হাতে বেতটা চেপে ধরে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গাল দেয়, খবরদার! কুকুর!

কিন্তু সেটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। পরক্ষণে সেই লকলকে বেত ওর হাত থেকে ছুটে যায়। সৈনিকটি ওর চুলের মুঠো ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাথি দিয়ে ওকে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। তার আগে লকলকে বেত ওর শরীর লাল করে দিয়েছে।

সতেরো বছরের প্রদীপ্ত মার খেয়েও জ্ঞান হারায়নি। রাস্তার লোকেরা ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। দুদিন পরে ও আলী আহমদকে জিজ্ঞেস করে, বাবা এর নাম কি সামরিক শাসন?

আলী আহমদ জবাব দেয় না। খুব কষ্ট করে নিজের আবেগ দমন করে। দুপুরে ভাত খাবার পর ও প্রদীপ্তকে রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকটা দিয়ে বলে, পড়ো।

ও বিছানায় শুয়ে বুকের ওপর রেখে বইটা পড়ে। সেই পৃষ্ঠায় এসে ও থেমে যায়, যেখানে সৈনিক বলছে, 'যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।' ধনপতি বলছে, 'ওই সোজা কাজটাই জান তোমার। মাথা খাটাতে পারো না, কাটতেই পারো মাথা।'

প্রদীপ্ত বইটা বন্ধ করে চোখ বোজে। বুঝতে পারে, বাবা কেন ওকে এই বইটি পড়তে দিয়েছে। মাথা খাটানোর বদলে মাথা কাটাতে যাদের রুচি, তাদের হাত দিয়ে শাসন মানেই সামরিক শাসন। এবং সেটা পীড়ন।

ও খাটের ওপর উঠে বসে। অস্থির লাগছে। শুতে ইচ্ছে করে না। স্নায়ু টানটান হয়ে উঠতে চায়। প্রতীক এসে ওর পাশে বসে। পিঠে হাত বুলোয়। বলে, ভাইয়া তোমার পিঠটা একদম কালচে হয়ে গেছে। খুব ব্যথা পেয়েছিলে না?

হ্যাঁ।

প্রদীপ্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

তোমার পিঠটায় কেমন আঁকাবাঁকা দাগ পড়েছে। কেন তুমি ওদের বাধা দিতে গেলে ভাইয়া?

আমার রক্ত চড়চড়িয়ে উঠেছিলো। মনে হয়েছিলো বাধা না দিলে ওরা আমাদের মাথায় উঠবে।

প্রতীক ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার কী কষ্ট হচ্ছে?

তুই বুঝবি না জিতু। ব্যথা যা পেয়েছি সেটা আমার শরীরে নয়, ব্যথা মগজে।

কেন ভাইয়া?

ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছি ওরা খুব হিংস্র। ওরা আমাদের লোক নয়। ওরা পরদেশী। আমাদেরকে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে রে।

কারা লড়বে?

আমরা সবাই লড়বো।

আমিও?

হ্যাঁ, তুমিও।

ওহ্ লড়াই, লড়াই।

কোনোকিছু না বুঝেই প্রতীকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে ও লড়াই, লড়াই শব্দটি স্লোগানের মতো বলতে থাকে।

প্রদীপ্তর মনে হয় প্রতীকের মুখের প্রতিটি রেখার মধ্যে কালসিটে ছায়া। ওর কপালের দু'পাশের শিরাগুলো নীল হয়ে ফুটে উঠে আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

গায়ত্রী সন্ধ্যা

২য় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৯.
প্রচ্ছদ : মঈন আহমেদ
উৎসর্গ : যে পরাক্রান্ত, ইতিহাস সৃষ্টি করে তার জন্য আহ্বান : তিষ্ঠ ক্ষণকাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

প্রকাশিত হলো 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই'।

'গায়ত্রী সন্ধ্যা : এক'- এর ব্যাপ্তি ছিলো সাতচল্লিশ থেকে আটান্ন। দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাপ্তি উনষাট থেকে উনসত্তর। ষাটের দশক ছিল বাঙালির জীবনে একটি অভিঘাতময় সময়। একদিকে সামরিক শাসনের পীড়ন, অন্যদিকে জাতি হিসাবে বাঙালির জাগরণ– সব মিলিয়ে এক কঠিন অথচ বিশাল সময়।

এ দু'য়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদে জিতেছে বাঙালি। এ জেতা নিজের স্বরূপকে চেনার বিজয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীকে এ বিজয় অর্জনের মূল্য দিতে হয়েছে আবার একটি সামরিক শাসনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। এ সময়ের শব্দরূপ 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই।'

১৯৯৩-এর নভেম্বর মাসে ফোর্ড ফাউন্ডেশন এই উপন্যাস লেখার জন্য ফেলোশিপ দিয়েছে আমাকে। কি লিখবো সে ভাবনা আমার– কীভাবে লিখব সেটি আমার স্বাধীনতা। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কনসালটেন্ট ডঃ যোশী বলেছিলেন, 'একজন লেখক জীবিকার জন্য মাথা না ঘামিয়ে তার সৃজনশীল কাজ করতে পারেন, ফেলোশিপ দেয়ার পেছনে এ বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছি।' এর সঙ্গে আরো যোগ করেছিলেন এই বলে যে, 'এখন অফুরন্ত সময় নিয়ে নিজের মতো করে কাজ করুন।' নিজের মতো করে কাজ করা সহজ কথা নয়। শিল্পের দাবি মেটানো কঠিন। একজন শিল্পী শুধু চেষ্টাই করে যেতে পারেন, কি হবে তা তাঁর জানা থাকে না। বই বেরোয় শুধু এটুকুই আনন্দ।

প্রকাশক মজিবর রহমান খোকা কাগজের দুর্মূল্য সত্ত্বেও উপন্যাসটি প্রকাশের ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি।

সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

সেলিনা হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফেরার পথে প্রদীপ্তর মনে হয় যেদিকে তাকায় সেদিকেরই দরজা খোলা। মনেই হয় না এটি একটি ছোট্ট শহর, এখানে ছোট ছোট কুঠুরি আছে, কুঠুরির ভেতরে মানুষের কোলাহল আছে এবং মানুষগুলোর পিঠের দিকে তাক করা আছে ষড়যন্ত্রের বিষ-মাখা তীর, ফাঁক পেলেই পিঠ-বুক ফুটো করে দেবে। প্রদীপ্ত হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, তবু এটা আমারই শহর- আমার কৈশোর, যৌবনের শহর। আমি ঐ তীরের দিকে বুক পেতে রাখি– আমার ভয় নেই। ভয়? শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্তর মনে হয় সেই ছোটবেলায় বাবা-মার হাত ধরে ভারত থেকে পালিয়ে আসার স্মৃতি ও ভোলেনি। মহানন্দা নদী পার হবার সময়ই মনে হয়েছিল ওর ভয় নেই। কী বিশাল নদী, কী প্রবল স্রোত। নৌকায় বসে থাকা মানুষগুলো ভয়ে আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছিল, যেন ঐ নদীটি বুঝি পার হওয়া যাবে না। বয়স্কদের ভয় ওকে স্পর্শ করেনি- আশঙ্কাও ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ওর উচ্ছ্বাস দেখে বাবা নৌকায় বসে থাকা অন্যদের বলেছিলেন, শিশুরা এ ধরনের ভয় বোঝে না। বাবার এই কথাটি পরবর্তী সময়ে ওকে অনেক ভাবিয়েছে, এখনো ভাবায়। ও নিজের বেলায় এমন একটি দার্শনিক কথা মানতে পারেনি। শিশুরা হয়তো এ ধরনের ভয় বোঝে না, এটা কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে, কিন্তু ওর বেলায় সত্যি হয়নি। ও ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে অন্য কারণে। আসলে হিংস্র মানুষের দ্বারা তাড়া খাওয়া শৈশব ওর ভয় কাটিয়ে দেয়ার ফলে সে শৈশব ওর জীবনের আগামী দিন হয়েছিলো।

প্রদীপ্ত চারদিকে তাকিয়ে আবার নিজের মুখোমুখি হয়। এই নতুন শহরে ওর কৈশোরের শুরু– বুঝতে শেখার সময় থেকেই এই শহরের সঙ্গে নাড়ির টান অনুভব করেছিল। আপনজনকে ভয় না পাওয়ার যে একটি জোয়ার থাকে এই শহর ওকে সেই অভয় দিয়েছিলো। ও কোনো মানুষ বা ঘটনার সামনাসামনি হতে ভয় পায়নি। শৈশবে দেখা বিশেষ কতগুলো হিংস্র মানুষের মুখ ওর স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হিংস্রতার আদল বদলায়, ভিন্ন আকারে তা রূপান্তরিত হয়, সেজন্য ও হিংস্র মানুষের মুখ ভোলে না। এই শহরের পথে পথে হেটে গেলে কোনো না কোনো সময় হিংস্র মানুষ সামনে এসে দাড়ায়। ও বুঝে যায় কি করতে হবে। কখনো হিংস্র সময় ঈগলের ঠোঁট নিয়ে শহরের ওপর নেমে আসে– তখন হয়তো হিংস্র মানুষের মুখোমুখি হতে হয় না, তারা অদৃশ্য থাকে– কিন্তু শহরের মানুষ চারপাশে তাকালে বুঝতে পারে এই মুহূর্তে তারা নিরাপদ নয়। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে, এই শহরের চারদিকে এখন তেমন সময়। একজন হিংস্র ফিল্ড মার্শাল বেঁচে থাকার দর্শনে কালো ছায়া ফেলেছে। হিংস্র সামরিক আইন জারি করে বেঁচে থাকার সীমানা মহানন্দা নদীর পাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে। পারবে কি? অসংখ্য ভয়হীন মানুষ জন্মেছে, তারা দু'হাতে বাতাস ধরতে পারে। ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে, ইতিহাসের ছাত্র হয়ে আজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের শুরু, একদিন এই শহরের ইতিহাস লিখবো

BanglaBook.org

আমি। আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনের একটা ছদ্ম আবরণ দিয়েছে, বলেছে মৌলিক গণতন্ত্র। প্রদীপ্ত ভাবে, গণতন্ত্র কি? কি তার ব্যাখ্যা? কত তার পথ? নিজস্ব নিয়মে গণতন্ত্র রচনা করলেই কি গণতন্ত্র হয়? নাকি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজস্ব নিয়ম তৈরির ভঙ্গিটাকে গণতন্ত্র বলে চালানো হয়? এসব ভাবলে ওর হাসি পায়। কিছু কিছু মানুষের জন্য করুণা হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের ভেতরে হাসির অনুভব অন্যরকম হয়ে যায়। ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে এক ঝলক বাতাস গলগল করে ভেতরে ঢুকে যায়। ও বড় করে শ্বাস টানলে বুক তোলপাড় করে ওঠে। হাসির সাথে বুক তোলপাড় করে ওঠার একটি গূঢ় সূত্র আছে। আজই ভর্তি হওয়ার সময় একজনের হাসি মুখ ওকে বিচলিত করেছে। আচমকা মনে হয় কাউকে ভালোবাসার বয়স হয়েছে ওর। পরক্ষণে নিজে নিজে লজ্জা পায়, ভালো লাগার লজ্জা। নিজের আবেগকে শান্ত করার জন্য ও দ্রুত বেগে হাঁটতে থাকে।

ও টের পায় না ওর পিছু পিছু আবেদ আলী আসছে, সেই রিকশাওয়ালা, যাকে পিটুনি দেয়ার প্রতিবাদে মিলিটারির হাতে মার খেয়েছিল ও। গতকাল জেলখানা থেকে বেরিয়েছে আবেদ। রাতে ফুলবাড়িয়া রেল-স্টেশনে কেটেছে ওর, এখন কোথাও যাবার জায়গা নেই। ও জানে না কোথায় যাবে। কয়েক বছর আগে ওর একটি ঠিকানা ছিলো, সে ঠিকানায় কাউকেই খুঁজে পায়নি। মাথার ওপর গনগনে সূর্যের দুপুর। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় এবং ব্যস্ততা। ও ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। একটু পরপরই কারো না কারো গায়ের সাথে ধাক্কা লেগে যায়। ও বিরক্ত হয়। পাঁচ বছর বিনা বিচারে জেল খেটে আবেদ আলী কিছুটা বেকুব হয়ে গেছে। ও ওর ভোঁতা বোধ নিয়ে শহরটা দেখে। জামার পকেটে হাত ঢোকালে রুমালটা উঠে আসে, ওটার মধ্যে সামান্য কিছু টাকা বাঁধা আছে। এত সামান্য যে ওটা দিয়ে ওর কিছু হবে না। পাঁচ বছর আগের লুঙ্গি এবং জামাটি ফেরত দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। অনেকক্ষণ ধরে এই পুরনো কাপড়ের গন্ধ ওর অনুভূতি আরো ভোঁতা করে দেয়। গা চুলকাচ্ছে, ইচ্ছে করে জামা কাপড় খুলে ফেলে দিয়ে দিগম্বর হয়ে যেতে। মনে হয় জেলজীবনের এত বছরে ও এক ধরনের স্বস্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। এখন এই শহরের অনভ্যস্ত জীবনযাপন ওকে ক্রমাগত বিরক্ত করে। ও পায়ের কাছে পড়ে থাকা ইটের টুকরো লাথি দিয়ে ফেলে দেয়। বুঝতে পারে পেটে প্রচণ্ড খিদে, তাই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে ঘূর্ণি। জেলে যাবার সময় বউ এবং দশ বছরের মেয়ে ছিলো। এখন ওরা কোথায় ও জানে না। এই শহরে কোথায় ওদের খুঁজবে ও? পুরো শহরটা ওর সামনে একজন ষড়যন্ত্রকারীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেন ও যেদিকেই এগুতে চায়, সেদিকেই পথ বন্ধ। চারপাশের মানুষের হাতে বিশাল রামদা। এই দায়ের নিচে আবেদ আলী মাথা পেতে রেখেছে। গতকাল জেলগেট খুলে দেবার সময় দারোয়ান সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিল,এ্যাত গুলান বছর ফালান গ্যালো। আহা বেচারা।

আবেদ আলীর মনে হয়েছিল ওর গালে দু'টো চড় মারে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। মানুষের সহানুভূতি ওর অসহ্য লাগে। ঠিক তখনই প্রদীপ্তর মুখোমুখি হয় ও। প্রদীপ্ত রাস্তা পেরুনোর জন্য ফিরে দাঁড়াতেই দেখতে পায় আবেদ আলীকে। লোকটা অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওর পায়ে সালাম করে, সাব আপনে?

প্রদীপ্ত প্রথমে চিনতে পারেনি, তারপর হকচকিয়ে বলে, তুমি? আবেদ আলীর ঠোঁটে ম্লান হাসি, আমি। আপনে আমারে মিলিটারির হাতে মাইর খাঅন থাইকা বাঁচাইলেন তার মাসখানেকের মদ্যে আমি জেলে গেলাম।

জেলে? তুমি জেল থেকে বেরুলে? কবে ছাড়া পেয়েছো? কি হয়েছিলো?

মেলা কতা সাব। মাত্র কালকে ছাড়া পাইলাম। মেলা ভুখ লাগছে।

BanglaBook.org

চলো, তোমাকে কিছু খাওয়াবো। তোমার কথাও শুনবো। চলো ঐ চায়ের দোকানটায় বসি।

কৃতজ্ঞতায় আবেদ আলীর দৃষ্টি চক্‌চক্‌ করে ওঠে। প্রদীপ্তর পিছু পিছু চায়ের দোকানে ঢোকে। প্রদীপ্ত ওকে এক প্লেট ভাজি আর রুটি দেয়। ও গোগ্রাসে খেতে থাকে। পেছনে বাজতে থাকে ওর কষ্ট– এই শহরের ভাসমান মানুষ আবেদ আলী। গ্রাম থেকে ভাসতে ভাসতে শহরে আসে। কাঁটাবন বস্তিতে সংসার সাজায়। রিকশা চালিয়ে উপার্জন মন্দ ছিলো না। বউ-মেয়ে-নিয়ে সুখের সংসার ওর। কিন্তু বেশিদিন সে সুখ কপালে সইলো না। ডাকাতি কেসে মিছেমিছে ওর নাম বলেছিলো বাসেত। বলেছিলো তোর সংসারের সুখ আমার সহ্য হয় না। তোর জীবনটা ছারখার করে দিলে কেমন হয়? তুই আমার বন্ধু। চল এক সঙ্গে ঘুরে আসি জেল থেকে। তারপর বিনা বিচারে কেটে গেলো এতগুলো বছর। আবেদ আলীর ঝাপসা চোখের ওপর ভেসে ওঠে বাসেতের দানবের মতো মুখ।

আবেদের মুখে এটুকু শুনেই বিচলিত হয় প্রদীপ্ত। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে! এ কেমন অদ্ভুত খেলা? তবু নিরীহ আবেদ আলী এ অদ্ভুত খেলার শিকার হয়েছে। এখন ওর আবার নতুন করে চিনতে হবে এই শহরকে। আবেদ আলীর দিকে তাকালে প্রদীপ্তর মনে হয় লোকটির ভেতর ও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। কারণ ওর অভিজ্ঞতায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষই তো ও খুঁজে বেড়ায়, যে ওকে একটুখানি আলো দিতে পারবে। আবেদ আলীর চেহারায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে ও প্রশ্ন করে, তুমি তোমার বউ মেয়েকে খুঁজতে যাওনি?

আবেদ আলী মাথা কাত করে, গেছিলাম। নাই কেউ।

নাই শব্দটি ও এমন করে বললো যে দু'তিন গ্লাস পানি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় শব্দটি রক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলো। ওখান থেকে সেটির আর আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেই ফেলে যাওয়া জায়গাটি ওর খুঁজে পেতে সময় লেগেছিলো। অচেনা হয়ে যাওয়া জায়গাটিতে গায়ে গায়ে ঘর উঠেছে, মানুষ বেড়েছে। রোষের ঘোড়া বেড়েছে– আস্তাবলের উৎকট গন্ধ তীব্র হয়েছে। রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা, সবজির খোসা, ভনভনে মাছি, শিশু এবং কুকুরের মল– না, আবেদ আলী দু'হাতে মুখ ঢাকলে ফেলে-আসা পরিচ্ছন্ন গ্রামটি ওকে নস্টালজিক করে। বুকের ভেতর একটা সুতো অনবরত প্যাঁচ খায়। কতদিন আগে ওর এমন জীবন ছিলো– কতগুলো বছর ও এই জীবন থেকে আলাদা হয়েছিলো। কোথায় ওর আয়েশা আর কলমী? জেলে বসে বাসেত বলেছে, আয়েশার ওপর ওর লোভ হয়েছিলো। কিন্তু আয়েশা ওকে পাত্তা দিতো না বলে বাসেতের রাগ হয়েছিলো। তাই ডাকাতি কেসে নিজের অপরাধের সঙ্গী করে নিলো আবেদ আলীকে। কথা বলতে বলতে এক চুমুকে শেষ করে ফেলা খালি গ্লাসটা ঠক্‌ করে টেবিলের ওপর রাখে আবেদ আলী। প্রদীপ্ত এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয় মানুষের অভিজ্ঞতা তার চেতনাকে ধারালো করে। এটা হয়তো সব মানুষের ক্ষেত্রে সত্য নয়, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে সত্য, যারা নিজের মতো করে চিন্তা করতে পারে। যাদের অনুভব তীক্ষ্ণ, তারা সৃজনশীল। আর সৃজনশীল মানুষ নিরক্ষর হলেও মেধাবী। আবেদ আলী সম্পর্কে এরকম একটা সিদ্ধান্তে এসে যায় প্রদীপ্ত। বাসেতের লোভ হতে পারে আয়েশার জন্য, এটি নর-নারীর সম্পর্কের সহজ কথা। কিন্তু সে কারণে আবেদ আলীর জীবনটা তছনছ করে দেয়ার বাসনায় যে হিংস্রতা আছে, সেটা এক জটিল মানবধর্ম। এখন কি করবে আবেদ আলী?

গ্লাসের শেষ জলের ফোঁটাটা টেবিলের ওপর ফেলে তর্জনি দিয়ে সে ফোঁটাটাকে বড় করতে করতে আবেদ আলী দেখতে পায় বস্তির একটি ডালিম গাছের নিচে ও দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

সামনের ঘর থেকে বছর দশেকের একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। আবেদ আলী বেকুবের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটিকে দেখে কেন ও কলমীর কথা ভেবে বেকুব হয়ে যাচ্ছে? বেকুব হওয়ার জন্য কি ও এতগুলো বছর নষ্ট করেছে? নিজের মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠলে জল থেকে মাথা তোলা সাঁতারুর মতো হয়ে যায় ও। ভাবে জিতটা ওর। ও ডুব সাঁতার দিয়ে একটানে অন্য পাড়ে এসে উঠতে পেরেছে। এখানে ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধ নেই, সঙ্গমরত কুকুরের ঘেউ ঘেউ নেই। এখানে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ নেমে এসেছে। ও খুঁজে পেয়েছে ওর কলমীকে। মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে, ওর ভুরু কুচঁকে থাকে। দৃষ্টিতে বিরক্তি এবং কৌতূহল দু'টোই। আবেদ আলী গাছের নিচে বসে পড়ে। মেয়েটি ওর কাছে আসে।

তুমি কেডা?

মানুষ।

ঘর নাই?

না।

তোমার কেউ নাই?

আমার তো তুমি আছো। তুমি আমার কলমী।

কেডায় কইছে? আমার নাম মিন্তি।

মাগো এক গ্লাস পানি খাওয়াইবা?

মিন্তি দৌড়ে গিয়ে পানি আনে। ও একজন কথা বলার লোক পেয়ে বর্তে যায়। একটু একটু করে আবেদ আলীর ঘনিষ্ঠ হয়।

কলমী কেডা?

আমার মাইয়া।

কত বড়?

অনেক বড়। তোমার বাপে কৈ?

মাইনষের বাড়িতে কামে গেছে। আমি ঘরে থাইকা আমার ভাইরে পাহারা দি। ও অহন গুমায়।

আবেদ আলী আনমনা হয়ে যায়। এখন ওর কোনো ঘর নেই। কোথাও ঘুমুনোর জায়গা নেই। ওর কী প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। এখন ও কোথায় যাবে? ভাবতে ভাবতে ও মিন্তি কে বুকের মধ্যে টানে। এমন হৃদয় শীতল করে বলেইতো শিশুরা মানুষের বেদনা এবং ভালোবাসার আশ্রয়।

তোমার খিদা লাগছে?

আবেদ আলী মাথা নেড়ে বলে, না।

মিন্তি ম্লানমুখে বলে, আমাগো গরে কিছু নাই। থাইকলে তোমারে প্যাট ভইরা খাওয়াইতাম। মা দুপ্পরের কাম শ্যাষে ভাত আনবো।

আমি অহন যাই।

আবেদ আলী উঠে দাঁড়ায়। মিন্তি ওর হাত জড়িয়ে ধরে, কাইলকা আবার আসবা কিন্তু। আসবা তো?

আবেদ আলী ঘাড় নাড়ে। বুঝতে পারে সামান্য আদরে মেয়েটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ও স্টেশনে এসে বসে থাকে। বারবার চোখ ঝাপসা হয়। হুসহুস শব্দে স্টেশনে ট্রেন ঢোকে। প্ল্যাটফর্মে ছুটোছুটি, চিৎকার। ও দু'চোখ মেলে দেখে এই আসা-যাওয়ার দৃশ্য। কতকাল ও এসব দেখেনি। ওর ভালো লাগতে শুরু করে। ও নিজেকেই বলে, আবার নতুন কইরা শুরু করমু, আবার সংসার সাজামু। এতদিনে আমার কলমীর বিয়া

BanglaBook.org

অইয়া গেছে। আমি আরো একডা কলমী চাই।

কথা বলতে বলতে আবেদ আলী সজল চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে প্রদীপ্তর সামনে। একজন অসহায় মানুষের চেহারা দেখতে পায় ও– এই আবেদ আলী সেই মানুষটি যাকে বেত দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করেছিলো সৈনিকরা, আজও সেই যন্ত্রণা, সেই কাতরোক্তি ওর অবয়বে। ও কোথায় পালাবে? কীভাবে ভালো থাকবে? অদৃশ্য হিংস্র সময় ওর চারপাশে। তবুও ওকে আবার উঠতে হবে, দাঁড়াতে হবে। প্রদীপ্ত ওর বাম হাত চেপে ধরে বলে, তুমি আর এক প্লেট রুটি-ভাজি খাবে আবেদ আলী?

প্যাট ভইরা গেছে। আপনারে আল্লাহ্ অনেক বড় কবুক।

জানি না কি করুম।

ও ঘন ঘন মাথা নাড়ে। তারপর বিড়বিড়িয়ে বলে, বউ নাই, মাইয়া নাই। রোজগার কইরা কি করমু।

বাঁচতে তো হবে আবেদ আলী।

বাঁচা? হ বাঁচন তো লাগবো। আমার কলমীরে লইয়া বাঁচুম।

কলমীকে তুমি কোথায় পাবে?

আবেদ আলী অন্যমনস্ক হয়ে বাইরে তাকায়। ওর মুখের রেখাগুলো আকাঁবাঁকা, যেন একহাঁটু ধুলো মাড়িয়ে যোজন পথ পেরিয়ে এসেছে। সেই ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে তার আসল চেহারা– ও এখন নিজেই নিজেকে চেনে না। প্রদীপ্তর মনে হয় এই আবেদ আলীর সঙ্গে তার দেখা না হলে দেখা হতো না মানুষের এই অসহায় ভঙ্গি– মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া– কেমন কুঁকড়ে যায় শরীর– কোঁকড়াতে থাকে, কোঁকড়াতে থাকে– কোঁকড়াতে কোঁকড়াতে মানুষ ক্ষুদ্র কীট হয়ে যায়, অসহায় কীট। প্রদীপ্তর করোটিতে আলোর বিন্দু জেগে ওঠে। ও ভাবতে থাকে, গভীর– বিশাল ভাবনা– যৌবনের প্রবল পরাক্রান্ত ভাবনা ওকে মোচড়াতে থাকে– কেমন করে মানুষ এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে? মানুষের কত জনমের আয়ু দরকার? তখন ও আবেদ আলীর চোখে চোখ রেখে বলে, আমি বুঝতে পারছি মিন্তিকে দেখে তোমার বুকের ভেতরে ভাঙচুর হচ্ছে।

আবেদ আলী চোখ ফেরায়, ওর নাক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, দৃষ্টি পীতাভ। ও কিছু আবিষ্কার করতে চায়– এখন আবিষ্কারের তটরেখায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঠোঁট কাপে, বিড়বিড়িয়ে বলে, বুকের ভেতর মেলা কষ্ট। ক্যান আমার এ্যাত গুলান বছর নষ্ট অইলো।

প্রদীপ্ত ওর মুখের চিত্র-বিচিত্র রেখায় দেখতে পায়, এই জনপদের মানবগোষ্ঠীর ছবি– ওরা মূঢ়, অসহায়, নিষ্পেষিত। বিনা-বিচারে জেল খেটে কতগুলো বছর নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানবিক মূল্য এখানে কেউ দেয় না। ওই মুখ নসরুল্লাহ, মফিজুল, কালো খালা, ফজলে আলী, আলী আহমদ হয় এবং ও নিজেও ওই মুখের সারির মানুষ। প্রদীপ্ত মুঠি জোড়া করে টেবিলের ওপর ধপ্‌ধপ্ শব্দ করে। টেবিলের জমে থাকা ময়লা ওর মুঠিতে লেগে কালচে হয়ে যায়। ও আবেদ আলীর সামনে দু'হাত মেলে দিয়ে বলে, দেখো নিজে নিজেই কেমন ময়লা মেখেছি। আবেদ আলী প্রদীপ্তর ময়লা মাখা হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমার তো কনু অপরাধ নাই। তাইলে আমার জীবন নষ্ট অইবো ক্যান? আমি ঐ মিন্তিরে লইয়া পলামু।

প্রদীপ্ত চমকে উঠে বলে, না, আবেদ আলী না। অন্যের মেয়েকে চুরি করতে নেই।

চুরি কিয়ের? আমার ঘর লাগবো, মাইয়া লাগবো।

পুলিশ তোমাকে ছাড়বে না।

পুলিশ?

শিথিল হয়ে যায় ওর হাত। পুলিশ দেখেছে ও– সেই আতঙ্ক এখনো ওর মগজে।

BanglaBook.org

বিস্ফারিত হয়ে ওঠে চোখ। বলে, ঠিকই কইছেন।

ও এক গ্লাস পানি খায়। ওর দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্তর ঘুম পায়, স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে চায়– হেঁটে যেতে চায়– কোথায়? প্রদীপ্ত কোথায়? তখন ও আবেদ আলীকে বলে, তুমি কাল আবার এখানে এসো। আমিও আসবো। আমি এখন থেকে তোমার বন্ধু।

বন্ধু? চমকে ওঠে আবেদ আলী। আমি আপনের বন্ধু হমু কেমনে? আমি তো লেহাপড়া জানি না।

বন্ধু হওয়ার জন্য লেখাপড়া জানতে হয় না। একজন আর একজনকে বুঝতে পারলেই হয়। আমি তোমাকে বুঝি। বুঝতে পারছি এখন তোমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে।

আবেদ আলী মৃদু হাসে। যেন অনেক কিছু বলার আছে ওর। কিন্তু বলে লাভ নেই এমন একটা ভঙ্গি সেই হাসিতে। ও ময়লা নখ দিয়ে গাল চুলকায়। খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো সাদা পাকা হয়ে আছে।

প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় যাবে?

মিত্তির কাছে। মিত্তি আমার লাইগা বইয়া থাকবে।

আবেদ আলীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দু'জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। আবেদ আলীর উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে ভয় হয় প্রদীপ্তর। ওর অস্বস্তি বাড়ে।

ঘরে ফিরে ও বাবার কাছে আবেদ আলীর কথা বলে। আলী আহমদ শুনে বলে, ওর ভেতরে যে ভয়ানক ইচ্ছার জন্ম হয়েছে তার থেকে ওকে বাঁচাতে হবে দীপু। নইলে ওর জীবনটা আবার নষ্ট হবে।

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে। বলে, আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি ওর জন্য কি করতে পারি? বাবা মানুষের মনটা এমন কেন?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, ও দুঃখ পেয়েছে, অপমানিত হয়েছে দীপু। তাই ওর ক্ষত মুছতে হবে। তুমি চেষ্টা করে দেখো। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, ততক্ষণ কোনো একটি মাত্র মানব নিষ্কৃতি পেতে পারে না।'

দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করে প্রদীপ্ত, কিন্তু ঘুম আসে না। বারবারই মনে হয় কিসে মানুষের নিষ্কৃতি? অর্থনৈতিক মুক্তির কথা মার্কস বলেছেন। কিন্তু হৃদয়? হৃদয়ের জটিলতা থেকে কি মানুষের পরিত্রাণ আছে? নেই। প্রদীপ্ত আর্তনাদ করে। হৃদয় থেকে মানুষের মুক্তি হলে স্তব্ধ হয়ে যাবে সব কোলাহল। বাবা ওকে রবীন্দ্রনাথের শেষের কথাগুলো বলেননি, যেটা ও পড়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'একটি মাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটু মাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান।' প্রদীপ্তর বুকে গাঢ় অন্ধকার জমে ওঠে। ও জানে কোনোদিনই রাত্রির অবসান হবে না। মানুষই মানুষের নিয়তি। মানুষই মানুষের আলো এবং অন্ধকার–এই দ্বৈরথেই মানুষের অনন্তকালের যাত্রা। এমন একটা সমাধান নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

একজন ভিখিরির সঙ্গে ওর ময়লা কাঁথাটা ভাগ করে রাতে স্টেশনের প্লাটফর্মে শুয়ে থাকে আবেদ আলী। ঘুম আসে না। বারবার মিত্তির কথা মনে হয়। ও গেলেই মেয়েটি ওকে আঁকড়ে ধরে– ওর ভেতরে মমতার আশ্রয় খোঁজে, তখন ওর পিতার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিজের পাওনাটুকু আদায়ের জন্য সেই ব্যাকুলতা ওকে অস্থির করে তোলে। গভীর রাতে পাশে শুয়ে থাকা কুকুরটির গায়ে হাত রাখে। আস্তে আস্তে হাত বুলায়। এবড়ো খেবড়ো শরীর–হয়তো কোনো কারণে পশম উঠে গেছে। নিজের কথা ভেবে খুব আপন মনে হয় কুকুরটিকে। এমন অসমতল হয়ে গেছে ওর পশমহীন শরীর। ওর দুচোখ বেয়ে জল গড়ায়, বড় নিঃশব্দ সে কান্না।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে ট্রেন এলে দু'জন লোকের মাল বয়ে দু'টাকা পায় ও। মিন্তির জন্য বিস্কুট লজেন্স কিনে সেই চায়ের দোকানে আসে। প্রদীপ্ত ওর জন্য বসেছিলো। আবেদ আলীকে দেখে হেসে বলে, আজ আমি তোমার সঙ্গে মিন্তিকে দেখতে যাবো।

ক্যান? আবেদ আলী চোখ গোল করে তাকায়। ক্যান যাইবেন?

ওর কণ্ঠ হিংস্র হয়ে ওঠে।

বোসো। নাস্তা খাও। রাগ করছো কেন?

না, আপনে যাইবেন না । আপনে গেলে মিন্তি ডরাইবো।

কিছু হবে না, দেখে নিও কিছু হবে না। আমি মিন্তিকে আদর করবো। একটু থেমে প্রদীপ্ত গাঢ় কণ্ঠে বলে, আবেদ আলী আমি তোমার বন্ধু।

এই কথায় ও চোখ নামিয়ে নাস্তা খেতে শুরু করে। প্রদীপ্ত কিছু বলতে পারে না। ওর ভেতরটা কাঁপে।

বন্ধু বললেই তো বন্ধুত্ব হয় না। বাসেতও ওকে বন্ধু বলতো। প্রদীপ্ত কি শেষ পর্যন্ত ওর বন্ধু থাকতে পারবে? নাস্তা খাওয়া শেষ হলে আবেদ আলী সরাসরি প্রদীপ্তর চোখের দিকে তাকায়।

কি দেখছো আবেদ আলী?

মানুষের চোখের ভিতরেই সব থাকে। বন্ধু কন, ডাকাত কন–

কি দেখলে আমার চোখে?

অহনও বুজি নাই।

তাহলে আমি তোমার বন্ধু না?

বন্ধু হইতে পারবেন কি না তা পরে কমু। বন্ধু হওনতো কঠিন। চলেন যাই।

প্রদীপ্ত বুঝলো আবেদ আলী ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর মন খারাপ হয়। দু'জনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালে প্রদীপ্ত নিজের অপমানকে এই শহরের অপমান বলে মনে করে। ওর প্রিয় শহরে অবিশ্বাস এখন ঘাতকের মতো হয়ে উঠেছে।

ওদেরকে দূর থেকে দেখে দৌড়ে আসে মিন্তি, ও যেন ওর অপেক্ষায় ছিলো। প্রদীপ্তকে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়, তুমি কেডা? প্রদীপ্ত হেসে বলে, বন্ধু।

বন্ধু? তুমি আবার কেমুন বন্ধু! হেসে গড়িয়ে পড়ে মিন্তি। প্রদীপ্ত আবার মনে মনে আহত হয়। এই বাচ্চা মেয়েটির কাছে ও বন্ধুত্বের ধারণা টিকাতে পারলো না। তাহলে মানুষ মানুষের কাছে পৌঁছাবে কীভাবে? শহরটা কি হিংস্র সময়ের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

দু'জনে ডালিম গাছের নিচে বসে। আবেদ আলীর কোলে বসে বিস্কুট খায় মিন্তি। বলে, মা আমারে বিস্কুট কিন্যা দেয় না। চাইলে ক্যাবল কয় দিমু দিমু। সবুর কর। আমার তো সবুর সয় না।

ও এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আবেদ আলীর মুখের দিকে তাকায়। আবেদ আলী বলে, তুমি যা চাইবা আমি তোমারে আইনা দিমু।

ক্যান দিবা, তুমি তো আমার কেউ হও না।

ক্যান দিমু? তোমারে দেখলে যে আমার পরানের তিয়াস মিটে।

মিন্তি ফিক করে হাসে। এসব কথা ও বোঝে না। শুধু আবেদ আলীর বুক ডালিমের লাল ফুলের মতো হয়ে থাকে। ফুলের মধুর মতো ওর দৃষ্টিতে লোভ, হাতে লোভ জমে। ও মগ্ন হয়ে নিজের হাতের তালু দেখে। করতলে অসংখ্য রেখা, যেন একটি আকাশের বুকে আঁকিবুঁকি। ও মনে মনে বলে, আমি চিলের মতো ছোঁ মেরে এই হাতের তালুতে একটি মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ও পা লম্বা করে ওর পায়ের পাতা দেখে। বলে,

BanglaBook.org

আমার পায়ের পাতায় লোভ জমেছে। আমি পায়ের পাতার ওপর ভর করে ক্ষিপ্র পায়ে দৌড়াতে চাই। আমি একজন সত্যিকারের ডাকাত হতে চাই। আবেদ আলীর হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়, ওর ভেতর ফেটে যেতে চায়, চেঁচিয়ে বলতে চায়, আমি আসলেই ডাকাত হবো। ডাকাতি কেসের মিথ্যে আসামী নয়, একজন খাঁটি ডাকাত।

প্রদীপ্ত ওর ভাবান্তর দেখে ভীত হয়। এতক্ষণ ও একটা কথাও বলেনি। এখানে ও নীরব দর্শক। তবুও আবেদ আলীর হাত চেপে ধরে বলে, শান্ত হও। আবেদ আলী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। মিন্তি ওর লুঙ্গির কোণা ধরে টান দেয়, তুমি কি ভাবো?

তুমি আমার হইবা মিন্তি?

আবেদ আলীর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে মিন্তি ভয় পায়। ওর মুখ শুকিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, তুমি এমুন করো ক্যান? আমার ডর লাগতাছে।

কোনু ডর নাই। কোনু ডর নাই।

আবেদ আলী গভীর মমতায় ওর মাথায় হাত রাখে।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে যে বড় কঠিন এ হৃদয়ের খেলা। ও ইচ্ছে করলেও আবেদ আলীকে আর বাঁচাতে পারবে না। ও এখন নেশার ঘোরে প্রবেশ করছে। এই ঘোরের ভেতর প্রদীপ্তর উপস্থিতি শূন্যের কোঠায়। তবু ও ফিসফিসিয়ে বলে, এখন চলে যাওয়া উচিত আবেদ আলী।

আবেদ আলী ওর দিকে রক্তচক্ষু তুলে তাকায়, যেন ওকে কেউ বিরক্ত করছে– এই বিরক্তি ওর অসহ্য। ও কপালের শিরা ফুলিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলে, মেলা কত্তা কইলে জবাই কইরা ফালামু।

প্রদীপ্ত থ হয়ে যায়। ও রেগে উঠতে পারে না– কিছু বলতে পারে না। কেবল আস্তে আস্তে হৃদয়ের জমে ওঠা খেলা দেখে। মিন্তির বিস্কুট খাওয়া শেষ– লজেন্স চুষতে চুষতে বলে, আমার আব্বা নাই, তুমি আমার আব্বা হইবা?

হমু, মাগো হমু। তুমি আমার কলমী।

আবেদ আলী পাগলের মতো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ওর দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ও মিন্তির চুলের মধ্যে ওর হারিয়ে যাওয়া জীবনটাকে হাতড়ে বেড়ায়।

প্রদীপ্ত ওর হাত চেপে ধরে। আবেদ আলী ওর দিকে তাকায় না। প্রদীপ্ত ওর হাতে চাপ দেয়– ওর বাঁধন শিথিল করে দিতে চায়। তখন মিন্তি ছটফটিয়ে ওর কোল থেকে নেমে যায়। বলে, জানো, মা কইছে তোমার লগে বেশি কথা না কইতে।

ক্যান, আবেদ আলী আহত হয়।

তুমি ছেলেধরা না তো? মা কয় ছেলেধরারা মাইনষের ছোড পোলাপানরে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বেইচা দেয়।

পরাজিত মানুষের খেদ আবেদ আলীর কণ্ঠে। শিথিল গলায় বলে, আমারে কি ছেলেধরার লাহান লাগে?

না, না একটুও লাগে না। তুমি খুব ভালো। আমি অহন যাই। কালকে আবার আসবা কিন্তু।

মিন্তি দৌড়ে চলে যায়। তখন আবেদ আলী অনুভব করে যে প্রদীপ্ত ওর হাত চেপে ধরে আছে। ওর দৃষ্টি থমথমে, বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে, ওর কপাল কুঞ্চিত– বোঝা যায় যে কিছু একটা ভাবছে। প্রদীপ্ত উঠে দাড়ালে ও উঠে দাঁড়ায়। প্রদীপ্ত হাঁটতে শুরু করলে ও হাঁটতে থাকে। যেন ধ্যানগ্রস্ত– ওর ভেতরে একটা কিছু ঘটছে– সেই ঘটাটা এখন প্রধান, তাতে ও আলোড়িত হচ্ছে, কিন্তু কি করছে তা বুঝতে পারছে না। প্রদীপ্ত একটা

BanglaBook.org

রিকশা ডেকে ওকে উঠতে বলে। ও একমুহূর্ত প্রদীপ্তর দিকে তাকায়, তারপর কিছু একটা ভেবে রিকশায় ওঠে। যেতে যেতে প্রদীপ্ত আবেদ আলীর জন্য মমতা অনুভব করে। ওর মনে হয় চোখ বুঁজলেই বুঝি দেখতে পাবে আবেদ আলীর ক্ষতবিক্ষত বুক– অমসৃণ, দা-দিয়ে কোপানো এবং রক্তাক্ত। এই আবেদ আলী স্বাভাবিক মানুষ নয়। ওর এই ভেঙে-পড়া মানসিক ভিতরটাকে শক্ত করতে হবে। ও দেখে আবেদ আলীর ঠোঁট কাঁপছে এবং ও চোখ মুছছে। তখন ও শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমার গ্রামের কথা মনে হয় আবেদ আলী?

হয়, খুব হয়। ওর ব্যাগ্র কণ্ঠে বিস্মিত হয় প্রদীপ্ত। কথা বলতে বলতে রিকশার পাদানিতে পা ঘষে আবেদ আলী, যেন পারলে এই মুহূর্তে ও চলে যাবে গ্রামে।

তোমার গ্রামের নাম কি?

কালমেঘা।

বাবা বলেছিলেন তোমার জন্য একটা কাজ খুঁজতে। আমার এক বন্ধুর বাবার অনেক রিকশা আছে। তাঁকে বললে তোমাকে একটা রিকশা দেবে। কাল থেকে তুমি রিকশা চালাও।

না। প্রচণ্ড গম্ভীর কণ্ঠে ও প্রতিবাদ করে।

আমি গেরামে যামু।

গাঁয়ে গিয়ে কি করবে?

নৌকা বামু।

গাঁয়ে তো তোমার ভিটামাটি নেই। নদী সব খেয়েছে না?

আবেদ আলী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কিছু না থাকলেও আমি গাঁয়ে যামু।

শঅরে আর থাকুম না।

প্রদীপ্ত উৎসাহ নিয়ে বলে, কবে যাবে? হঠাৎ করে ওর মনে হয় আবেদ আলীর গ্রামে চলে যাওয়াই ভালো। তাহলে মিন্তিকে কেন্দ্র করে ওর মনে আবেগের যে জট পাকিয়েছে সেটা কমে যাবে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে ও। প্রদীপ্ত একই উৎসাহে আবার প্রশ্নটি করে। আবেদ আলী অন্যদিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলে, দেহি মিন্তি কোনদিন যাইতে চায়।

মিন্তি?

প্রদীপ্ত হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবেদ আলী কোনো কথা বলে না। ওর কপালের শিরাগুলো নদীর মতো আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে। রিকশা এসে প্রদীপ্তর বাড়ির সামনে থামে।

এইখানে ক্যান?

চলো, মাকে বলেছি তোমার কথা। মা বলেছে দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেতে।

আমি পথের মানুষ। ক্যান–

আরে চলো তো।

সায়েব বাসায় নাই?

হ্যাঁ, বাবাও আছে। বাবা তোমার কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছে। বাবা বলেছে, তুমি কাজের মধ্যে ডুবে গেলে দুঃখের কথা ভুলে যাবে।

আবেদ আলী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কি হলো, চলো।

আমারে উপদেশ দিলে আমি যামু না। আপনেরা যত কথাই কন আমি মিন্তিরে লইয়া গেরামে যামু।

ঠিক আছে তোমার কথাই থাকবে। চলো।

BanglaBook.org

আবেদ আলীর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আলী আহমদ হাসিঠাট্টা, গল্প দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করে। ও সুখ-দুঃখের কথা বলে। জীবনের ব্যাখ্যা দেয়। শেষে বলে, মানুষের জীবনে হাজার রকম ঘটনা থাকে বলেইতো আমরা গল্প-উপন্যাস লিখি। গল্প-উপন্যাস মানুষের জীবন আবেদ আলী। বিশাল জীবন।

ও কিছু না বুঝে মাথা নাড়ে। আলী আহমদ উঠে গেলে প্রদীপ্তকে বলে, সায়েব খুব জ্ঞানী লোক। আপনেরা মানী লোকের পোলা। এর লাইগাতো এত ভালা।

প্রতীক হেসে উঠে বলে, কি করে বুঝলেন যে আমরা ভালো?

আবেদ আলী ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, বুজি, বুজা যায়।

আপনি আমাকে গ্রামের গল্প বলবেন?

হ, কমু।

প্রতীক বারান্দার চৌকির ওপর চাদর বিছিয়ে ওকে বিছানা করে দেয়। নিজে চেয়ার টেনে পা তুলে বসে। শুরু হয় গল্প– নিজের জীবনের গল্পই বলে আবেদ আলী। শুনতে শুনতে চেয়ারের ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে প্রতীক।

বিকেলে সবাই দেখতে পায় আবেদ আলী কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। আলী আহমদ চা খেতে খেতে বলে, ও আমাদের ভয় পায় দীপু।

কেন বাবা?

ও বুঝে গেছে যে ওর পথে আমরা বাধা দিচ্ছি। ও এখন বাধা মানবে না। ও নিজের ইচ্ছে পূরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমি এর শেষটা দেখতে চাই বাবা।

দেখো। যত দেখবে তত শিখবে। তাছাড়া আমি তো জানি ওর জন্য তোমার আবেগটা অন্যরকমের।

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, ঠিকই বলেছো।

প্রতীক ওর শার্ট উঠিয়ে বলে, দেখি তোমার পিঠের দাগগুলো আছে নাকি?

আহ্ ছাড় জিতু।

এখনো আছে ভাইয়া।

আলী আহমদ বিড়বিড়িয়ে বলে, সামরিক শাসন। ঐ দাগ কি এত তাড়াতাড়ি যাবে– ওটাতে আমাদের জীবনের ওপর চেপে বসেছে।

রান্নাঘর থেকে আসতে আসতে পুষ্পিতা বলে, তোমাদের কি মনে আছে আগামীকাল জিতুর জন্মদিন।

হ্যাপি বার্থ ডে টু জিতু। কাল তোর জন্য কয়টা বেলুন কিনবো বল তো?

একশোটা ভাইয়া।

আর আমি কি আনবো রে?

আলী আহমেদের প্রশ্নে প্রতীক লজ্জা পেয়ে বলে, জানি না।

আমি তোর জন্য 'সঞ্চয়িতা' কিনে আনবো।

পুষ্পিতা বলে, আর আমি?

তুমি পোলাও কোর্মা। প্রদীপ্ত মাকে জড়িয়ে ধরে, ঠিক আছে তো জিতু?

প্রতীক ঘাড় কাত করে। তখন আলি আহমদ বলে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে আমার জিতুর উদ্দেশ্যে বলো, 'হে নতুন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'।

পুষ্পিতা লাইনটা আউড়ে প্রতীকের কপালে চুমু দেয়। প্রদীপ্তর মনে হয় বাবা সবসময় রবীন্দ্রনাথ থেকে যোগ্য লাইনটা খুঁজে নিতে পারে। 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'

BanglaBook.org

ভাবতেই ওর মনে পড়ে অন্ধকার রাত, ট্রেন– জিতুর জন্ম। দেখতে দেখতে জিতু কিশোর হয়ে গেলো। ওর এখন অনেক কিছু বোঝার সময় হয়েছে।

পরদিন প্রতীকের জন্মদিন নিয়ে হৈ-চৈ করে কাটলো। তার পর দিন এক বন্ধুর সঙ্গে বুড়িগঙ্গার ওপার গিয়ে আর ফিরতে পারলো না প্রদীপ্ত। দু'দিন দেখা হলো না আবেদ আলীর সঙ্গে। পরদিন চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলো এই দু'দিন আবেদ আলী আসেনি। প্রদীপ্ত কি করবে ভাবতে থাকে। যাবে নাকি মিন্তিদের ওখানে? নাকি স্টেশনে দেখবে? ভেবে-চিন্তে ও প্রথমে স্টেশনে আসে। ফাঁকা প্ল্যাটফরম। দু'চার জন লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। রেললাইনের ধারে স্তূপ করে রাখা নুড়ির পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে আবেদ আলী, দু'হাতে নুড়ি নিয়ে খেলছে, চেহারা দেখে মনে হয় অন্যমনস্ক। ও প্রদীপ্তর দিকে তাকায় কিন্তু ওর দৃষ্টিতে আপন ভাবনার রেশ। বেশ কতক্ষণ পরে বলে,

আপনে?

দু'দিন যাওনি যে?

ইচ্ছা হয় নাই।

মিন্তি কেমন আছে। গিয়েছিলে ওখানে?

রোজইতো যাই।

আজ যাওনি?

অহন যামু।

চলো, আমিও যাবো।

চলেন। আবেদ আলী উঠে দাড়ায়। তারপর মৃদু হেসে বলে, কইলকা মিন্তির মা আমারে খুব বকছে।

কেন?

ক্যান আবার? বুঝেন না?

আবেদ আলী আর কোনো কথা না বলে হাঁটতে থাকে। ও মিন্তির জন্য রুটি- গুড় কিনেছে। দোকান থেকে চার আনার বিস্কুটও কেনে। যেতে যেতে বলে, ইচ্ছা হয় মিন্তির জন্যি লাল জামা কিনি। জামা পাইলে মাইয়াডা খুব খুশি অইবো।

প্রদীপ্ত একটা রিকশা ডাকে। রিকশায় বসে আবেদ আলী একই কথার জের টেনে বলে, কিন্তুক মিন্তির মা আমারে দেখলে মারতে আসবে। কাইলকা আমারে কইয়া দিছে আমি য্যান আর হের মাইয়ার ধারে না যাই।

তুমি কি বললে?

আমি মেলা কথা কইছি। শ্যাষে জিগাইলাম গেলে কি অয়? আমি তো কনু ক্ষতি করি না। মিন্তির মা চোখ গরম করছে। কইছে বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে দিবো আমারে। আমার মতলব খারাপ। আমি হের মাইয়া লইয়া পলামু। আমার সামনে মাইয়াডারেও খুব মারছে।

তাহলে কি আজ আবার যাওয়া ঠিক হচ্ছে?

আবেদ আলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ঠিক-অঠিক অহন আর বুজি না। তারপর প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে, পরের মাইয়া চুরি করলে অপরাদ অইবো ক্যান? কীসের অপরাদ? আমার জীবন থাইকা যে এতগুলান বছর বাদ অইয়া গেল তার তো কনু বিচার অইলো না? তাইলে কোনোহানে কোনো অপরাদ নাই। সব নিয়ম, সব আইন।

আবেদ আলী কথা শেষ করে হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে কাশে, কাশির সঙ্গে ওর চোখে জল আসে। ও কোনোকিছু না বলে প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে। তারপর

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে বলে, এই বুকের ভিতর মেলা কষ্ট। খাইতেও কষ্ট অয়। রাস্তার ধারের এক দোকানির লগে চুক্তি আছে আটার রুটি আর গুড়ের। মাঝেমাঝে দোকানি অবাক অয়, কয়, খান না যে, আমি জবাব দিবার পারি না। রুটিটা কুকুররে দি। কাউরে কিছু কইবার পারি না। কেবল আমার বুকের ভিতর গর্জন অয়। কেবলই মনে অয় আমি সব ফিরত চাই। ঘর, মাইয়া, বউ সব– সব। আমার কাঁদন আহে না, রাগ অয়, রাগে বুক পোড়ে। এইভাবে তো চলে না। কিছুই সহ্য অয় না। আমি কি করমু!

প্রদীপ্তর হাতের ওপর আবেদ আলীর হাত থাবা হয়ে যায়। কিন্তু প্রদীপ্ত ওর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে না। বুঝতে পারে একজন মানুষের আবেগ ওর ভেতরেও ঢুকে যাচ্ছে। ও আবেদ আলীর পুড়ে যাওয়া বুকের ভেতর থেকে উত্তাপ পাচ্ছে। একসময় শিথিল হয়ে যায় আবেদ আলীর হাত। ওরা এসে গেছে। দু'জনেই দেখতে পায় মিন্তি ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার দিকে দৃষ্টি। ওরা কাছাকাছি যেতেই ও দৌড়ে এসে আবেদ আলীকে জড়িয়ে ধরে।

মাগো তুমি কেমন আছো?

ভালো। মিন্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে। আবেদ আলী ওকে রুটি-গুড় দেয়। ও নিমিষে খেয়ে ফেলে। তারপর গুড় লেগে থাকা আঙুল চাটতে চাটতে বলে, বাবা আমি জিলাপি খামু?

জিলাপি? কালকাই নিয়া আসুম। তোমার যা খাওনের মন চায় আমারে কইবা। আমি তোমার লাইগা বেবাক জিনিস কিন্যা আনুম।

আল্লারে তুমি যে কত ভালা।

আবেদ আলী দ্রুতকণ্ঠে বলে, তাইলে তুমি আমার লগে যাইবা?

কোনহানে?

আমি তোমারে আমার গেরামের বাড়ি নিয়া যামু। গেরামের নাম কালমেঘা।

ইহানে নদী আছে?

আছে।

নাও আছে?

তাও আছে।

আমি নৌকায় চড়মু?

চড়বা।

শাপলা ফুল তুলমু।

তুলবা।

আল্লারে কত্ত মজা। বাপ থাকলে কত্ত মজা অয়।

ওর ঝিলিক দিয়ে ওঠা চোখের তারা দেখে প্রদীপ্ত অভিভূত হয়। আবেদ আলী হো-হো করে হাসে। প্রাণ খোলা হাসিতে উড়িয়ে দিতে চায় বুকের ভেতরে জমে থাকা কালো ধোঁয়া। তখন অন্য দিক থেকে মিন্তির মা এসে দাঁড়ায়। আবেদ আলীকে নিয়ে তার প্রবল আশঙ্কা। তাই অসময়ে কাজ ফেলে চলে এসেছে। চোখ গরম করে চেঁচিয়ে ওঠে, আপনে আইজ আবার আইছেন?

আপনের মাইয়াডারে খুব ভালা লাগে।

আর আইবেন না। অহনই এইহান থাইক্যা যান। নইলে ভালা অইবো না কইয়া দিলাম। এইডা আবার কারে লইয়া আইছেন। ভদ্দরলোকের পোলা মনে অয়। আপনের মতলবডা যে কি আল্লাহ্ই জানে।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত তড়িঘড়ি বলে, আমাদের কোনো মতলব নাই। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

ভেংচি কাটে মিন্তির মা, না চিন্তা করবে না। আর একদিন এইহানে দেখলে ঠ্যাং ভাইঙা ফালামু।

অপমানে প্রদীপ্ত বিব্রত বোধ করে। ও গুছিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না। আবেদ আলী ওর হাত ধরে টেনে হাঁটতে থাকে। শুনতে পায় মিন্তির কান্না। মা ওকে মারছে। প্রদীপ্ত মনে মনে বলে, এ বড় কঠিন খেলা আবেদ আলী। তুমি কি এ খেলায় জিততে পারবে? বড় রাস্তায় উঠে ও আবেদ আলীকে বলে, তুমি আর এখানে এসো না। ও এক মুহূর্ত থমকে দাড়ায়, তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর হনহনিয়ে হেঁটে রাস্তার উল্টো দিকে চলে যায়। প্রদীপ্তর মন খারাপ হয়ে যায়। ও বিষণ্ন হতে চায়নি, তবু ওকে বিষণ্ন হতে হয়। যতক্ষণ আবেদ আলীকে দেখা যায়, ততক্ষণ ও তাকিয়ে থাকে। নতুন আর দেখার কি আছে, একজন মানুষ তো শুধু হেঁটে যাচ্ছে, কত মানুষই তো হেঁটে যায়– মানুষ শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটবে এজন্যই রাস্তা তৈরি। রাস্তা না থাকলেও মানুষ হাঁটে– হাঁটার জন্য জঙ্গল কেটে সাফ করে, মানুষের পায়ে পায়ে মাঠের ঘাস উঠে রাস্তা তৈরি হয়। কিন্তু আবেদ আলীর হেঁটে যাওয়া দেখে প্রদীপ্তর কষ্ট হচ্ছে– এই কষ্টটুকুর সঙ্গে এই মুহূর্তে মানুষের হেঁটে যাওয়ার সম্পর্ক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও নিজে যখন হাঁটতে থাকে তখন ওর মনে হয় এই ভাবনাটি কবিতার পঙক্তির মতো। ও ঘরে গিয়ে লাইনটি ডাইরিতে লিখে রাখে, পাতা জুড়ে বেশ বড় বড় অক্ষরে লিখে। এই প্রথম ওর নিজের লেখা– প্রদীপ্ত লাইনটির দিকে তাকিয়ে থাকে– একটি ভাবনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশের আনন্দে ও বিভোর হয়।

রাতে ওর ঘুম আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকে। বার বার মনে হয় আবেদ আলী বিপদগ্রস্ত। মিলিটারি আবেদ আলীকে অন্যায়ভাবে মেরেছিলো বলে প্রতিবাদ করে ছিলো প্রদীপ্ত, কিন্তু এখন কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? কিভাবে ওকে বাঁচাবে? আবেদ আলীর এই ঘটনা কোথায় গিয়ে থামবে ও জানে না, কেউ জানে সেটুকু ওর মগজে গেঁথে থাকে, যেন গ্যাসের হলুদ আলো– এই শহর, মানুষ, পথঘাট সবকিছু পেরিয়ে টিমটিম করে আজীবন জ্বলবে। সেই আলোর বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত বুঝতে পারে মানুষের এসব কষ্ট এবং বেদনা নিয়ে বাবা লেখক– নতুন করে জীবন গড়ে বাবা। প্রদীপ্ত নিজেকে বলে আমি সরাসরি প্রতিফলন চাই, যা দেখি তার হুবহু ছবি। সাংবাদিক হলেই এমন জীবনের চিত্র খুঁজে পাবো। নিজে ভেবে নিয়ে ও ঠিক করে সকালেই বাবাকে বলতে হবে সাংবাদিক হবার কথা। বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবে না। নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অভ্যাস বাবার নেই। সেজন্য বাবাকে এত ভালোলাগে।

চার-পাঁচ দিন পর নাজিমুদ্দিন রোডে জেল গেটের সামনে দেখা হয় আবেদ আলীর সঙ্গে, ও তখন পুলিশের হেফাজতে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, চোখ ছলছল করছে, প্রদীপ্তকে দেখে ঠোঁট কাঁপে। দু'জন পুলিশ অন্য আর একজনের সঙ্গে কীসব কথা বলছে সেই ফাঁকে ও আবেদ আলীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন মাথার ওপর গনগনে সূর্য, ওর জামা ভিজে আছে ঘামে, ঠোঁটের কোণে রক্ত। স্পষ্ট বোঝা যায় মার খেয়েছে।

প্রদীপ্ত ফিসফিসিয়ে বলে, কি করেছিলে?

মিন্তিরে কইছিলাম আমার লগে যাইবা মিন্তি? মাইয়াডা কইলো, হ যামু। এই একলা ঘরে বইয়া বইয়া আমার ভাইরে পাহারা দিতে এটটুও ভালা লাগে না। এটটুও খেলতে পারি না, আমি তোমার লগে গাঁয়ে যামু। মিন্তি আমার হাত ধরলে আমি রওনা করলাম। বড় রাস্তার কাছাকাছি আইতে মিন্তির মার লগে দেহা। চিল্লাইয়া মানুষ জড়ো করলো।

BanglaBook.org

লোকেরা তোমাকে মারলো?

আবেদ আলী মাথা নেড়ে বলে, হ। আপনে আমারে মাপ কইরা দিয়েন।

প্রদীপ্ত হাত জড়িয়ে বলে, আবার তোমাকে এই বড় বাড়িটায় আসতে হলো।

হ, আমার পুরানা জাগা। একবার থাইকা গেলাম কনু অপরাদ না কইরা, এইবার আইলাম অপরাদ কইরা।

সত্যি কি অপরাধ করেছো আবেদ আলী?

ও তীর্যক চোখে তাকিয়ে বলে, না অপরাদ কীসের? এইডাই নিয়ম, এইডাই আইন। ক্যাবল পরের মাইয়ার লাইগা আমার এত লোভ হয় ক্যান?

ও ফুপিয়ে কেঁদে উঠলে পুলিশ দু'জন সচেতন হয়। ওকে ধাক্কা দিয়ে জেল গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত দেখতে পায় আবেদ আলী চোখের জল মুছে ফেলেছে। জেলগেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবীও ওর জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

সেদিন ক্লাসে কিছুতেই মন বসাতে পারে না প্রদীপ্ত। বাড়ি ফেরার পথে কার্জন হলের সামনে শহীদ সাবেরের সঙ্গে দেখা হয়, রাস্তার পাশে উঁচু হয়ে বসে ঘাসের মধ্যে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। প্রদীপ্ত দু'পা এগিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা মুড়ি কুড়িয়ে খাচ্ছিলো। তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কি দেখছো? মজা? মজা দেখছো? জানো মানসিক হাসপাতালে আমার চিকিৎসা ছিলো ইলেকট্রিক শক। প্রতি সেকেন্ডে ১১০ ভোল্ট। জানি সব জানি। এখন তো আমি ভালোই আছি। কিন্তু পত্রিকা অফিসগুলো আমার সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা করে। কাজ দিতে চায় না। আমি সবাইকে বলি আমাকে কাজ দাও, লিখতে দাও। কাজ দাও, লিখতে দাও বলতে বলতে সাবের রাস্তা পেরিয়ে চলে যায়। প্রদীপ্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার মনে হয় এ কেমন শহর, প্রতি পদক্ষেপে একটি করে অভিজ্ঞতা! এভাবে মানব জীবন পাঠ করে কি ও একজন সম্পন্ন মানুষ হতে পারবে? এই প্রাকৃতিক পাঠের ভেতর থেকে কি উঠে আসবে বড় কিছু করার চেতনা? আবেদ আলী বা শহীদ সাবেরের জন্য প্রদীপ্তর দুঃখ হয় না। ও বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকায়– তোমরা আমাকে জ্ঞান দাও। আমি মানুষের পক্ষে লড়াই করবো। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খেতে পারলো না। আলী আহমদ জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে দীপু? ও দুটো ঘটনার কথা বললো। আলী আহমদ মাথা নাড়লো, জানতাম এমনই হবে। দু'টো ঘটনাই খুব দুঃখজনক দীপু। আবেদ আলীকে আমরা বাঁচাতে পারতাম, পারিনি। সাবেরকে তো সাংবাদিক ইউনিয়ন হাসপাতালে পাঠালো। কিন্তু কিছু হলো না। একটা জিনিস কি জানিস দীপু, সাবের বদ্ধ পাগল নয়। নিজের চারপাশ সম্পর্কে সচেতন।

ঠিক বলেছো বাবা। ওর তীব্র দৃষ্টি দেখে আমার কিছুতেই মনে হয়নি যে শহীদ সাবের পাগল। পাগলের দৃষ্টি কি অমন শাণিত হয়?

প্রদীপ্ত সমর্থনের আশায় বাবার মুখের দিকে তাকায়। আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছিস। রোকনুজ্জামান বলতো, ওকে হাসপাতালে বসিয়ে রাখাই ছিলো সমস্যা। বেশি লোক দেখলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। কিছুতেই বসে থাকতে চাইতো না। তখন নানা মিথ্যে কথা বলে ওকে ভুলিয়ে রাখতে হতো। পাবনা যাবার দিন বহু সাধ্য-সাধনা করে তবে ট্রেনে তোলা হয়েছিলো। করীমের অভিজ্ঞতা তো আরো সাংঘাতিক। সাবেরকে দেখলে করীম বলে, জানেন আমি আর ও যখন রিকশায় করে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ওকে বললাম, দেখ তো কী সুন্দর বিল্ডিং। তুই এখানে থাকবি। শহীদ কথা বলে না। মুখ টিপে টিপে হাসে। ভঙ্গিটা এই যেন প্রহসনেরও

BanglaBook.org

সীমা আছে। তারপর বললো, খুব বললি এখানে আরামে থাকবো, না? তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠি সেই হাসি শুনে, ভীষণ বিদ্রূপাত্মক হাসি।

এসব শুনলে গা কেমন শিউরে ওঠে বাবা।

তবে একটা জিনিস আশ্চর্যের যে এতকিছুর মধ্যেও সাবের লিখতে পারে। কোনো কোনো কবিতার লাইন দারুণ। মনে হয় যেন ঝলসে উঠেছে। ডাক্তার বলেছিলো ওকে সবসময় কাজের মধ্যে রাখতে। কাজের মধ্যে না থাকলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। সবাইতো নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, ওর জন্য কে আর কত সময় দেবে। তাই শহীদ সাবের শহরময় ঘুরে বেড়িয়ে নিজের সময় কাটিয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই বলেছিস দীপু।

ঠিক করেছি আমি সাংবাদিক হবো বাবা। এইসব মানুষকে খুঁজে বেড়াবো।

ভালো। তোর ইচ্ছের ওপর আমার কিছু বলার নেই।

একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারার প্রেরণায় প্রদীপ্তর দৃষ্টি চ্‌কচক্‌ করে। পুষ্পিতা চা আর নারকেলের নাড়ু নিয়ে আসে। মার পিছু-পিছু প্রতীকও আসে। পুষ্পিতা মোড়া টেনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে, বাবা-ছেলেতে কীসের কথা হচ্ছে?

প্রদীপ্ত নাড়ু কামড়ে বলে, বলো তো মা কি কথা?

কি আর নিশ্চয় রাজনীতি।

উঁহু হলো না। আমার ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবছি।

ভবিষ্যৎ? আমাদের কি ভবিষ্যৎ আছে? ঢাকা শহরে ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা। নিজেদের কোনো জমি নেই, বাড়ি নেই।

ধুত মা, এসব রাখো তো। মানুষের স্বপ্ন থাকলে সব হয়, স্বপ্ন না থাকলে কিছুই হয় না। আমাদের কষ্ট কীসের? বাবার চাকরি আছে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা আছে। আমরা এই শহরের ভাসমান মানুষ নই মা। আমাদের শক্ত খুঁটি আছে।

আলী আহমদ পুষ্পিতার কথার জবাব দেয় না। প্রদীপ্তর চক্‌চকে দৃষ্টি নিজের ভেতর অনুভব করে। ও ঠিকই বলেছে, ওদের জীবনে স্বপ্ন আছে। ওরা ভাসমান মানুষ নয়। নিজের জন্য একটি শক্ত খুঁটি তৈরি করতে পেরেছে– এই শহর থেকে ওদের কেউ উপড়ে ফেলতে পারবে না। দুই সন্তান, দু'জন প্রিয় মানুষের মুখের ওপর আলী আহমেদের দৃষ্টি আটকে থাকে– বুকের ভেতর গুমরে ওঠে নদী, কলকল ধ্বনি, বলতে চায়, ওরা আমার স্বদেশ, আমারই উত্তরাধিকার।

২

শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে চাকরি হয়ে গেলো আলী আহমদের। দরখাস্ত করার পর মনে আশা ছিলো। দীর্ঘদিনের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা আর প্রকাশিত বইগুলো সাহায্য করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ওপর লেখা গবেষণাধর্মী বইটির সবাই প্রশংসা করেছে। আজ ও নতুন চাকরিতে যোগদান করতে যাবে। সকালে উঠেই মনে হয় চারিদিক স্তব্ধ, ওর কিছু করার নেই। কণ্ঠ ভরে শুধু গান বেজে ওঠে– এখন অর্গলমুক্তি দরকার। ও উঠোনে নেমে পায়চারি করে এবং গলা ছেড়ে গান গায়– তখনো

BanglaBook.org

অন্যরা ঘুম থেকে ওঠেনি, চারিদিকে ফিকে আলো– আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

দিন গড়িয়ে যায়। কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়– বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং পড়াশোনার ফাঁকে দিনগুলো কিছুটা অন্যরকম হয়, ব্যাপক কোনো রদবদল নয়, শুধু সাংস্কৃতিক চেতনার উনুনে আগুন বাড়ে, সেখানে যেন বাড়তি কয়লা জমেছে, ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকে। নইলে এই শহর এবং শহরের মানুষ তো তেমনই আছে– দেখা হয় জুলেখার সঙ্গে, মুখোমুখি হতে হয় শহীদ সাবেরের– প্রতিবেশীরা, সহকর্মীরা, সংবাপত্রের অফিস, প্রকাশক– সবকিছুর ভেতর দিয়ে প্রবহমান এই জীবন আলী আহমদের কাছে কখনো মনোরম হয়ে ওঠে– কখনো নিষ্প্রাণ শীতল হয়ে যায়, যখন পারিপার্শ্বিকের কোলাহলে রাজনীতির কুটিল থাবা পড়ে, টুটি চেপে ধরে এবং বুকের ওপর পা তুলে দেয়। আলী আহমদ পোড়-খাওয়া মানুষ– নিজের বুকের ভেতর রাজনীতির হিসাব মেলাতে চায়– সেটুকু ওর একান্ত নিজস্ব। অনেক ভেবে দেখেছে এখানে ওর সন্তর্পণ পদচারণা আছে, বড় বেশি নিঃশব্দ এবং অন্তর্মুখী। ভোরবেলা রোজকার পত্রিকা নিয়ে বসলে শুধু বর্তমান নয়, অতীতটাও ওর সামনে ভেসে ওঠে। কখনো প্রদীপ্ত ওর সঙ্গে বসে– ঝাঁঝালো কথা বলে, তীব্র মন্তব্য করে, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালোলাগে।

সেদিন প্রদীপ্ত কাগজ হাতে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসে, বাবা এই লোকটা একটা চাঁড়াল।

আলী আহমদ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, কোন লোকটা?

ঐ যে জনগণের সার্বিক ক্ষমতার হরণকারী অথচ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আইয়ুব খান। যিনি নিজেই নিজেকে ঘোষণা করলেন ফিল্ড মার্শাল পদে। তিনি জানেন যে সেনাবাহিনীই তার ক্ষমতার মূল উৎস। এদের ছাড়া তিনি একদিনও টিকতে পারবেন না।

আর জানিসতো পদাধিকার বলেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমৃত্যু যোগাযোগ রাখতে পারে একজন ফিল্ড মার্শাল।

ও এজন্যেই ষোলকলা পূরণের আয়োজন।

বলতে বলতে যেভাবে এসেছিলো সেভাবেই ঘরে চলে যায় প্রদীপ্ত। আলী আহমদ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা এলিয়ে রাখে। আপনা থেকে চোখ বুঁজে আসে। পুষ্পিতা ওর জন্য এই চেয়ারটা বানিয়েছে। বলেছে, সারাদিনের খাটনির পর এভাবে গা– এলাতে পারলে তোমার ভালো লাগবে।

এই মুহূর্তে মনে মনে পুষ্পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে আলী আহমদ। এভাবে মাথা এলিয়ে চোখ বুঁজে থাকতে ওর ভালোই লাগে। মনে হয় শরীরের ওপর থেকে ঘাড়টাকে নামিয়ে রাখা হলো। কিন্তু এখন প্রদীপ্তর ঝাঁঝালো কণ্ঠ ও কিছুতেই সরিয়ে রাখতে পারে না। ওর ক্রোধ বিশাল একটা চাপড়ার মতো মগজের দেয়ালে গেঁথে আছে। সামরিক শাসন জারির পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। এইসব ঘটনা পত্রিকার পৃষ্ঠায় খবর হয় না কিন্তু তাই বলে চাপাও থাকে না। খবর বাতাসে ভর করে উড়ে আসে। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দপ্তর সম্পাদক হাসান নাসিরের কারাগারে মৃত্যু ওর মতো অনেককে বিচলিত করেছে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রাজবন্দীরা। আলী আহমদের রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডের কথা মনে হয়– নির্যাতন আবার নতুন রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে। সীমান্ত প্রদেশ, কোয়েটা, বেলুচিস্তানের রাজবন্দীদের ওপর নানাধরনের নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। এদিকে ভাসানীকে তো গৃহবন্দী করে রেখেছে। এখনো ছাড়া হয়নি। শেখ মুজিবকে বছরখানেক পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য দুর্নীতির মামলা

BanglaBook.org

করে তাকে বেশ নাজেহাল করা হচ্ছে। ভাবতে গেলে অতীত ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আলী আহমদের চোখের পাতা ভিজে আসে– ঝাপসা হয়ে যায় চারিদিকে। এভাবেই কি গড়াবে রাজনীতির খেলা? তুচ্ছ হয়ে থাকবে মানুষের জীবন? ও নিজেকে বেকুব ভাবে। এমন বোকার মতো ভাবনার মানে নেই। রাজনীতির নোংরামিটুকু মানুষকে বেঁচে থাকার আস্তাকুঁড়ে নিয়ে যায়; আর রাজনীতির সততার অভাব মানুষকে শূন্যে তুলে লোফালুফি করে। মানুষের পায়ে মানুষই হয়ে যায় বল। কী ভয়াবহ! সোজা হয়ে উঠে বসে আলী আহমদ। নিজের খেয়াল-খুশিমতো দেশ চালাচ্ছে একজন মানুষ, বাকিরা জ্বি-হুজুরের দল– নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী করাচি থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নিয়ে গেছে। পাশ্চাত্য দুনিয়াকে দেখানোর জন্য আস্থা ভোটের ব্যবস্থা করেছে। এই আয়োজনে বিপুল 'হাঁ'-সূচক আস্থা ভোট আদায় করেছে। কী চমৎকার সব সাজানো খেলা। আলী আহমদের মাথার ভেতর গুমগুম শব্দ হয়– ও যেন একটা কিছু শুনতে পায়, একটা গর্জন কিংবা ধ্বসে পড়ার বিশাল শব্দ। ওর বুক কাঁপে, হাত-পা ঝিমঝিম করে। ও আবার মাথা ইজিচেয়ারে হেলিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত গুনগুনিয়ে গান গাইছে। আলী আহমদ কান পাতে, সুরটা ওর ভালোলাগে। মাথার ভেতর থেকে সব ধ্বনি বেরিয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ চন্দনের মতো চর্চিত হয়– আহ্ শান্তি, আহ্ স্বস্তি। তখন পুষ্পিতা এক কাপ চা নিয়ে আসে। ওর দিকে তাকালে আলী আহমদের আবেগ উথলে ওঠে– মুগ্ধ হয়ে যায় দৃষ্টি। পুষ্পিতা বিব্রত হেসে বলে, কি হয়েছে ?

তোমাকে দেখছি।

কেন ?

তোমাকে একদম নতুন লাগছে। যেন তোমার আমার এখন যৌবনের সময়।

যাহ। লজ্জা পুষ্পিতাকে আরো মোহনীয় করে।

আলী আহমদ ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি যে তুমিই, ওগো। সেই তব ঋণ/আমি মোর প্রেম দিয়ে/শুধি চিরদিন।'

পুষ্পিতা গভীর চোখে আলী আহমদের দিকে তাকায়, যেন বলতে চায় কতদিন পর তুমি আমাকে এমন করে দেখছো। এ দেখা রোজ হয় না কেন? পুষ্পিতার মুখটা রবীন্দ্রনাথের আঁকা নারীর মুখের মতো মনে হয় আলী আহমদের, যেখানে অপার রহস্যের ভেতর এক গভীর দর্শন ইহলোক ও পরলোককে এক করে দেয়। পুষ্পিতা তুমি কি আমার কাদম্বিনী, যাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য সারাজীবনের তপস্যা দরকার হয়? পুষ্পিতা বুঝে যায় একটু আগে আলী আহমদের যে চোখ ওর দিকে গভীরভাবে তাকিয়েছিলো সেটা এখন আর ওর ওপর স্থির নেই। অন্য কোথাও চলে গেছে। ও চায়ের কাপটা আলী আহমদের হাতে দিতে দিতে বলে, এই আছো, এই নেই। কেমন মানুষ যে তুমি বুঝি না।

আশ্চর্য, এমন করে বললে? আমি তো জানি তুমি রবীন্দ্রনাথের বোবা মেয়ে সুভা।

কেবল রবীন্দ্রনাথ, সবকিছুতেই তুমি শুধু একটি মানুষকে দেখতে পাও।

পুষ্পিতা চায়ের কাপটা না নিয়েই চলে যায়। আলী আহমদ বাকি চাটুকু শেষ করে চায়ের কাপটা টেবিলে রাখতে রাখতে ভাবে আগামী বছর রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। ও পড়ার টেবিলে আসে। কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারে না। বারবার মনে হয় একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা। দু'টো ভিন্নমুখী ধারা মুখোমুখি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের, তাঁর সম্পর্ক হৃদয়ের। অন্যদিকে ধর্মের নামে, দুই পাকিস্তানের সংহতির নামে লেখক সংঘের মাধ্যমে

BanglaBook.org

তৈরি করতে চাইছে এক ভিন্ন সাহিত্য– যা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের নয়, তা জুলুম, সাধারণ মানুষকে ঘাড় ধরে জোয়ালে জুতে দেয়ার চিন্তা। আলী আহমদের মনে হয় সামনে এক নতুন লড়াই। বেশ কিছুদিন ধরে পাকিস্তানের জন্য একটিমাত্র ভাষা তৈরির ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়েছে উভয় পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির কারণে একটি ভাষার বিকাশ সাধনই সরকারের লক্ষ্য। এদিকে নবগঠিত শিক্ষা কমিশন দু'টো প্রস্তাব দিয়েছে। এক, যারা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের অর্থ সাহায্য দেয়া হবে। দুই, বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফের উদ্ভাবন করার জন্য ভাষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। সবকিছুই ওর কাছে কেমন গোলমাল মনে হয়। টেবিলের সামনে রাখা বইয়ের পৃষ্ঠায় অক্ষরগুলো ওর চোখের সামনে বিশাল হয়ে ওঠে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। চোখ জ্বলে, না চোখ ফেটে জল আসতে চায় সেটা বুঝতে পারে না। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে। কতদিন জুলেখার সঙ্গে দেখা নেই? মাস ছয়েক হবে। রাজশাহীতে থাকতে জুলেখা ওকে অন্য-জীবনের মুগ্ধতা দিয়েছিলো। এখন আর ঐ ধরনের মুগ্ধতা নেই। পেছনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর কেমন লজ্জাই করে। পরক্ষণে মনে হয় লজ্জা করবে কেন? বয়স হয়েছে বলে? এ সময়ের মতো সেটাওতো একটা বিশেষ বয়স ছিলো, যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়িহীন ভালো লাগা ছিলো, স্মৃতির পাতায় সঞ্চয় হয়েছে। এখন কোনো নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ঐ ভালোলাগা ওকে সুখ দেয়। সে সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময়ের ওর কোনো বিরোধ নেই। ও নিজের ভেতরে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জুলেখার স্বামী মতিউর চমৎকার ভদ্রলোক। জমিয়ে আড্ডা দিতে পারে। প্রাণখোলা হা-হা হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তোলে। আলী আহমদ প্রায়ই হাসতে হাসতে তাকে বলেছে, আপনার এই হাসি আমাদের জন্য বিশুদ্ধ বাতাস। ওদের ওখানে গেলে সময় যে কীভাবে ফুরিয়ে যায় তা ঠাওর করা যায় না, সেটা কি মুহূর্ত গেলো না ঘণ্টা তা বুঝতে সময় লাগে। আলী আহমদ ওদের বাসাতেই যাবে বলে ঠিক করে।

রাস্তায় প্রতীক ওর পথ আটকায়।

তুমি যেখানেই যাও না কেন বাবা, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে?

ওখানে কি তোমার ভালো লাগবে?

কেন ভালো লাগবে না?

তোমার বয়সী কেউ নেই যে।

তবু যাবো। আমার বন্ধুদের কাউকে পেলাম না। এখন আমি একা একা কি করবো?

দু'জনে রিকশায় ওঠে। লম্বায় প্রতীক প্রায় আলী আহমদের সমান হয়ে গেছে। এ নিয়ে প্রতীক মাঝে মাঝে বলে, বাবা আমি তোমার সমান হয়েছি।

আলী আহমদ হেসে বলে, মনে হয় তুই দীপুর চেয়েও লম্বা হবি।

উহ্ কী মজা হবে। সবার মাথার ওপরে মাথা উঁচু হয়ে থাকা!

আলী আহমদ ছেলের এই অভিব্যক্তিতে খুশি হয়। মাথা উঁচু করে রাখার ব্যাপারটা প্রতীক যদি সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে সেটাই হবে গৌরবের। সেখানেই জিতে যাবে ও। আজ ওর সঙ্গে রিকশায় বসে আলী আহমদের মনে হয় বুড়িয়ে যাবার সময়টা খারাপ, কষ্ট দেয়। কেমন করে যে দিনগুলো গড়িয়ে গেলো। আলী আহমদ আড়চোখে প্রতীককে দেখে– ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফের রেখা, এখনো বেশ চঞ্চল, প্রদীপ্তর মতো স্থির স্বভাবের নয়। বাবাকে বন্ধু মনে করে। পুষ্পিতার কাছে ওর সব প্রশ্রয়– কখনো মায়ের সঙ্গে ডাল রান্না করবে, কখনো ডালের বড়ি বানাবে। দুপুরবেলা মাকে জড়িয়ে ধরে শুতে না পারলে ওর ঘুম আসে

BanglaBook.org

না। কাঠি লজেন্স এনে মায়ের মুখে পুরে দিয়ে বলবে, চুষে খাবে কিন্তু, দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙে ফেলবে না। দু'পাশের দোকানপাট, বাড়িঘর, আকাঁবাঁকা রাস্তা-গলি, মাথার ওপর ইলেকট্রিকের তার, বসে থাকা পাখি সবইতো আছে, সবইতো থাকবে, শুধু থাকবে না আলী আহমদের একসময়কার এই ভালোলাগা। সময়ের ব্যবধানে শুধু এটুকুই তফাৎ হয়ে যাবে। প্রতীক ছটফটিয়ে বলে, আজকের বিকালটা বেশ ভালো না বাবা? বেশ সুন্দর হাওয়া বইছে।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে।

মাকে নিয়ে বেরুলে বেশ হতো।

তোর মাতো বেরুতে চায় না।

ঠিক বলেছো। মা একদম ঘরকুনো। তবু তুমি তো মাকে জোর করে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারো বাবা। তুমি তো জোর করো না।

কি জানি হয়ে ওঠে না।

উঁহু ঠিক তা নয়। প্রতীক মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

তবে কি? আলী আহমদ চমকে ওর দিকে তাকায়।

আসলে মাতো তোমার মতো সাহিত্য বোঝে না।

সাহিত্য না বুঝলে কি হবে তোর মা কিন্তু খুব ভালো জিতু। এমন মহিলা হয় না।

তবুও তোমার সঙ্গে মায়ের দূরত্ব আছে বাবা।

ও প্রতীকের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কখন ছেলেটি এত বড় হয়ে গেলো? কেন ও এমন করে এত কিছু বলতে পারছে? আলী আহমদের বুকের ভেতর ভয়ের ধ্বস নামে– নিজেকে চিনতে না পারার ভয়।

জুলেখা প্রতীককে দেখে হৈচৈ করে। বলে সেদিন দেখলাম ছেলেটা এতটুকু, ক'মাসের মধ্যে ধাম করে লম্বা হয়ে গেছে। আয় বোস। তোর মা কেমন আছে?

ভালো।

ডালের বড়ি বানায়নি?

হ্যাঁ, বানিয়েছে।

একা একা খেলে কিন্তু পেট ফুলবে বলে দিলাম।

আমি কালই আপনার জন্য নিয়ে আসবো খালাম্মা।

জুলেখা হাসতে হাসতে ওর চুল এলোমেলো করে দেয়।

আলী আহমদ বলে, কর্তা কৈ?

তিন-চার দিন আগে খুলনা গেছে। কাল ফিরবে।

বন্যা? পার্থ?

ওরা ঘরেই আছে। যা দুষ্টুমি করে। সারাদিন ব্যস্ত করে রাখে।

কথা শেষ হতে না হতে দু'জনেই দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। আলী আহমদ বন্যাকে কাছে টেনে নেয়, কেমন আছো মামণি?

ভালো। একমাথা কুচকুচে কালো চুল নিয়ে মাথা ঝাঁকালে প্রতীকের বুক কেমন করে।

কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বন্যা। কত বয়স হলো? বোধহয় নয় কি দশ। ও মনে মনে হিসেব করে।

কোন ক্লাসে পড়ছো তুমি?

ফাইভে।

খুব ভালো। এই যে দেখছো জিতুকে, ও কিন্তু তোমার ভাইয়া।

বন্যা লাজুক হাসে। তারপর দৌড়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

BanglaBook.org

চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে আপনার। মনে হয় আপনার ছোট বেলা দেখলাম।

ধড়ধড়িয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। বয়সের চেয়ে লম্বাও হয়েছে বেশি। যাই চা আনি।

চায়ের কি দরকার বসুন না। ঘরে ভালো লাগছিলো না ভাবলাম আপনাদের এখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যাই।

জুলেখার সঙ্গে বাবার দৃষ্টি এবং কথায় প্রতীক ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে। কণ্ঠটা অন্যরকম লাগছে কেন? যে কণ্ঠ কোনোদিন কখনো শোনা হয়নি? ও উঠে যাবার জন্য উসখুস করে। র‍্যাকে অনেক বই আছে, কিন্তু এই ঘরে বসে সেগুলো দেখার ইচ্ছে তার নেই। বাবা যেন জুলেখাকে কি বলছে সেটা ও শুনতে চায় না, বেশিরভাগই রাজশাহীর কথা, দু'জনের স্মৃতিচারণ। দু'জনে স্মৃতিচারণ করলে একটি বয়সে ফিরে যেতে পারে, সে বয়সটা হয়তো ওদের প্রিয় সময় ছিলো। প্রতীকের মন খারাপ হয়। বলে, আমি একটু বাগানে যাই?

জুলেখা তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁ যাও বাবা, বন্যা বোধহয় বাগানেই আছে। প্রজাপতি ধরা মেয়েটার শখ। প্রজাপতি ধরে বইয়ের ভেতর রেখে দেয়।

মুহূর্তে প্রতীকের মন ভালো হয়ে যায়। সত্যি বন্যা ছুটাছুটি করছে। বাগানভর্তি রঙবেরঙের ফুল- ফুলে ফুলে রঙিন প্রজাপতি। বন্যা একটাও ধরতে পারেনি। প্রতীক এগিয়ে গিয়ে বলে, আমি তোমাকে প্রজাপতি ধরে দেই বন্যা?

ও থমকে দাড়াঁয়। ওর লজ্জা কেটে গেছে। হেসে বলে, ধরতে চাইলেই হলো বুঝি? পারবে না । আমিই পারছি না।

প্রতীক ওর মুখটা উঁচিয়ে ধরে বলে, যারা নিজেরা প্রজাপতির মতো তারা প্রজাপতি ধরতে পারে না।

যাহ্ মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা নয়, মিথ্যে কথা নয়, বলতে বলতে প্রতীক খপ করে একটা প্রজাপতি ধরে বন্যাকে দেখায়। বলে, দেখেছো আমি প্রজাপতির মতো নই বলে কেমন চট করে ধরতে পারলাম।

তুমি আমার জন্য আরো প্রজাপতি ধরো জিতু ভাইয়া।

বন্যার কণ্ঠে অনুনয়। প্রতীকের শরীর ঝিমঝিম করে। ওর এই বয়সে কখনো ওকে মেয়েদের আবদার রাখতে হয়নি। আজ বন্যা ওর তারুণ্য স্পর্শ করেছে, ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে। বন্যা কি তা বুঝতে পারছে। না বন্যা তা বুঝবে না, বন্যার বোঝার বয়স হয়নি। এই বুঝে ওঠার সময়টুকুর জন্য ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

তুমি কিন্তু আমাকে রোজ প্রজাপতি ধরে দিও জিতু ভাইয়া।

এই ফুলের মধ্যে প্রজাপতির ওড়া তো অনেক সুন্দর বন্যা।

তা হোক। তবু আমি নিজের জন্য চাই। দেবে কি না বলো?

দেবো।

কথা দাও, আমাদের বাসায় রোজ আসবে?

রোজতো আসতে পারবো না।

কেন?

আর দু'মাস পরে আমার পরীক্ষা। আমি তো মেট্রিক দেবো।

বন্যা মুখ কালো করে বলে, দূর ছাই, ম্যাট্রিক আবার একটা পরীক্ষা।

হো-হো করে হাসে প্রতীক।

হেসো না কিন্তু, হাসলে আমার খুব রাগ হয়। দাও প্রজাপতিগুলো আমাকে দিয়ে দাও। আমি ঘরে যাই।

BanglaBook.org

ইস এতগুলো প্রজাপতি ধরলাম, মানুষতো তার জন্য ধন্যবাদও দেয়। তুমি যে কী!

ঠিক আছে চাই না প্রজাপতি।

বন্যা দৌড়ে চলে যায়। প্রতীক মুঠিভরা প্রজাপতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বন্যার অভিমানে ওর ভেতরটা তোলপাড় করে, ভালোলাগে। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে দ্রুতপায়ে ঘরে এসে প্রজাপতিগুলো টেবিলের ওপর রাখে।

খালাম্মা বন্যা রাগ করে প্রজাপতিগুলো নেয়নি।

ওর আবার রাগ! তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। পার্থকে একটাও ধরতে দেবে না।

ও বলেছে আমি যেন ওকে রোজ এসে প্রজাপতি ধরে দেই।

দুষ্টু মেয়ে। তুমি রোজ এলে আমার খুব ভালোলাগবে। তোমার বাবাকেও নিয়ে আসবে। একটু হেসে জুলেখা আবার বলে, তোমার মাকেও আসতে বলবে। নাও মিষ্টি খাও।

জুলেখা ওর দিকে মিষ্টির প্লেট বাড়িয়ে দেয়। প্রতীক কেমন নিস্প্রভ হয়ে যায়। ও বুঝতে পারে যে ওর ভেতরের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যাচ্ছে। ও বাবার দিকে তাকাতে পারছে না। বাবাকে কেমন দূরের মানুষ মনে হচ্ছে, কারণ বাবার চেহারায় আলগা খুশির আভা। মানুষের একধরনের ভালোলাগা তার চেহারায় অকারণ দীপ্তি আনে, যেটা দেখলে অন্য কারো রাগ হতে পারে। প্রতীকের এখন তেমন রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে করে প্রজাপতিগুলো দু'পায়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলতে। বন্যা মেয়েটা আসলে একটা বাজে পোকা।

জুলেখা ওর কাছে এসে বসে, ওকি তুমি মিষ্টি খাচ্ছো না ?

আমার খেতে ভালো লাগছে না।

আলী আহমদ তড়িঘড়ি বলে, সে কিরে তুই তো মিষ্টি পছন্দ করিস জিতু। খেয়ে নে।

তুমি খাও বাবা।

ওর কণ্ঠের শ্লেষ আলী আহমদের কানে খট্ করে বাজে। বুঝতে পারে যে ছেলে অন্যকিছু ভাবছে। জুলেখাও বিব্রত বোধ করে। তখুনি বন্যা একপ্লেট মিষ্টি নিয়ে ঢোকে। জিতুর কোলের ওপর প্লেট রাখতে রাখতে বলে, তুমি যে আমাকে এতগুলো প্রজাপতি ধরে দিলে তাই তোমার জন্য মিষ্টি নিয়ে এলাম। খাও। সব খাবে কিন্তু। একটাও যেন প্লেটে না থাকে। বলেই টেবিলের ওপর থেকে প্রজাপতিগুলো নিয়ে দৌড়ে চলে যায়।

জুলেখা ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলে, ছেলে আমার এখন জব্দ। না খেলে বন্যা তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতেই দেবে না।

প্রতীকের মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। বন্যার চুলের লাল রিবন, সবুজ ফ্রক ওর দৃষ্টিতে বাবার চেহারার দীপ্তির চেয়েও বর্ণাভ হয়ে ওঠে। সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। আড়চোখে বাবার দিকে তাকালে দেখতে পায় ওর বাবার ঠোঁটে মৃদু হাসি। প্রতীক বুঝতে পারে ওর বুকের ভেতরের সব বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। ও গপগপিয়ে দু'তিনটে মিষ্টি খেয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বাবা চলো যাই, সন্ধ্যা হয়েছে।

জুলেখা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও নিঃশব্দে বাইরে আসে। বুঝতে পারে বাবার এখন বিদায় নেবার সময়। দু'জনে কিছু একটা বলবে, হয়তো সামান্য রসিকতা, সামান্য হাসি বিনিময়। কিন্তু বন্যা? না, আশেপাশে কোথাও বন্যা নেই। না, থাক। না, থাকলেই ভালো। ও দু'লাফে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে গেট খুলে রাস্তায় আসে। তখনো ঠিকমতো সন্ধ্যা হয়নি, হালকা হলুদ আলো চারিদিকে। মানুষের মুখগুলো রঙিন প্রজাপতির পাখার মতো চিত্র-বিচিত্র। একজন রিকশাওয়ালাকে ডেকে দাঁড় করায়। লোকটার গায়ে জামা নেই, মেরুদণ্ডের হাড় উঁচু, লোকটার মুখে রঙ নেই, তবুও প্রতীকের আজ সবকিছুতেই রঙ।

BanglaBook.org

রিকশায় যেতে যেতে ও বাবার সঙ্গে একদম ভিন্ন কথা বলে, আযম খান লোকটাকে বেশ ভালো বলেই মনে হয়, না বাবা?

হঠাৎ তোর আযম খানের কথা মনে হলো কেন?

আলী আহমদ ছেলের প্রশ্নে বিরক্ত হয়। সে তখন বুকের ভেতর সুখের অনুভূতি লালন করছে। সেই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আযম খান তার চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করবে এটা তার কাম্য নয়। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক বলে, তুমি কি অন্যকিছু নিয়ে ভাবছিলে বাবা?

আলী আহমদ খানিকটা কর্কশ কণ্ঠে বলে, না, তুই কি বলছিলি বল?

বলছিলাম ভদ্রলোক অবাঙালি হলেও বাঙালিদের জন্য বেশ দরদ আছে। চট্টগ্রামের জলোচ্ছ্বাসের পর তিনি যেভাবে রিলিফ দিলেন তা সত্যিই তুলনাহীন।

ঠিক বলেছিস। কোনো কোনো মানুষ বোধহয় এমনই হয়। ওদের কাছে মানুষই বড় থাকে। আর সব বিবেচনা বাদ হয়ে যায়। আযম খান তেমন মানুষ।

প্রতীক কিছুটা উদ্ভাসিত হয়ে বলে, এমন মানুষে দেশ ভরে গেলে ভালো হতো।

ছেলের এসব কথায় আলী আহমদের বিরক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক আবারো বলে, বাবা তুমি কি কিছু ভাবছো?

হ্যাঁ, ভাবছি। একটা গল্পের প্লট মাথায় এসেছে।

বাহ্ দারুণতো। তুমি যে কেমন করে এসব ভাবো আমি ভেবেই পাই না। আমি কখনো তোমাদের মতো লিখতে পারবো না। ভাইয়া পারবে। ভাইয়া অনেক কিছু নিয়ে ভাবে।

বন্যাকে তোর কেমন লাগলো?

চমৎকার মেয়ে। ভীষণ অভিমানী, বোকাও। তোমার কেমন লেগেছে বাবা?

বাচ্চাদের আমার খুব ভালোলাগে। বন্যা তো আমার মেয়ের মতোই।

বন্যা কবে ম্যাট্রিক পাস করবে বাবা?

আরো বছর পাঁচেক পরে। মেয়েটা মায়ের মতো সুন্দর হয়েছে।

ঠিক বলেছো।

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ সময় কাটায়। রিকশাওয়ালা দ্রুত যাবার চেষ্টা করছে। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। একটু পর প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ দেখ বাবা ভাইয়া রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে।

খেতে দাও। ও ফুচকা খেতে ভালোবাসে।

আমিও নেমে যাই ?

না, সামনে তোমার পরীক্ষা।

প্রতীক খানিকটা আহত হয়ে চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে আচ্ছা বাবা আযম খান কতদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে থাকবে?

আহ্ জিতু, তুমি বড্ডো বেশি বাজে বকো।

প্রতীক বুঝতে পারে বাবা ভীষণ রেগে গেছে। বাবা রেগে গেলে ওকে তুমি করে বলে। ও আর কথা বাড়ায় না। জুলেখা খালাম্মার বাসা বাবার একটি প্রিয় জায়গা। বাবা কি ঘন ঘন ঐ বাসায় যায়? তখন আলী আহমদের বুকের ভেতর গল্পের প্লট নয়, কবিতার লাইন প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি দিয়ে নয়, আজ নিজের সত্তার ভিতর থেকে উঠে আসছে আবেগের আশ্চর্যজনক পঙক্তি। কতদিন, কতদিন কবিতা লিখা হয়নি। এই চেনা শহরের বুকটা রক্তের সমুদ্র হলে আলী আহমদের তর্জনি কলম হয়ে ডুবে যাবে,

BanglaBook.org

বেরুবে তাজা ফুটফুটে গোলাপ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মফস্বলে এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু সামরিক সরকার এর মধ্যে কয়েকজন সংস্কৃতিসেবীকে গ্রেফতার করলে পরিস্থিতি কিছুটা থমথমে হয়ে ওঠে। সবাই এ নিয়ে তুমুল তর্কে মাতলে আলী আহমদ চুপচাপ থাকে। ওর মনে হয় সামরিক সরকারের চরিত্রই এই, এটাই স্বাভাবিক। এমন না ঘটলেই বরং অবাক হতো। ওর মনে পড়ে শিক্ষা সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাবের বক্তৃতা। পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি লেখকদের প্রচুর উপদেশ দিয়েছিলেন। মনে রাখবেন আমাদের চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি পাকিস্তান, অন্য কোথাও নয়। আমাদের উচিত পাকিস্তানি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা। আলী আহমদ বিড়বিড় করে, পাকিস্তানের আদর্শ? পাকিস্তানের আদর্শ মানে কি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গুলি চালানো? আমরা কেমন করে ভুলবো একুশে ফেব্রুয়ারিকে? আইয়ুব খান বক্তৃতায়, আলোচনায় পাকিস্তানের সংহতির ওপর জোর দিয়ে কথা বলেন। বলেন, ইসলামের আদর্শ দুই পাকিস্তানকে অখণ্ড বাঁধনে বেঁধে রাখবে। হায় বাঁধন ! একুশের ঘটনার মধ্য দিয়ে তো এই বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। এখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চলছে নানা রকমের চক্রান্ত। দৈনিক আজাদ লেখালেখি করছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে একদল বুদ্ধিজীবী। তাঁদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার কথাও বলেছেন। আলী আহমদের মনে হয় এতকিছুর মধ্যেও ওর তেমন খারাপ লাগছে না। ও বেশ নির্লিপ্ত হয়ে যেতে পারছে। নির্লিপ্ত হয়ে থাকতেও পারছে, ও বুঝতে পারছে কঠিন সময় সামনে। তাই বড় আকারের প্রস্তুতি চাই। মোকাবেলার জন্য শক্তিও চাই। প্রদীপ্ত মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়। ওর বয়স কম, অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন। ধাম করে কোনো কিছু করে ফেলতে চায়। কিন্তু আলী আহমদ নিজে এখন আর তেমন করে ভাবে না। ওর বিশ্বাস সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা অনেক বেশি গভীর। সাময়িক উসকানি দিয়ে এই চেতনার স্তর ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা যাবে না। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেলো যে সরকারের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে এবং বিশেষ গোষ্ঠীর মিথ্যা প্রচারণা উড়িয়ে দিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। শহর মুখর হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠান থাকে। বৈশাখের এগার তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের উদ্যোগে কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠান হিসেবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রাজনীতির উপরে রেখে বিশ্বকবিকে মহান কবি হিসেবে স্থান দেয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। কথাটি চমৎকার লাগে আলী আহমদের। সেদিন অনেক রাতে সভা ভাঙে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে ও। বারবার মনে হয় এই রাত শুধু আমার। গুনগুনিয়ে সুর ওঠে বুকের ভেতর থেকে। রমনার সবুজ গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে শীতল বাতাস বয়ে আসছে। জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, জুড়িয়ে যাচ্ছে হৃদয়। আলী আহমদের মনে হয় জুড়িয়ে যাচ্ছে এই শহর– কমে আসছে সামরিক শাসনের ধার– গভীর হচ্ছে, গাঢ় হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, যেন গায়ে গা লাগছে। শিস বাজাতে ইচ্ছা করে। এভাবে রাত করে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরা যেন অনেক কাল আগের ঘটনা, ভেবে দেখলো আলী আহমদ, রাজশাহী থাকতে ও হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতো, ফিরতে ভালো লাগতো। গভীর রাতে নিজের দরজায় টুংটাং শব্দ করা, খোলো আমি এসেছি, কার কাছে বলা এইসব কথা? নিজের কাছে কি?

তখন ও শুনতে পায় পেছন থেকে ডাক, বাবা?

প্রদীপ্ত দৌড়ে ওর কাছে আসে। আলী আহমদ ছেলেকে পেয়ে যেন ভরসা পায়, অনেক রাতে এই একা একা ফেরার পথে কাউকে পেয়ে ওর ভালো লাগছে– ফুসফুসে

BanglaBook.org

শীতল বাতাস ভরে ওঠে।

বাবা আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি এমন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরবে?

আলী আহমদ ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে দেখিনি।

আমিও তোমাকে দেখিনি। যা লোক হয়েছে। শহর যেন ভেঙে পড়েছে। সবাই কি রবীন্দ্রনাথকে বোঝে বাবা? নাকি ভালোবেসে এসেছে?

ভালোবাসাবাসি কিছু নয় দীপু। পূর্ব বাংলার মানুষ রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে নিজেদের দেখতে চাইছে। আইয়ুব খান যেমন সংহতির নামে দুই পাকিস্তানকে এক করতে চাইছে এটা তার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। এক করতে চাইলেই কি এক করা যাবে? পূর্ব বাংলার মানুষেরতো আলাদা আইডেনটিটি আছে।

ঠিক বলেছো বাবা, পাকিস্তানের সংহতির জন্যতো আমরা এই আইডেনটিটি বিসর্জন দিতে পারি না।

এইসব কথা নিজর্নে এমন রাতের অন্ধকারেই বলা যায়। দিনের আলোয় নয়।

এজন্যই নসিব হাফিজুদ্দিন বলে সামরিক শাসন এই শহরকে গ্রাস করে রেখেছে। জানো বাবা, আমার মনে হয় এই শহরের কোথাও সামরিক শাসন নেই। নসিব ভাই অবশ্য শিকার করে না। বলে, এত অল্পে কিছু হয় না। আরো গভীর কিছু চাই।

নসিব, তোমার ঐ পাগল বন্ধুটি তো?

ও পাগল নয় বাবা। বলে, এই শহর বাসের অযোগ্য। যেখানে সামরিক শাসন থাকে সেখানে বাস করলে নাকি নিশ্বাসে পোকা ঢুকে যায়। পোকা কুরে কুরে খেতে থাকে মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, নাড়িভুঁড়ি–

আলী আহমদ অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে চেঁচিয়ে বলে, বুঝেছি বুঝেছি। সব খায়, সব।

প্রদীপ্ত গভীর কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ বাবা, সব।

অকস্মাৎ ফুরিয়ে যায় দু'জনের কথা। সামনে বাড়ি– বাড়ির কাছাকাছি এসে গেলে ঘণ্টাধ্বনির জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে মন, তখন মনে হয় কেউ প্রতীক্ষায় আছে– খুব কাছের, গভীরের কেউ।

গেটে ধাক্কা দেয়ার আগে প্রদীপ্ত বলে, মা নিশ্চয় জেগে আছে, না বাবা?

আমরা কেউ না ফিরলে তোমার মা কি কখনো ঘুমোয়।

আলী আহমদ গাঢ় স্বরে কথাগুলো বলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পুষ্পিতা না থাকলে ওর জীবনের অনেকখানি শূন্য থেকে যেত। ও আছে বলে যন্ত্রণা কম, আছে বলে স্বস্তি বেশি– এ দু'য়ের জন্য আলী আহমদ লেখালেখির দিকে এত মনোযোগী। প্রদীপ্ত গেটে ধাক্কা দিতে না দিতেই পুষ্পিতা দরজা খুলে দেয়। বলে, বারান্দায় বসে ছিলাম। ভাবলাম তোমরা ছাড়া এত রাতে আর কে হবে।

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, আমরা জানতাম তুমি আমাদের জন্য জেগেই আছো। আমাদের জন্য তোমার কোনো কষ্ট নেই মাগো।

কে বললো নেই? অনেক কষ্ট আছে।

তাই নাকি কখনো তো বলোনি?

সব কথা কি আর বলা যায়।

পুষ্পিতা হাসতে হাসতে রান্নাঘরে ঢোকে। ওদের জন্য রাতের খাবার গরম করতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে পারে না আলী আহমদ। রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখাটা শেষ

BanglaBook.org

করতে হবে। চব্বিশে বৈশাখ থেকে ইঞ্জিনিয়ার'স ইন্‌স্টিটিউট মিলনায়তনে যে অনুষ্ঠান হবে ওখানে দ্বিতীয় দিনে ওকে প্রবন্ধ পড়তে হবে। চারদিন ধরে অনুষ্ঠান হবে। আলী আহমদ নিজের লেখা কাগজপত্র গোছাতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ভূমিকার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে। বেশ খানিকটা লেখা হয়েছে। এতকিছু লেখার আছে যে ভয় হয় প্রবন্ধ না বড় হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায় নিয়ে অনেকের স্মৃতিচারণ আছে। সেইসব পত্রিকা-বই নিয়ে বিভিন্ন জায়গা বেছে বেছে পড়তে থাকে আলী আহমদ। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলেন, 'আপাতত রাশিয়া এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।' আলী আহমদ বোঝে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুর্জোয়া মানবতাবাদী। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু 'তীর্থদর্শন' শব্দটির মধ্যে দিয়ে মানবতার জন্য যে গভীরতম ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এই প্রবন্ধের শুরুতেই ও দেখিয়েছে যেখানে নিপীড়ন, অত্যাচার, আগ্রাসন সেখানেই প্রতিবাদী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১-এ হিটলারের নাৎসীবাহিনী আক্রমণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তখন তার জীবনের শেষ পর্যায়। তিনি অসুস্থ। তবুও যুদ্ধের খবর জানার জন্য সারাক্ষণ উন্মীব থাকতেন। নির্মলকুমারী মহলানবীশ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'খবরের কাগজ এলে, এনে দিলাম। দেখি একমাত্র ইন্টারেস্ট যুদ্ধের খবরে, অর্থাৎ জার্মানরা কেবলই এগোচ্ছে, না রাশিয়ানরা কোথাও ওদের ঠেকাতে পারছে। যেদিন দেখেন, জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু বাধা পড়েছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েন। আর বড় বড় হেডলাইনে লেখা থাকে জার্মান সৈন্য আজ এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়ে ঐ হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন–'হয়ে গেছে নিয়ে যাও।' সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার থাকে।'

১৯৪১-এর তিন জুলাই রবীন্দ্রনাথের শরীরে অস্ত্রোপচার করা হবে, সেদিন সকালে জানতে চেয়েছেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার অগ্রযাত্রার খবর। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখেছিলেন, যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা ;'রাশিয়ার খবর বলো।' বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।'

রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছিলেন, 'সোভিয়েত কখনো পরাভব মানবে না।' আলী আহমদের দুঃখ হয় যে রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেননি সোভিয়েতের সাফল্য। নয়শ দিন লেলিনগ্রাদ শহর অবরোধ করে রাখার পরও হিটলারের বাহিনী ঢুকতে পারেনি সে শহরে। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু ফ্যাসিজমের কাছে নতি স্বীকার করেনি। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভূমিকার কথা পড়তে পড়তে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ও শুনতে পায় মসজিদ থেকে ভেসে আসা আযানের ধ্বনি। পুষ্পিতা আড়মোড়া ভাঙে, তারপর আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। ওর ঘুমের যেন অসুবিধা না হয় সেদিন বেশি রাত হলেই আলী আহমদ মোম জ্বালিয়ে পড়াশোনা করে। মোমটা প্রায় নিভুনিভু। কিন্তু ও এখনো ক্লান্তি অনুভব করে না। একজন বিশাল মানুষের সান্নিধ্য অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে ওর ক্লান্তি কেটে যায়। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে ও নতুন তথ্য খুঁজতে থাকে। অনেক তথ্য পেয়ে গেলে ওর মনে হয় প্রবন্ধটি ভালোই হবে। ওর আর ঘুম পায় না, রাতজাগার ক্লান্তি ও নেই। ও আবার কাগজ-কলম তুলে নেয়, খসখসিয়ে লিখতে থাকে। তখন পুষ্পিতা নিঃশব্দে এসে ঘাড়ের ওপর হাত রাখে, ঘুমোওনি?

BanglaBook.org

উঁহু।

আলী আহমদ কাগজ থেকে মাথা তোলে না।

অনেক হয়েছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

পুষ্পিতা মোমের শেষ অংশটুকু ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। তখন ঘরে আলো-আঁধারী। কালো কালো অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। আলী আহমদ দু'হাতে পুষ্পিতাকে জড়িয়ে ধরে।

বলে, ঘুমুতে পারি এক শর্তে। আমার সঙ্গে তোমাকেও শুতে হবে।

সেকি ভোর হয়ে গেছে।

চুলোয় যাক ভোর।

একটুপর ছেলেরা উঠে যাবে।

ওরা এই মুহূর্তে আমার হিসাবের বাইরে।

কী যে পাগলামি!

এসো।

পুষ্পিতার মৃদু আপত্তি অগ্রাহ্য করে আলী আহমদ ওকে নিয়ে বিছানায় আসে। আজ ওর মন ভালো। পুষ্পিতার শরীর এখন মৃগের নাভি, কস্তুরির গন্ধ ছড়ায়। কতক্ষণ, কতক্ষণ পরে আলী আহমদ জানে না, ওর দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে।

ঘুম ভাঙলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা এগারোটা, পাশে পুষ্পিতা নেই। বিছানার পাশে খবরের কাগজ রাখা আছে। ও চেঁচিয়ে প্রদীপ্তকে ডাকে, দীপু আমার চশমাটা দিয়ে যাও। প্রদীপ্ত মশারি ওঠায়, জানালা খুলে দেয়, ঝকঝকে আলোতে ভরে যায় ঘর। এই ঘরের জানালার সামনে কোনো দেয়াল নেই, সামনে বিস্তৃত খোলা মাঠ– মাঝে মাঝে বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় ঘরের সব জিনিস। সবুজ ঘাসে ভরে থাকা মাঠটা দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে প্রদীপ্ত বলে, জানো বাবা নসিব ভাইয়ের বাবাকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেকি? কি হলো?

মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলো, আর ফেরেনি। নসিব ভাইও এমন ছেলে না, কোথাও খোঁজ করেনি। হাসপাতালেও না।

সাধেই কি বলি ও একটা পাগল।

আলী আহমদ কাগজের ওপর চোখ বুলায়। প্রদীপ্ত বেরিয়ে যায়।

অনুষ্ঠান শেষের পরদিন বিকেলে 'সংবাদ' অফিসে আড্ডা দিতে গেলে জুলেখা আর মতিউর একসঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে, আমরা এক জায়গায় যাবো বলে বেরিয়েছি। চলুন আপনিও যাবেন।

কোথায়?

চলুন না। আগেই বলে দিলে মজা থাকবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

বেরুবার আগে মতিউর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সেদিন আপনার প্রবন্ধটি দারুণ ছিলো। 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা' বিষয়টিও চমৎকার নির্বাচন করেছেন। আমাকে দেবেন, 'সংবাদ'- এ ছাপবো।

আলী আহমদ মৃদু হাসে। জুলেখাও উচ্ছ্বসিত হয়, সত্যি সেদিনের অনুষ্ঠান আপনি

BanglaBook.org

ভরিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন তথ্য, তেমন উপস্থাপনা।

হয়েছে, হয়েছে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

আলী আহমদ দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে। তখন শেষ বিকেল, আকাশ মেঘলা। যেন যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে, হয়তো একটা কালবোশেখিও বয়ে যেতে পারে শহরের ওপর দিয়ে। তিনজনে দু'টো রিকশায় ওঠে। ওরা সুফিয়া কামালের বাসায় আসে। ওখানে আরো অনেকে আছে, বেশ জমজমাট আড্ডা জমে উঠেছে। ওদের দেখে আর একদফা চা হয়। গাল-গল্পের বিষয়ের ঠিক নেই। মাঝে মাঝে গানও হয়। আলী আহমদ এই ঘরোয়া আড্ডায় বেশ স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। একসময় সুফিয়া কামাল বলেন, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতো আমরা বেশ সফলভাবেই পালন করতে পারলাম, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দিতে হবে এবং তা ধরেও রাখতে হবে। ধরে রাখতে না পারলে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে যাবে মাত্র।

কি করতে চান?

একটা গানের স্কুল করলে কেমন হয়?

সবাই সায় দেয়, হ্যাঁ করা যেতে পারে।

এই স্কুলের লক্ষ্য হবে আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা। এটা যাতে বিকৃতির স্রোতে নষ্ট না হয় তা আমাদের দেখতে হবে।

ঠিকই বলেছেন।

এ বিষয়টি নিয়ে সভায় গুঞ্জন ওঠে। প্রত্যেকে যার যার অভিমত দিতে থাকে।

জুলেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এমন একটি গানের স্কুল হলে আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করে দেবো।

আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, আমার ছেলে দু'টো বড় হয়ে গেছে, না হয় আমিও দিতাম।

ছেলে বড় হলে কি হবে, বাপের চেহারায় বুড়োর ছাপ পড়েনি। চুলও পাকেনি।

তাহলে কি উনি নিজেই ভর্তি হবেন স্কুলে?

হলে ক্ষতি কি? গান শিখতে কি বয়স লাগে?

হো-হো হাসির রোল ওঠে। চেহারার প্রশংসা আলী আহমদের ভালোই লাগে। তেমন করে কেউ কখনো চেহারার কথা বলেনি। বিয়ের পর পর পুষ্পিতা অনেক বলেছে। এখন মনে হয় সেটা ছিলো একধরনের অভ্যাস– হয়তো ওকে খুশি রাখার জন্য পুষ্পিতার চেষ্টা। কিন্তু বাইরের কেউ প্রশংসা করলে সেটা অন্য রকম লাগে, একদম ভিন্ন।

রাতে বাড়ি ফিরে প্রথমেই প্রদীপ্তকে বলে, গান শিখবে দীপু?

গান? বলো কি বাবা?

হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

দারুণ হবে। শিখবো।

প্রতীক কাছাকাছি ছিলো। এগিয়ে এসে বলে, আমিও শিখবো। এতদিন কেন যে স্কুলে ভর্তি করে দাওনি। এখন বয়স হয়ে গেছে না?

গান শেখার কি আর বয়স আছে।

না, বাবা, নেই। আমি মনে করি বিখ্যাত শিল্পী হতে হবে এমন কথাতো নেই। নিজের আনন্দের জন্য শিখলে দোষ কোথায়?

বাহ্, চমৎকার বলেছে দীপু।

ভাইয়া তো ভালোই বলেছে বাবা। তাহলে তুমি আর মাও গান শিখতে শুরু করো।

BanglaBook.org

জিতুটা যা দুষ্টু হয়েছে না।

পুষ্পিতার কথার সূত্র ধরে আলী আহমদ বলে, ও কিন্তু ঠিকই বলেছে। আমরাও ভর্তি হবো।

বুড়ো বয়সে আর কত দেখাবে।

পুষ্পিতা হাসতে হাসতে মুখে আঁচল চাপা দেয়।

প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, কারা গানের স্কুল করছে বাবা? কি নাম রেখেছে? কবে উদ্বোধন?

উদ্বোধন করতে হয়তো সময় লাগবে। নামটা কিন্তু ভারি সুন্দর।

তিনজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কি নাম?

আলী আহমদ মুখ উজ্জ্বল করে বলে, ছায়ানট।

বাহ্ বেশ।

প্রতীক প্রদীপ্তকে ডিঙিয়ে বলে, বেশ নয়, দারুণ।

হ্যাঁ দারুণই। ভাবছি নসিব হাফিজুদ্দিনকেও গান শেখাতে নিয়ে যাবো।

তোমার পাগলা বন্ধু?

প্রদীপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, পাগলা নয় জিতু , ব্যতিক্রম। এই শহরে ও অন্যরকম মানুষ।

BanglaBook.org

৩

দু'দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টি ঝরছে, গত পরশু বৃষ্টি ছিলো না, আকাশে ঘন মেঘ এবং ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা ছিলো, তবুও গলায় মাফলার জড়িয়ে বেরিয়েছিলো নবীজ হাফিজুদ্দিন। সকাল-সন্ধ্যা কিছুক্ষণের জন্য হেঁটে আসা ওর অভ্যাস, নইলে স্বস্তি পায় না, বুকে নাকি ব্যথা বাড়ে। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর সে প্রবল যন্ত্রণায় আছে, সংকট মানসিক এবং শারীরিক। বলে, তার এই দুই অংশে জড়তা এসেছে। হতে পারে, আসাই স্বাভাবিক। ফলে তার কাছে এই সংকট উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ। বুড়ো নবীজ হাফিজুদ্দিন হাঁটুক বা নাচুক তাতে তার পুত্র নসিব হাফিজুদ্দিনের কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই লোকটি সন্ধ্যার পর আর ফিরলো না, এটাই ওর ভাবনা। অবশ্য মাঝে-মধ্যে না বলেকয়ে উধাও হয়ে যাওয়া তার অভ্যেস– জিজ্ঞেস করে কোনো সদুত্তর পায়নি কখনো। আঠারো বছর বয়সের শেষে একবার উত্তর পেয়েছিলো। নবীজ হাফিজুদ্দিন তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছিলো, সব ব্যাপারে জানতে চেয়ো না। মনে রাখবে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়া জঘন্যতম নোংরামি, অত্যন্ত রুচিহীন। একজন আধুনিক মানুষ এটা করে না, করা উচিতও নয়।

সেদিন নীরবে অপমান হজম করেছিলো ও। তারপর থেকে বাবার ব্যাপারে কখনো মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভেবে দেখেছে, বাবার সংজ্ঞা অনুযায়ী ওর চারপাশে সব রুচিহীন লোক। দু'একজন বাদে প্রত্যেকেই তো অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ভালোবাসে। পরচর্চা অত্যন্ত প্রিয় বিষয়, না থাকলে আড্ডা জমে না, অফিস চলে না এবং প্রতিটি বাড়ির বৈঠকখানা শূন্য লাগে। সুতরাং ওর বাবার কথা অনুযায়ী ঢাকা শহরে আধুনিক লোক নেই বললেই চলে। তবুও এত কিছুর মধ্যে তো জীবন চলছে। কেউ তো চোখ উল্টিয়ে, নাকের ফুটো বন্ধ করে

দিয়ে বসে নেই। প্রত্যেকের শরীরে স্বাভাবিক শ্বাস বইছে। প্রত্যেকে এইসব অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো জলাঞ্জলি দিচ্ছে। কই, আক্ষেপ তো কোথাও নেই। যাকগে।

ওর চার বছর বয়সে মা মারা যায়, এখন ওর বয়স বত্রিশ। বাবা আর বিয়ে করেনি, দু'জনে বেশ সংসার চালিয়েছে, কারো কোনো কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। কখনো ওর বাবা দু'চারদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। নইলে মোটামুটি ঘরমুখো। রান্নাবান্না পারে, কাজের লোক না থাকলে চালিয়ে নেয়, ঘরদুয়ার ছিমছাম রাখতে ভালোবাসে, ঠিক চাকুরিজীবী মেয়েদের মতো জীবনযাপন আর কি। দু'জনের কাছে ঘরের চাবি আছে, যার যখন খুশি বেরিয়ে যায় এবং ফেরে, কোনো বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে এম. এ. পাস করার পরও নসিবের তেমন ভালো চাকরি জোটেনি। আধা সরকারি অফিসে ছোটখাটো অফিসারের চাকরি নিয়ে সুখে থাকার ভান করে। বাবা নাম রেখেছে নসিব, নিজের কাছে মনে হয় বদ-নসিব। বন্ধুরাও নাম নিয়ে ঠাট্টা করে, ও গায়ে মাখে না। বরং হাসতে হাসতে বলে, গোলাপকে যে নামেই ডাকো, গোলাপ গোলাপই।

বৃষ্টির দিনগুলোতে বেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, অফিস যায়নি, দু'দিনের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নেবে। কিন্তু অফিসে গিয়ে বৃষ্টির এই উষ্ণ সান্নিধ্য মাটি করতে চায়নি ও। আর মন যা চায় তা করাটাই শ্রেয় মনে করে। পাতলা কাঁথা গায়ে টেনে চিৎ হয়ে শুয়ে খবরকাগজ পড়ছে, দু'তিন দিনের পুরনো কাগজ পড়তেই ও ভালোবাসে। তাতে উৎকণ্ঠা থাকে না, খবরের পীড়ন থাকে না, ধীর-স্থির ভাবে , হেলাফেলা করে সেসব খবর পড়তেই ওর পছন্দ। গান শোনার মতো এটাও একটা আনন্দদায়ক অভ্যেস। মাঝখানে একবার উঠে তেল-পেঁয়াজ মুড়ি মাখিয়ে এনে বিছানায় রেখেছে, টুপটাপ গালে পোরে তা, যেন বৃষ্টির ভেতর থেকে হঠাৎ করে ছুঠে আসা দু'একটা শিলার টুকরো। দাঁতের তলে মুড়ি থেঁতলে গেলে ওর ভাবনা প্রবল হয়, আজ তৃতীয় দিন তবুও ফিরলো না লোকটা। যাক আর দু'দিন পর খুঁজবো। কোথায়? ও ভেবে পেলো না। মাতৃহীন চার বছরের ছেলেকে নিজে মানুষ করেছে, তবু ছেলের ফুফু বা খালার কাছে রেখে আসেনি। নসিব ভেবে দেখেছে বাবার মধ্যে যুক্তি এবং আবেগ প্রবলভাবে কাজ করতো। মানসিক কোনো ব্যাপার তাকে শিশুর মতো অবুঝ করে দিতো। আবার যুক্তি প্রবল হলে তাকে খণ্ডানো কষ্টসাধ্য ছিলো। নসিব ভেবে পায় না যে কি করে সম্ভব? যুক্তি এবং আবেগ কি করে একজনের মধ্যে সমানভাবে ক্রিয়া করে। তাহলে কি সে সুস্থ মানুষ নয়? কি জানি। এখানে কোনো কিছুর নিয়মের ব্যতিক্রম হলেইতো লোকে বলে পাগল। যে যত গৎবাঁধা রুটিন জীবনযাপন করতে পারে সে তত বেশি স্বাভাবিক।

মুড়ি খেয়ে ও ঘুমুনোর চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আসে না। ও গান শোনার চেষ্টা করে, গজল ওর প্রিয়। অতুল প্রসাদের গান শুনতে ওর ভালো লাগে। গানের কথা মনে হতেই নিজে হেসে ওঠে ও। গতকাল প্রদীপ্ত এসেছিলো। বলেছে, নসিব ভাই নতুন একটা গানের স্কুল হবে আপনি কিন্তু সেখানে ভর্তি হবেন। ও হ্যাঁ-না কিছু না বলে চোখ গোল করে প্রদীপ্তর দিকে তাকায়। ছেলেটির সঙ্গে ওর অল্প দিনের বন্ধুত্ব হয়েছে। ওকে কেন যে ছেলেটির এত পছন্দ তা ও বুঝতে পারে না। ও অনেকটা ওর ন্যাওটা হয়ে গেছে। বলে, আপনি দারুণ লোক। এমন লোকই আমি খুঁজি। সাদামাটা লোক আমার একটুও পছন্দ হয় না।

প্রদীপ্তর কাছে ও কেন যে দারুণ এটা কখনো ও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে না। তবে ছেলেটি সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত– তাই ওকে ওর ভালো লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে প্রদীপ্ত নিজেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তা কোনো বাধা হয়নি। এই বৃষ্টির মধ্যে হয়তো প্রদীপ্ত আসতে পারবে না, কিন্তু পারলে ওর

BanglaBook.org

ভালোই লাগতো। কে জানে বৃষ্টি মাথায় করে এসেও পড়তে পারে, কাছেই তো থাকে ওরা– হাঁটা পথ। বাইরে জোর বাতাসের দাপট, কিছুটা ঝড়ো হাওয়া, ও ভাবলো হয়তো বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ও বাবার ঘরে এলো। পরিপাটি বিছানা তেমনি আছে, আলনার কাপড় ভাঁজ করা, টেবিলে কিছু খুচরো কাগজপত্র, স্টিলের আলমারি বন্ধ, কোণের টিপয়ে পানের সরঞ্জাম– ডিব্বায় পান শুকিয়ে আছে, কুঁচানো সুপোরি কৌটায় ভর্তি, জর্দ্দার কৌটা দু'তিনটে, পাশে চুনের পট। চুনের পটটা কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নসিব। পটটা পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছিলো নবীজ হাফিজুদ্দিন। প্রদীপ্ত বলেছিলো, বিউটিফুল গিফট। খুব আর্টিস্টিক। মাত্র চারদিন আগে প্রদীপ্ত ওকে রায়েরবাজারে সতীশ কুমোরের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো। সত্তর বছরের বুড়ো সতীশ প্রদীপ্তর বন্ধু, মজার বন্ধুত্ব ওদের। ছেলেটি কত কিছু যে খুঁজে বের করতে পারে। সম্পর্কের সূত্রগুলো নিয়ে বেশ খেলতে পারে। সতীশ বুড়োর নাকি বিচিত্র জীবন– ঘা-খাওয়া, পোড়-খাওয়া, ওকে নিয়ে ফিচার করবে। তার আগে ওর নাড়িভুঁড়ি সব উল্টেপাল্টে ফেলবে ছেলেটি। নসিবের বুকটা কেমন জানি মোচড় দিয়ে ওঠে। প্রদীপ্তকে পছন্দ করতো ওর বাবা। বলতো, ছেলেটি ক্রিয়েটিভ। প্রদীপ্ত ওর বাবাকে বলেছিলো, আপনার পান খাওয়ার সরঞ্জামগুলো আমি বদলে ফেলবো। আর্টিস্টিক পট এনে দেবো। নজীব হাফিজুদ্দিন খুশি হয়ে বলেছিলেন, বেশ হবে। আমাকে একদিন তোমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যেও। তাহলে কি বাবা একা একাই সতীশ কুমোরের বাড়িতে গেলো? আর্টিস্টিক পট দেখে বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গেলো ? নসিব চুনের পটটি আগের জায়গায় নামিয়ে রাখে। ও আঁতিপাতি সবকিছু খুঁজলো, ভাবলো বাবা কোথায় গেছে সে সম্পর্কে যদি কোনো কিছু লিখে রেখে যায়, সে সূত্র ধরে ও তাকে খুঁজতে বেরুবে। নেই, কোথাও কিছু নেই। ও বিছানায় বসে, বালিশ থেকে ত্রিফলা তেলের গন্ধ আসে। সে গন্ধে ওর নসিয়ার ভাব হয়, মুখভর্তি থুতু উঠে আসে। বাথরুমে গিয়ে থুতু ফেলে। প্রায়ই ওর মুখভর্তি থুতু উঠে আসে। এ নিয়ে বাবা বকাবকি করে। বলে, তোমার ম্যানিয়া। এটা ইচ্ছে করলেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ও কিছুতেই বাবাকে বোঝাতে পারে না যে, ইচ্ছে করলেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ওর নেই। যে কোনো কিছুতেই ওর বমির ভাব হয়। বাবা বলবে, নসিয়া শব্দটা ফ্যাশন। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ফ্যাশনের মোহে ভোগ। তোমরা নিজেই বোঝো না যে তোমরা কি চাও, কিভাবে চাইলে তা যোগ্য চাওয়া হয়। যোগ্য চাওয়া? হাসি পায় নসিবের। বাবা মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যে শুনলে বাবার জন্য মায়া হয়। তাই নসিব চুপ করে থাকে। বাবার এইসব ধারণার সঙ্গে ওর নিজের মত মেলে না। ও জোর করে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতেও চায় না। এইসব ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয় না।

এক সময় ভাবতো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণী নিয়ে পাস করে যে চাকরি করছে, সেটা ওর প্রাপ্য নয়, ওর আরো বড় কিছু পাওনা ছিলো। কিন্তু হলো কৈ? ওর তো এটুকু মেনে নিয়ে সুখে থাকতে হচ্ছে। বাবা কোথায় যায় তা জানার অধিকার ওর নেই, ও তো তাও মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেয়াটাইতো ওর এখন অভ্যেস। এই অভ্যেস ওকে রীতিমতো চর্চা করে শিখতে হয়েছে। এটা না করলে কি হতো তা ও ভেবে দেখেনি। ভেবে দেখা সঙ্গত ছিলো কি না সে হিসেব করতে ইচ্ছে হয় না। আসলে সময় ওকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ও নিয়ম মানছে। কতদিন মানবে? এভাবে নিয়ম মানলে ও রেশম গুটির মতো নিজের সুতোয় আটকা পড়বে এবং একদিন কোনো মানুষের হাতে গরম পানিতে সেদ্ধ হয়ে গেলে ওর ত্বক থেকে বেরুবে রেশমি সুতো। ওহ্ কী বাজে ব্যাপার! এখন থেকে ও নিয়ম মানার একটি সীমানা নির্ধারণ করবে। ও আবার নিজের ঘরে আসে।

BanglaBook.org

দু'কামরার এই বাড়িটাকে ওর এখন দ্বীপের মতো মনে হয়, চারদিকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। মেঝের ওপর পড়ে থাকা খবর কাগজটা তুলে রাখতে গিয়ে একটি খবরে ওর দৃষ্টি আটকে যায়, বাসের ধাক্কায় একজন অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধের মৃত্যু। বাসের চালক দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে বৃদ্ধের লাশ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। রাস্তায় কেউ পড়ে থাকলে তার লাশতো পুলিশই হাসপাতালে নিয়ে যাবে। এটা পুলিশের দায়িত্ব। তো এটা কি কোনো খবর লেখার স্টাইল হলো? রিপোর্ট যদি আরো তথ্যবহুল না হয় তাহলে লিখে কি লাভ? এজন্যই মনসুর খবর কাগজ পড়ে না। ওর বউ জেসমিন পড়ে। জেসমিন যদি তেমন কোনো বিশেষ নিউজ পায় তাহলে সেটুকু মনসুরকে পড়ে শোনায়। মনসুরের কথা ভাবতে ভাবতে নসিব রাগ করে কাগজটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে মারে।

এই খবরে জানানো উচিত ছিলো বৃদ্ধের পরণে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি ছিলো কি না, গলায় মাফলার। হাতে বারোটি আঙুল ছিলো কি না, ঘাড়ের ডানদিকে একটা জড়ুল, মাথার সব চুল সাদা, একদম শরতের কাশফুলের মতো। খবরে যদি পুরোটা চিত্র পাওয়া না যায়তো লাভ কি? সব শালা টেবিলে বসে খবর লেখে। কাগজটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রদীপ্তর কথা মনে পড়ে। ছেলেটি সাংবাদিক হতে চায়। ও নিজের জন্য একটি লক্ষ্য ঠিক করেছে। বলে, ও কখনো টেবিলে বসে খবর লিখবে না। ও খবরের প্রতি সৎ থাকবে। সৎ থাকা? দৃষ্টি কুঁচকে আসে নসিবের– নিজে নিজেই বলে, সৎ থাকা খুব কঠিন রে প্রদীপ্ত।

জোর বাতাস দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, পুরনো দরজাটা নড়ছে, হয়তো ভেঙে যেতে পারে। ও দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। মুহূর্তে ওর মনে হয়, খবর কাগজে দেয়া দুর্ঘটনার খবরের ঐ বৃদ্ধ লোকটি আমার বাবা, তা আমি ভাবছি কেন? এইসব কাঁচা আবেগ প্রশ্রয় দেয়ার কোনো মানে হয় না। দরজার ফাঁকফোঁকর দিয়ে কনকনে বাতাস ওর পিঠ ফুঁড়ছে, পারলে মাংস ভেদ করে সেঁধিয়ে যেতে চায়, ওর শীত করে, হাঁটু কাঁপে। ওর মনে হয় এই ঘোর বর্ষায় ওর হাঁটু কাঁপা উচিত নয়। ও রান্নাঘরে এসে চুলো জ্বেলে হাত সেঁকে নেয়, তবু শরীর গরম হতে চায় না। মানুষের জীবনে কখনো শীতল অবস্থা আসে, ও ভাবলো, সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ হিমযুগ পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু ব্যক্তির জীবনে সে যুগ কখনো অনতিক্রম্য নয়। লে বাবা, আমি দেখছি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছি। ঐ কচু হওয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। ও চুলোয় এক হাঁড়ি পানি বসিয়ে দেয়। তারপর খানিকটা চাল-ডাল ধুয়ে ছেড়ে দেয়। অন্য চুলোয় ডিম আর আলু সেদ্ধ বসায়। বাপ উধাও হওয়ার পর থেকে ওর আর সকালে পাউরুটি দুধ খাওয়া হয়নি, ওটি ছিলো রোজকার বরাদ্দ। দুপুরে মাছের দোপেঁয়াজা কিংবা মাংসের ভুনাও হয়নি। তিনদিন ধরে ও কেবল ডালে-চালে সেদ্ধ করে খাচ্ছে। অবশ্য খাওয়ার ব্যাপারে ওর কোনো আয়েশ নেই। যা পায় তাই খায়, ভালো খাবার পেলে খুব যে উৎফুল্ল হয়, তাও নয়। ও ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে শুনতে পায় বাবার কণ্ঠ, 'তোর কোনো শখ নেই কেন বল তো?' পেঁয়াজের ঝাঁঝে ওর চোখ জ্বালা করে। ও হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছতে মুছতে ভাবে, শখ থাকলে মানুষ ক্রীতদাস হয়। যা কিছু বন্ধন তাকে ও ঘৃণা করে। লে বাবা, আমি আবার দার্শনিক হচ্ছি, শালা, আমি চাই না এইসব বিটকেলে শব্দটব্দ আমাকে ঘায়েল করুক। ও খিচুড়ির মধ্যে পেঁয়াজ এবং কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দেয়। তারপর ডিম ভাঙে, একটাই ডিম ছিলো। এই দিয়ে ওকে রাতেও চালাতে হবে।

দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি ছেড়ে যায়। দ্রুত মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ওঠে। ও খিচুড়ি খেয়ে ঘুমিয়েছিলো। ঘুম ভাঙলো দরজায় টুকটুক্ শব্দে। শব্দটা পরিচিত, নিশ্চয় নিশাত এসেছে। নিশাতকে ওর খুব কাছ থেকে জানা হয়েছে। ওর সব ভঙ্গিগুলো চেনা। এটুকুই কি একজন মানুষকে বোঝার জন্য যথেষ্ট? নাকি আরো কিছু বাকি থাকে? নিশাত আবার

BanglaBook.org

শব্দ করে। এবার আর একটু আস্তে, ওর ভঙ্গিটাই এমন! হই চই করে মাতিয়ে তোলা স্বভাব নয়। তখন নসিবের মনে হয় আসলে নিশাতকে ওর জানা হয়েছে, কিন্তু বোঝা হয়নি, যেভাবে বুঝলে পরস্পরের দূরত্ব থাকে না। আসলে নিশাতের সঙ্গে ওর এখনো অনেক দূরত্ব! ইচ্ছে করলেই কাছে পৌঁছানো যায় না।

দরজা খুলতেই নিশাত চুপিচুপি বলে, তোমার বাবা আছে?

ভেতরে এসো।

ঘরে তোমার বাবা থাকলে তুমি বেরিয়ে এসো। চলো কোথাও বেড়াতে যাবো। রিকশা ছাড়িনি।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে এসো।

তাও বলবে না যে বাবা বাসায় নেই।

নিশাত ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়, তারপর রিকশা বিদায় করতে যায়। নসিব দরজা ছেড়ে বারান্দায় আসে, নিশাতকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে, হয়তো বৃষ্টির কারণে– হয়তো বৃষ্টি ওর লাবণ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সাদার ওপরে লাল ছাপা শাড়ি পরেছে, সঙ্গে লাল ব্লাউজ, কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। অন্য মেয়েদের মতো ও কাজলের টিপ পরে না, সিঁদুরের টক্‌টকে রঙ ওর খুব পছন্দ। নিশাত উজ্জ্বল শ্যামলা, ছিপছিপে ফিগার– হালকা করে সাজে। সব মিলিয়ে চমৎকার। গেটের কাছে ঘাসগুলোতে এখনো বৃষ্টির পানি। নিশাতের স্যাণ্ডেল ভিজে গেছে। ওর নেলপলিশ লাগানো বুড়ো আঙুলের নখে পানির ছোঁয়া। ওকে আজকে বৃষ্টির পটভূমিতে চিত্রিত করতে ভালোই লাগে নসিব হাফিজুদ্দিনের। ওর ইচ্ছে হয় নিশাতের চুলের ডগায় দু'এক ফোঁটা পানি জমে থাকুক। তার বদলে নিশাতের চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। খোঁপায় এক থোকা বেলি গোঁজা, মৃদু গন্ধ আসছে। রিকশার ভাড়া চুকিয়ে নিশাত বারান্দায় উঠে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু উঁচিয়ে বলে, কি দেখছো অমন করে?

শুধু তোমাকে, তোমার সবটুকু।

হয়েছে থাক। আজ কি? কবিতা না নাটক?

আজ কবিতা। তোমাকে নিয়ে পুশকিনের দেশে যাবো।

দু'জনে ঘরে ঢোকে। নিশাত ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, উঁহু তোমার ঐ পুশকিনের দেশে যেতে আমি রাজি নই।

কেন?

ওটা তোমার একলার জগৎ। তোমার এইসব মানসিক ভ্রমণে সঙ্গী না থাকাই ভালো। তাহলে একা হওয়ার যন্ত্রণা গভীর হয়। গভীর হলে মগজ খোলাসা হয়, লেখা বের হয়। আহ্ নিশাত, তুমি একটা দারুণ মেয়ে। আমাকে এমন চমৎকার বোঝ।

নিশাত খিলখিলিয়ে হাসে। চেয়ার টেনে বসে।

বাবা কোথায়?

দু'দিন ধরে খোঁজ নেই।

খোঁজনি?

না। জানোই তো বাবা পছন্দ করে না।

রাবিশ। তুমি যে কি?

ক'দিন ধরে যা বৃষ্টি–

বাজে কথা বলবে না। আর কিছু না হোক, চুপচাপ হাসপাতালগুলোতে খুঁজে আসতে পারো। বাবাও জানলো না, তুমি নিজেও একটা সান্ত্বনা পেলে।

সান্ত্বনার নিকুচি। ওটা আমি চাই না।

BanglaBook.org

কচু। তোমার মতো ছেলে দেখিনি।

দেখোনি ভালো। এখন দেখে নাও।

চলো, হাসপাতালে যাই।

আমি একাই যাবো।

আমিও যাবো।

না।

কেন?

কারণ তিনদিন পর হাসপাতালে খুঁজতে হলে মর্গে দেখতে হবে। আমি তোমাকে নিয়ে মর্গে যেতে চাই না।

ঠিক আছে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো। তবু চলো।

তাড়াহুড়ো কোরো না। তাড়াহুড়ো আমার ভালোলাগে না। আমি কাল সকালে যাবো। আজ বিকালটা শুধু তোমার আর আমার। তোমার খোঁপার বেলি ফুলের গন্ধ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। এ সুরভি ছেড়ে কেন আমি মর্গের পচা গন্ধে শ্বাস নিতে যাবো?

আসলেই তুমি একটা–

কি বলে ফেলো–

পুশকিন।

নসিব হাফিজুদ্দিন হা-হা করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, জানি তুমি খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারো না।

কারণ, আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি।

আর আমি?

তুমি আমার চাইতে কম।

ইস যদি দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখা যেত!

নিশাত হাসতে হাসতে রান্নাঘরে যায়। চায়ের কেটলিতে করে চুলোয় পানি বসায়। এই রান্নাঘরের সবকিছু ওর জানা। চিনি, চায়ের পাতা খুঁজতে হয় না। মাঝে মাঝে এলোমেলো ঘরটাকে ওর নিজেরই গুছিয়ে রাখতে হয়। ও টিনগুলো থেকে কিছু পাপর বের করে ভাজতে শুরু করে। তখন ভিজে যাওয়া খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায় নসিব। নিশাত হাসপাতালের কথা বলার পর ঐ এ্যাকসিডেন্টের সংবাদটি ওর মাথা জাম করে রেখেছে। বারবার খবরটি পড়ে। এখন নিশাতকে খবরটি শোনানোর জন্য চাঞ্চল্য বোধ করে।

তুমি আবার এখানে এলে কেন? তোমার ঘরে বোসো, আমি চা আর পাপর নিয়ে আসছি।

উঁহু চা নয়। আমার মগজটা চা হয়ে গেছে নিশাত। একটি এ্যাকসিডেন্টের খবর তোমাকে শোনাতে এসেছি।

কী যে ছেলেমানুষি না। তুমি জানো তোমার এমন আচরণে আমার স্নায়ুর ওপর প্রেসার হয়। আমি রেগে যাই।

খবরটা পড়বো কি পড়বো না তাই বলো?

ঠিক আছে পড়ো।

নিশাত তেলের কড়াই চুলো থেকে নামিয়ে রাখে। তেলটা ফুটছে, কিন্তু পাপর দেয়া হয়নি। নসিব পড়তে শুরু করে : 'গতকাল বুধবার সকাল আটটায় কাজীপাড়ার কাছে একটি বাস (ঢাকা-চ-৫১১৬) ষাট বছরের এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই

BanglaBook.org

মারা যায়। চালক গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

পড়া শেষ হলে নসিব নিশাতের মুখের দিকে তাকায়। ওর ভয় করে, বুক শুকিয়ে যায়। তবু জোর দিয়ে বলে, জানি তুমি বলবে বাবা এ পথেই মর্নিং ওয়াক করে, ফিরতে ফিরতে সকাল আটটা হয়ে যায়। এই তো?

নিশাত নসিবের কথার জবাব না দিয়ে তেলের কড়াইটা আবার চুলোর ওপর বসায়। প্লেট থেকে পাপরের টুকরো নিয়ে তেলে ছাড়ে। মুচমুচে হয়ে গেলে অন্য আর একটি প্লেটে ওঠায়।

নসিব আবেগ ভরে ডাকে, নিশাত?

নিশাত দু'চোখ মেলে ওর দিকে তাকায়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, খবরটা পড়ে তুমি খুব ভাবনায় পড়েছো, না?

হ্যাঁ, তাই। ভাবনার বিষয় নয় কি?

এর কোনো জবাব নেই। আসলে তুমি একটা–

শেক্সপিয়র।

হা-হা করে হেসে ওঠে নসিব।

নিশাত বলে, যাক বাঁচালে। ভেবেছিলাম কাঁদতে বসবে। কেউ যে একটা উটকো খবর পড়ে নিজের বাবার ওপর চালিয়ে দিতে পারে–

তা, এই প্রথম দেখলে, এই তো। তুমিই তো বললে হাসপাতালে খুঁজে দেখা উচিত ছিলো। তাই তো আমি ভাবলাম– যাকগে আপাতত পাপর ভাজা আর চা খেয়ে নিই।

নসিব কাগজ হাতে চলে যায়। নিশাত বিব্রতবোধ করে। খবরটা সত্যিও তো হতে পারে, অমূলকই বা ভাবছি কেন? হঠাৎ ভয়ে ওর হাত থেকে খুন্তি পড়ে যায়। কেটলিতে পানি ফুটছে। ঢাকনায় একটা শব্দ হয়। নিশাত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে এই শব্দে বাষ্পইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এখন এই শব্দ বাষ্প হয়ে ছুটে আসছে। ওহ্, ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। একটুপর আত্মস্থ হয়ে কোনোরকমে চা বানিয়ে নসিবের ঘরে আসে। ও বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে কাগজের উপর আঁকিবুঁকি কাটছে। মানুষের চেহারা থেঁতলে গেলে কেমন হয়? রক্ত মাখানো কাটা মাংসের মতো? নাকি একদম সমতল হয়ে যায়, বোঝা যায় কি? নাক, চোখ কিংবা ঠোঁট বা কপাল? মাথায় সাদা টুপি থাকলে সেটা কোথায় ছিটকে পড়ে যায়? বোগাস– এসব ভাবার কোনো মানে হয় না। নসিব বিছানায় উঠে বসে। নিশাত পাপরের প্লেট বিছানার ওপর রাখে। নিজের ভেতরের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। আচমকা নসিবের গায়ে বড় রকমের ধাক্কা দিয়ে জোরে হাসতে হাসতে বলে, নাও, চটপট খেতে থাকো।

নসিব নিশাতের বাড়িয়ে রাখা প্লেট থেকে পাপর নিতে হাত বাড়ায় না। উল্টো ওর চোখে চোখ রেখে বলে, তোমাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না নিশাত। তুমি তো জানো আমি তোমাকে সহজেই বুঝতে পারি।

নিশাত গম্ভীর হয়ে যায়। কথা না বলে দাঁতের নিচে পাপর ভাঙে। কপাল কুঁচকে থাকে, যেন দু'ভুরুর মাঝে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করে রেখেছে ও। নসিব নিশাতের এ ভঙ্গিকে একদমই খেয়াল না করে বলে, জানো নিশাত, তুমি না বললে আমি কিছুতেই বাবাকে খুঁজতে হাসপাতাল যেতাম না।

তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথা বলছো কেন? হাসপাতাল মানেই তো মৃত্যু নয়,

BanglaBook.org

আহত হয়েও থাকতে পারেন। আমাদের ফ্যামিলিতে এমন তিনটি উদাহরণ আছে যাদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাওয়া গেছে। তাই আমি হাসপাতালের কথা বলেছি।

নসিব পাপরে কামড় দিয়ে মনোযোগ দিয়ে নিশাতের কথা শোনে। তারপর বলে, কাল সকালে যদি হাসপাতালে গিয়ে দেখি মর্গে বাবার লাশ ফুলে পচে আছে?

নিশাত তীব্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ায়।

আমি যাচ্ছি। তোমার এই প্যানপেনি অসহ্য।

নসিব লাফিয়ে খাট থেকে নেমে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বলে, আসলে হাসপাতাল নয়, আমি ভাবছি আমার জীবন থেকে বাবা এমন নিঃশব্দে হারিয়ে গেলে কেমন হয়? কাঁদবো না, কেবল খুঁজে যাবো বাবাকে। একটু অন্যরকম নয় কি?

নিশাত কথা বলে না। নসিব ওকে টেনে এনে খাটে বসে। ও নিশাতের মুখে পাপর তুলে দেয়। নিশাত হাত দিয়ে ধরে না। কামড় দিয়ে খানিকটুকু মুখে নিয়ে নেয়। নসিব ওর ঘাড়ে হাত রাখে। যে হাত ঘাড়ে রেখেছে সে হাতে চায়ের কাপ। বলে, খুঁজে ফেরার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে নিশাত। আমি এমন একজন মানুষকে নায়ক করেছি আমার নাটকে যে অনবরত নিজেকে খুঁজবে। কখনো নিজেকে খুঁজে পাবে শেক্সপিয়রের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড আভনে কিংবা লেনিনগ্রাদ থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে পুশকিনের গ্রামে অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিদারাবাদ গ্রামে অথবা তেঁতুলিয়া কিংবা টেকনাফে। নায়কের এই মানসিক ভ্রমণ কিন্তু একজন ব্যক্তির সংকট। কারণ আমার নায়ক একজনের মধ্যে তিন সত্তার অধিকারী। যখন সে কবি তখন নিজেকে দেখে একভাবে, যখন গল্পকার তখন সে অন্য মানুষ হয়, যখন সে নাট্যকার তার ভেতর জেগে ওঠে ভিন্ন মানুষের ছায়া। যখন সে এই তিনজনের সমন্বয়ে এক হয় তখন এক অসাধারণ স্রষ্টা। সে মনে করে স্রষ্টার কোনো আলাদা বিশ্ব নেই। তার সামনে লেলিনগ্রাদ এবং নিদারাবাদ গ্রাম এক হয়ে যায়।

নিশাত আগ্রহ নিয়ে নসিবের কথা শুনছিলো। বলে ওঠে, চমৎকার। আমি তো দেখতে পাচ্ছি এই নায়কের ভেতর তুমি নিজেকে ভাঙচুর করছো। তাই না?

নসিব লম্বা টানে চা শেষ করে বলে, হয়তো তাই। একমাত্র লেখকই পারে নিজেকে বদলে বদলে নতুন মানুষ বানাতে। নিজেকে নিয়ে মজা করতে– নিজেকে হাসিয়ে-কাঁদিয়ে অন্যের চোখে এক বিস্ময়কর মানুষ করে তুলতে।

নিশাত নসিবের উরুর ওপর হাত রাখে। বলে, আচ্ছা তুমি যে তিনটি ছদ্মনামে লেখো তোমার খারাপ লাগে না? মনে হয় না কি তুমি নিজেকে টুকরো করছো?

না, তা নয়। আমার মনে হয়, আমি নিজের বিস্তার ঘটাচ্ছি। যখন নাট্যকার হিসেবে আমার নাম অমিতাভ গফুর ছাপা হয় আমি বিস্ময়ে সে শব্দ দু'টোর দিকে তাকিয়ে থাকি। বুক ভরে যায় আনন্দে। নিজের সম্প্রসারণ দেখতে কার না ভালোলাগে বলো?

ঠিক। নিশাত মাথা নেড়ে সায় দেয়। এজন্য তোমাকে আমি এত ভালোবাসি।

তবু, চাও না যে, আমরা দ্রুত বিয়েটা সেরে ফেলি।

ধুত্ এক রকম কথা বোল না তো। তোমার মুখে একঘেয়ে কথা মানায় না।

তবে কি তুমি ধরে নিয়েছো যে, লেখালেখিটাই আমার জীবনের শেষ কথা।

অবশ্যই শেষ কথা। তবে এর পাশাপাশি অন্য কিছু থাকতে পারে।

কেমন?

যেমন প্রেম, বিয়ে, এ্যাকসিডেন্ট, নিখোঁজ হওয়া, এইসব আর কি।

বুঝেছি, বুঝেছি। তুমি খুব গভীরভাবেই আমাকে আত্মস্থ করেছো। আমার আর

BanglaBook.org

পালাবার কোনো উপায় নেই।

নিশাত মুখ টিপে হাসে। খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে। নসিব ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। নিশাত ওর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে, শুয়ে পড়লে যে? বেরুবে না?

উঁহু, ইচ্ছে নেই। আজ আর বাইরের দখিনা বাতাস নয়, আজ শুধু নিরিবিলি গৃহকোণ।

তবে তাই হোক।

নিশাত ওর ঠোঁটজোড়া নসিবের কপালের ওপর নামিয়ে আনে। কপালটা আভন নদী। নিদারাবাদের খালে এসে মিশে গেছে। কালো জলের দু'ধারে বিশাল প্রাসাদ, ধানক্ষেত, টিউলিপ ফুলের বাগান এবং অসংখ্য পর্যটক, যারা দু'চোখ মেলে দেখে নিদারাবাদের বিরজার টুকরো টুকরো শরীর কিংবা গির্জার ভেতরে শুয়ে থাকা শেক্সপিয়রকে। কপালের পাশ ঘেঁষে ঘন চুলের গুচ্ছ পুশকিন গ্রাম থেকে বাল্টিক সাগরের তীর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা ঘন বৃক্ষরাজি। ভুরু জোড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামান, চিহ্ন রেখেছে ধ্বংসের– কিন্তু এখন আশ্চর্য নিশ্চুপ, একজোড়া মানব-মানবীকে ডেকে এনেছে নিজের কাছে। বলছে, তাকিয়ে দেখো পাতা-ঝরা গাছের সবুজ কিশলয়ের দিকে, কী সুন্দর দলবেঁধে ফুটেছে, এখনইতো বসন্ত। বিতাড়িত হয়েছে নাৎসী বাহিনী, তোমরা নির্ভয়ে ভালোবাসো নিজেদের। নিশাতের ঠোঁট কপালে নেমে এলো। নসিব দু'হাতে নিশাতের মাথা চেপে ধরে। কিছুতেই যেন ঠোঁটজোড়া উঠে না যায় উঁচুতে– অনেক দূরে, যেন স্পর্শ দিয়ে রাখে অনন্তকাল, যেন পেরিয়ে যায় চারশ বছর, হ্যামলেট কিংবা ওথেলো হয়ে বেঁচে থাকে আভন নদী থেকে নিদারাবাদের বিল পর্যন্ত। বাইরে বিকেল ফুরোয়, আঁধার নামে। সব পাখি ঘরে ফেরে।

রাতে লিখতে বসে নসিব। এখন ও একজন মানুষ তৈরি করছে। উত্তেজনা ওকে চেপে ধরলে ও নসিব হাফিজুদ্দিনের খোলস থেকে বেরিয়ে অমিতাভ গফুর হয়। তখন ও ঘুরতে যায় আভন নদীর ধারে শেক্সপিয়রের শহরে, যে নদীর উপর একটি সরু সেতু আছে। চারশ' বছর আগের লোহার তৈরি সেতু– দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে। অমিতাভ গফুর সে সেতুর ওপর এসে দাঁড়ায়। ওর চোখে এখন স্বপ্ন। ও নাটকের প্রবাদ পুরুষ শেক্সপিয়রের জন্মস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে– চারদিকে পপি এবং টিউলিপের সমারোহ। ওর আকাঙ্ক্ষা, এই একটি জায়গা থেকে ও যদি কোনো অনুপ্রেরণা পায়, যদি একটি ভালো নাটক লিখতে পারে। উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে দিন, কোনো কুয়াশা নেই, আকাশে হালকা মেঘও নয়। আকাশে পাখি, ম্যাগ্নোলিয়া, লাইলাক, চেরি ফুটে আছে, আরো কত ফুল যার নাম ও জানে না, তার ওপর সবুজ স্নিগ্ধ ঘাস দৃষ্টি জুড়িয়ে দেয়। অমিতাভ গফুর ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সেই বাড়িটির দিকে, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন। কাঠের বাড়ি কী চমৎকার, ঘুরে ঘুরে উঠে যায় সিঁড়ি। ওর মনে পড়ে সেদিনের কথা যখন লন্ডনের অকলন মাঠে নিলামে উঠেছিলো এই বাড়িটি। পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিলো দেয়াল। লেখা হয়েছিলো : একটি গৌরবোজ্জ্বল কালের মর্মস্পর্শী স্মৃতিচিহ্ন– শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্মৃতিসৌধ। সেদিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। অনাদিকালের মানুষের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার তাগিদে এই অমর নাট্যকারের বাড়িটি কেনা হয়েছিলো। অমিতাভ গফুর বাড়িটির দেয়ালে হাত দিয়ে অভিভূত হয়। গার্ডেন বন থেকে কাঠ এনে এবং উইলমকট গ্রাম থেকে পাথর এনে তৈরি করা হয়েছিলো বাড়িটি। এই গ্রামটিতেই হেসেখেলে বড় হয়েছিলো শেক্সপিয়রের মা।

একটি একটি সিঁড়ি ভেঙে ওঠে অমিতাভ গফুর। ভাবে, ইতিহাস কত ধূসর এবং নীল। যে ঘরে সেই অবিস্মরণীয় শিশুটির জন্ম হয়েছিলো তার মেঝেটি কাঠের, নিচু ছাদ, লম্বায় ছোটখাটো, কারুকাজখচিত চেস্ট, দেয়ালে সুঁচের কাজ-করা চিত্র। অমিতাভ প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে দেখে, তবু মনে হয় এই তো সেদিন, এখনো কত জীবন্ত তিনি, সপ্রতিভ হয়ে

BanglaBook.org

সবার হৃদয়ে উপস্থিত। শেক্সপিয়রের শহরটি অমিতাভের মগজে আঁকাবাঁকা রেখা। সেই ঘরের জানালার শার্সিতে বিখ্যাত লোকদের স্বাক্ষর। আঁকাবাঁকা রেখাগুলো কাঁচের ওপর চিত্রিত হয়ে আছে। কোনো কোনো নাম পড়া যায়, কোনোটি যায় না, অস্পষ্ট। স্কট, কারলাইল এবং আরভিংয়ের স্বাক্ষর দেখে অমিতাভ বড় করে শ্বাস নেয়।

এই শ্বাস এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সঞ্চারিত হয় কিংবা এই শ্বাস একজন লেখকের দীর্ঘশ্বাস, বড় কিছু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যার মধ্যে প্রবল।

অমিতাভ হাঁটতে হাঁটতে পাশের ঘরে আসে। কতকিছু এখানে সাজানো, ছোট্ট একটি স্মৃতির ঘর। আছে পোর্ট্রেট, কবির প্রশংসাপত্র, প্রথম প্রকাশিত নাটকের প্রথম ফোলিও এবং অন্যান্য কাগজপত্র। গ্রামের স্কুলে যে ডেস্কে বসে তিনি পড়তেন, সেই ডেস্কটির সামনে দাঁড়ায় অমিতাভ। এটি শেক্সপিয়রের ডেস্ক নামে খ্যাত। অমিতাভ ছুঁয়ে দেখে। কি কাঠ এটা? ওক নাকি অন্য কিছু। কত পুরনো, চারশ' বছরের বেশি হয়ে গেছে কি? কত? হ্যাঁ চারশ' পঁচিশ বছর। ও এখন বিংশ শতাব্দীর মানুষ, বারবার ফিরে যায় পেছনে। খুঁজে ফিরে চার শতাব্দী বিস্তৃত সময়কে। কী কঠিন এই পেরিয়ে আসা এবং পেরিয়ে যাওয়া– বিপজ্জনক দড়ির ওপর চলাফেরা। মাথার এক হাত উঁচুতে কাঠের সিলিং। ঘোরানো কাঠের সিঁড়িগুলো অপ্রশস্ত, অন্ধকার। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলে রান্নাঘর। পাথর বসানো মেঝে, বিশাল চুলো, ওপরে বড় চিমনি, পেতলের শিকলে ঝুলানো হাঁড়ি এবং অন্যান্য বাসনকোসন। মাংস রান্নার প্যান এবং রোস্ট করার পাত্রটি দেখে বোঝা যায় কেমন সময় পেরিয়ে এসেছে একজন প্রতিভাধর মানুষ। অমিতাভ বেবি-মেন্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ও নিজের ভেতরে চাঞ্চল্য অনুভব করে। ছেলেমেয়েরা যেন চুলো কিংবা ফায়ার প্লেসে গিয়ে আগুনে পুড়ে না যায় সে জন্য এই মেন্ডার। লম্বা কাঠের স্ট্যান্ড, আড়াআড়ি একটি কাঠ লাগানো, সে কাঠের সঙ্গে আছে আংটা। এই আংটায় ছেলেমেয়েদের বেঁধে রাখা হয়। মা যখন রান্নায় ব্যস্ত থাকে তখন শিশুরা এখান থেকে নড়তে পারে না। শেক্সপিয়র কি বাঁধন খুলে ফেলার জন্য চিৎকার করতেন? নাকি চুপচাপ শান্ত শিশু ছিলেন? তেমন সুবোধ বালক, যাদের জন্য মায়েদের কোনো চিন্তা থাকে না। অমিতাভ মনে মনে হাসে। এখন প্রশ্নের উত্তর ওকে কে দেবে? সুতরাং ওর যেমন পছন্দ ও তেমন কিছু ভেবে নিতে পারে। একজন স্বপ্নের মানুষকে তো স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই দেখতে হয়। ফলে নিজের মনের মতো একটা মূর্তি গড়তে গড়তে ও বাগানে আসে।

এলোমেলো ঘাসের ঝোপে ফুটে আছে অজস্র ড্যাফোডিল, লিলি, ডেইজি, গোলাপ। উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতি। সরু ইট বাঁধানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় আঙুর লতা, তুঁত এবং ডুমুর গাছ। এইসব পেরিয়ে ও এ্যানি হ্যাথাওয়ের বাড়িতে এলে দেখে শেক্সপিয়রের যৌবনের ভালোবাসার দিনগুলো। অপূর্ব এক বাগান এবং অসাধারণ সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শনের এই বাড়িতে যুবতী এ্যানির হাত ধরে প্রেমের বাণী উচ্চারণ করে শেক্সপিয়র। অমিতাভের মনে হয় ও দেখতে পাচ্ছে সেই দৃশ্য। লাল লিলির মতো আভা এ্যানির কপোলে, দৃষ্টিতে প্রজাপতির পাখার বর্ণচ্ছটা, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায় চেহারা এবং দৃষ্টির রঙ। এ্যানি কি জানতো যে যুবককে ও ভালোবাসছে সে এক অলৌকিক মানুষ, সে মানুষের হৃদয়ে আছে রঙধনুর বর্ণচ্ছটা এবং আরডেনের বনের ঘন-সবুজ পত্রালির ঔজ্জ্বল্য। সেইসব রঙে কলম ডুবিয়ে সে রচনা করবে এমন নাটক, পৃথিবীর শত কোটি মানুষের সঙ্গে যার উত্তরাধিকার হবে অমিতাভ নিজেও।

ও নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ায় বাগানের চত্বরে। স্ট্রার্টফোর্ড-আভন থেকে পশ্চিমে এ্যানির গ্রাম শটারি, দূরত্ব এক মাইলের সামান্য বেশি। একজন প্রেমিকের জন্য এটুকু আর কতটুকুইবা পথ, এক নিশ্বাসে ফুরিয়ে যাবার কথা।

BanglaBook.org

অসাধারণ সুন্দর বাড়িটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ও। চারদিকে ফুলের বাগান, আছে অজস্র রকম লতা, গুল্ম এবং গাছের সারি, পাশে ফলের বাগান ও পেছনে ডেইরি ফার্ম। নিচে বিশাল হলঘর, উপরে ছয়টি শোবার ঘর। চারশ' বছরের পুরনো ঐতিহ্য ধরে রাখা বাড়িটির সব সৌন্দর্য ছাপিয়ে একজোড়া যুবক-যুবতীর প্রেমের দৃশ্য বারবার ভেসে ওঠে অমিতাভের সামনে। ওর শরীরে কাঁপন জাগে, রক্তে দোলা। ও নিজের আবেগ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'আমি একবার যেতে চাই তোমাদের আসরে। জানতে চাই কি ভাষায় কথা বলতে তোমরা? দেখতে চাই তোমাদের কপোলের রঙ।' ভাবতে ভাবতে বিশাল হল ঘরে প্রবেশ করে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে তাকায়। ভাবতে চায় কোথায় এসে দাঁড়াতো প্রেমিক যুবক? দেখামাত্র কি ছুটে আসতো প্রেমিকা? ডান হাত উঠিয়ে নিয়ে কি ছোঁয়াতো ঠোঁটে? ওর চোখ আটকে যায় দরজা-জানালার মাঝখানে স্থাপিত চতুষ্কোণ তক্তায়। সেইসব চিত্রিত তক্তা প্রেমিকের হৃদয়ের মতো। ও ঘুরেফিরে দেখতে দেখতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওপরে ছয়টা শোবার ঘর। দু'একটা ভাঁড়ার হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। ওপর তলার পুরোটা অর্থাৎ গোটা দালান জুড়েই ঘর। আসবাবপত্র, খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। ঘুরেফিরে আচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে আসে অমিতাভ।

ষোড়শ শতাব্দী শেষ হওয়ার তিন বছর আগে শেক্সপিয়র নিজের জন্য বাড়ি কেনেন। তারও পনেরো বছর আগে বিয়ে করেন এ্যানিকে। এ্যানির সঙ্গে বিয়ের দশ বছরের মধ্যে একজন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দী শেষ হওয়ার এক বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্লোব থিয়েটার। ১৬১০ সাল থেকে নিজের বাড়িতে বসবাস শুরু এবং ১৬১৬ সালের তেইশ এপ্রিল মৃত্যুবরণ। ১৬২৩-এ প্রথম পুস্তকাকারে বইয়ের প্রকাশ। এতকিছু ভাবতে ভাবতে অমিতাভ শেক্সপিয়রের নতুন বাড়িতে আসে। পুরনো বাড়ির চাইতে অনেক আধুনিক। এ বাড়ির বড় বৈশিষ্ট্য বাগান। যেন এই ফুলের বিন্যাস একজন মানুষের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করেছে, গৌরবোজ্জ্বল করেছে। গাছগুলো এমনভাবে লাগানো হয়েছে যেন বাগানে ফুলের এমব্রয়ডারি করা হয়েছে। বিশাল বাগান, কাঁটাঝোপগুলো এমন করে কাটা যে প্রতিটির একটি আলাদা ডিজাইন আছে। প্রকৃতির এমন অপরূপ সমাবেশে তিনি তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন। বাগানে নামার পথে দরজার দু'পাশ থেকে ছাদ পর্যন্ত দেয়ালে লেগে আছে আইভি লতা, কেউ বুঝি আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে এই সবুজ পাতাগুলো। অমিতাভ ঘুরে ঘুরে দেখে, বাড়িটি এখন জাদুঘর। এখানে আছে শেক্সপিয়রের সময়ের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। রান্নাঘর এবং তার খুটিনাটি জিনিসপত্র। একটি কালকে এমন করে ধরে রেখেছে যে, যেন সময় এখানে স্থির হয়ে আছে।

জীবনের এইসব চিত্র ধরে মৃত্যুর কাছে এসে দাঁড়ায় অমিতাভ। ও আস্তে আস্তে হলি ট্রিনিটি চার্চে প্রবেশ করে। আভন নদীর ধারে এই চার্চ। গেট দিয়ে ঢোকার পরে মনে হয় কী বিষণ্ন চারদিক। আশেপাশে কবর। লম্বা গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রেখে ছায়া দিচ্ছে কবরে শায়িত লোকগুলোকে। চার্চের ভেতরে নাট্যকারের স্মৃতিচিহ্ন, মৃত্যুর সাত বছরের মধ্যে নির্মিত হয়েছে এই আবক্ষ মূর্তি। চার্চের দেয়ালগুলো যীশুর জীবনের নানা কাহিনী দিয়ে চিত্রিত। আস্তে আস্তে এগোয় অমিতাভ। চারদিক সুনসান। যারা এখানে দর্শনার্থী তারা কেউ কথা বলে না। বেশ ভেতরে সারিবদ্ধ কবর। বোঝাই যায় না যে এটি কবর। মেঝের মতো সমান। চারদিকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। কিছু ফুল দিয়ে গেছে কেউ। পাশে কবি ও নাট্যকারের পরিবারের অন্যদের কবর। অমিতাভ বুঝতে পারে না যে কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। ও কি বর্তমান থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে নাকি এগুচ্ছে? এখন কোন শতাব্দীতে ওর অবস্থান? ও ওর নিজের নাটকের

BanglaBook.org

একটি মানুষ তৈরি করার জন্য কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় কাটালো। সে মানুষটিকে কি ও চিনতে পারলো? পারলো কি ওকে খুঁটিয়ে আঁকতে? কেমন করে তৈরি করবো? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলো আমাকে? এখন আমি তোমার ভেতরে প্রবেশ করছি। আমার মা রান্নাঘরে আমাকে লোহার আংটায় বেঁধে রেখেছে। সামনেই চুলোয় আগুন। মায়ের ভয় যদি আমি খেলনা ভেবে আগুনের শিখা ছুঁয়ে ফেলি? মা তো জানে না, জানবেও না যে আমি আগুন ছুঁতেই চাই। আগুন নিয়েই খেলবো।

কারা আমার জানালার কাঁচে লিখে যায় নিজেদের নাম। কাকে আমি তুলে নেবো আমার লেখায়? স্কট, কারলাইল নাকি আরভিং? কত বিচিত্র স্বাক্ষরে ভরে আছে আমার জানালার শার্সি, আমি সব মানুষকে চাই, সবাই প্রিয়। আমি প্রত্যেকের শরীর থেকে একটি করে টুকরো তুলে নিয়ে আমার নায়কের শরীরে গাঁথুনি দেবো। এখন আমি এই শতাব্দীর শেক্সপিয়র। হলি ট্রিনিটি চার্চ থেকে আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

থানার ফাঁড়িতে রাত তিনটের ঘণ্টা পেটায়। সেই শব্দে ঘাড় ওঠায় অমিতাভ। কত বিচিত্র জায়গা ঘুরে এসে ও এখন নিজের ভেতরে স্থির হয়েছে। ঘরের মেঝেতে কাগজের স্তূপ। ও লিখেছে আর ছিঁড়েছে। নায়কের বেড়ে ওঠা কিছুতেই মনমতো হচ্ছে না। এখন ওর আর চিন্তা নেই। শেক্সপিয়রের আদল থেকে নতুন নির্মাণে ভরে যাচ্ছে ওর কাগজের পৃষ্ঠা। কাগজের ওপর খস্‌খস্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। নসিব হাফিজুদ্দিন অমিতাভ গফুর হয়ে কাজ করে যায়। রাতের কথা মনে থাকে না।

একটানা লিখে যখন শেষ করে তখন বাইরে আলো ফুটেছে, শুধু তাই নয়, রোদও উঠেছে। ওর মাথাটা হালকাই লাগছে, রাত-জাগার ক্লান্তি বা জড়তা নেই। ও আড়িমুড়ি ভেঙে উঠে দাঁড়ায়। কোন সন্ধ্যায় নিশাত চলে গেছে। মনে পড়ে রাত দশটার পর ও সামান্য কিছু খেয়েছিলো, ঘণ্টাখানেক গান শুনেছিলো। উঠোনে খানিকক্ষণ পায়চারি করে লিখতে বসেছিলো। গিয়েছিলো স্বপ্নের দেশে, এক অদৃশ্য প্রেরণাদায়িনীর কাছে। নিশাতের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। নবীজ হাফিজুদ্দিনের কথা মনে পড়ে। আজ ও হাসপাতালে ওর বাবাকে খুঁজতে যাবে। বাবার কথামতো আধুনিক মানুষ না হয়ে এই খুঁজতে যাওয়ার জন্য ওর কোনো গ্লানি নেই। নিজে নিজেই ঠিক করে নিয়েছে যে সবকিছুর একটা সময়সীমা থাকা উচিত। সেই সীমা অতিক্রম করে গেলে হারিয়ে যেতে পারে এমন কিছু, যে ক্ষতি অপূরণীয়।

ও বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুয়ে নেয়। রান্নাঘরে এসে কেটলিতে করে চুলোয় চায়ের পানি বসায়, কৌটো থেকে মুড়ি বের করে। দরজার নিচ দিয়ে হকার কাগজ দিয়ে গেছে। ও চা খেতে খেতে খবরের কাগজ খোলে। টঙ্গীর কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার ছবিসহ দীর্ঘ খবর। দু'টি যাত্রীবাহী ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ– অসংখ্য লাশ, অসংখ্য আহত মানুষ। ট্রেনের ছাদে বসেছিলো এমন একটি মানুষ উড়ে গিয়ে বেল গাছে আটকে পড়েছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে নসিব। এও কি সম্ভব? দু'চুমুক চা খাওয়ার পর ও আর খেতে পারে না। ও বাথরুমে গিয়ে বমি করে। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে পকেটে চাবি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গেটের সামনে প্রতিবেশী মান্নান সাহেবের সঙ্গে দেখা।

এই যে বাবা নসিব, কাল সারা রাত দেখলাম তোমার ঘরে বাতি জ্বলেছে, ঘুমোওনি বুঝি? নসিব বিরক্তির স্বরে বলে, আপনিও দেখছি ঘুমুননি।

না, আমি ঘুমুইনি তা নয়। তবে রাত্রে আমার বারবার ঘুম ভেঙে যায়। যাকগে, তিনদিন ধরে তোমার বাবাকে দেখছি না?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমিও দেখছি না?

সেকি? মানুষটা কোথায় গেলো–

বাবার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক, এটা বাবা নিজেও পছন্দ করতেন না।

ও।

মান্নান সাহেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চলে যায়। নসিব একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। রোদ ঝলমলে প্রসন্ন সকাল। ওর ভালোই লাগে। খানিকটা যেতেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রদীপ্ত ওর রিকশা থামায়, নসিব ভাই–

নসিব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, না বাবার কোনো খোঁজ পাইনি। খুঁজতে যাবো। তোমার ক্লাস আছে?

আছে, বারোটার দিকে।

এসো রিকশায়। তোমাকে নিয়েই বাবাকে খুঁজতে যাবো।

প্রদীপ্ত লাফিয়ে রিকশায় ওঠে, ও যেন এই বলাটুকুর অপেক্ষায় ছিলো। পথে দু'জনের কোনো কথা হয় না। রিকশা মেডিক্যাল কলেজের গেটে এসে থামে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঘণ্টা তিনেক পরে নবীজ হাফিজুদ্দিনকে মর্গ থেকে শনাক্ত করে নসিব। লাশে পচন ধরেছে, দুর্গন্ধ আসছে। গালের ওপর বড় জড়ুল এবং দু'হাতে বারোটা আঙুল দেখে ও প্রথম চিনতে পারে। ডান এবং বাম হাতের কড়ে আঙুলের পাশ দিয়ে ছোট ছোট দু'টো আঙুল ছিলো। নবীজ হাফিজুদ্দিন ছেলেকে অনেকদিনই বলেছে, ছেলেবেলায় ওই আঙুল দেখে ওর ভয় লাগতো, বড় হওয়ার পর ভালো লাগতো। ওই আঙুলের জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো। বলতো, বিধাতা সবাইকে দশটা দেয়, আমাকে দিয়েছে বারোটা। সুতরাং ওই বাড়তি পাওনাটুকু সৌভাগ্য তো বটেই!

পচা গন্ধে নসিবের গা গুলিয়ে উঠলে ও দৌড়ে বাইরে আসে। খোলা হাওয়ায় বড় করে শ্বাস নেয়। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। এক ঝলক পচা গন্ধ ঠিকই ওর ফুসফুসে ঢুকে যায়। মর্গের খোলা দরজা দিয়ে গন্ধ আসছে।

প্রদীপ্ত দূরে দাঁড়িয়েছিলো। নসিবকে দেখে দ্রুত কাছে এসে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, পেয়েছেন? কি দেখলেন?

নসিব ঠাণ্ডা গলায় বলে, পেয়েছি। মুখ চেনা যায় না। অন্য লক্ষণ মিলিয়ে শনাক্ত করতে হয়েছে।

প্রদীপ্তর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুলে নসিব দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়, খবরদার, কোনো সান্ত্বনার কথা না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখো। কোনো প্রশ্ন করলে ঐ লাশকাটা ঘরে ঢুকিয়ে দেবো।

প্রদীপ্ত বেকুব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন বুঝতে পারে দেখা এবং শোনা ছাড়া ওর কোনো ভূমিকা নেই তখন কিছুটা স্বস্তিবোধও করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কীভাবে কথা বলতে হয় তা ওর জানা নেই। শুধু নসিবের সঙ্গটাই এখন ওর কাম্য। ও প্রাণপণ চেষ্টায় কোনো বিকার না দেখিয়ে পচা গন্ধ সহ্য করে যেতে থাকে।

ডোমটা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর ও নিচে নেমে আসে। একটু অবাক হয়ে নসিবের মুখের দিকে তাকায়, আপনার বাবার লাশ তো?

নসিব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমার বমি পাচ্ছে।

তারপর একগাদা থুতু ফেলে, যেন নাড়িভুঁড়ি উপড়ে আসছে। ডোমটা আবার বলে, আপনার বাবা তো–

নসিব ওকে এক ধমক লাগিয়ে বলে, বাবা হোক আর চাচা হোক সেটা তো কথা

BanglaBook.org

নয়, পচে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে এটাই এখন বড় কথা।

ডোমটার চোখ কপালে ওঠে। বছর দশেক ধরে ও মর্গে কাজ করছে কিন্তু এমন লোক কখনো দেখেনি। ও বিরক্তি সহকারে নসিবকে দেখে। তারপর গলা ফাটিয়ে বলে, এখানে কেউ নাকে গন্ধমাখা রুমাল লাগায় না।

নসিব চেঁচিয়ে ওঠে, রাবিশ। তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে। চুপ করে থাকো।

ডোমটা ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। নসিবের রাগ বাড়তে থাকে। নবীজ হাফিজুদ্দিনের এই মৃত্যু ওকে বিব্রত করে। ও চায় না এমন পরিস্থিতির সামনে পড়তে। এ ধরনের বাজে পরিস্থিতি একেবারে অসহ্য। ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর করে লাশ ছাড়ানোর জন্য অফিসে আসে। প্রদীপ্ত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসার মাঝবয়সী। নসিবের চাইতেও দশ-বারো বছরের বড়। মুখ দেখলে মনে হয় যেন কৌতুকের সঙ্গে এই পৃথিবীকে দেখে। তার সামনে কোনোকিছুই গুরুতর ব্যাপার নয়। নসিবকে বসতে বলে এবং সিগারেট দেয়। নসিব একমুহূর্ত ইতস্তত করে সিগারেটটা নেয়। এই মুহূর্তে সিগারেট টানার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। ওটা হাতে রেখে টেবিলের ওপর ঠুকতে থাকে। অফিসার গম্ভীর হবার ভান করে বলে, বাবা-মা তো কারো জীবনে চিরকাল থাকে না।

জানি।

নসিব নিরাসক্ত মুখে জবাব দেয়। তারপর ধুত্তর বলে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে।

বুঝতে পারছি আপনি খুব অস্থির হয়ে গেছেন।

মোটেই না। আমার বিরক্ত লাগছে।

সত্যি, একজন পিতার এভাবে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।

নিকুচি করি।

অফিসার কৌতুকের হাসি হেসে বলে, কাকে, আমাকে?

নসিব ব্যঙ্গের স্বরে বলে, না আমাকে। কারণ এই শহরে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা অনেক বলে আমি জানতাম।

অফিসারের মুখের হাসি উবে যায়। ও ছুঁচালো দৃষ্টিতে নসিবের দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, এ ক'দিন বৃষ্টি ছিলো বলে কিছুটা ঠাণ্ডা ছিলো, নইলে আরো পচে-গলে যেত, চিনতেই পারতেন না।

সেটা বোধহয় ভালো ছিলো।

কি বললেন?

একজন মানুষ খুব অজান্তে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া মন্দ কি। জীবনভর খুঁজবো, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাবো না।

অফিসার মুখ কালো করে ওর দিকে তাকায়। ওর কথাগুলো তার পছন্দ হয় না। ইতস্তত করে বলে, আপনার বাবাই তো–

আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে? জেনে রাখুন তিনি শুধু বাবাই নন, মা'ও। মা মরে যাবার পর থেকে আমার মায়ের দায়িত্বও পালন করেছেন। না, তাও বোধহয় কম বলা হলো, আসলে আটাশ বছর ধরে আমরা একে অপরের সঙ্গী।

অফিসার এবার কৌতুক বোধ করে। তার চেহারায় আগের ভাব ফিরে আসে। চোখ নাচিয়ে বলে, আপনার বাবা আর বিয়ে করেননি কেন?

বলতেন আমার জন্য। আমার বিশ্বাস হয়নি।

কেন?

আমার ধারণা তার খুশিমতো জীবনযাপনের জন্য বিয়ে করেননি।

BanglaBook.org

তিনি কি তেমন জীবনযাপন করতেন?

করতেন।

কি রকম?

অফিসারের কণ্ঠে প্রবল আগ্রহ খেলে যায়, গল্পের স্বাদ পেলে ছোট বাচ্চারা যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নসিব মৃদু হাসে। অফিসারের এই বেয়াড়া কৌতূহলে ওর বিরক্তির ভাব কেটে যায়। ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা জ্বালায়। দিয়াশলাই অফিসারই দেয়। নসিব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এত কিছু নাইবা জানলেন? তবে ধরে নিন একজন মানুষের অজস্র ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকে। আজ তিনি ভাত খাবেন কি খাবেন না থেকে শুরু করে অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়, ইত্যাদি।

নসিবের এই আকস্মিক থেমে যাওয়াতে অফিসারটি চুপসে যায়। তারপর মুখ ফসকে বলে ফেলে, আপনার মতো বিদ্‌ঘুটে মানুষ আমি কখনো দেখিনি।

আমি আপনার ভেতর যথেষ্ট কৌতুকের সঞ্চার করেছি। আপনি তা উপভোগ করেছেন।

অফিসারের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। তীক্ষ্ণস্বরে বলে, তার জন্য কি আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে?

আপনি রেগে গেলেন দেখছি।

অফিসারটি আকস্মিকভাবে বলে, আপনি কারো প্রেমে পড়েননি?

হ্যাঁ, একজনকে ভালোবাসি।

সে আপনাকে সহ্য করে?

সহ্য করা নয়, ভালোবাসে। কারণ, আমি তার কাছে ভিন্ন মানুষ। আমার ভেতরে অনেক মানুষ আছে। আপনি সেটা বুঝবেন না।

বাহ্ বেশ একজন বহুরূপী লোক দেখার আনন্দ পাওয়া গেলো। নিন, এখানে সাইন করুন।

লাশ নিয়ে যাবার অনুমতি-পত্র নিয়ে ও বেরিয়ে আসে। বহুরূপী শব্দটা ওকে তাড়িত করে। আমি তো মনে করি আমার ভিতরের প্রতিটি ব্যক্তিই আলাদা সত্তা। আমি বহুরূপী নই। ক্রোধ বাড়ে। রাগটা ও প্রদীপ্তর ওপর ঝাড়ে। ক্রুদ্ধস্বরে বলে, তুমি বাড়ি চলে যাও প্রদীপ্ত।

লাশ দাফনের জন্য–

না, সেজন্য তোমাকে আমার দরকার হবে না। আমি একাই পারবো।

আমতা আমতা ভাবটা কাটিয়ে ও জোর দিয়ে বলে, আমি থাকলে আপনার ভালো লাগবে। কিছুটা হালকা বোধ করবেন।

খবরদার উপদেশ দিও না বলছি।

প্রদীপ্ত রাগে না, চলেও যেতে পারে না। কয়েক পা পেছনে সরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর কেবলই মনে হয়, শেষটুকু ওর দেখা দরকার। ও তো টেবিলে বসে খবর লিখতে চায় না। নসিব লাশ নিয়ে গোরস্তানে এলে প্রদীপ্ত পিছু পিছু আসে। গেটের সামনে নসিবের মুখোমুখি হয়। নসিব মৃদু হেসে বলে, জানতাম আসবে। কারণ তুমি টেবিলে বসে খবর লিখতে চাও না।

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে। বলে, আমি শুধু সঙ্গে থাকবো।

একটিও কথা বলতে পারবে না।

বলবো না।

আমি তোমাকে উপেক্ষা করবো।

করবেন।

BanglaBook.org

আমি যা করি, যেখানে যাই, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে।

তাই হবে।

নসিব লাশ দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য গোরস্তানের লোকদের ওপর ভার দেয়। ও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মর্গের ডোমটি ওর কাছে বখশিস চেয়েছিলো, ও দেয়নি। আরো দু'চারজন জুটেছিলো ওর সঙ্গে। ওরা সবাই ওর দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিলো। সেই রাগে ও ডোমটিকে বখশিস দেয়নি। আসলে বখশিস ওর প্রাপ্য নয়, ও করুণা চেয়েছিলো। এখন এই গোরস্তানে দাঁড়িয়ে ওর মনে হয় লোকটাকে করুণা করা উচিত ছিলো। প্রদীপ্ত গেটের কাছাকাছি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর প্রচণ্ড কৌতূহল। না দেখে ছাড়তে চায় না, এটুকু বুঝে যায় নসিব। তখন ওর মনে হয় প্রদীপ্ত রাজনীতি করে, হয়তো বাম রাজনীতি। এমন ভাবার কারণ নেই। ভাবনাটা আকস্মিকভাবেই মনে আসা। লাশ দাফন হয়ে গেলে ও একটা রিকশা নিয়ে মর্গে আসে, সঙ্গে প্রদীপ্ত। আগের ডোমটি নেই। ওর বদলে অন্য লোক ডিউটিতে এসেছে। ও ওর কাছে থেকে আগের ডোমটির নাম-ঠিকানা জেনে নেয়। ও মেথরপট্টিতে থাকে। নসিবের মেথরপট্টিতে যাতায়াত আছে। ও ওখানে বাংলা মদ খেতে যায়। ঠিকানা খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। ডোমটির নাম প্রেমলাল।

নসিব রিকশায় বেশ খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। মর্গের ডোমটিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলতে পারো প্রেমলাল আমার কাছে বখশিস চেয়েছিলো কেন?

বখশিস তো চাইবেই। সবাই দেয়।

ডোমটি এই সাধারণ প্রশ্নে খুব অবাক হয়।

কিন্তু কেন চেয়েছিলো?

কেন আবার? মদ খাবে, ফূর্তি করবে, এজন্য।

মদ খাবে, ফূর্তি করবে– ভাবতে ভাবতে নসিব গোরস্তানে ফিরে আসে। ওর মনে হয় যা কিছু এখানে রেখে যাচ্ছে, এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। নতুন কবরের সামনে ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রদীপ্ত ওর আচরণে বিস্মিত হয়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না, বলার নেই। নসিবকে ও এখন হয়তো কিছুটা বুঝেছে, নসিবের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, ও নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না, তাই হয়তো এই অস্থিরতা। নসিব পলকহীন তাকিয়ে আছে, যেন এমন বিস্ময়কর জিনিস ও আর কখনো দেখেনি। সাধারণ কবর, কিছুকাল পর মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। এটি রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। যেহেতু নসিবের কাছে কোনো অর্থ নেই সেহেতু নবীজ হাফিজুদ্দিনকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে। এটাই নিয়ম। ধর্ম কি? ধর্মওতো বড় লোকদের জন্য। যাদের অর্থ আছে তারা হজ্জে যাবে, তারা কবরের ওপর স্মৃতিসৌধ গড়বে। যাদের নেই তারা ডডকলা, তাদের আবার দাম কি? ঐ মাটির মধ্যে দীর্ঘদিনের জীবনযাপনের একটি অংশ চাপা পড়ে গেলো, এখন আবার নতুন করে শুরু। পাশে আর একটি লাশ গোরে নামানো হচ্ছে। একদল প্রিয়জন কান্নাকাটি করছে। একটু দূরে দু'জন মহিলা একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ছে। নসিব নিজের মধ্যে কোনো ব্যাকুলতা অনুভব করে না। ও ধীর পায়ে ফিরে আসে। প্রদীপ্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, প্রদীপ্ত দেখে ঐ দৃষ্টি ভাবলেশহীন, শূন্য। গেটের কাছে একদল লোক জটলা করছে। ওরা সবাই কবর খোঁড়ার কাজ করে। কেউ কেউ ওকে সালাম দেয়। ও বুঝতে পারে না কেন। এইসব মানুষের কোলাহল থেকে ও অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। একজন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, স্যার একটা সিগারেট দেন?

নাই। ও মাথা নাড়ে।

তাহলে চার আনা পয়সা দেন।

ও লোকটিকে চার আনা পয়সা দেয়। ও ভেবে পেলো না যে এই চার আনা লোকটিকে

BanglaBook.org

বখশিস দিলো কিনা। একদল ভিখিরি ওকে ঘিরে ধরে। ও পাশ কাটিয়ে চলে আসে। ওর আবার রাগ বাড়তে থাকে। এই রাগের সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় একটি গল্পের প্লট ধোঁয়ার মতো জমতে থাকে। ও পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওর মাথার মধ্যে নিদারাবাদ জেগে ওঠে, যে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে একদল খুনী দ্রুতহাতে নৌকা বেয়ে চলে যায়, ওরা আর একটু পর একজন নারী ও পাঁচটি ছেলেমেয়েকে কুচিকুচি করবে। ও মুহূর্তে চমকে গোরস্তানের দিকে তাকায়, দেখতে পায় সর্বত্র আজরাইল। ভিখিরির মুখগুলো আজরাইল হয়ে এই শহরের প্রধান সড়কগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। ওদের রাইফেলের নলে মানুষের মাথা গেঁথে আছে। ও মেথরপট্টির ঠিকানা বলে একটি রিকশায় উঠে পড়ে। এতক্ষণে ওর বাবার মৃত্যুর জন্য ক্ষোভ জন্মায়– রিকশার পাদানিতে পা দাপায়। প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে শক্ত করে। ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে বলতে থাকে, সামরিক শাসনের অধীনে জীবনযাপন করলে মৃত্যু এমন অমানবিক হয়। যারা গণতন্ত্রের ছায়ায় বাস করে না, যারা স্বৈরাচারের নিপীড়নের শিকার তারা সবাই বেওয়ারিশ লাশ। এবং এই সরকারের অধীনে প্রতিটি মানুষই একজন নপুংসক নাগরিক। সে কারণে আমি নিশাতের প্রেমের উপযুক্ত নই। এবং এই কারণে আমি বাবার জন্য কাঁদতে পারছি না। কারণ, আমার জীবনের মৌলিক শর্তগুলো সামরিক শাসনের যাঁতাকলে খারিজ হয়ে গেছে। আমি কি মানুষ? আমি কেমন করে ভালোবাসবো? কেমন করে কাঁদবো? কথাগুলো শুনে প্রদীপ্ত বিস্মিত হয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, নসিব ভাই?

নসিব ওর দিকে ঘুরে তাকায়। চোখ লাল, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোনো তরল পদার্থ, কিন্তু বেরুতে পারছে না। আর পারছে না বলেই প্রবল চাপ সৃষ্টি করে ভারি করে রেখেছে চোখজোড়া। ও ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বলে। প্রদীপ্ত মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

দুপুর গড়িয়েছে। এখন মধ্য বিকেল। অফিস-ফেরত মানুষ ঘরে ফিরছে। রিকশাওয়ালা হই-হই করতে করতে ছুটছে। বোঝা যায় ওর হৃদয়ে এক ধরনের ফূর্তি আছে। ও গান গাইছে এবং ওভারটেক করার চেষ্টা করছে।

নসিব ওর পিঠে হাত রেখে বলে, তুমি একটু আস্তে যাও ভাই।

কন কি সাব, আস্তে যামু ক্যান?

যেভাবে ওভারটেক করছো এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

মরণরে ডরাই না, বলে ও একই গতিতে রিকশা চালিয়ে গন্তব্যে চলে আসে। মেথরপট্টিতে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে নসিব প্রেমলাল ডোমের বাড়ি খুঁজে বের করে। চারদিকে নোংরা, কাদা থক্‌থক্ করছে। বাচ্চাদের হৈ-চৈ। মাতালদের হল্লা দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে যায়। এইসব দৃশ্য ওর ভালোই লাগে। মেথরপট্টির বেশির ভাগ রমণী মোটাসোটা, থলথলে, ওদের পোষা শুয়োরগুলোর মতো চর্বিসর্বস্ব। ওরা এখানে-ওখানে জটলা করে গল্প করছে। কোথাও নারী-পুরুষ গোল হয়ে বসে চুরুট টানছে। সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। নসিব প্রেমলালের কথা বলে। প্রেমলাল ওকে দেখে অবাক হয়। আর ও নিজে অবাক হয় প্রেমলালের বৌ পেয়ারী সুন্দরীকে দেখে। ছোটখাটো মানুষটির টক্‌টকে গায়ের রঙ, আয়ত চোখ, দৃষ্টি ফেরানো কষ্ট। এতক্ষণ দেখে আসা রমণীদের সঙ্গে পেয়ারী সুন্দরীর কোনো মিল নেই। ও যেন আলাদা জগৎ থেকে হঠাৎ করে এখানে ছিটকে পড়েছে। মিষ্টি হেসে নসিবকে বসতে বলে। ও বসতে চায় না। প্রেমলালকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

প্রেমলাল কাচুমাচু স্বরে বলে, বাবু কেন কষ্ট করে এসেছেন?

তোমাকে আমি বখশিস দিতে চাই প্রেমলাল।

BanglaBook.org

বখশিস?

হ্যাঁ, প্রেমলাল।

না, না তার দরকার কি।

এই টাকাটা নাও। তুমি তোমার বৌকে কিছু কিনে দিও।

প্রেমলাল মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। নসিব নিজের পরিবর্তনে অবাক হয়। এই পট্টিতে ঢোকার আগে পর্যন্ত কখনো ভাবেনি যে, প্রেমলালের বউর জন্য ও কিছু কিনতে বলবে। ও তো প্রেমলালের ফূর্তির জন্য বখশিস দিতে এসেছিলো। প্রেমলাল মুখ উদ্ভাসিত করে বলে, স্যার বাংলা খাবেন? বাংলা?

নসিব মাথা নেড়ে বলে, না।

প্রেমলাল উজ্জ্বল মুখে বলে, স্যার দারুণ নেশা হবে।

নেশা?

স্যার আপনি খাননি কখনো?

খেয়েছি। আমার পছন্দ হয়নি।

স্যার আজ চলুন।

না, আজ থাক। আমি যাই।

স্যার আবার আসবেন?

হয়তো আসবো, হয়তো না।

স্যার আমার বেয়াদবী ক্ষমা করবেন।

বেয়াদবী?

নসিব প্রেমলালের মুখের দিকে তাকায়। এই লোকটি কত সহজে কেনা হয়ে গেলো। এখন এই লোকটি ওকে স্যার বলছে, তোয়াজ করছে, মাফ চাইছে। আসলে ওর ঐ মর্গের উপেক্ষার ভঙ্গিটি অনেক সহনীয় ছিলো। এখন এই লোকটি একটা কীট হয়ে গেলো। ওর ওপর ঘৃণা বাড়ছে এবং একই সঙ্গে ক্রোধ। লোকটির এমন একটি সুন্দরী বৌ আছে দেখে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে যায় ওর হৃদয়।

BanglaBook.org

স্যার আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন?

তোমার বিয়ের কত বছর হলো প্রেমলাল?

পাঁচ বছর।

বাচ্চা আছে?

না, বাচ্চা হয়নি।

ঠিক আছে, যাই।

নসিব হাঁটতে শুরু করলে প্রেমলাল ওর পিছু পিছু আসে। নসিব নিষেধ করা সত্ত্বেও ও পিছু ছাড়ে না। মেথরপট্টির শেষ সীমানায় এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ে, তুমি যাও প্রেমলাল।

লোকটি আবার প্রণাম করে একই কথা উচ্চারণ করে, স্যার আমার বেয়াদবী মাফ করবেন।

ও রেগে ওঠে, একটা কথা কেন বারবার বলো?

প্রেমলাল হকচকিয়ে যায়। হাতজোড় করে বলে, স্যার?

নসিব ঝামটা দিয়ে ওঠে, স্যার? কে তোমার স্যার? আসলে যে বেয়াদবীর জন্য তুমি বারবার মাফ চাইছো, সে বেয়াদবীটুকুই আমার অনেক বেশি পছন্দের ছিলো প্রেমলাল।

প্রেমলালের জন্য এটা খুব কঠিন কথা। ও কিছুই বোঝেনি, তবু এটুকু সম্বল করেই নসিব হাফিজুদ্দিন ঘরে ফেরার জন্য রিকশায় ওঠে। আজকের দিনটির কথা মনে করে ও

ভাবলো এই বিশেষ দিনটি আজ ওর কবিতা লেখার দিন। আজ রাতটা ওর কবিতার রাত। একজন কবির আত্মবিশ্বাস ওর মধ্যে সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নসিব হাফিজুদ্দিন অসীম রায়হান হয়ে যায়।

প্রদীপ্তকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবার সময় বলে, আজ আমার কবিতার রাত প্রদীপ্ত।

সারা রাত জেগে কবিতা লিখবেন?

হয়তো তাই।

একজন মানুষ এবং একটি দিন– আজ আমার জন্য একটি সঞ্চয় নসিব ভাই।

সঞ্চয়? অভিজ্ঞতার সঞ্চয়?

হা-হা করে হেসে ওঠে নসিব হাফিজুদ্দিন। রিকশা ওর বাড়ির দিকে চলে যেতে থাকে, কিন্তু দৃষ্টি ফেরাতে পারে না প্রদীপ্ত আহমদ, হবু সাংবাদিক, যে টেবিলে বসে খবর লিখবে না। ওর করোটিতে গেঁথে থাকে ঘটনা। ঘটনাগুলো একটি একটি করে বিনে সুতোর মালায় গাঁথা হচ্ছে– সেগুলো বিস্তৃত হয়ে গড়ে তুলছে প্রান্তর, বিশাল প্রান্তর। নসিবের রিকশা মোড়ে মিলিয়ে যাবার পরও প্রদীপ্ত ঘরের দিকে পা বাড়াতে পারে না। মনে হয় কত কিছু করার আছে, কত কিছু।

ঘরে ফিরে অসীম রায়হান হয়ে খাটে বসে জুতো খোলে নসিব, হাত-মুখ ধোয়, কাপড় খুলে বাথরুমে রাখে। রান্নাঘরে আসে। কৌটো খুলে চিড়ে বের করে। সেগুলো ভেজে এবং এক কাপ চা বানিয়ে ও নিজের ঘরে আসে। ওর কবিতা লেখার জন্য উঁচু একটা টেবিল আছে। সেই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও কবিতা লেখে। আজ ওর মাথা খোলাসা হচ্ছে। ইচ্ছে আছে এক সঙ্গে বিশ-পঁচিশটা কবিতা লেখার। কিন্তু ও কিছুতেই টেবিলের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। টেবিলের সামনে দাঁড়ালেই মর্গের তীব্র পচা গন্ধ এসে ওর নাকে প্রবেশ করে, ওর বিবমিষা হয়, মাথা ঘোরায়। শরীর খারাপ লাগছে। ও পর পর ছয় কাপ চা খায়, তবু ওর ঘোর কাটে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিক, কিন্তু কোথায় যেন গলদ– কোথায় যেন ফোঁকর, বারবারই সে গর্তে পা পড়ে যায়। কবি অসীম রায়হান কিছুতেই নিজের মধ্যে সুস্থির থাকতে পারে না। ও ঘরের সব বাতি বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে বসে। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার আছে নবীজ হাফিজুদ্দিনের। অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে নবীজ হাফিজুদ্দিন এই চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতো। অসীম রায়হান সুযোগ পেলে এই চেয়ার দখল করে রাখতো। আজও এই চেয়ারে বসবে কি বসবে না বুঝতে পারে না। এ তিনদিনে ও অনেকবার বসেছে। তখন ওর মনে আশা ছিলো যে, বাবা যে-কোনো সময় ফিরে আসবে। আজ এই মুহূর্তে নেই শব্দটা ওর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। ও একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ারটায় বসে পড়ে এবং দু'হাতে মুখ ঢাকে। তখন ওর মনে হয় একজন কবি যখন শূন্যতায় প্রবেশ করে সে শূন্যতা তার সামনে ফুল হয়ে ওঠে। শূন্যতা একজন কবিকে গ্রাস করে না। সামরিক শাসন একজন কবিকে দমন করতে পারে না। সে কবি হয়ে ওঠে বিপ্লবের প্রতীক। আজ রাত আমার সৃষ্টির রাত। আমি আজ রাতে শস্যের গোলা ভরে তুলবো।

ও ধীর পায়ে পুশকিন নামের শহরে এসে দাঁড়ায়। এখানে পুশকিনের সফল-জীবন কেটেছে, সেজন্য কৃতজ্ঞ অধিবাসী এই শহরের নাম রেখেছে পুশকিন। গাছের নিচে লোহার বেঞ্চে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা পুশকিনের ভাস্কর্যের চারদিকে ঝরাপাতা জমে আছে। অসীম ঐ গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। আনাতোলি লুনাচরস্কি বলতেন, পুশকিন ছিলেন রাশিয়ার ঋতুরাজ

BanglaBook.org

বসন্ত, ছিলেন রৌদ্র করোজ্জ্বল সুপ্রভাত, ছিলেন রাশিয়ার আদম। নিরিবিলি সুন্দর শহর পুশকিন। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট পার্ক আছে। বরফ গলে যাওয়ার ফলে কোথাও কোথাও কাদা হয়ে আছে। পাখির মতো উড়ে উড়ে ইতস্তত ঘোরে অসীম রায়হানের দৃষ্টি। বুঝতে পারে না ও কোনটা ছোঁবে, কোনটায় বসবে। সবকিছুর মধ্য থেকেই তো একজন মানুষ ওকে কবি হতে বলে, তেমন একজন কবি, যে তার দেশকে বুঝতে পারে, যে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যে বিপ্লবের পক্ষে অমর বাণী উচ্চারণ করে। অনায়াসে বলে, 'কমরেড বিশ্বাস রাখো মনে একদিন প্রসন্ন ভোর আমাদের সবার দুয়ারে রোদ ছড়াবে, বিজয়ানন্দের আলোকে আকাশ হবে উদ্ভাসিত। অত্যাচারীদের ধ্বসে যাওয়া ঘাঁটিতে আমাদের বিজয় নিশান উড়বে।' রাশিয়ার জারদের বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালের চৌদ্দ ডিসেম্বর যারা অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলো পুশকিন ছিলো তাদের সমর্থক। ঐদিন তিনি রাজধানী থেকে দূরে ছিলেন বলে বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকতে পারেননি। বিপ্লবীদের প্রত্যেকের পকেটে পাওয়া গেছে তাঁর রচিত কবিতা। জার ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সেদিন থাকলে কি করতে?' পুশকিন নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকতাম।'

একজন কবিকে সম্মান জানানোর জন্যই কি এই শহর রূপান্তরিত হয়েছিলো শিল্পের শহরে? এই শহরে আছে রাণী ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট-এর প্যালেস। যা বর্তমানে জাদুঘর। এই সব প্যালেস দেখলে বোঝা যায় কেন একজন কবি জনগণের প্রতিনিধি হয়। সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ-নিপীড়নের পর্যায় কোন স্তরে গেলে কবি বিদ্রোহী হয়? কবি তো জানে যারা শাসন ক্ষমতায় থাকে তারা প্রকৃত দেশপ্রেমী নয়, দেশ তাদের যারা বিন্দু বিন্দু পরিশ্রমের ঘাম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে দেশের প্রতিটি তৃণলতা। অসীম রায়হান রাণী ক্যাথেরিনের প্যালেসের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। মহিলা নিজে ছিলেন জার্মান। রুশ শাসক স্বামীকে কৌশলে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন এবং বিশ বছর রাজত্ব করেন। দেখেশুনে অসীমের মনে হয়, এই মহিলার শিল্পপ্রীতি অসাধারণ। প্রতিটি ঘর অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো। প্রতিটির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কোনো ঘরের দেয়াল এবং ছাদ জুড়ে পেইন্টিং। কোনো ঘরের দেয়াল চমৎকার চাইনিজ সিল্ক দিয়ে মোড়ানো। কোনো ঘর জুড়ে আছে ফরাসি সিল্ক, সঙ্গে চিনেমাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটি ঘরের দেয়াল কাঠ দিয়ে তৈরি। সেই কাঠের ওপর অপূর্ব সুন্দর কারুকাজ। শোবার ঘরে খাট, সোফা ইত্যাদি সাজানো, খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল সাজানো, যেন সবকিছু তৈরি, যাদের আসার কথা তারা এলেই হয়। প্রত্যেকটি ঘরে আছে অসংখ্য রকমের ঘড়ি। ময়ুর, ঘোড়া, হরিণ, ফুল, বিভিন্ন পাখি ইত্যাদি আকারের ঘড়িগুলো খুব সুন্দর। এই প্রাসাদের মেঝে নয় রকমের কাঠ দিয়ে তৈরি। সেই কাঠের ওপর অপূর্ব সুন্দর কারুকাজ। মেঝে যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য সবাইকে বিশেষ জুতো দেয়া হয়। খুঁজে পেতে অসীম যে জুতো নেয়, সেটা ওর পায়ে বড় হয়। পা টেনে টেনে হাঁটতে ওর খুব অসুবিধে হচ্ছিলো। মুগ্ধ হয়ে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জুতো খুলতেও ভুলে যায়। সামনে বিশাল বাগান, ঘন গাছের সারি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে গেছে, একজন কবির দৃষ্টি সে সারি ছুঁয়ে চলে যায়। ১৯১৭-এর বিপ্লবের আগে এখানে রুশ সম্ভ্রান্তদের এবং বিদেশি কূটনীতিকদের রাজকীয় সংবর্ধনা দেয়া হতো। অসীম যেন অসংখ্য নারী-পুরুষের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখতে পায়– শুনতে পায় অসংখ্য ঘড়ির একই সঙ্গে বেজে ওঠা ঢং ঢং ধ্বনি। এই ঘণ্টাধ্বনি ওদের বিদায়ের ধ্বনিও। শুধু কি ঘড়িই বাজায় নাকি অন্য কেউও বাজাচ্ছে? তারা কারা? নিশ্চয় তারা পুশকিনের হর্সম্যানরা। কী দুর্বিনীত ভঙ্গি সেইসব হর্সম্যানদের। এখানে আসার আগে লেলিনগ্রাদে সে দেখে এসেছে হর্সম্যানদের ভাস্কর্য। ক্যাথেরিন প্যালেসের বাগানের সামনে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পর ও চলে যাবে পেত্রোভার্স। পেরিয়ে

BanglaBook.org

যাবে সেই দু'টো কামান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসী বাহিনী তছনছ করেছিলো পুশকিনের শহর। রাণী ক্যাথেরিনের প্যালেসকে বানিয়েছিলো আস্তাবল এবং এখানকার গির্জাটা ব্যবহৃত হতো মোটর সাইকেল রাখার কাজে।

এইসব ভাবলে কবি অসীম রায়হানের হাসি পায়। ক্ষমতার জন্য মানুষের কী প্রাণান্ত কর লড়াই। ক্ষমতার অহমিকায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো জাররা, অন্ধ হয়েছিলো জার্মান নাৎসীরা। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরাজিত হয় অন্ধরা, জেগে ওঠে নতুন শক্তি। ভাবতে ভাবতে অসীম রায়হান পেত্রোভার্স শহরে প্রবেশ করে। ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই শহরকে বলা হয় ঝর্ণার রাজধানী। রাশিয়ার জার এবং পিটাসবুর্গের সম্ভ্রান্তদের জন্য এখানে আছে সামার প্যালেস। চারদিকে ফুল, পাখি এবং পত্রশোভিত বৃক্ষ, সঙ্গে বসন্তের নরম রৌদ্রালোকে এক স্বর্গরাজ্য তৈরি হতো এখানে। না দেখলে বোঝা যায় না যে কি পরিমাণ শোষণ এবং বঞ্চনার ওপর প্রতিষ্ঠিত অবসর বিনোদনের জন্য এই মনোরম প্যালেস ও তার পারিপার্শ্বিক। প্রাসাদের সামনে দু'হাজার কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। এক একটির আকৃতি এক এক রকম। সবগুলো একসঙ্গে ছেড়ে দিলে যে পানির ফোয়ারা উৎক্ষিপ্ত হয় তার সঙ্গীতধ্বনি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিনল্যান্ড উপসাগর থেকে খাল খনন করে প্রাসাদের সামনে পর্যন্ত আনা হয়েছে। দু'পাশ উঁচু করে বাঁধাই করা। অসীম রায়হান হাঁটতে হাঁটতে উপসাগরের তীরে আসে। সামনে বিস্তৃত উপসাগর বরফ জমে সাদা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে যেটুকু পানি দেখা যায় সেটা শুধুই নীল। লোহার ঘাটের মতো আছে, হেঁটে হেঁটে বেশ খানিকটা ভেতরে যাওয়া যায়। রেলিংয়ে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কবি অসীম রায়হান। ওর নিজের দেশে বরফ নেই, সেখানে প্রকৃতি সারাটা বছরই সবুজ। এখন এই অসীম বিস্তারি নীলাভ সৌন্দর্য ওর মন প্রসন্ন করে দেয়। ও জানে একজন পর্যটক বলেছিলো, যদি কেউ তার কলম রঙধনু আর আলোর সমুদ্রে ডোবাতে পারে তবেই পেত্রোভার্সের এই সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে।

অসীম রায়হান শত বছরেরও বেশি সময় পরে ফিনল্যান্ড সাগর তীরের এই সামার প্যালেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলো, এই অপরূপ সৌন্দর্য পুশকিনের কবি হৃদয়কে মুগ্ধ করেনি। আহত, বেদনার্ত এবং রক্তাক্ত করেছিলো বলেই তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে এই অসাধারণ সুন্দর বিলাসবহুল প্রাসাদের দিকে তাকালে মনে হয়, কেন এদের জীবনে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। কত মানুষের জীবন এদের বিলাসের তলায় যে গুঁড়িয়ে গেছে তার কোনো সীমা নেই। তাই তিনি নিয়েছিলেন জনগণের পক্ষ, চেয়েছিলেন সুবিচার। সেজন্যই গোগল বলেছিলেন, 'নজিরবিহীন ভাবেই তাঁর মাঝে রাশিয়ার সমগ্র সত্তার বিকাশ ঘটেছিলো। দু'শ' বছরের রাশিয়ার ব্যক্তি মানুষকে তাঁর মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি রাশিয়ার মাটি ও মানুষ, রাশিয়ার আত্মা, রাশিয়ার ভাষা এবং জনজীবনের মূর্ত প্রতীক।' একজন কবি একটি দেশের আত্মা হতে পারে, একটি বিশাল দেশ– বিচিত্র যার ভাষা, বিচিত্র যার জনপদ। লেলিনগ্রাদ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের এই পেত্রোভার্স শহরে দাঁড়িয়ে কবি অসীম রায়হান ভাবতে পারে না সে তার দেশের আত্মা হতে পারে, যেখানে সামরিক শাসন স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হয়, গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে রাখে। যেখানে বন্দুকের নলের ওপর স্থাপিত হয় মানুষের করোটি। এবং বন্দুকধারী ক্ষমতার লড়াইয়ে জিতে গিয়ে প্যারেড করে কবিদের বুকের ওপর। অসম্ভব লজ্জায় বরফে ঢাকা বাল্টিক সাগর অসীম রায়হানকে অন্ধকারের বরফের কথা বলে, যার তীরে দাঁড়ালে স্বপ্ন মুছে যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। আমি কেমন করে কবিতা লিখবো? কে আমার কবিতা পকেটে নিয়ে বিপ্লবের জন্য পথে নামবে? ও

BanglaBook.org

দু'হাতে বাল্টিক সাগরের ওপরে তৈরি খানিকটা ভেতরে এগিয়ে যাওয়া ঘাটের লোহার রেলিং চেপে ধরলে দেখা যায় ওটা ওরই ইজিচেয়ারের কাঠের হাতল। ও একটি শোক অতিক্রম করার জন্য নিজেকে কবিতা লেখার জন্য তৈরি করছে। কিন্তু পারছে না। ও প্রতিজ্ঞা করেছে বাবার মৃত্যুতে ও এভাবেই কাঁদবে, কিন্তু পারছে না। ভাবছে একজন মানুষের চলে যাওয়াকে এভাবে স্মরণ করবে, পারছে না। যে ছোট শোককে ধারণ করতে পারে না, সে কিভাবে সামরিক শাসনে নিপীড়িত জাতিকে পথ দেখাবে? কিভাবে এ দেশের মানুষ তার মাঝে নিজেদের খুঁজে পাবে? ও ছুটে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে একজন কবির নিজস্ব গণ্ডিতে ছায়া ফেলছে কুটিল সময়, যে সময় মানুষের মগজ হরণ করে, সৃজনশীলতা নষ্ট করে এবং শক্তিকে অবদমিত করে রাখে। ফলে সেই কবির জগতে প্রবেশ করে শূন্যতা। অসীম রায়হান প্রথম কাগজটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেঝেতে। ওর কলমদানিতে অনেকগুলো কলম, কলম ওর শখ। দু'টো বলপেন দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙে ফেলে। দ্বিতীয় কাগজটা মেঝেতে লুটোয়। তৃতীয় কাগজটায় দু'টো পঙক্তি রচিত হয়, কিন্তু পছন্দ হয় না বলে সেটাও মেঝেতে চলে যায়। অসীম রায়হানের প্রিয় সাদা কাগজগুলো গোল্লা গোল্লা হয়ে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে। কত কাগজ নষ্ট হয়েছে ও জানে না, কত রাত হয়েছে ও জানে না। এক সময় ওর চেতনায় পুশকিন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও একটানে পাঁচটি কবিতা লিখে ফেলে। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ওর ভেতরে নতুন ছায়া ভেসে ওঠে, ও দেখতে পায় ওর ভেতরে ভিন্ন আদল জেগে উঠেছে। ও অসীম রায়হানের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তখন রাত প্রায় শেষ। প্রবল আনন্দে ওর চোখে জল আসে। চিৎকার করে বলে, আমার ভেতরে আমার প্রভুর আবির্ভাব হয়েছে। এলোমেলো কাগজ ছড়িয়ে থাকে টেবিলের ওপর। দু'একটা কলম গড়িয়ে পড়েছে নিচে। ও মুক্ত হৃদয়ে বিছানায় আসে। ওর ঘুম পাচ্ছে, প্রবল ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙে তখন চোখ ধাঁধানো রোদ ঘরের মধ্যে। ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। মেঝেতে গতকালের খবরের কাগজ পড়েছিলো সেটা হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে নেয়। চিৎ হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ে। মনে পড়ে রাতে ওর তেমন কিছু খাওয়া হয়নি, খিদে পেয়েছে। বাবা নেই, ফলে ও জানে না আর কোনোদিন দুধ-পাউরুটি খাওয়া হবে কি না।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলে ওকে উঠতে হয়। বিছানায় বসে বড় করে হাই তোলে।। দরজায় আবার শব্দ। মেজাজ খারাপ করেই ও দরজা খোলে। প্রতিবেশী মান্নান সাহেব। উৎকণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবার খবর পেলে?

হ্যাঁ, মর্গ থেকে তাঁর লাশ পেয়েছি। তিনদিন আগে এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।

ওহ্, কী ভয়ানক খবর!

মান্নান সাহেব কাছের চেয়ারটার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, তিন দিন বেওয়ারিশ লাশ হয়ে থাকলেন।

নসিব হাফিজুদ্দিন হাত ওল্টায়, কি আর করা।

ঠিকঠাক মতো মাটি দিয়েছো তো?

হ্যাঁ, গতকালই সব করে ফেলেছি।

আজ তাহলে কুলখানি করা দরকার? কিছু ব্যবস্থা করেছো?

না কিছু করিনি। ভাবছি কি করবো?

মান্নান সাহেব গলা পরিষ্কার করে বলে, তোমাকে কি বলে যে সান্ত্বনা দেবো!

নসিব চুপ করে থাকে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না ওর। মান্নান সাহেব আগের কথার জের টেনে বলে, তাছাড়া আমার এইসব সান্ত্বনার ভাষা একদম আসে না। আমি সবকিছু গুলিয়ে ফেলি। তাছাড়া তুমিই বলো কয়েকটি কথা বলে কি এত বড় শোক দূর করা যায়?

BanglaBook.org

মান্নান সাহেব আরো একটু অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, তোমার শোক তো আরো গভীর। তোমার বাবা ছিলেন তোমার জীবনের সব।

হ্যাঁ, দেখুন না বাবা নেই বলে আমার ক'দিন ধরে দুধ-পাউরুটি খাওয়া হচ্ছে না।

মান্নান সাহেব একটু হোঁচট খায়। চোখ গোল করে বলে, দুধ-পাউরুটির চেয়েও তোমার বাবা তোমার জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

তা তো নিশ্চয়। এখন তাঁর অবর্তমানে আমার জীবনযাপনের ধরনটা অন্য রকম হয়ে যাবে। আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রতিটি মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি তৈরি করে। তার ফলে আরো দশজনে উপকৃত হয়। বাবার নিয়মে আমিও চলতাম। এখন থেকে আমাকে আমার মতো করে জীবনযাপনের উপায় বের করতে হবে।

ও!

মান্নান সাহেব ভেতরে ভেতরে রেগে যায়। নসিবের ধীরশান্ত জবাব তাকে বিমূঢ় করে। যেহেতু নসিবের আবেগ অনুচ্চারিত এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ তাই ওর শোক কত গভীর তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সেজন্য উষ্মা প্রকাশ করাও শোভন বলে মনে করছে না।

আচ্ছা যাই। তোমার চাচি তোমার জন্য দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দেবে।

না, না, তার দরকার কি।

দরকার? কি যে বলো, এটাই তো নিয়ম।

নিয়ম! নসিব মাথা চুলকায়। দেখুন আমার চার বছর বয়সে মা মারা গেছেন। তাই সংসারের অনেক কিছু আমি বুঝি না। আমি আর কোনো মৃত্যু দেখিনি, নিয়মও জানি না। নসিবের দৃষ্টিতে শোক নয়, অন্যকিছু ছিলো, সেটা মান্নান সাহেবের ভালো লাগেনি। আর কোনো কথা না বলে সে ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়। ও টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবিতাগুলো গোছাতে থাকে। এলোমেলো হয়ে আছে পুরো টেবিল। টেবিলের ওপর একটি রঙিন মাছি ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায়। ওর লাল মাথা, নীল চকচকে শরীর, ছয়টি কালো পা, সাদা রঙের ডানা, নিমেষে উধাও হতে পারে যে কোনো মহাদেশে, যা ওর কাছে স্বপ্ন। মাছিটা দেখতে সুদর্শন, ও নারী না পুরুষ বোঝা যায় না। নসিব মাছিটার সঙ্গ উপভোগ করে। কারণ ওটা এখন কাগজ, কলম, এ্যাসট্রে, খালি চায়ের কাপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে– কখনো দ্রুত উড়ে এসে নসিবের মুখের সামনে কিংবা মাথার পাশ দিয়ে বোঁ করে উড়ে যায়। ও কি নিশাত হয়ে এসেছে? ও কি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মেঘ, প্রিয়ার কাছে বয়ে নিয়ে যাবে প্রিয়তমের বার্তা? কবিতাগুলো রাখার জন্য ড্রয়ার খুললে ওটা ড্রয়ারে ঢোকে। নসিব ড্রয়ারে কবিতা না রেখে ড্রয়ার বন্ধ করে দেয়। মুহূর্তে ওর অনুভূতি পাল্টে যায়। আসলে ওটা তো একটা নোংরা জীব। এটা এই দেশের মতো– রঙিন, ফুরফুরে– কিন্তু আপাত সরলতার অন্তরালে একে কুৎসিত করে রেখেছে একদল মানুষ। এখন এই মাছিটাকে ধরে ও যেমন টান দিয়ে ডানা ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তেমন ইচ্ছে হচ্ছে এই দেশের বহিরাবরণটুকু টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। বেরিয়ে আসুক এর আসল অন্তর, উড়ে যাক মালিন্য। ও কবিতাগুলো নিয়ে বিছানায় আসে। খাটময় ছড়িয়ে রাখে কাগজগুলো। পড়তে চেষ্টা করে, পারে না। দরিদ্র, বুভুক্ষ সামরিক শাসনপীড়িত এই দেশ। বিদেশী সাহায্য না পেলে ছয়মাসও টিকে থাকতে পারবে না। সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে এ দেশের মানুষ, পরিণত হচ্ছে নোংরা, খুঁটে-খাওয়া কীটে। কি এর ভবিষ্যৎ? কে টেনে তুলবে তার এই সাধের, স্বপ্নের, সৌন্দর্যের, মমতার পূর্ব বাংলাকে? কবিতাগুলোর দিকে তাকালে ওর বমি পায়। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে সেগুলো। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

BanglaBook.org

কোথায় যাবো? ও হাঁটতে থাকে। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিছু লোক। প্রচণ্ড রোদ মাথার উপর। নিশাত এখন কি করছে? বাবার মৃত্যুর খবরটা ওকে দেয়া দরকার। ও কি যাবে নিশাতের বাসায়? না, থাক। কোনো বাসা নয়। চারদিকে নিজেকে খুঁজে ফেরাই আজ জরুরি। ও কেন ছদ্মনামে নিজেকে আড়াল করে? আড়াল করি কি? আমি তো নিজেকে প্রকাশ করি, যে প্রকাশের তাড়নায় একজন লেখক ব্যাকুল হয়– যে ব্যাকুলতায় পাঠক ছুটে আসে লেখকের কাছে। সাহিত্য মানুষের তেমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে যে আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অন্য জীবনের বাসনায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখনো তো এ দেশে অসংখ্য মানুষ আছে যারা ক্ষমতাবানদের হাতের পুতুল, যাদের চাওয়া-পাওয়া সীমিত, যারা আকাশের দিকে মুখ রেখে কোনোরকমে জীবন কাটিয়ে দেয়। আমি কি তাদের দলে? কিছু কথা বলার তাগাদায় নিজেকে ছদ্মনামে আড়াল করি? দেশের এই অসুস্থ অবস্থায় আমি নিজেকে কোথায় খুঁজবো? নিজের মধ্যে ঈশ্বর আবিষ্কার করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেজন্য আমি একের মধ্যে অনেক হই। একক সত্তার মধ্যে বহুকে অনুভব করতে চাই। ফুটপাথের একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ও বলে ওঠে, সরি। লোকটি রেগে তাকায়। ওকে দেখে নসিবের ভয় করে। দশাসই চেহারার মানুষ, তেমন রুক্ষ চেহারা। লোকটি খেঁকিয়ে ওঠে, চোখে দেখে হাঁটতে পারেন না?

চোখ? এই শহরে তো কারো চোখ নেই।

কি বলছেন আপনি?

শহরটা যে সামরিক শাসনের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা তো কেউ দেখতে পায় না।

পাগল নাকি?

লোকটি নসিবের মুখের ওপর অবজ্ঞার হাসি হাসে।

আপনি আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

লোকটি রুখে দাঁড়ায়, কি বলতে চান আপনি? জানেন আমি আপনাকে পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে পারি।

নসিব শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, জানি। কারণ এখন অস্ত্র এবং পেশীর শাসন চলছে।

মনে রাখবেন, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না।

লোকটি ওর ওপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে চলে যায়। এই শহরে যারা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে, চড়া গলায় কথা বলতে পারে, বিনাদ্বিধায় পিষে ফেলতে পারে, তাদেরই জিত।

এর ওপর ভর করেই ওরা ঠাণ্ডা মাথায় একটি পুরো পরিবারকে খুন করার পরিকল্পনা করবে। খুন করে যখন ধরা পড়বে তারপর জবানবন্দী দিয়ে তাজুল ইসলামদের স্বাভাবিকই দেখাবে। অন্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেও তাজুল ইসলাম নির্বিবাদে পানি এবং চা খাবে। ওর চাপ দাড়ি সংবলিত চেহারায় খুনীর দৃষ্টি জেগে উঠবে। ও এতই স্বাভাবিক, এতই সহজ। তখন লৌহ নদীর ধারের নিদারাবাদ গ্রামে এই স্বাভাবিকতা হারিয়ে গিয়ে জেগে থাকবে আতঙ্ক। সন্ধ্যা হলে ভূতুড়ে এলাকা হয়ে যাবে, গা ছমছম করবে। এখানে কোনোদিন কোনো জনপদ ছিলো কি না, কেউ তা জানতে চাইবে না। শুধু হেঁটে যাবে তারা, যারা এই গ্রামের ছয়জন মানুষকে একটি ইঞ্জিন-চালিত নৌকায় করে ধোপাজুরি বিলের দিকে নিয়ে যাবে।

তখন গভীর রাত। আকাশে চাঁদ নেই। পেছনে পেছনে আসবে দেশী নৌকা। বিরজারাণীর বুকে দুই বছরের শিশু, কাঁদতে ভুলে যাবে। নসিব ভাবতে চায় যে এই অনির্দিষ্ট যাত্রায় সেই ছয়জন মানুষের মনে তখন কি রকম অনুভূতি হবে। ওরা কি চরম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ভগবানকে ডাকবে, নাকি সমস্ত ভাবনার ঊর্ধ্বে এক অসম্ভব শূন্যতা ওদের

BanglaBook.org

স্থবির করে রাখবে? লৌহ নদীর ধারের মাটির ঘরে শশাঙ্ক আর বিরজা তো ওদের পাঁচটি সন্তান নিয়ে সুখের সংসারই যাপন করতে চেয়েছিলো। ওদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো অন্যায় ছিলো না, কোনো জোর-জুলুমও না। কিন্তু কেন বাধ সাধবে সেইসব মানুষ, যারা ভাবে গায়ের জোরে দখল করে নিতে পারবে অন্যের সম্পত্তি? তাজুল ইসলামের মতো ঘাতকেরা চাইবে ওদের সম্পত্তি বাড়িঘর জমি। রটিয়ে দেবে যে, ওরা ভারতে চলে গেছে। এই কারণে দু'বছর আগে কৌশলে শশাঙ্ককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে সীমান্তের কাছে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে খুন করবে। তারপর মৃতদেহ কাঁধে করে ভারতের চেচুরিয়া গ্রামের একটি পরিত্যক্ত শরণার্থী ক্যাম্পের কূপের ভেতর ফেলে আসবে। কত স্বাভাবিকভাবে ঘটবে এইসব ঘটনা। তাজুল ইসলাম ও তার সঙ্গীরা এখানেই শেষ করবে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দু'টি ড্রাম, লবণ ও দুই মণ চুন কিনে নৌকায় এনে তুলবে। ওদের সঙ্গে থাকবে রামদা, লাঠি, বল্লম ও টর্চ। ধোপাজুরি বিলে আবদুল হোসেন ও ফিরোজ বিরজারাণীকে চেপে ধরবে, তাজুল ইসলাম রামদা দিয়ে বিরজারাণীর নাভি বরাবর পর পর তিনটি কোপ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করবে। বিরজারাণী দু'টুকরো হয়ে যাবে। এরপর আলী আজম ও ফিরোজ বড় মেয়ে নিয়তিকে চেপে ধরলে আবদুল হোসেন ওকে রামদা দিয়ে দু'টুকরো করবে। ধনু মিয়া দু'বছরের সুজনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। এরপর আলী মোহাম্মদ ও ফিরোজ বিরজারাণীর ছোট মেয়ে প্রণতিকে চেপে ধরলে আলী আজম দা দিয়ে কেটে টুকরো করবে। বাদশা ও হাবিব বিরজার অপর দু'টি ছেলেকে কেটে টুকরো করবে। টুকরো খণ্ডগুলো দু'টি খালি ড্রামে ভরে লবণ ও চুন দিয়ে ড্রামের ঢাকনা বন্ধ করে দেবে। হাবিব আর আবদুল হোসেন পানিতে নেমে ড্রাম দু'টি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবে। মানুষের টুকরো টুকরো শরীর বাঁধা থাকে বিলের জলে। যে জলে মাছ ধরে জেলে, শাপলা ফোটে, পানকৌড়ি ডোবে আর ওঠে, নৌকা করে নাইওর যায় নববধূ। চোত মাসে বিলের জল শুকিয়ে গেলে কাদাপানিতে পোলো নিয়ে মাছ ধরতে নামবে শত শত লোক। ওরা জানবে না মানুষের শরীরের টুকরো ডুবিয়ে রাখা হয়েছে বিলের জলে। সে বিলের পানিতে রক্তমাখা নৌকা ধুয়ে ফেলা হবে, রামদা ধুয়ে রেখে দেয়া হবে পাটাতনে। আবদুল হোসেন সে রামদা উঁচিয়ে অন্যদের শাসাবে। বলবে, এ ঘটনা ফাঁস হলে ওদের অবস্থা বিরজারাণীর মতো হবে। কিন্তু বিলের জল তো মানুষের শরীরের টুকরো ধরে রাখে না। জলে পাপ নেই, জলে পাপ লুকানো যায় না। ফাঁস হয়ে যাবে সব ঘটনা।

নসিব নিদারাবাদে ঘুরতে ঘুরতে আবার নিজের কাছে ফিরে আসে। এ কোন ভবিষ্যতে ও চলে গিয়েছিলো? কেন দেখতে পায় এমন নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের ছবি? তাহলে ঘুরেফিরে সামরিক শাসনই কি এদেশের ভাগ্য? এভাবেই মিশে যাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ? এখন তো এমনই হচ্ছে দেশজুড়ে। এই দেশের গ্রামগুলোতে অসংখ্য বেওয়ারিশ কুকুর আছে। ওরা একে অপরের মাংস ছিঁড়ে খায় না। যারা ছিঁড়ে খায় তারা মানুষ। নসিবের মুখ ভরে থুতু ওঠে। ওর খারাপ লাগতে শুরু করলে ও বাড়ি ফিরতে চায়। ঐ লোকটির সঙ্গে ধাক্কা না লাগলে ও ভবিষ্যতের নিদারাবাদ যেত না। এইভাবে চলে যাওয়া ওর অভ্যেস। ও ভাবলো, আমি যতই শেক্সপিয়র বা পুশকিন হই না কেন, এই শহরে বসবাস করলে শেষ পর্যন্ত বেওয়ারিশ কুকুর হয়ে যাওয়া আমার নিয়তি। কারণ, নিদারাবাদ আমার স্বদেশ। আমি তাজুল ইসলাম, আবদুল হোসেনদের বাইরে কোথায় যাবো? ওরা আমার বন্ধু, প্রতিবেশী, পথ চলার সঙ্গী এবং প্রতিদিনের চেনা। নসিব অবসন্নের মতো নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়।

মান্নান সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে মান্নান সাহেবকে দেখতে পেয়েছিলো ও। চেক লুঙি পরণে, সাদার ওপর নীল চেক। গায়ে সাদা হাফ শার্ট। ডান

BanglaBook.org

হাতের তিনটে আঙুলে তিনটে তিন রঙের পাথর বসানো রূপোর আংটি। গভীর বিশ্বাস আছে ওগুলোর ওপর। ভাত খাবার সময় খুলে রাখে। ওগুলো হাতে রেখে নাকি ভাত খেতে হয় না। কখনো পাথরে চুমু খায়। লোকটা যখন রোগা, গাল-ভাঙা চেহারার ছিলো, তখনই নসিবের ভালো লাগতো। এখন মোটা হয়ে নাদুস-নুদুস হয়েছে, দেখতে খাসী খাসী লাগে। মেদ-সর্বস্ব লোক নসিব সহ্য করতে পারে না। ও কাছে আসতেই বিগলিত হাসি হাসে, যেন কত জনমের আপন ও।

কোথায় গিয়েছিলে বাবা?

এমন কোথাও নয়। খানিকটা ঘুরে এলাম।

নসিব বারান্দায় উঠে যায়। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খোলে। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। ও জামা-জুতো খুলে ঘরটা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ু নিয়ে আসে। এলোমেলো নোংরা ঘর দেখলে ওর গা চিড়বিড় করে। ঝাড়ুর মাথায় উড়ে যায় ছিঁড়েফেলা কবিতাগুলো। রাত জেগে যে ফসল ও তৈরি করেছিলো সেগুলো ও অবলীলায় ঝাড়ুর মাথায় উড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবে, কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করে না কেন? কোনো পিছুটান অনুভব করি না, কোনো মানুষ কিংবা বস্তুর জন্য? যে লেখাগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি তার জন্য আমার কত দিন ও রাতের উষ্ণ প্রতীক্ষা ছিলো। কেউ তো জানে না, যখন কবিতা লিখি তখন আমি ঈশ্বর হই এবং অলৌকিক জগতে প্রবেশ করি। মহাকাশের তারার মতো আমি পঙক্তির বিন্যাস ঘটাই। তবু সবকিছুর শেষ আমার এভাবেই হয়। আমি এমনই মানুষ। আমি দেখতে চাই কিভাবে লোভ থেকে দূরে থাকা যায়। সে লোভ ক্ষমতার, সম্পত্তির, খ্যাতির এবং যা কিছু ছোটখাটো তারও; আমি জানি লোভ পাপ এবং পাপ এক ধরনের নেশা। মাদকদ্রব্যের মতো আচ্ছন্ন করে, কিন্তু নেশার পর শুরু হয় যন্ত্রণা।

ঝাড়ু দিয়ে গোসল শেষ করলে এক গামলা ভাত এবং দুটো রকমের তরকারি নিয়ে ঘরে আসে মান্নান সাহেব। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত নসিব হাফিজুদ্দিন প্রথমে খুশি হয়, পরে গম্ভীর।

আপনি কষ্ট করতে গেলেন–

মান্নান সাহেব দ্রুত জবাব দেয়, কোনো কষ্ট নয় বাবা। এ আমার কর্তব্য। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে–। থাক, আমি যাই। তুমি খেয়ে নাও বাবা।

আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ, আমি খেয়েছি। আমি আবার গ্যাস্টিকের রুগী তো নিয়ম মতো খাই।

ভালো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সবার উচিত।

মান্নান সাহেব হে-হে করে হেসে বলে, মাঝে মাঝে তুমি এত ভালো কথা বলো। মাঝে মাঝে তুমি কেমন যেন উল্টোপাল্টা করো। তোমাকে তখন বোঝা দায়।

মান্নান সাহেব ওর মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে। নসিব মৃদু হাসে। তার কথার কোনো জবাব দেয় না। প্লেটে ভাত বেড়ে নেয়। চমৎকার রান্না। ক্ষুধার মুখে গোগ্রাসে খেতে থাকে। বলে, কাল রাত থেকে আমি তেমন কিছু খাইনি। সেজন্য আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করছিলো। রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিলো। ওর কথা শুনে আমার নিদারাবাদের ছয়টি খুনের কথা মনে হয়েছিলো।

নিদারাবাদ? ছয়টি খুন? এসব আবার কি কথা?

এটা একান্তই আমার কথা, তাছাড়া আমার বাবা মারা গেছে, মাথাও তেমন ঠিক নেই, আমার মনে হয় আমরা যারা পিতা-মাতার বৈধ সন্তান, আমরা স্বাভাবিক নিয়মে কিছু করতে পারছি না।

মানে কি বলতে চাও?

BanglaBook.org

মান্নান সাহেবের চোখ কপালে উঠতে থাকে।

আপনি তো জানেন, বাবা মারা গেলে মানুষ শোকের সাগরে ভাসে। মানুষ স্বাভাবিক থাকে না, সেজন্য আমি ভালো কিছু ভাবতে পারছি না। আমার মনে হয় একটা কিছু বড় পরিবর্তন দরকার। এই সামরিক শাসন বেশিদিন চলতে পারে না। কিন্তু এখানে এটা চলছে। যা কিছু ঘটেছে তা বড় যান্ত্রিক, বড় প্রাণহীন। এর জন্য আমাদের জন্মের স্বাভাবিকতাই দায়ী।

মান্নান সাহেব চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, কি বলতে চাও তুমি?

পুরো একগ্রাস ভাত কোত করে গিলে নসিব বলে, আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম বদলাতে হবে। আমি এখন গভীরভাবে সেটা ভাবছি।

সেটা কি?

ভাবছি সেটা হলো বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন।

ইডিয়ট।

মান্নান সাহেব রাগে থরথর করে কাঁপে। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। তোতলাতে তোতলাতে বলে, বাপের জন্মেও এমন কথা শুনিনি। তুমি এত নষ্ট হয়েছো তা আমার জানা ছিলো না।

সামরিক শাসন ঘাড়ের ওপর চেপে থাকলে তো মানুষ নষ্টই হয়। তাছাড়া আমার বাবা মারা গেছে আমার তো মাথার ঠিক নেই।

নসিব আবার মনোযোগ দিয়ে ভাত খেতে শুরু করে। মান্নান সাহেবের দিকে তাকায় না। সব তরকারি ভাত চেটেপুটে খেয়ে ফেলে। বাপ-ছেলের সংসারে এমন উপাদেয় খাবার তৈরি হয় না।

মান্নান সাহেব যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার চাচি বলছিলো যে, তুমি একা হয়ে গেছো দেখেশুনে তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দিতে। আমার আত্মীয় একটি মেয়েও ছিলো। কিন্তু এখন দেখছি তোমার মতো ইডিয়টের কাছে বিয়ে দেয়া বোকামি।

সেজন্যই আমি যাকে ভালোবাসি সে আমাকে বিয়ে করতে চায় না। বলে, ওকে ওর ভাইবোনদের দেখতে হয়, তাই ওর পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। ও বন্ধু হতে পারে কিন্তু স্ত্রী নয়।

ওর কথা শেষ হবার আগেই মান্নান সাহেব বেরিয়ে যায়। নসিব হো-হো করে হাসে। মান্নান সাহেবের ইচ্ছে ওকে আত্মীয় বানানো। বিচিত্র মানুষের সাধ– এক জীবনে কি সব সাধ পূর্ণ হয়? ও বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে আসে। গামলা-বাটি গুছিয়ে রাখে। বাবার ঘরে ঢুকে কৌটো খুলে এক টুকরো সুপোরি মুখে পোরে। বাবাকে দাফন করার পর এই প্রথম ও এই ঘরে এলো। একজন মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তার সবই তো এ ঘরে আছে, শুধু যার জিনিস সে নেই। ও এখন কি করবে? কি করা উচিত? নিশাত থাকলে ও বলে দিতো কি করতে হবে। নিশাত খুব স্বাভাবিকভাবে একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারে, যেটা ও পারে না। সুতরাং নিশাতের জন্য অপেক্ষা করাই ভালো। ও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। পানদানিতে পানগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। এগুলো ফেলে দেবে কি? নিতে গিয়ে আবার রেখে দেয়। থাক নিশাত আসুক। ও কি নিশাতের ওপর বেশি নির্ভর করে? এটা কি ঠিক হচ্ছে? ওকে তো ওর বাবার মতো একাও থাকতে হতে পারে? তখন ও কি করবে? নসিবের মন খারাপ হয়ে যায়। কেন ও বুঝতে পারে না। আসলে ও জানে না নিশাত ওর জীবনে থাকবে কি থাকবে না। পানদানিতে পানগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, কথাটি কবিতার পঙক্তির মতো বলতে বলতে চুপচাপ ঘর থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসে। পাশের বাসার কাজের ছেলেটি এসেছে গামলা-বাটি নিতে। ছেলেটি কিছুটা বোকা, তাই সরল। ঢুকেই একগাল হেসে বলে, সাহেব আপনারে ধুইয়ে কিছু থোয় নাই।

নসিব ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, কি বলেছে?

কইছে আপনে একটা বেজন্মা।

ঠিকই বলেছে।

কি কন? ঠিকই কইছে?

হ্যাঁ, একদম ঠিক।

আপনের বাপ আছিলো না?

বাপ থাকলেই কি আর জন্মের ঠিক থাকে! বুঝলি কালু, আমি বেজন্মা হলেই খুশি হতাম। আমিও চাই বেজন্মাদের দিয়ে দেশ ছেয়ে যাক।

ধুত আপনে যে কি কন? এর লাইগা সাহেব বাসায় গিয়া এত রাগ করতাছে। আপনের মাথার ঠিক নাই। আসলেই আপনি একটা উন্মাদ।

কি বললি? উন্মাদ? হো-হো করে হেসে ওঠে নসিব। কোথা থেকে শিখলি শব্দটা?

সাহেবে কয়।

সাহেবে বললে তুইও বলবি?

কালু বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকে। নসিব গলা নামিয়ে এমনভাবে কথাটা বলেছে যে সেটা ওর বুক ছুঁয়ে গেছে। ও চোখ ছলছল করে নসিবের দিকে তাকায়। নসিব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ঠিক আছে তোর যা খুশি তাই বলিস। আমি কিছু মনে করবো না। মনে করবোই বা কেন? মানুষইতো মানুষকে নিয়ে কত শব্দ বানায়। নিজের ইচ্ছেমতো তা আবার ব্যবহারও করে। কি বলিস?

কালু কিছু না বুঝে মাথা নাড়ে। থালাবাসন গোছাতে থাকে। ওর দিকে তাকিয়ে নসিবের মায়া হয়। বলে, কালু তুই মিছিলে যাস?

যামু ক্যামনে? বেগম সাহেব যা কড়া। বাইর অইতে দ্যায় না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাসার কামের পোলার আবার মিছিল কি?

তুই মিছিলে যেতে চাস?

চাই-ই তো।

কেন? মিছিলে গিয়ে কি হয়?

মিছিলে গেলে নিজেগো দাবির কথা কওন যায়।

কার কাছে বলবি? কে শুনবে? যারা শোনার তারা তো নিজেদের পকেট গোছাতে ব্যস্ত।

কালু আর কথা না বাড়িয়ে গামলা-বাটি নিয়ে চলে যায়। বারান্দা পেরিয়ে ও আবার ফিরে আসে।

বেগম সাহেবে কইছে রাইতেও আপনেরে ভাত পাডাইবো।

কেন? আবার রাতে কেন?

বুইঝলেন না, সাহেব রাগ করলে কি হইবে বেগম সাহেব কিন্তু আশা ছাড়ে নাই।

কীসের আশা?

ক্যান আপনের লগে হ্যার কোন আত্মীয়ের মাইয়ার য্যান বিয়া দিবো। রোজ সাহেবের লগে এই এক কথা কয়।

কালু খুব অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। তারপর গলা নামিয়ে বলে, আমার কথা য্যান আপনে আবার কইয়েন না।

BanglaBook.org

ও গেট পেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। কণ্ঠস্বর নিচু করে একই ভঙ্গিতে বলে, আপনের কাছে যে এক মেমসাহেব আহে হেইডা কিন্তু আমি দেহি।

ও তো আমার বন্ধু।

কালু চোখ কপালে তোলে, বন্ধু? মাইয়ামানুষ আবার বন্ধু হয় নাহি?

হয় না? তো কি হয়?

কালু খি-খি করে হাসে। হাসতে-হাসতে চোখ-মুখ কুঁচকে যায়, ওর শরীর দোলে। তারপর একই ভঙ্গিতে বলে, কি যে হয় হেইডা তো কওন যায় না।

ওর ভঙ্গি দেখে নসিবেরও হাসি পায়। কালু একরকম দৌড়ে চলে গেলে নসিব ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ওর ঘুম পায়।

পরদিনও অফিসে যেতে ভালোলাগে না। ও কি করবে? এই ঘরটা ওর গুহার মতো মনে হচ্ছে। এটা ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। কোথায় যাবো? মিছিলে–অজস্র মানুষের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে রাজপথ প্রদক্ষিণ? তারপর ক্লান্ত হয়ে আবার ঘরে ফেরা? দিনশেষে হরতাল সাকসেসফুল হলো বলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া? আত্মতৃপ্তি সহকারে হাজার হাজার রাজা-উজির মারা! তারপর কি? আমি যে তারপর চাই। হাজার হাজার তারপর–তারপর। উড়ে আসবে হাজার পুশকিন। প্রত্যেকের পকেটে থাকবে বিপ্লবের কবিতা। আমি বাপের বৈধ সন্তান। কিছুই করতে পারি না এ দেশের জন্য। তাহলে আমি বেশ্যার ঔরসে জারজ সন্তান উৎপাদন করে দেখি না কেন? জারজ সন্তানে ভরে যাক দেশ এবং তারাই আনুক একটা পরিবর্তন।

নিশাত আমার স্ত্রী হবে না। আমার সন্তানের মা হতে ও রাজি নয়। ভালোবাসায় ওর তেমন একটা বিশ্বাস নেই। সম্পর্ক রাখার জন্য ও ভালোবাসা শব্দটিকে ব্যবহার করতে চায়। ও বিশ্বাস করে সম্পর্কের দেয়া-নেয়ার। ও বলে, এর উপর নির্ভর করেই এই যান্ত্রিক সভ্যতা চলছে। সুতরাং আবেগের বেশি বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। নিশাত স্পষ্ট কথা বলতে ভালোবাসে। ওর মধ্যে কোনো ন্যাকামি নেই। সে জন্য নসিব ওকে পছন্দ করে। ওর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আকর্ষণীয়। নিশাতের সর্বত্র রুচির দীপ্তি আছে। ও বরাবরই আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার। বলে, এই শহর আন্দোলনের শহর। আন্দোলন করেই জনগণের অধিকার আদায় করতে হয়। কবে দেখেছো যে রক্ত না ঝরিয়ে এখানকার মানুষ কোনো কিছু আদায় করতে পেরেছে?

নিশাতকে সামনে রেখে ও কথা বলে, সবই তো সত্যি নিশাত, কিন্তু এখন কি হচ্ছে? কবে আমরা এই সামরিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি পাবো? কবে, কবে?

নিশাত কাছে নেই যে জবাব দেবে। ফলে ঘুরেফিরে নসিবকে ঘর-বারান্দা এবং রাস্তা করতে হয়। ওর বাসার পাশে একটা ছোট খালি জমি আছে। জমির মালিক মোল্লা সাহেব। পঞ্চাশের ওপর বয়স। লুঙ্গি এবং গেঞ্জি গায়ে ঐ জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নসিব দূর থেকে তাকে দেখে। একটা এ্যাকসিডেন্ট করার পর মোল্লা সাহেবের পায়ে খুঁত হয়েছে, সামান্য খোঁড়াতে হয়। সেজন্য ডান হাতে লাঠি রাখে। লাঠির ওপর ভর না করলে হাঁটতে পারে না। ডান হাতে লাঠি এবং বাম হাতে টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলিয়ে অফিসে যায়। বেশ অসুবিধে হয় তার। নসিবের বাবা মারা যাবার পর এই লোকটি ওর কোনো খোঁজ নিতে আসেনি। তার আত্মীয়ের মেয়ে নেই বলে কি? নাকি ওর বাবার খবর জানে না? রাস্তায় দু'চারটে কথা ছাড়া ওর সঙ্গে তেমন আলাপও হয় না। আজ মোল্লা সাহেব নিজে থেকেই এগিয়ে আসে।

কেমন আছেন নসিব সাহেব?

জ্বী ভালো। আপনি ভালো তো?

BanglaBook.org

আমার আর শরীর। বেশির ভাগ সময় খারাপই থাকে। আপনার বাবা কেমন আছেন? তিনি শান্তির ঘুম ঘুমুচ্ছেন।

আসলেই ঘুম আসাটা একটা শান্তির ব্যাপার। আমি তো বলি আল্লাহর আশীর্বাদ। আমার সহজে ঘুম আসে না। এই আর এক রোগ। আপনার আব্বাকে আমার সালাম দেবেন।

মোল্লা সাহেব খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে চলে যায়। মাথার মধ্যে প্রবল ক্রোধে নসিবের সামনে সবকিছু ধোঁয়াটে হয়ে থাকে। কেন ও নিজের ওপর রেগে যাচ্ছে? ও তো সহজে ওর বাবার মৃত্যুর খবরটা দিতে পারতো। মোল্লা সাহেবকে এমন একটি খবর নিজে থেকে শুনে নিতে হবে। এমন দাবিটা কি অযৌক্তিক নয়? নিজের আত্মসমালোচনায় ভেতরটা কুঁকড়ে আসে। বারান্দায় ফিরে এলে মান্নান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। মান্নান সাহেব বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলো। দু'দিন ঘরে থাকার ফলে তার চামড়ার ভাঁজে এক পরত চর্বি জমেছে– চেহারা আরো ফুলো-ফুলো দেখায়। ভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। নসিব মান্নান সাহেবের সঙ্গে কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঐ চেহারা দেখে ওর মুখ ভরে থুতু ওঠে।

ও ভেবে পায় না ক্রোধ কার ওপর। যারা সামরিক শাসনকে মেনে নিয়েছে তাদের ওপর নাকি ঐসব নপুংসক নাগরিকদের ওপর, যারা শুধু ঘুমুতে চায়! ক্রোধ বাড়তে থাকলে ওর মাথার মধ্যে একটি রাজপথ জেগে ওঠে, দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। স্বাভাবিক জন্মের মানুষগুলো জারজ হয়ে গেছে– ওদের দিয়ে আর কিইবা হবে, ও ভাবতে ভাবতে টেবিলের ড্রয়ার খোলে। রঙিন মাছিটি মরে পড়ে আছে। ওর ডানার উজ্জ্বল রঙে তখনো সোনালি আভা। ও মস্তিষ্কের রাজপথের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। শূন্যে হাত ওঠায়, বলে, আমি শত শত জারজ সন্তান চাই, যাদের সামাজিক স্বীকৃতি নেই। যাদের কেউ গণ্য করে না, যারা সমাজের অপাংক্তের প্রাণী। অথচ তাদের আজ বড় বেশি প্রয়োজন, তারাই একটা বড় পরিবর্তন আনতে পারবে।

আমি অমিতাভ গফুর এবং অসীম রায়হানের মধ্য দিয়ে একটি জারজ সন্তানে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি। আমি আর নসিব হাফিজুদ্দিন নই। আমার মা জানে না কে আমার পিতা। আমি এখন একটি দীর্ঘ রাজপথের বিশাল মিছিলে যাচ্ছি। আমি এই শহরটাকে বাহান্নোর মতো আন্দোলনের শহর হয়ে উঠতে দেখতে চাই।

BanglaBook.org

৪

যে পরিস্থিতি চেপে বসে বুকের ওপর– ঘনীভূত করে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, তাকে ঝেড়ে ফেলে বেঁচে ওঠার চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হয় মানুষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে পিছু হটার জায়গা থাকে না, তখনতো সামনে এগুতেই হবে। নসিব হাফিজুদ্দিনের মতো হাজার মানুষের মনে ক্ষোভ যেমন বারুদে রূপান্তরিত হতে থাকে, তেমনি রাজনীতিবিদরাও আন্দোলন শুরু করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ গোপন বৈঠক হয়। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি হিসেবে ঠিক হয় সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে বিবৃতি দেবেন।

একই সঙ্গে ছাত্র সমাজও আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং আন্দোলন গড়ে তোলা দুঃসাহসের কাজ জেনেও গোপন বৈঠকে মিলিত হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা। ঠিক হয় বাষট্টির একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত করতে হবে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। আইয়ুব খানের গোয়েন্দা সংস্থা সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক তৎপরতার খবর টের পেয়ে যায়। ফলে খুব দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে ত্রিশে জানুয়ারি তাকে করাচিতে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন কাগজে এই খবর বেরুলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ঢাকায়। ঐদিন রাতে মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বৈঠক বসে।

পরদিন স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমতলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবে যায়। সরকারি পত্রিকা অফিসে আগুন দেয়। কোনো কোনো ছাত্রনেতা বক্তৃতা করে। সামরিক শাসনের দীর্ঘ চার বছর পর প্রথম রাজপথে মিছিল। এক নাগাড়ে পাঁচ দিন বিক্ষোভ, সমাবেশ চলতে থাকে। নগরীর দেয়ালে গভীর রাতে স্লোগান লিখে ভরে ফেলা হয়– বড় বড় কালো হরফগুলো যেন এক বিশাল প্রতিবাদ। লেখা হয় 'ডাউন উইথ মার্শাল ল', 'সামরিক শাসন নিপাত যাক।'

নসিব হাফিজুদ্দিন বিস্ফারিত চোখে ছাত্রদের মিছিলের দিকে তাকিয়ে থাকে–ওহ্ মিছিল, মিছিল। এই আন্দোলনের শহরে ছেলেরা বাধ ভেঙেছে।

শেষ রাত পর্যন্ত দেয়াল-লিখন লিখে ক্লান্ত প্রদীপ্ত নসিবের বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। না, ওর ঘুম পায়নি, চায়ের পিপাসা পেয়েছে– ওর বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার। সামরিক শাসন নিপাত যাক লেখা হয়েছে– এ খবরটি নসিবকে না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। দরজা খুলে নসিব চেঁচিয়ে ওঠে, ওহ্ কি খবর মিছিলের ছেলে? এসো, এসো, ভেতরে এসো। এমন দুঃসাহসী মানুষের অপেক্ষায় ছিলাম। আমিও তোমার সঙ্গে মিছিলে যাবো প্রদীপ্ত।

প্রদীপ্ত হো-হো করে হাসে।

তারপর হাত উঁচিয়ে বলে, দেয়াল-লিখনে ভরে গেছে শহর নসিব ভাই, ডাউন উইথ মার্শাল ল।

নসিব ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ঘরের ভেতর ওকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, এমন খবরের অপেক্ষাতেই তো আছি প্রদীপ্ত। এই শহর তো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার শহর নয়।

নসিব ভাই মনে হচ্ছে নাকি আজ একটা বিজয়ের দিন?

হচ্ছে, হচ্ছে। যাও ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি চা বানাচ্ছি।

ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে প্রদীপ্ত। রাতজাগার ক্লান্তি ধুয়ে যায়। ও জানে বিশ্ববিদ্যালয় চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে। তিন তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মনজুর কাদেরকে যেভাবে নাজেহাল করা হয়েছে তার জের সহজে মিটবে না। তবু ওর বুকভরা আনন্দ। সামরিক শাসনের যাঁতাকলের নিগড় থেকে মাথা তুলতে পেরেছে ওরা। অনেকেই ভেবেছিলো এ কাজটি খুব সহজ কাজ নয়। সামরিক শাসন এক কঠিন শাসন। খানিকটুকু হলেও যে বেড়ি ভাঙা হলো তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মাথা সোজা করে হাঁটতে হবে, দৌড়ুতে হবে।

ও বাথরুম থেকে বেরুতেই নসিব বলে, তোমাদের এই আন্দোলন সামরিক শাসন সম্পর্কে জনগণের ভয়ভীতি ভেঙে দেবে।

ঠিক বলেছেন। আমার ধারণা এরপর আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে যদি আরো বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে তাহলে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেবে।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত আমার বুক ভরে যাচ্ছে, আমার বুকের ভেতর থেকে ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা নিদারাবাদ গ্রাম মুছে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি আমার প্রিয় শহরটি ফিরে পাচ্ছি। সেই বাহান্নোর শহর, যে শহর আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

কথা বলতে বলতে নসিব প্রদীপ্তকে ডিম-পাউরুটি আর চা দেয়। পরপর দু'কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়ে প্রদীপ্ত। বলে, আমি এক ঘণ্টা ঘুমুবো। তারপর জাগিয়ে দেবেন। আটটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছুতে চাই।

সেদিন রাতেই হঠাৎ করে ঘোষণা করা হলো ছয় তারিখ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। গ্রেফতার করা হয় 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। কার্জন হল প্রাঙ্গণে কয়েক হাজার ছাত্র সমবেত হয়। প্রতিবাদ সভার পর বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে– রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। আইয়ুব খান ঢাকায়, সুতরাং নিরাপত্তা প্রয়োজন। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত এলাকা– সামরিক শাসনের বেড়ি ভেঙে ফেলেছে ছেলেরা– এখন দোর খোলার পালা। শহর ঘুরে মিছিল ফিরে এলে কার্জন হলের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। উপাচার্য ড. মাহমুদ হোসেন ছাত্রদের দেখতে এলে পুলিশের ইটের আঘাতে আহত হন। সেনাবাহিনীর জি.ও.সি. ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় ছাত্ররা তাকে ধাওয়া করে, তার ড্রাইভার আহত হয়। পরদিন আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচি নেয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনী রাস্তায় টহল দেয়। কার্জন হল ও হাইকোর্টের সামনে দু'টো ফিল্ড কামান বসানো হয়েছে।

চারদিন এমনভাবে ঘেরাও করা হয়েছে যেন ছেলেরা বেরুতে না পারে। ছাত্ররা, যেমন কুকুর তেমন মুগুর, এই ভেবে কৌশল অবলম্বন করে। ওদের মিছিল ঢাকা হলের ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ঢোকে। সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজের মধ্য দিয়ে বক্সিবাজার হয়ে পুরনো ঢাকায় ঢুকে যায়– স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা, সামরিক শাসন নিপাত যাক।

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে হাটখোলা রোডে এলে পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে। প্রদীপ্ত ডান কাঁধে ব্যথা পায়, মৃদু চিনচিনে ব্যথা ছড়াতে থাকে শরীরের ভেতর। ও আমল দেয় না। ওর মাথার ভেতরটা স্বচ্ছই থাকে, মনে হয় ঐ ব্যথা ওর মাথা ছুঁতে পারবে না– আর মাথা ছুঁতে না পারলে ও কখনোই ক্লান্ত হবে না। ও নসিবের মতো হতাশ হবে না, মানসিক ভ্রমণে বেরিয়ে যাবে না কোথাও– ওর সামনে জেগে থাকবে এই শহর, যেখানে দিনরাত জোনাকির আলো উড়ে উড়ে বেড়ায়– নেভে আর জ্বলে, জ্বলে আর নেভে। সে আলো মালার মতো গাঁথা হলে সেটা পেরিয়ে যাবে শহরের সীমানা– বাড়তে থাকবে, বাড়তে থাকবে– চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ, মহানন্দা ঘুরে ঘুরে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর– ঘুরে ঘুরে এ দেশের বিচিত্র জনপদ। প্রদীপ্তর মাথা ছুঁয়ে যায় বরিশালের বিশখালি নদী–যে নদীর পাড়ে মনু মিয়ার বাড়ি, যে মনু মিয়া আদমজী পাটকলের শ্রমিক হয়ে মিছিল করতে চায়। প্রদীপ্ত দেখতে পায় লাঠিচার্জের সামনে পড়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ওকে ফিরতে হয় বাড়িতে। বিকেলে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সভা বসে ঢাকা হলে। রাত বাড়তে থাকে, কিন্তু সভার কাজ শেষ হয় না– ছাত্ররা উত্তেজিত। ঘটনার তীব্রতায় ওরা মারমুখি হয়ে ওঠে– কর্মসূচি ঠিক করে। সে রাতে পুলিশ আর সেনাবাহিনী হল ঘেরাও করে। ছাত্রদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়। অসংখ্য ছেলেকে গ্রেফতার করে। প্রদীপ্ত গ্রেফতার হয়। ছেলেদের প্রথমে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়, তার পর সেখান থেকে

BanglaBook.org

জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। খবর পেয়ে দেখা করতে আসে আলী আহমদ, এর মধ্যে দু'দিন পেরিয়ে গেছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাবাকে দেখে চমকে ওঠে প্রদীপ্ত। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্ত দেখতে পায়, বাবার বয়স বেড়ে গেছে। দুশ্চিন্তায় বাবা ভীষণ ক্লান্ত। ওর মায়া হয়, কিন্তু নিজেকে শক্ত রাখে। অন্যদিকে মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কুখুস্কু চেহারা, চোখজুড়ে রাত জাগার ক্লান্তি সত্ত্বেও প্রদীপ্তকে সজীব মনে হয় আলী আহমদের– ও ভাঙেনি, মচকায়নি, ক্লান্ত হয়নি। ও বাবার হাত চেপে ধরে বলে, বাবা ভয় পেয়ো না।

ছলছল করে আলী আহমদের চোখ– শুধু বলে, আমি তো পোড়খাওয়া মানুষ রে–

প্রদীপ্ত আবারও শক্ত গলায় বলে, ভয় পেয়ো না বাবা। বেঁচে থাকা এমনই। আমি জীবনকে শক্ত মুঠোয় নিয়েছি। মোকাবেলা করার সাহস আমার আছে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না আলী আহমদ, চোখ নামিয়ে ফেলে। সময় কম। চারদিকে সামরিক আইনের কড়াকড়ি। আলী আহমদ বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না। ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবে, ছেলের কাছ থেকে শুনতে হলো জীবন কেমন, তার কথা। জীবনবোধের দিক থেকে ছেলে কি ওকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে? কত গভীর ওর অনুভব? কত তীক্ষ্ণ? ও জানে প্রদীপ্ত ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। রাজনীতি ওকে কত দূর নিয়ে যাবে?

ঘরে পুষ্পিতা কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়েছে। প্রতীকের মুখ শুকনো। আলী আহমদ ওদের দিকে তাকিয়ে অবসন্ন বোধ করে। তারপর বলে, ও ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই। পুষ্পিতা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আলী আহমদ বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওর কাপড় ছাড়ার ইচ্ছে নেই, জুতোও খোলা হয় না। বারবার মনে হতে থাকে, ছাত্র-রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী মফিজুলকে বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, লাশটিও না। ও তখনই নিশ্চিত হয়েছিলো যে মফিজুলের লাশ পুলিশ গুম করেছে। অনেকদিন পর মফিজুলের কথা মনে করে আলী আহমদ কেঁদে ফেলে। দ্রুত ও পাশ ফিরে শুয়ে চোখের জল আড়াল করে। পুষ্পিতাকে ও চোখের জল দেখাতে চায় না। ভাববে হয়তো কোনো বড় ঘটনা আছে যেটা ওর থেকে আড়াল করা হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে ও যদি মফিজুলের কথা মনে করে তা শুনলে পুষ্পিতা শোকার্ত হয়ে যাবে। এটা একটা শোকের বাড়ি হোক আলী আহমদ তা কিছুতেই চায় না। ও হাতের তালুতে চোখ মোছে। শুনতে পায় বারান্দায় বসে প্রতীক গুনগুন করছে, 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি'–। আলী আহমদের বুক উথলে ওঠে। ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদতে, কিন্তু পারছে না। বুকের ভেতর পাষাণ ভার, বুকের নদী কষ্টের পাথর ডিঙোতে পারে না। তাহলে শোক কি ওর বুকের ভেতরেই গুমরে মরবে? সেটাকে একলা ধারণ করা কি সহজ? এসব ভাবনার মাঝে প্রতীকের গলা উঁচুতে উঠতে থাকে– সে কণ্ঠ ধুয়ে দেয় যন্ত্রণা– সে কণ্ঠ নদীর মতো প্লাবিত করে, সৌরভ ছড়ায়। আলী আহমদ বিছানায় উঠে বসে। টান দিয়ে শার্ট খোলে এবং জুতো খুলতে খুলতে প্রতীকের সঙ্গে গলা মেলায়।

গ্রেফতার, নির্যাতন ইত্যাদি সাময়িকভাবে ছাত্রদের দমিয়ে রাখলেও ভেতরে ভেতরে ফল্গুধারার স্রোত বইতে থাকে। ঘটনা থেমে থাকে না, সেটা গড়ায়, কখনো সহজ নিয়মে না গড়িয়ে উল্টো পথে যায়, তখনই গোল বাধে। কয়েকদিন আগে আইয়ুব খান নতুন সংবিধান জারি করেন। তিনি ষাট সালের জানুয়ারি মাসে তার মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে পঁচানব্বই শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

BanglaBook.org

তার দু'দিন পর শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই তিনি বাষট্টি সালের পয়লা মার্চ নতুন সংবিধান জারি করেন। সংবিধান অনুযায়ী এপ্রিল মাসের আটাশ তারিখ জাতীয় পরিষদের এবং মে মাসের ছয় তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্ররা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়– মধুর রেস্তোরাঁয় সমাবেশ হয়। নির্বাচনের বিরুদ্ধে 'শপথ দিবস' পালন করে। ছাত্র আন্দোলনের চাপে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্রদের দাবি বাড়তে থাকে– বন্দী ছাত্রদের মুক্তি, হুলিয়া প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি দাবির মুখে আন্দোলন জঙ্গী হয়ে উঠতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সামরিক শাসকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়।

আলী আহমদ ঘরে বসে পড়াশোনা করে– চুপচাপ দিন কাটে।

বাড়িতে প্রদীপ্তর কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই। ওর মনে হয় পুষ্পিতা ও প্রতীক যেন মেশিনের মতো হয়ে গেছে। খেতে বসলে প্রদীপ্ত– কাজের অবসর মানে প্রদীপ্ত। পুষ্পিতা সারাক্ষণ স্মৃতিচারণ করে– প্রদীপ্তর শৈশব, কৈশোর এবং একই সঙ্গে মালদহর কথা, রাজশাহীর কথা অনবরত শুনতে হয় ওকে। প্রতীক আগ্রহ নিয়ে শোনে– অনেক কথাই ওর কাছে নতুন, গল্পের মতো। এইসব শুনলে আলী আহমদের বুকের ভেতর চেপে আসে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নীলক্ষেতে কলাভবন নির্মাণের কাজ চলছে– ও হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে চলে যায়। ইট-কাঠের স্তূপের ওপর বসে থাকে ! তখন দার্শনিক ভাবনা পেয়ে বসে ওকে– এইসব নির্মাণ এবং এর অন্তরালে জীবনের প্রবাহ– মানুষ এবং মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলন এক হয়ে যায় ওর কাছে। ও নিজে পোড়খাওয়া মানুষ– সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছে ভিটে ছেড়ে, যে ভিটে পূর্বপুরুষের– যাকে নিয়ে গর্ব করে দেশ ও জাতি। ওর এখন নতুন জীবন– নতুন জীবনের নতুন নির্মাণ চলছে– ভিটেছাড়া মানুষের বুকের ভেতর একই সঙ্গে শোক এবং ক্রোধ থাকে। প্রদীপ্ত তরুণ, ও ক্রোধ আত্মস্থ করেছে– আলী আহমদ তারুণ্য পেরিয়েছে, ওর ভেতর শোক গাঢ় হচ্ছে– শোক গাঢ় হয়ে ওকে শক্ত শিলাতে পরিণত করছে। ও এখন নিজে প্রদীপ্তর জন্য এক শক্ত ভিটে, যে ভিটে নিয়ে প্রদীপ্ত এবং ওর বংশধরেরা, তারও পরে আরো অনেক প্রজন্ম প্রোথিত হবে মাটিতে– ওরা আর কখনো উদ্বাস্তু হবে না। কেউ ওদের ছিন্নমূল মানুষে রূপান্তরিত করতে পারবে না। কখনো না। চমকে ওঠে আলী আহমদ। কখনো না? বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি, কখনো না? না, এ সত্য নয়, এ মিথ্যা। মানুষের নিরন্তর চলা, নিরন্তর ওঠানামা মানুষকে ভিটে ছাড়া, দেশ ছাড়া করে। মানুষ পালায়– পালাতে থাকে– রাজনীতির বিষাক্ত ছোবল থেকে, যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে পালিয়ে গিয়ে মানুষ বাঁচতে চায়। যেটুকু প্রতিরোধ– তার ভেতরে শত মানুষ জীবন দেয়, শতজনের ভিটে রক্ষা করে। প্রদীপ্ত এখন ভিটে রক্ষার সংগ্রামে নেমেছে। এই সংগ্রাম করেই ও ওর বংশধরদের জন্য ভিটে শক্ত করবে। আলী আহমদের বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি থেমে যায়। ও বুঝে যায় যে প্রদীপ্ত ওর মতো পলাতক মানুষ হবে না।

ওর চারপাশে একঝাঁক ভয়শালিক কিচিরমিচির করছে– শব্দ রূপান্তরিত হচ্ছে ধ্বনিতে– ধ্বনি ওর শ্রবণকে করছে আলোকিত। ও একজন মুক্ত মানুষ– অবলীলায় হেঁটে যেতে পারে এপার থেকে ওপারে– পূর্ব থেকে পশ্চিমে– পৃথিবী থেকে ভিন্ন গ্রহে। ওহ্, কী আনন্দ– বুকের ভেতর জুলেখার মুখ ভেসে ওঠে– হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন চলে যায়, সামনে ফুলবাড়িয়া স্টেশন। ও রেলের শব্দের নিচে শোক চাপা দিয়ে রেললাইনের কাছে আসে। স্লিপারের ওপর পা রেখে অনেকদূরে হেঁটে যায়। দেখতে পায় বর্ধমান ভবনের সাদা

BanglaBook.org

দেয়াল রমনার সবুজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারও পরে কার্জন হল- লাল ইট। বুকের ভেতর আবার গুড়গুড় ধ্বনি- ট্রেন চলে গেলে মাটি যেমন কাঁপে তেমন- তখন ও গুনগুনিয়ে গায়- আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার।

ঘরে ফিরলে প্রতীক জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া কবে ছাড়া পাবে বাবা?

আলী আহমদ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, জানি না তো।

জেলে কি ওরা ভাইয়াকে মারে?

জানি না তো।

পাশ থেকে পুষ্পিতা ফোঁস করে ওঠে, ওহ্, তুমি কিছুই জানো না। তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো।

আলী আহমদ পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। লাবণ্য কমে গেছে। ইদানীং প্রদীপ্তর জন্য ও বিপর্যস্ত- চোখের নিচে কালি, দৃষ্টিতে ক্লান্তি আলী আহমদের ইচ্ছে করে পুষ্পিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে- আদরে ওর ক্লান্তি। মুছিয়ে দিতে- ওর উদ্বেগটুকু নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে, কিন্তু প্রতীক সামনে দাঁড়িয়ে- তাই নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, কারো সঙ্গে একটিও কথা না বলে। পুষ্পিতা ওকে বুঝতে পারেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে গজগজ করে- ছেলের জন্য কিছু করছে না বলে অভিযোগ করছে। আলী আহমদ একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে পুষ্পিতার অভিযোগ শোনে। কখনো কখনো এমনই হয়। অসহায় হয়ে যেতে হয়, তখন বুঝি মুহূর্ত দ্রুতবেগে পেরিয়ে যায়। সে মুহূর্তগুলো নিজের থাকে না। আলী আহমদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামা-জুতো খোলে। পুষ্পিতার সব কথা শুনেও কিছুই শোনে না। মানুষ এভাবে শোনার ক্ষমতা বধির করে রাখতে না পারলে বেঁচে থাকার অনেকটা নষ্ট হয়ে যেত। আলী আহমদ ভেবে দেখলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষকে অহরহ লড়তে হয়। নিজের একটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশের লড়াই। ভাবতে ভাবতে ও কলতলায় যায়। অনেকক্ষণ ধরে হাতমুখ ধোয়- মনে হয় বিপুল ক্লান্তি ওকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

আলী আহমদ স্পষ্ট বুঝতে পারে সামরিক শাসকরা পূর্ব বাংলার জন্য নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগুচ্ছে। ওদের এঁটোকাঁটা দিয়ে এ পারের মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার দায়সারা চেষ্টা মাত্র। পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য উর্দুভাষী আযম খানের দরদ এবং এ অংশের জন্য তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাঁকা চোখে দেখছে সামরিক প্রভুরা। তাই গভর্নর পদ থেকে তড়িঘড়ি আযম খানকে সরিয়ে দেয়া এ দেশের মানুষের বুকে বড় বেশি বাজে। পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ঢাকাবাসী বিদায় জানালো আযম খানকে। এর কিছুদিন আগে সংবাদ অফিসে বসে মতিউরের বন্ধু আমীর হোসেন বলেছিলো, আযম খান আর বেশি দিন নেই কিন্তু।

কেন? অনেকেই তার দিকে তাকিয়েছিলো।

আমির হোসেন হা-হা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বলেছিলো, উর্দুভাষী লোকের এমন বাঙালি প্রীতি কে সহ্য করবে বলুন? সবুর খান আর মোনায়েম খানই তাঁর বিরুদ্ধে বেশি লেগেছে। পা-চাটার দলেরা চায় না যে তাদের জন্য কেউ ভালো কাজ করুক।

কথা বলতে বলতে আমীর ভুরু কুঁচকায়, কণ্ঠ ওঠানামা করে, আলী আহমদের মনে হয় এটা ওর একটা বিশেষ ভঙ্গি। এ ভঙ্গি দিয়ে আমীর নিজেকে প্রকাশ করে এবং এ সময়েই ওর দৃষ্টিতে বেদনার মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। আমীরকে ওর তখন ভীষণ আপন মনে হয়। কেউ কেউ বোধহয় এমন হয়, যারা হৃদয়ের কাছের লোক। সেদিন পল্টন ময়দানে রোকসানা করিমের গান শেষ হলে আমীর ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলো, সামনে আরো খারাপ সময় আসছে। ছাত্রদের এই আন্দোলন তো একটা সূচনা মাত্র। সে মুহূর্তে আলী আহমদের সামনে প্রদীপ্তর উস্কুখুস্কু চেহারা ভেসে ওঠে। ওর জন্য অহংকার হয়। পিতার গৌরব নিয়ে ও দ্রুত

BanglaBook.org

কণ্ঠে বলে, সূচনা তো তরুণরাই করে। বাহান্নোতেও ওরাই করেছিলো। বাষট্টিতেও ওরাই। ওরা ছাড়া আর কে বলতে পারতো, সামরিক শাসন নিপাত যাক।

আমীর হোসেন ওকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলে, বুঝেছি আপনার বুক পুড়ে যাচ্ছে। জেলখানায় ছেলে কেমন আছে?

আলী আহমদ গাঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, ভালো। ও জানে নিজেকে কিভাবে সামলে রাখতে হয়। ছেলেটি আমার চেয়েও এগিয়ে থাকা মানুষ।

শেষের দিকে আলী আহমদের কণ্ঠ ধরে যায়।

আমীর হোসেন অনেকক্ষণ ওর ঘাড়ের ওপর হাত রেখে দেয়। কথা নয়, উত্তাপই এখন ভীষণ দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলেও ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের দাবি সমর্থন করে। চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ছাত্রকে মুক্তি দেয়, কিন্তু বাকিরা ছাড়া পায় না। বাকিদের দলে প্রদীপ্ত পড়ে। সব ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র-আন্দোলন চলতেই থাকে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়। এর কয়েকদিন পরই পূর্ব বাংলার শীর্ষ স্থানীয় নয়জন নেতা পত্রিকায় এক জোরালো বিবৃতি দেয়। তাঁরা আইয়ুব খানের প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে বলেন, 'সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোনো ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়।' এঁদের দীর্ঘ বিবৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলে নয় নেতার বিবৃতি নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিবৃতিকে স্বাগত জানায়। পল্টন ময়দানে জনসভা হয়। সভায় বক্তারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান জানায়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্ফার খান সহ বিনা বিচারে আটক সব রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবি জানায়। সাধারণ মানুষের মনে হতে থাকে সামরিক শাসনের শ্বাস-রুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এ এক দারুণ সুবাতাস– ভাঙছে, অচলায়তনের বেড়ি ভাঙছে।

নয় নেতার বিবৃতিতে আইয়ুব খান ক্ষিপ্ত। সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের কটু মন্তব্য করা হচ্ছে, সঙ্গে উপহাস ও বিদ্রূপও আছে। সবুর খানের কণ্ঠ এ ব্যাপারে শাণিত– বলেন 'ব্যাবিলনের নয়জন জ্ঞানীর বিবৃতি।' এতে ফল হয় উল্টো। সাধারণ মানুষের ভীতি কাটতে থাকে– ওরা রাজনীতির মুক্তির আলো দেখতে পায়। অপর দিকে আগস্ট মাস থেকে ছাত্র আন্দোলন আবার নতুন উদ্দীপনায় শুরু হয়।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্রসমাজ সতেরো সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী হরতাল ডাকে। আইয়ুব খান ঢাকায়। কার্জন হলে ঐদিন তাঁর ভাষণ দেবার কথা। ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে– রাস্তায় লোকে-লোকারণ্য। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। আইয়ুব খান ভাষণ না দিয়েই কার্জন হল থেকে চলে যান। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে– পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের ওপর। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে। এ পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হয় দু'জন। ওয়াজিউল্লাহকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। শহরে ১৪৪ ধারা জারি হয়। কিন্তু ছাত্ররা তখন অকুতোভয়– ১৪৪ ধারা ভেঙে জঙ্গী মিছিল আইয়ুবের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘেরাও করে রাখে।

তখন সমাজকর্মী, সংস্কৃতিসেবী আমীর হোসেন আলী আহমদের হাত চেপে ধরে ফুঁসছে। দু'জনে 'সংবাদ' অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রথখোলার মোড়ে জঙ্গী

BanglaBook.org

মিছিলকে বাধা দিয়েছে পুলিশ। গুলি ও টিয়ারগ্যাসের মুখে টিকতে না পেরে মিছিলকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

দাঁত কিড়মিড়িয়ে আমীর হোসেন বলে, চলেন।

কোথায়?

হাসপাতালে। আহতদের কি হয়েছে দেখতে হবে তো।

দু'জনে বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানের রেলিং টপকে হাসপাতালে আসে। আমীর হোসেন চেঁচিয়ে বলে, দেখুন, 'গোয়ের্নিকা'।

আলী আহমদ তাকিয়ে থাকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিকে। বিড়বিড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, গোয়ের্নিকা-ই।

পিকাসোর একটা ছবির কথা বললেই ভিন্ন দেশের একটি অবস্থার কথা বোঝানো হয়। তাই না?

আমীরের কণ্ঠে ব্যঙ্গ না বিষাদ সেটা আলী আহমদ বুঝতে পারে না। আচ্ছন্নের মতো বলে, তাই। কোনোরকমে শব্দটি উচ্চারণ করলেও ওর দু'কান ভরে বাজতে থাকে আহতদের আর্তনাদ এবং গোঙানির ধ্বনি। ওই শব্দে ও আমীরের মুখের দিকে তাকায়। দেখতে পায় সে মুখের রঙ বদলাচ্ছে, মানুষের ভেতরে ভাঙচুর হলেই বুঝি রঙ এমন দ্রুত বদলাতে থাকে, নাকি রঙের ওলোট-পালোট, চিৎপটাং হয়ে যাবার মতো ব্যাপার ঘটে। আর্তনাদ এবং গোঙানির শব্দে কান ভারি হয়ে উঠলে ও ভাবে আমীর হয়তো এক্ষুণি চেঁচিয়ে বলবে, শুনুন বেঠোভেনের সঙ্গীত। অন্ধ হয়ে থাকুন, খুলে রাখুন শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু কোনো কিছু না বলেই আমীর দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়। ওর পিছু পিছু ধাওয়া করে ওষুধ এবং রক্তের গন্ধ। কিন্তু কতদূর যাবে আমীর? ছুটতে চাইলেই কি ছোটা যায়? চারদিকে গোয়ের্নিকার জীবিত মানুষেরা ছুটতে চাইছে– রক্ত, ওষুধ এবং আর্তনাদ মাড়িয়ে। ছাত্ররা ব্যতিব্যস্ত, বন্ধুদের জন্য উদ্বেগ। মমতায় ধরে রাখছে আহত বন্ধুদের। নার্স ও ডাক্তাররা ছুটোছুটি করছে। পেশাগত দায়িত্বের বাইরে তাদের শুধু শরীর নয় এক অনির্দেশিত আবেগও ছুটছে। আলী আহমদ দেখে থমকে আছে আমীর হোসেন। ও একজন সমাজকর্মী। বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ও কাজ করে, সাইক্লোন, বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকা দেখেছে, মহামারী দেখেছে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম দেখেছে– তবু ওর মনে হয় বাহান্নোর পর এমন দৃশ্য ও আর দেখেনি। ও আলী আহমদের হাত চেপে ধরে বলে, দেখেছেন তো সামরিক শাসনের প্রথম রক্তপাত। দেখুন, দেখুন। লিখতে হবে আপনাকে।

আলী আহমদের মনে হয় আমীর হোসেন কাঁপছে– কণ্ঠস্বরে আবেগ– উত্তেজনায় ওর হাত থরথর করছে। আলী আহমদ আস্তে করে বলে, শান্ত হন কবি।

আমীর হোসেন তীব্র চোখে ওর দিকে তাকায়। তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত চলে যায় আহতদের মাঝে। আলী আহমদ একজন আহতের পাশে বসে পড়ে। ওর কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে– মুখটা কুঁচকে গেছে, চোখের পাতা নিমীলিত। ও তুলো নিয়ে ওর রক্ত মুছে দেয়। ছেলেটি পানি চাইলে অসহায়ের মতো চারদিকে তাকায়।

তখন ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে আমীর, এইসব নিপীড়ন বেশিদিন চলতে পারে না। ঐ কুকুরদের আমরা পায়ের নিচে পিষে মারবো।

ঘরের ভেতর উপস্থিত বিক্ষুব্ধ মানুষেরা ওর দিকে তাকায়। আলী আহমদ ওর হাত চেপে ধরে বলে, আপনি গোয়ের্নিকাকে তাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাইছেন।

গোয়ের্নিকার নিজস্ব নিয়ম আছে। ওটা বিন্দু। ওটাকে কেন্দ্র করে আমাদের ঘুরতে হবে। গোয়ের্নিকার শেষ নেই।

BanglaBook.org

চলুন। ওদিকে যাই।

আলী আহমদ আমীরের হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর লোকেরা লাশ গায়েব করতে এসেছে– ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের বাধা দিয়েছে ছাত্ররা। শহীদের লাশ ওরা সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। ওরা মর্গ থেকে লাশ বের করে এনে পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ওদের সাফ জবাব, লাশ আমরা দাফন করবো।

শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার চাপে সেনাবাহিনীর সদস্যরা লাশ না নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। আহতরা খানিকটা সুস্থ হয়েছে– গোঙানির শব্দ কমে গেছে। অনেক রাতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে দু'জনে। নির্জন পথ, চারদিকে অন্ধকার, রাস্তায় বাতি নেই। দু'জনে হাঁটতে থাকে।

আলী আহমদ আমীর হোসনকে বলে, আপনি হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন?

হঠাৎ করে নয়। ক্ষোভ বুকের ভেতর পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চলুন, আজ আমার সঙ্গে থাকবেন। এত রাতে আপনার আর বাড়ি ফিরতে হবে না।

ভালোই হলো চলুন। আমারও ঘরে ফেরার টান নেই। বউ বাপের বাড়ি গেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় শহরের রাস্তায় রাত কাটাই। যদি কোনো চোরের মুখোমুখি হই শুনবো ওর কথা। যদি কোনো বদমাশ তেড়ে আসে বলবো পেশী দেখিও না। এসো পাল্লা লড়ি। কথা শেষে হা-হা করে হাসে আমীর। আলী আহমদ মজা পায়। একটু আগে লোকটি কেমন ক্ষুব্ধ ছিল, এখন হাসছে। কী অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

প্রফেসর চুপ করে গেলেন যে?

আপনার হাসি শুনতে ভালো লাগছে।

আসলে আমরা দু'জন পরস্পরের কাছে থাকতে চাইছি।

ঠিক বলেছেন। আলী আহমদ স্বতঃস্ফূর্ত সায় দেয়।

আমীরের কণ্ঠ আবার খাদে নেমে যায়, জানেন এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গ আমার খুব দরকার। মনটা খারাপ হয়ে আছে। ভাবছি বারবারই কি আমাদের এমন রক্ত আর জীবন দিয়ে এগুতে হবে?

দু'জনের বুকের ভেতর প্রচণ্ড ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। দু'জনে বড় বেশি কাছ থেকে দেখা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যায়।

মাসখানেক পরে প্রদীপ্ত ছাড়া পায়। একরকম আকস্মিকভাবেই। জেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। চিরচেনা শহরটা কি খানিকটা অন্যরকম লাগছে? আসলে কিছুই বদলায়নি। না দেখার অভ্যাস ওকে আহত করেছে। ও হেঁটেই বাড়ি ফেরে, শীতের রোদ গা পোড়ায় না। হেঁটে আরাম। জেলখানার স্যাঁতসেঁতে ঘরে শীতের রাতগুলো কেমন ভয়াবহ মনে হতো। পাতলা কম্বলের নিচে খানিকটা উষ্ণতার জন্য কী ব্যাকুলতা ছিলো। এখন সেই উষ্ণতা এই রোদালো দুপুর ছড়িয়ে রেখেছে শহরের উপর। ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বাড়ির দরজা খোলাই ছিলো। উঠোনে দাঁড়িয়ে মা বলে চিৎকার করে ওঠে। ওর চুল-দাড়ি লম্বা হয়েছে, ওকে অন্যরকম লাগছে। পুষ্পিতা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। প্রদীপ্ত মাকে জাপটে ধরে রেখে হাসতে হাসতে বলে, কেঁদো না মা। তুমি কাঁদলে আমি হেরে যাবো। আমি তো হারতে চাই না।

প্রতীক ওর পিঠে হাত রেখে বলে, তোমাকে কি ওরা মেরেছিলো ভাইয়া?

প্রদীপ্ত ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, প্রশ্নের উত্তর দেয় না। পুষ্পিতাকে বলে, মাগো ভীষণ খিদে পেয়েছে। কতদিন তোমার রান্না খাই না। ভাত খেতে বসলেই– জানো তো জেলের রান্না–

BanglaBook.org

হয়েছে, আর বলতে হবে না। জেলের ওই ছাইভস্ম গিলতেই তোর মজা–

প্রদীপ্ত মাকে জড়িয়ে ধরে, ঠিক বলেছো। আমি তো ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে তোমার কাছে জেলের রান্নার গল্প আগে করবো। শুনে তোমার–

পুষ্পিতা ছেলের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে, তুই গোসল করে নে। আমি তোর জন্য ভাত আনছি।

পুষ্পিতা রান্নাঘরে যায়। সেদিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত বলে, জিতু তুই একটা বোকা। মায়ের সামনে কি এমন প্রশ্ন করতে হয়?

তাহলে তুমি মার খেয়েছো?

খেয়েছি এবং দিয়েছিও।

দিয়েছো?

অবাক হচ্ছিস?

না, অবাক হইনি, খুশি লাগছে।

তবে যেটা খারাপ লেগেছে সেটা হলো অপমান। আমি অপমানিত হয়েছি জিতু। তোকে আমি সে কথা বলবো। ভীষণ খিদে পেয়েছে। যাই গোসল করে নিই। এরমধ্যে হয়তো বাবাও ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরবে।

প্রতীক ওকে লুঙি-গামছা এনে দেয়। ওর মনে হয় এতদিনের চেনা ভাইটি খানিকটা অন্যরকম হয়ে গেছে। কেমন তা ও পরিষ্কার করে বুঝতে পারছে না। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ও ভাবে আসলে হয়তো ব্যক্তি এবং বস্তুর আড়ালে একটা পরত থাকে। খানিকটা দূরে গিয়ে নতুন করে দেখতে চাইলে দেখা যায় আগের দেখা পরতটি নেই, সেটা অন্যরকম হয়েছে– এটাই হয়তো দৃষ্টি এবং অনুভবের ফারাক। মানুষ প্রতিনিয়ত এই ফারাকের ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করে। বাথরুমে ঢুকে গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে প্রদীপ্ত গলা ছেড়ে গান গায়। মনে হয় নিজের ভেতরের উঠে যাওয়া পরতটা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর খুশি লাগছে।

সেদিন বিকেলে আমীর নিজের ওষুধের কারখানা থেকে সোজা আলী আহমদের বাসায় আসে। অনেকদিন ধরে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করছে। কাল রাতে দু'টো কবিতা অনুবাদ করার পর আলী আহমদকে শোনানোর জন্য খুব তাগিদ অনুভব করছে। আলী আহমদের পরামর্শ ওর পছন্দ হয়। সে পরামর্শ অনুযায়ী দু'একটা কবিতার ঘষামাজাও করেছে। নওয়াবপুর রোড থেকে রিকশায় উঠলে আশেপাশের বাড়িঘর, দোকানপাট ছুঁয়ে আসা বাতাস আমীরের স্নায়ু শীতল করে। কোলের ওপর কবিতার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। ওর মনে হয় শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক পরিশ্রমের ক্ষয় অনেক বেশি। সাফল্যের আনন্দ না থাকলে ব্যর্থতার গ্লানি ক্লান্ত করে। আর সৃজনশীলতার ব্যর্থতা ভয়াবহ। একজন মানুষকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে আমীরের বুকের ভেতর সাফল্যের আনন্দ। রিকশার বেলের টুংটাং শব্দ যেন মগ্ন চৈতন্যের ধ্বনি। এই ধ্বনি শুনতে শুনতে আমীর শহরের আলো নিজের বুকের ভেতর ধরে রাখে।

তখন আলী আহমদের বাড়িতে পারিবারিক আড্ডা জমে উঠেছে। পুষ্পিতা চা আর পাপর ভাজা দিয়েছে, মুড়ি মাখিয়েছে। প্রদীপ্ত বাবার নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। দুপুরে ঘুমুনোর আগে প্রতীককে ওর অপমানের কথা বলেছিলো। বাবাকে এখনো বলা হয়নি। তখন গেটের কড়া নাড়ে আমীর হোসেন। গেট পেরিয়ে বারান্দায় আসতে আসতে প্রদীপ্তকে দেখে চেঁচিয়ে বলে, বাহ্, তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে? তাহলে তুমি এখন একজন মুক্ত মানুষ?

না, চাচা, মুক্ত মানুষ নই। এখনো পাঞ্জাবিদের ঘৃণ্য মানসিকতার মুঠোর মধ্যে আছি।

BanglaBook.org

আমাদের মুক্ত হতে সময় লাগবে। জেলখানায় আমার খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমি জানি প্রদীপ্ত। আমি তোমাকে বুঝতে পারছি। আমাদের সঙ্গে ওদের আচরণের অভিজ্ঞতাগুলো ছোট ছোট, কিন্তু ভীষণ তিক্ত। সেদিন মতিঝিলে একটি অফিসে গিয়েছিলাম। পাঞ্জাবি অফিস-কর্তা আমাকে বসতে বলেনি।

এটুকু বলেই হা-হা করে হেসে ওঠে আমীর। প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইটি পড়েছো না?

প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, পড়েছি।

আমীর হোসেন ঘাড় নেড়ে বলে, ভাবী চা।

পুষ্পিতা চা আনতে উঠে যায়। আলী আহমদ ও প্রদীপ্ত নিজেদের স্তব্ধতার ভাব কাটিয়ে ওঠে। আমীর প্রতীকের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার আগেই প্রদীপ্ত বলতে শুরু করে, একদিন জেলে খারাপ খাবার দিয়েছিলো বলে আমি ভাতসহ থালা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। সেপাই খেঁপিয়ে উঠে বলেছিলো, বাঙালি কুত্তা, নিকাল যাও হিঁয়াসে। আমি ওর মুখে ঘুঁষি মারলে পেছন থেকে আর একজন সেপাই আমার পিঠে বুটের লাথি দিয়েছিলো। পরে আমাকে সেলে আটক করা হয়। শাস্তি হিসেবে দেড়দিন আমাকে খাবার দেয়া হয়নি। বাবা, আমি এই অপমানের জবাব দিতে পারিনি।

পারিসনি বলে দুঃখ করার কিছু নেই দীপু। একদিন না একদিন আমাদের পারতে হবে।

ঠিক। আমীর হোসেন আলী আহমদকে সমর্থন করে বলে, প্রদীপ্ত তোমার দুঃখ হ যে তুমি পাঞ্জাবিদের হাতে অপমানিত হয়েছো। আমার দুঃখ আরো গভীর। বাঙালিরা আমাদের প্রতিনিয়ত অপমান করছে। আমাদের সংসদ সদস্য আর মন্ত্রীদের দিবে তাকাও? সবার কথা ছেড়ে দিলাম। শুধু গভর্নর মোনায়েম খাঁকে দেখো? ছাত্র-আন্দোলনের চাপে যখন রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচন বর্জন করেছে, তখন সেই নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়ে ময়মনসিংহ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে রাজবন্দীদের দেশদ্রোহী বললেন এবং সরকারের কাছে আবেদন করলেন যে তাঁদের যেন মুক্তি দেয়া না হয়। আরো দেখো, যখন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা লড়ছে তখন তিনি এন. এস. এফ-কে পুণর্গঠন করে একটি পেশাদার বাহিনী গড়লেন। দেখবে তাঁর সমর্থনে এই বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে। দীপু, আমাদের অপমান ভেতরে এবং বাইরে।

কথা শেষ করে আমীর হোসেন চা'য়ে লম্বা চুমুক দেয়। প্রদীপ্তর দাঁতের নিচে পাপর-ভাজা চূর্ণ হতে থাকে। আমীর চা শেষ করে বলে, আমি জানি পাঞ্জাবিরা কথায় কথায় আমাদের কাফের বলে। যেন ধর্মটা ওদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের সম্পত্তি। আমরা বাঙালি এবং মুসলমান এই সত্যটি ওরা বুঝতে পারে না।

আলী আহমদ বলে, আসল কথা ওরা আমাদের জোর করে পাকিস্তানি বানাতে চায়। আমাদের সামনে এখন দু'টো পথ খোলা। আমরা পাকিস্তানি হবো না বাঙালি?

আমীর হোসেন দৃঢ় কণ্ঠে বলে, বাঙালি। নজরুলের কবিতার অনুবাদের কাগজগুলো আলী আহমদের চোখের সামনে উঠিয়ে ধরে বলে, আমার সামনে এই কবি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। আমি এখান থেকে কখনোই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবো না।

আলী আহমদ দেখতে পায় শেষ বিকেলের আলোয় আমীরের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রদীপ্ত ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রতীকের ইচ্ছে করে যদি শৈশব ফিরে পেতো তবে এই মানুষটির ঘাড়ে চড়ে পেরিয়ে যেত মেঠো পথ, নদীর ধার, বকুল-

BanglaBook.org

তলা। ও মানুষটির চোখে চোখ রাখে। গভীর দৃষ্টিতে ছুঁয়ে ফেলতে চায় বুকের তল। মানুষটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। যেন বলতে চায়, তুমি কি ভাবছো তা আমি জানি। ধরো আমার হাত।

তখন প্রতীক নিজের হাতটা বাড়িয়ে বলে, আমার হাতটা ধরুন না। আপনাকে ছুঁয়ে দেখি।

হা-হা করে হেসে ওঠে আমীর। বলে, ছোঁয়া একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এসো আমরা দুই প্রজন্মের মানুষ পরস্পরকে ছুঁই।

আমীর হোসেন দু'হাতে প্রতীকের ডান হাত নিজের মধ্যে টেনে নেয়।

৫

'দাউদাউ পুড়ছে ঢাকা শহর। আগুন এখন প্রমিথিউসের লজ্জা।'

ডায়রিতে লাইন দুটো লিখে অস্থির হয়ে ওঠে আমীর। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু কার্ফু হয়ে গেছে, উপায় নেই। ও জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। দূরে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশ– ভেসে আসছে মানুষের চিৎকার। ছাদের ওপর থেকে লক্‌লকে আগুনের শিখা দেখলে মনে হয় এই তো কাছেই, যেন পুড়ে যাচ্ছে চামড়া। ও ছুটে বাথরুমে ঢোকে, চোখেমুখে পানি দেয়। মাথা কেমন করছে– হয়তো প্রেসার বাড়লো, না কি অন্য কিছু! ও ছটফট করে। ওর মাথার মধ্যে এখন ভুবন ছাড়া কিছু নেই। তবু ও নিজেকে শান্ত রাখার জন্য আবার ডায়রিটা খুলে লিখতে বসে, 'পুড়ে যাচ্ছে ঘর, দোকান, বস্তি– পুড়ছে মানুষের জীবনযাপন, স্বপ্ন– পুড়ছে মানুষের ঘৃণা, বিশ্বাস, আদর্শ। পুড়ে যাচ্ছে শিশুর কান্না, রমণীর হাসি– ত্রস্ত মানুষের বিচলিত পদক্ষেপ।

ভুবন এখন কি করছে? ও কি বাঁচার জন্যে আকুল হয়ে আমাকে স্মরণ করছে? ভুবনের শরীর কি গুঁড়ি-গুঁড়ি কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে? ও কি আকাশর দিকে মুখ করে শুয়ে আছে? চোখ গোলাকার পিণ্ড, জিহ্বায় থুতু নেই, ঠোঁটের কোণে কষ? ভুবনের মা মারা গিয়েছিলেন নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে। বাথরুম আটকে দিয়েছিলেন। সে আগুন কি এমন কালো ধোঁয়ার জন্ম দিয়েছিলো? আমি তো কিছুই জানি না। শুধু শুনতে পাই ভুবনের আর্তনাদ। ও ঈশ্বরকে ডাকার মতো করে আমাকে ডাকছে!'

পরক্ষণে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। রেগেমেগে ডায়রিটা ছুঁড়ে মারে ঘরের কোণে। এইসব বস্তাপচা আবেগময় ভাষা লিখে কি হবে যদি না ভুবন বেঁচে থাকে। ওরাতো টের পাচ্ছিলো ভীষণ, ভয়াবহ একটা দাঙ্গার পায়তারা ঘনিয়ে উঠছে শহরের বুক জুড়ে। তবে কেন ও ভুবনকে নিজের কাছে এনে রাখলো না? পরশুদিন ভুবন বলেছিলো, আমার খুব ভয় করছে আমীর, বিপদ হলে দেখিস। ও হেসেছিলো। বলেছিলো, তোর গায়ে হাত ছোঁয়াবে কে? কেনই বা ছোঁয়াবে? তুই তো একজন ভালো মানুষ। তোর সঙ্গে কারো শত্রুতা নেই।

ভুবন চোখ কপালে তুলে বলেছিলো, আমার ধর্মের সঙ্গে আমার শত্রুতা। আমার ধর্মইতো আমাকে হিন্দু বানিয়ে রেখেছে। মানুষ থাকতে দেয়নি।

আমীর ভাবে, ভুবন ঠিক কথাই বলেছে। ও এত কিছু বোঝে আর এই সহজ কথাটি

BanglaBook.org

বুঝতে পারলো না কেন? সাম্প্রদায়িকতার জন্য শত্রুতার নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে হয় না। ওটা আপন নিয়মে নিজের স্থান করে নেয়। ওটাকে কাজে খাটায় রাজনীতিবিদরা। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাজনীতির।

ও আবার বারান্দায় আসে। রেলিংয়ে ঝুঁকে নিচের রাস্তা দেখে। নিশ্চুপ, জনশূন্য পথ। কোথাও শব্দ নেই। এমনকি কাকের ডাকও না। শহরের কাকগুলো মাঝে মাঝে আশ্চর্যরকম ভাবে উধাও হয়ে যায়। আমীরের মতে, কাক শহরের প্রতীক। ওর বর্ণ এবং কণ্ঠস্বর দু'টোই বিভিন্নভাবে শহরের প্রতিনিধিত্ব করে। সেটা সুন্দর এবং কুৎসিতকে অবলীলায় ধারণ করে। তাই যখন ও শহরের মানুষ তখন কাক ওর প্রিয় পাখি, যখন গ্রামে যায় তখন মাছরাঙা প্রিয়। কারণ মাছরাঙার শরীরে ও নীলিমা অবলোকন করে। যে কবি নীলিমা দেখতে পায় না তার বুক থেকে কাক সরে না, সবটুকু কদর্যতা নিয়ে কাক তার কুচকুচে কালো দিয়ে কবির বুক অন্ধকার করে রাখে। ও ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে অনুভব করে ওর নাড়িভুড়ি উপড়ে আসতে চায়। ও বুকের সঙ্গে রেলিং চেপে রাখে। ছোট্ট একটা কাজের ছেলে আছে বাড়িতে, আর কেউ নেই। নাসিমা মণিকাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি গেছে। ও এখন রাজশাহীতে। আবু কাছে এসে দাঁড়ায়।

খালু? কিছু খাইবেন না?

নাস্তা কি বানিয়েছিস?

আলুভাজি আর রুটি।

টেবিলে দে।

দিছি। অহনই আহেন। নাইলে ঠাণ্ডা অইয়া যাইবো। ঠাণ্ডা অইলে আপনে আবার আমারে বইকবেন।

এত কথা বলছিস কেন রে? আমি কি তোকে শুধু বকি, আদর করি না?

আবু হলুদ দাঁত মেলে হেসে বলে, করেন। তয় আজকে আমার মন খারাপ। ডর লাগতাছে। আইজ আমারে বকলে কান্দন আইব।

না, আজ তোকে কাঁদতে হবে না।

বলতে বলতে আমীর টেবিলে এসে বসে। প্রচণ্ড খিদে। কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছিলো বলে আজ ঘুম ভাঙতে দশটা বেজে গেছে। একটুকরো রুটি মুখে পোরে, কিন্তু খেতে পারে না। বমি বমি লাগছে। প্রচণ্ড অস্থিরতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

খালু, দুপুরে কি রাঁধমু?

জানি না।

খালু, দাঙ্গা লাগছে কেন?

আমীর চুপ করে থাকে।

পাড়ার দোকানদার কইছিলো কাশ্মীরে এক মসজিদে রাখা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর চুল নাহি চুরি হইয়া গেছে। সেইটা নাহি হিন্দু কাফেররা করছে। সেজন্য বিহারিরা খেইপা গিয়া এমন প্রতিশোধ নিতাছে।

তোর বিশ্বাস হয়?

হইব না কেন? হয়।

আমীর ওকে প্রচণ্ড জোরে ধমকে ওঠে।

যা, এখান থেকে। আমাকে এককাপ চা দে।

আবু কাঁদো কাঁদো মুখে চলে যায়। ওর অপরাধটা কি বুঝতে পারে না। ওর ধারণা হয় খালাম্মা না থাকার জন্যে খালুর মেজাজ খারাপ। আর মণিকা না থাকলে তো বাড়িটা একদম

BanglaBook.org

খালি হয়ে যায়। তখন ওর নিজেরই কোনোকিছু ভালোলাগে না। কেবলই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এই বারো বছর বয়সে ও বিভিন্ন বাসা থেকে দশ বারো বার পালিয়েছে। কেউ ওকে বেঁধে রাখতে পারে না, একটানা বেশিদিন কোথাও থাকলে হাঁফিয়ে যায়।

ও খুব দ্রুত এককাপ চা বানিয়ে আনে। আমীর কিছুই খায়নি। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

খালি প্যাটে চা খাইবেন?

আমীর হেসে ফেলে।

তুই দেখছি তোর খালাম্মার মতো কথা বলছিস রে।

ও লজ্জা পেয়ে টেবিলের প্লেট গোছাতে থাকে। এই মুহূর্তে ওর আর কোনো রাগ নেই। আসলে ও রাগ করতে পারছে না। ওর কেবলই মনে হয় শহরের রাস্তায় হাজার হাজার শেয়াল নেমেছে। বুকের ভেতর ভয় নিয়ে কি রাগ করা যায়? ও ভয় কাটানোর জন্য পরম নির্ভরতায় আমীরের দিকে তাকায়।

আমীর ওকে আদর করে বলে, আমার বন্ধু ভুবনকে তোর মনে আছে আবু?

হ্যাঁ।

ও ঘাড় কাত করে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলে, উনি আমারে বলে কিনা ছোটবেলায় একদম আমার মতো আছিলেন। কেবল বাড়ি থাইকা পলাইতেন।

আমীর একদৃষ্টিতে আবুকে দেখে। ভুবন কি আবুর মতো? মিল আছে চোখে, চিবুকের কাছে। আর স্বভাব? না স্বভাবের কথা বলতে পারবে না। ও জানে ভুবন অসম্ভব নিরীহ ছেলে। কারো কাছে জোর করে কিছু চাইতে পারে না এবং নিজের বলে কোনোকিছু দাবি করার সাহস ওর নেই। অথচ কেমন করে যে রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছে। প্রবলভাবে কিছু করে না, নীরব কর্মী। যা করে গভীর বিশ্বাস থেকে করে। প্রায়ই বলে, এ দেশের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে। একে না রুখতে পারলে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব মুছে যাবে। কি বলিস আমীর?

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে ভুবনের সঙ্গে ওর পরিচয়। তারপর আলাপ, পরিশেষে গভীর হৃদ্যতা। ভুবন রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলো প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেই। ওর কণ্ঠের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলো আমীর। কিন্তু গায়ক হিসেবে এখনো তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। তার জন্যে ওর কোনো হতাশা নেই। ওর কাছে চর্চাটাই আসল। আরো বলে, শিল্প-সাহিত্যকে জীবনের প্রয়োজনে লাগানোটাই জরুরি আমীর। শুধু নান্দনিক দিক আমার কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর এই উৎসব, নেহাতই উৎসব নয়। আমরা এর মধ্যে দিয়ে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আইয়ুব খান যে সাংস্কৃতিক একনায়কত্ব গড়ে তুলতে চাইছে এটা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই মুহূর্তে ভুবনের কথাগুলো কানে বাজে ওর।– জানিস আমীর রবীন্দ্রনাথকে তারাই বর্জন করতে চায় যারা নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধান জানে না। জানে না বলে ছিন্নমূল মানুষের মতো ধর্ম আঁকড়ে ধরে নিজেদেরই অপমান করে।

ও খুব ধীর লয়ে থেমে থেমে কথা বলে। মুগ্ধ হয়ে শোনে আমীর। ও নিজে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী। অনেক বেশি সচেতন। সক্রিয়ভাবে কাজ করে। তবু ভুবনের কথা শুনতে ওর ভালোলাগে। গভীর করে, খুব আন্তরিকতায় কথা বলে। ওর বিশ্বাস থেকে কিছুতেই ওকে উপড়ে আনা সম্ভব নয়।

ভুবন একটি স্কুলে পড়ায়। খুব ছোটদের পড়াতে ভালোবাসে। বক্সিবাজারে এক ঢাকাইয়া কুট্টির সঙ্গে থাকে। বাড়ির বাইরের দিকের ঘর সেটি, সঙ্গে বাথরুম আছে। স্টোভে নিজে রান্না করে। মাঝে মাঝে চমৎকার রান্না করে আমীরকে খেতে ডাকে। বলে,

BanglaBook.org

মানুষ মানুষকে নেমন্তন্ন কেন করে জানিস? বিশেষ করে আমার মতো মানুষ।

কেন?

নিজের সুখ দেখাতে।

হা-হা করে হাসে আমীর। বলে, তোর রান্নার জন্য আমার লোভ আছে। আর আমি জীবনভর তোর সুখ দেখতে চাই। তবে এটা ঠিক তোর সুখ আর দশজন লোকের সুখের মতো নয়।

ভুবন মৃদু হেসে বলে, কেমন?

মাছরাঙা দেখলে আমার যেমন নীলিমার কথা মনে হয়, তেমন। তোর সুখ নীলিমার মতো।

ভুবন হাসতে হাসতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, বাবা-মা হারা ছেলেদের জীবনে সুখ সোনার হরিণ।

এভাবে বলিস না। তোর সুখের অনুভব আমার কাছে সত্য হয়ে থাক।

ভুবন মুখ নিচু করে। অন্যদিকে তাকায়। আমীরের চোখে চোখ ফেলতে চায় না। আমীর বিভিন্ন কোণ থেকে ভুবনের চিবুক, চোয়াল, গ্রীবা দেখে। ও একা মানুষ, দিন ভালোই কাটে। বলে, দেড়শো টাকা বেতন আমার জন্য অনেক রে আমীর। খরচ করতেই পারি না।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। কেবল এক তারিখে ভাড়া পৌঁছে দেয়। এ কাজে কোনোদিন ভুল হয়নি ওর। হাতে কখনো টাকা জমে গেলে সে টাকা বাড়িওয়ালাকে দেয়ার জন্য বিছানার নিচে রেখে দেয়। ওর ঘরের সবচেয়ে দামি জিনিস একটি হারমোনিয়াম আর এক জোড়া তবলা। অনেকদিন ওর মায়ের গয়নার কথা গল্প করেছে ভুবন।

ওর মা আত্মহত্যা করার পর ওর বাবা ওকে ঠাকুরমা'র কাছে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আর ফেরে না। ঠাকুরমা বলতেন, তোর মায়ের গয়নাগুলো তোর বাবা আমাকে দিয়েছিলো। কথা ছিলো তোর বউকে দেবো। কিন্তু তোর পড়ার খরচ চালাবার জন্যে ওগুলো বিক্রি করতে হয়েছিলো।

কিন্তু ছোট মাসীর কাছে ও শুনেছিলো, ওগুলো ওর বখাটে মামা মেরে দিয়েছিলো। এ নিয়ে ওর কোনো আক্ষেপ নেই। বরং ঠাকুরমা'কে বলেছিলো, ওগুলো নেই ভালো হয়েছে। থাকলে আমার জ্বালা বাড়তো।

তুই রাগ করিসনি তো ভুবন?

কি যে বলো ঠাকুরমা। তবু তো গয়নাগুলো তুমি একটা কাজে লাগিয়েছো। তুমি না থাকলে বাপ-মা হারা ছেলেকে কেইবা লেখাপড়া শেখাতো। লেখাপড়া শিখেই আমি খুশি। তোমার ঋণ কি শোধ করতে পারবো?

এ গল্প ভুবনের বহুবার করা। হয়তো এই গল্পের ভেতর দিয়ে ও মায়ের স্মৃতিকে খুঁজে নিয়ে আনন্দ পেতো। আমীরের তাই ধারণা। সেজন্য ঐ গল্প বারবার শুনতে ও কখনো আপত্তি করেনি। অল্পসময় ধরে ভুবনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব, অথচ কত গভীরভাবে নিবিড় হয়েছে। লাজুক, কিছুটা অসহায়বোধে তাড়িত ভুবনের জন্যই এতটা সম্ভব। নইলে কাজের এত ব্যস্ততার মধ্যে আমীর অনেক কিছুই ভুলে যায়– ভোলে না ভুবন। ওর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে নানাভাবে আমীরকে জড়িয়ে রাখে। ও খুব স্বল্পাহারী– ডালের সাথে এক চামচ ঘি মিলিয়ে ভাত খেতেই বেশি ভালোবাসে। মাঝে মাঝে ডিম সেদ্ধ করে। আমীর ভেবেই পায় না একজন লোক এত অল্প খেয়ে কি করে বেঁচে থাকে। অথচ ভুবনের স্বাস্থ্য ভালো, তরতাজা শরীর, খারাপের বালাই নেই।

BanglaBook.org

তোকে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে মানুষ এত কম খেয়ে কি করে বেঁচে থাকে?

ভুবন মৃদু হাসে। নিজের ঘরে থাকলে এসব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান শুরু করবে, 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারেবারে।' খুব দরদ দিয়ে গান গায় ও। তারপর এক সময় বিষণ্ন দৃষ্টিতে বলে, আচ্ছা আমীর বাবা কেন নিরুদ্দেশ হয়েছিলো, এর কোনো কারণ তুই বলতে পারিস?

এখন আর কারণ খুঁজে কি হবে?

ওটাই আমার সুখ।

ভুবনের গভীর চোখের দৃষ্টির রঙ বদলে যায়। ওটা নীলাভ থাকে না, বেগুনি হয় কিংবা খয়েরি।

আমীর ওর হাত চেপে ধরে বলে, এসব ভেবে কষ্ট পাস কেন?

এটাই আমার সুখ।

আমি বুঝতে পারি না তোর সুখটা কেমন।

ভুবন প্রসঙ্গ এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, বড় হয়ে শুনেছিলাম বাবা নাকি মা'কে খুন করেছিলো। দু'জনের খুব তিক্ত সম্পর্ক ছিলো। আমার জন্যও সেটা জোড়া লাগেনি। বাবা পালিয়ে না গেলে হয়তো বাবার ফাঁসি হতো। কেমন গল্পের মতো না সবকিছু? তুই লিখবি?

আমীর কঠিন কণ্ঠে বলে, না।

কেন?

তোকে নিয়ে গল্প লিখতে পারবো না।

তাহলে আমিই লিখবো। আমার বিশ্বাস ওটা একটা দারুণ নাড়া জাগানো উপন্যাস হবে। তখন তুই আমাকে ঈর্ষা করবি।

আমীর অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে ভুবন আর নিজের মধ্যে নেই। ওর সুখ নিয়ে ও এখন নীলিমায় পৌঁছেছে। আমীর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই দেখতে পায় না ভুবনকে।

দু'জনের কথা ফুরিয়ে গেলে ভুবন হারমোনিয়ামে সুর তোলে– 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' এক লাইন গেয়ে চুপ করে যায়। একটা ঢোক গিলে বলে, জানিস আমীর আত্মহত্যা বা খুন কোনোটাই আমি বিশ্বাস করি না। মা নেই এটাই আমার জন্য সত্যি। তবে বাবাকে আমি সারাক্ষণ খুঁজি।

কেন?

পেলে জিজ্ঞেস করবো যে কোনটা সত্যি, আত্মহত্যা না খুন?

যদি বলে আত্মহত্যা?

মেনে নেবো। কারণ জানতে চাইবো না।

যদি বলে খুন?

দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে ওর চোখ থেকে। বলে, আমার তেমন সাহস নেই যে বাবাকে খুন করবো। আমার সবকিছুতে ভীষণ ভয় আমীর। আমি সাহস করে কোনোকিছুই করতে পারি না। মুহূর্তের মধ্যে অসহায় হয়ে পড়ি।

আচ্ছা ভুবন এমনওতো হতে পারে যে তোর মায়ের কোনো অন্যায় ছিলো?

জানি না, জানি না।

এমনওতো হতে পারে যে তোর বাবা তোর মাকে খুব ভালোবাসতো। আত্মহত্যার মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

BanglaBook.org

ভুবন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, বাবা মা যদি জানতো যে তাদের সন্তানকে তারা কি পরিমাণ নষ্ট করে রেখে গেছে।

ভুল। তোর কিছুই নষ্ট হয়নি ভুবন।

তুই বুঝবি না আমীর। এ যার হারায়, সে বোঝে। আমার সাহস নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ভুবনেশ্বর সেনগুপ্ত পৃথিবীকে একদম ছোট করে দেখি, সাহস নেই বিশাল করে ভাবার।

তোর মতো গভীর করে কে চিন্তা করতে পারে বল।

হা-হা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ভুবন। আমীরের মনে হয় ঐ হাসিতে দুঃখ, বেদনা, গ্লানি, অপমান ঝরে পড়ছে। যেন ভুবন এখন মৃত, ওর ভেতরে প্রাণের উত্তাপ নেই। মাঝে মাঝে ও এমন করে ভুবনকে হারায়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। সামনের বাসার হাবিব এসেছে। আমীর দরজা খুলে দেয়। ভদ্রলোক কিছুটা উস্কুখুস্কু, বোঝাই যায় ভয়ে কাবু। সোফায় গা এলিয়ে বলে, চারদিকে কি শুরু হলো বলুনতো?

আমীর নির্বিকার উত্তর দেয়, হওয়াটাইতো স্বাভাবিক। না হলেই অবাক হতাম।

হাবিব সোজা হয়ে বসে সরাসরি তাকায়, কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে এটি একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চক্রান্ত।

কেন, কাশ্মীরের মসজিদ–

রাখেন, সবকিছু ছুতো।

হাবিবের চোখ গোল হয়ে যায়। আমীর এভাবে কথা বলবে ভাবতেই পারেনি। ছুঁচালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। লোকটির দৃষ্টিতে অবিশ্বাস– সন্দেহের চোখে দেখে আমীরকে। আমীর হাবিবের দৃষ্টি বুঝতে পারে না– আবেগের তোড়ে কথা বলে যায়। হাত নেড়ে বলতে থাকে, এটাতো সুস্পষ্ট যে এই দাঙ্গা সরকারের প্ররোচনায় ঘটেছে।

কি বলছেন আমীর সাহেব?

দাঙ্গা প্রতিরোধে সরকারের উদাসীনতাই এর প্রমাণ। একটু তাকিয়ে দেখলেইতো সব দেখা যায় হাবিব সাহেব।

হাবিব উত্তেজিত হয়ে বলে, সরকার কার্ফু দিয়েছে, মিলিটারি নামিয়েছে–

আমীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এসব চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে। ওদের ছত্রছায়ায় বিহারিরা আরো সুযোগ পেয়েছে।

আপনি একটু অন্যরকম করে কথা বলছেন আমীর সাহেব।

সত্যি কথা বলছি বলে কি খারাপ লাগছে আপনার? হাজার হলেও আপনি একজন সরকারি চাকুরে।

আপনি আমাকে খোঁচা দিচ্ছেন?

ছিঃ ছিঃ একদম নয়। আমি কথার কথা বললাম। খুব বেশিদূর যেতে হবে না হাবিব সাহেব, শুধু ষাটের পর থেকে এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে দেখুন। দেখবেন এই দাঙ্গা ঘটতোই।

আপনি বোধহয় বাড়াবাড়ি করছেন।

মোটেই না।

হাবিব যে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হচ্ছে এদিকটা আমীর খেয়ালই করে না। সে একজন শ্রোতা পেয়ে এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মনের সুখে কথা বলে যায়। যেন এই ক্ষোভ ঝাড়া এই মুহূর্তে তার জন্যে খুব জরুরি।

BanglaBook.org

শুনুন হাবিব সাহেব পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে দুর্বল করার জন্য হিন্দু-বিরোধী এই দাঙ্গায় বিহারিদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। দেখছেন না বাঙালিরা এই দাঙ্গা রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জীবনের ঝুঁকি নিতেও তারা পিছপা হচ্ছে না।

আপনার কথা একপেশে, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক। হাবিব রেগে উঠে দাঁড়ায়।

আপনি রাগছেন কেন হাবিব সাহেব? আপনিও তো একজন বাঙালি।

অসম্ভব কথা, আমি একজন খাঁটি মুসলমান। আপনার এ ধরনের ধোঁকাবাজি কথায় আমি বিভ্রান্ত হই না।

হাবিব গট্‌গটিয়ে বেরিয়ে যায়। আমীরের মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শীতের স্নিগ্ধ দুপুর ওর কাছে কেমন ভয়াবহ মনে হয়। বুঝতে পারে হাবিব কেন রেগে যাচ্ছিলো, আসলে ওর গায়ের ওপর শত্রু। পাশাপাশি বাসায় থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন বোঝেনি যে হাবিব মুসলমান এবং বাঙালির বিষয়টা বোঝে না।

আমীর আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দক্ষিণের বারান্দা রোদে ভরে গেছে। গায়ের সোয়েটার খুলে ফেলে ইজিচেয়ারে বসে। নাসিমা রোদ পোহাতে ভালোবাসে। এখন কি করছে ও? রাজশাহীতেও কি দাঙ্গা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে? কোনোকিছুই জানা যাচ্ছে না। ও কি ভয় পেয়েছে? ওদের সাগরপাড়ায় অনেক হিন্দু থাকে। কে জানে মণিকাই বা কি করছে? মেয়েটাকে বুকে নিতে পারলে এই মুহূর্তে ও আর কিছুই চাইতো না। আমীর মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য চোখ বোঁজে। চা খেয়ে শেষ করেছে। কাপটা পায়ের কাছে। মণিকার একটা বেড়াল ছিলো। ওরা যাবার পর থেকে ওটা যেন কোথায় চলে গেছে। ফিরে এসে বেড়াল না পেলে মণিকা ভীষণ কাঁদবে। এই বারান্দায় মণিকা বেড়ালের সঙ্গে বল নিয়ে খেলতো। মণিকা যখন বেড়াল চাইবে তখন ও কি জবাব দেবে?

খালু গরম পানি দিচ্ছি। গোসল করেন।

সেই ভালো।

ও লুঙি-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

গোসল করার পর ওর মাথা ঠাণ্ডা হয়। আসলে ও এতক্ষণ ধরে হাবিবকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছিলো। ও দাঁত কিড়মিড় করে, আইয়ুব খান-মোনায়েম খানের চেয়ে এই লোকগুলো দেশের কম বড় শত্রু নয়। এদের চেহারা বোঝা যায় না। তলে তলে সর্বনাশ করে।

বাথরুম থেকে বেরুলেই আবু আবার কাছে এসে দাঁড়ায়। টেবিলে ভাত দিতে দিতে বলে, ভুবন কাকারে ফোন করেন না ক্যান খালু?

ওর ঘরে তো ফোন নেই।

আমীরের গলায় ভাত আটকে যায়। আবার বিষণ্ন হয়ে পড়ে। আবু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা-ওটা এগিয়ে দেয়।

রাতেও এইসব খেতে হবে না রে আবু?

হ্যাঁ। আমি দুইবেলার রাঁধা একবেলায় রানছি। আমার খুব ডর করে খালু।

ভয় কীসের? আমি তো আছি।

আবু খানিকটা আশ্বস্ত হয়। ওর খাওয়া হলে বাসনকোসন নিয়ে রান্নাঘরে যায়। ওর মৃদু কণ্ঠের গান ভেসে আসে। গানের সুরে ভুবন যেন প্রবল উপস্থিতিতে হাজির হয় আমীরের সামনে। কয়েকদিন আগে ও ভুবনকে বলেছিলো, তোর একজন সঙ্গী দরকার রে।

তুই তো আছিস, তোর চেয়ে ভালো বন্ধু কি হয়?

BanglaBook.org

আমি একজন নারীর কথা বলছি।

নারী?

হা-হা করে হাসে ভুবন। হাসতে হাসতে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়।

এত হাসির কি হলো ভুবন?

নারী মানে আমি বুঝি কালো ধোঁয়ায় আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো, পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া মূর্তি।

তুই তো দেখিসনি।

চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই।

একটা দুর্ঘটনা জীবনের শেষ কথা নয় ভুবন।

আমি জানি। আমি বুঝি। আবার এও জানি আমার এর থেকে মুক্তি নেই।

তুই রাজনীতি সচেতন ছেলে। তোর কি এত হতাশা মানায়?

আমি তাও জানি।

কেবল জানি, জানি করছিস। মানিস না কোনোকিছু। আমীর চেঁচিয়ে বলে।

আমার কাছে জীবনটা ছোট নয় ভুবন। একটি ঘটনাই যদি সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে আমার ভেতরের শক্তি কোথায়? আমি কি একটা ডামি যে ঘটনা অতিক্রম করতে পারবো না?

আমি জানি তোর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তোর মধ্যে হতাশা নেই। তুই সবসময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিস। একজন রাজনৈতিক কর্মীর জন্যে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে তোর সঙ্গে আমাকে এক অবস্থানে নিয়ে আসিস না। তোর বুকে তো একজন বাবাকে খুঁজে ফেরার তৃষ্ণা নেই আমীর? তাকে পেলে কি করবি সেটা বুঝে ওঠার ব্যাকুলতা নেই?

ভুবন থাম, বুঝেছি তুই খুব কষ্ট পেয়েছিস। চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি? এসব কথা আর বলবো না।

ভুবন হেসে ফেলে।

তুই সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস। গান শুনবি?

শুনবো।

সেদিন একটার পর একটা গান গেয়েছিলো ভুবন। প্রাণ খুলে গান গাওয়া। এখনো সেই সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারে না আমীর। আবু কখন থালাবাটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে, হাতের এঁটো শুকিয়ে আসছে, তবু টেবিলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আমীর। ভুবনকে কেন্দ্র করে আজ ওর সময় বারবার স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবনার বলয়ে খৈ-ফোটায়– কখনো তা মধুর, কখনো চনমনে, তবু সবকিছুর অন্তরালে এক গভীর বিষাদ। ও নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে। হাত ধোয়। আবু সুপোরি এনে দেয়, সঙ্গে এলাচি। তখন ফোন বেজে ওঠে। সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এই প্রথম ফোন। ও নিজেও কোথাও করেনি। ঐ ফোনটা সদ্যজাত শিশুর কান্নার মতো আনন্দের সংবাদ হয়ে ওর কানে বাজে। ও দ্রুতপায়ে গিয়ে ফোন ওঠায়।

হ্যালো?

আমীর?

ওপাশ থেকে ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে।

জ্বী, মুজিব ভাই বলুন?

কেমন আছিস?

খুব অস্থির লাগছে।

BanglaBook.org

বুঝতে পারছিসতো ঘটনাটা কি?

হ্যাঁ।

আমাদের পিছিয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে। একে আমাদের ঠেকাতে হবে।

অবশ্যই।

'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন হবার পর অবস্থা সামান্য হলেও আয়ত্তের মধ্যে এসেছে।

'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' নামে ইস্তেহারটি ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে।

সন্ধ্যার পর আমি যেভাবে হোক আপনার ওখানে আসছি। তার আগে ভুবনের বাসায় একটু যাবো।

ঠিক আছে। বুঝেসুঝে পথে বের হোস।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দেয় শেখ মুজিব। আমীর বিছানায় এসে বসে। ডায়রিটা ঘরের কোণে উল্টে পড়ে আছে, উঠিয়ে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ঘুরেফিরে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, জীবনানন্দ দাশ ট্রামের নিচে পড়ে নিহত হয়েছিলেন। লোকে বলে আত্মহত্যা। মানুষ কেন নিজেকে নিজে নিঃশেষ করে? কেমন করে ফুরিয়ে যায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে? একজন কবির কেন মৃত্যুর সাধ হবে? তিনি তো তাঁর কবিতায় সব যন্ত্রণা মুছে ফেলতে পারেন? আমীর ভেবে পায় না হঠাৎ জীবনানন্দ দাশ কেন তার ভেতরে প্রবেশ করলো। জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে কি শেখ মুজিবের কণ্ঠের কোনো সম্পর্ক আছে? বোধহয় আছে। ওই কণ্ঠের মধ্যে ও কবিতার স্পর্শ খুঁজে পেয়েছে বলেই একজন প্রিয় কবির কথাই মনে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। আজকের এই শহরে মৃত্যুর উল্লাস চলছে, মৃত্যুর বেদনা চলছে। যিনি মৃত্যুর উল্লাস বন্ধ করতে চান তিনি কবি। যিনি মৃত্যুর বেদনা ধারণ করতে চান তিনি কবি। এ দুয়ের সঙ্গেই শেখ মুজিব। তাঁর কাছে ছুটে যেতে না পারার জন্য আমীরের মন খারাপ হয়ে যায়। ঘরের চারদিকে তাকালে আলনায় চোখ পড়ে। একগাদা শাড়ি ভাঁজ করা আছে। নাসিমার রঙ-ওঠা শাড়িগুলো আমীরকে বিষণ্ণ করে দেয়। ও বইয়ের র‍্যাক থেকে নিজের লেখা ডায়রিগুলো নিয়ে আসে। ডায়রি লেখা ওর অভ্যেস। দশটি ডায়রি আছে এমন। বছরে একটি লেখা হয়। বাষট্টি সালের দু'টো– ওই বছরে অনেক বেশি লেখা হয়েছিলো। ডায়রিগুলো উল্টেপাল্টে রেখে দেয়। এইসব ডায়রিতে ভুবনের কথাই বেশি লেখা আছে।

গল্পটা ভুবনের কাছেই শোনা। কৈশোরে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আরিচা ঘাটের এক চায়ের দোকানে কাজ করেছিলো মাস দুই। ফেরিতে লোক পারাপার দেখতে নাকি ওর ভালো লাগতো। অন্য সময় যতই চা নিয়ে ছুটোছুটি করুক, ফেরি এলেই ও ঘাটের কাছে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকত, মানুষ দেখতো। মানুষের মুখের আদল দেখতে দেখতে ও কেমন জানি হয়ে যেত। মনে হতো কারো চেহারায় প্রাণ নেই, সব পুড়ে কালো হয়ে আছে। চায়ের দোকানে জব্বার নামের আর একটি ছেলে কাজ করতো। ও কিছুতেই ভুবনকে সহ্য করতে পারতো না। ভুবন লেখাপড়া জানে, গান গায়। মালিক ওকে বেশি ভালোবাসে। গান শুনে দু'টো ডালপুরি বেশি খেতে দেয়। এতকিছু জব্বার সইতে পারে না। সেবার ঘোর বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো যমুনা। একদিন খুব মগ্ন হয়ে মানুষ দেখার সময় ছেলেটি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নদীতে। স্রোতের তোড়ে মুহূর্তে ভেসে যায় ও। দু'দিন পর ঘাট থেকে চার মাইল দূরে বালুর চরে পেয়েছিলো গাঁয়ের লোকে। মইনুদ্দিনের বাসায় সাতদিন ছিলো। ওরা খুব গরিব, তেমন সেবাযত্ন হয়নি। মইনুদ্দিনের বৌ ওকে একদম পছন্দ করতো না। শরীরটা একটু ঠিক হলে ও বাড়ি চলে এসেছিলো।

BanglaBook.org

বহুদিন ওর ইচ্ছে হয়েছিলো জব্বারের ওপর প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু সাহস হয়নি। আর কোনোদিন আরিচা ঘাটে যায়নি ও। এখন ভুবন জব্বারকে করুণা করে। ভুবন বলেছিলো, জানিস জব্বার আমাকে হিংসা করার আরো একটা কারণ ছিলো। অনেক রাতে ফেরিঘাট যখন স্তব্ধ হয়ে যেত– নদীতে ভেসে আসতো হিমেল বাতাস, আমি গলা ছেড়ে গান গাইতাম। আশেপাশের লোকেরা জড়ো হয়ে গান শুনতো। এখন মনে হয় ওরা হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝতো না, কিন্তু সুরে মুগ্ধ হয়ে যেত। চুলদাড়ি সাদা, গালের চামড়া কুঁচকে যাওয়া এক বুড়ো আমার খুব ভক্ত ছিলো। বলতো, তোমার গান শুনলে আমি খুব শান্তি পাই বাবা। মনে হয় সারা দিন রোদে খেটেখুটে এসে যেন প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা পানি খেলাম। জানিস আমীর আমার কখনো মনে হতো লোকটি আমার বাবা নয়তো? একদিন অনেক প্রশ্ন করলাম, দেখলাম, না, তিনি অন্য জায়গার মানুষ। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়, বড়ো তৃষ্ণা নিয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকাই। আমি বড়ো অল্প সময়ে মানুষকে জয় করেছিলাম বলেই জব্বারের বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বলেছিলো। কিন্তু কেন এমন হয় আমীর? ও হয়তো আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। আমি মরে গেলে ও কীভাবে লাভবান হতো? আমি তো আর কখনো আরিচা ঘাটে ফিরে যাইনি। ওরা নিশ্চয় জানে যে আমি মরে গেছি। এখন কি জব্বার খুব সুখে আছে?

উল্টোটাও হতে পারে।

কেমন?

তোকে মেরে ফেলেছে এই বোধে তীব্র অনুশোচনাও হতে পারে ভুবন।

বিশ্বাস হয় না। কারণ ওর মধ্যে প্রচণ্ড হিংস্রতা ছিলো। নিষ্ঠুর লোকের হৃদয়ে অনুশোচনা থাকে না। আমি অনেক মানুষ দেখেছি আমীর। কখনো ভেবেছি মানুষ আমার কাছে খুব সহজ বিষয়, এক মুহূর্তে বুঝতে পারি। পরক্ষণে দেখেছি এর চেয়ে কঠিন বিষয় আর হয় না। সহজে কেউ এ পাঠ নিতে পারবে না। এক জীবনে তো নয়ই, হাজার জীবনেও কেউ পারবে না।

তা ঠিক। তোর সঙ্গে আমি একমত।

ডায়রিটা বুকের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে ও। বুক ধড়ফড় করে, যেন ভুবন ডাকছে, আমীর তুই কথা রাখিসনি। ও শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে পায়চারি করে। সন্ধ্যা নামলেই ও ভুবনের কাছে যাবে– অলিগলি দিয়ে নিশ্চয় পৌঁছুতে পারবে। ভুবন, আমি যে করেই হোক, তোর কাছে পৌঁছবো রে। ও আলনা থেকে চাদর টেনে গায়ে দেয়।

বৈঠকখানার মেঝেতে আবু ঘুমুচ্ছে। মণিকা থাকলে কিছুতেই ওকে ঘুমুতে দিতো না, কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়ে দিতো। মেয়েটি ভীষণ চঞ্চল, দুপুরে কিছুতেই ঘুমুবে না, সারা দিন দুষ্টুমি। যদি কোনোদিন দুপুরে ঘুমোয়তো, রাত বারোটার আগে বিছানায় যাবে না। আর কত যে প্রশ্ন করবে, ভাবলে হাসি পায়। ভুবন খুব ধৈর্য নিয়ে ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমীর অতোটা পারে না, বকা দিয়ে দেয়। তখন ওর মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে আব্বু একটুও ভালো না। আব্বু একটা বানর।

ওর মা বলতো, বানর কি করে হলো? তোমার আব্বুর তো লেজ নেই।

গজাবে, দেখো ঠিক আজ রাতে গজাবে।

অভিমানে ঠোঁট ফুলে ওঠে ওর।

ঠিক আছে যদি গজায় তাহলে তোমার আব্বুকে আমরা চিড়িয়াখানায় রেখে আসবো।

হ্যাঁ তাই হবে। তখন ভুবন কাকু আমাদের বাসায় থাকবে। তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। আমরা বেড়াতে যাবো। খুব মজা হবে মামণি।

BanglaBook.org

নাসিমা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আমীর মজা পায়। হো-হো করে হাসে। এখন মেয়ের কথা মনে করে ও আপন মনে হাসতে থাকে। সোফায় পা গুটিয়ে চাদরে ঢেকে বসে থাকে। কখন সন্ধ্যা নামবে? সন্ধ্যা ভুবনের প্রিয় সময়। বলে, দিনরাতের এই পরিবর্তনের সময়টা আমার কাছে লক্ষ রকম অর্থ বয়ে আনে। তুই বুঝবি না আমীর যে এই সময়টায় আমি কিভাবে বিচলিত হই।

কেন এমন হয়?

আমার কাছে এই পরিবর্তন মৃত্যুর মতো, ঘন কালো। মনে হয় আমি এক দৃশ্যমান জগৎ থেকে অদৃশ্যে চলে যাচ্ছি। আমার এই যাওয়ার শেষ নেই। আমার বুক ফেটে যায়। কখনো সন্ধ্যা নামলে আমার বিশাল পদ্মার কথা মনে হয়, থৈ থৈ জলরাশি প্রবল স্রোতে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ গহ্বরে, যেখানে অথৈ শূন্যতা থাবা মেলে থাকে। জানিস কখনো সন্ধ্যা জনসমুদ্র, কালো কালো মাথা মিলে সমুদ্রের বিস্তার তৈরি করে রেখেছে। এই ধারণা কোথা থেকে জন্মালো জানিস? ষোলো সেপ্টেম্বর যেদিন সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে এলেন, সেদিন বিমানবন্দরে লক্ষ মানুষ যে সংবর্ধনা দিয়েছিলো সেই থেকে এটা আমি ভাবতে শিখেছি। জানিস আমীর সেদিন আমি প্রচণ্ডভাবে বাবাকে খুঁজেছিলাম। এক সঙ্গে অতো মানুষ দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ঐ সংবর্ধনা এই দেশের শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়িয়ে দিয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে যে এ দেশের মানুষ কচ্ছপের গতিতে একটি লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছে। এই গতি ওদের ফুসফুস ফুটো করে দেবে। ওরা মরিয়া হয়ে ছোবল মারবে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে ভুবন। আমি সন্ধ্যার কথা বলছিলাম সেখান থেকে কোথায় চলে গেলাম। সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানিস, সন্ধ্যা আমার কাছে মায়ের শরীর, বাবার চেহারা। একটি মানুষ আমার জীবনকে খুব ছায়া দিয়েছিলো সে, সে আমার ঠাকুরমা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তিনি যখন মরে গেলেন তারপর আমি ওই সংসার ত্যাগ করি। স্কুলের চাকরিটা হয়ে যাওয়াতেই বেঁচে যাই। ওই সংসারে আমি আর ফিরিনি।

আমীর ভেবে দেখলো, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে কাজ করার সময় ও অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, কিন্তু ভুবনের অভিজ্ঞতা একদম ভিন্ন। বড় বেশি হৃদয় নিংড়ানো। এসবের সঙ্গে ওর যোগাযোগ এত প্রত্যক্ষ যে এর থেকে ওকে আলাদা করা যায় না। আমীরের অভিজ্ঞতা উপর থেকে পাওয়া– সহজেই সেসব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে মজা আছে– দুঃখ বা আনন্দের মিশেল আছে, কিন্তু কষ্ট নেই, যে কষ্ট একজন মানুষকে দহন করে।

আমীরের ড্রয়িংরুমের টেবিলে তেষট্টি সালের ডায়রিটা পড়ে আছে। উঠিয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ওপর কতগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করে এক নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করে আইয়ুব সরকার। এই অর্ডিন্যান্সে ক্ষুব্ধ হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকরা। সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে হরতাল পালন করে। সেদিন বিকেলে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সমাবেশে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বলেছিলেন, 'বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন-মরণের সংগ্রামই নয়, সে সংগ্রামের সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত।' সেদিনের লেখা কালো কালো অক্ষরগুলো যেন দাঙ্গার আগুনে দাউদাউ পুড়ছে, আবার জেগে উঠছে। কিছু কিছু সত্য আছে এমন অমোঘ, হাজার চেষ্টা করেও পুড়িয়ে ফেলা যায় না। এই সত্য মানুষের জানা। তবু মানুষ অন্তহীন চেষ্টায় অন্যকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে, জাতিসত্তা নষ্ট করে দিতে চায়। এতকিছু করতে গিয়ে ধ্বংস

BanglaBook.org

হয়। এটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। ও ডায়রিটা রেখে দেয় একপাশে। মাস ছয়েক আগে ভুবন একদিন উধাও হয়। স্কুলে ছুটি ছিলো। বলা নেই, কওয়া নেই একদিন হাওয়া। নাসিমা কয়েকবার বলেছিলো, লোকটার খোঁজ করো গো। কিন্তু কোথায় করবে? ও তো খোঁজ করার জায়গা রাখে না। যত বিচিত্র জায়গা খুঁজে বের করে আসবে। যেখানে ভালোলাগে সেখানে থেমে পড়ে, যে কয়দিন ভালোলাগে কাটিয়ে আসে। নাসিমা আরো একদিন কথাটা বললে হেসেছিলো আমীর, ওকে খুঁজেই যদি পাওয়া যাবে, তাহলে পালাবে কেন?

বিয়ে দিয়ে দাও। তাহলে হয়তো এই পাগলামি কমবে।

দেখো না মেয়ে। জোর করে কিছু করা যায় কি না দেখি।

এরপর নাসিমা প্রবল উৎসাহে মেয়ের খোঁজ করে। ওর বান্ধবীর এক দূর সম্পর্কের বোনকে পায়– মেয়েটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। শ্যামলা, স্নিগ্ধ চেহারা। নিজের বাসায় গানের আসর বসিয়ে ভুবনকে ডেকেছিলো ও। মেয়েটি বেশ অনেকগুলো গান গায়, মুগ্ধ হয়ে শোনে ভুবন। ওরা চলে গেলে আমীর মৃদু হেসে বলে, মেয়েটি কেমন গান করে রে?

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভুবন, চমৎকার, স্নিগ্ধ, মায়াময়। আহা গলা কী, গায়ও ভালো–

আমীর মিটমিটিয়ে হেসে বলে, তাহলে পোড়া কয়লার ধারণা বদলাচ্ছে, না?

ভুবন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

দেখবো মেয়েটিকে?

মানে?

মানে আর কি? নাসিমা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। বুঝতে পারছেন না আমাদের উদ্দেশ্য? আমরা চাই না আপনি আর বেশিদিন একা থাকুন।

অসম্ভব।

ছিটকে ওঠে ভুবন। মুহূর্তে বদলে যায় চেহারা, যেন ছুটে বেরিয়ে যাবে। আমীর দ্রুত হাত ধরে, শোন, বোস, এখনিতো আর কিছু হচ্ছে না। এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন।

ছাড়, যাই।

না।

ভুবনের দৃষ্টি বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

কেন আটকে রাখতে চাইছিস আমীর?

পাগল, আটকে রাখবো কেন? কার সাধ্য তোকে আটকে রাখবে?

নাসিমা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে।

অমন করে বলবে না। আমরা চাই ভুবনদাকে আটকে রাখার লোক হোক।

না বৌদি, হয় না, হবে না, বৃথা চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না।

আপনার জন্যে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার অনেক আছে। আপনি শুধু হ্যাঁ বললেই হয়।

ভুবন চুপ করে থাকে। আমীর জানে এই কথাগুলো আমীর বললে ভুবন এতক্ষণে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো, নইলে এমন এক বিষণ্ন সুরে কথা বলতো যে, বেশিদূর এগুনো যেত না। নাসিমা বলেই ও চুপ করে আছে।

কিছু বলছেন না যে ভুবনদা?

বৌদি প্লিজ, আমাকে চাপ দেবেন না।

ঠিক আছে আপনি ভাবুন। আমরা অপেক্ষা করবো।

এই অন্ধকার প্রহর কোনোদিন ফুরোবে না।

BanglaBook.org

নিশ্চয় ফুরোবে।

নাসিমা জোর দিয়ে বলে। ভুবন কথা না বলে মণিকাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমীর বুঝতে পারে ও নিজেকে আড়াল করেছে। নাসিমা কিছুটা আহত হয়ে উঠে চলে যায়।

সন্ধ্যার পর দু'জনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটে। ঠাণ্ডা বাতাস, কখনো দমকা হয়ে ঝাপটা দিয়ে যায়। কপালের ওপর উড়ে আসে চুল। ভুবন মাঝে মাঝে চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে সেগুলো বিন্যস্ত করে।

আমীর বেশ মৃদুস্বরে মোলায়েম করে বলে, এমন কোনো সঙ্গী পেলে তোর জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো রে?

ভুবন চুপ করে থাকে। কিছুটা বিরক্ত হয়। এই একটা কথা বারবার ওরা বলছে কেন? ও পছন্দ করছে না জেনেও! এই পীড়নের মানে কি? ও রেগে ওঠে।

আমি জানি রাজনৈতিক কর্মী শত্রুকে পীড়ন করে কিন্তু বন্ধুকে নয়। আমার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা কি তোর উচিত হচ্ছে? যদি তেমন কিছু ভাবি তাহলে আপনা থেকেই তোকে বলবো।

সরি। আমি তোকে আহত করতে চাইনি।

আমীর গম্ভীর হয়। ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়, উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসছে।

রেললাইনের পাশে ঝুপড়ি মতো চায়ের দোকান। খোলা আকাশের নিচে টেবিল আর বেঞ্চ পাতা। দু'জনে জাঁকিয়ে বসে।

জায়গাটা ভালো না রে ভুবন?

হ্যাঁ।

ঝিঁঝির ডাক আসছে একটানা। ছোট একটা ছেলে এসে দু'গ্লাস পানি রাখে। আজ দোকানে লোকজন কম। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব।

কি খাবেন সাব?

চারটে ডালপুরি আর দু'কাপ চা।

ছেলেটি চলে যায়। ভুবন গুনগুনিয়ে গান গাইছিলো। হঠাৎ গান থামিয়ে বলে, ছেলেটিকে দেখে নিজের কথা মনে হচ্ছে রে।

কেমন!

একবার সিলেটের কমলগঞ্জ রেল-স্টেশনে চায়ের দোকানে কাজ করি। খদ্দেরকে চা দিতে গিয়ে কি যে হলো হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। মালিক এমন জোরে একটা থাপ্পড় দিয়েছিলো যে একটা দাঁত পড়ে গিয়েছিলো। ভাবলে এখনো ব্যথা পাই গালে। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারতাম না। একদিন এক মালগাড়ির কামরায় উঠে পড়ি। চুপচাপ শুয়েছিলাম। কোথায় এসেছিলাম, কিছুই জানি না। একজন কুলির কাছে কয়দিন ছিলাম। লোকটির খুব দয়া ছিলো। আমাকে ওষুধ কিনে দিয়েছিলো, দুধ খেতে দিয়েছিলো। তারপর একদিন বললো, দেখেতো মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে। বাড়ি থেকে পালিয়েছিলি কেন?

বলেছিলাম, আমার অভ্যেস। থাকতে ভালোলাগে না।

খুব খারাপ। এমন ঘরছাড়া হলে কাঁদতে হবে শুধু।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, কান্না দিয়ে শুরু, আমাকে ভালোমন্দ কি শেখাবে কাকা? লোকটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। ওর কেউ ছিলো না। একটা

BanglaBook.org

ঝুপড়িতে থাকত– ফুটো ছাদ দিয়ে ঘরে বৃষ্টি পড়তো। কেন ওর কেউ ছিলো না সেটা আমি কখনো জানতে পারিনি– দেখতাম চুপচাপ বসে বিড়ি টানছে, নয়তো অসুরের মতো খাটছে– কাজে ফাঁকি ছিলো না। সেদিন মনে হয়েছিলো লোকটি ওর ওই অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে আমার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। অমন করে তাকালে আমি ভয় পেতাম, হিম হয়ে যেত আমার শরীর। একদিন বলেছিলো, তোর ভেতরে নিজেকে দেখতে পাই বলে তোকে আমার ভালোলাগে। তুই যেন আমার কিশোর বেলা, অবিকল আমি হয়ে ফিরে এসেছিস।

তোমার কেউ নেই কেন?

পালিয়ে থাকি বলে।

পালিয়ে থাকো কেন?

সে মেলা কথা। বলবো একদিন। দোলযাত্রার দিন শুনিস।

তোমার বাবা কোথায়?

জানি না।

মা?

ছিলো একসময়।

তারপর গাঁজায় দম দিয়েছিলো লোকটি। আমি আরো কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তর দেয়নি। তারপর ক'দিন লোকটির খুব জ্বর হলো। বুঝতেই পারিস, কাজ নেই, খাওয়াও নেই। আমি এদিক-ওদিক করে কিছু জোটাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তেমন সুবিধে হয় না। না খেয়ে ওকে খাওয়াতাম। কদিন পর সুস্থ হলো। বললো, তোর খুব কষ্ট গেলো ক'দিন না রে?

আমার কি কষ্ট? আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তুমি আমার জন্য যা করেছো তার এককণাও না।

কৃতজ্ঞতার ভাষা জানিসতো। তুই লক্ষ্মী ছেলে।

তারপর বিড়ি খেয়ে প্রবল কাশিতে লোকটা কেমন অস্থির হয়ে যেত। একদিন মেইল ট্রেন আসবে, শরীর খুব দুর্বল, প্ল্যাটফরমের কোল ঘেঁষে বসে আছে। আমি বললাম, এত কাছে বসে আছো কেন? এখুনিতো ট্রেন আসবে?

বললো, আসুক। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার মাথায় হাত রেখে বললো, বাড়ি ফিরে যা। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরাই উচিত।

আমাকে তাড়াতে চাইছো কেন? আমি কি তোমার বোঝা?

তোকে টানতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি? আমার কাছে তো ঠিকমতো খেতে পাস না।

চাই না খেতে, তোমাকেই চাই। বলেছিলে না দোলযাত্রার সময় সব কথা বলবে।

ও হেসেছিলো। বললো, যা একটা বিড়ি নিয়ে আয়।

এখুনি ট্রেন আসবে। তুমি ওঠো।

তুই যা না।

আমি গেলাম বিড়ি আনতে। ট্রেনে ঢুকলো হুসহুসিয়ে। ব্যস, ঝুপ করে পড়ে গেলো নিচে। ছুটে এসে দেখলাম টুকরো টুকরো শরীর। মাথা থেঁতলে মাংসের দলা হয়ে গেছে। সেদিনই পালিয়ে এলাম। তারপর প্রায় দু'বছর আমি বাড়ি থেকে বের হইনি।

স্যার ডালপুরি।

আমীর একটা উঠিয়ে মুখে পোরে। ভুবন হাত গুটিয়ে বসে থাকে। খেতে পারে না। থকথকে মাংসপিণ্ড ওর চোখের সামনে জোনাকির মতো জ্বলছে আর নিভছে। কত অল্প

BanglaBook.org

সময়ের জন্যে একটি মানুষের সঙ্গে পরিচয়, কত অল্প সময়ে একটি মানুষের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী, অথচ কত দীর্ঘ তার ছাপ। আমৃত্যু এ কি ভোলা সম্ভব? চোখ বুঁজলেই মুহূর্তে সামনে ভেসে ওঠে।

খাবি না ভুবন?

তুই খা।

মন খারাপ হয়ে গেলো? এত মন খারাপ করলে কখনোই খেতে পারবি না। মানুষ যদি ভুলে না যেত তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হতো ভুবন।

আমি চা খাবো।

ছেলেটা চা এনে দেয়।

দু'একজন করে খদ্দের এসে জায়গাটা ভরে উঠেছে। আশেপাশের টেবিল থেকে কথা শোনা যায়, সঙ্গে উচ্চ হাসি। ভুবন দুই চুমুকে চা শেষ করে ফেলে। চায়ে বেশি মিষ্টি দিয়েছে। গা কেমন ঘুলিয়ে উঠছে। আমীর শেষ পুরিটা খায়।

আমীর তোর সেই গল্পটা বল?

গল্প না ভুবন।

গল্পই। সেটাই যখন স্মৃতিতে গেঁথে যায় তখন আমি তাকে গল্প বলি। সে গল্প শুনলে সুখ বা দুঃখ হয়, অর্থাৎ অনুভূতি নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সেবার আদমজী পাটকলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যায়। বাঙালি শ্রমিকদের অভিযোগ ছিলো বিহারিদের সুযোগ-সুবিধা বেশি দেয়। ওভারটাইম বাঙালিদের দেয়ই না। ঘটনা সবটাই সত্যি। অনেকদিন ধরেই অসন্তোষ জমছিলো, তারপর ফেটে পড়লো। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। দা-ভোজালির ঝনঝনিতে এলাকা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের একজন খুব ভালো কর্মী ছিলো রফিক। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো ইকবালের। রফিকের মত হলো, ইকবাল বিহারি না মিশরি এটা বুঝি না, আমি জানি ও খুব ভালো ছেলে। অন্যরা সবাইতো ক্রোধে উন্মত্ত। ওদের কাছে এইসব ছেঁদো কথার মূল্য নেই। রফিকের ঘরে লুকিয়ে ছিলো ইকবাল। ওরা যখন ভোজালি নিয়ে তেড়ে এলো তখন রফিক বাধা দিলো। প্রথম কোপেই শেষ হয়ে গেলো রফিক। তারপর চৌকির নিচ থেকে ইকবালকে টেনে বের করে কুচিকুচি করে কাটলো। মানুষ কত নৃশংস হয়ে যেতে পারে ভুবন না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন অনেক কিছুই শেষ, অনেক কিছু নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবু আমরা যা করতে পেরেছিলাম সেটাও অনেক ছিলো। রফিক এবং ইকবালের মৃত্যু সত্যিই বেদনার, ভোলা যায় না। চোখ বুঁজলে দেখতে পাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ওদের শরীর, ফিনকি দিয়ে ছুটে যাওয়া রক্তের ধারা। সবচেয়ে ভয়াবহ কি জানিস? কাটামুণ্ডু থেকে ছিটকে ওঠা চোখের মণি। নৃশংস! ওহ!

আমীর দু'হাতে মুখ ঢাকে।

নৃশংসতার অনেকরকম চিত্র আছে আমীর। মনে আছে শেরে বাংলা ফজলুল হক মৃত্যুর আগে কি বলতেন? বলতেন, 'আল্লাহ! যে দেশে আমার ভোট নেই, সে দেশে বাঁচার ইচ্ছা আমার নেই। আমাকে তুমি তুলে নাও।' সে সময় আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র আমার কাছে নৃশংস মনে হয়েছিলো আমীর। শব্দের কি আশ্চর্য হেরফের বলতো? তুই নৃশংসতা দেখেছিস একভাবে, আমি দেখেছি অন্যভাবে। দু'টোরই চরিত্র একদম ভিন্ন, আবার খুব নিকট। এই নিকট এবং দূরের অর্থে শব্দগুলো গভীর তাৎপর্যময়।

তোর এটাই গুণ ভুবন, তুই এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যেতে পারিস। মনে আছে বাষট্টির পনেরো মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ধর্মঘট করলো।

BanglaBook.org

মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় শাসনতন্ত্রের দু'টি কপি পোড়ানো হলো। পূর্ব বাংলাবাসীর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলো আইয়ুব খান। ছেলেরাও ছাড়বার পাত্র নয়। তিন দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে শুরু হলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট। এক. নয়া শাসনতন্ত্র অবিলম্বে বাতিল কর; দুই. দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম কর; তিন. সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দাও। মিছিলে-স্লোগানে ভরে উঠেছিলো ঢাকার রাস্তা। কাঁদানে গ্যাস দিয়ে সে মিছিল প্রতিহত করলো পুলিশ, গ্রেফতার করলো অসংখ্যজনকে।

এখনো মনে হয় এইতো সেদিনের কথা, চোখের সামনে ভাসে।

কিছু কিছু জিনিস ভুলে যাই না কেন বলতো আমীর?

ভোলা সম্ভব নয় বলে।

ভুবন আবার চা খেতে চায়। আশেপাশে ভিড় বাড়ে। মানুষের গল্পের শেষ নেই, আড্ডার শেষ নেই। অফুরন্ত সময়, শুধু কোনোমতে উড়িয়ে দেয়াই যেন লক্ষ্য। আকাশে ফুটি ফুটি তারা, চারদিক অন্ধকার। আমীর ভাবে মানুষের এই লক্ষ্যহীন চলাকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে মোড় ফেরানো যায় না? সমস্ত শক্তি একত্র করলে একটা চমৎকার সমাজব্যবস্থা তৈরি হতে পারে, যেখানে সবার দুঃখের অংশী হবে বাকিরা। কাঁটাবন বস্তির ভাঙা ঘরে শুয়ে কাঁদতে হবে না হারুনের মাকে।

কি ভাবছিস আমীর?

চল উঠি ভুবন। হারুনের মায়ের ওখানে যেতে হবে।

চল।

দু'জনে রেললাইনের ধার দিয়ে দ্রুত হাঁটে। ওরা হাঁটতেই বেশি অভ্যস্ত, টুকটাক কথা হয়– বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো কথা।

দু'জনে যখন হারুনের মায়ের ঘরে আসে তখন কারো মুখেই কথা নেই– দু'জনে অন্য কোনো ভাবনার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে। হারুন মায়ের তিন ছেলের মধ্যে শেষ অবলম্বন ছিলো। দু'ছেলে মরেছে দুর্ঘটনায়। একজন বাস এ্যাকসিডেন্টে, অন্যজন লঞ্চ ডুবিতে। হারুন মারা গেছে দাঙ্গায়। বুড়ির আর কেউ নেই। তিন ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলো বিশ বছর আগে। এখন অসুস্থ, শরীরের নিচের অংশ অবশ, শরীর শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে। রুক্ষ মেজাজী। কারণে-অকারণে চিৎকার করে গালাগালি করে। পার্টি থেকে হারুনের মাকে সাহায্য করা হয়। একটি মেয়েকে রাখা হয়েছে দেখাশোনা করার জন্য। আমীর দু'চার দিন পরপর এসে দেখে যায়– মেয়েটির কাছে টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। চিকিৎসাও করানো হয়েছিলো, এখন তেমন কিছু করার নেই।

ঘরটা এমন অন্ধকার কেন বলতো?

মেয়েটি বোধহয় আসেনি। হারিকেন জ্বালেনি। আমীর দু'পা এগিয়ে অনুচ্চ স্বরে ডাকে, সকিনা, ও সকিনা? সাড়া নেই। আশেপাশের ঘর থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসে।

সকিনা কই কালুর মা?

সকিনা? সেই যে টাকা দিয়ে গেলেন তারপরই তো মালেকের সঙ্গে পালিয়েছে।

পালিয়েছে?

হ্যাঁ।

আশপাশ থেকে হি-হি করে একটা হাসির রোল ওঠে।

আমি তিনদিন আগে এসেছিলাম। আল্লাহই জানে এর মধ্যে কি হাল হয়েছে বুড়ির। কেউ একটা কুপি আনো তো?

পাশের ঘর থেকে একটা হারিকেন আনে একজনে। ঘরে ঢোকা যায় না– উৎকট গন্ধ।

BanglaBook.org

আমীর নাকে রুমাল চেপে ভেতরে ঢোকে। মরে আছে নাকি বুড়ি? নোংরা কাঁথা-বালিশ। বোঝাই যায় তিনদিন বুড়ির কেউ খোঁজ করেনি। সকিনা পালিয়েছে, ঠিক আছে। বয়সটাই পালানোর। কিন্তু কারো হাতে বুড়ির দায়িত্বটাতো দিয়ে যেতে পারতো? এতটুকু মানবিক হতে পারলো না কেন সকিনা? কাউকে দিয়ে আমীরকে খবর পাঠাতে পারতো তো? হারুন ওদের পার্টির দারুণ কর্মী ছিলো। তার ফল কি এই যে ওর মায়ের এই পরিণতি হবে? বুড়ির মৃত্যুর জন্যে যতটুকু না দুঃখ, তার চেয়ে বেশি বুকে বাজলো সকিনার অমানবিক আচরণ। ভালোবাসার লোকের সঙ্গে নীড়ের স্বপ্ন বাঁধার আকাঙ্ক্ষা ওর জন্যে যেমন সত্য, এই দায়িত্ব পালন করাটাও তেমন সত্য ছিলো। সে রাতে ভুবন আর ও হারুনের মাকে কবরস্থানে নিয়ে যায়। দাফনের ব্যবস্থা করে। ভুবন দূরে চুপচাপ বসেছিলো। ও কখনো গুনগুনিয়ে গান গাইছিলো। সব ঠিকঠাক করে গোরস্তানের লোকজনের হাতে দিয়ে ও যখন ভুবনের কাছে বসে তখন ভুবন আস্তে করে বলে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান, আমার বলতে ইচ্ছে করছে, কত বিচিত্ররূপে হেরিনু তোমায় মৃত্যু-জননী। ভুবনের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। আমীরের মেজাজ খারাপ।

সকিনা নয় পালিয়ে গেলো ভুবন কিন্তু আশেপাশে কেউ কি ছিলো না যে বুড়ির খোঁজ করে? মানুষ কি এমনই উদাসীন, এমনই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে? কাদের জন্য আমরা সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবি?

রাত বাড়ে। ওরা বসেই থাকে। দাফনের কাজ শেষ। টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়েছে। নাসিমা হয়তো ভাবছে, উৎকণ্ঠায় পায়চারি করছে। আমীর না ফেরা পর্যন্ত ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কোনোকিছুতে স্বস্তি পায় না।

তোর ঘরে ফেরা উচিত আমীর।

তুই যাবি না?

ভাবছি এখানেই শুয়ে থাকি।

কি বলছিস পাগলের মতো? আমীর চেঁচিয়ে ওঠে।

তুই কি আমাকে নতুন দেখছিস? আমি সব পারি।

অসম্ভব। আমি তোকে এখানে রেখে যেতে পারবো না।

ভুবন শব্দ করে হেসে ওঠে। অন্ধকারে সে হাসিতে গা ছমছম করে ওঠে আমীরের। এমনিতেই মেজাজ খারাপ। যে বিকেলটা অমন সুন্দর গানের আসর দিয়ে শুরু হয়েছিলো সেটা যে এভাবে শেষ হবে কে জানতো? ওদের হাসি শুনে পাহারাদার এগিয়ে আসে।

স্যার আপনারা যাবেন না?

যাবো। যাচ্ছি।

কি ফুলের গন্ধ আসছে বলতে পারেন?

ভুবনের আচমকা প্রশ্নে পাহারাদার হকচকিয়ে যায়।

জানেন না ফুলের নাম?

না। কতজনে কত ধরনের চারা নিয়ে আসে তার সব কি আমি জানি!

ফুলটা কামিনী। হারুনের মায়ের কবরে তুই একটা শিউলি ফুলের গাছ লাগিয়ে দিস আমীর।

সে হবে কাল-পরশু একদিন। তুই ওঠ?

ভুবন পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় থাকেন?

ঐ দিকটায়।

আর কে থাকে?

BanglaBook.org

একাই।

তাহলে আমি আজ রাতে আপনার সঙ্গে থাকবো।

পাহারাদার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে, ঘুমুতে কষ্ট হবে।

আমার অভ্যেস আছে। চলুন আপনার ওখানে যাই। দু'জনে গল্প করবো। আমীর তুই চলে যা।

ভুবন আমীরকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পাহারাদারের ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটতে থাকে। আমীর কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনকে কিছু বলার ইচ্ছেও হয় না। অকস্মাৎ এই নির্জন গোরস্তানে ওর ভীষণ ভয় করে। দ্রুতপায় বেরিয়ে আসে। রিকশায় উঠেও স্বস্তি হয় না। ঘরে ফিরে ডায়রিতে একটা লাইন লেখে, সকিনাকে ক্ষমা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? মানুষের অমানবিক হয়ে ওঠা এই পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম কাজ।

খালু? চা।

বাহ্ আমি এই মুহূর্তে মনে মনে চা-ই চাইছিলাম আবু। তুই কি করে টের পেলি আমার মনের কথা?

ও বোকার মতো হাসে। বিস্কুট দিমু?

না, থাক। দুপুরে যা খেয়েছি না পেট একদম ঠেসে আছে। আর একটু হলে ফেটেই যেত।

আবু বিগলিত হয়ে হাসে।

তোর খালাম্মা এলে বলবো আবুর মতো ছেলে হয় না।

খালাম্মা তো আমারে কয় দুষ্টুর শিরোমণি।

তোকে বেশি আদর করে তো সেজন্য।

আবু খুশি হয়ে মাথা নাড়ে। বোঝা যায় উত্তরটা ওর মনঃপুত হয়েছে।

রাতে কি রাঁধবি বলতো?

কি আর, দুপুরের মতোই। মাগো অবস্থা কেমুন খারাপই হইতাছে। গুণ্ডাগুলা কেমুন যে করে! একটু আগেও বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখলাম বড় বড় রামদা হাতে দৌড়াইতাছে। আমার যা ডর করছে। আপনি কিন্তু বারাইবেন না খালু?

সন্ধ্যা নামলে লুকিয়ে বেরুবো। ভুবনের একটা খোঁজ নিতে হবে না?

খোঁজ লইয়া আর কি হইবে? আবু ম্লান মুখে বলে।

তুই বুঝিস না ওর খোঁজ না নিতে পারলে আমি মরেই যাবো।

দুইমাস আগে যে কোনহানে চইলা গেছিলো আপনি কি খোঁজ লইতে পারছিলেন? উনিতো এমুনই করে।

তাতে কি! এখনতো আর তখনকার মতো অবস্থা না। বিহারিগুলো যে হিন্দুদের মেরে ফেলছে রে আবু?

আমীরের কণ্ঠ অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়। ওর বুকজুড়ে আবেগের বন্যা। নিজেই থই পায় না। সারাদিনের বন্দী অবস্থা অসহ্য লাগছে। কার্ফু উপেক্ষা করে রাস্তায় লোক নেমেছে ভোজালি হাতে। ও নিরস্ত্র হয়ে নামতে পারবে না কেন? ওরা খুন করতে নেমে যদি অপরাধ না করে থাকে তাহলে ওর অপরাধ কীসের? পরক্ষণে দমে যায় মন। এটাইতো এই রাজনীতির খেলা। নিরস্ত্র হয়ে রাস্তায় নামাটাই আজকের দিনে ওর অপরাধ। বদলে গেছে পরিস্থিতি।

খালু?

কি?

BanglaBook.org

তেমুন বিপদ হইলে ভুবন কাকা আমাগো বাসায় আসতে পারলো না?

কি জানি। হয়তো সুযোগ পায়নি। হয়তো ওর ইচ্ছে হয়নি। হয়তো গোরস্তানে থেকে যাওয়ার মতো বিচিত্র আকাঙ্ক্ষায় ও অন্য কোথাও চলে গেছে। নয়তো ওর ঘরে ভোজালি হাতে ঢুকে পড়া মানুষগুলোর সামনে ও গান গাইতে চেয়েছিলো? কি করছিলো ভুবন? মাস দুই আগে ভুবন চলে গিয়েছিলো মেঘনা ঘাটে। এক জেলের সঙ্গে দিন সাতেক কাটিয়ে আসে। কত বয়স হলো ভুবনের? এখনো কি ও ঘরে ফিরবে না? না বয়স দিয়ে ওকে বিচার করা যাবে না। ওর বয়স বাড়বে না। কোথাও থেকে ফিরে এলে ও এখনো বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

জানিস সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। লোকটার সঙ্গে আমি নৌকা বাইতাম। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, সারাদিন পানির সঙ্গে খেলা। এই অভিজ্ঞতার সুখ বলে বোঝানো যায় না। চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভুবনের। এক অপার্থিব আনন্দে চক্‌চক্‌ করে দৃষ্টি।

জানিস একবার খেপুপাড়ার জেলেদের সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম। ওদের সঙ্গে মাছ ধরতাম। কিন্তু এই বুড়ো একদম অন্যরকম। ওরা আমাকে সমীহ করতো, শহুরে লোক বলে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে থাকত। রান্না হলে মাছের বড় টুকরোটা আমাকে দিতো। কিন্তু এই বুড়ো ভুল হলে খেঁকিয়ে উঠতো, ক্লান্ত থাকলে নৌকা বাওয়ার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিতো, বেশি সিগারেট খেলে শাসন করতো, বৃষ্টিতে বেশি ভিজলে গালাগালি করতো। যেন একজন পিতা তার সন্তানের সঙ্গে আচরণ করছে। আমি বুড়োর সঙ্গ খুব উপভোগ করেছি রে। কখনো রাগ হয়নি আমার। প্রথম যেদিন গেলাম, দোকানে চা খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছি। ভাবছি কি করবো, কোথায় যাবো। দেখলাম অনেকগুলো কেরায়া নৌকা। বেশ খানিকটা নিচে গেলাম। বুড়ো বসেছিলো গলুইয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, চাচা আপনার নাম কি?

বুড়ো ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো। ফোকলা গালে কথা ফ্যাসফ্যাস করে। কি যে বললো কিছু বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকেন?

হাত দিয়ে অনেক দূরের কিছু একটা দেখিয়ে দিয়ে বললো, অনেক দূরে গ্রাম।

রাতে কোথায় থাকেন।

নৌকায়।

আমি আপনার সঙ্গে থাকবো?

কেন? বুড়ো অবিশ্বাসের চোখে তাকালো। তারপর অকপটে বললো, আমি নিজেই খেতে পাই না।

খাওয়ার টাকা আমি দেবো।

তাহলে থাকো। কয়দিন থাকবে?

যতদিন মন চায়।

কেন থাকতে চাও?

নদীতে থাকতে কেমন লাগে সেটা দেখবো।

পাগল।

বুড়োর ফোকলা গালে সরল হাসি। ভুবনের চোখ জুড়িয়ে যায়, কী সুন্দর দেখাচ্ছে মানুষটাকে– যেন ওর জীবনের কোথাও কোনো দুঃখ নেই। শুধু অভাবটাই সঙ্গী, তবু ঘায়েল করেনি, ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেয়াটা এত গভীর বিশ্বাস থেকে যে এটা অর্জন করা এক দুর্লভ গুণ।

BanglaBook.org

চাচা আপনার কে আছে?

তোমার চাচি আছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছয় ছেলে আছে। সবার ঘরে নাতী নাতনী আছে। মেলা বড় সংসার।

আপনি এই বয়সে নৌকা বেয়ে রোজগার করেন কেন? ছেলেরা টাকা-পয়সা দেয় না? দিলেই নেবো কেন? যতক্ষণ পারি নিজের আয়ে খাবো। তোমার চাচি ছেলেদের সংসারে থাকতে চায় না।

ভালো, খুব ভালো।

তা তুমি রোদে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে বসো।

ভুবন লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। ছলকে ওঠে পানি। মানুষটাকে ওর পছন্দ হয়– নৌকায় উঠে দেখলো বুড়ো তোলা-চুলোয় ভাত বসিয়েছে, টগবগ করে ফুটছে ভাত। ভেতরে গোটানো কাঁথা-বালিশ– ময়লা, তেল চিটচিটে। ছইয়ের সঙ্গে হারিকেন ঝোলানো, নারকেলের মালা দিয়ে হাতা বানানো, মাটির সানকি, পানির কলসি। ছোটখাটো এই সংসার মন্দ নয়। ছৈয়ের ওপরে বুড়োর লুঙি বাতাসে পত্‌পত্‌ উড়ছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে জুতো খুলে জুত করে বসে ভুবন।

ভাতের ভেতর দু'টো আলু সেদ্ধ দিয়েছি। এই খাওয়া, পারবেতো।

খুব পারবো চাচা।

তোমার বাড়িঘর নেই?

না।

কেউ নেই?

না।

এই জন্য পথে পথে ঘোরো। বিয়ে করো না কেন?

মেয়ে দেবে কে।

মেয়ের আবার অভাব।

বুড়ো সরল হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তোলে।

তুমি কয়টা বিয়ে করবে বলো? আমি মেয়ে খুঁজে দেবো।

হো-হো করে হাসে ভুবন। বুড়োর এই অকপট সরলতায় ও মুগ্ধ হয়। তারপর ও ছৈয়ের ভেতর চিৎপাত শুয়ে পড়ে– নদীর বাতাসে ঘুম পায়।

জানিস আমীর দু'দিন পর লোকটি আমাকে বললো, মেয়ের জামাইর খুব অসুখ, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবো। তুমি যাবে? আমি তো এককথায় রাজি। ছোটখাটো জায়গায় যাচ্ছি কয়দিন ধরে। দূরপাল্লার কোথাও যেতে পারলে আমার ভালো লাগবে। পথে এক হাট থেকে আমি মিষ্টি কিনলাম ওর নাতি-নাতনীর জন্য। পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেলো। গিয়ে দেখলাম কান্নার রোল, কলেরায় মারা গেছে জামাইটি। দু'দিন থেকে মেয়েটিকে নিয়ে ফিরতে হলো আমাদের। বুড়োর সেকি বুক-ভাঙা কান্না আমীর! আমি কিছুতেই সইতে পারছিলাম না। মেয়েটি নৌকার মধ্যে মূর্ছিতের মতো পড়ে রইলো। বয়স অল্প, এর মধ্যে তিনটে ছেলেমেয়ে। ওদেরকে বাড়িতে রেখে আমি অন্যের নৌকায় ফিরে এলাম ঘাটে। তারপর সোজা ঢাকা। আমি বুড়োর সঙ্গে দেখা করিনি আমীর। সেই সরল অকপট হাসিভরা মুখে বিষণ্নতার ছায়া আমার সহ্য হয়নি। ভাবছি, এখন থেকে আর কোথাও যাবো না। গেলেই এমন একটা কিছুর মুখোমুখি হয়ে যাই যে ভার বহন করতে কষ্ট হয়। এই পালিয়ে যাওয়া আমার কষ্টকর জীবনে কষ্টই বাড়িয়েছে অনবরত। যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা– যাকে কোনো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যাবে না, যার ওজনের কোনো পরিসীমা নেই। তবে আনন্দও যে পাইনি তাও নয়। বর্ষার

BanglaBook.org

ভরা নদী, পূর্ণিমার রাতের লালদিয়ার চর। তালতলির বৌদ্ধমূর্তি, রামুর বৌদ্ধ মন্দিরের বিশাল লোহার ঘণ্টা কিংবা কাঠের ওপরের অসাধারণ কারুকাজ, এমনি ছোটখাটো আরো কতকিছু চোখ জুড়িয়েছে, মন জুড়িয়েছে। ভুলিনি কিছুই, ভুলবো না কোনোদিন। সবটাই সঞ্চয়, সবটাই লাভ। ক্ষতি নেই আমীর।

বলতে বলতে ভুবন বিষণ্ন উদাস হয়ে যায়। এরপর ও আর কোথাও যায়নি। হয়তো যাবে, যাওয়াটাই ওর জন্য স্বাভাবিক। বাইরে কোলাহল বাড়ছে। আমীর ফেলে দেয়া ডায়রিটা ঘরের কোণা থেকে উঠিয়ে এনে টেবিলে রাখে। আবু নিচে গেছে। তখন দরজায় আবার শব্দ হয়। হাবিব এসেছে। আমীরের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘরে আর কতক্ষণ থাকা যায় বলুনতো, তাই আপনাকে আবার বিরক্তি করতে এলাম।

না, না বিরক্ত কীসের, বসুন।

হাবিবের কুঞ্চিত কপাল, মুখে অবিশ্বাসের হাসি। বলে, একা একা খুব খারাপ লাগছিলো–

আপনারতো তবু পরিবারের সবাই আছে। আমার ঘরেতো কেউ নেই। আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন?

আপনি কি করে যে সারাদিন কাটালেন!

আমার নানা ধরনের কাজ আছে। চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। সময় কোথা দিয়ে চলে যায় টেরই পাই না।

তা তো বটে। আপনি রাজনৈতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাহিত্যিক, কত কিছু। আমি তো ছাপোষা মানুষ। অফিসে যাই আবার ঘরে ফিরি। এই যেমন আজকের ঘটনাটি নিয়ে কতকিছু ভেবে বসে আছেন। আমি এসব চিন্তাই করতে পারি না। আপনাদের অসাধারণ ব্রেন বলতে হবে।

হাবিবের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। আমীর মুহূর্তে বুঝে যায়, লোকটি গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছে সন্দেহ নেই। সকালে রেগেমেগে চলে গিয়ে এখন আবার এসেছে, হয়তো মনে মনে কিছু ঠিক করে এসেছে।

সকালে আপনার কথা শুনে আমি টেলিফোনে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। সবাইতো অবাক। কোথায় মুসলমানদের একটা ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে দাঙ্গার ইস্যু। আর আপনি কিনা কত কি ব্যাখ্যা করছেন।

আমীর গম্ভীর হয়ে যায়। কিছুটা রূঢ় কণ্ঠে বলে, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি।

আপনাদের এই এক দোষ, একতরফা ভাবে দেখেন। কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে এমনই হয়।

আপনি কি ঝগড়া করতে এসেছেন হাবিব সাহেব?

মোটেই না। এলাম একটু গালগল্প করে সময় কাটাতে।

বলুনতো কত লোক এ পর্যন্ত কাটা পড়েছে?

তা আমি কি করে জানবো!

আপনি যাদের ফোন করেছিলেন তাদের জিজ্ঞেস করেননি?

প্রশ্নটা মনে হয় একটু বাঁকা ভাবে করছেন?

আমীর চুপ করে থাকে। উত্তর না দিয়ে বলে, চা খাবেন? আবু? আবু?

না, না থাক। আমি এই খেয়ে বেরিয়েছি। গিন্নী পেঁয়াজু ভেজেছিলো। অনেকগুলো খেয়ে ফেললাম।

শুনেছেনে বোধহয় 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন হয়েছে!

BanglaBook.org

শুনেছি। কমিটির আহ্বায়ক শেখ মুজিবুর রহমান।

আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি?

আমার এক বন্ধু টেলিফোনে জানালো। ইত্তেফাক ভবনে বসে নিরানব্বই জন নাগরিক নিয়ে এই কমিটি।

ভালোই হয়েছে কি বলেন? এদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়ে আসছে। নইলে কত যে নিরীহ লোক মারা যেত!

কাফেরদের মরাই উচিত।

হাবিবের কণ্ঠে আক্রোশ এবং ঘৃণা উপচে ওঠে। আমীর প্রথমে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর দ্রুত বলে, ছিঃ এভাবে বলা উচিত নয়।

আপনি নিজেকে ফেরেশতা ভাবার চেষ্টা করছেন। আমার অত ভণিতা নেই। সোজাসুজি কথা বলি। পাকিস্তান মুসলমানের দেশ। আমি মুসলমান। এর পক্ষে যা কিছু হবে তাতেই আমার সমর্থন আছে। আমি এর বাইরে কোনো কিছুই বুঝতে চাই না।

আপনি কি চান না যে এই দাঙ্গা থেমে যাক? নিরীহ মানুষের জানমাল রক্ষা পাক?

নিরীহ মানুষ কাকে বলছেন? কাফেরদের হত্যা করা হচ্ছে। ওরা আমাদের ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

আপনার সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

হাবিব কিছুটা উত্তেজিত। এসেছিলো এই লোকটাকে জ্ঞান দান করতে। কিন্তু লোকটির মাথা ধোলাই হয়ে গেছে। একে কিছুই বোঝানো যায় না। আমীর সিগারেট জ্বালায়। মাথা বোঁ বোঁ করছে। ক্রোধ ওকে দহন করছে। কিন্তু এই মূর্খ লোকটির সঙ্গে তর্ক না করাই ভালো। টিপয়ের ওপর থেকে পুরনো কাগজ উঠিয়ে নিয়ে চোখ বুলোয়। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে উবে যায় আমীরের চিন্তা। এই কি মুসলমানের স্বরূপ? যেখানে বিবেক পীড়িত হয়, মা-বোন লাঞ্ছিত হয়, মানুষ তার মানবিক পর্যায় থেকে অনেক নিচে নেমে যায়, যেখানে জীবনের মূল্য শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে? আমি মানবতার দোহাই দিয়ে ওদের কাছে যাবো। শুনবে কি আমার কথা? এই লোকটি শিক্ষিত, বড় চাকুরি করে, সমাজে ভালো প্রতিষ্ঠা আছে, কই এর মনে তো কোনো সৎ চিন্তা নেই! যারা ভোজালি নিয়ে রাস্তায় দৌড়াচ্ছে তারা আর কতদূর ভাববে? ওরাতো পুতুলের মতো নাচছে। সুতো যারা নাড়ছে তাদের কথায় নড়ছে। তবু আমি ওদের কাছে যাবো। আমি ভুবনের প্রাণ ভিক্ষা চাইবো। ভুবনের জন্যে আমার নিজের জীবন বাজি, ওকে আমি কথা দিয়েছি। আমীর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।

দীর্ঘদিন ধরে হাবিব ওর প্রতিবেশী। দু'বছর আগে লোকটি নয় নেতার বিবৃতির পরও এমন এলোপাতাড়ি তর্ক করেছিলো। আমীর ভেবে দেখলো এর ভেতরে একটা একগুঁয়ে বলদ আছে। সেটা শিং উঁচিয়ে কেবল সামনেই চলে, আশেপাশে তাকায় না এবং যতক্ষণ লক্ষ্যবস্তুকে গুঁতো দিতে না পারে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না। এইরকম একতরফা তর্ক ওর অভ্যেস। আইয়ুব খানের এমন পা-চাটা বশংবদ দু'জন চোখে পড়েনি। অন্ধভাবে লোকটি নিজের পদ-ক্ষমতার মোহে ডুবে আছে। কোনো বিরোধিতাই সহ্য করতে পারে না।

আপনি কিছু ভাবছেন মনে হয় আমীর সাহেব? লোকটি সজোরে পত্রিকাটি টেবিলের ওপর রাখে।

হ্যাঁ, আমি ভাবছি আমার বন্ধু ভুবনের কথা।

হাবিবের কুঞ্চিত ভ্রু প্রসারিত হয়।

এ ধরনের লোকদের সঙ্গে কেন যে বন্ধুত্ব করেন? ওরা আমাদের জাত শত্রু।

BanglaBook.org

আপনি শুধু মুসলমান চেনেন হাবিব সাহেব। আপনি মানুষ চেনেন না। আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়।

তাই নাকি? ঠিক আছে চলি।

হাবিব আলোয়ানটা ঝাড়া দিয়ে আবার গায়ে দেয়। চটিতে পা ঢোকায়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় আমীরের মুখের ওপর। যেতে যেতে বলে, যাই আবার দেখা হবে।

আমীর হো-হো করে হেসে ওঠে, কে জানে হয়তো হাশরের ময়দানে!

হাবিব মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়।

আপনি বড় ভালো রসিকতা করেন।

আমীর হাসতেই থাকে। হাবিব চলে যায়। আবু ফিরে আসে নিচ থেকে।

কিরে কোথায় ছিলি?

নিচের দোকানে।

আমি একটু বেরুবো বুঝলি।

এখন? আমি একা থাকতে পারুম না।

ভয় কি? আমি একটু পরেই আসছি।

ঐ বিহারিগুলার হাসি শুইনলে আমার গা ছমছম করে। আপনে যাইবেন না খালু।

কিচ্ছু হবে না। ভুবনের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি।

খালাম্মা থাকলে আপনেরে কিছুতেই যাইতে দিতো না।

আমীর ওর পিঠ চাপড়ে আদর করে দেয়। তারপর ফোন ঘোরায়।

কে জহীর? মুজিব ভাই কোথায়?

তিনিতো নারায়ণগঞ্জের মিলে দাঙ্গা থামাতে গেছেন।

বলো কি!

হ্যাঁ। সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ফোনে খবর পেলাম তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হাজার হাজার শ্রমিককে মানবতা বিরোধী এই জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে আকুল আবেদন জানান। এতে কাজ হয়েছে। জানেন আমীর ভাই তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মুসলিম শ্রমিকদের সামনেই হিন্দু শ্রমিকদের দেখতে যান।

এই কথার পর নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় আমীরের। আর ও সন্ধ্যার অপেক্ষায় সারাদিন কাটিয়েছে। এতক্ষণে ভুবনের কি হয়েছে কে জানে? আমীর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে।

জহীর মুজিব ভাই বলছিলেন ইস্তেহারের কথা।

ওটা ছাপা হয়েছে। আপনি এলেই পাবেন।

আমি আসছি।

অসম্ভব এক তাড়না আমীরকে মরমে মারে। ও আবুকে দরজা লাগাতে বলে বেরিয়ে আসে। আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে চারদিকে থেকে। এ গলি ও গলি দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটে ও। বেশিদূর যেতে হবে না। কাছাকাছি দূরত্ব। ওর এখন আর ভয় করে না।

জহীরের হাত থেকে ইস্তেহারটি নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে।

কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে বের করে আনে। মাথার ভেতর অজস্র চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বিহারিরা শুধু হিন্দুদের নয়, বাঙালি মুসলমানদেরও ছাড়ছে না। আর সে কারণেই যারা এগুলো করাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ওরা চায় পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে। শুধু মোনায়েম খানের মতো ব্যক্তি দিয়ে অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নয়, বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত করতে পারলে এ দেশবাসী নির্জীব, পঙ্গু অথর্ব হয়ে থাকবে। আন্দোলনে যাওয়ার মতো শক্তি

BanglaBook.org

এদের থাকবে না। আমীর দ্রুত পায়ে পথ পেরিয়ে আসে। মানুষের উন্মত্ত কোলাহল সমানে চলছে। ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। ত্রস্ত পায়ে মানুষ ছুটছে এদিক-ওদিক। কোথায় যাবে ওরা? পালাবার জায়গা নেই। পথ একটা– হয় প্রতিরোধ নয় মৃত্যু। অসম্ভব, এ দেশের মানুষ কিছুতেই নিজগৃহে পরবাসী হবে না। এ দেশে হাবিবের মতো লোকেরাই পরবাসী। যারা ভাবে দেশটা ওদের পৈত্রিক সম্পত্তি, এখানে যা ঘটছে এই ঘটাটা জরুরি ছিলো। যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে কিন্তু বাঙালি নয়, যারা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে বাঙালি কিন্তু আনুগত্য প্রকাশ করে অন্যত্র, এমন লোকের জায়গা এ দেশে হবে না। তখন ও শুনতে পায় ভুবনের কণ্ঠ, যেন বলছে, আমীর পারবি কেন ওদের সাথে? ওদের মুখোশ চেনা দায়। ওরা পুনর্বাসিত হয় বলে প্রতিমুহূর্তে আমাদের ওদের ঠেলে এগুতে হয়।

হোক, আমরা ঠেলেই এগুবো। তবু তো নিজেদের শেকড় আমরা মাটির সঙ্গেই আঁকড়ে রেখেছি। এ জন্যই বারবার ওদের ছোবল মারা, বারবার ওদের ব্যর্থ আক্রমণ।

আমীর পকেটে হাত দিয়ে ইস্তেহারটি অনুভব করে। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও।' এর হাজার হাজার ছাপানো কপি মাটির ওপর বিছিয়ে দিলে শুষে নেবে সব রক্ত, প্রস্ফুটিত হবে অজস্র গোলাপ। এই ইস্তেহার বলবে, তাদের চেনো, যারা আমাদেরকে মূল থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইছে। ভুবনকে এখন ওর ভীষণ দরকার, ভীষণ। ভুবন ছাড়া ও বড় একা হয়ে যাবে।

আমীর যখন ভুবনের পাড়ায় পৌঁছে তখন চারদিক অন্ধকার। রাস্তায় আলো নেই– আশেপাশের বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ। গলির মোড়ে জটলা করছে বিবেক-শূন্য ভয়াবহ মানুষের দল। হঠাৎ করে আমীরের মনে হয় ওরা কি মানুষ? মানুষের সংজ্ঞা কি? অবয়বটা একরকম হলেই কি মানুষ হয়? এমন কেউ কি আছে যে ওদের মানুষ বানাবে? এরা কি ইবলিসের ভিন্নরূপ? ওরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ের উল্লাসে উন্মত্ত। ওদের বীভৎস হাসিতে শরীর চিড়বিড় করে, এক ধরনের আক্রোশ ছড়িয়ে পড়ে রক্তে। আমীর ওদের পাশ কাটিয়ে গলিতে ঢোকে।

বিশাল-দেহী দু'জন এসে ওর পথ আটকে দাঁড়ায়।

এই শালে খাড়ে হো।

আমীর থমকে দাঁড়ায়। যমদূতের মতো মানুষ দু'জনের কণ্ঠ কর্কশ এবং ভূতুড়ে। কিন্তু আমীর কোনোকিছু ভাবতে পারে না। ভুবন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ও বুঝতে পারে না যে ওদের সঙ্গে কি কথা বলতে হবে।

তুমহারা নাম কেয়া হ্যায়?

আমীর।

শব্দটি বলতে পেরে ও কিছুটা স্বস্তি পায়– বুঝতে পারে যে ওর ভেতরে শক্তি আছে। ও যাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তাদের ওর কোনো ভয় নেই।

কেয়া তুম মুসলমান হো?

হ্যাঁ।

তুম কিসকে পাস যা রাহে?

আমার বন্ধু। ওর নাম ভুবন, ভুবনেশ্বর সেনগুপ্ত।

ও শালে তো সুভা মে খতম হো গিয়া।

খতম হয়ে গিয়েছে?

ভুবন শেষ? আমীরের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। ভুবন নেই? অন্ধকার গলিটা নিকষ কালো বিশাল গুহা হয়ে যায়। ও দৌড়ুতে থাকে– পেছনে ধাওয়া করে

BanglaBook.org

দানবের দল। ভুবনের ঘর গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

ভুবন কোথায় তুই?

ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে মেঝের ওপর। পেছন থেকে কেউ একজন ম্যাচ জ্বালায়। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ভুবন– রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। পুরো ঘর তছনছ– ওর হারমোনিয়াম ভাঙা, তবলাজোড়া ছিন্নভিন্ন। আর কিছু দেখা যায় না– আলো নিভে যায়। তোমরা ওকে কেন মেরেছো? তোমরা কি ওকে চিনেছিলে? ও জানতো যে তোমরা ওকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছো? তোমরা একবার বলো ও কি আমার নাম ধরে ডেকেছিলো? ও কি চিৎকার করে বলেছিলো–। আমীর ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বিহারি দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওকে একটা লাথি দেয়। গড়িয়ে পড়ে আমীর। অন্ধকারে ও ভুবনের শরীরটা জড়িয়ে ধরে।

মুসলমান কা দোস্ত হিন্দু। তুম ভি কাফের হো।

চিবিয়ে কথা বলে ওরা।

খতম কর দো শালে কো।

ওদের চিবানো কণ্ঠ এবং সেই কণ্ঠে হন্তাকারীর উল্লাস শিস হয়ে বেজে উঠলে মুহূর্তে আমীরের শরীর হিম হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ও ক্ষিপ্রতায় নিজেকে সামলে নেয়। ভুবনের ঘরের কোথায় কি আছে সব ওর জানা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ওর কোনো অসুবিধে হয় না– ও হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে চলে যায়। বিহারি দু'জন দরজা ছেড়ে সামনে এগিয়ে আসে– ম্যাচ জ্বালিয়ে আমীরকে খোঁজার চেষ্টা করে। দিয়াশলাইর ক্ষীণ আলোয় আমীর সাঁই করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করে। ওরা চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, শালা ভাগ গিয়া, পাকড়াও শালাকো।

আমীর ছুটতে থাকে জিন্নাহ এভিন্যুর দিকে। দু'জন বিহারির চিৎকারে ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো অনেকে, এখন ওরা একটা দল। নিরস্ত্র আমীরকে দা, ভোজালি নিয়ে তাড়া করছে। ওরা ওর কাছাকাছি এসে যায়, প্রায় ধরেই ফেলে আর কি– আমীর চেঁচিয়ে বলে, আমি একজন মুসলমান, দোহাই লাগে তোমাদের, আমি মুসলমান।

কেয়া বোল রাহা? মুসলমান? শালা কাফের।

হা-হা হাসিতে পৌষের ঠাণ্ডা সন্ধ্যাটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। রেল-ক্রসিংয়ের ওপর ধরাশায়ী করে আমীরের শরীরটা ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে– রক্ত ঝরে– মুসলমানের হাতে মুসলমানের রক্ত– রক্ত ঝরে। রেল-ক্রসিংয়ের ওপরের এবড়োখেবড়ো জায়গাটুকু ভিজে যায়। ও নেতিয়ে পড়ে– তখন ও শুনতে পায় না সেই ঘৃণিত উচ্চারণ, শালে, কুত্তে কি বাচ্চা। তখন ও আর জানতে পায় না যে দূর থেকে ছুটে আসছে নিরাপত্তা বাহিনী। পালিয়ে যাচ্ছে গুণ্ডারা। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত শহরটা থমথমে।

৬

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমীরের লাশের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আলী আহমদ। চেনা চেহারাটা চেনা যায় না– মানুষটা লাশ হয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে। আলী আহমদের মনে হয় ক্ষতবিক্ষত আমীর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঢাকা– এই দু'তিন দিনে ওর পরিচিত

BanglaBook.org

শহরটা আমীরের মতো ক্ষতিবক্ষত– থেঁতলানো– কালো রক্তের আঁকাবাঁকা রেখায় মুমূর্ষু। ও খাটের রেলিং ধরে নিজেকে সামলে রাখে। কারা যেন কাঁদছে, ও শুনতে চায় না– শোক, বেদনা, আর্তনাদ, বিলাপ কোনোকিছু ওকে স্পর্শ করে না। আলী আহমদ এই শহরটাকে বুকের ভেতর পুরে নিয়ে আমীরের দিকে তাকিয়ে থাকে– তরতাজা, উচ্ছল, প্রাণময় একজন মানুষ ছিলো, এখন আর নেই। সাহসী, মানবিক একজন মানুষ ছিলো, অন্যকে বাঁচানোর ঝুঁকি নিয়েছিলো, সে আর নেই।

প্রদীপ্তর কথা মনে পড়ে। দু'দিন ধরে প্রদীপ্ত বাড়িতে নেই। শেখ মুজিব পাঁচশ' কর্মী নিয়ে ঠাটারীবাজার, বনগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় গিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সবাইকে আবেদন জানিয়েছেন। প্রদীপ্ত কর্মীদলের সঙ্গে গিয়েছে। ও পুষ্পিতার মানা শোনেনি। মা বাধা দিও না, বলে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ও এখন কোথায় জানে না আলী আহমদ। ও কি রায়েরবাজারে? যেখানে কুমোরদের এলাকায় গুণ্ডারা আগুন দিয়েছে– পুড়ছে মানুষের ঘরগেরস্থি। নাকি ও তেজগাঁয়ের পালপাড়ায়? যেখানে গুণ্ডারা আক্রমণ করতে গেলে পুলিশ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। রাত এগারোটায় নারী, শিশু ও পুরুষদের তেজগাঁও থানার আশ্রয় শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। ও কার শিশু বুকে নিয়ে দৌড়ে এসেছে? নাকি কোনো যুবতীকে শুনিয়েছে আশ্বাসের কথা? গ্লানিমুক্ত করেছে ওর যৌবন? অন্ধকারে সেই যুবতীর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে গেছে অন্য কারো কাছে। ও কতজনকে আশ্বাসের কথা শুনিয়েছে? পেরেছে কি ষোলো শত গোপীনিকে আশ্বস্ত করতে? নাকি কোনো বৃদ্ধের দু'হাত ধরে বলেছে, জীবন এমনই। ও কি পালপাড়ার ঘরে ঘরে ছুটে গেছে। নাকি ও এখন ঠাটারীবাজারে অথবা বনগ্রামে কিংবা নারায়ণগঞ্জে? কোথায় এখন প্রদীপ্ত?

প্রদীপ্ত তখন সতীশ বুড়োর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ঘরের ভিটের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কেউ বেঁচে নেই। ও শুনেছে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। কেউ বেরুতে পারেনি। সতীশ বুড়োর পটগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলেছে দাঙ্গাকারীরা। পিটিয়ে ভেঙেছে, কী প্রচণ্ড আক্রোশ। সময়মতো এসে পৌঁছতে পারলে কি বাঁচানো যেত পরিবারটি? বাঁচানো যেত সতীশ বুড়োর শিল্পকর্মগুলো? কতদিন বুড়ো ওর হাত চেপে ধরে বলেছে, জ্ঞাতিগুষ্ঠি বলে ভিটেমাটি বেচে দিয়ে ভারতে চলে যেতে। আমি যাবো না। আমার কিছু হলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখো দাদাবাবু। আমার বেঁচে থাকার খুব শখ। শত বছর আয়ু পেলে এমন পট বানিয়ে ভরে দেবো কুমোর পাড়া। যখন তুমি আসবে তখন মনে হবে চারদিকে কেবল ফুল ফুটে আছে।

বুড়োর ফোকলা গাল প্রদীপ্তর চোখের সামনে গহ্বর হয়ে যায়। ও দেখতে পায় মানুষ ডুবে যাওয়ার আগে যেমন করে তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে সেভাবে শ্যাওলা-পড়া ভয়ার্ত চোখে বুড়োর মুঠিতে প্রদীপ্তর হাত চলে যায়। ও নিজের শরীর ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলেছিলো, আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবো। দেখবেন কেউ আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

ও এক হাত দিয়ে অন্য হাতের মুঠি চেপে ধরে। বুঝতে পারে পুড়ে যাওয়া ঘরটার ছাই নিভে যায়নি, ভেতরে আগুন আছে, কেমন এক অদ্ভুত গন্ধ নাকে এসে লাগে। গন্ধটা কি মাংস পোড়ার? চমকে ওঠে নিজের ভেতর। সতীশ বুড়োর জন্য চিতা সাজাতে হলো না। প্রাকৃতিক চিতায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেই অদ্ভুত গন্ধ ওকে দিশেহারা করে ফেলে। সতীশ বুড়োর নেড়ি কুকুর ওর পায়ের কাছে বসে কুঁইকুঁই করছে। সেই অদ্ভুত গন্ধের সঙ্গে কুকুরের কুঁইকুঁই শব্দটা ওকে আবার চমকে দেয়। ওর মনে হয় দু'টোই বইছে, কিন্তু একই সমান্তরালে। ও বিড়বিড় করে বলে, তুই আমার কাছে কি চাস? তুইও কি হিন্দু?

BanglaBook.org

ও ক্লান্তি অনুভব করে। জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে যাবার অনুভবের ক্লান্তি। কুকুরটার কুঁইকুঁই থামে না। যেন ও সতীশ বুড়ো হয়ে অভিযোগ করছে, তুমি তো কথা রাখলে না প্রদীপ্ত।

ও গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে মাথা ঠোকে। কখনো এমন সময়ই আসে– যখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, শরীরের ভেতরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা নড়তে থাকে– ওর এখন তেমন সময়। ওর মনে হয়, আমি আর আমি নই।

কুমোর পাড়ার অন্যদিকে ঘুরে আসে নসিব। প্রদীপ্তর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কি হয়েছে প্রদীপ্ত?

আমি তো সতীশ বুড়োকে–

জানি। তুমি চেয়েছিলে জীবনের বিনিময়ে হলেও তাকে বাঁচাতে। এমন কথা তুমি তাকে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি জানি এমন কথা তুমি অনেককে দিয়েছো। তোমার জীবন তো একটা প্রদীপ্ত। তুমি কাকে দেবে?

অদ্ভুত বিষণ্ন চোখে নসিবের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রদীপ্ত। নসিব ওর হাত ধরে টানে, চলো প্রদীপ্ত।

প্রদীপ্তর মনে হয় কী শীতল নসিবের হাত। মৃত্যু কি এমন? নাকি ওই ছাইয়ের নিচের আগুনের মতো? নাকি এই নেড়ি কুকুরের কুঁইকুঁই শব্দ? নাকি বাতাসে ভেসে থাকা এই অদ্ভুত গন্ধের মতো, যাকে কোনো সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না? মৃত্যু কি? কেমন? নসিব এবার ওর হাত ধরে জোরে টান দেয়, চলো প্রদীপ্ত।

ও দু'পা এগুতেই কুকুরটা আবার কুঁইকুঁই শব্দ করে ওর পিছু নেয়। প্রদীপ্ত থমকে দাঁড়ায়। ওটার মাথায় হাত রেখে বলে, তোর ধর্ম নেই বলে তো তুই বেঁচে গেছিস। তোর আর দুঃখ কেন?

চারদিকের এত সব ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেও ওর কথা শুনে হা-হা করে হেসে ওঠে নসিব। বলে, পাঁচশ' বছর পরের মানুষেরা ওদের গবেষণায় যখন দেখবে ধর্ম নামের এমন একটা অদ্ভুত বিষয় নিয়ে আমরা জীবনপাত করেছিলাম, তখন ওরা বলবে, লোকগুলো কত আদিম ছিলো। সভ্যতা কি তা ওরা জানতোই না।

প্রদীপ্তকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও আবার বলে, কি ঠিক বলিনি?

প্রদীপ্ত প্রাণ ফিরে পাবার শক্তি নিয়ে বলে, আপনার হাতটা দিন নসিব ভাই, আমি ধরবো।

নসিব হাত বাড়িয়ে দেয়। ওরা এগিয়ে যেতে থাকে আগামী দিনের দিকে– যেন কুকুরের আর্তনাদ নেই, ছাইচাপা আগুন নেই, বাতাসে অদ্ভুত গন্ধ নেই। বড় সড়কে উঠে প্রদীপ্ত নসিবের হাত ছেড়ে দেয়। বলে, ক'দিন ধরে বাড়িতে আমার কোনো খবর নেই। বাবা-মা আমার জন্য খুব ভাবছেন।

নসিব হাত তুলে রিকশা ডাকতে ডাকতে বলে, আমার জন্য ভাবনার কেউ নেই।

দু'জনে রিকশায় ওঠে। প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, আধুনিক মানুষেরা বড্ড একা। আমি গেঁয়ো মানুষ। তাই পিছুটানের অভাব নেই।

পিছুটান? হা-হা করে হাসে নসিব। বলে, বাবা-মায়ের ভালোবাসাকে যে ছেলে পিছুটান বলে সে অনেক বেশি আধুনিক।

প্রদীপ্ত দূরে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না নসিবের কণ্ঠে ব্যঙ্গ না উপদেশ। রাস্তায় তেমন লোক চলাচল নেই। প্রায় ফাঁকা রাস্তায় রিকশা ছুটছে। ওর বুকের ভেতর অনুতাপ– বুঝতে পারে বাড়িতে খবর না দিয়ে ও মাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

BanglaBook.org

আমীরের দাফনের পর বাড়ি ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকে আলী আহমদ। শরীর খারাপ লাগছে। মাথা ভার, কান্নায় চোখের পাতা ফুলে গেছে– নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়। প্রদীপ্ত কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি এসেছিলো, আবার বেরিয়েছে। পুষ্পিতা ছেলের চিন্তায় ম্রিয়মাণ, ঠিকমতো খেতে পারছে না। খুব একটা কথাও বলছে না। প্রতীক নিজের ঘরে কানের কাছে ট্রানজিস্টার নিয়ে শুয়ে আছে। একসময় এসে আলী আহমদকে বলে, বাবা কোতওয়ালি ও সূত্রাপুর থানা এবং আরো কিছু এলাকায় বিকেল দু'টো থেকে আগামীকাল দু'টো পর্যন্ত আবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। নওয়াবপুর এলাকায় সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে বাবা।

আলী আহমদের উত্তেজনা, ক্রোধ থিতিয়ে গেছে। ও ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ গলায় বলে, এই শহরটা এমন জিতু।

ভাইয়ার যে কি হবে–

কিছুই হবে না। ওর জন্য ভেবো না। তোমার মুখে ভাবনার কথা শুনলে তোমার মা আরো ভেঙে পড়বে। ও সবার সঙ্গে কাজ করছে। করুক। এই মুহূর্তে কাজ করতে না পারাটাই লজ্জার।

তুমি কালকে মিছিলে যাবে বাবা?

হ্যাঁ।

আমাদের গানের স্কুল থেকেও মিছিল বের হবে। আমি সেই মিছিলে যাবো বাবা।

যেও।

মা তো বাধা দেবে।

আমি তোমার মাকে বোঝাবো।

বাঁচালে বাবা।

প্রতীক খুশি হয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। আলী আহমদ ভাবে আর কতদিন পুষ্পিতা ওকে আঁচলে বেঁধে রাখতে পারবে? ওর এখন নিজের মতো বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। একটু পর প্রতীক আবার এ ঘরে এলে আলী আহমদ বলে, ছায়ানটেরতো শুধু মিছিল করার কথা নয় জিতু, ওদের তো শান্তি ও সম্প্রীতির গানও গাইতে হবে।

গাইবো বাবা, গাইবো।

প্রতীকের কণ্ঠস্বর বদলে যায়। ও গভীর আন্তরিকতায় গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে। আলী আহমদের হঠাৎ করে মনে হয় যেন আমীর ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ঠিক আমীরের গলায় কথা বললো জিতু। ওর চোখ ভিজে উঠলে ও বালিশে মুখ গোঁজে।

এইতো কয়েক মাস আগে, গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ পালিত হলে আমীর সবগুলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকত। বলতো, চমৎকার একটি আয়োজন। প্রদর্শনীটি দারুণ। ভাষা ও সাহিত্যের ওপর যে এমন প্রদর্শনী হয়, এটা না দেখলে বুঝতাম না। সব ধরনের দর্শকই এই প্রদর্শনী দেখে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারবে। ওর প্রশংসার ভাষাই ছিলো এমন, কোনো কার্পণ্য করে প্রশংসা করতো না। বলতো, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণের মনে বেশ সাড়া জেগেছে। আপনারা নিজেদের গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে দিলেন ভাষা ও সাহিত্যকে। এটি এখন শুধু পুথির বেষ্টনী আর গবেষণার বিষয় নয়। সেই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। বলেছিলেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিলো পূর্ব বাংলায়, উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগ চালু হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে এদেশেই এবং ভাষা-সাহিত্যের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এখানে। এর

BanglaBook.org

একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত হচ্ছে যে, বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এদেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন।'

আমীর প্রসঙ্গে এসব ভাবতে গিয়ে আলী আহমদের চোখের জল উবে যায়। ওর মাথার শূন্যতা কাটে– মনে হয় ভরে যাচ্ছে কোষগুলো। সেইসব দিনগুলোয় প্রতিদিন হাজার হাজার লোক প্রদর্শনী দেখেছে, অনুষ্ঠান শুনেছে। আমীর বলেছে, এ কয়দিনের অনুষ্ঠান শুনে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমি বেশ জ্ঞান অর্জন করেছি। মধ্যযুগের মুসলমানদের সাহিত্যকর্মের ওপর ব্যাপক আলোচনা হলেও কোথাও কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবনা ঠাঁই পায়নি। আমার মনে হয় কি জানেন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই জানা খুব কার্যকরী হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে কাজ করবে এই ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ। এটি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ।

আমীর কি বুঝতে পেরেছিলো যে সময়টি খারাপ, নষ্ট? তাই কি ও বলেছিলো সময়োপযোগী উদ্যোগ? ও জানতো নষ্ট রাজনীতি মানুষের শুভবুদ্ধি ভোঁতা করে, কেড়ে নেয় মানবিক আবেগ। তাই সাম্প্রদায়িকতা কালো ধোঁয়া হয়ে ঢেকে দিলো শহরটাকে। প্রচণ্ড গ্লানিতে আলী আহমদ বিছানায় উঠে বসে। শুনতে পায় উঠোনে প্রদীপ্তর গলা– ও অনুভব করে ছেলে ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সবসময় বলে, দ্রুত কোনোকিছু ভেবো না, ধীরে ভাবো। চাইলেই কি রাতারাতি পরিবর্তন হবে? হ্যাঁ, ও ঠিকই বলে। ও এ দেশের মানুষের নাড়ির টান বুঝেছে। আমীরকেত মরতেই হতো। ও যে অকুতোভয়, ছুটে যায়।

আলী আহমদ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় প্রদীপ্ত বারান্দায় উঠে এসেছে। পুষ্পিতাকে জড়িয়ে ধরেছে। বলছে, মাগো ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ও জানে এই একটি কথায় পুষ্পিতার কোনো রাগ থাকবে না। ছেলেকে আর একটিও শাসনের কথা বলবে না। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে দেখতে পায় না, কিন্তু শুনতে পায় কণ্ঠ, তুই গোসল সেরে নে দীপু। আমি ভাত আনছি।

প্রতীক বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া অবস্থা কেমন?

ভালো। বাবা কৈ রে?

শুয়ে আছে।

থাক, বাবার সঙ্গে পরে কথা বলবো।

আমীর চাচার মৃত্যুটা–

এসব কথা বলিস নে জিতু। বাবা কষ্ট পাবে। আমি সইতে পারি, বাবা পারে না।

পরদিন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের সমন্বয়ে শান্তি বাহিনীর মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে আলী আহমদের মনে হয় সেও সইতে পারে, সইতে হয়– যদিও বুকের ভেতরে নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ ওঠে আর ভাঙে। তবু না সইতে পেরে উপায় কি? মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। 'আমরা সবাই শান্তি চাই' বলে স্লোগান দিতে থাকে। মিছিল গভর্নমেন্ট হাউসের গেট পর্যন্ত পৌঁছে নবাবপুর রোডে ঢুকতে গেলে গুণ্ডারা বাধা দেয়। ওরা আগে থেকেই ওখানে টহল দিচ্ছিলো। শেষে মিছিল গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে বসে পড়ে এবং 'দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বন্ধ কর' দাবি জানাতে থাকে। বাড়ি ফেরার পথে কবি জসীমউদ্‌দীন আলী আহমদকে বলে, 'একই মায়ের ছেলে' নামে একটি লেখা লিখেছি। কাল পত্রিকায় ছাপা হবে।

BanglaBook.org

আলী আহমদ বলে, কাদের জন্য লিখলেন? ওরা কি বুঝবে?

বুঝতে পারছি যে তুমি এখনো খুব কষ্ট পাচ্ছো। মানুষকে ক্ষমা করা ছাড়া আমাদের উপায় কি বলো।

ক্ষমা?

আলী আহমদ প্রচণ্ড বিস্ময়ে ক্ষীপ্র দৃষ্টিতে একজন কবির দিকে তাকায়। মনে হয় চারদিকে বাতাসে শন্‌শন্ শব্দ, কী যেন উড়ে যাচ্ছে। সময় এখন মৌল সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে কি?

কবি ওর ঘাড়ে হাত রাখে, ভুলে গেলে চলবে না, কিছু কিছু মৌল সত্য আমাদেরকেই ধরে রাখতে হয়। আমরা সৃষ্টিশীল মানুষ। আমাদেরকেই যেতে হয় সাধারণের কাছে, ওদের বোঝাতে হয়।

জানি।

আলী আহমদ এক ঝটকায় কথাটা বলে অন্যদিকে চলে যায়। বিড়বিড় করে বলে, শালা, এখন কি সময় এমন করে শান্ত হয়ে থাকার? না, ক্রোধ ফুটুক। কবিকে প্রতিরোধও করতে হয়। যে প্রতিরোধ করতে জানে না সে অনায়াসে ধ্বংস হয়।

পেছন থেকে শহীদ সাবের ওর ঘাড় খামচে ধরে। কোনো কথা না বলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। আর একজনের গায়ের ওপর পড়তে পড়তে সামলে নেয় আলী আহমদ।

হা-হা করে হেসে ওঠে শহীদ সাবের– তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক হাসি। কিন্তু আলী আহমদের কানে পৌঁছে তা শীতল হয়ে যায়– ওর মনে হয় ঐ হাসি আমীরের মৃত্যুর মতো। হাতে ধরা একটা কাগজ টুকরো টুকরো করে শহীদ সাবের অন্যদিকে চলে যায়। আলী আহমদ অনুভব করে যে সাবেরের দৃষ্টির তীব্রতা কমেনি। পাগল হয়ে গেলেও মানুষ কি কখনো এমন ঝলকে ওঠে, যে ঝলক ঝলসে দেয় বুকের তল পর্যন্ত? তখনই বুঝে নিতে হয় এটাই মানুষের প্রতিরোধের ভাষা– যে জনগোষ্ঠী প্রতিরোধের ভাষা হারায় তার বেঁচে থাকা অর্থহীন। শত্রুকে ক্ষমা নেই, ভাবতে ভাবতে আলী আহমদ সামনে এগোয়। ভিড়ের মধ্যে সাবেরকে কোথাও আর দেখা যায় না। জনারণ্যে মিশে যাওয়া মানুষ হয়েও সাবের আলী আহমদকে তাড়িত করে। ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবেরকে খোঁজে– না, দেখা যায় না ওকে। কোথায় গেলো? গতকাল আতাউর রহমান খানের বাসায় সর্বদলীয় সভায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ এমনই। একদল মানবিক, একদল অমানবিক– শুধু শহীদ সাবেরের মতো কেউ কেউ এইসব বোধের বাইরে চলে যায়।

রাতে সাবেরের কথা ভেবে ঘুমুতে পারে না আলী আহমদ। এই শহরে আমীর আর নেই– শহীদ সাবের থেকেও নেই। রাজশাহী শহরে একদিন জুলেখার স্বামীর মৃত্যু দেখেছিলো। কতদিন জুলেখার সঙ্গে দেখা হয় না। কেমন আছে ও? এক সময় জুলেখা ওর করোটির ভেতর পদ্মার রূপোলি মাছ হয়ে যেত– অদ্ভুত, মায়াবী আলো বিচ্ছুরিত হতো সে মাছের শরীর থেকে। এখন আর ওর করোটিতে সে জুলেখা নেই, আছে একটুকরো স্মৃতি। এভাবেই চলছে। আর কতদিন চলবে আলী আহমদ জানে না– শুধু বুকের ভেতর পিপাসা থেকে যায়– ভয়াবহ পিপাসা। ওর মনে হয় মানুষের পিপাসা কোনোদিনই ফুরোবার নয়– শহীদ সাবেরও অমন একবুক পিপাসা নিয়ে এই শহরে মৃত রাস্তাগুলোয় তাজা প্রাণ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর চেতনার মৃত্যু হয়নি।

দেখতে দেখতে শীত ফুরিয়ে গেলো– কবেইতো প্রমিথিউসের আগুন নিভে ঠাণ্ডা হয়েছে। আবার ক্লাস, ছাত্র পড়ানো, পরীক্ষার খাতা দেখা সব শুরু হয়ে গেছে। একদিন

BanglaBook.org

মতিউর কলাভবনের সামনে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। বললো, জুলেখা অসুস্থ। বুকের ভেতর উৎকণ্ঠা– দুমড়ে যায় হৃৎপিণ্ড, আলী আহমদ যেন শুনতে পায় করোটির ভেতর কীর্তিনাশার বয়ে যাওয়া– হাজার হাজার রূপোলি মাছ স্রোতের ভেতর উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

আপনাকে খুঁজতে। ও বলেছে অসুস্থতার খবরটা আপনাকে জানাতে।

কি হয়েছে?

ব্রেস্ট ক্যান্সার।

ওহ্।

আলী আহমদের কণ্ঠে অস্ফুট অথচ অন্তহীন আর্তনাদ। মতিউর চমকে তাকায়। কিছুই বুঝতে পারে না। মুহূর্তে আলী আহমদ নিজেকে সামলে নেয়। মতিউরের বিস্মিত দৃষ্টিতে ও বিব্রতবোধ করে। প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, ডাক্তার কি বলেছে?

আগামীকাল অপারেশন। রিমুভ করার পর যদি দেখা যায় যে শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে যায়নি তাহলে তো এ যাত্রা বেঁচেই গেলো। দোয়া করবেন।

আলী আহমদ জিজ্ঞেস করতে পারে না যে ক্যান্সার যদি শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে এ যাত্রার কি হবে?

মতিউর বলে, যাই। পারলে বিকেলে একবার আসবেন।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে জুলেখা কি ওকে দেখতে চেয়েছে? নাকি শুধুই সৌজন্য? জুলেখার হৃদয়ে কি এখন মৃত্যু-ভয়? ও নিজে জুলেখার জীবনের একটা মৃত্যুর সাক্ষী। ওহ্ কী নিদারুণ সেই ঘটনা। হঠাৎ করে ওর বুকটা কেমন খালি হয়ে যায়। ওর কি খারাপ লাগছে? কান্না পাচ্ছে? চারদিক তোলপাড় করা শূন্যতা বুকের ভেতর বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা নদীর গর্জন নিয়ে। কেবলই মনে হয় ওর একা হওয়া দরকার এবং নিজের মুখোমুখি বসা– নিজের সঙ্গে কথা বলা, গভীর আবেগময় কথা। দুপুরে ওর বাড়ি ফেরা হয় না। এক ঠোঙা মুড়ি কিনে ও বলধা গার্ডেনে আসে– পুকুরের সিঁড়িতে বসে থাকে। বিকেলে ওর জুলেখার বাড়িতে যাওয়া হয় না। ও যেতে পারে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াই শেষ করা হয়ে ওঠে না।

দু'দিন পর রাতের খাবার সময় প্রতীক খুব বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, বাবা তুমি কি খবরটা শুনেছো?

আলী আহমদ ভুরু তুলে তাকায়। প্রতীক ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, বন্যার আম্মার ক্যান্সার। অপারেশন হয়েছে। বন্যা অনেকদিন থেকে গানের স্কুলে আসে না। আমি আজ হাসপাতালে খালাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

কেমন দেখলে?

আমাকে কেবিনের ভেতর ঢুকতে দেয়নি। শুনেছি অবস্থা বেশি ভালো না। মতিউর চাচা তোমাকে যেতে বলেছে।

পুষ্পিতা হতচকিত কণ্ঠে বলে, বলিস কি? এতবড়ো ঘটনা, অথচ আমরা জানলামই না। হ্যাঁ গো, তুমি জানতে না?

আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলে, না।

কালকেই চলো দেখে আসি।

পুষ্পিতার কণ্ঠের ব্যগ্রতা উপেক্ষা করে আলী আহমদ ঠাণ্ডা গলায় বলে, অপারেশনের রোগীর ঘরে বেশি ভিড় করতে নেই। ডাক্তাররা নিষেধ করে। ইনফেকশনের ভয় থাকে।

তাই বলে যাবে না?

BanglaBook.org

ভালো হয়ে উঠুক, বাসায় যাবো একদিন।

প্রতীক প্রতিবাদ করে, না বাবা, ঠিক বললে না। তোমার যাওয়া উচিত। ভালো হবে কি না কে জানে!

আলী আহমদ গম্ভীর মুখে ভাত খাবার চেষ্টা করে। পুষ্পিতা সেদিকে তাকিয়ে খেঁকানো কণ্ঠে বলে, কখন যে তোমার কি হয় বোঝা মুশকিল।

আলী আহমদ ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে, কি রেঁধেছো খাওয়া যাচ্ছে না বলে, ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে যায়।

পুষ্পিতা এবং প্রতীক বেশ বিব্রত বোধ করে। প্রতীক মাকে মৃদু ধমকের সুরে বলে, বাবাকে এমন করে বলা উচিত হয়নি।

পুষ্পিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, তাই, তোর বাবার মনটা বোধহয় খুব খারাপ। জুলেখার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয় তো।

প্রতীকের গলায় ভাত আটকে যেতে চায়। বারবার বন্যার মুখ ভেসে ওঠে। অনবরত কান্নায় বন্যার চোখ দু'টো ফুলে গেছে। ও গানের স্কুলে যায় না– প্রতীককে দেখলে অকারণে হাসে না। প্রতীকের দিনগুলো একদম ঝিমিয়ে গেছে। ইচ্ছে করে এই শহরটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে।

কি হলো তুই খাচ্ছিস না যে?

পুষ্পিতা ছেলেকে ধমকে ওঠে। এতক্ষণে ওর রাগ হয়। ধুত্ ভালো লাগছে না বলে প্রতীকও ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে যায়। এঁটো ভাতের থালার সামনে বসে পুষ্পিতার রাগ বাড়ে না। ওর চোখে জল আসে। দুঃখটা কীসের ও তা ধরতে পারে না। রাজশাহীতে থাকতেই তো ও দুঃখের সঙ্গে আপোস করেছে। ও কী দেখেনি জুলেখার জন্য আলী আহমদের আড়াল-করা ব্যাকুলতা! রাজশাহীর দিনগুলোতে ও কত নীরব দহনে নিজেকে পিষ্ট করেছে। এখন যদি জুলেখার কিছু হয় তাহলে ওর তো খুশি হবার কথা। খুশি? পুষ্পিতা চমকে নিজের দিকে তাকায়। ভেবে দেখে, আলী আহমদও তো সংসারের সঙ্গে নিজের ভালো লাগার আপোস করেছে। বাড়াবাড়ি তো ছিলো না। তাহলে এ কেমন আনন্দ? যার জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে আনন্দ মিশে যায় তার কাছে সেটা ভয়াবহ আনন্দ। পুষ্পিতা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ওর নীরব কান্না দেখতে পায় না আলী আহমদ, দেখতে পায় না প্রদীপ্ত। সে দুপুরে পুষ্পিতার ভাত খাওয়া হয় না।

পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের তোড়জোড় শুরু হয়। প্রাদেশিক সরকার দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেছে। ভোরবেলা বেশ স্নিগ্ধ আবেশে মন ভরে থাকে। আলী আহমদের মনে হয় এক মুক্তির নদীতে সাঁতরে চলে যাচ্ছে– কোথায় ও জানে না। আজ বহুদিন পর ওর মন ভালো। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ও একটি উপন্যাস লেখার তোড়জোড় করেছে। বিষয় ঠিক করেছে নায়কের অস্তিত্বের প্রশ্ন। একটা খসড়া দাঁড় করিয়েছে। রোজই কাটাছেঁড়া করে খসড়াটা ঠিক করে। লেখা আর শুরু করা হয় না। আসলে এই তিনমাস ধরে একদিনও ওর মন ভালো নেই। জুলেখা অপারেশনের পর বাড়ি এসেছে। ওর শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে– ও আর কোনোদিনও ভালো হবে না। এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। এই সত্য জুলেখাও জানে। ছেলেমেয়ের জন্য সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। কোনো আপন মানুষ দেখলে ওর চোখ জলে ভরে ওঠে। এই দৃশ্য আলী আহমদ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। আজ কেন যে এই অকারণ ভালোলাগা! নববর্ষের প্রথম দিন বলে কি?

BanglaBook.org

শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান হবে। যেন বদ্ধ ঘর থেকে মুক্তি-পাওয়া মানুষের উৎসব। প্রতীক আর বন্যা ছায়ানটের অনুষ্ঠানে গান গাইবে। হোক কোরাসে অংশগ্রহণ তবু ওরা দু'জনে এই প্রথমবারের মতো বাইরের অনুষ্ঠানে গাইবে। ওদের তারুণ্যভরা চোখের দৃষ্টিতে চক্‌চকে আলো। কদিন ধরে প্রতীক খুব উচ্ছল– সারাক্ষণই গুনগুন করে। ও ভেবে দেখেছে যে বন্যার বিষণ্ন মুখটাও ওকে আনন্দ দেয়। মনের এ ভাব ও কাউকে প্রকাশ করতে পারে না। কতদিন পর বন্যাকে ও কাছ থেকে দেখছে। গানের স্কুলতো বন্যা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো। নববর্ষের অনুষ্ঠানের জন্য ও সবার অনুরোধে এসেছে। প্রথম দু'তিন দিন ও একদম গাইতে পারতো না। গান শুরু হলে ওর চোখ ছলছল করতো। কখনো কোনো ফাঁকে বারান্দার কোণায় গিয়ে হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে নিতো। প্রতীক ওর দিকে খেয়াল রাখতো। চোখ মুছতে দেখলে কাছে গিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলতো, এসব কি হচ্ছে বন্যা? এসব ঠিক নয়।

বন্যা লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বলতো, কদিন পর আমার মা মরে যাবে প্রতীক ভাই।

ছিঃ, এভাবে বলতে নেই। চলো গান গাইবে। রিহার্সেল শুরু হয়ে গেছে।

দু'চার দিন পর বন্যার বিষণ্নতা কেটে যায়। ওর মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। ও প্রাণখুলে গান গায়। বন্যার খুশিতে প্রতীকও খুশি। অনুষ্ঠানের আগের দিন প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, জিতু তোর কি হয়েছে বলতো?

ও চমকে তাকায়। তারপর বোকার মতো মাথা নেড়ে বলে, কৈ, কিছু হয়নি তো?

প্রদীপ্ত ওর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বলে, তুই প্রেমে পড়িসনি তো জিতু?

যাহ্ কী যে বলো ভাইয়া। তুমি না একটা ইয়ে–

প্রদীপ্ত হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, তুই তো বড়ই হয়ে গেছিস জিতু। ম্যাট্রিক পাস করে ফেললি। কদিন পর কলেজে ভর্তি হবি। কলেজে ভর্তি হলেতো তুই স্বাধীন। তোকে আর পায় কে?

প্রতীক বড় ভাইয়ের কথা শুনে বেশ মজা পায়। ভালোও লাগে। হঠাৎ করে ওর লজ্জাও হয়, প্রদীপ্ত কি বুঝতে পারছে যে বন্যাকে ওর একটু একটু ভালোলাগে! কী দারুণ, বন্যার সঙ্গে এই গান গাওয়ার স্মৃতি।

পয়লা বৈশাখ রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান– শুরু হবে সূর্য ওঠার আগে। খুব ভোরে ওরা পৌঁছে যায়। আলী আহমদ এবং প্রদীপ্তর সঙ্গে পুষ্পিতাও এসেছে। ও খুব একটা বাইরে যায় না, দু'একটা সিনেমা, দু'একটা অনুষ্ঠান হলেই খুশি থাকে– এর বেশি ওর নিজেরও ভালোলাগে না। আজ বৈশাখের প্রথম দিনে চারদিকের এই সবুজের মধ্যে পুষ্পিতা কিছুটা আত্মহারা হয়ে যায়। স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে যায় এপাশ থেকে ওপাশে। শুরু হয় কলকণ্ঠে, এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো– পুষ্পিতা তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। কী সুন্দর লাগছে প্রতীককে, গলা ছেড়ে গাইছে। মায়ের বুক ভরে যায়, কেবলই মনে হয় রমনার সবুজের মতো স্নিগ্ধ ওর উঠতি-যৌবনের ছেলেটি। পুষ্পিতা পরিবারের বাইরে তেমন কিছু ভাবতেই পারে না। আলী আহমদ বন্যাকে দেখে– বারবার জুলেখার মুখ ভেসে ওঠে– আর কতদিন? আর কতদিন বেঁচে থাকবে জুলেখা? বন্যা যেন তরুণ বয়সের জুলেখা, অবিকল মায়ের মুখটা পেয়েছে; নাক, চোখ, লাবণ্যভরা ত্বক– আলী আহমদের চোখ বুজে আসে– গলা ধরে যায়, আর একটু বেশি ভাবলে বুঝি ওর বুক ফেটে যাবে। গান ওর ভেতরে ঢোকে না। পয়লা বৈশাখের এই স্নিগ্ধ মনোরম দিন ম্লান হয়ে যায়। কিছুই ভালোলাগে না। প্রদীপ্ত তাকিয়ে থাকে মঞ্জুলিকার দিকে– বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরই বিভাগে

BanglaBook.org

অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। শ্যামলা, দীঘল চুলের মেয়েটিকে এই মুহূর্তে প্রদীপ্তর চোখে ভিন্নরকম লাগছে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে, সেমিনারে বা রাস্তায় দেখেছে। আজ ও মঞ্জুলিকার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। প্রদীপ্তর মনে হয় হয়ে গেলো ওর– অনেকদিনের একটা কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ওর ভেতরে বাতাসের মতো ঢুকে যায়। ও প্রাণভরে সে বাতাস নিজের ভেতরে টেনে নেয়।

দু'দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মঞ্জুলিকাকে একলা পায় প্রদীপ্ত। ও রিকশার জন্য দাঁড়িয়েছিলো। আকাশে ঘন কালো মেঘ, যে কোনো সময় তোলপাড় করে বৃষ্টি নামতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। রাস্তার ওপর বাতাসের ঘূর্ণিতে পাতা ওড়ে। মঞ্জুলিকাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখায়। প্রদীপ্ত পাশে গিয়ে দাঁড়ালে কাউকে খুঁজে পাওয়ার নির্ভরতা ওর ব্যাকুল দু'চোখে ফুটে ওঠে। এর আগে বিভাগে দেখা হয়েছে, কিন্তু কথা হয়নি দু'জনের।

প্রদীপ্ত আগ বাড়িয়ে বলে, রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বুঝি?

হ্যাঁ, যা মেঘ করেছে। মনে হয় ভীষণ একটা কালবৈশাখি বয়ে যাবে।

প্রদীপ্ত ঝড়ের বিষয়ে না গিয়ে বলে, রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে আপনি দারুণ গেয়েছিলেন।

কোরাসে আর কি–

কোরাসেইতো ভালো বোঝা যায়। আপনার মধ্যেই মগ্নতা সবচেয়ে বেশি ছিলো। মনে হচ্ছিলো আপনি যেন গানের মধ্যে মিশে গেছেন।

মঞ্জুলিকা লাজুক হাসে। সে হাসি প্রদীপ্তর কাছে শ্যামলা চেহারায় আলো-ফোটা। ও মনে মনে বলে, ভারি মিষ্টি। দূরে রিকশা দেখতে পেয়ে ও চেঁচিয়ে ডাকে, এ্যাই রিকশা। তারপর মঞ্জুলিকার দিকে ঘুরে বলে, বাসা কোথায়?

সিদ্ধেশ্বরী।

যান উঠে পড়ুন। পথে বৃষ্টি নেমে গেলে ভিজতে হবে।

দারুণ হবে। ভিজতে আপত্তি নেই। ভিজতে ভিজতে বাড়ি পৌঁছে যাবো।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে রিকশায় ওঠে। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানায়। প্রদীপ্ত কি করবে বুঝতে পারে না। ধীরে সুস্থে এগোয়। ভাবে, বৃষ্টি এলে বর্ধমান ভবনে ঢুকে যাবে। এভাবে শুরু। ও মনে মনে হাসে। ভাবে, শুরুটা খারাপ হয়নি। আর কতদিন লাগবে একটি ছোট্ট মিষ্টি শব্দ বলতে? যে শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় করে উঠবে মঞ্জুলিকার হৃদয়? গভীর চোখে তাকাবে ওর দিকে? নিজের ভেতর প্রচণ্ড শিহরণ অনুভব করে প্রদীপ্ত। কবে ও তুমি করে বলতে পারবে মঞ্জুলিকাকে? ভালোবাসা এবং তুমি শব্দ দু'টি ভারি সুন্দর, ভীষণ আপন। ও রেসকোর্স এবং বর্ধমান ভবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। রেসকোর্সের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় রাস্তার অপর পারে, যেখানে রমনার সবুজ। তখন বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি প্রদীপ্তর মাথার ওপর পড়ে। ও আকাশের দিকে তাকায়, ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে। ও ভিজতে থাকে। কিন্তু দৌড়ে বর্ধমান ভবনে ঢুকতে ওর মন চায় না। ভিজতে ওর ভালোলাগে। ভাবে ভিজে ভিজে বাড়ি গেলে কেমন হয়? মঞ্জুলিকা বলেছিলো, ভিজলে দারুণ হবে। প্রদীপ্ত বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে থাকে। অনেকদিন পর ওর শৈশবের কথা মনে হয়। মনে হয় ও আট বছরের বালক, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে মহানন্দা নদী পার হচ্ছে। বারবার দুলে উঠছে যাত্রী বোঝাই নৌকা।

সে রাতেই কাঁপিয়ে প্রবল জ্বর আসে ওর। ঘোরের মধ্যে কেটে যায় রাত। কিছুই বলতে পারে না। ডাক্তার আসে, পুষ্পিতা সারারাত মাথার কাছে বসে থাকে। জলপট্টি দেয়।

BanglaBook.org

প্রলাপ বকে ও। মঞ্জুলিকার নাম ধরে ডাকে। ঐ নামকে উল্টেপাল্টে ছোট ছোট শব্দ বানায়। সাতদিন আর বাড়ি থেকে বের হতে পারে না।

এর দু'দিন পর মারা যায় জুলেখা। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে নিয়ে ও বাড়ি যায়। পুষ্পিতা ভেতরে চলে গেলেও ও ভেতরে ঢুকতে পারে না। বাইরের লোহার গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো সঙ্গে তেমন কথা বলে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে ছোট্ট করে উত্তর দেয়। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ প্রবল হয়ে ভেসে আসে, পরে আবার স্তিমিত হয়ে যায়। আলী আহমদ দেখে খানিকটা দূরে প্রতীক দাঁড়িয়ে আছে, বিবর্ণ, ফ্যাকাসে চেহারা। মাঝে-মধ্যে চোখ মোছে। লাল হয়ে আছে ওর ফর্সা গাল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আলী আহমদের ভেতরের শূন্যতা গলতে থাকে। ও বুঝতে পারে যে বন্যার কষ্টে প্রতীকের বুক ফেটে যাচ্ছে। হঠাৎ করে আলী আহমদের মনে হয় ওর বেশ স্বস্তি হচ্ছে– ওর কষ্ট কমে যাচ্ছে– শুধু কোনো একদিন জুলেখার জন্য যে আবেগ ছিলো, তা বুকের ভেতর গাঢ় হয়ে স্থিত হয়ে যাচ্ছে। ও প্রতীকের দিকে তাকিয়ে অনুভব করে ওর আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে প্রতীকের মধ্যে। প্রতীকের বুকের ভেতর ভালোবাসার একটা কিছু তোলপাড় করছে। ও কি নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না? আলী আহমদ তো ধরে রাখতে না পারার বোধে নিজেকে সামলাতে সামলাতে এতটা বয়স পেরুলো। আর কত? এখন প্রদীপ্তর সময়। প্রদীপ্তর গাঢ় সময়। এরপর প্রতীক– এরপর বন্যা। ততদিনে জুলেখা মিশে যাবে মাটিতে– ধূসর হয়ে উঠবে আলী আহমদের দিনগুলো। ও আর নিজের ভেতর কষ্ট অনুভব করতে চায় না। লোকজনের ভিড় এড়িয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখে প্রদীপ্ত আসছে– হুড-ফেলা রিকশায় বসে আছে– বাতাসে এলোমেলো চুল উড়ছে, কিছুটা বিষণ্ন। ওর রিকশা আলী আহমদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ও লাফিয়ে নেমে বলে, বাবা তুমি এখানে?

এমনি।

জানাজা কখন?

একটু পরেই।

তুমি যাবে গোরস্তানে?

যাবো।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা?

হ্যাঁ, কতদিনের পরিচয়।

শুধু পরিচয়? প্রদীপ্ত বিস্ময়ে বলে।

আলী আহমদ ওকে উপেক্ষা করে বলে, যাও, ভেতরে যাও।

প্রদীপ্ত বাবার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আর কথা বাড়ায় না। গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকে।

আলী আহমদ ভাবে, জ্বরের ঘোরে ও মঞ্জুলিকা নামে কাউকে ডেকেছিলো। মেয়েটি কে? ওর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। চোখও ভিজে ওঠে। এতক্ষণ ধরে তো ও নিজেকে সামলেই যাচ্ছিলো। মনে হয় আর পারা যাচ্ছে না। পুরো অবয়বটা ধ্বসে পড়তে চাইছে। তখন বিড়বিড়িয়ে বলে, নাহ্ শুধুই পরিচয় নয় দীপু। ভালোবাসা, ভালোবাসা।

ইদানীং নসিবের সঙ্গে আড্ডা একটু বেশি হয় প্রদীপ্তর। মঞ্জুলিকার সঙ্গে প্রেম হয়ে যাবার পর ও বেশ আনন্দে আছে। এদিকে নিশাতের সঙ্গে নসিবের সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। নিশাত আর এ বাসায় আসে না। নসিব একটা উপন্যাস লেখায় মন দিয়েছে। রোজই এক-

BanglaBook.org

আধ পৃষ্ঠা লেখে আর ছেঁড়ে। মাঝে মাঝে প্রদীপ্তকে বলে, কবিতা আর লিখবো না। এখন আমার একটি বড় ক্যানভাস চাই, যে ক্যানভাসে হাজার মানুষের কথা বলতে পারবো।

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। মৃদু হাসে। নসিব ঐ হাসি দেখলে কখনো ক্ষেপে যায়। বলে, হেসো না। হাসি দেখলে রাগ হয়।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, আমি হাসি আর কাঁদি যাই করি না কেন আপনি তো জানেন আমি আপনাকে ভীষণ পছন্দ করি। আপনি দারুণ লোক। আপনার লেখা পড়তে আমার খুব ভালোলাগে। আপনার বাক্যগুলোর ভেতর অনেক রকম মানে থাকে।

হয়েছে, বাড়িয়ে বলতে হবে না।

প্রদীপ্ত ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করে, আপনার উপন্যাসের বিষয় কি?

প্রেম নয়।

নসিব ঘাড় না তুলে জবাব দেয়। প্রদীপ্ত হো-হো করে হাসে। বলে, আমি জানি আপনার উপন্যাসের বিষয় কি।

কি?

রাজনীতি।

নসিব ধাম করে চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। স্থির চোখে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলে, ঠিক বলেছো।

তারপর আবার ঘুরে যায় টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে থেকেই বলে, তবে কি লিখবো সেটা ভাবিনি। ভাবছি আর গোছাবার চেষ্টা করছি। চারপাশের ঘটনা খুঁজছি। দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

পটভূমি কি? গ্রাম না শহর?

দু'টোই। আমার মনে হয় গ্রাম দেশের ধমনী– শহর মগজ। আমার নায়কের শেকড় থাকবে গ্রামে, জীবিকা শহরে।

তাহলে বিষয় দাঁড়ালো কি?

সময়। এখনকার সময়। আমাদের সময়।

কথা বলতে বলতে নসিবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রদীপ্ত আনমনে বলে, শহীদ সাবেরকে নিয়ে উপন্যাস লিখুন নসিব ভাই।

শহীদ সাবের? নসিব ভুরু কুঁচকে বলে, আহা কেমন মানুষ কেমন হয়ে গেলো।

নসিব মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে যায়। বলে, তাঁকে যখন রাস্তায় এখানে-ওখানে দেখি আমার বুক ভেঙে যায়।

আপনি কি কখনো দেখেছেন যে শহীদ সাবের ছেঁড়া চট পরে আছে? ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজছে?

দেখেছি।

আমাদের সময়টা কি এমন নসিব ভাই?

হ্যাঁ, এমনই। ছিন্নভিন্ন– ডাস্টবিনে চলে যাওয়া।

তাহলে এ সময় নিয়ে লিখে কি হবে?

লিখতে হবে এজন্য যে ওই আবর্জনা ঘাঁটলে দেখতে পাবো সবকিছুর অন্তরালে একটি সবুজ ঘাস আপন নিয়মে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলভাবে বেঁচে থাকছি না তো?

প্রদীপ্তর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ছুটে আসে। নসিব নিজেও ওর কথা আওড়াতে থাকে, ঠিকই বলেছো, ভুলভাবে বেঁচে থাকছি না তো, বলতে বলতে নসিব বাথরুমে ঢোকে। প্রদীপ্ত

BanglaBook.org

নসিবের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রাখে। মনে হয় ঐ বালিশের স্পর্শে মঞ্জুলিকা আছে– বুকটা কেমন করে। মঞ্জুলিকা একটা টানটান মেয়ে– তীব্রভাবে বোঝে, এক ধরনের তীক্ষ্ণ সরলতার ভেতর ওর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, সরলতা ওকে নির্বোধ করে না। অন্য যে কোনো ব্যক্তিত্বহীন মেয়ে এই সরলতাটুকু নিয়ে অনায়াসে বোকা বলে পরিচিত হতো। আসলে ও কি মঞ্জুলিকার ভেতর একটু বেশি ডুবে গেছে? ভাবনাটা কি বড় একতরফা ভাবনা? মঞ্জুলিকা কি ওকে নিয়ে এমন পরিতৃপ্ত? যে পরিতৃপ্তি মঞ্জুলিকা ওকে দেয়? কিন্তু না মঞ্জুলিকায় ও বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না। শহীদ সাবের ওকে আচ্ছন্ন করে। মনে পড়ে বাবার কাছে শুনেছিলো একটি মেয়ে শহীদ সাবেরকে রোজ পত্রিকা অফিসে ফোন করতো– কলকল হাসিতে উচ্ছল ছিলো সে মেয়ে, কিন্তু কোনোদিন দেখা দেয়নি সাবেরকে। একদিন সেই ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেলো– অপেক্ষায় অপেক্ষায় কত প্রহর কেটে গেলো সাবেরের, ফোন আর এলো না। প্রদীপ্তর বুক কেমন করে উঠলো। ও মাথার নিচ থেকে বালিশ সরিয়ে দিয়ে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেয়ালে টিকটিকির সঙ্গম, সঙ্গে ধ্বনি– চিন্তার সমান্তরালে প্রদীপ্ত মগজ ও হৃদয় দেখতে পায়। মগজ ও হৃদয় ছাড়া জীবনটা অর্থহীন। বাবা বলে, লেখালেখিটা মগজ আর হৃদয়। শরীরের সবচেয়ে উন্নত এই দু'টো অস্ত্র দিয়ে যদি সামাজিক ব্যর্থতাকে আঘাত করতে না পারি তাহলে লিখে কি লাভ? নিজেকে নিয়ে আমার বড় ভয় দীপু। আমি হেরে যেতে চাই না।

আমিও হারতে চাই না বাবা। প্রদীপ্ত ধড়মড় করে উঠে বসে। দেখতে পায় টিকটিকিজোড়া পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এটা কি ওদের অবৈধ সঙ্গম, নাকি বৈধ? ওরা কি পরস্পরকে মগজ ও হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে? ওরা ভুলভাবে বেঁচে আছে না সঠিকভাবে? ধাম করে বিছানার ওপর একটা ঘুঁষি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে নসিব। থমকে দাঁড়িয়ে বলে, কি ভাবছো?

ফোনের সেই স্ট্রেঞ্জড ঘটনাটি শহীদ সাবেরকে খুব আহত করেছিলো নসিব ভাই।

তুমি মোটেই শহীদ সাবেরের কথা ভাবছো না।

তাহলে ভাবছি অবৈধ সঙ্গমের সঙ্গে হৃদয় এবং মগজের সম্পর্ক কতটা।

কি হয়েছে তোমার?

আমার ধারণা সতীশ বুড়ো বেঁচে আছে। একদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

বুঝেছি তোমার মন ভালো নেই। তুমি চা খাবে প্রদীপ্ত?

হ্যাঁ।

নসিব রান্নাঘরে ঢোকে। প্রদীপ্ত বিছানায় শুয়ে রেডিওর নব ঘোরায়। শুনতে পায় জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজছে– পাক সার জমিন– ওর কান খাড়া হয়ে ওঠে। কি হলো? নিশ্চয় প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবেন। ও আগের ঘোষণা শোনেনি, তাই কিছু বুঝতে পারছে না। মিউজিক থামতেই আইয়ুব খানের কণ্ঠ গম্‌গম্‌ করে ওঠে। তিনি বলছেন, পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের ঈমানের পরীক্ষার সময় এসেছে। প্রদীপ্ত বুঝে যায় যে, আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিচ্ছেন। বলছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ভারতীয় বাহিনী আজ আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করেছে। আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত। আক্রমণকারীদের সমুচিত জবাব দানের সময় এসেছে। এ দেশে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

এটুকু শুনেই খাট থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে ওঠে প্রদীপ্ত, নসিব ভাই যুদ্ধ, যুদ্ধ!

দৌড়ে আসে নসিব, যুদ্ধ?

শুনুন না, আইয়ুব খান বেতার ভাষণ দিচ্ছেন।

BanglaBook.org

থামো, থামো, কথা বোলো না।

নসিব হুমড়ি খেয়ে পড়ে খাটের ওপর। ভাষণের খানিকটুকু চলে গেছে। প্রেসিডেন্ট বলছেন, পাকিস্তানের জনগণকে শান্ত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকতে হবে। বলছেন, যে শয়তান মাথা তুলেছে তার প্রতি কঠোরভাবে আঘাতের পর আঘাত হানতে আমরা প্রস্তুত। ভারতীয়রা জানে না কোন জাতির সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে অগ্রসর হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন, এখন সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দেওয়ার সময় এসেছে। করুণাময় আল্লাহতালা আপনাদের জয়যুক্ত করবেন।

আইয়ুব খানের কণ্ঠ থেমে গেলে আবার বেজে ওঠে জাতীয় সঙ্গীতের সুর। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে বলে, কি বুঝলেন নসিব ভাই?

ব্যাপারটা সোজা হিসেব।

কেমন?

এতদিন ধরে পাকিস্তান কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে ওদের মদদ জোগাচ্ছিলো। তার পরিণাম এখন যুদ্ধ।

তাই বলে এভাবে এমন অতর্কিত আক্রমণ করবে? এ খুব অন্যায়।

এখন সেয়ানে সেয়ানে হবে। কে জানে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে।

যাই, বাসায় যাই। দেখি বাবা কি ভাবছে। শহরে খুব উত্তেজনা হবে।

হ্যাঁ, তা হবে। ভারতের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের পক্ষে মিছিলতো হবেই। যেতে যেতে দেখবে লোকজন হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

আপনি কি করবেন এখন?

কি আর করবো। লিখতে বসবো। নাসিমা ঢাকায় থাকলে ওর ওখানে যেতাম। দু'জনে মিলে–। বাক্য শেষ না করে থমকে থেকে নসিব বলে, নাসিমা কলেজে পড়ায়, ইংরেজি সাহিত্য। মনে হয় ভালোই হবে। সাহিত্য পড়া মেয়ে নিশ্চয় আমাকে বুঝতে পারবে। কি বলো প্রদীপ্ত?

এতদিনেও বুঝতে পারেননি নাসিমা আপা আপনাকে বোঝে কি না?

এখনও বোঝার সময় হয়নি রে বোকা। যখন আবেগের ঘোর কাটবে, সংসারের প্রয়োজনটা প্রধান হবে তখনইতো পরস্পরকে বোঝার সময়।

এই গভীর কথায় প্রদীপ্ত থমকে যায়। বুঝতে পারে নসিব খাঁটি কথা বলেছে। মনে হয়, মঞ্জুলিকা তো সাহিত্য পড়ে না। তাহলে মঞ্জুলিকা কি ওকে বুঝতে পারবে না? নিশাত তো সাহিত্য পড়েনি। সেজন্যই কি ও নসিবকে উপেক্ষা করে চলে গেছে?

কি ভাবছো?

বোঝাবুঝি অনেক কঠিন ব্যাপার নসিব ভাই। সাহিত্য পড়াটড়ার ওপর ঐসব নির্ভর করে না।

হয়তো ঠিক বলেছো।

প্রদীপ্ত আচমকা বলে, নিশাত আপনাকে বুঝতে পারেনি বলেই কি আপনি এত শঙ্কিত নসিব ভাই?

নসিব চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলে, তুমি একটা দারুণ ছেলে। বাড়িতে যাও। তোমার মা হয়তো ভেবে মরছে।

মায়েদের অভ্যেস ভেবে মরা। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমি কিন্তু এখন ভীষণ রেগে যাবো। আমার খুব বিরক্ত লাগছে। আর রেগে গেলে

BanglaBook.org

আমি উল্টো মগজের মানুষ হয়ে যাই।

প্রদীপ্ত ভুরু কোঁচকায়, উল্টো মগজ?

হ্যাঁ, মগজটা যেমন আছে সেটাকে উল্টো করে দিলে শরীরের যে অবস্থা হবে তেমন।

সেটা কি?

ধরো ডারউইনের বানর।

সে বানরটি উল্টো মগজের ছিলো না। আপনি যদি তেমন একটি বানর হন তাহলে আমাকে আর একজন ডারউইন হতে হবে।

নসিব চেঁচিয়ে ওঠে, বেশি বাঁদরামি হয়ে যাচ্ছে প্রদীপ্ত।

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে পথে নামে। মনে মনে বলে, হারামী একটা।

পুষ্পিতা আর প্রতীক যুদ্ধের খবরে খুব উত্তেজিত। নানারকম আশঙ্কা প্রকাশ করছে। প্রতীক উঠোনে একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কথা ভাবছে। রেডিওতে ব্ল্যাকআউটের কথা ঘোষণা করছে। দু'জনে মিলে জানালার কাঁচে কাগজ সেঁটে দিয়েছে। রাতে রান্নাঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে খেতে বসে ওরা। প্রতীক ঠিকমতো খেতে পারে না। বারবার পানি খায়। ওর ভেতরে উৎকণ্ঠা। প্রদীপ্ত বলে, ওরা কি পূর্ব পাকিস্তানও আক্রমণ করবে বলে মনে করো বাবা?

মনে হয় না।

কেন?

দু'টো ফ্রন্টে যুদ্ধ চালানো কি এত সহজ।

আলী আহমদের কণ্ঠে দ্বিধা।

যদি ওরা আক্রমণ করে বসে তাহলে কি আমরা লড়তে পারবো?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। উত্তরটা জানা নেই। পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারির জোর কতটা শক্ত এটা ও কোনোদিন ভাবেনি। আজ ভাবার সুযোগ হয়েছে। আলী আহমদের মাথাটা টলে যায়। নতুন ভাবনায় ও আক্রান্ত হয়। ওর কেবলই মনে হয় ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে ওরা দু'দিনও টিকতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় শাসনের অবহেলা তো নতুন কথা নয়। পরদিন 'ইত্তেফাক' পত্রিকা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই। প্রদীপ্ত জোরে জোরে পড়ে আর অন্যরা শোনে ঃ

'প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও পাকিস্তান রক্ষা বিধি জারি–

পাক মূল ভূখণ্ডে ভারতের হামলা।

ত্রিমুখী অভিযান চালাইয়া লাহোরের বিভিন্ন স্থানে সেনা গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনীর হামলা। বিমানপথে দেশের দুই অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলও স্থগিত।...

অদ্য প্রত্যুষে ভারতীয় সেনাবাহিনী লাহোরে ওয়াধা ও বেদিয়নে এবং শিয়ালকোটের জাসার সীমান্ত দিয়া লাহোরে প্রবেশ করিয়া গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে পাক-ভূখণ্ডের উপর ত্রিমুখী হামলা চালায় এবং সেই সাথে ভারতীয় বিমান বাহিনী পিন্ডি লাহোর মেইন লাইনে গুজরানওয়ালার দশ মাইল দক্ষিণে গাকারমন্ডি রেল-স্টেশনে এবং লাহোর শিয়ালকোট লাইনে ওয়াজিরাবাদ স্টেশনে বোমাবর্ষণ করে।'

এটুকু পরেই প্রদীপ্ত কাগজটা প্রতীকের হাতে দিয়ে বলে, জিতু তুই মাকে পড়ে শোনা। বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে।

BanglaBook.org

প্রতীক কাগজটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে থাকে। পুষ্পিতা মনোযোগ দিয়ে শোনে না। শব্দগুলো রেলগাড়ির ধ্বনি নিয়ে করোটির চারদিকে ছুটতে থাকে। কিছু স্থির চিত্র ভেসে ওঠে, ডোবে– নড়ে, ফেটে যায়। কেমন করে যে দিন গড়িয়ে গেলো। কেমন করে যে দিনগুলো জোড়া হয়ে থাকলো। এই তো সেদিন পালিয়ে এলো। একবার ভিটেমাটি থেকে উপড়ে পড়েছে, এখন এই যুদ্ধ আবার কোথায় নিয়ে ফেলবে? ওর কান্না পায়। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। অনেকদিন পর কেবলই কালো খালার কথা মনে পড়ছে। ওর নিজের জীবনটা যদি কালো খালার মতো সর্বস্ব হারানো–। না পুষ্পিতা নিজের ভাবনাকে লাটাই ছাড়া সুতো করতে চায় না। ও রাশ টানে। উঠে রান্নাঘরে যায়। রান্না করতে ওর ভালোলাগে, যতক্ষণ রান্না করে ততক্ষণ আনন্দ যেন ওর চারপাশ ঘিরে রাখে। কোনো ফাঁক নেই খারাপ চিন্তার, বাজে ভাবনার। সময়টা পবিত্র প্রার্থনা– নিজের ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর-ঈশ্বর খেলা। প্রদীপ্ত আলী আহমদকে টেনে ঘরে নিয়ে আসে। বলে, বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি। আমাদের রক্ষার উপায় কি?

উপায় একটাই। পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর সামরিক শক্তি দিয়ে আমাদের শেষ রক্ষা হবে না। আমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধ করতে হবে।

অস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, বোমারু বিমান– কোথায় পাবো আমরা?

আলী আহমদ অবসন্ন বোধ করে। এসব প্রশ্নের উত্তর তো তার জানা নেই। এখন একমাত্র ভরসা রবীন্দ্রনাথ। আলী আহমদ নিজের ঘরে এসে বই খুঁজতে থাকে। এই আশ্রয়টি আছে বলেইতো মাথার ওপর কা-কা ধ্বনি নেই। রাত-দুপুরে অর্জুন গাছের ডালে-পাতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কাকগুলো আলী আহমদকে ছুঁতে পারে না। ও জানে মনমতো বইটি পেয়ে গেলেই ও অস্বস্তি থেকে বেরিয়ে একটি গভীর দর্শনে প্রবেশ করতে পারে।

BanglaBook.org

পরদিন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে উড়ে এলো ভারতীয় বিমান। বাজ পাখির মতো উড়ে যাওয়া বিমানের নিচে সন্ত্রস্ত নগরবাসী। প্রতীককে জড়িয়ে ধরে পুষ্পিতা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আলী আহমদ চাপা ধমক দেয়, আহ্, হচ্ছে কি? কিন্তু জোরে কথা বলার সাহসও হয় না। যুদ্ধ কি তাহলে এ অঞ্চলেও শুরু হয়ে গেলো? নাকমুখ মুছে পুষ্পিতার প্রশ্ন ঘরজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রদীপ্ত বলে, এবার আমরা পালাবো না মা। এবার যুদ্ধ করে মরবো– নয়তো জয়ী হবো।

পরদিন আবার খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া। লিখেছে, 'ভারতীয় বিমানসমূহ অদ্য সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার নিকটবর্তী কুর্মিটোলা, চট্টগ্রাম, যশোর, লালমনিরহাট ও রংপুর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি, করাচি ও সারগোদায় বিমান হামলা ও বোমা বর্ষণ করে।'

বিকেলে নসিবের ওখানে গিয়ে দেখে ও চিৎ হয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ছে। প্রদীপ্ত বইটা কেড়ে নিয়ে বলে, শহরেতো যুদ্ধ ছাড়া কোনো কথাই নাই। আর আপনি বেশ উপন্যাস পড়ছেন।

রাখো তোমার যুদ্ধ। আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এই খবরে।

কেন?

যুদ্ধটাতো ঐ ব্যাটা ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানেরই পাঁয়তারা। আমি একটুও অবাক হবো না ও যদি ভারতকে বলে যে, পূর্ব পাকিস্তান তোমরা নাও, আর কাশ্মীর আমাদের ছেড়ে দাও।

ডারউইনের বানর কেমন ছিলো প্রদীপ্ত জানে না, কালের বিবর্তনে সেটা কতটা মানুষ হওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে সেটা জানে না, কিন্তু নসিব হাফিজুদ্দিন এই মুহূর্তে আসলেই একটা বানর। এত সব উত্তেজনা ফেলে নির্বিকার চিৎপাত হয়ে আছে।

ওর দিকে ছুঁচালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলতে থাকে, নাকের ওপর আর পানি কি? এখনো টের পাওনি যে আমরা কত অরক্ষিত। পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সব পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তেই নিয়োজিত।

সেজন্যইতো ভয় করছে। ভারত আক্রমণ করলে আমাদের কোনো উপায় নেই।

নসিব হো-হো হাসিতে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, ভয়ের কথা কি বলছো? জনগণ সচেতন। দেখছো না কত সভা, মিছিল, উদ্দীপনা। এক হাত দেখিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার।

নসিবের শাণিত কণ্ঠে প্রদীপ্ত আহত হয়ে বলে, নাহ্, আপনার সঙ্গে কথা বলে পারা যাবে না। বুঝতে পারছি যে আপনি বেশ মুডে আছেন।

জানো আজ সারা সকাল লিখেছি?

তাই নাকি? দেখি। কি নাম রেখেছেন উপন্যাসের?

'এই সময়।'

বাহ্, চমৎকার নাম। দিন না পড়ি।

নসিব আঙুল দিয়ে ওকে টেবিলের ওপর রাখা পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে–

"নদীতে এখন তুফান।

জোয়ারের ঢেউয়ের সঙ্গে বাতাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পানি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। যেন নদীর গর্ভধারণ। কিন্তু নষ্ট মেয়ে মানুষের মতো খিলখিল হাসি সহকারে অবলীলায় সে গর্ভ খারিজ করে দেয়। ঢেউ এখন প্রবলবেগে উঠছে, আর ভাঙছে। তাই বুড়োর ছোট্ট নৌকার শরীরে কাঁপুনি। এমন ছোটখাটো তুফানে ওদের ভয় নেই। বুড়ো নিশ্চিন্তে নামাজে বসে, আসরের নামাজ। সূর্য পশ্চিম আকাশে তাই মুখের ওপর রোদ। বুড়োর মাথায় সাদা টুপি, সাদা দাড়ি, চেহারায় আলোকিত প্রশান্তি, সেটার রঙও বোধহয় সাদা, বোঝা যায় না। কিন্তু কখনো মানুষের চেহারায় অদৃশ্য রঙ লেপ্টে থাকে। সেটা দৃষ্টি। মুখের ওপর আসরের নামাজের সময়কার রোদ, সেই সঙ্গে আশা-প্রত্যাশার ছায়া কাঁপছে। বুড়ো সেজদায় গেলো, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, পাথরঘাটা থেকে আসা লঞ্চের ভেঁপু কানে যায় না। পরকালের সুসময়ের প্রার্থনায় বুড়ো বধির হয়ে গেছে। বুড়িও ধ্যানমগ্ন, একাগ্র দৃষ্টি ফাতনার নড়ে ওঠায়, লঞ্চের ভেঁপু ভ্রুক্ষেপ করে না। একটা বড় মাছ পেলে সন্ধ্যায় হাটে বেচে রাতের চাল জোটাবে। বুড়োর চাইতে এসবের চিন্তা বুড়ির মধ্যে প্রবল এবং সেভাবে রোজগারের চেষ্টা করে। বুড়ো কিছুটা সহজ-সরল মানুষ, বুড়ির ওপর নির্ভরশীল। বছর বারোর নাতিটা অসময়ে ঘুমিয়েছে, গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। লঞ্চের ভেঁপু ওর কানে যাবার কথা নয়। ও স্বপ্ন দেখে ওর বাবাকে, বছর দুই যাবৎ সে নিখোঁজ। ঘুমের মধ্যে ও বিড়বিড় করে। যেন ওর বাবা ফিরে এসেছে, ও দৌড়ে গিয়ে কোলে উঠেছে। নদীর তুফানের মতো সুখ কাঁপছে ওদের সংসারে। জ্যৈষ্ঠের শেষ, অস্তগামী সূর্যের আলোও গরম। ছেলেটির মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওর চেহারায় রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই, বিবর্ণ এবং ফ্যাকাসে। ওর বছর চারেক বয়সে আর একটি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ওর মা মরেছে। বছর আটেক বয়সে বাবা শহরে কাজ খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ও এখন দাদা-দাদীর আশ্রয়ে। ছেলেটি পাশ ফিরে শোয়। মুখে লাল গড়ায়। ঘাম এখন আর বিন্দু বিন্দু হয়ে নেই, সারা মুখে লেপ্টে গেছে। বুড়ো মোনাজাত করছে। বুড়ি সাঁই করে বড়শি টান

BanglaBook.org

দেয়, একটা মৃগেলের বাচ্চা উঠেছে। খুশিতে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়। বুড়ো মোনাজাত শেষ করে মুখ ফেরায়।

বিশখালি নদীতে ওরা তিনজন। সামনে দিগন্ত ধনুকের মতো বাঁকা। বুড়ো নামাজ শেষে নৌকার হাল ধরেছে। এখন ওরা ডাঙায় ফিরবে। ছেলেটি উঠে বসে হাতের উল্টো পিঠে চোখ কচলায়। ঘুমের আমেজ কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ওর সবকিছু মায়াময় মনে হয়, যেন নদী, আকাশ, পাহাড়, গাছগাছালি ওর নিজের, একদম আপন। ওর এমন ভালোবাসা খুব অল্পক্ষণের। বেশির ভাগ সময়ই ও বিষণ্ন এবং মনমরা। বাবার অভাব ওকে দমিয়ে রাখে। একটু দূর থেকে রমজান আলি বুড়োকে উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়ে, কি মাছ পেয়েছে জিজ্ঞেস করে। বুড়ো বাতাসে গলা ছেড়ে জবাব দেয়। ছেলেটি ওর দাদীকে দেখে। বুড়ি বড়শি গুছিয়ে রাখছে, আজকের মতো শেষ। মাছ ধরায় বুড়ির দারুণ উৎসাহ, ক্লান্ত হয় না। ঘরের কাজ করতেই যত বিরক্তি। ঘর বুড়ির যন্ত্রণা, নদী আনন্দ। বুড়ি গুনগুনিয়ে দরুদ পড়ছে, সুখের মুহূর্ত ও এমন করেই কাটায়। চিকন গলার সুর ছেলেটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওর বয়স এখন বারো, দেখায় দশ। ওর মগজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শরীর বাড়েনি বলেই লোকে অনেক সময় ওকে বুঝতে পারে না। ওর দাদা পালের নৌকার মাঝির সঙ্গে কথা বলছে, নদীর বুক জুড়ে হলুদ আলো, কী মোলায়েম অথচ কিছুটা উষ্ণ, শীতের সকালের নাড়া জ্বালানো আগুনের মতো রঙ ও তাপ। ওর বুক ভার হয়ে ওঠে, বাবার জন্যে ব্যাকুল হয় হৃদয়। ইচ্ছে করে শহরে ছুটে গিয়ে বাবাকে খুঁজে নিয়ে আসতে। লঞ্চ থেকে নেমে কাঁচা-মরিচের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘরে ফিরে দাদীর গলা জড়িয়ে বলবে, 'দাদী মোগ আর দুখ নাই, বাজান আইছে।' আসে না কেন বাবা? কোথায় হারিয়ে গেলো? ছেলেটির মুখের রেখা বদলে যায়, জোয়ারের নদীর মতো এলোমেলো, বিকেলের হলুদ আলো যেখানে আঁকাবাঁকা তেমন বিষণ্ণতা ওকে আঁকড়ে ধরে। মাঝির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর দাদা উঁচুকণ্ঠে হেসে ওঠে। ওর কাছে কেমন অর্থহীন মনে হয় সে শব্দ। ও দাদীর দিকে তাকায়। বুড়ির দৃষ্টি ডাঙায়। কিছুই দেখছে না কিংবা দেখছে, নইলে কিছু ভাবছে। বুড়ি তার ছোটবেলার কথা বলতে ভালোবাসে। সেইসব কিছু হয়তো এখন তার চিন্তায়। ছেলেটি আঁতিপাতি বুড়ির চেহারা দেখে। সে জায়গাটিও এখন অর্থহীন।' মিছেই ওর বাবার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে চেষ্টা করছে ও।

নৌকা পাড়ে ঠেকিয়ে বুড়ো মাছ নিয়ে নেমে যায়। আজ হাটবার। লোকজনের আসা-যাওয়ায় বাজার গম্‌গম্‌। বুড়ি লগি ধরে বসে থাকে।

দাদী মুই নামি?

না, মানিক, না। তোর দাদা অহনই আইয়া পড়বো।

ছেলেটি কর্ণপাত করে না। জোরসে লাফ দিয়ে ডাঙায় নেমে ভিড়ে মিলিয়ে যায়। বুড়ি পিছু ডেকে চুপ করে থাকে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। যে বয়সে সুখ করার কথা, সেই বয়সেই উপার্জনক্ষম ছেলেটি নিরুদ্দেশ।

ও মনু মিয়ার মা পোলার কোনো খোঁজ পাইছো?

পাড়ে দাঁড়িয়ে আনসার মিয়া জিজ্ঞেস করলে বুড়ি প্রবলবেগে না-সূচক মাথা নাড়ে। এই একটি প্রশ্ন শুনলে ও বিরক্ত হয়, কলজে পর্যন্ত তেত হয়ে ওঠে। মানুষের যত্তসব আদিখেত্যা! সহানুভূতির নামে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। আনসার মিয়া আরো দু'চারটে কথা বলে চলে যায়। বুড়ির মেজাজ আর ঠিক হয় না, গন্‌গনে মাটির খোলার মতো ভেঁপে থাকে। মনুমিয়া নিরুদ্দেশ হবার পর বছর দু'য়েক ফিরে আসবে বলে কাল গুনেছে। আস্তে আস্তে এই আশা পরিত্যক্ত হয়ে গেলে বুড়ির মেজাজ বদলে যেতে থাকে। মৃত্যু শোক তবু সহনীয় কিন্তু এই বেদনা শুধু বুক নয়, সমস্ত শরীর খাম্‌চে ধরে রাখে। যেখানে হাত দেয়

BanglaBook.org

সেখানেই অনুভব করে। এই অনুভবের সময় রাত-দিন সমান হয়ে যায়, ধূসর হয়ে যায় জোয়ারের জল, বিবর্ণ দিগন্তের রেখা, অর্থহীন নদীর ধ্বনি। বুড়ো তখন ওকে বুকে জড়িয়ে রাখে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে দেয়, যৌবনের সময় ফিরিয়ে আনে, মনে হয় না ওরা পঁয়তাল্লিশ বছর ঘর করে এখন শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে। আর এক পা এগুলে জীবনের সুতো ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু ঐ এক পা আর এগুনো হয় না। ওরা বিপজ্জনক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ি ট্যাক থেকে পানের কৌটো বের করে পান মুখে পোরে। নদীতে সন্ধ্যা নেমেছে, নিথর হয়ে গেছে নদী, বাজারের কোলাহল নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটির জন্যে বুড়ির বুক কেমন করে। ও জিলেপি খেতে ভালোবাসে। দু'তিনবার জিলেপি চুরি করে ধরা পড়ে মার খেয়েছে। একবার দোকানদার এমন করে হাত মুচড়ে দিয়েছিলো যে ভালো হতে সময় লেগেছিলো প্রায় মাস ছয়েক, এখনো হাতটা সামান্য বাঁকা হয়ে আছে। তবু ওর দুঃখ নেই, জিলেপি দেখলে চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে। চুরি করে জিলেপি খেতেই হবে। একবার বুড়ি ওকে একটা টাকা দিয়েছিলো। ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো।

কি হরমু?

জিলেপি খাবি।

না নিমু না। টাহা দিয়া মুই জিলেপি খামু না দাদী।

ক্যান?

চুরির জিলেপিতে মজা বেশি।

ছেলেটি দাদীর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। ওর নাগাল ধরে কার সাধ্যি! হাটবার এলেই ও অস্থির হয়ে ওঠে। এজন্যে বুড়ো এখন নিয়মিত বাজারে আসে না। ওরা কেউ ফিরছে না দেখে বুড়ির মেজাজ চড়তে থাকে, কতক্ষণ আর একা বসে থাকা যায়। একটু পর বুড়ো ফিরে আসে। গামছায় বাঁধা চাল আর কিছু আনাজ। লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। বুড়ি খেঁকিয়ে ওঠে।

মরণ! না আইলেই তো অইতো।

বুড়ো কথা বলে না। ঘড়ঘড়িয়ে কাশে, বুকে কফ্‌। বুড়ির ভাঁপা মেজাজ খুব অল্পক্ষণের, একটুক্ষণ চুপ থাকলেই পড়ে যায়। বুড়ো এতটাকাল এই ভাবেই বুড়িকে সামাল দিয়ে আসছে।

শয়তানডা অহনও আইলো না। ওর বাপে পোড়াইছে কইলজা, ও পোড়ায় শরীল। আর সয় না। আল্লা যে ক্যান উডাইয়া নেয় না মোরে।

বুড়ো চুপ, বুড়িও। আর কথা বাড়ে না। চারদিকের কোলাহল ওদের কানে ঢোকে না। ওরা যেন হঠাৎ করে শতাব্দীকালের প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। কোনো যুবকের প্রতীক্ষায় আছে যে এসে ওদের শরীরে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে। নদী থেকে শব্দ উঠছে, বাতাসে শোঁ শোঁ ধ্বনি, মানুষের কণ্ঠ স্রোতের মতো বয়ে যায়, শুধু ওরা দু'জন নীরব।

একটি ছেলের প্রতীক্ষায় সময় গুনছে।

অনেকক্ষণ পর ও আসে। মুঠিতে দু'টো জিলেপি।

দাদী খা?

বুড়ি কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

ও দাদী, খা?

বুড়ো নৌকো খুলে দেয়। ওদের ভীষণ খিদে পেয়েছে। সারাদিনের ধকলের পর এখন মনে হয় ক্লান্ত। ছেলেটি বেশি আবদার করলে দাদীকে তুই বলে ডাকে। ও বুঝতে পারে বুড়ি রাগ করেছে। কাছে এসে পায়ে হাত রাখে।

BanglaBook.org

মুই খাইছি দুইডা। তোমাগো লাইগা আনছি দুইডা। আইজ দোকানদার বুজতেই পারে নাই। হেইর লাগি সময় লাগছে।

বুড়ি তবু নিশ্চুপ। নৌকা তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। ছেলেটি একটা জিলেপি বুড়ির মুখে গুঁজে দেয়। আর একটি বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিলে বুড়ো নিজেই মুখে পোরে। দু'জনেই জিলেপি চিবোয়। একজন নিঃশব্দে, আর একজন শব্দ করে। ছেলেটি পাটাতনে চিৎপাত হয়, আকাশ-ভরা তারা দেখতে ভালোলাগে, যেন ওর অন্ধকার বুকে স্বপ্নের মতো ফুটে আছে। ছেলেটির চোখে জল আসে।

নদীতে ওদের বাড়িঘর ভেঙে গেলে ওরা এখন চরে থাকে। নেসার জমাদারের জমি পাহারা দেয়। মাচার ওপর ওদের ঘর। জোয়ারে চরে হাঁটু সমান জল জমে। মাচার ওপরে থাকতে ওদের কারোই ভালোলাগে না। মাটির কাছ থেকে পর পর মনে হয় নিজেদের। তবু থাকতে হয়, থাকতে থাকতে কখনো কোনো মুহূর্তে মাচাই প্রিয় আবাস মনে হয়। বড় মুহূর্তিক সে ভালোবাসা। ওদের কাছে দু'টো হাঁড়ি, তিনটি থালা, একটি গ্লাস, তিনটি চামচ, একটি মাটির কলসি আর দু'টো বালিশ, একটি কাঁথা। ছেলেটির জন্যে কোনো বালিশ নেই। ও কাঁথার ওপর মাথা সোজা রেখে টানটান হয়ে ঘুমোয়। এই অল্প আয়োজনের বুড়ো-বুড়ির সংসারে ছেলেটি সম্পত্তি। ও জমিজমা, হাল-বলদ, গোলার ফসল। মাঝে মাঝে বুড়ো-বুড়ি দু'জনেরই খেই হারিয়ে যায়, বুঝতে পারে না ছেলেটি ওদের কতখানি, কতটুকু, বেশি না কম। তাই দু'জনেই ওকে চোখে চোখে রাখে। দুরন্ত ছেলে, নিষেধ মানতে চায় না। বাবার জন্যে ওর প্রবল টান, সামনে নেই সেজন্যে হয়তো, অদৃশ্য বস্তুর জন্যে পাগলের মতো নেশা। বিশখালি নদীতে লঞ্চ গেলে ও দৌড়ে কিনারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কোনো দিক থেকে কোনোদিন অবাক করে ওর বাবা এসে হাজির হয়।

বুড়ো দ্রুত নৌকা বেয়ে ঘাটে এসে পৌঁছে। ছেলেটির হাতে সওদা। মরিচের ক্ষেতের আল বেয়ে ও লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। আকাশে জ্যোৎস্না। বুড়ো বুড়ির হাত ধরে আছে, যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এই আশঙ্কায়। চোখে ওরা এখনো ভালো দেখে, জ্যোৎস্না রাতেও অসুবিধা হয় না। তবু এবড়ো-খেবড়ো আল পথ তো, সাবধানের মার নেই। বুড়ো বুড়িকে আগলে রাখতে ভালোবাসে। ছেলেটি নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে দু'জনের মধ্যে যৌবনের ভালোবাসা ফিরে এসেছে।

পোলাডারে খাড়াইতে কন, এত আগে আগে যায় ক্যান?

যাউক। যাইতে দ্যাও।

বুড়োর কথাটা বুড়ির পছন্দ হয় না। তবু চুপ করে থাকে। আসলে নাতিটি বুড়ির চোখের আড়াল হলে বুক চেপে আসে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অবশ্য এই মুহূর্তে বুড়োর হাত পরম আশ্রয়, তবু বুড়ি গলা ছেড়ে ছেলেটিকে ডাকে।

ও নান্টু।

ছেলেটি পেছন ফেরে না। অনেক দূরে অন্ধকারে ওকে বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। একটু পর আর দেখা যাবে না।

বুড়ির কাঁধে হাত রাখে বুড়ো।

যাউক, যাইতে দ্যাও।

না। ও নান্টু–

বুড়ি আরো জোরে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ডাকে। বাতাসে ফ্যাসফেসে কণ্ঠ চিরে যায়। খোলা প্রান্তরে সে ডাক হা-হা ফেরে। বাতাসের ঘূর্ণিতে সে কণ্ঠ চক্রাকারে ঘুরে বুড়ির বুকে সেঁধিয়ে যায়। ছেলেটি থামে না এবং কোনো জবাব দেয় না। বুড়ি কেঁদে ফেলে।

BanglaBook.org

পোলাডা একডা আস্ত শয়তান।

বুড়ো শব্দ করে হেসে ওঠে।

তোমার মাথা খারাপ। ও কি আর আমাগো লাইগ্যা বইয়া থাকপো! ও যাইবেই।

বুড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। শক্ত করে বুড়োর হাত চেপে ধরে।

মোরা কি কেবল দুইজনেই থাকুম? মোরা কি ঝাড়ে-বাত্তিতে বাড়ুম না?

বুড়ো খোলা আকাশের নিচের নির্জন প্রান্তরে বুড়িকে বুকে চেপে ধরে।

দুইজনেই তো ভালা আছি মোরা।

বুড়োর বুকে মাথা রেখে বুড়ি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মনে হয় সময়টা খারাপ, কিছুতেই কাটে না। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার শব্দ, ব্যাকুল বৃষ্টির মতো একটানা, পতন এবং নির্গমন, টাপটুপ বুকের কোন্দরে ঝরে। তখন শুনতে পায় ছেলেটি ডাকছে– দাদী, ও দাদী। জলদি আও, জোয়ার আইয়া পড়বে।

সে ডাক বুড়ো-বুড়ির কানে যায় না। দু'জনের চেতনায় বৃষ্টির পতন এবং নির্গমনের শব্দ। প্রান্তরে ঝিঁঝির ডাক তুঙ্গে ওঠে। মনে হয় কোথাও শূন্যতা নেই, কেবলই কোলাহল, প্রচণ্ড কোলাহল। দু'জনের মাথার ওপর জ্যোৎস্নার আশ্চর্য আশীর্বাদ। ছেলে হারানোর শোক নেই, খিদের কান্না নেই, ঘর-ভাঙা চেতনায় ফসলের উৎসব। বুড়ো বুড়ির হাত ধরে এগোয়। এখন একটা দারুণ সময়, এই সময়টা বড়ো মুহূর্তিক, কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। এই সময়টা শৈশবে ছিলো, যখন রূপকথার গল্প শুনতো। যৌবনে ছিলো যখন উভয়ের মিলনে বাগানে পুষ্পে-পল্লবে শোভিত হয়েছে, পাখি গান গেয়েছে, নদীতে বান ডেকেছে। সেই সময় বার্ধক্যে আছে, যখন ফাতনার নড়ে ওঠায় মাছের আশা ঝিলিক দেয়, উত্তরসূরির কণ্ঠে নতুন প্রজন্ম ধ্বনিত হয়।

ও দাদী মোর খিদা লাগছে।

ছেলেটির রাগী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাতাস দ্বিখণ্ডিত, চরাচর আলোড়িত এবং ঝিঁঝি পোকার ঐকতান এক অনির্বচনীয় সুরে মর্মরিত। এই কণ্ঠস্বর শুনে বুড়ো-বুড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়ার ক্ষমতা নেই যেন। ছেলেটি চিৎকার করে এ একটি বাক্য উচ্চারণ করে। বুড়ি বলতে চায়, তুই খাড়া, মুই আইতাছি। কিন্তু বলতে পারে না। কণ্ঠে সাঁড়াশির চাপ, ওদের জমি নেই, জমি নেসার জমাদারের। ওদের ফসল নেই, ফসল নেসার জমাদারের। ওরা পাহারাদার মাত্র। যা পায় তাতেও ওদের খিদে মেটে না। ছেলেটির বাপ পেটের ধান্দায় শহরে গিয়ে আর ফেরেনি। ওদের খিদে মরে না, চাওয়া পূরণ হয় না, এই দেখতে দেখতেই তো জীবনের পাড়ি হয়ে গেলো, এখন ছেলেটির শুরু। বুড়ো-বুড়ি নড়ে না, ওদের ইচ্ছে ছেলেটি চেঁচাক, চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠুক, যেভাবে নদীর ভাঙনে জমি তলিয়ে যায় সেভাবে বিরুদ্ধ স্রোতের প্রবল তোড়ে ছেলেটির জীবন তছনছ হোক, ও দাঁড়াতে শিখুক।"

একটানা পড়ে ফেলে প্রদীপ্ত নসিবের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। নসিব মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগলো?

আপনার আগের লেখার মতো নয়, একদম অন্যরকম।

কেমন?

প্রতীকের ব্যবহার চমৎকার। দারুণ বলেছেন যে, বিরুদ্ধ স্রোতের প্রবল তোড়ে ছেলেটির জীবন তছনছ হোক, ও দাঁড়াতে শিখুক। নাহ্ আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না। দিন, পায়ের ধুলো দিন।

বেশি কোরো না, বেশি সহ্য হয় না।

বাকিটুকু কবে পড়বো?

BanglaBook.org

দেখি কি করতে পারি। দেখা গেলো হয়তো সাতদিন আর লিখতেই পারলাম না। যুদ্ধের পরিস্থিতিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে। আচ্ছা প্রদীপ্ত লেখাটা নাসিমার ভালোলাগবেতো?

আমি কেমন করে জানবো? আপনি মাঝে মাঝে বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যান নসিব ভাই। আগে আপনি এমন ছিলেন না। নাসিমা আপার প্রেম আপনাকে খানিকটা বদলে দিয়েছে।

নসিব চুপ করে থাকে। নাসিমার সঙ্গে প্রেম ওর জীবনে অবশ্যই একটি বড় ঘটনা। নিশাতের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াও তেমন। কিন্তু এই উপন্যাসে কোনো প্রেম থাকবে না। ও এখন পর্যন্ত নিজের প্রেমকে পাশ কাটিয়ে রাখতে পারছে।

যাবার সময় প্রদীপ্ত বলে, আপনার গল্পের এই ছেলেটি কে? সে কি এই পূর্ব বাংলা?

হো-হো করে হাসে নসিব। হাসির তোড়ে ওর আর জবাব দেয়া হয় না। জবাব ও দিতেও চায় না। নসিব নাসিমার কাছে যাবে বলে দরজায় তালা দেয়। ওর ভেতরে এখন অন্য উত্তেজনা, উপন্যাস নিয়ে ও আর ভাবছে না। কিন্তু প্রদীপ্তর মাথায় উপন্যাসের বিষয়টা থেকেই যায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই।

নসিব রিকশা নিয়ে লালবাগ যায়। প্রদীপ্ত নীলক্ষেতে নেমে পড়ে। ও রেসকোর্সের পাশ দিয়ে রমনায় যাবে। ও ঠিক করে হেঁটেই যাবে। মায়ের কড়া নির্দেশ সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। তবু ও নিজের ভেতর তাড়া অনুভব করে না। ওর হাঁটতে ভালো লাগছে। বর্ধমান ভবনের সামনে মঞ্জুলিকা রিকশা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ও। তারপর দ্রুতহাতে পকেট হাতড়ে আট আনা পয়সা দেয় রিকশাওয়ালাকে। মঞ্জুলিকা তারস্বরে বলে, ওকি কি করছো?

বুঝলে না, রিকশাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম।

মানে?

মানে তুমি এখন নেমে পড়বে।

কি যে করো না?

এসো।

প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে টানে। বলে, পাঁচ মিনিট দু'জনে রেসকোর্সে বেড়াবো। তারপর তুমি চলে যাবে।

রোকেয়া হলে সাথীর ওখানে আমার জরুরি কাজ ছিলো।

আহ্ মঞ্জুলি এমন করতে হয় না।

ও নেমে আসে। প্রদীপ্তর ঐ কণ্ঠ উপেক্ষা করার ইচ্ছে ওর নেই। শুনলে শরীর অবশ হয়ে যায়। কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু'জনে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

মঞ্জুলিকা মৃদু হেসে বলে, মায়ের কাছে বলে এসেছি যে যাবো আর আসবো। দেরি হলে মা ভীষণ বকবে।

দেরি হবে কেন? তুমি তো যাবে আর আসবেই। এই এমন, বলেই ঝট্ করে ওকে চুমু খায়।

ছিটকে ওঠে মঞ্জুলিকা, কি করলে?

জনারণ্যে নয়, অথচ খোলা আকাশের নিচে তোমাকে চুমু খাবো, এমন একটা ইচ্ছে আমার অনেক দিনের ছিলো।

চারদিকে যখন মানুষ যুদ্ধের তোড়ে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, তখন তুমি প্রেমের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছো–

আমি যদি যুদ্ধে গিয়ে মরে যাই তখন তুমি কি করবে মঞ্জুলিকা?

BanglaBook.org

এখানে যুদ্ধ কোথায় যে তুমি মরবে?

ভারত যদি আমাদের আক্রমণ করে?

বেশ ভালোই হবে। তুমি যে ফ্রন্টে যুদ্ধ করবে আমি সেখানে নার্স হয়ে যাবো। হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতো, না?

না, আমাদের অমন করুণ পরিণতি হবে না।

না, কখনোই তা হবে না। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার হাত চেপে ধরে। গাঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরবো। আমাদের ছেলেমেয়েদের যুদ্ধের গল্প শোনাবো।

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মঞ্জুলিকা বলে, আমরা বুড়ো হয়ে গেলে মনে করবো যুদ্ধের সময়টা আমাদের জীবনে এক দারুণ সময় ছিলো।

গল্প করতে করতে দ্রুত সময় ফুরিয়ে যায় ওদের। ওরা ঘরে ফেরে।

সতেরো দিন যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদ বিশ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিলে দু'দেশই তা মেনে নেয়। যুদ্ধ বাধার খবরটা যেমন আকস্মিক ছিলো, থামার খবরটাও তেমন আকস্মিক। বাইশ তারিখ ভোররাতে যুদ্ধ বিরতি আদেশ কার্যকর হয়। ভোরবেলা কাগজ নিয়ে প্রদীপ্ত আলী আহমদকে বলে, ব্যাপারটা কেমন হলো বাবা? আমাদের একটা দারুণ শিক্ষা হলো। ভেবে দেখো, যুদ্ধ বেশিদিন স্থায়ী হলে আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যেতাম। এ অঞ্চলে কখনোই খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখা হতো না, তার ওপর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অন্য দেশ থেকে সাহায্য আসার পথ খোলা ছিলো না।

আমাদের জন্য এ এক নতুন অনুভব বাবা।

হ্যাঁ, তা সত্যি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আর একটা ক্ষতি হয়েছে। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, সবসময় দেখছি তোমার কষ্টটা একটু অন্যরকম।

বাঙালি সংস্কৃতিকে ওরা যে ইসলামি সংস্কৃতি বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে না? এই নিঃশব্দ যুদ্ধটাও কম ভয়াবহ নয়।

প্রদীপ্ত মাথা নেড়ে বাবার সামনে থেকে সরে পড়ে। নসিবের ওখানে দু'দিন গিয়েছিলো দেখা হয়নি। আজ ওখানে যাবার জন্য মন ছটফট করে। বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে মন চায় না। কপাল ভালো যে নসিবকে বাড়িতেই পাওয়া গেলো।

আজ অফিস করবেন না?

পাগল, আজতো উৎসব। পত্রপত্রিকাগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে জয়গান গেয়েছে তুমি কি মনে করো–

রাখেন আপনার সেনাবাহিনীর গল্প। আপনার লেখা কই?

তুমি তো আর এলে না, আমি অনেকখানি লিখে ফেলেছি।

যুদ্ধের কথা এনেছেন?

পাতানো খেলায় আমার আস্থা নেই। বলেছিলাম না এ হচ্ছে ফিল্ড মার্শালের কূটচাল। জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

থাক, আপনি আর এসব বলবেন না। পাবলিক ভীষণ ক্ষেপে আছে। শেষে আপনাকে আক্রমণ করে বসবে।

তুমি আমার উপন্যাস পড়ো। আমি বাজারে যাচ্ছি। দু'জনে একসঙ্গে খাবো কিন্তু।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত মহাখুশিতে মাথা নাড়ে। তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজ টেনে নেয়। সেদিন যেটুকু পড়েছিলো তারপর থেকে শুরু করে–

"তখন ছেলেটি দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের কাছে আসে।

খাড়াইয়া রইচ ক্যা তোরা? মোর খিদা লাগছে, ভাত রান্ধবি না?

ছেলেটি বুড়ির হাত ধরে হেঁচকা টান দেয়। ওরা চলতে শুরু করে, যেন কলের পুতুল। এবার ও আর ওদের হাত ছাড়ে না। দু'হাতে দু'জনকে ধরে এগোয়। হাতের পোটলা-পুটলি ও দাদার হাতে তুলে দিয়েছে। ওর মনে এখন ভারি আনন্দ।

একটা বড় ভাঙা লোহার কড়াইয়ে মাটি দিয়ে চুলো পেতেছে বুড়ি। সেই চুলোয় ঘুঁটে দিয়ে রান্না করে। ছেলেটি গোবর কুড়োয়, বুড়ি ঘুঁটে বানায়। কখনো দু'জনে মিলে শুকনো ডাল কুড়িয়ে আনে। ঘরে ঢুকেই বুড়ি চাল ধুয়ে ভাত বসায়, কিন্তু ছেলেটির আর খাওয়া হয় না, ও ঘুমিয়ে পড়ে। একবার ঘুমুলে ওকে আর ওঠানো যায় না, ঘুম থেকে উঠে ও কিছুতেই ভাত খায় না। বুড়ো ওকে গল্প বলে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলো কিন্তু ছেলেটি আজ গল্প শোনে না। বেশ রাতে বুড়ি ভাত খেতে বসে মন খারাপ করে।

পোলাডার প্যাডে খিদা–

বুড়ি কোঁৎ করে ভাত গেলে।

ছাড়ান দাও, পোলাপানের কি কিছু ঠিক আছে।

ও মোর ধারে ভাত চাইলে–

বুড়ির কণ্ঠ বিষণ্ন, কিছুটা অপরাধী। ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতে বুড়ো মজে যায়, কথা না বলে খেতে থাকে। পান্তা ভাত বুড়ির প্রিয়, গরম ভাত বুড়োর।

মোর পোলাডা যে এহন কোনহানে? আহা মোর বাজান কি দু'গ্যা ভাত পায়?

বুড়ির গলা ধরে আসে। সানকির ভাতে পানি ঢেলে দেয়, খেতে ইচ্ছে করে না।

করো কি? করো কি? পেত্যেকদিন এমুন করলে কি শরীল ভালা থাকবে?

বুড়োর দরদ উপচে পড়ে। বুড়ির হাত চেপে ধরে।

আর দু'গা খাও।

না।

বুড়ি হাত গুটিয়ে নেয়। বাসন গোছায়। ভাতের হাঁড়িতে পানি দেয়। বুড়োর খাওয়া শেষ, সানকিতে হাত ধুয়ে নেয়।

কাইল শিঙ্গইর মাছ ধরমু। নাস্টুরে নিমু লগে।

বুড়ো বিড়ি ধরায়। খাওয়ার পর একটা বিড়ি না খেলে হয় না। বুড়ি কুপি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। বুড়ো ঘরের দরজা খুলে দেয়, ধুম বাতাস আসছে। ও পা ঝুলিয়ে বসে। জ্যোৎস্নায় আলোকিত প্রান্তর শৈশবের রূপকথার তেপান্তরের মাঠে এখন জোয়ার আসছে, নদীতে কলধ্বনি। কান পাতলে সে ধ্বনি রয়ানি গানের করুণ সুরের মতো মনে হয়। ছেলেবেলায় রাত জেগে রয়ানি গান শুনতো ও। এখনো সে অন্যমনস্ক হলে বেহুলার বিলাপ শুনতে পায়। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী নিয়ে কেমন করুণ সুরে গান গাইতো রাখাল দাস। ও মরার পর ওর ছেলে দল গড়েছিলো, কিন্তু বুড়োর কাছে সেটা তেমন ভালো লাগতো না। এখনো ওর কানে বাজে রাখাল দাসের কণ্ঠ। আজ এই মুহূর্তে জোয়ারের শব্দে সেই ব্যঞ্জনা বুড়োকে অন্যমানুষ করে দেয়, ছেলের জন্যে বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে আসে। বুড়ি সারাক্ষণ ছেলের দুঃখে ম্রিয়মাণ বলে বুড়ো নিজের বুকের ঢাকনা খোলে না। তাতে বুড়ি আরো কাতর হবে ভেবে। চাঁদ সওদাগরের ওপর আক্রোশে লক্ষ্মীন্দরকে মনসা খেয়েছিলো, কিন্তু ওর ছেলেকে কে খেলো? ও কেন হারিয়ে গেলো?

BanglaBook.org

কোথায় হারালো? বুড়ো হু-হু করে কেঁদে ওঠে। শব্দ করে না, পাছে বুড়ির ঘুম ভেঙে যায়। এই ছেলেটি হবার পর বুড়ির আর ছেলেমেয়ে হয়নি। কত তাবিজ, পানিপড়া, ঝাড়ফুঁক করেছে, কিছুতেই কিছু না, বুড়ি কেঁদেকেটে শান্ত হয়ে যায়। বুড়ো বয়সে এসে সেই একটি ফল বোঁটা থেকে উপড়ে গেলো। বুড়ো গামছায় চোখ মোছে, নাক ঝাড়ে। ঘুম আসে না, দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে।

বুড়োর মনে হয় মাঝে মাঝেই একটা প্রবল ঝাপটা আসে, ওকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। ও যখন উঠে দাঁড়ায়, কিছুটা শক্ত হয় তখন আবার একটা। আবার মুখ থুবড়ে পড়ে, মুখে ফেনা ওঠে, রক্ত ঝরে। জীবনের উথাল-পাতাল বুড়োর পায়ের বেড়ি। নদীতে যেদিন ভিটে গেলো সেদিন কী ঘোর অমাবশ্যা ছিলো। নদীর ভাঙনের গতি দেখে আগেই বাড়ি ছেড়েছিলো ওরা। প্রতিদিন নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, দেখতো নদীর ভাঙন। প্রবল ঢেউ এসে ধ্বসিয়ে দেয় মাটি, একটু একটু করে তলিয়েছে ওর ভিটে। ঘরের বেড়া, দরজা, চাল সব খুলে নিয়েছিলো আগে। শুধু দু'চোখ ভরে দেখে ভাঙন, চিৎকার করে কেঁদেছে ওরা সবাই। মনু মিয়া কেমন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। জমি নেই ওদের, ছিলো একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই, তাও গেলো। বুড়ো চোখ বুঁজলে স্পষ্ট দেখতে পায় সে দৃশ্য, দেখতে চায় না, তবু দেখতে হয়। এত বেশি তাজা যে না দেখে থাকতে পারে না।

একটু পর বুড়ির ঘুম ভেঙে গেলে উঠে এসে পাশে বসে।

ঘুমাইবেন না?

ঘুমতো আয় না।

বুড়ো পা গুটিয়ে নেয়।

তুমি উঠলা ক্যা? ঘুমাও যাইয়া।

মোরও ঘুম আয় না।

বুড়ি চুপচাপ বসে থাকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমের রেশ নেই। যেন দীর্ঘক্ষণ জেগে ছিলো। ছেলেটি পাশ ফিরে শোয়। বেশিরভাগ সময়ই ও উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। কি যেন বিড়বিড় করে। কয়েকদিন আগে বুড়িকে বলেছিলো, দাদী মুই বাজানরে বিছরাইতে শহরে যামু?

বুড়ি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়েছিলো।

কও কি সোনা?

ঠিকই কই। তুমি যাইতে না দিলে মুই পলাইয়া যামু। দেইক্যো বাজানরে বিছরাইয়া আনুম।

বুড়ি আবেগে, ভয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো। ছেলেটি বিরক্ত হয়েছিলো।

ক্যাবল ফ্যাচফ্যাচ কইরা কান্দো ক্যা?

ও বুড়িকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে বাথানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, মোষগুলোর সঙ্গে ওর ভারি ভাব। ওরা ওকে বেশ চেনে।

একটু পর বুড়ো বিড়বিড়িয়ে বলে, মোগ মনু মিয়ারে কোন মনসায় খাইছে?

এমুন কতা কইয়েন না।

বুড়ি বুড়োর হাত চেপে ধরে।

তুমি রয়ানি গানের বিলাপ হোনো না?

কৈ? না।

বুড়ি বিস্মিত হয়।

BanglaBook.org

বিলাপ মোর বুকের মদ্যে।

বুড়ো যেন অনেকদূর থেকে কথা বলে। বুড়ির বুক শিরশির করে, আশঙ্কায় জোয়ার ঢোকে গলগলিয়ে। ছেলেটি কি মরেই গেলো? বুড়ো বুড়ির হাত ধরে টেনে তোলে, লও গুমাই।

বুড়ি নড়ে না। অনুনয়ের স্বরে বলে, মুই কইছি মোগ পোলা মরে নাই।

তখন ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়। ও তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে ওঠে, দাদী?

কি রে সোনা।

বুড়ি দ্রুত ওর কাছে যায়। ছেলেটির চিৎকারের শব্দ বুড়োকে স্থবির করে দেয়। শব্দটা যেন বুড়োর জন্মের সময় থেকে চলে আসছে, এটা ওর সঙ্গী।

সোনা মোর স্বপন দেখছো।

বুড়ি ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলায়।

কি স্বপন দেখছো সোনা?

বাজানরে।

কি দেখছো?

বাজান ট্রাকের নিচে পইড়া মরছে। বাজানের শরীলডা চাক্কার নিচে থ্যাতলাইবার সময় বাজান তোমারে বোলাইছে। মা, মা কইরা বাজান এমুন চিল্লানি দেছে।

দরজার কাছে বসে থাকা বুড়ো দ্রুত ছেলেটির কাছে এসে বসে।

আর কি দেখছো?

মেলা কিছু। মনে আয় না।

ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মুই বাজানের ধারে যামু।

মুইও মোর পোলার ধারে যামু। লও মোরা বেবাক্যে শহরে মেলা করি।

বুড়ি কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বুড়ির দুঃখের আগুন অনুকূলে বাতাস পেয়েছে, দাউদাউ জ্বলছে। সে শিখা লকলকিয়ে আকাশ ছুঁতে যাচ্ছে। শুধু বুড়ো নির্বিকার বসে থাকে। দুঃখ না, কান্না না, একটা স্থবির অবস্থায় ও অনড় হয়ে থাকে। ছেলেটি কেঁদেকেটে ঘুমিয়ে যায়, বুড়ি শুয়ে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে। বুড়োর তখন ঘুম আসে, ভীষণ ভয়ানক ঘুম।

খুব ভোরে বুড়ো-বুড়িকে ঘুমে রেখে ছেলেটি বাথানে এসে দাঁড়ায়। ছয়টা মোষ শুয়ে আছে। বড় কালো মোষটা ছেলেটির প্রিয়। ওটার পিঠে করেই ও বেশির ভাগ সময় চরে ঘুরে বেড়ায়। নেসার জমাদারের মোষ, চাষের কাজে লাগে। এই চরে ওগুলো ওর খেলার সাথী। জোয়ারের সময় ওগুলোর সঙ্গে খেলা জমে ভালো। মোষের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে সাঁতরিয়ে চলে যায় বেশ কিছুদূর। আবার লাফিয়ে পিঠে চড়ে, কখনো একটির পিঠ থেকে আর একটির পিঠে চলে যায়। গলা জড়িয়ে ধরে যখন মুখের ওপর মুখ রাখে তখন কেমন জানি পাল্টে যায় ওর অনুভূতি। ওর তখন কান্না পায়। খোলা চরের বুকের ওপর দাপিয়ে চলে যাওয়া বাতাসের মতো হা-হা কান্না। তখন শুনতে পায় ঘর থেকে দাদীর ডাক, না-টু-। ধ্বনি বলের মতো বাতাসে গড়ায়, ওর কানে এসে বাধে, গোল হয় না, শব্দটা কানে ঢুকতে পারে না। ও প্রবলভাবে উপেক্ষা করে মোষের পিঠে থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ে। আবার ডাক ভেসে আসে, আবার খেলা জমে। এভাবে শব্দ, পানি এবং মোষের সঙ্গে খেলতে খেলতে ওর চোখ লাল হয়ে ওঠে, মাথা ঝিমঝিম করে। এক সময় জোয়ার শেষে ভাটি নামে, ও মোষগুলো বাথানে নিয়ে আসে। এখন ঘাস কাটবে। ঘাস কেটে বাথান বোঝাই করে রাখবে। দুপুর গড়িয়ে এলে ওর দাদী ওকে আবার ডাকে। এবার ক্রুদ্ধ ডাক, সঙ্গে গালাগালি, ছেলেটির মজা লাগে। ও আনন্দে একটি

BanglaBook.org

প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে ধানক্ষেতে চলে যায়। ওর দাদা অন্য চাষীদের সঙ্গে জমিতে নিড়ানি দিচ্ছে। মকবুল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, পোলাডার কেবল হারাদিন খেলা।

ক্যা? মইষের ঘাস কাডে কে?

ও লাফিয়ে মকবুলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

মইষের আদর করে কেডা?

নাওয়ায় কেডা?

বাথান সাফ করে কেডা?

নেসার জমাদারের মইষতো মুই পালি। না হইলে জমি চইতেন ক্যামনে?

ছেলেটি হাত-পা নেড়ে দ্রুতবেগে কথা বলে। ও রেগে গেছে, ওকে গুরুত্ব কম দেয়া হয়েছে, এই যন্ত্রণায় ওর শরীরে এখন বিছুটির জ্বালা।

তোমার নাতীরে সামলাও মনু মিয়ার বাপ!

মকবুল রাগে চেঁচিয়ে ওঠে। পারলে ছেলেটিকে দু'টো চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু বুড়োর জন্যে সাহস করে না। ছেলেটি বুড়োর সামনে এসে দাঁড়ায়।

দাদা মুই কাম করি না?

হয় সোনা তুমি মেলা কাম করো।

ছেলেটি সবাইকে উপেক্ষা করে ছুটতে থাকে। এখন আর প্রজাপতি নেই, একটা সবুজ ঘাস-ফড়িং ওর লক্ষ্য। এখানে দাদীর ডাক নেই। বুড়ির কণ্ঠ বাতাসে মিশে ওপারে চলে গেছে, যেন ওটা আর কোনোদিন ছেলেটির কানে পৌঁছুবে না। শব্দের সঙ্গে ওর বল খেলা শেষ। ও এবার বয়স্ক পুরুষ, গভীর মনোযোগে মোষের জন্যে ঘাস কাটে, জমিতে লাঙল দেয়ার সময় হয়েছে। ওর সামনে ঘর-সংসারের অজস্র কাজ। কোমরের কাঁচি খুলে খচ্‌খচিয়ে ঘাস কাটে, অভ্যস্ত হাত দ্রুত নড়ে। বুঝতে পারে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। এজন্যই দাদী ওকে ডাকছিলো। এতটা বেলা পানিতে লাফালাফি করার জন্যে ওর মাথা ভার। ঘাস কাটতে কষ্ট হয়। তবুও কাজ সারে। কাজে হেলাফেলা নেই। বাথানে পর্যাপ্ত ঘাস দিতে না পারলে স্বস্তি পায় না। এই চরে মোষগুলোই ওর খেলার সাথী, নইলে এই প্রায় নির্জন চরে ওর বুকে শ্বাসকষ্ট ঘনিয়ে উঠতো, সামনে কেবলই মাইল মাইল নীরবতা। ও ঘাস কেটে মাথায় করে বাথানে নিয়ে আসে। মোষগুলো এদিক-ওদিক চরছে। বাথানে ঘাস তুলে ও মোষের পিঠে উঠে বসে। বড় মোষটা ওকে পিঠে করে এদিক-ওদিক ছোটে। ওর মনে দারুণ ফূর্তি, যেন খুব ছোটবেলায় বাবার পিঠে চড়ে খেলছে। এমন কোনো স্মৃতি ওর মনে নেই, তবু এরকম কিছুই ওর মনে হয়। অল্পদূরে আর একটি মোষের পিঠে দু'টো ফিঙে লেজ নাড়াচ্ছে। ও পাখি দু'টো ধরতে যায়, ওগুলো উড়ে চলে যায় দূরে। আস্তে আস্তে বেলা নামছে, রোদ কমে আসছে। বাতাসে দাদীর ডাক ভেসে আসে। মনে হয় বাবা ওকে শহর থেকে ডাকছে, ওকে শহরে যেতে বলছে। তখন ওর শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। ও কান পেতে দাদীর কণ্ঠ শোনে, ফ্যাসফেসে, ভাঙা কণ্ঠ, কিন্তু জোর আছে, জলোচ্ছ্বাসের মতো উঁচু হয়ে তেড়ে আসে। তখন ওর মন খারাপ হয়, অকারণ বিষণ্নতা। ও মোষগুলো বাথানে বেঁধে ঘরে ফেরে। মাচানের সিঁড়িতে পা রেখে চিৎকার করে, দাদী মোরে ভাত দে।

তোরে মুই বোলাইলাম, হোনো নাই?

হুনছি।

আও নাই ক্যা?

ইচ্ছা অয় নাই। এত কথা কবি না দাদী। ভাত দে।

ও রেগে যায়। রেগে গেলে ও দাদীকে তুই তোকারি করে। ওর আচরণের কোনো

BanglaBook.org

ঠিক-ঠিকানা নেই। এ নিয়ে ওর দাদা-দাদী মাথা ঘামায় না। বুড়ি তাড়াতাড়ি সানকিতে ভাত বেড়ে দেয়।

চোখ রাঙাও ক্যা?

তোর কি!

ছেলেটি গপ্‌গপিয়ে ভাত খায়। দাদী ওর কপালে হাত রাখে।

শরীরতো ঠাণ্ডা। তয় কি তোর মন খারাপ সোনা?

না।

ছেলেটি দাদীর সামনে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। বাবার জন্যে ওর বিষণ্নতা আছে সেটা সবসময় প্রকাশ করে না। ওর বুকের ভেতরের নিজস্ব এলাকায় ও দাদা-দাদীকে ঢুকতে দিতে চায় না। ও চোখ বুঁজলে শহর দেখতে পায়, দেখতে পায় ওর বাবা বিশাল মানুষ হয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ি-ঘোড়া কোনো কিছুতে সে চলা থেমে থাকে না। বাবার হাঁটা থামিয়ে দেয়ার জন্যে রাজপথে নামে সৈন্য, ঝরে আগুনে বৃষ্টি, পথ রোধ করে ট্যাঙ্ক কিন্তু কিছুই হয় না, ওর বাবা মাথা উঁচু করে হেঁটে যায়। রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ হাঁ করে সে চলা দেখে। তারপর একসময় ওর বাবার পিছু পিছু নেমে আসে মানুষ। হাজার হাজার, অগণিত মানুষ। ছেলেটি কোঁৎ করে ভাতের দলা গিলে, প্রবল কাশিতে চোখের পানি আসে।

পানি খা।

দাদী ওর সামনে গ্লাস বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটি ঢক্‌ঢকিয়ে পানি খায়। ওর আর ভাত খেতে ইচ্ছে করে না।

খা, মানিক, খা।

না, রাইতে খামু।

বুড়ি সানকি উঠিয়ে নিয়ে ঢেকে রাখে।

দাদী মাছ ধরবি না?

হ, যামু।

লও।

তোর দাদাতো আয় নাই?

থাউক দাদায়, ল মোরা যাই।

ছেলেটি বড়শি গোছাতে থাকে। তখন বুড়ো ফেরে। গোসল সেরে এসেছে। গামছা পরা, মাথায় ভেজা লুঙি প্যাঁচানো। বুড়োকে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পরও চেহারায় তেমন ক্লান্তি নেই।

দাদা মাছ ধরমু?

হয় যামু। ভাত খাইয়ে লই।

তরতরি খা।

বুড়ো জানে ছেলেটি যখন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে তখন যেতেই হবে। না করার উপায় নেই। বুড়ি সানকিভরা ভাত আনে। বুড়ো খেতে বসলে, একগ্রাস মুখে না দেবার আগেই লঞ্চের ভেঁপু বেজে ওঠে। বিশখালি নদী দিয়ে লঞ্চ যাচ্ছে, ওটা ঢাকা থেকে আসছে, বরগুনা যাবে। বুড়োর হাতে ধরা ভাতের দলা মুখে ঢোকে না। ছেলেটি ততক্ষণে নেমে গেছে। ও সবকিছু পেছনে ফেলে ছুটছে নদীর কিনারে। লঞ্চের ভেঁপু কানে গেলে ওর আর কিছু মনে থাকে না। ও বাবার প্রত্যাশায় নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।"

এটুকু পড়া হয়ে গেলে প্রদীপ্ত গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। কেমন অবশ লাগছে, যেন

BanglaBook.org

কোনো প্রবল আঘাতে ভোঁতা হয়ে গেছে অনুভূতি। তখনো নসিব বাজার থেকে ফেরেনি। সামনের দরজাটা খোলা। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠ। সেই কণ্ঠস্বরে ওর মনে হয় নসিব হাফিজুদ্দিন এখন অমিতাভ গফুর হয়ে এক ভিন্ন জগতে চলে গেছে– কেমন চমৎকার উঠে এসেছে চর এবং সে চরের বর্ণনা। ও উঠে রান্নাঘরে যায়। চা বানিয়ে আনে, কাপে নয়, বেশ বড় এক মগ চা। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো গুছিয়ে রেখেছে। তখন এক থলে বাজার নিয়ে ঘরে ফেরে নসিব। ঢুকতে ঢুকতে বলে, জানি পড়ে ফেলেছো। এরপর শুরু হবে উপন্যাসের পরের অধ্যায়। ফ্যান্টাসি করবো। ছেলেটাকে ওর কল্পনার শহরে নিয়ে আসবো। বাবার সঙ্গে দেখা হবে। এখানেই মিলবে বর্তমান সময়ের রাজনীতি।

তারপর?

এখনো ভাবিনি।

আপনার উপন্যাসে এ যুদ্ধের কিছু আসবে না নসিব ভাই?

না, আসবে না।

কেন?

তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি এই যুদ্ধের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। সবার মতো আমার দেশপ্রেম অত উথলে ওঠেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে আইয়ুব খানের কূটচাল মনে হয়েছে।

যাকগে। দেখি কি বাজার এনেছেন?

এ কথার উত্তর না দিয়ে নসিব নিজের মনেই বলে, তবে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভিন্ন একটি থিম আমার মাথায় এসেছে প্রদীপ্ত।

কি?

দেশের দুই অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা আমাকে ভীষণ ভাবাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে এটাই এখন এই সময়ের একটি চিন্তা-উদ্রেককারী দিক। দারুণ উপন্যাস হবে। যাকগে উপন্যাস, কি রাঁধবো বলোতো? খিচুড়ি না ভাত?

খিচুড়ি তো আপনার জন্য সহজ রান্না।

সেই ভালো। মুরগিটা ছিলে এনেছি। চট্‌পট্ রান্না হয়ে যাবে।

ওদের কথা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় রিকশা এসে থামে। রিকশায় নাসিমা। খুব সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। প্রদীপ্তকে দেখে বলে, কেমন আছো? ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে নসিবের দিকে তাকিয়ে বলে, ভাগ্য ভালো আজ বলতেই হবে। একটা চান্স নিয়ে জিতে গেলাম।

বেশ করেছো। আমি আর প্রদীপ্ত খাবারের মেনু ঠিক করছিলাম।

নাসিমা চোখ কপালে তুলে বলে, তাই বলে আমি কিন্তু রাঁধতে পারবো না।

না, না তুমি রাঁধবে কেন? তার চেয়ে তুমি আমার নতুন উপন্যাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলো।

উপন্যাস? ইস্, আবেগের ঐসব প্যানপেনি আমার একটুও ভালোলাগে না।

নসিব ভাইয়ের এই উপন্যাসে কিন্তু আবেগের প্যানপেনি নেই নাসিমা আপা। লেখাটা অন্যরকম।

তুমি তো বলবেই। তুমি তো আবার ওর এক নম্বর চ্যালা।

নসিব এবং প্রদীপ্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দু'জনের মুখে কথা নেই। নসিব মুখ কালো করে বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে যায়। নাসিমাও পিছু পিছু যায়। প্রদীপ্ত ওদের কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে। নসিবকে বিদায়ের কথা বলতে গেলে ও থাকার জন্য

BanglaBook.org

জোর করবে, কিন্তু ও ধরে নেয় যে এখানে ওর আর থাকা উচিত নয়। ভীষণভাবে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। খানিকটা পথ হাঁটতেই ও কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দীর্ঘ আঠারো বৎসর ধরে যে উত্তেজনা চলছিলো, যার পরিণতি এই যুদ্ধ, তার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং আইয়ুব খানকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমন্ত্রণ জানান। সে অনুযায়ী ভারত পাকিস্তানের সরকার প্রধানদ্বয় ছেষট্টি সালের চার জানুয়ারি থেকে দশ জানুয়ারি তাসখন্দে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া কোনো ধরনের চুক্তি করতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেই বসেন যে, 'ন্যায় ও সম্মানজনক পন্থায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে, অথবা এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ না হলে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে।' শেষ পর্যন্ত দশ জানুয়ারি দু'দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত হয়।

পূর্ব বাংলাবাসী এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই চুক্তিকে স্বাগত জানাতে পারেনি। যে চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নেই তাকে অভিনন্দন জানাবে কি করে? ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে তাসখন্দ চুক্তি-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। পত্রিকায় খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়ে প্রদীপ্ত। যেদিন আন্দোলনের ফলে সরকার ওখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় সেদিন ও আলী আহমদকে বলে, বাবা, ওদের এই আচরণ আমার একটুও ভালো লাগছে না। মনে হয় ওরা অন্য মতলবে ঘোঁট পাকাচ্ছে।

বুঝলি না? আমাদেরকে অরক্ষিত রেখে ওরা যেভাবে কাশ্মীর কাশ্মীর করে বুক চাপড়াচ্ছে তাতেইতো ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আরো একটি জিনিস পরিষ্কার বাবা, ওরা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে বড় করে দেখছে, শেখ মুজিব কিন্তু পূর্ব বাংলার স্বার্থকে বড় করে দেখে তাসখন্দ চুক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তার জের হিসেবে তার বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে।

ঠিকই বলেছিস।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে। তখন প্রতীক বেশ উঁচু কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢোকে। বাবাকে এবং ভাইকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, কি রে খুব ফূর্তিতে আছিস মনে হয়?

কলেজে একটা অনুষ্ঠান হবে। আমি সোলো গাইবো।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেবে?

না দিলে জোর করে গাইবো। রেডিওতে বন্ধ করেছে বলে কি বাইরের অনুষ্ঠানেও করবে নাকি? সব ঘাট কি ওরা ইজারা নিয়েছে?

আলী আহমদ অবাক হয়ে প্রতীকের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও তো বেশ কথা বলতে শিখেছে। কবে এত বড় হয়ে গেলো? আর কোনো কথা না বলে ও যেভাবে এসেছিলো সেভাবে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। প্রদীপ্ত আলী আহমদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, জিতু বড় হয়ে যাওয়াতে তুমি বেশ অবাক হয়েছো না বাবা?

আলী আহমদ চোখ উজ্জ্বল করে বলে, ওর জন্মের কথা তোর মনে আছে দীপু?

BanglaBook.org

খুব মনে আছে।.ভোলা কি যায়।

সেদিন আমরা জিতেছিলাম বলেই না ও জিতু।

তখন পুষ্পিতা ঘরে ঢোকে। দু'জনেই অনুভব করে যে পুষ্পিতার চেহারায় ক্লান্তি–স্বাস্থ্যটা ভাঙছে। প্রদীপ্তর মনে হয় নসিবের উপন্যাসের মতো দেখাচ্ছে মাকে। মা যেন জোয়ারের জলে থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জোয়ার-ভাটার টান বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে।

অফিসের কাজে দু'দিনের জন্য ঢাকার বাইরে যেতে হয়েছে নসিবকে। ঘরের পাহারা প্রদীপ্তর। গতকাল থেকে ও এ বাড়িতে আছে। নসিব জানিয়েছে, সেদিন নাসিমা বিয়ের জন্য চাপ দিয়েছে। আগামী মাসেই একটা তারিখ ঠিক করবে ওরা। আসলেই এখন আর অপেক্ষা করার যুক্তি নেই, ভাবতেই প্রদীপ্তর বুক কট্ করে ওঠে। বিষণ্ন হয়ে যায়। নাসিমা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায়, কিন্তু সাহিত্য পছন্দ করে না। অমিতাভ গফুর আর অসীম রায়হান কতদিন আপোস করে কাটাতে পারবে? যাকগে, ও ভাবনা ভেবে ওর কি হবে, তারচেয়ে নসিবের উপন্যাস পড়ে ফেলা ভালো। ও চা বানিয়ে আনে সঙ্গে এক বাটি মুড়ি আর পাটালি গুড়। দরজা-জানালা খুলে রাখে। বাতাসে ভরে যাচ্ছে ঘর। ও উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বের করে পড়তে শুরু করে।

"জল-স্থল আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে লঞ্চটি চলে যায়। ছেলেটি নিথর দাঁড়িয়ে শূন্যে তাকায়। জলে এখনো লঞ্চের আলোড়ন, বাতাসে ভেঁপুর শব্দ। ও এখন ঢাকা শহরে, বাবাকে খুঁজতে এসেছে। ও কখনো শহরে যায়নি। কিন্তু যখন শহরের কথা ভাবে ওর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়, স্পষ্ট দেখতে পায় ছবি। এভাবেই ও আবিষ্কারকের মতো অচেনা ভূমিতে পা রাখে। ও যখন সদরঘাটে নামে তখনো তেমন ভোর হয়নি। আবছা আলো চারদিকে। ও টারমিনালে এসে দাঁড়ায়। বেঞ্চে, মেঝেতে মানুষজন ঘুমুচ্ছে। লঞ্চ থেকে নামা যাত্রীদের কোলাহল ওদের কানে প্রবেশ করে না। ছেলেটি একটুক্ষণ অবাক হয়ে ওদের দেখে। কী নির্বিবাদে ঘুম! গ্রামের কেউ এমন করে ঘুমোয় না। ওর কাছে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। নিশ্বাসে বুকের পাঁজর উঠানামা করে, চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে অনেকটা নদীতে জাগা চরের মতো, মাথায় তেলহীন রুক্ষ খস্‌খসে চুল, এলোমেলো অবিন্যস্ত। ওর চোখের পলক পড়ে না। ওরা এমন করে ঘুমোয় কেন? ওদের ঘর নেই? আশেপাশের লোকজন যাওয়ার সময় ওকে ধাক্কা দিয়ে যায়। ও এভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে। ওর কেবলই মনে হয় এই শহরে ওর বাবারওতো কোনো ঘর নেই। বাবাও কি এমন করে ঘুমোয়? ওর বুক ধড়ফড় করে। ও ঘুমন্ত মানুষের কাছে গিয়ে দেখে। না কেউ ওর বাবার মতো নয়। কিন্তু ওর খোঁজার শেষ হয় না। এর মধ্যে অনেকে জেগে উঠেছে। বসে বসে হাই তুলছে। কে যেন কাকে গালি দিচ্ছে। কী বিশ্রী সে ভাষা। ছেলেটি ইতস্তত ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যায়। কি করবে বুঝতে পারে না। এত বোকা এবং অসহায় ও কখনো হয়নি। ওকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন এগিয়ে আসে, তোর বাড়ি কোথায় রে? ও বলতে চায়, আমি বিশখালি নদীতে জেগে ওঠা চরের মানুষ গো।

কিন্তু বলা হয় না। কে যেন কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে।

গ্রাম থেকে এসেছিস বুঝি?

শুধু গ্রাম না, চর থেকে।

এটাও বলতে পারে না। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ঢাকা শহরে নতুন, না?

BanglaBook.org

এতক্ষণে ও মাথা নাড়ে।

বেচারা। মা, বাবা নেই বুঝি?

ও আবারো মাথা নাড়ে।

তুই কথা বলতে পারিস না?

পারি।

নাম কি?

তিতুমীর।

নিজের অজান্তেই ও ভালো নামটা বলে। বাবা শখ করে নামটা রেখেছিলো। তখন ওর চোখে পানি আসে। এই একটা নামের উচ্চারণে ওর সব অনুভূতি ক্রন্দসী হয়ে ওঠে কেন? বাবার কথায় ওর সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়। মনে হয় বাবা না থাকা খুব কষ্টের।

যাবি আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমি যেখানে থাকি?

যাবো। ছেলেটি এতক্ষণে চোখের পানি মোছে।

কাঁদিস না তিতুমীর।

ওর মনে হয় ও এখন আর ওর দাদীর নান্টু নয়। ও এখন তিতুমীর, ঢাকা শহরে উদ্বাস্তু, ঘরহীন, বিত্তহীন, আশ্রয়হীন মানুষ। তিতুমীর নামের আড়ালে মুছে যায় ওর শৈশব।

আয় রে তিতুমীর।

ও লোকটির পিছু পিছু রওনা করে। পেছনে লঞ্চের ভেঁপু, টার্মিনালের কোলাহল। ও ফিরে ফিরে তাকায়, এত মানুষের ভিড়ে যদি কোথাও বাবা থাকে? লোকটি একসময় ওর হাত ধরে।

যা ভিড়, কোথাও আবার হারিয়ে যাস যদি!

লোকটির হাসি ওর কাছে নতুন মনে হয়। গ্রামে ও কারো মুখে এমন হাসি দেখেনি। ওর গা ছমছম করে। মনে হয় ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু উপায় নেই, লোকটার শক্ত হাতের মুঠিতে ওর হাত। সেখানে প্রবল চাপ, বুঝি টানাটানি করলে মুড়মুড়িয়ে ভেঙে যাবে হাড়গোড়। ও চুপচাপ হাঁটে।

তুই আমাকে চাচা ডাকবি, মোজাম্মেল চাচা।

আচ্ছা। ও ঘাড় কাত করে।

তোর খিদা লেগেছে?

হ্যাঁ।

চল, গরম ডালপুরি খাবি।

মোজাম্মেল ওকে দোকানে নিয়ে আসে। ছেলেটি পেট পুরে তৃপ্তি সহকারে ডালপুরি খায়। গ্রামে ও পিঠা খেয়েছে কিন্তু ডালপুরি খায়নি, দারুণ লাগছে। এই উষ্ণতা ওকে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। মায়ের স্মৃতি ওর মনে বাবার মতো প্রবল নয়, মাঝে মাঝে দপ্ করে জ্বলে ওঠে কেবল। আবার নিভে যায়। মায়ের কথা ওর মনে পড়ে না, মাকে ও ধরে রাখতে পারে না। ও বাবাকে খুঁজতে শহরে এসেছে, এই আবেগে ভীষণভাবে তাড়িত।

আয় খাবি?

না।

পেট ভরেছে?

হ্যাঁ। আপনি খাবেন না?

BanglaBook.org

পরে খাবো। চল যাই।

দু'জনে বেরিয়ে আসে। ফুরফুরে বাতাসে ছেলেটির বিষণ্নতা কেটে যায়। ও মন ভরে শহর দেখে। কী সুন্দর বাড়িঘর, দোকানপাট, রিকশা-গাড়ি। মানুষজন ছুটছে, কেউ কারো দিকে তাকায় না, কেমন আছো জিজ্ঞেস করে না, ব্যাপারটা ওর কাছে কেমন জানি লাগে।

চাচা।

কি রে?

ও কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো, কিন্তু বুঝতে পারে না কিভাবে করবে। মানুষজন এমন কেন ও জানতে চেয়েছিলো। পরে দেখলো গুছিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা খুব কঠিন।

কিছু বলবি?

না। ও বিব্রত হয়ে মাথা নাড়ে।

পাগলা। মোজাম্মেল ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

নে, রিকশায় ওঠ।

কোথায় যাবো আমরা?

গুলিস্তান।

ছেলেটি মনে মনে নামটি আওড়ায়। ভোরের বাতাসে ওর চুল ওড়ে। ওর বিশ্বাস হয় নিশ্চয় ওর বাবাকে খুঁজে পাবে, কোথাও না কোথাও আছে। একদিন হঠাৎ করে দেখা হলে বলবে, নান্টু তুই? ও উত্তেজনায় মোজাম্মেলের হাত চেপে ধরে, চাচা।

কি রে?

আপনি আমার বাবাকে চেনেন?

তোর বাবা?

হ্যাঁ, লম্বা, শুকনো, কালো। মাথায় চুল কম। পান খায়। আমার বাবা খুব ভালো গান গাইতে পারে, দরাজগলা। রয়ানি গানের দলে গিয়েছিলো বলে গ্রামের লোকে বাবার নিন্দা করতো।

ছেলেটি আপন মনে ওর বাবার কথা বলে যায়। ও আরো অনেক কথা বলে, যেগুলো ও জানে না, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে বলে যায়। বলতে ভালোলাগে। এত কথা ও বলতে জানে এতদিন তা টের পায়নি। আজ একজন নিবিষ্ট শ্রোতা পেয়েছে, মোজাম্মেল ওকে বাধা দেয় না। বরং ছেলেটির তন্ময় হয়ে বলে যাওয়া উপভোগ করে। বুঝতে পারে ছেলেটি ভাবুক, বাবার জন্যে ওর প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই এমন স্বপ্ন দেখা। ওর কথা ফুরোয় না, মোজাম্মেলকে যে প্রশ্ন করেছিলো তার উত্তর ও জানতে চায় না। ওর কথার মাঝে ওরা গুলিস্তানের ডেরায় পৌঁছে।

মতীন তখন সবে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছছে। মোজাম্মেলকে দেখে এগিয়ে আসে।

কালু আর শাহু তখনো ঘুমিয়ে। মতীন মোজাম্মেলকে চোখ টিপি দেয়।

ওস্তাদ নিউ রিক্রুট?

হ্যাঁ।

একদম কাঁচা?

গ্রাম থেকে এসেছে। লঞ্চঘাটে পেলাম।

ভালোই হয়েছে। কালুটা বেশি সেয়ানা হয়েছে ওকে বাদ দিয়ে দেয়া যাবে।

মতীন ছেলেটির হাত ধরে, আয়, ভেতরে আয়।

ছেলেটির ভালোলাগে না। গা ঘিনঘিন করে। কেমন নোংরা, দুর্গন্ধে নাড়ি উপড়ে আসে। সবচেয়ে বেশি তীব্র পেশাবের গন্ধ। ছোট একটা ঘরের মধ্যে চারজন মানুষ

BanglaBook.org

গাদাগাদি করে থাকে। মোজাম্মেল গায়ের জামা খুলে ছুঁড়ে মারে দড়িতে; তারপর চৌকির ওপর চিৎপাত হয়। ততক্ষণে কালু শাহু উঠে গেছে। কালু ওকে পরখ করে।

ভালোই তো মালটা ওস্তাদ। এই নাম কি রে তোর?

তিতুমীর।

মাগো। এ যে রাজা-বাদশাহ্‌র নামগো! কালু আর শাহু হো-হো করে হেসে ওঠে।

ওস্তাদ একটা ছোটখাটো রাজা নিয়ে এলো দেখছি।

এ্যাই চুপ কর। মতীন কষে ধমক দেয় ওদের। তিতুমীরের রাগ হয়। শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে।

চল রে কালু মুতে আসি। সারারাতে থলেটা একদম বোঝাই হয়ে গেছে।

শাহু কালুর হাত ধরে বেরিয়ে যায়। ওদের কথায় তিতুমীরের শরীর আবার মুচড়ে ওঠে।

মনে হয় বমি হবে। এ কোথায় এসে পড়লো ও? এতক্ষণের আনন্দ আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়। মোজাম্মেল ওর মনোভাব আঁচ করে। বলে, বস রে তিতুমীর।

আমি এখানে থাকবো না।

কোথায় যাবি?

জানি না।

পাগলামি করিস না। ঢাকা শহর একটা বড় জায়গা। হারিয়ে গেলে আর দেশে ফিরতে পারবি না।

আমাকে কেন এনেছেন?

তোকে কাজ শেখাবো।

কি কাজ?

পকেট কাটা।

মতীন শব্দ করে হেসে ওঠে, ওস্তাদ ডোজটা আস্তে আস্তে দিলে হয় না?

হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে কেউটে। ফণা ওঠাতে চায়।

ছেলেটির বুক কেঁপে ওঠে। পকেট কাটা কি? মোজাম্মেল এবং মতীন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছেলেটি একবার মোজাম্মেলের চোখে চোখ ফেলে, আর একবার মতীনের। ওর বুকের ভেতর কাঁপুনি, ওদেরকে এখন আর ও চিনতে পারছে না। ওদের এখন ভিন্নমূর্তি– ক্রুদ্ধ এবং ভয়াবহ। ওর ইচ্ছে করছে ছুটে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু পারছে না, পা নড়ে না, ওদের দৃষ্টি সাঁড়াশির মতো ওকে ধরে রেখেছে। মতীন এসে কাঁধ চেপে ধরে, বাড়াবাড়ি করবি তো বেঁধে রাখবো।

ছেলেটি কেঁদে ফেলে, আমি বাবাকে খুঁজবো।

চুপ!

মতীন ধাক্কা দিয়ে ওকে ঘরের কোণে ফেলে দেয়। হাঁটুতে ব্যথা পায় ও। চিৎকার করে কাঁদে। দাদীর সঙ্গে বিরোধ হলে যেমন আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে কাঁদতো এখনকার কান্নাটা তেমন। ওর বুক ফেটে যায়, শতমুখে গলগলিয়ে বেরুচ্ছে স্রোত। ইতোমধ্যে কালু আর শাহু ফিরে আসে।

বাছাধনের শুরু হয়ে গেছে ওস্তাদ? প্রথম প্রথম আমাদেরও অমন হয়েছিলো। এখন সব ঠিক। একদিন পকেট না কাটলে হাত সুড়সুড় করে। কি বলিস শাহু?

আর একটা জিনিস বাদ দিলি?

কি? কালু ঘুরে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

পুলিশের গুঁতো না খেলেও পিঠ সুড়সুড় করে।

মাইরি, যা বলেছিস।

দু'জনে হি-হি করে হাসে। সে হাসি ছেলেটির কানে জ্বালা ধরায়। ইচ্ছে করে ধড়াম করে ওদের মুখে দু'টো লাথি বসিয়ে দিতে। দাঁত কিড়মিড় করে। ওর রাগ বাড়লে ও হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। তখন কালু এসে ওর সামনে উবু হয়ে বসে।

এই যে দোস্ত–

কথা শেষ করার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। দমাদম ঘুষি লাগিয়ে দেয়। কালু প্রথমে নিচে পড়ে বেকায়দা অবস্থায় থাকলেও পরক্ষণে সামলে নেয়। ছেলেটি ওর সঙ্গে পারে না, কালু ওর চাইতে শরীরে তাগড়া। উপরন্তু শাহু এসে জুটেছে। দু'জনের কাছে মার খেয়ে ও লুটিয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোয়। কেউ ওকে ধরে না। কাছেও আসে না। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় শরীর, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ওর নেই। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ও নিস্তেজ হয়ে যায়। কালু, শাহু, মতীন বেরিয়ে গেছে। মোজাম্মেল চৌকির ওপর বসে বিড়ি ফুঁকছে। ছেলেটি যখন মাথা ওঠায় ও বুঝতে পারে না ঘরে আলো না অন্ধকার, ও এখন গ্রামে না শহরে।

এ্যাই উঠে আয়? মোজাম্মেলের বাঁজখাই গলায় ওর পিলে চমকে ওঠে। কিন্তু উঠতে পারে না। মাথায় ঘূর্ণি, জিভে রক্তের নোনা স্বাদ। উঠে আয় বলছি?

তিতুমীর হামাগুড়ি দিয়ে মোজাম্মেলের পায়ের কাছে গিয়ে বসে, চাচা? একটা আশ্রয়ের আশায় ও ব্যাকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

চুপ শুয়োরের বাচ্চা! মোজাম্মেলের নির্মম কণ্ঠে ও থমকে যায়।

চাচা, চাচা গো!

চাচা না, ওস্তাদ। একই কণ্ঠ গর্জে ওঠে।

যখন নতুন রিক্রুট করি তখন চাচা থাকি। ছোলা-দানা খাইয়ে পোষ মানালে ওস্তাদ হই। বুঝলি? মোজাম্মেল ওর চুল টেনে ধরে দাঁড় করায়। বলে, পা ধরে সালাম কর। বল, ওস্তাদের কথা পীরের মতো মানবো। যখন বলবে শুনবো, কথায় বরখেলাপ হলে জীবন দেবো।

ছেলেটির কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ওর চোখে শূন্যতা। ও কিছুই দেখতে পায় না। শীতের সকালে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ যেমন ধোঁয়াটে দেখায় তেমন চারদিক। মুছে গেছে মোজাম্মেলের বিশাল দেহ।

কথা বলছিস না যে?

ছেলেটি শুনতে পায় না। যেন ও জন্ম থেকে বধির। পৃথিবীর কোনো শব্দ কোনোদিন ওর কানে প্রবেশ করেনি। শব্দ কি জানে না। মোজাম্মেল একটা লাথি দিলে ও মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। ওর শরীরে কোনো যন্ত্রণা নেই। ও জন্মাবধি অনুভূতিহীন, অসাড় ওর স্নায়ু। ও এখন আর কঁকায় না। ধরিত্রীর মতো নিশ্চুপ। উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। মোজাম্মেল ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে, এখন থেকে তোকে কাজ শিখতে হবে। শিখবি কেমন করে ভিড়ের মধ্যে অন্যের পকেট থেকে টাকা উঠিয়ে আনতে হবে। তোকে আমি নিজের হাতে সব শেখাবো। এই লাইনে তুই একটা পাকা ওস্তাদ হবি। দেখবি আমি একদিন তোর হাতেই ওস্তাদি ছেড়ে দেবো। তুই একটা পকেটমারের দল গড়ে তুলবি। ওরা কামাই করবে। তুই পায়ের ওপর পা উঠিয়ে খাবি। বুঝলি বিরাট ব্যাপার হবে।

ছেলেটি বাক-রহিত, বধির এবং দৃষ্টিহীন। ও কখনো সূর্যের আলো চোখে দেখেনি, রঙ কি জানে না। জানলে এই মুহূর্তে মোজাম্মেলের মুখের রঙ দেখতে পেতো।

কথা বলিস না কেন? এদিকে আয়?

BanglaBook.org

ছেলেটি নড়ে না। ও এখন গাছ। মাটির সঙ্গে শিকড় প্রোথিত। মোজাম্মেলের রাগ বাড়ে। অনড় ভঙ্গিতে মোজাম্মেলের চোখে চোখ রেখে বলে, চাচা আমি বাবাকে খুঁজবো।

কে তোর চাচা! বল ওস্তাদ।

কী অদ্ভুতভাবে ছেলেটি নিজের আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে চায়– কী অদ্ভুতভাবে নিজের টানটান ধাতব শরীরে দাদীর কণ্ঠ ছুটে এসে আছড়ে পড়ে, নান্টু–। আশ্চর্য, অথচ তখন ও নিজেকে তিতুমীর ভেবে বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার, পেরিয়ে যাচ্ছে সাতসমুদ্র তেরো নদী। ঘোড়ার খুরে বাজছে হাজার জিজ্ঞাসা, চাচা আপনি আমার বাবাকে দেখেছেন?

শুয়োরের বাচ্চা বল ওস্তাদ।

চাচা, চাচা। চাচা– ছেলেটির মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে। মোজাম্মেলের শক্ত হাতের পিটুনিতে ও এক সময় সংজ্ঞা হারায়। ঐ অবস্থায় ওকে রেখে মোজাম্মেল দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। গজগজ করে, জাত কেউটে। একদিনে হবে না।

যখন ওর জ্ঞান ফেরে তখন বাইরে দুপুর। ওর শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়তে কষ্ট হয়। পেটে ভীষণ খিদে, ওর মাথায় বিশখালি নদীর ঘূর্ণি। তাকাতে কষ্ট হয়। ও আবার চোখ বোঁজে। দাদীর কথা মনে হয়। বুড়ি কি এখন নৌকায় মাছ ধরছে? নাকি চুলোয় ভাত চাপিয়েছে? আশ্চর্য ও কি করে ভাবছে এসব কথা? ও নেই, চর শূন্য। ও নেই বিশখালি নদী শূন্য– মোষের বাথান শূন্য। আর কি শূন্য? আকাশ-বাতাস-ধানক্ষেত এবং দাদীর জীবন শূন্য। ও ভারি হয়ে থাকা দু'চোখের পাতা মেলে তাকিয়ে থাকে। অদ্ভুত মনে হয় সবকিছু, চোখের পাতা বন্ধ করতে পারে না। বুঝতে পারে ও চোখের ভেতরও শূন্যতা অনুভব করছে, ফলে এক শক্ত আবরণ ওর দৃষ্টি আটকে রেখেছে। প্রবল যন্ত্রণায় ওর মাথার ভেতর এক উদ্বাস্তু জীবনের ব্যর্থতা। দাদীর কথায় ওর চোখে পানি আসে। কিন্তু ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে না। বুকে ব্যথা হয়। জানালা দিয়ে রোদ আসছে। জ্যৈষ্ঠের রোদ ভাঁপানো, শরীর পোড়ায়। ও উঠে বসার চেষ্টা করে, পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছে যায়, একটু বাতাস পেলে ভালো লাগবে। জানালার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে দেয়। তখন জানালা দিয়ে দেবু ওকে ডাকে, এ্যাই!

কে? ও চমকে ফিরে তাকায়।

আমি দেবু। পাশের ঘরে থাকি। সকালে তোকে দেখেছি। মোজাম্মেল গুণ্ডাটা তোকে খুব মেরেছে বুঝি?

ছেলেটি কথা বলে না। ওর গলার কাছে কান্না জমা হয়। কথা বললে বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে বুক।

কথা বলিস না কেন? তোর নাম কি?

তিতুমীর।

কাঁদছিস? কাঁদবিইতো। যা মারাটা মারলো। মাগো, আমার গা কেমন করছিলো!

ওর কথায় ছেলেটির শূন্যতা কাটতে থাকে। এই নিষ্ঠুর শহরে এমন কোমল কণ্ঠে কি কেউ কথা বলতে পারে? যেন ঠিক দাদী মাথার কাছে বসে ডাকছে, নান্টু–। ছেলেটি দু'পায়ে ভর করে দাঁড়ায়, কষ্ট হয় তবুও। দেবু ওর বয়সী।

খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ।

এখনতো আমার কাছে কিছু নেই। মা কাজে গেছে। একটু পরে ভাত আনলে তোকে আমার থেকে দেবো।

আমাকে বের করে দে দেবু।

BanglaBook.org

কেমন করে? বিরাট তালা দিয়েছে যে।

ছেলেটা হতাশ হয়ে যায়।

তোর কাছে পয়সা নাই? তাহলে দোকান থেকে মুড়ি এনে দিতে পারি।

নাই। ছেলেটি মাথা নাড়ে। হঠাৎ খুব আবেগতাড়িত হয়ে বলে, আমি বাবাকে খুঁজতে এসেছি দেবু। কোথায় খুঁজবো বলতো?

দেবু চুপ করে থাকে। উত্তর ওর জানা নেই। ছেলেটি অবসন্নের মতো বসে পড়ে। বাবাকে খুঁজে পাওয়া কি খুব কঠিন? খুঁজতে চাইলে কি পারিপার্শ্বিকের জটিলতা মাকড়সার আঠালো জালের মতো লেপ্টে যায় সময়ের গায়ে, ক্ষত তৈরি হয়, তারপর–। ছেলেটি নিজের ভেতরে চিৎকার করে ওঠে, বাবারা কেন জীবন থেকে হারায়? এ প্রশ্নের উত্তর ওকে কে দেবে? উত্তর ও নিজেই খুঁজবে। ও মাকড়সার জালটা ছিন্নভিন্ন করবে বলেই সব ব্যথা উপেক্ষা করে ধাম করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

তিতু, তিতুমীর? দেবু জানালার শিকে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে ডাকে।

বল।

ওরা যা বলবে তাই শুনবি। তারপর তোকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলে কেটে পড়বি।

আমি পকেট মারতে পারবো না।

তা করবি কেন? পালাবি, বোকা পালাতে পারবি না?

পারবো।

তাহলে আর কি, তবেই তোর মুক্তি।

দেবু হা-হা করে হেসে ওঠে। তিতুমীর কিছু বলে না। ওর শ্রবণশক্তি খুলে যায়। ও শুনতে পায় বাবার কণ্ঠ। ওর বাবা হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। বাবা থেমে গেলে হাজার কণ্ঠ গর্জে ওঠে ঐ একই স্লোগানে। রাজপথে অগণিত মানুষ। জীবনের সব বঞ্চনার অবসান চায়। ওর বাবার মাথাটা কি যে উঁচুতে, ওদের গ্রামের খাল পাড়ের তাল গাছের চাইতেও উঁচু। ছেলেটি নিচ থেকে তাকালে ভালো করে কিছু দেখতে পায় না। ওর ঘুম পায়। বুঝতে পারে না কেমন করে বাবা ওর মাথায় এলো। কেমন করে বাবা এত বিশাল হলো। এই বাবাকে তো ও চেনে না। বাবা বলছে, নান্টু, আমি এখন আদমজী পাটকলের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি।

বাবার কথায় ওর খিদে উবে যায়। ও জানালার ধারে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন ওর একটা আশ্রয় হয়েছে– নিশ্চিত, নির্ভয়। ওর আর কোনো দুর্ভাবনা নেই।

ও স্বপ্ন দেখে মোজাম্মেলের হাত থেকে পালিয়ে ও দৌড়ুচ্ছে। প্রাণপণে দৌড়ে যাচ্ছে, লোকজন, গাড়িঘোড়া, দোকানপাট কোনো কিছুই ওকে আটকে রাখতে পারছে না। ও এখন দাদীর কাছে যাবে, বাবাকে খোঁজা হবে না ওর। পেছনে মোজাম্মেলের ভয়াবহ, ক্ষিপ্র লোমশ হাত। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারে না, গুলিস্তানের মোড়ে এলে বাবার বিশাল দেহ ওকে আড়াল করে ফেলে।

নান্টু–

ভরাট গম্ভীর কণ্ঠ, আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। ছেলেটির বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। ওর চোখে পানি আসে।

নান্টু কতকাল তোকে দেখিনি। বাবা ওকে দু'হাতে কাঁধের ওপর উঠিয়ে নেয়।

এতদিন কোথায় ছিলে বাবা? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি।

নান্টু নদীতে ভিটে তলিয়ে গেলে আমি যে ছন্নছাড়া মানুষ হয়ে শহরে এলাম, আর তো ফিরতে পারলাম না রে।

BanglaBook.org

এখন চলো আমার সঙ্গে।

এখন তো যাবার সময় নেই। আমি যে একটা ভয়ানক যুদ্ধে নেমেছি। দেখছিস না আমার সঙ্গে হাজার হাজার লোক।

তোমার কীসের যুদ্ধ বাবা?

শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যারা আমাদের শ্রমের বদলে মুনাফার পাহাড় গড়ছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা এসব রুখবো নান্টু।

তাহলে আমি দাদীর কাছে যাই?

চল, আমার বস্তিতে দু'দিন থাকবি।

ছেলেটি বাবার সঙ্গে যেখানে আসে সে এক নতুন জায়গা। ওর বিস্ময় কাটে না। এখানে মানুষ থাকে? এমন ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি করে? মনে পড়ে ওর চরের ঘর। চারদিক থেকে হু-হু করে বাতাস আসে। মানুষের নিশ্বাস মানুষের সঙ্গে মিশে যায় না।

বাবা এ আমরা কোথায় এলাম?

এখানেই আমি থাকি।

ছেলেটির বাবা মনু মিয়া গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

তুমি কেমন করে থাকো?

অভ্যেস হয়ে গেছে।

কষ্ট হয় না? দম আটকে আসে না?

না।

মনুমিয়া ছেলের কথায় বিব্রত বোধ করে না। ওকে এই বাস্তব চেনাতে চায়। এখান থেকেই বেরুবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা নতুন পৃথিবী গড়বে। এই সব কথা ইউনিয়নের নেতারা ওকে শিখিয়েছে। ও শিখাবে ওর ছেলেকে। তাহলে কয় পুরুষ ধরে লড়াই চলবে? ও ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। মনু মিয়া চৌকির নিচ থেকে ছোট টিনের বাক্সটা টেনে বের করে।

দেখ আমি তোর জন্য লাল জামা আর বল কিনে রেখেছিলাম। মায়ের জন্যে শাড়ি, বাবার জন্যে লুঙি। দেখতো কেমন হয়েছে?

ছেলেটি আগ্রহ প্রকাশ করে না। বস্তির এই পরিবেশ ওকে মনমরা করে দিয়েছে। বাবার এই দীনদশা ওকে ব্যাকুল করে তোলে।

বাবা চলো দেশে যাই?

দেশে গিয়ে কি হবে? জমি আছে যে চাষ করে খাবো? ভিটে আছে যে ঘুমুবো?

এখানে তোমার কি আছে?

শরীরে শ্রম আছে, তাই ফেরি করি। দেশেতো কাজ নেই।

ভুল। এইখানে তুমি স্রোতের শ্যাওলা।

নান্টু?

মনু মিয়ার আর্তনাদ ছেলেটির কানে ঢোকে না। বাবার জন্যে ওর বুক ভার। এই উদ্বাস্তু জীবনের জন্যে ওর কোনো মমতা নেই, বরং আক্রোশ বাড়ে। বাবাকে একটা অদ্ভুত জীবের মতো মনে হয়।

বাবা তোমাকে মানুষের মতো দেখায় না।

ঠিক বলেছিস নান্টু, ঠিক বলেছিস। মানুষ হওয়ার জন্যই আমার লড়াই।

তোমার কথা আমি বুঝি না। যত কথাই বলো তুমি– ছেলেটি আর কথা বলে না। চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে। মনু মিয়া পাশের দোকান থেকে ছেলের জন্যে দু'টো ডালপুরি আনে।

BanglaBook.org

খা!

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে নেয়।

তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে থাক। আমি ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

ইউনিয়ন অফিসে। ওখান থেকে এসে তোকে খেতে দেবো।

কি দিয়ে ভাত খাবো?

ডাল, আলু ভর্তা। আর তো কিছু রাঁধিনি।

আমি এসব দিয়ে খাবো না।

সোনা আমার, তোকে একটা ডিম ভেজে দেবো।

তুমি নিজে রান্না করো?

আর কে করবে?

সারাদিন কাজ করে সময় পাও?

সকালে রেঁধে রাখি যে।

সকালেরটা রাতে খাও? গন্ধ হয় না?

হয় না আবার। একদম পচে যায়।

তাও খাও?

হ্যাঁ খাই। না খেয়ে করবো কি? বারবার রাঁধবে কে?

ছেলেটি হাঁ করে বাপের কথা শোনে। ওর এই বাবাকে ও চেনে না। বাবার এই পরিবর্তন ওকে ব্যথিত করে। বাবা স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, পায়ের নিচে মাটি নেই, নিজের দেশেই পরবাসী।

বাবা?

বল, কি বলবি?

ছেলেটি চুপ করে থাকে। ওর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। যারা বাবার মতো লক্ষজনের শরীরে পা রেখে স্বর্গ বানিয়েছে তাদের দেখতে পায় ও। কী নিদারুণ, নির্মম সে দেখা। ওদের পায়ের নিচ দিয়ে হৃদয়-নিংড়ানো রক্তের স্রোত বয়, ওরা সেই রক্তে পা ডুবিয়ে লজেন্স চোষে। বাবার মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, দৃষ্টি ঘোলাটে, মৃত্যুর মুখোমুখি এখন। বাবা কি করে লড়াই করবে?

নান্টু।

বাবা।

আমার সঙ্গে যাবি?

কোথায়?

ইউনিয়ন অফিসে?

বাবা দাদীর পাতা মোষের দুধের দই খেতে চাও না?

মনু মিয়া চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। ছেলেটি বড় বেশি বুকের ভেতরে হাত দিচ্ছে। টেনে নিতে চায় নদীর কোন্দরে, যেখানে কাদা-জলের মাখামাখি, যেখানে দাঁড়ালে হৃদয় আর্দ্র হয়, সমতলের জলবায়ু বিবশ করে দেয় শরীর। না, মনু মিয়া এখন আর সেখানে যাবে না, সেই সময় নেই। সামনে খোয়া-ওঠা পথ, এবড়োখেবড়ো রাস্তা, মরুভূমির উষ্ণতা, শরীরে দরদরিয়ে ঘাম নামে। মনু মিয়া এখন শক্ত-সমর্থ পুরুষ, নদীর ওপার থেকে বয়ে আসা স্নিগ্ধ বাতাস ওর নিশ্বাস আর গ্রহণ করে না।

বাবা! বাবারে–

BanglaBook.org

নান্টুর কণ্ঠ মনু মিয়া প্রাণভরে শোনে। ছেলেটির জন্যে ওর কিছু এখন করার সময়।

বাবা দাদীর ইলিশ মাছ রান্না খুব মজার, তুমি খেতে চাও না?

না। মনু মিয়া অনেক উঁচু থেকে কথা বলে। ছেলেটি অতদূর পৌঁছুতে পারে না। বুঝতেও পারে না।

বাবা দাদীর হাতের ভাঁপা পিঠা খেতে চাও না?

না। না নান্টু, না। এখন সামনে অনেক কাজ। এখন পেছনে চাইবার সময় নেই।

ছেলেটি আক্রোশে ফুঁসে ওঠে, বাবা তুমি আর মানুষ নেই।

মনু মিয়া হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে। ছেলেটি ছটফটিয়ে নেমে যায়। ওর কিছুই ভালোলাগে না। বাবার স্পর্শে আগুন, শরীর পুড়িয়ে দেয়। ছেলেটির কপাল ঘেমে ওঠে।

যাবি আমার সঙ্গে?

না।

আমি ঘুরে আসি?

যাও।

মনু মিয়া বেরিয়ে গেলে ছেলেটি ঘুরেফিরে ঘরটা দেখে। বাইরের কড়া আলোতেও ঘরে আলো-আঁধারী। তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ছেড়া কাঁথা। মাটির সানকি, টিনের গ্লাস উল্টে আছে। ঘরে ময়লা, সিগারেটের প্যাকেট স্তূপ হয়ে আছে। ছেলেটির গা ঘিনঘিন করে, বমি আসছে। ওর মনে হয় গ্রামের মুচি পাড়ার হরগোপালের শুয়োরটা যেমন কাদা-মাখামাখি করে থাকে, এখানেও তেমন একটা অবস্থা। বাবার জন্যে ওর মায়া হয়, পরক্ষণে রাগ বাড়ে। বাবা যতক্ষণ ছিলো, তবু ঘরের একটা শ্রী ছিলো। আকর্ষণ ছিলো বাবার। কিন্তু এখন এই উলঙ্গ, হা-হা ঘর শ্রীহীন, কদর্য। ও ঝাঁপ টেনে বেরিয়ে আসে।

বস্তিতে অসংখ্য ছেলেমেয়ে খেলছে, হৈ-চৈ, হল্লায় গমগম করছে এলাকা। ওকে দেখে ছুটে আসে অনেকে।

তুমি কে?

আমি তিতুমীর।

তিতুমীর? বাব্বা বেড়ে নাম তো।

তোমার বাবা কে?

মনু মিয়া।

ওহ্ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের ছেলে! তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বিশখালি নদীর চরে।

তুমি কি করো?

মোষ চরাই, মাছ ধরি।

খেলবে আমাদের সঙ্গে?

না।

চরে তুমি খেলো না?

মোষের সঙ্গে খেলি।

ছেলেরা হি-হি করে হেসে ওঠে, তুমি একটা আজব জীব। এই, চল, চল।

ছেলেরা যেভাবে দৌড়ে এসেছিলো সেভাবে দৌড়ে চলে যায়। ছেলেটি একটুক্ষণ ওদের দেখে, তারপর আবার হাঁটতে থাকে। এই বস্তিতে ওরা এত ভালো আছে কি করে?

অভ্যাস হয়ে গেছে ওদের, যেমন বাবার হয়েছে। ছেলেটি বস্তির মাঝ বরাবর নিম

BanglaBook.org

গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। একটু ভালোলাগে, হাঁফ-ধরা ভাবটা কেটে যায়।

তুমি কে গো? তোমাকে তো দেখিনি?

বুড়ো মতো লোকটা প্রশ্ন করে। ছেলেটি বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। ওর দাদার মুখের আদল খোঁজে, কিন্তু মিল পায় না। এই বুড়ো অনেক বেশি পোড়-খাওয়া, চোয়াল-ওঠা মুখটা বিধ্বস্ত। ওর দাদাকে এমনটি দেখায় না। দাদার চামড়া রোদে পুড়ে গেলেও পেশিতে ঔজ্জ্বল্য আছে। এরা এমন কেন?

হাঁ করে দেখছো কি? তুমি কার ছেলে?

আমার বাবা নেই।

আহা।

বুড়ো দুঃখ প্রকাশ করে চলে যায়। ছেলেটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারে না। মনে হয় বাবার সঙ্গে ইউনিয়নের অফিসে গেলেই হতো, এখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় নেই। সাঁই করে ধুলোর ঘূর্ণি উঠে চোখমুখ ধাঁধিয়ে দেয়। বস্তির কিশোরী মেয়ে আমিনাকে কলসি কাঁখে পানি নিয়ে যেতে দেখে ওর খুব আপন মনে হয়। ও কোথা থেকে পানি নিয়ে এলো? এখানেতো নদী নেই, পুকুর নেই। কলসি জলে ভাসিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে জলে না ডোবালে ওরা কি কলসি ভরার আনন্দ পায়? আমিনা ডুরে শাড়ি পরেনি কেন? এইসব ফ্রক পরা মেয়ে ওর ভালোলাগে না। আমিনা ওর কাছে এসে থামে।

তুমি কে? তোমাকে তো আগে দেখিনি?

আমি তিতুমীর।

ও গলা ভারি করে, ঘাড় সোজা করে জবাব দেয়। বয়স্ক হবার চেষ্টা করে।

কোথা থেকে এসেছো?

বিশখালি নদীর চর থেকে।

চর কি? মেয়েটি বিস্ময় প্রকাশ করে।

তুমি চর দেখোনি?

না। মেয়েটি ঘাড় নাড়ে। ওর বেণী দুলে উঠে, ভুরু কুঁচকে যায়, হাসিতে ভারি মিষ্টি দেখায় ওকে। এই প্রথম কোনো মেয়েকে দেখে ছেলেটির বুক ছলকে ওঠে।

বললে না চর কি? আমাদের এই বস্তির মতো?

না, আরো সুন্দর। চরের চারদিকে নদী। বাতাসে নদীতে ঢেউ ওঠে– জোয়ারে চরে পানি আসে– আমি সাঁতার কেটে সারাবেলা কাটাই। ভাটির সময় মোষের পিঠে ঘুরে বেড়াই। ফিঙে পাখি উড়ে আসে আমার কাছে। আমি গাঙ্গ ফড়িংয়ের পেছনে দৌড়ে যাই।

এসব কি বলছো তুমি? এমন জায়গাও হয়?

হয়, হয়। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? আমি কাচপোকা ধরে দেবো। কাচপোকার পাখা দিয়ে তুমি কপালে টিপ পরবে। আমার দাদী তোমাকে মল কিনে দেবে। ঝুমঝুম করে মল বাজবে তোমার পায়ে।

ধুত। তুমি একটা পাজী ছেলে। মিথ্যে কথা বলছো।

মেয়েটির মুখ ঝামটায় ছেলেটির মুখ শুকিয়ে যায়। ও আর স্বপ্নের কথা বলে না। জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথা থেকে পানি আনলে?

ঐ যে ঐ ট্যাপ থেকে।

ছেলেটি হতাশ হয়ে যায়। ট্যাপ থেকে কলসি ভরানোর কল্পনা ওকে আহত করে। বলে, চরের মেয়ে নও বলে কলসি ভরানোর মজা তুমি পাও না।

BanglaBook.org

থাক দরকার নেই। আমার বস্তিই ভালো।

ছেলেটি এতক্ষণে বুঝতে পারে চর দেখেনি বলে বস্তি ওদের ভালোলাগে। মেয়েটি ওকে আচমকা প্রশ্ন করে, তুমি কার ছেলে?

জানি না।

ওমা কেমন কথা। মেয়েটি হি-হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। তুমি তো ভারি রসিক ছেলে।

ছেলেটি কথা বলে না। কেন যে ও জানি না বললো, তাও বুঝতে পারে না। কখনো কখনো পিতা কি আড়াল হয়ে যায়? বুকের মধ্য থেকে উধাও হয় পিতা, প্রতিষ্ঠিত হয় নিজের পৌরুষ? যে পৌরুষ পারিপার্শ্বিক চেনে, নারীকে ভালোবাসতে শেখায়, লড়াই করে জয়ী হতে চায়। ও আমিনার চলে যাওয়া দেখে। হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, কবুতর অনেক কিছুই আছে বস্তিতে। মানুষের সঙ্গে ওদের বড় বেশি মাখামাখি। ছেলেটি আমিনার কাছে বাবার কথা অস্বীকার করেছে, এ জন্য হঠাৎ করে ওর লজ্জা হয়। ও দ্রুত হাঁটে। এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে ইউনিয়ন অফিসে এসে পৌছে।"

উপন্যাস আপাতত এখানেই শেষ। প্রদীপ্ত চোখ বুজে চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে রাখে। বুক ভার হয়ে আছে। ছেলেটি ওর বাবাকে উদ্বাস্তু বলেছে, বলেছে স্বদেশে পরবাসী। আলী আহমদ এবং পুষ্পিতার মনে কষ্ট আছে উদ্বাস্তু বলে। কিন্তু নসিব উদ্বাস্তুর নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে। গ্রামের মানুষ শহরে এসে উদ্বাস্তু হয়, এই ধারণা প্রদীপ্তকে চমকিত করে।

তখন ওর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নাচতে থাকে। ওর মনে হয়, মানুষ জীবনভর উদ্বাস্তুই থাকে। নিজের কাছে নিজেই অচেনা হয়ে যায়। আপন জমির ঠাঁই পাওয়া বড় কঠিন।

ওর তখন ইচ্ছে করে ছুটে বাবার কাছে চলে যেতে, বাবাকে এই নতুন বোধের কথা জানাতে হবে। তাহলে কি বাবা নিজের উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ ভুলবে?

BanglaBook.org

৮

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে প্রথম জনসভা করেন চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে। দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায়। বলা হতে থাকে এই ছয় দফা বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। পঁচিশ ফেব্রুয়ারি সেই সভায় বিপুল জমায়েত হয়।

এর আগে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে পাঁচ ও ছয় ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলন ডেকেছিলো। শেখ মুজিব সেই সম্মেলনে তাঁর ছয় দফার প্রস্তাব তুলে ধরেন, কিন্তু সম্মেলন সে প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। ঢাকায় ফিরে তিনি জনগণের সামনে ছয় দফার দাবিগুলো ঘোষণা করলে মানুষের চিন্তায় বঙ্গোপসাগরের নতুন ঢেউ এসে আঘাত করে। পুস্তিকাটি পড়ে আলী আহমদ প্রদীপ্তকে বলে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ দীপু।

বাংলার মানুষ এই কর্মসূচিকে গ্রহণ করেছে বাবা। দেশের যে কোনো স্থানে আয়োজিত জনসভায় প্রচুর লোক হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের কাছেই 'আমাদের বাঁচার দাবি– ছয় দফার কর্মসূচি' পুস্তিকাটি আছে।

এই পুস্তিকার ভূমিকায় তাজউদ্দিন আহমদের লেখাটিও উল্লেখযোগ্য। পরিষ্কার বলে

দেয়া হয়েছে যে, 'সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের নাজুক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সকল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার স্লোগানী রূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের কোনো মঙ্গলকামীকে বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারবঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে আর সস্তা বুলিতে ধোঁকা দেওয়া চলিবে না। তাঁহারা আজ দেশের প্রকৃত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরূপণ ও আশু বাস্তবায়ন দাবি করেন।'

আলী আহমদ কয়েকবার পুস্তিকাটি পড়েছে, আবারো পড়ায় মনোযোগী হয়ে যায়। নিজেদের অবস্থাটা বুঝে ওঠার চেষ্টা করলে কেবলই মনে হয় এ এক ধরনের আত্মআবিষ্কার। আত্মআবিষ্কার ছাড়া নিজেকে বোঝা হয়ে ওঠে না– তাই রক্তাক্ত হতে হয়– রক্ত ভেতরের এবং বাইরের। কেমন করে এই ভেতরে এবং বাইরের রক্তের স্রোত মিলবে? পুস্তিকাটি বন্ধ করে শিউরে ওঠে আলী আহমদ। গুনগুন করে 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি/আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' গান থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চলে যায় আলী আহমদ। 'শিশুতীর্থ' কবিতার লাইন ক'টি আবৃত্তি করে ঃ

'সকলে জানু পেতে বসলো, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়,
উচ্চস্বরে ঘোষণা করল– জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, এই চিরজীবিতের।'

কয়েকবার পঙক্তিগুলো বিড়বিড়িয়ে বলার পর আলী আহমদ নিজের ভেতর শক্তি অনুভব করে। ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে বলে, জয় হোক মানুষের।

কলাভবনের সামনের বটতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বক্তৃতা থেকে প্রদীপ্ত। পাকিস্তানের দুই অংশের ভেতরের অর্থনৈতিক বৈষম্যটিই প্রধান বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা পরিষ্কার করে দেন সবার চোখের সামনে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ড. মাহমুদ হোসেন এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। ছাত্র নেতারা উদ্দীপ্ত গলায় সেসব কথা বলে যায়। শুনলে ফুঁসে ওঠে শরীর– প্রদীপ্তর কান গরম হয়– হঠাৎ করে পাশে বসে থাকা অপরিচিত কারো কব্জী চেপে ধরে। তারপর লজ্জা পায়। ততক্ষণে মাইকে উচ্চারিত হতে থাকে বৈষম্যের খতিয়ান 'পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলো ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নাকি দুই প্রদেশের মাথাপিছু ব্যয়ের বৈষম্য কমানো হয়েছিলো। তাতেও দেখা যায় মাথাপিছু পূর্ব পাকিস্তান ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯১ টাকা। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হয়েছিলো ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২,১৫০ কোটি টাকা।–' ইত্যাদি, ইত্যাদি। অসংখ্য বৈষম্যের কথা অনর্গল বলে যায় ছাত্র-নেতারা।

এদিকে পূর্ব বাংলার আইন ও পার্লামেন্টারি দফতরের মন্ত্রী আবদুই হাই চৌধুরী করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব কর্তৃক পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করলেন।

শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিটি জেলায়, থানায়, গ্রামে-গঞ্জে– জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ছয় দফা। জনতার ঢল বয়ে যায় প্রতিটি জনসভায়। প্রমাদ গুনলেন আইয়ুব খান। এক মাসের মাথায় ছুটে এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁর

BanglaBook.org

রাজশাহীর জনসভায় প্রকাশ্যে ছয় দফার সমালোচনা করলেন। বললেন, 'ইহা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা।' তিনি কঠোর ভাষায় এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। ঘোষণা দিলেন, 'এই জঘন্য স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গোলামে পরিণত হবে, তাই এ কাজ তিনি কখনোই সফল হতে দেবেন না।' শুধু তাই নয় ঢাকায় ফিরে মুসলিম লীগের কনভেনশনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেবার সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেখ মুজিব ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে গৃহযুদ্ধের হুমকি দেন। একই দিনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিনে পল্টন ময়দানে ভাষণ দেবার সময় বলেন, 'কোনো হুমকিই বাংলার মানুষকে ছয় দফা দাবি থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।'

প্রতিদিনের কাগজে এইসব খবর পড়ে প্রদীপ্তর মনে হয় রাজনীতির সংকট দানা বেঁধে উঠেছে। ওর অস্থির লাগে– বুকের ভেতর শংকাও জাগে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা– পড়ায় মন বসে না। ওর ইচ্ছে সাংবাদিকতা করা। তাই বাবা ইত্তেফাকের নিউজ এডিটর সিরাজুদ্দীন হোসেনের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। লেখালেখির সূত্রে বাবার সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা। তিনি বলেছেন পরীক্ষা দিয়েই জয়েন করতে পারবে। কিন্তু পরীক্ষার কথা ভাবতেই ওর কেমন জানি ভয় করে। এই বছরে হয়তো পরীক্ষা দেয়া হবে না। মঞ্জুলিকা টাইফয়েডে ভুগছে। ক্লাস করতে পারছে না। বটতলায় বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। ও এক ফাঁকে উঠে বেরিয়ে আসে। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রমনার দিকে যায়।

শাহবাগের দিক থেকে রায়হান দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছিলো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, শুরু হয়েছে সরকারের দমন-পীড়ন, জেল-জুলুম, নির্যাতন।

প্রদীপ্ত খানিকটা নির্বিকার কণ্ঠে বলে, হবেই তো। সরকার তো আর চুপচাপ বসে থাকবে না। যার হাতে ডাণ্ডা সে আঘাত করবেই। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

হলে।

প্রদীপ্তর এইসব কথায় আলী আহমদ চুপ করে ছিলো। কেমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো অন্যদিকে। বাবাকে আর কষ্ট দিতে চায়নি প্রদীপ্ত। চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিলো বাড়ি থেকে। এখন ও কোথায় যাবে? কোথাও যাবার জায়গা নেই। ইকবাল হলে রায়হানের ঘরে গিয়ে আড্ডা দেবে? না থাক। রমনা পার্কের গেট থেকে এক ঠোঙ্গা বাদাম কিনে ও লেকের পাড়ে এসে বসে।

শেখ মুজিবের ওপর নির্যাতন এবং হয়রানির মাত্রা দিন দিন বাড়তে থাকে। সেদিন একুশে এপ্রিল যশোরে জামিনে মুক্তি পেলেও ঢাকায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সিলেট এস. ডি. ও. আদালতের এক পরোয়ানা বলে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। পরদিন পুলিশের পাহারায় সিলেট পাঠানো হয়। অভিযোগ ছিলো চৌদ্দ মার্চ সিলেটে তিনি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। চব্বিশ এপ্রিল সিলেটের জেলা দায়রা জজ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করে– কিন্তু সেদিনই ময়মনসিংহ থেকে পাঠানো এক গ্রেফতারি পরোয়ানায় পুলিশ সিলেট জেল থেকে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে ময়মনসিংহে পাঠায়। ময়মনসিংহের সদর মহকুমা হাকিম তাঁর জামিনের আবেদন বাতিল করে, কিন্তু ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ তাঁর জামিন মঞ্জুর করলে তিনি মুক্তি পান। কয়েকদিন মুক্ত থাকার পর আট মে রাতে তাঁকে এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২(১) ক ধারার বিধানবলে আবার গ্রেফতার করে। শুধু তাই নয় তাজউদ্দিন আহমদসহ আরো অনেক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশে বেশ হইচই পড়ে গেছে। এর প্রতিবাদে

BanglaBook.org

সাত জুন সারা দেশে হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। এদিকে ছয় জুন ছিলো প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন। গভর্নর মোনায়েম খান যখন বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা শুরু করেন তখন বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা প্রদেশব্যাপী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে দেশে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। পত্রিকাগুলো লিখছে 'দেশময় আজ হা-অন্ন, হা-অন্ন রব উঠিয়াছে, আজ হাহাকার উঠিয়াছে পূর্ব বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ঘরে ঘরে।' বাইশ মে 'খাদ্য দাবি দিবস' পালিত হয়েছে। সব মিলিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। ঘর ছেড়ে পথে নামছে– নির্যাতন উপেক্ষা করছে। এসবের ভেতরে সরকারের দমননীতি স্রোতের মধ্যে গতি সঞ্চার।

একদিন জিপিও'র সামনে নসিবের মুখোমুখি হয় প্রদীপ্ত। নসিব ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছো?

মায়ের জন্য একটা ওষুধ কিনতে এসেছি।

কি হয়েছে?

জ্বর। অনেকদিন ধরে ভুগছেন।

রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে?

না।

গাধা, ঐসব হাতুড়ে চিকিৎসায় হবে না। আগে রক্ত পরীক্ষা করো।

বাবাও তাই ভাবছেন। কাল নিয়ে যাবেন অন্য ডাক্তারের কাছে। আপনার উপন্যাস কতদূর?

আর লিখিনি। রাজনীতির খেলাটা দেখছি, তারপর শুরু করবো। আমি তো এই সময়কেই ধরতে চাই। তাই এখানে ইতি টানবো।

কবে পড়তে আসবো?

সাত তারিখের হরতাল যাক, তারপর। আসি।

নসিব জিন্নাহ এভিন্যুর ভিড়ে মিশে যায়। প্রদীপ্ত রাস্তা পেরিয়ে আসে– সামনেই ওষুধের দোকান। ওষুধ কিনে পূর্ণিমার জিলেপি খাবার কথা মনে হয় ওর।

সাত তারিখে প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঢাকার নাগরিক জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। ধর্মঘটী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এগারো জন নিহত হয়। শত শত লোককে গ্রেফতার করা হয়।

পরদিন প্রতিটি পত্রিকায় সরকারি প্রেসনোট ছাপা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রেসনোটটি বাবাকে পড়ে শোনায় প্রদীপ্ত। পুষ্পিতার বিছানার পাশে বসে নখ কেটে দিচ্ছিলো আলী আহমদ। প্রদীপ্তর পড়া হলে বলে, চমৎকার সাফাই গেয়েছে সরকার। তবে সব প্রেসনোটের ভাষা একই থাকে দীপু। সবসময়ই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই পুলিশ গুলি চালায়। বাহান্নোতেও এমন হয়েছিলো। প্রদীপ্ত কিছু বলে ওঠার আগেই জ্বরের ঘোরে মাথা তুলে বমি করে পুষ্পিতা। মেঝে ভরে যায়– তীব্র গন্ধ ঝাঁঝালো হয়ে নাকে এসে লাগে সবার। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে জড়িয়ে ধরে মাথাটা কোলের ওপর তুলে নেয়। প্রদীপ্ত এক গ্লাস পানি এনে মায়ের মুখ ধুইয়ে দেয়। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে মা ওর দিকে তাকায়। আলী আহমদের মনে হয় পুষ্পিতার ঘোলাটে চোখ গুলি খেয়ে রাজপথে ছিটকে পড়া মগজের মতো যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

রহিমার মা ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। প্রদীপ্ত ফিনাইল ছিটিয়ে দেয়। প্রতীক মায়ের জন্য এক গ্লাস লেবুর শরবত নিয়ে আসে। একটানে শরবতটুকু খেয়ে ক্লান্তিতে চোখ বোঁজে ও।

BanglaBook.org

পরদিন রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে ধরা পড়লো পুষ্পিতার জণ্ডিস হয়েছে। মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরুলো না প্রদীপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, আড্ডা বন্ধ, বাইরের জগৎ বন্ধ– যেন ওর জীবনে একটা ভীষণ হরতাল হয়ে গেলো। বাবাকে ওর বিছানায় পাঠিয়ে দিয়ে ও রাতদিন মায়ের সেবা করলো। আলী আহমদ ছেলের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো মনে মনে। মুখে বললো, তুই যে এমন সেবা করতে পারবি আমি ভাবতেই পারিনি দীপু। প্রদীপ্ত হেসে বলে, মায়ের অসুখ দেখে আমার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে গেলো বাবা। আমার কেবলই মনে হতো সেই সাতচল্লিশ সালে আমরা তিনজন মানুষ মহানন্দা পেরিয়ে এ দেশে এসেছিলাম। সেই মা যদি না থাকে–। না বাবা, আমি ভাবতেই পারি না যে আমরা কেউ থাকবো না।

কথাগুলো বলার সময় আলী আহমদ, পুষ্পিতা ও প্রতীক ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো। ওরা সবাই যেন অনুভব করেছিলো নিজেদের মধ্যে সময়ের টিক্‌টিক্ শব্দ– বাজছে, বেজেই যাচ্ছে। তখন পুষ্পিতা ম্লান হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে। বলে, দীপু আজ তুই একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়। আলী আহমদ সায় দেয়, হ্যাঁ, কতদিন তুই ঘর থেকে বেরোসনি। প্রতীক উচ্চস্বরে বলে, তুমি যাও ভাইয়া। আমি থাকবো মায়ের কাছে।

পুষ্পিতা হাসে, ওরে আমাকে নিয়ে তোদের আর ভয় নেই। প্রতীক মায়ের গলা জড়িয়ে বলে, আমি তোমার জন্য চুপিচুপি অনেক কেঁদেছি। তুমি যদি বন্যার মায়ের মতো–

প্রতীকের চোখ ছলছল করে ওঠে। আলী আহমদ মৃদু ধমক দেয়, আহ্ জিতু–

প্রতীক আড়ালে সরে যায়। প্রদীপ্ত রাস্তায় নামে। কোথায় যাবো? মুহূর্তে নসিবের কথা মনে হয়– নিশ্চয়ই এতদিনে উপন্যাসটি লিখে শেষ করেছে। কেমন করে শেষ হলো নসিবের 'এই সময়'– প্রদীপ্ত রিকশা নিয়ে নসিবের বাসায় আসে। নসিব তখন কেবল লেখাটা শেষ করেছে। প্রদীপ্তকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, বাঁচবে অনেকদিন। লেখাটা শেষ করেই তোমার কথা মনে হয়েছে।

কই দেখি? ও হাত বাড়ায়।

আগে চা খেয়ে নেবে না?

না। প্রদীপ্ত কাগজগুলো টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

"ইউনিয়ন অফিস জমজমাট। ঘরে তিল-ধারণের জায়গা নেই। মনু মিয়া বক্তৃতা করছে। তার কণ্ঠ ঘর ছাড়িয়ে রাজপথে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি ঘরের বাইরে থমকে দাঁড়ায়। এ যেন ওর নতুন বাবা। ও প্রাণভরে বক্তৃতা শোনে। এইসব কথা ও আগে কখনো শোনেনি। এই প্রথম ও শেখ মুজিবের নাম শোনে, শোনে ছয় দফার কথা। ও বিড়বিড় করে, এসব কি হচ্ছে!

মনু মিয়া এখন আর ওর বাবা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ও বাবা, বাবা করে ডাকলেও সে ডাক মনু মিয়ার কানে পৌঁছুবে না। জোরালো হয়ে ওঠে মনু মিয়ার কণ্ঠ।

ভাইসব ছয় দফা আমাদের বাঁচার দাবি। পশ্চিমা শোষণের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে মাথা তুলে দাঁড়াবার সময় এসেছে।

ছেলেটি ভিড়ের মধ্যে বাবাকে খুঁজে পায় না। ছোটখাটো একটা মিছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে, ছয় দফা আন্দোলনের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেটি অনেকক্ষণ এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মিছিল চলে গেলে ও একা পথে নামে। ওর চোখে জল, বাবার জন্যে গর্ব, এমন বাবা লাখে মেলে। ওর আর দুঃখ নেই,

BanglaBook.org

দাদীর কান্নার জন্যে মায়া নেই, চরের জন্যে ব্যাকুলতা নেই, ও এই বস্তির একজন। এইসব ছেলেমেয়েদের মতো ওর ভাগ্যও অনিশ্চিত। ধুলোবালি মেখে, খিস্তি-খেউড় আউড়ে, চড়-চাপড় খেতে-খেতে ও বেড়ে উঠছে। ছেলেটি ঘরে ফেরে। ওর এখন ভালো লাগছে। বাবার ঘরটা পরিষ্কার করে। বাসন-কোসন ধুয়ে আনে, বিছানা-বালিশ গোছায়। ইচ্ছে করে রান্না করতে, কিন্তু সাহস হয় না, রাঁধতে তো জানে না। ও বাবার জন্যে রাত জেগে বসে থাকে। অনেক রাতে মনু মিয়া ফিরলে ছেলেটি বাবার গলা জড়িয়ে ধরে।

নান্টু–

বাবা, কোথায় ছিলে তুমি?

আমার কত কাজ রে? কাল যে হরতাল। কতকিছু ঠিকঠাক করতে হয়।

বাবা আমি তোমার সঙ্গে পল্টনে যাবো।

যাবি, যাবিই তো। মনু মিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে। কপালে চুমু খায়। তুই আমার সোনার ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।

বাবা তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি তোমার জন্যে ভাত বাড়ি।

ছেলেটি মেঝেতে মাদুর পাতে। সকালের রান্না ভাত পানি থেকে উঠিয়ে সানকিতে রাখে। কুপির আলোয় মরিচ পোড়ায়। খেতে বসলে ছেলেটির গা গুলিয়ে উঠে। ভাত টক হয়ে গেছে, গন্ধ আসছে। মনু মিয়া ভ্রুক্ষেপহীন গপ্‌গপিয়ে খেতে থাকে। ছেলেটি ভাত নাড়াচাড়া করে।

তুই খাচ্ছিস না নান্টু?

খাচ্ছিতো।

আসলে আমার মায়ের রান্না হলে তোর খেতে ইচ্ছে করে। না রে?

ছেলেটির চোখে জল আসে। বাবা কত বদলে গেছে। বাবা রান্নার স্বাদ ভুলে গেছে।

বাবার বুকে এখন অন্য নেশা। এ নেশার পিয়াস মিটলে বাবা কি আবার ভাতের সোঁদা গন্ধ পাবে? তাজা ইলিশের দোপেঁয়াজার জন্য ব্যাকুল হবে? কবে সেদিন আসবে?

খা না নান্টু? না, তোকে নিয়ে পারা গেলো না, আমাদের এমনই খেতে হয় রে।

বাবা আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। বিকেলে যে পুরি খাইয়েছো ওতেই পেটটা কেমন ভরে আছে। তুমি খাও, আমি উঠে পড়ি।

ছেলেটি পেটে খিদে রেখে উঠে পড়ে। ও এখনো শ্রমিকের ছেলে হতে পারেনি। ওর গায়ে চরের গন্ধ। এখনো জীবনযাপন ঢিলে-ঢালা, খোলা বাতাসে ফুসফুস পরিষ্কার, এখনো দাদীর হাতের রান্নার স্বাদ জিভ থেকে মুছে যায়নি। ও কখনো বস্তির জীবনে অভ্যস্ত নয়, কারখানার ভেঁপু শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, দিনশেষে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে শরীরের রক্ত পানি করে ঘরে ফেরে না। ও কি করে বুঝবে মনু মিয়ার যন্ত্রণা, কি করে বুঝবে মনু মিয়ার স্বপ্ন?

পরদিন হরতাল পালিত হতে দেখে ছেলেটির জীবনের বাঁধ ভেঙে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল, রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া নেই, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় মানুষের ঢল, স্লোগান-মিছিল। ছেলেটি বাবার সঙ্গে পুরো শহর ঘুরে বেড়ায়। ও হরতাল কি জানতো না, জনসমুদ্র দেখেনি। সারাদিন মিছিল করে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে এখন জাগরণ, মানুষ বুঝতে পারছে ওদের জীবনে শোষণের নিগড় কত ভয়াবহ। নেতাদের কারাগারে আটক রেখে যতই আন্দোলন থামাতে চাইছে, ততই ফুলে ফেঁপে উঠছে জনসমুদ্র। বিকেলে পল্টন ময়দানে ওর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জনে ঢাকা শহর ফুঁসছে। ওর মনে হয় দেশের চারদিক থেকে এক ভয়াবহ গর্জন ধেয়ে

BanglaBook.org

আসছে। কালো হয়ে উঠছে আকাশ। বক্তারা সরকারের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। কী জোরালো ভাষা! কী জোরালো কণ্ঠ! শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করে মনু মিয়া। ছেলেটির বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। ওর মনে হয় বাবাকে খুঁজতে না এলে ওর অনেক কিছুই বাদ পড়ে যেত। ও একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারতো না।

রাতে ঘরে ফিরে ছেলেটি বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। ঘরে তখন আলো নেই, বাইরে অন্ধকার। মনু মিয়া দিয়াশলাই খুঁজে পায় না। ছেলেটির নিশ্বাস ঘন।

নান্টু–

বাবা!

কি হয়েছে?

বাবা দারুণ লাগছে।

মনু মিয়া ওকে চেপে ধরে, তোর খিদে পায়নি।

না।

দাঁড়া, আলো জ্বালি।

থাক না বাবা।

পাগল ছেলে।

অন্ধকারই ভালো বাবা, তোমার হাত ধরে বসে থাকি। তুমি আমার কাছে আলোর মতো। আমি আর দাদীর কাছে যাবো না। কতকাল তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি। এখন আর তোমাকে ছাড়বো না।

ছেলেটি বাবার গলা ছাড়ে না। মনু মিয়া ওকে নিয়ে চৌকির ওপর বসে। চৌকির নিচে ইঁদুরের খুটখাট।

বাবা তুমি খুব ভালো বক্তৃতা করো? শুনলে প্রাণ ভরে যায়।

তুই তো শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনিসনি। শুনলে শরীর কেঁপে ওঠে, বুক উথাল-পাতাল হয়। মানুষটা দেশের কথা, মানুষের কথা খুব দরদ দিয়ে বলে রে! সেই বক্তৃতা শুনলে মনে হয় তিনি ডাক দিলে আমি মরণেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

আহ্ বাবা, বাবাগো।

হ্যাঁরে সত্যি। তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে, তাঁর কণ্ঠস্বরে আমি বাউরা হয়ে যাই।

বাবা আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।

এখন না, তুই বড় হয়ে নে। এখন তুই তোর দাদীর কাছে থাকবি। এখনই সময় চরের মাটি গায়ে মাখার। আমার মতো সোঁতের শ্যাওলা হবি কেন তুই?

না, তুমি সোঁতের শ্যাওলা না। তুমি শক্ত খুঁটি বাবা। তোমার মতো সবাই একসঙ্গে হলে ভেঙে পড়ে–

ছেলেটি আর কথা খুঁজে পায় না। বাকি কথাটুকুর জন্যে ও বাবার মুখের দিকে তাকায়।

মনু মিয়া কথা না বলে ঘর কাঁপিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে ঘরে আলো জ্বালে।

বাবা হাসছো কেন?

তুই আমার চাইতে বেশি বুঝিস রে। তুই অনেক বড় হবি।

ছেলেটি চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে। ধুলি-ধূসরিত পা, ধোয়া হয় না। ইচ্ছে করে না। মনু মিয়া বদনা নিয়ে বাইরে গেছে। আজকে রান্না হয়নি। দু'জনের মুড়ি খেয়ে থাকতে হবে। তবু ভালো, কোনো আপত্তি নেই। এখন ছেলেটি বুঝতে পারে দাদীর হাতের ভালো রান্না না খেয়েও ওর বাবা কেমন করে থাকতে পারে। ভালো রান্না হলে

BanglaBook.org

খুশি মনে খায়, না পেলে ক্ষতি নেই, দুঃখ নেই। সামনে কাজ আছে, নতুন স্বপ্ন গড়ার আয়োজন আছে, সেজন্য অন্য সবকিছু অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

আয় হাতমুখ ধুয়ে নে।

মনু মিয়া বদনা-ভরা পানি নিয়ে ফিরে আসে। জলের স্পর্শ ছেলেটির খুব ভালোলাগে। শীতল হয়ে যায় শরীর। খুব অল্প পানি ব্যবহার করেছে ও। তবু মনে হয় যেন ও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল তোলপাড় করে সাঁতার দিয়ে উঠে এলো।

বাবা তোমার এক বদনা পানি এক নদীর সমান।

উহ্ নান্টু– মনু মিয়া কথা না বলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখে চোখ, ছেলেটির চোখে আশ্চর্য ব্যাকুলতা। ছেলেটির দৃষ্টিতে দিগন্তস্পর্শী জিজ্ঞাসা। ওর মুখজুড়ে জলের রেখা।

বাবা কি দেখছো?

তুই অনেক বুঝিস নান্টু। আমার চাইতেও বেশি।

ছেলেটি গামছা খুঁজে মুখ মোছে। তারপর মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর চৈতন্যে হাজার হাজার মানুষের পায়ের শব্দ। বেশ কটা দিন ছেলেটির চমৎকার কাটে। মনু মিয়া ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কখন ঘরে ফেরে ছেলেটি মাঝে মাঝে তা টের পায় না। এখন বাবা ওর সমগ্র অস্তিত্বের, সেজন্য বাবার উপস্থিতির তেমন প্রয়োজন নেই। আসা-যাওয়ার ফাঁকে যে দেখা, যে কথা সেটাই ওর কাছে পরিপূর্ণ, সেটাই বিশাল। একদিন অনেক রাতে ও বাবাকে ধরে বসে।

বাবা তোমার এত কি কাজ?

আগামী সাত জুন সারা দেশে হরতাল ডাকা হয়েছে নান্টু। তার জন্য কাজ করতে হচ্ছে। ছেলেটি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনু মিয়া বলতে থাকে, কদিন আগে 'খাদ্য দাবি দিবস' পালন করা হয়েছে। মানুষ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে নান্টু। শ্রমিকরা এর আগে কখনো এমন করে আন্দোলনে আসেনি। এখন আমাদের সময়। আমরা এই অবস্থার শেষ দেখতে চাই।

মনু মিয়া ছেলের কপালে চুমু দেয়।

আজ তোকে লঞ্চে তুলে দেবো। তুই বাড়ি যা। মা তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে।

না, আমি তোমার কাছে থাকবো।

তা হয় না রে পাগল। দেখিস না আমার কোনো কিছুর ঠিক নেই।

আমি এভাবেই থাকতে পারবো। আমার অসুবিধা হয় না বাবা।

তোর দাদী যে তোকে ছাড়া থাকতে পারে না।

ছেলেটি চুপ করে থাকে। দাদীর কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কি, ঠিক বলিনি?

বলেছো। ছেলেটি মাথা নাড়ে।

তাহলে আজই চলে যা?

যাবো। কিন্তু আমি আবার আসবো বাবা?

কেন?

সাত জুনে আসবো।

নান্টু।

হ্যাঁ, সেদিন আমি তোমার কাছে আসবো।

আসিস। মনু মিয়া ছেলের মাথা বুকে চেপে ধরে।

BanglaBook.org

বিকেলে ছেলেকে লঞ্চে তুলে দেবার পরও মনু মিয়ার বুক ভার হয়ে থাকে। ছেলেটি রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে আছে। আস্তে আস্তে ও দূরে সরে যায়– আস্তে আস্তে ভেঁপুর শব্দ কমে যায়– আস্তে আস্তে জলের আলোড়ন থেমে যায়– আস্তে আস্তে কোলাহল অসীম স্তব্ধতায় পরিণত হয়। ছেলেটির চোখের সামনে বাবা বিন্দু হয়ে গেছে। ছেলেটি এখন আর বাবাকে দেখতে পাচ্ছে না। লঞ্চ কখন চলে গেছে। এখন আর ভট্‌ভট্‌ শব্দও নেই। ও দেখতে পাচ্ছে ওর দাদা আলের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে, নদীর বাতাসে তার সফেদ চুল উড়ছে, গলার গামছা দু'হাতে ধরা। দাদা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়, বুকে হাঁফ, কথা জড়িয়ে যায়।

ঘরে চল দাদা, তোর বাপ আর কুনুদিন আইবে না। ও মোর বুক পোড়াইছে, তোরেও পোড়ায়। ও আমাগো জ্বালা।

ছেলেটি দাদার হাত ধরে ঘরে ফেরে। ওর সামনে থেকে মুছে যায় স্বপ্ন। দাদাকে বলতে পারে না যে ও মনে মনে বাবার সঙ্গে শহরে কাটিয়ে এসেছে। এটুকু ওর নিজের মনেই থাকে। তাই ছেলেটির এখন দারুণ সময়। ও এখন বিশখালি নদীতে, মাছ ও পানির সঙ্গে ওর সখ্য। নদীর মোহনায় যেখানে সবচেয়ে স্রোত বেশি সেখানে পাতা হয়েছে বাধা জাল। গোলাকার জাল, ব্যাসার্ধে আশি হাত। লম্বায় চল্লিশ হাত আর মুখে পঞ্চাশ হাত, মুখে একটা বড় রশি থাকে। ছেলেটি খুব গভীরভাবে নিরিখ করে ওর দাদা মকবুলের সঙ্গে মিলে কিভাবে জালটা বাঁধছে। জালের মুখের কাছটা সরু হয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্যাসার্ধ দাঁড়ায় তিন কিংবা চার হাতে। নাইলন সুতোর তৈরি জাল· ছিদ্রগুলো আঙুল পরিমাণ চওড়া। ছেলেটি বৈঠা ধরে বসে আছে, নৌকায় ওঠা দাদী নেঃ এটা ওর খুব খারাপ লাগছে। বাধা জাল পাতার সময় বুড়ি আসে না। কারণ তার কিছু করার থাকে না। সে ফেলে বড়শি। বুড়ি এখন ঘরে কোমরের ব্যথা নিয়ে শুয়ে আছে, পাশ ফিরতে গেলেও কষ্ট হয়। ছেলেটি মালশার আগুনে সেঁকে দেয় কোমর। নদীর ঘোলা পানির দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়, দাদী কি এহন মোর কথা ভাবে। সকালে বুড়ি ওকে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা দিয়েছে। কী অপূর্ব স্বাদ! এখনো জিভে লেগে আছে। না কি দাদীর জন্যে মন কেমন করছে বলেই ইলিশ মাছটা এমন বড় হয়ে উঠেছে। ছেলেটি লজ্জা পায়। সবকিছুর পেছনে স্বার্থ থাকে। কখনো চেতনে, কখনো অবচেতনে সেই স্বার্থ কাজ করে। মৃদু স্রোতে নৌকা নড়ছে। ছেলেটি দাদার কাজ দেখে। দাদার মুখ এখন নিরুদ্বিগ্ন, চিন্তামুক্ত। সকালেও চিন্তিত ছিলো। নেসার জমাদারের সঙ্গে অংশীদারদের ধানের হিসেব নিয়ে গণ্ডগোল বেঁধেছে। ওরা বলেছে জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাবে। নেসার জমাদার দেবে না। বুড়োকে হুঁশিয়ার থাকতে বলেছে। ধান কাটার এখনো পনেরো বিশ দিন বাকি। বুড়ো চিন্তায় অস্থির। এই দুর্যোগ সামাল দেবে কি করে? ছেলেটিরও কিছু ভালোলাগে না। দাদার মুখের দিকে তাকালে আঁকাবাঁকা আলের রেখা দেখতে পায়, সেই রেখা ভাঙতে ভাঙতে জমির সীমানা বাড়ে, যেমন বেড়ে যায় বর্ষার নদী। ছেলেটি নদীতে পা ডুবিয়ে আসন্ন বিপদের কথা ভাবে। ভয়ানক মারামারি হবে, কত লোক আহত হবে। ওর দাদার কিছু যদি হয়? না, ভেবে ক্লান্ত হতে চায় না, মন খারাপ খুব বাজে জিনিস। বুক কুরে কুরে খায়। খেয়ে ঝাঁঝরা করে। কী যে কষ্ট! ছেলেটি নদীর ওপারে দৃষ্টি ধরে রাখে। আসন্ন বিপদের কথা ভুলে যেতে চায়। বাবার কথা ভাবে, ব্যাপ্তিতে, বিশালতায়, গভীরতায় বাবা রাজপথের মিছিলের মানুষ। যার পেছনে হাজার লোকের মুষ্টিবদ্ধ হাত।

নান্টু, বাঁশের খুঁড়িডা ধর।

দাদার কথায় ওর চমক ভাঙে। মকবুলকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, যেন জন্মের পর একদিনের জন্যেও বিশ্রাম হয়নি। সেই তুলনায় ওর দাদা বয়স্ক, অথচ সতেজ। গলায়

BanglaBook.org

মোটা রগ নেই, কপালে দাগ নেই। ও দাদার কথায় বাঁশের খুঁটিটা চেপে ধরে। নৌকা দুলছে, সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস বইছে। সে বাতাসে নোনা স্বাদ, ছেলেটি বিশাল হাঁ করে শ্বাস টানে। মকবুল আর ওর দাদা বাঁশ আর জালের সংযোগস্থলে দুই মাথায় হাওয়া-ভর্তি ড্রাম বেঁধে দিচ্ছে। এর ফলে জাল উপরে ভেসে থাকবে। নইলে জাল স্রোতের টানে নদীতে তলিয়ে যাবে। এই জালপাতার সময়টা ছেলেটির জন্য ভীষণ আনন্দের। যেমন আনন্দ পায় ও মোষের পিঠে ঘুরতে, যেমন আনন্দ পায় জোয়ারের জলে চর ভেসে গেলে। নদীর ভাঙনে ভিটে ধুয়ে গেলে বাবা শহরে যায় উদ্বাস্তু হয়ে। এটাও কি আনন্দের? ছেলেটির বুক কট্ করে ওঠে।

ঐ ছ্যারা ঠিক মতন খুঁডিডা ধর।

দাদা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। ছেলেটি অন্যমনস্ক ছিলো। আনমনা হলে সময়টা কেমন অদ্ভুত হয়ে যায়। তখন যেন সময়ের রঙ থাকে, নদীর মতো ঘোলাটে, কিংবা পত্রাদির মতো সবুজ বা বালুর মতো চিক্‌চিকে। ছেলেটির এই অন্যমনস্কের মুহূর্ত বাবার বস্তির ঘর, টুটাফাটা জামাকাপড়, আধপেটা খাওয়া, নোংরা বাসনকোসন। ও ভুলে যায় বাবা ডাক।

দাদা, দাদা গো?

কি?

সোত বেশি, রাখতে পারি না।

ছেমরা কোনো কামের না।

দাদা ওর ওপর বিরক্ত হয়। ছেলেটি চুপ করে থাকে, কিছুটা লজ্জিত, বিব্রত। ওর চোখের সামনে এখন সময়ের রঙ, সে ঘোর কাটেনি। শুধু জালের ওপর দৃষ্টি, জালটা পাতা হচ্ছে। জালের সামনের অংশ আলাদা দু'টি বাঁশ দিয়ে ফাঁক করে দেয়া হচ্ছে। এরপর জালের সরু প্রান্ত শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। স্রোতের তোড়ে মাছ জালের সরু প্রান্তে জমা হয়, হাজার হাজার মাছ জমা হয়। রূপালী ঝাঁক, সে এক অসাধারণ দৃশ্য। ভাটি কিংবা জোয়ারের শেষে জাল যখন নৌকার ওপর তুলে মুখ খোলা হয় তখন আনন্দে উত্তেজনায় নিথর হয়ে যায় ও। তবে এমন সময় কমই আসে ওর জীবনে। কেননা ওর দাদার মাছ মারার সুযোগ কম। কেবলই মনের কোণে আনাগোনা করে বাধা জালের সরু মুখে তাজা মাছের ছটফটানি। এক সময় ওদের জাল পাতা শেষ হয়। তখন খাড়া দুপুর। ছেলেটির পেটে খিদে।

দাদা?

কি?

বাড়ি লন।

হ, যাই।

মকবুল চিন্তিত, উস্কুখুস্কু চেহারা, নদীর জলে মাতম। লঞ্চ যাচ্ছে পাশ দিয়ে, ঢেউয়ে নৌকা দুলছে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে ছেলেটি, দাদা? ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ওর মনে এখন বাড়ির টান। বুড়ো ক্ষেপে যায়, ছেমরা খালি চিল্লায়। চুপ থাক হারামজাদা। মকবুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মোগ সামনে এহন খারাপ দিন।

মকবুল একবার মনপুরায় চর দখলের সময় লাঠালাঠিতে মাথা ফাটিয়েছিলো। দীর্ঘদিন ভুগে বেঁচে গিয়েছিলো সে যাত্রা। এখন আবার এই জমির আসন্ন বিবাদে ও সন্ত্রস্ত। ওর দৃষ্টিতে এখন ধূ-ধূ বিষণ্নতা, কাজে মন বসে না। দু'জনের কারোই নদী থেকে যেতে ইচ্ছে করে না। ডাঙা মানেই খুনোখুনি, মারামারি, রক্তের নদী। বুড়ো সে কারণে তিরিক্ষে, মকবুলও কিছুটা মেজাজী হয়ে আছে। ছেলেটি সে সব বুঝতে চায় না। ওর পেটের খিদেয় আগুন জ্বলে। ইচ্ছে করে জাল বাঁধা খুঁটিটা উপড়ে ফেলে দিতে, জালটা ছিন্নভিন্ন টুকরো

BanglaBook.org

টুকরো হয়ে যাক। মাছগুলো ভেসে যাক গভীর সমুদ্রে।

মকবুলের কণ্ঠ ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে, নেসার জমাদারের লাগি মুই মারামারি করবার পারমু না। মোরা মরমু ক্যান? সারা বছর শরীলের রক্ত পানি কইরা ফসল ফলামু আবার সেই ফসলের লাইগ্‌গা পরাণ দিমু? ক্যান এত ঠেকলাম কি লাইগ্‌গা? মোরা কি মোগ ন্যায্য পাওনা পাই?

মকবুলের রোষ দৃষ্টি উদ্দীপিত। ছেলেটি যেন বাবার কণ্ঠ শুনতে পায়। না, শুধু বাবার নয়, আরো হাজার হাজার কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শহরের রাজপথে, গ্রামে গঞ্জে, নদীর বুকে সে প্রতিধ্বনি গর্জনে প্রবাহিত। ছেলেটির খিদে উবে যায়, ওর সামনে এখন সময়ের রঙ। দ্রুত পাল্টাতে পাল্টাতে একটা বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে যায়। টকটকে লাল রক্তের মতো সে বিন্দু– সে বর্ণের বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় ও এখন স্থির, অনড়।

মকবুলের কথা শেষ হলে বুড়ো কোনো উত্তর দেয় না। চুপচাপ বিড়ি ফোঁকে। বুড়ো বোঝে ওর পালাবার পথ নেই। নেসার জমাদারের পক্ষ হয়ে ওকে লড়তেই হবে। না লড়লে খাবে কি? যাবে কোথায়? নেসার জমাদার কি একজন? ওরা তো অনেক, একজনের হাত থেকে পালিয়ে আর একজনের হাতে পড়তে হয়। যাদের জমি নেই, ভিটে নেই তারা কি মানুষ?

তখন মকবুল খেঁকিয়ে ওঠে, তুমি কিছু কইলা না যে?

বুড়ো গলা ফাটিয়ে একটা বিশাল হুঙ্কার ছাড়ে, মোরা কি মানুষ মকবুইল্যা?

এই অকস্মাৎ চিৎকারে ছেলেটি ভয় পেয়ে বুড়োর হাত চেপে ধরে।

দাদা, দাদা গো!

ছেলেটির ব্যাকুল কণ্ঠ দু'জন অস্থির মানুষের বুকে সেঁধিয়ে যায়। ওরা তখন একসঙ্গে বলে ওঠে, মোগ মাথা একডা, কিন্তু ফাডে হাজার বার। মোগ মাথা একডা কেনতে চায় হাজার কুত্তায়। আসলে মোরাই মানুষ ওরা কুত্তা, ওরা বেজন্মা। মোরা মানুষ– মোরা মানুষ।

ছেলেটিও তখন সুর করে এদের সঙ্গে এই কথা বলে। জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে সে সুর প্রবলবেগে আলোড়িত হয়। ছেলেটির মনে হয় সেই মিছিলের মানুষগুলো জালে আটকে-পড়া মাছের মতো তাজা, ছটফটে। ওরা মাছের মতো তড়পায়, ওরা ছাড়া পেতে চায়। ওর চেহারা পাল্টে ক্রুর হয়, চিৎকার করে, দাদা?

কি?

মোর বাজান–

তোর বাজান! কচু। বুড়ো মুখ বাঁকিয়ে বুড়ো আঙুল দেখায়। তোর বাজান! ঘণ্টু। বুড়ো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জবাব দেয়। শরীরে রাগ বাড়তে থাকে।

না তুমি মোর বাজানরে চেনো না। তোমার পোলা অইলে কি অইবে মোর বাজানরে তুমি একটুও চেনো না।

রাখ তোর বাজান। বুড়ো গর্জে ওঠে।

যে নিজের বাপ ভোলে, মা ভোলে, পোলা ভোলে, চরের ধান ভোলে হে কি একডা মানুষ?

বাজান কিছু ভোলে নাই। বাজান এই বেবাকতার মদ্যে আছে। বাবা তোমার নেসার জমাদারের মতো মানুষের মাথা ফাডাইতে চায়।

ছেলেটির ক্রুদ্ধ তেজী কণ্ঠে দু'জন বৃদ্ধ থমকে যায়। বুড়ো নিস্তেজ কণ্ঠে বলে, তুই এইডা কি কও দাদা? ঠিক কথা তো?

BanglaBook.org

হ, মুই ঠিক কই। মুই চিনি মোর বাজানরে। তুমি চেনো না। চেনতে পারবা না।- তোমার হেই বয়স নাই দাদা গো।

তখন নদীর ওপর আশ্চর্য প্রশান্তি খেলে যায়। দু'জন ভূমিহীন কৃষকের বুকের কন্দরে জল জমতে থাকে। ওরা ভাবে, তাহলে এতদিন পর বুঝি সুখের দিন আসছে। মনু মিয়া সুসময়ের জন্যে লড়ছে। জাল পেতে ওরা যখন ডাঙায় নামে তখনো ওদের বুক কাঁপে। বৃদ্ধ দু'জন ছেলেটির কথা বিশ্বাস করে। ওরা বুঝতে পারে এই সব কথার হয়তো কোনো ভিত্তি নেই, এতটুকু ছেলে কিইবা আর জানবে! কিন্তু এই সব কথা বিশ্বাস করতে ওদের ভালোলাগে। ছেলেটি লাফিয়ে আগে আগে বাড়ির পথে যায়। ও পেছন ফিরে তাকায় না। দাদীর জন্যে ওর মন কেমন করে। দাদীকে রেখে ও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না। বুড়ো দু'জন মগ্ন হয়ে কথা বলে। তখন দিনের অপরাহ্ন ছুঁই-ছুঁই সময়।

ও মকবুইল্যা হাছাই কি নেসার জমাদারগো মাথা ফাডবে?

ফাডবে। বুড়ো মকবুলের কথার ওপর জোর দিয়ে বলে। গভীর বিশ্বাস থেকে উচ্চারিত হয় সে শব্দ।

মোরা আর কতকাল কষ্ট হরমু?

মোগ কি দাম অইবো না?

মোরা কি খালি নেসার জমাদারের ধানের লাইগা মোগ মাথা ফাডামু?

না। বুড়ো ঘুরে দাঁড়িয়ে মকবুলের হাত চেপে ধরে।

না, না।

দু'জনে একসঙ্গে উচ্চারণ করে। ছেলেটি ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। ও এমন একটা ভাবনা দু'জনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে বোঝা বড় কঠিন, বড় শক্ত। দু'জনের কারোই বহন করার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ ওরা নদীর পাড়ে হাঁটে ততক্ষণ ওদের চমৎকার সময় কাটে। কিন্তু যেই মুহূর্তে ওরা চরের ভেতরে প্রবেশ করে তখন ওরা ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। বিশালাকায় দৈত্যের মতো নেসার জমাদার ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। পুরো চর-জুড়ে ধান, ওরা এর পাহারাদার মাত্র এবং এর হাত থেকে ওদের মুক্তি নেই। বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ ধরে ওরা এভাবে পরের জমি চাষ করে যাচ্ছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নেই, ক্ষুধার্ত, নিরন্ন, ক্লান্ত, হাড়-জিরজিরে শরীর। ওরা কিছুতেই নেসার জমাদারের শরীর একচুল নড়াতে পারে না। সেই বিশালাকায় দৈত্যের ছায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কী অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছিলো ওরা। তারপর দু'জনের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

মোগ জমি অইবে না মকবুল?

না অইবে না।

মোগ মাথা ফাডবে মকবুল?

হ, ফাডবে।

দু'জন বুড়ো নিথর, নিস্পন্দ। ছেলেটি ওদের পাশে নেই যে সাহসের কথা উচ্চারণ করে। বুড়োদের ভরসা দেবার কেউ নেই। অসম্ভব স্বপ্নের পিপাসায় দু'জনের চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে। তারপর আলের ওপর দিয়ে পিঠ নুইয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়। ওদের শরীরে সামর্থ্য নেই তবু মালিকের জন্যে লড়তে হবে, ওদের বাহুতে বল নেই তবু ধান বেড় দিয়ে রেখে মালিকের গোলায় ওঠাতে হবে। নিজের অজান্তে মকবুলের হাতটা ওর মাথায় পৌঁছে যায়। কাটা দাগ এখনো আছে, স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। বুড়োর গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, গলা ঘড় ঘড় করে। ওদের শরীর

BanglaBook.org

ছুঁয়ে আঁধার নামে, ওদের শরীর ছুঁয়ে নদীর দিকে বাতাস বয়ে যায়, ওদের কানে কেবলই রয়ানি গানের বিলাপ ধ্বনিত হয়।

ছেলেটি অনেক রাত জেগে দাদীর সঙ্গে গল্প করে। ওর বাবার কথা বলে। বলতে ওর ক্লান্তি নেই, বলেই যায়। বুড়ি অবাক হয়ে শোনে। বুড়ো বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়, কিন্তু ধমকে কাজ হয় না। ছেলেটি বলেই যায়। যে বাবাকে ওর মনে নেই তাকে নিয়ে এত কথা কেন ওর বুকে জমে থাকে? কেন এমন হয়?

ছেলেটির এত কথা শুনতে শুনতে বুড়ি হাঁপিয়ে ওঠে, বুড়ির কান্না পায়। অসীম বিরক্তি নিয়ে বুড়ো উঠে আসে। ছেলেটির গল্প শুনতে শুনতে বুড়োর বিরক্তি উবে যায়। গল্পটি বাধা জালে ধরা-পড়া হাজার হাজার মাছের মতো রূপোলি রোদে চক্‌চক্‌ করে, বুড়োর সুখের সময় এখন। এক ভূমিহীন কৃষকের ছেলে শহরে গিয়ে শ্রমিক হয়ে কি করে নেতা হয়ে সংগ্রাম করে সে এক অবিশ্বাস্য রূপকথার গল্প এখন ছেলেটির কণ্ঠে।

ধান পাকার সময় হয়ে এসেছে। মকবুল রাতদিন পাহারা দেয়। নেসার জমাদারের প্রতিপক্ষের জোর দাবি, ধানের হিস্যা চাই, নইলে কেড়ে নিয়ে যাবো। নেসার জমাদার এককণা ধান ছাড়বে না। আরো দশজন লোক পাঠিয়েছে ধান কাটার জন্যে। চরে এখন মানুষের কোলাহল। বুড়োর অস্থির লাগে। শানানো কাঁচি হাতে কখনো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্ষেতের দিকে। কি যে হয়, বারবার ছেলের কথা মনে পড়ে। ওর সঙ্গে এই জীবনে আর বুঝি দেখা হলো না। মাঝে মাঝে মকবুল এসে বুড়োর হাত চেপে ধরে।

মোরা কি মরমু?

বুড়ো নির্বিকার উত্তর দেয়, হয় মরণই সামনে।

কার লাইগ্যা মরমু?

বুড়ো উত্তর দেয় না। এ এক কঠিন প্রশ্ন। ছেলেটি কালকে বলছিলো, ওর বাবা অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নেমেছে। কিন্তু ওরাতো লড়ছে মালিকের জন্যে। এ লড়াই করে কি হবে?

কথা কন না যে?

কথা কইতে জানি না।

BanglaBook.org

বুড়োর দৃষ্টি স্থির। মকবুলের চোখের দিকে তাকায় না। মকবুল দপ্‌দপিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। গতকালও ও ভীষণ হাসিখুশি ছিলো। জাল-ভরা মাছ তুলেছিলো। আজ ওর মেজাজ চটে আছে। প্রতিপক্ষের নানা ধরনের বাক্যবানে ও বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। কিন্তু এসব কথা বুড়োকে এখন তেমন বিচলিত করে না। বুড়ো বুঝে গেছে যে নেসার জমাদারের পক্ষ নিয়ে না লড়লে ওর মুক্তি নেই। এভাবেই ওকে বেঁচে থাকতে হবে। ছেলেটি কাছে এসে দাঁড়ায়, দাদা?

বুড়ো ঘুরে দাঁড়ায়।

মোইষ বাথানে দিমু?

দে।

ছেলেটি বুড়োর সঙ্গে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না, বলা হয় না। শেষের কথা বলার পরও দাঁড়িয়ে থাকে। ওর নিজেরও মন খারাপ। আসন্ন বিপদ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দাদী বারবার বলে দিয়েছে দাদাকে আগলে রাখতে। যেন মারামারির সামনে না যায়। কিন্তু কেমন করে আগলাবে ও? মারামারির সময় দাদাতো ওর কথা শুনবে না। ও জানে দাদা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবার শক্তি সঞ্চয় করছে।

ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে। শূন্য হয়ে উঠছে চরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এখন আর দৃষ্টির পথে বাধা নেই। এমাথা ওমাথা সব দেখা যায়। দুপুরের পর নৌকা বোঝাই ধান চলে যাবে নেসার জমাদারের বাড়িতে। তারই প্রস্তুতি চলছে। বুড়ো কিছুটা আশ্বস্ত, প্রতিপক্ষ হয়তো এদের তোড়জোড় দেখে পিছু হটে গেছে। এ যাত্রা হয়তো আর হাঙ্গামা হবে না। বাঁচা গেলো। বুড়ো আলের ধারে বসে কপালের ঘাম মোছে। মকবুল নিশ্চিন্তে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। ধান ওদের দখলে। কোনো বাপের বেটা আর সাহস করে নিতে আসবে না।

বুড়ো একগাল হেসে মকবুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, দে বিড়ি দে।

মকবুল ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে।

সুখটান দ্যান। মোর মাথা এহন আর ফাডবে না। আল্লাহ মোরে দয়া করছে।

বুড়ো চুপচাপ বিড়ি টানে। ধানের গোছা আঁটি বাঁধা হচ্ছে। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। বাতাস গুমোট। ছেলেটি গামছায় বেঁধে দাদার ভাত নিয়ে আসে। খোলার সময় হয় না। চরের পুব কোণে পাঁচটা ডিঙি থেকে পনেরো জন লোক লাফিয়ে নামে। হাতে সড়কি, বল্লম, রামদা। মুহূর্তে সরব হয়ে ওঠে এলাকা। বুড়ো সড়কি হাতে রুখে দাঁড়ায়। ছেলেটি বিমূঢ় হয়ে এক অভিনব দৃশ্য দেখে। দুই প্রতিপক্ষই প্রভুর চাকর, প্রভুর স্বার্থের জন্যে নিজেদের জীবন দিচ্ছে। মারামারি তুমুল চলছে, ওর দাদা ছুটে গেছে সামনে। ছেলেটি গামছায় বাঁধা ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। ও শহরে আসে বাবার কাছে। আজ ছেষট্টি সালের সাত জুন। কথা ছিলো আজ ও বাবার কাছে থাকবে।

শহর প্রতিদিনের নিয়মের বাইরে। কল-কারখানা, অফিস-আদালত, দোকানপাট বন্ধ, গাড়ি-ঘোড়া নেই, শুধু পায়ে হাঁটা মানুষের ঢল। চারদিক স্তব্ধ, থমথমে ভাব। ছেলেটির মনে হয় বাতাসে ক্রন্দনধ্বনি, ও কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। পর মুহূর্তে হাঁটে, না আজ আর বাবার বস্তিতে যাওয়া হবে না ওর। বাবা নেই, বস্তি খালি। ও হাঁটতে হাঁটতে মিছিলে মিশে যায়। দেবুর সঙ্গে দেখা হয়। দেবু ওর দিকে চোখ বড়ো করে তাকায়।

তিতুমীর তুই?

ছেলেটি হাসে।

তুই ছাড়া পেয়েছিস তিতুমীর?

ছেলেটি মাথা নেড়ে দেবুর হাত চেপে ধরে।

কী যে খুশি লাগছে! দেবুর দু'চোখে আনন্দের ঝিলিক।

আমাদের মতো ছেলেদের বন্দী থাকা মানায় না।

ছেলেটির কথায় দেবু ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকায়। ছেলেটি দেবুর ঘাড়ে হাত রাখে। দেখছিস কি? চল, আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

দু'জনে দ্রুত এগোয়। কিন্তু বেশিক্ষণ সঙ্গে থাকা হয় না। আলাদা হয়ে যায় আবার। জঙ্গী মিছিল এগিয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ যতই এগোয় ততই দীর্ঘ হতে থাকে মিছিলের আকার। ছেলেটি কোথাও ওর বাবাকে খুঁজে পায় না। কখনো বাবার কথা একদম মনে করে না, মনে হয় ও নিজে মিছিলের একজন, বাবার মতো লড়াইয়ে নেমেছে। সামনে লড়াইয়ের ময়দান– লক্ষ্য একটাই। ওর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

গুলিস্তানের মোড়ে মোজাম্মেলের সঙ্গে দেখা হয় ওর। একটুও ভয় পায় না। আজ মোজাম্মেল মিছিলে– বুক ভরে স্লোগান দিচ্ছে। আস্তে করে ছেলেটির মাথায় হাত রাখে, তিতুমীর?

BanglaBook.org

ওস্তাদ।

না ওস্তাদ না, তোর চাচা।

চাচা। ছেলেটির কণ্ঠে একরাশ সুরভি।

কবে এসেছিস ঢাকায়?

আজই।

ভালোই করেছিস।

চাচা, আমি আমার বাবাকে খুঁজে পেয়েছি।

বাহ্, খুব ভালো। কোথায় তোর বাবা?

বাবা এখন শ্রমিক নেতা। মিছিলের সামনে।

তাই নাকি? মোজাম্মেলের দু'চোখে বিস্ময়। ছেলেটি তখন ফিসফিসিয়ে বলে, আমার বাবা আপনার জন্যও লড়াই করছে। আপনি যাতে ভালোভাবে থাকতে পারেন।

মুহূর্তে মোজাম্মেলের দৃষ্টি ম্লান হয়ে যায়।

তিতুমীর তুই আমাকে মাফ করে দিস।

তিতুমীর মৃদু হাসে।

মোজাম্মেল আর ওর সামনে দাঁড়ায় না। ভিড়ের মধ্যে অন্য পাশে চলে যায়। তখন মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গুলি চালায়। এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। ও ছুটতে পারে না, কোথায় যাবে জানে না। বুক ভার ওর। বাতাসে বারুদের গন্ধ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তবু ভিড় ঠেলে সামনে এগোয়, বাবাকে খুঁজতে হবে। বাবার সঙ্গে দেখা না করে ও ফিরবে না।

ছেলেটির বুকে লড়াইয়ের উত্তেজনা, ছেলেটির চেতনায় বারুদের গন্ধ, ছেলেটির সামনে রক্তের রেখা। ওর বাবা রাজপথে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কালো পিচের ওপর গোত্তা খেয়ে পড়ে যাওয়া শরীরটা কেমন মোচড়ানো। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক উপরে উঠে যাওয়া কাটা ঘুড়িটার মতো কি বাবা পড়ে গেলো? ওর স্মৃতিতে ঘুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষ কখনো ঘুড়ি হয়। ছেলেটি বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত এক সুরেলা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে।

বাবা গো! ছেলেটির আর্ত চিৎকারে বাতাস চিরে যায়। ও বাবার লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

বাবা গো! গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না। কণ্ঠ রুদ্ধ। কান্নার স্বর স্লোগানের মতো হয়ে যায়।

ছেলেটি প্রাণপণে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

এ্যাই সর, সর বলছি।

রাগী, ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। ওর চারপাশে কেউ নেই। বন্দুকধারী পুলিশরা ঘিরে আছে ওকে। ত্যাঁদড় ছেলে তো, সর বলছি।

ও আরো শক্ত করে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। না, ও সরবে না, কিছুতেই না। তখন ওর মাথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত পায়। কে যেন রাইফেলের বাঁট দিয়ে ওকে মারলো।

বাবা গো? সেই একই ধ্বনি বুক চিরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর চমক ভাঙে। ও শুনতে পায় দাদার ভাঙা গলার আর্ত চিৎকার, নান্টু–। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে ওর দাদা ধানের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। ও ভাতের গামলা ছুঁড়ে ফেলে দাদার কাছে দৌড়ে যায়। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দাদাকে। বুড়ো নিমীলিত চোখে তাকায়।

নান্টু তোর বাজান কই? মোর মনু মিয়া?

BanglaBook.org

মুই জানি না দাদা গো, মুই জানি না।

বুড়ো আর কথা বলে না। চোখ বুঁজে যায়। বুকের ওঠানামা কমে আসে। ছেলেটি ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি করবে বুঝতে পারে না। বুড়োর মাথা ফেটেছে, ক্ষীণ রক্তের ধারা গলায়। চরে শিয়ালমুথা পাতা নেই। থাকলে ও চিবিয়ে রস লাগিয়ে দিতো। কিন্তু এখন কি করবে? দৌড়ে গিয়ে দাদীকে ডেকে আনবে? ছেলেটি বুড়োর গামছা দিয়ে মাথা বেঁধে দেয়।

প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় নেসার জমাদারের লোকেরা, এক আঁটি ধান ওরা ছাড়েনি। জখমের পাল্লা ওদের দিকে ভারি বেশি। ছেলেটি দাদার মাথা আঁকড়ে ধরে সে দৃশ্য দেখে। আস্তে আস্তে বুড়োর বুকের ধুক্‌পুকানি বন্ধ হয়ে যায়। মকবুল সড়কি হাতে যখন বিজয়ীর বেশে এসে দাঁড়ায় তখন বুড়ো আর নেই। জানতেও পারে না প্রভুর এক কণা ধান ওকে ছেড়ে দিতে হয়নি। মকবুল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বুড়ি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। বুড়োর দাফন হয়নি। আগামীকাল হবে। ছেলেটি চৌকাঠে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মকবুল বাথানে। মোষের দড়ি খুলছে। নেসার জমাদার নিজে এসেছে চরে। সন্ধ্যার আগেই নৌকা বোঝাই ধান চলে গেছে তার গোলায়। নেসার জমাদার বুড়িকে কত কি বললো কিছুই কানে ঢোকে না তার। বুড়ো নেই এই তীব্র সত্য মেনে নেয়া এক জীবনে সম্ভব নয়। বুড়ির জন্যে আর একটি জীবন দরকার। আস্তে আস্তে রাত বাড়ে। ছেলেটি ঠায় বসে থাকে। কঠিন অন্ধকার, অমাবস্যা চলছে। ও রাত বাড়তে দেখে। ও কখনো নির্ঘুম রাত কাটায়নি। বুড়ির কণ্ঠ কখনো নেমে আসে, কখনো উঁচুতে উঠে যায়। বুড়ো রয়ানি গান ভালোবাসতো। বুড়ির কণ্ঠে এখন সে গান। শুনবে কে? ছেলেটির মন ছট্‌ফট্ করে। নেসার জমাদার চলে গেছে অনেক আগে। মকবুল নিচে ঘাসের ওপর বসে আছে। একবার ওর মাথা ফেটেছিলো এ বোধে বারবার আক্রান্ত হয় ও। অথচ বুড়ো আজ প্রাণ দিয়েছে, এই তীব্র সত্য মেনে নেয়া এক জীবনে মকবুলের পক্ষে সম্ভব। এর মধ্য দিয়েই তো ওর জীবনের বিস্তার ঘটেছে। এমনটি ঘটবে মকবুল জানতো, এভাবেই ঘটতে দেখেছে। বুড়ো না মরলে হয়তো ও নিজে মরতো, নইলে অন্য কেউ কিংবা একসঙ্গে অনেকে। অথচ বুড়ো নেই এ সত্য বুড়ি মেনে নিতে পারছে না, তীব্র বেদনায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বুক। বুড়ি এক জীবনে অনেক দেখেছে, চর দখলের লড়াই কিংবা ধান দখলের গল্প দাদার মুখে শুনেছে, বাবার মুখে শুনেছে, চাচার মুখে শুনেছে, পড়শির মুখে শুনেছে, তবু বুড়ি মেনে নিতে পারছে না। বাইরে অমাবস্যার রাত ঘুটঘুটে, কুক্কা ডাকছে তীব্র স্বরে। কঠিন কালো রাত তিনজন মানুষের বুকের ওপর পা দাবিয়ে পাড়ি দিচ্ছে। ছেলেটির নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ও মুখ হাঁ করে থাকে। গলগলিয়ে বাতাস ঢোকে, বাতাস বেরোয়। ওর মনে হয় নদীর দিক থেকে জোর বাতাস আসছে। চাদরে ঢাকা বুড়োর লাশ যেন নড়ছে, বাতাসে কেঁপে যায় চাদর। বুড়ির কণ্ঠে বিলাপ নেই, আশ্চর্য নীরব পরিবেশ। ছেলেটির নিশ্বাস স্বাভাবিক হলে ও ভীষণ স্বস্তি পায়। মনে হয় ওর ভালো লাগছে, বেশ ভালো লাগছে। ও এখন দাদার জায়গায় স্থান পাবে। নেসার জমাদারকে প্রভু মেনে চরের ধান পাহারা দেবে। গোলা ভরিয়ে ফসল তুলবে। ফসল, ফসল, চারদিকে সোনালি ফসল। ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। চরাচর প্রকম্পিত করে সে কান্না ধ্বনিত হতে থাকে। মারামারির সেই দৃশ্য দেখার পর থেকে বুড়োর মৃত্যু পর্যন্ত ও বিমূঢ় হয়েছিলো, এখন ওর চোখের জল বিশখালি নদীতে আরো একটি নতুন চরের দিকে ধাবিত। ওর কান্না কিছুতেই থামে না।

বুড়ি ওর কাছে এসে বসে, মাথায় হাত বুলোয়। বুড়ির মনে হয় তার নিজের

BanglaBook.org

শোকার্ত হৃদয়ও বুঝি ছেলেটির মতো ক্ষতবিক্ষত নয়। ছেলেটির শোক অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক। মকবুল কাছে বসে, ছেলেটিকে ও কোনোদিনও বুঝতে পারেনি। আজো পারে না। দু'কান ভরে ওর কান্না শোনে। এই কান্না কোথায় শুনেছে, আরো অনেকবার, হাজারবার শুনেছে, কিন্তু কোথায় কিছুতেই মনে করতে পারে না। পরক্ষণে মনে হয় ওর নিজের বুকের ভেতর থেকে ঠিক এই একই রকমের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। বুড়ি ছেলেটির মাথা বুকে চেপে ধরে। ছেলেটি বুড়ির বুকে মাথা রেখে কান্না থামাতে চায়, পারে না। বারবার বাবার মুখ ভেসে ওঠে, রক্তাক্ত, অথচ উদ্দীপিত। মৃত্যু ঐ মুখের সংগ্রামী চেতনা কেড়ে নিতে পারেনি। ছেলেটির বুক ভরে যায়। দাদার লাশের সামনে বসে ও বাবার মৃত্যুশোক অনুভব করে। মনে হয় এমন মৃত্যুগুলো সব এক। কারণ তা সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়। তাই কোনোটাই আলাদা নয়।

দাদীর বুকে মুখ গুঁজে ওর রাত পোহায়। তখনো চরের বুকে আঁধার কাটেনি, পুব আকাশে সূর্য নেই, বাথানে মোষের কোলাহল স্তব্ধ, লাশের ওপরের চাদরে বাতাসের কাঁপন নিস্পন্দ। ছেলেটির দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। ও শহরে এসে দাঁড়ায়।

রাজপথ প্রায়ই ফাঁকা। রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়ি-ঘোড়া তেমন নেই। ও শহরের এমাথা-ওমাথা দৌড়ুতে থাকে। গতকাল যেখানে ওর বাবা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো সেখানে রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন। বাতাসে বারুদের গন্ধ বিলীন। ঘাতক সব চিহ্ন মুছে নিয়ে গেছে। ছেলেটি হাঁফাতে হাঁফাতে সদরঘাটে ফিরে আসে। টার্মিনালের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। তখন একগাদা খবরকাগজ নিয়ে দেবু এসে হাজির হয়।

তিতু, তিতুমীর?

দেবু তুই?

আমি এখন কাগজ ফেরি করি। আজকের কাগজে তোর বাবার খবর ছাপা হয়েছে তিতু। নে একটা কাগজ তুই রাখ।

তিতুমীর হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ নেয়। ও কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দেবু চলে যায়। কালো কালো অক্ষরগুলো হাজার হাজার মানুষের মাথার মতো, ছেলেটির দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। লেখা হয়েছে মনু মিয়া, মজিবুল হক প্রমুখ শ্রমিকসহ এগারো জন শহীদ হন এবং আটশ' লোককে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি প্রেসনোটের ওপর ছেলেটির দৃষ্টি আটকে যায়। প্রেসনোটে দশ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়েছে। প্রেসনোটটি ওর মগজে ঢুকতে থাকে, ঢুকতে ঢুকতে বিশাল বিশখালি নদী হয়ে যায়, জেগে ওঠে এক অসাধারণ উর্বরা চর। ঐশ্বর্যে, সম্ভাবনায় সে চর ওর কাছে এক সোনালি স্বপ্ন। ও সরকারি প্রেসনোট পড়ে :

'ঢাকা, ৭ই জুন– আওয়ামী লীগ-কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুণ্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া হয়। ই. পি. আর. টি. সি. বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচলে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রান করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তেজগাঁওয়ে ২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেল-স্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা

BanglaBook.org

হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারা গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩০০ উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক তেজগাঁওস্থ ল্যান্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টরেট অফিস আক্রান্ত হয়। জনতা তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং মেশিনসমূহের দারুণ ক্ষতিসাধন করে। আক্রমণের সময় প্রেসের তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪ নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতিসাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহু সংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতিসাধন এবং বন্দুকের গুলিতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা-ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলীবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরো ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি জনাব এম. এ. জাবেদের মোটর গাড়ি ভস্মীভূত ও তাঁহার বাড়ি লুণ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও চাষাড়ার মধ্যে রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

টঙ্গিতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে। কাওরান বাজারের উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন সার্জেন্টকে প্রহার ও তাহার স্কুটারের ক্ষতিসাধন করে এবং রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও ই. পি. আর. দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই. পি. আর. বাহিনী একটি শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে জনতা গেণ্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখে ৩৩-আপ ট্রেনখানি অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয়। যাহা হউক ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় চালু করা হয়। সন্ধ্যার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাংক আক্রমণ করে। রক্ষীগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলীবর্ষণ করে। বেলা ১১-টায় ৫ বা ততধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।' [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন ১৯৬৬]

পড়তে পড়তে ছেলেটির বুকে তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। যেন ওর চারপাশে নোনা জল, কিছুতেই গলা দিয়ে নামছে না। সরকার ওর বাবাকে গুণ্ডা বলেছে, যারা হরতাল করেছে তারা সবাই গুণ্ডা। যারা অধিকারের সংগ্রামে লড়াই করে তারা বুকের রক্ত দিয়ে

BanglaBook.org

গুণ্ডা হয়। ছেলেটির তৃষ্ণা বাড়তেই থাকে, ও একটা দোকানে গিয়ে পানি চেয়ে খায়। এক গ্লাসে হয় না, ওর এক কলসিতে হয় না, ওর এক নদী পানি দরকার। ও হাতের কাগজ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। ওর ইচ্ছে করছে হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই যেন টুকরো টুকরো করে, তাই যেন দুমড়ে-মুচড়ে বাতাসে মিলিয়ে দেয়। এক অসুরিক শক্তি ওকে প্রবল চেতনায় আঁকড়ে থাকে। ওর সামনে এক দুর্দমনীয় যৌবন। ও কৈশোর অতিক্রম করছে আজ।

তখন ওর চেতনার কড়া নড়ে।

নান্টু?

দাদী ডাকছে। ওর দৃষ্টি শূন্যে, দাদা নেই এ এক অসম্ভব সত্য।

নান্টু রে–?

দাদীর কণ্ঠের বিলাপে ওর দিব্যদৃষ্টির দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। ওর সামনে এক অথৈ সমুদ্র। এখানে বাবা নেই।

মোরা এহন কৈ যামু?

দাদীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ছেলেটির কানে ঢোকে না। ও নির্নিমেষ দাদীর মুখের রেখা দেখে, আঁকিবুঁকি রেখায় কখনো জোয়ারের সরু জল, কখনো জলকাদার টান, কখনো কি আলপথ নাকি মেঠো পথের চিকন চিহ্ন? এতকিছু একসঙ্গে যে তা জট পাকিয়ে যায়– তালগোল পাকানো এতকিছু দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়।

ও নিঃশব্দে এসে বুড়োর পাশে বসে। মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দেয়। নিমীলিত চোখের পাতায় যুদ্ধের চিহ্ন নেই, ওর বাবার চেহারায় ছিলো। ওর দাদা শান্ত, নিরীহ, গোবেচারা, মার খেতে খেতে মরে গেছে। ওর বাবা রুখে দাঁড়িয়েছিলো, প্রতিবাদ করে মরে গেছে। নদীর দিক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসে। ছেলেটির শরীরে কাঁপুনি জাগে। ওর সামনে কেউ নেই। এখন ওর সময় উঠে দাঁড়াবার। বুড়ি আবার বিলাপ শুরু করেছে। ছেলেটি কান খাড়া করে। যেন শুনতে পায় বুড়ো বলছে, এখন তোর সময়। রক্তের মধ্য থেকে মুখ উঠিয়ে ওর বাবা বলছে, এখন তোর সময়। ও বিড়বিড় করে, হ এহন মোর সময়। ও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

দাদী গো এহন মোর সময়।

মকবুল ছুটে আসে। বুড়িও। ছেলেটি ততক্ষণে বুড়োর গায়ের চাদর টান দিয়ে ফেলে তার পাশে শুয়ে পড়ে। প্রবল ভালোবাসায় মমতায় হিমশীতল শক্ত শরীর জড়িয়ে ধরে। ওর ফোঁপানি থামতেই চায় না। দু'জন মানুষ কিছুতেই ওকে বুঝতে পারে না। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।"

প্রদীপ্ত যতক্ষণ পড়েছে নসিব ঘর-বারান্দায় পায়চারি করছিলো। উপন্যাসটা শেষ করার পর থেকে ও বেশ উত্তেজিত। এখন ও অসীম রায়হান– নিজের সৃষ্টির স্রষ্টা। ওর সঙ্গে এখন আর কারো মিল নেই। প্রদীপ্তর মতামত শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। প্রদীপ্ত কাগজের ওপর থেকে চোখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে নসিব, কেমন লাগলো?

দারুণ। প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে। ভালো লেগেছে নসিব ভাই। ফ্যান্টাসি এবং বাস্তবের গাঁথুনি মিলিয়েছেন চমৎকার।

নসিব আনন্দে দু'বার ঘুরপাক খায়। তারপর বলে, চল নাসিমার ওখানে যাই।

নাসিমা আপা? তিনি তো উপন্যাস পছন্দ করেন না।

BanglaBook.org

করবে, করবে চল। তোকে তো বলা হয়নি, আমরা আগামী সাত জুলাই কোর্টে যাচ্ছি।

কোর্টে কেন? বাড়িতে–

না, বাড়িতে কোনো ঝামেলা করা যাবে না। এইতো ভালো। নির্ঝঞ্ঝাট। কোর্ট থেকে দু'জনে সরাসরি এখানে চলে আসবো। তারপর নাসিমা আর আমার সংসার, বলে নসিব হা-হা করে হেসে ওঠে। মন খারাপ হয়ে যায় প্রদীপ্তর। ও অদ্ভুত দৃষ্টিতে খোলা দরজাটার দিকে তাকায়। ভাবে, নসিবের সংসার মানে এ বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ওর অবাধ যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে। ও একটি মানসিক আশ্রয় হারাচ্ছে। নসিবের প্রদীপ্তর দিকে খেয়াল নেই। ও আপন খুশিতে শিস বাজাতে বাজাতে দরজায় তালা দেয়।

সেই ফাঁকে প্রদীপ্ত পিছু হটে। দরজার ওপর উপুড় হয়ে নসিব কি যেন করছে, হয়তো তালাটা ঠিকমতো লাগাতে পারছে না, হয়তো ওটা বিগড়েছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ও দেখতে পায় উঁচু হয়ে আছে নসিবের পাছা। দৃশ্যটি ওকে কষ্ট দেয়– বুঝতে পারে ওর দিকে পাছা ফিরিয়ে থাকা লোকটি আর ওর নয়, নাসিমার– যে নারী উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে না। এখন ওই লেখক সেই নারীর কাছে যাবে ভালোবাসার জন্য এবং সংসার পাতবে বলে। প্রদীপ্তর রাগ হয়। বিড়বিড় করে বলে, তুই একটা শুয়োরেরবাচ্চা লেখক। তোর সৃষ্ট কর্মগুলোর দিকে তোকে অমন পাছা উঁচু করে রাখতে হবে। আমি এত রেগে যাচ্ছি কেন? উপন্যাসের তিতুমীরের মতো আমার কি দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে? কেন আমি এমন দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি? ও মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে। শুনতে পায় পেছন থেকে নসিব ওকে ডাকছে। ও দাঁড়ায় না। রিকশায় ওঠে। কোথায় যাবে? নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়। নসিবের বিয়ে হলে ও একটি মানসিক আশ্রয় হারাবে, এই কষ্টটুকু ওকে শুয়োর বানিয়েছে, তাই ও ঘোঁত ঘোঁত করছে। সতীশ বুড়োর কাছে ওর আর একটি মানসিক আশ্রয় ছিলো, সেটিও এখন নেই। একবার কি দেখতে যাবে তার পোড়োভিটে? ও রিকশা ঘুরিয়ে রায়েরবাজার আসে। আশ্চর্য, কোথায় সেই পোড়াভিটে, ভিটেতে ঘর উঠেছে– ঘরের চালে মিষ্টি কুমড়োর লতা। উঠানে বসে সতীশ বুড়ো পট বানাচ্ছে। আগের চেয়ে চাহা হয়েছে শরীর, সেই নেতিয়ে পড়া ভাবটি নেই। সতীশ বুড়ো প্রদীপ্তকে খেয়াল করে না, কাজের মধ্যে ডুবে আছে, গুণগুণ করে গান গাইছে। প্রদীপ্ত সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসতেই বিস্ময়ে হাতের পট পড়ে যায়, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, কিন্তু জোড়া লেগে থাকে দু'চোখের দৃষ্টি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রদীপ্তর হাত। ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন নারী জিজ্ঞেস করে, কে এসেছে গো?

সতীশ বুড়োর গলা কাঁপে থরথরিয়ে। প্রদীপ্ত ফিসফিসিয়ে বলে, আমার হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরো দাদু, আমি যেন বুঝতে পারি তুমি বেঁচে আছো।

হ্যাঁ, বেঁচে আছি দাদাবাবু।

কেমন করে বাঁচলে? কেমন করে? প্রদীপ্তর স্খলিত কণ্ঠ।

ঘটনার দিন দুই আগে মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। দাঙ্গায় পরিবারের সব মরেছে শুনে মেয়ে আমাকে আর এদিকে আসতে দেয়নি। ওদের নিয়ে পালিয়ে যাই ইন্ডিয়ায়। কত দিন পথে পথে ঘুরলাম। মেয়ে-জামাইয়ের আশ্রয় জুটলো, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। এসে দেখি পোড়াভিটাতে ঘাস গজিয়েছে।

হ্যাঁ গো কে এসেছে, বলতে বলতে সেই নারী ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

সতীশ বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে বলে, এ হলো মধুমালতী, পথের মানুষ। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। পট বানাই।

কোথায় দেখা হলো?

পথে। সে মেলা কথা। জানতে চেও না।

BanglaBook.org

কেন জানবে না? আমি তোমাকে বলি শোনো।

থাক দিদিভাই বলতে হবে না। আমি বুঝেছি কি হয়েছে।

বুঝেছো? মধুমালতী চোখে আঁচল চাপা দেয়। ঘর ছিল, স্বামী ছিল। দাঙ্গায় সব গেলো।

বিধবা হইনি। মুসলমান ছুঁয়েছে দেখে স্বামী ত্যাগ করেছে।

স্বামী তোমাকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু মানুষ ত্যাগ করেনি। কি বলো দাদাবাবু?

প্রদীপ্ত হাঁ করে সতীশ বুড়োকে দেখে। মানুষটা এত বড়? নিজের জীবনটাকে নতুন রঙ দিয়ে পটের মতো আবার এঁকেছে।

মধুমালতী চোখ মুছে বলে, ও আমার সিঁথি থেকে সিঁদুর তুলে নিয়ে এই পটে লাগিয়েছে গো দাদাবাবু।

সতীশ বুড়ো শ্বাস ফেলে বলে, স্বামী না থাকলে আর সিঁদুর দিয়ে কি হবে?

মধুমালতী ঘরে চলে যায়। সতীশ বুড়ো ফিসফিসিয়ে বলে, সব ওপার চলে গেছে। বর্ডারে ওকে লাথ্থি দিয়ে ফেলে রেখে গেছে। পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখে আমি কুড়িয়ে এনেছি। দাদাবাবু দাঙ্গা ওর সতীত্ব নিয়েছে, আর ধর্ম ওর সিঁথির সিঁদুর নিয়েছে। আমি বলেছি, আমার পটের ধর্ম আছে। ওই ধর্ম মানুষ খায় না। চলো আমার সাথে। ঠিক করিনি?

তোমার পায়ের ধুলো দাও।

প্রদীপ্ত নিজের দুহাত বাড়িয়ে সতীশের পায়ে হাত রাখে। এই তো সত্যিকার শিল্পী।

সতীশ ছিঃ ছিঃ করতে করতে সরতে চায়, করো কি দাদাবাবু, আমার পায়ে যে কাদা।

কাদা দিয়ে কাজ করলেও তোমার পায়ে সোনা লেগে আছে দাদুভাই। তোমাকে একদিন আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো।

আমি মুখ্যু মানুষ।

প্রদীপ্ত সতীশ বুড়োর কথা শোনে না। তাকিয়ে দেখে মধুমালতীর দিকে। ও বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। সর্বস্ব হারানো একজন ধর্ষিত নারী সতীশ বুড়োর পটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপ্ত বারবার পেছন ফিরে তাকায়। দুজন মানুষ দুই ভঙ্গিতে– দু'জন মানুষ দুই জীবনবোধে– দুজন মানুষ দুই অবয়বের হলেও এক। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে দু'জনের ভেতরই আছে একজন পিকাসো– একজনের হাতে যদি মাটির পট থাকে তাহলে অন্যজনের আছে রক্ত-মাংসের চিত্রিত শরীর। ওর মনে হয় রায়েরবাজার নয়– ও প্যারিসের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে, আর কদিন পর ও একটি গর্ভবতী ছাগলের লোহার ফিগার বানাবে।

সে রাতে প্রদীপ্তর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। ওর না ফেরা পর্যন্ত আলী আহমদ পুষ্পিতা দু'জনে জেগেই থাকে। সারা দুপুর ঘুমুনোর ফলে পুষ্পিতার ঘুমও আসে না। আলী আহমদ মাথার কাছে বসে পুষ্পিতার চুলে বিলি কাটে। গুনগুনিয়ে গান গায়। এক সময় পুষ্পিতা বলে, জুলেখা মরার পর তুমি কেমন বুড়িয়ে গেলে?

চমকে ওঠে আলী আহমদ। বলে, তা কেন শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

পুষ্পিতা অদ্ভুত এক বিষণ্ন গলায় বলে, আমি উদ্বাস্তু মানুষ। এই দেশে আপন কেউ নেই। তাই তো তোমাকে কোনোদিন কিছু বলা হয়নি।

ছিঃ পুষ্পিতা, ছিঃ। নিজেকে ছোট করতে নেই। তুমি আমার স্ত্রী, এ সত্য আমার কাছে অনেক বড়।

পুষ্পিতা আর কথা বলে না। ওর গলা বুঁজে আসে, যেন এক গভীর বেদনার দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ও নিজের বুকের দরজা টান দিয়ে খুলে ফেলেছে। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ সে জায়গাটি। ও আর পারছে না বয়ে বেড়াতে।

BanglaBook.org

পুষ্পিতার এই কথায় স্তব্ধ হয়ে থাকে আলী আহমদ। এই পুষ্পিতাকে ও চেনে না এবং পুষ্পিতা যে অন্যরকম কোনো মানুষ তা ও কখনো ভাবেনি। শুধু স্ত্রী, এই সত্যের বাইরে পুষ্পিতাকে ও কি অন্যভাবে বুঝতে চেয়েছে? না চায়নি। প্রবল আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আলী আহমদ। নিজের অজান্তেই পুষ্পিতার মাথা থেকে হাতটা সরে যায়।

ভোরবেলা প্রদীপ্ত আলী আহমদকে বলে, বাবা সতীশ বুড়ো আবার জীবন এঁকেছে। মনে হয়েছে এ আঁকা ওর পটের ওপরের আঁকার চেয়েও সুন্দর। বিবাহিত জীবনের বাইরে এক অদ্ভুত সংসার। আমি যেন জীবনের একটা গভীর অর্থ খুঁজে পেয়েছি।

আলী আহমদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, জীবনের এ সত্যকে ধরে রাখা কঠিন দীপু।

না বাবা, বেশি কঠিন না, মনের জোর থাকলেই হয়।

আলী আহমদ ভেবে পায় না ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে মনের জোর কতটা সম্পৃক্ত? গতরাতে পুষ্পিতা ওকে কঠিন কণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছে। কত নমনীয় ভঙ্গি, অথচ কত প্রবল তার জোর।

৯

প্রতীক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে। সঙ্গীত ওর প্রিয় বিষয়। আর বছরখানেকের মধ্যে গানের স্কুলের পাঠ চুকবে। ভাবতেই বেশ ভালোলাগে। রেডিওতে অডিশন দিয়েছে। ওর ধারণা পাস করে যাবে। তখন বেশ একটা নিয়মিত প্রোগ্রাম পাবে। হেঁটে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথে কখনো কোথাও থমকে দাঁড়ালে ওর মনে হয়, চারদিকে এখন ওর সময়– সময় ওর নাগালের মধ্যে এবং এই সময়কে ওর গড়ে নেয়া উচিত। পরক্ষণে ভাবে মানুষ কি সময় গড়ে নিতে পারে? মানুষের সাধ্য কতটুকু। কিন্তু না, প্রবলভাবে মাথা নাড়ে ও। সময় মানুষই গড়তে পারে, সময়ের সাধ্য কি মানুষের গড়াটুকু তছনছ করে দেয়া? তবুও খটকা থেকে যায় মনে। তাহলে বলা হয় কেন সময়ই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক? কালের পৃষ্ঠায় কি টিকবে, কি টিকবে না তা তো সময়ই নির্ধারণ করে। সময়ই মানুষকে মুছে ফেলে, সময়ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। এসব ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায় প্রতীকের। ও কি পারবে তেমন কিছু করতে যেটা সময়ের বিচারে টিকে যাবে। নিজে নিজে হাত উল্টোয়। অত সহজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় সভা হচ্ছে। বক্তৃতা করছে কেউ। ও জানে চারদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক টালমাটাল সময় যাচ্ছে। পঁয়ষট্টি সালে যেদিন যুদ্ধ শেষ হয়েছিলো, সেদিন প্রদীপ্ত ঠিক আগের মতো প্রতীকের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলো, এখন থেকে আমাদের বলতে হবে পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিলো চৌষট্টি সালের দাঙ্গার সময় এই শিরোনামে একটি প্রচারপত্র প্রদীপ্ত ওকে দিয়েছিলো। এখন রুখে দাঁড়ানোর প্রশ্ন উঠেছে। তখনতো রুখে দাঁড়ানোর কারণ ঘটেছিলো। এখনো ঘটেছে। রুখে দাঁড়াতেই হবে। ওর খুব কাছের বন্ধু আজিম, ধানমণ্ডিতে থাকে, বাবা ব্যবসায়ী, অঢেল টাকা ওদের। কিন্তু আজিম অন্যরকম। দু'জনে কতদিন ধানমণ্ডিতে লেকের ধারে বসে থেকেছে– কত হাজার কথা আলোচনা করেছে। এইচ. এস. সি. পরীক্ষার পর ও আজিমের সঙ্গে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার বেড়াতে

BanglaBook.org

গিয়েছিলো। নীল সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়া বেলাভূমি আর ওপাশে হিমছড়ির পাহাড়– খুলে দিয়েছিলো ওর দৃষ্টি– ও বুঝতে শিখেছিলো যে দেশ মানেই শুধুই একটি ভূখণ্ড নয়– দেশ আরো কিছু। বিশাল বড় একটি ক্যানভাসের ওপর জীবনের ছবি আঁকা। এই ছবির সঙ্গে কখনোই কোনো উল্টো মাত্রার যোগ হয় না। যোগটা নিজের হতে হয়– প্রাণের হতে হয়।

বেলাভূমিতে দাঁড়ালে ওর দু'কান ভরে বাজে সেই অনির্বচনীয় সঙ্গীত– যখন তা গভীর হয়, গভীরতায় গাঢ় হতে থাকে, তখন তা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ হয়ে ওকে সেই অলৌকিক জগতে নিয়ে যায় যেখানে পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ভূখণ্ড শুধু আর ভূখণ্ড থাকে না– সেটি সহস্র মানুষের মুখ হয় এবং সে মুখ থেকে সুর প্রবাহিত হয়ে যায় নদীর মতো। যেন রবীন্দ্রনাথ বলতে থাকে 'ভৈরবী সুরে মোচড়গুলো কানে এলে মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ভৈঁরো যেন ভোর-বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ। মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুরণন, না থাকে ঘড়ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব-বিলাসী তাকে অবান্তর বলে নিন্দা করে না। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা। মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস। পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। বাতাসে ভূপালি সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি 'থামরে থাম, আয়রে আয়।' পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রা বিহ্বলতা। সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর– যাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নেই, তাই সেটি আমাদের বিবাহ-উৎসবের রাগিনী। কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি। খাম্বাজের করুণ তান শহর আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।' রবীন্দ্রনাথের বলা এই সুরের মোচড়গুলো ওর ভেতর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মতো অবিরাম পড়ে এবং ভেতরটা ধোঁয়াটে করে রাখে। ও বুঝতে পারে সেই ধোঁয়াটে কুয়াশাময় অবস্থানের মধ্য থেকে ও বেরুতে পারে না। না পারায় ওর ক্ষতি নেই। সেটা ওর নিরন্তর আনন্দ। এই মুহূর্তে ছাত্রদের বক্তৃতার উত্তেজিত, উদ্দীপিত কণ্ঠও তেমন হয়ে ওর কানে লাগছে– যে লাগাটা ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত, যে ভূখণ্ডের শেষ সীমানাটুকু পর্যন্ত খাম্বাজের করুণ তান যেন আঁচল বিছিয়ে রাখে। প্রতীক অনুভব করে ওর ভেতরে ভীষণ রকমের ভাঙচুর চলছে। সেই ভাঙচুরে ওর বন্ধ দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে। ও তন্ময় হয়ে ছাত্র-নেতাদের বক্তৃতা শোনে। কোনো এক ফাঁকে ওর বন্যার কথা মনে পড়ে। বন্যা এখন হলিক্রস স্কুলের ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে ওর আরো চার বছর বাকি। বন্যা দারুণ গায়– বড় হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠ। শ্রোতারা বলে বন্যার কণ্ঠ মন ছুঁয়ে যায়। প্রতীক হাসে। মনে মনে বলে, শুধু কণ্ঠ নয়– বন্যা আমার সবটুকু ছুঁয়ে যায়। কবে আমি ওকে এই কথাগুলো বলতে পারবো? সেইতো কবেই শুরু, সেই প্রজাপতি ধরার দিন থেকে। তখন ছাত্র-নেতার প্রবল কণ্ঠে এলোমেলো হয়ে যায় ওর ভাবনা। ও উঠে দাঁড়ায়। পিছু হটে আসে। হাঁটতে শুরু করলে শুনতে থাকে, এমনিতে ছয় দফা আন্দোলন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে হয়রানি ও জেল-জুলুমের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গবাসী ক্ষিপ্ত– এর মধ্যে মোনায়েম খানের সদম্ভ ঘোষণা 'যতদিন আমি ক্ষমতায় আছি শেখ মুজিবকে আর কারাগারের বাইরে আসতে হবে না'– তাই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা চলছে। তবে প্রতিটি মামলাই বিচারে অমূলক প্রমাণিত হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে আসে প্রতীক। এখন আর মাইকের স্পষ্ট শব্দ নেই– কণ্ঠস্বর বোঝাও যায় না। এইসব কথা ও নিজেও জানে। ওর মনে হয় এখন একটা বারুদে-সময়। জ্বলবে বুঝি– ফস্ করে দাউদাউ ছড়িয়ে যাবে। তানসেনের দীপক রাগের মতো।

তানসেনের গল্পটা ওর প্রিয় গল্প। বন্যা অনেকবার ওর কাছ থেকে গল্পটা শুনেছে।

BanglaBook.org

কিন্তু বর্তমান সময় যেন গল্পটার জন্য ভিন্ন প্রেক্ষিত তৈরি করেছে। যে আগুন জ্বালে সে নেভাতেও জানে। যে আগুন নিয়ে খেলে খেলার শক্তি তার ভেতরেই থাকে– তার করোটির খোলা অংশে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ জ্বলে উঠলে মেঘমল্লার গেয়ে ওঠে কেউ– বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি।

ও হাঁটতে হাঁটতে নিমতলি আসে। এখানে ওর একটি প্রিয় চায়ের দোকান আছে। প্রায়ই আড্ডা দেয়। আড্ডা দেবার কেউ না থাকলে চা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। টেবিলের ওপর নীল মাছির খেলা দেখে। নীল রঙের মাছিটা উড়ে আসে– দূরে যায়– উড়ে আসে। দোকানদার খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। প্রতীকের মনের ভেতর তানসেনের গল্প প্রবল হয়ে ওঠে। আকবর তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন তানসেন– যিনি সঙ্গীতের 'তান' দিয়ে 'সেন' করতে পারেন অর্থাৎ হৃদয় গলিয়ে দিতে পারেন তিনিই তানসেন।

বাদশাহ আকবরের প্রিয়পাত্র তানসেন– তাঁকে ছাড়া তাঁর দিন অচল। বাদশাহর অন্তঃপুরে তানসেনের অবাধ গতি। ভোরে ও রাতে তাঁর গৃহে তানসেনের গান ছিলো বাঁধা– তাছাড়া বাদশাহ যখন চাইতেন তখন তাঁকে গাইতে হতো। ভৈরব রাগে পারদর্শী ছিলেন তিনি। এ রাগ দরবারে গাইতেন না। বাদশাহের যখন ঘুম ভাঙতো সেই ভোরবেলা এই রাগ অন্দরে আলাপ করতেন তানসেন। তানসেন কানাড়া এত ভালো গাইতেন যে বাদশাহ কানাড়াকে মিঁয়াকি রাগ অর্থাৎ তানসেনের রাগ বলতেন। তাঁর এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন অন্যান্য ওস্তাদরা। তাদের বুক পুড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে তানসেনকে মেরে ফেলার উপায় বের করে। বাদশাহকে গিয়ে বলে, বাদশাহ নামদার আমরা কখনো দীপক রাগ শুনিনি। এই রাগ শুনে আমরা নিজেদের ধন্য করতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করলে আমরা এ রাগ শুনতে পারি। মিঁয়া তানসেন ছাড়া এ রাগ আর কেউ গাইতে পারেন না। এই রাগ শোনানোর ব্যবস্থা করে আপনি আমাদের কৃতার্থ করুন জাঁহাপনা। বাদশাহ ওদের চক্রান্তের কথা বুঝতে পারেন না। তানসেনকে বলেন, মিঁয়া তানসেন আমি দীপক রাগ শুনতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করুন।

তানসেন চমকে ওঠেন। তিনি জানেন, এই রাগ গাইলে তাঁর শরীরে আগুন জ্বলে উঠবে। তিনি মারা যাবেন।

কিন্তু বাদশাহ অতশত বুঝতে চাইলেন না। তাঁর ভীষণ কৌতূহল, শুনবেনই দীপক রাগ।

অগত্যা তানসেনকে রাজি হতে হলো। তিনি পনেরো দিন সময় চাইলেন।

তাঁর চিন্তার শেষ নেই। কারণ দীপক রাগের তেজ মর্ত্যের গায়ক সহ্য করতে পারে না– শরীর জ্বলে যায়। এর প্রতিরোধের একমাত্র উপায় কেউ যদি সুরের শীতল আবাহনে সে আগুন নেভাতে পারে। তানসেন ভাবেন, ভাবতে থাকেন। তিনি জানেন দীপকের তেজে যেমন আগুনের সৃষ্টি হয়, মেঘরাগের দ্বারা তেমনি বারিধারা নামে। তাঁর কণ্ঠে দীপক রাগ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে তখন যদি কোনো সাধক মেঘরাগ গায় তবেই তাঁর জীবন রক্ষা পেতে পারে।

তানসেন তাঁর মেয়ে সরস্বতীকে মেঘরাগে তালিম দিতে শুরু করলেন। কঠিন সাধনা। রাতদিনের সাধনায় সরস্বতী মেঘমল্লার আয়ত্ত করলেন। তিনি মেঘকে আহ্বান করবেন। প্রস্তুতি শেষ। তানসেন বাদশাহকে জানালেন যে তিনি দীপক রাগ গাইবেন। এই সংবাদ দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হয়ে গেলো। এক পক্ষ ধরে হাজার হাজার লোক দিল্লী নগরীতে জমা হতে লাগলো। মানুষের উৎসাহের অন্ত নেই– কৌতূহলের শেষ নেই। সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য বিশাল আয়োজন করেছেন বাদশাহ। ভিন্ন দেশের মিত্র ও সামন্ত

BanglaBook.org

রাজাদের আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। তাঁরা বাদশাহর আতিথ্য গ্রহণ করে আসতে শুরু করেছেন। দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে– চারদিকে লোকে লোকারণ্য। সকালবেলা তানসেন দীপক রাগের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন– একই সঙ্গে বাড়িতে তাঁর মেয়ে মেঘরাজের যজ্ঞ শুরু করে। যেন মুহূর্তের জন্যও দু'জনের মধ্যে সময়ের হেরফের না হয়। সভার চারদিকে অসংখ্য প্রদীপ দেয়া ছিলো। তানসেন বাদশাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন যে প্রদীপগুলো জ্বলে ওঠা মাত্রই তিনি গান বন্ধ করে দেবেন। শুরু হয়েছে গান। প্রথম আলাপের পর সভাপ্রাঙ্গণের সমাবেশের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়– প্রত্যেকে অনুভব করেন যেন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপ ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। দ্বিতীয় আলাপের পর তানসেনের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। তৃতীয় আলাপে গায়ে তাপ শুরু হয় এবং চতুর্থ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপগুলো জ্বলে ওঠে। সভায় আগুন লেগে যায়– লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে। তানসেনের শরীরে আগুন। ছুটে যাচ্ছে নিজের বাড়ির দিকে। সরস্বতী ততক্ষণে গান শুরু করেছে। প্রথম আলাপে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে– আঁধারে ঢেকে যায় চারদিক। দ্বিতীয় আলাপে ঘোর ঘনঘটায় আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টি নামে। শীতল হয় তানসেনের দগ্ধ শরীর।

গল্পটা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায় প্রতীক। কেবলই মনে হয় বাতাসে এখন দীপক রাগের আলাপ। প্রদীপগুলো জ্বলার অপেক্ষায়। মুহূর্তে চিন্তাটা আবার নিজের ভেতর এসে যায়– বন্যাকে যেদিন ভালোবাসার কথা বলবে সেদিন এমন করেই বলবে, মেঘমল্লার গেয়ে বৃষ্টিধারা বইয়ে দাও বন্যা। দু'জনে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হৃদয়ের দীপক রাগ শীতল করে ফেলি। আমরা মেঘমল্লারের সাধনাই করবো বন্যা।

দোকানের ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়ায়, আর এক কাপ চা দিমু স্যার?

দিবি? দে।

ডালপুরি?

না।

ছেলেটি চায়ের কাপ উঠিয়ে নিয়ে যায়। নীল মাছিটা এখন সামনে নেই। কড়া দুধের গন্ধ ওটাকে টানে– কখনো ওটা জোড়ে আসে। নীল পাখা চক্‌চক্ করলে প্রতীকের নীল বেনারসির কথা মনে হয়। এটা মনে হতেই ওর সবকিছু দারুণ ভালোলাগে। শিক্ষক যখন ক্লাসে শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি পড়ায় ওই ভালোলাগার সময় ট্র্যাজেডিগুলো আর ট্র্যাজেডি থাকে না– আপন ভাবনায় ও সবগুলো কমেডি করে নেয়।

পরদিন ভোরবেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ও। আলী আহমদ তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। অনেক রাত পর্যন্ত পরীক্ষার খাতা দেখতে হয়েছে। পুষ্পিতা রান্নাঘরে। প্রদীপ্ত ঘরে শুয়ে আছে। ওর জ্বর। প্রতীক চেঁচামেচি করে বাবাকে ঘুম থেকে ওঠায়।

বাবা দেখো, অবস্থাটা দেখো?

আলী আহমদ হাই তুলে বলে, কি হয়েছে?

পিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলছে। অথচ সেখানে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথের স্থান নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়েছে।

আলী আহমদের শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি কাগজটা।

আলী আহমদকে কাগজটা দিতে দিতে প্রতীক তিক্ত কণ্ঠে আকস্মিকভাবে জিজ্ঞেস করে, এখন কার সময় বাবা? তোমার না আমার?

আলী আহমদ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, আমাদের সবার।

নিজের ঘরে বসে বাবার উত্তর শুনে প্রদীপ্ত থমকে যায়। ভাবে, নসিব ওর উপন্যাসে

BanglaBook.org

বলেছে সময়টা কিশোর তিতুমীরের। কারণ লড়াইতে ওর দাদা মরেছে, বাবা মরেছে। তাই সময়টা তিতুমীরেরই হয়। তাহলে ওদেরও কি এমন জীবনই সামনে? লড়াইয়ে হারিয়ে যাবে দাদা, বাবা? কয় পুরুষ লড়তে হবে আমাদের? প্রদীপ্ত বিড়বিড়িয়ে নিজেকে বলে। ততক্ষণে আলী আহমদ কাগজটা পড়ে ফেলেছে। প্রতীকের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, কী ঔদ্ধত্য, কী সাহস ওদের।

প্রতীক কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে যায়। আবার খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করে। পড়ার পর ওর মনে হয় সরকারি দলের নেতা সবুর খান জাতীয় পরিষদে যা বলেছে তার সারমর্ম করলে এই দাঁড়ায় যে, পূর্ব বাংলার অন্তত সাংস্কৃতিক তৎপরতা তিনি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছেন। পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপ এখন অনুসৃত হচ্ছে। পয়লা বৈশাখ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভারতের সাধারণ নির্বাচনের পর এ ধরনের কার্যকলাপ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানা হবে।

প্রতীক এই সারমর্মটুকু নিজের ভেতর ভালো করে গেঁথে নেয়। ধরে নেয় এই গেঁথে রাখার মধ্য দিয়ে ও লড়াইয়ের প্রেরণা টিকিয়ে রাখবে। পড়া হলে কাগজটা খাটের নিচে ফেলে দেয়। খচে যাওয়া মনটাকে বাগে আনতে পারে না। মনে হয় সারাটা দিন বুঝি নষ্টই হলো। দু'দিন পর আবার বিস্ফোরণ। পত্রিকার খবরের শিরোনাম ঃ 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করা হবে না।'

প্রতীক আলী আহমদকে কাগজটি দিতে দিতে বলে, বাবা নাও এবার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

আলী আহমদ খবরটি পড়ে চুপ করে থাকে। ভেতরে প্রচণ্ড অবসাদ, উত্তেজিত হতেও পারছে না। যেন সবটাই ধ্বসে গেছে। প্রতীক কাগজটা দিয়ে বাথরুমে গিয়েছিলো। ফিরে এসে বলে, বাবা কেমন লাগছে?

আলী আহমদ ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকায়। মনে পড়ে ছেলেটির জন্মের কথা– মনে হয় এইতো সেদিন কালো খালা ট্রেনের চেন টানতে বললো, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত ছিলো– এক বিরান জনপদে থেমে গেলো ট্রেনটা। ট্রেনের সব মানুষেরা একটি জন্মের প্রহর গুনছিলো। সবাই উৎকণ্ঠিত, কারণ একজন মানব শিশু আসছে। ট্রেনের কামরায় জন্মালো ছেলেটি। কী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় জীবনের কয়েকটি ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছিলো। চোখ বুজলেই মনে পড়ে। মনেতো পড়বেই, মানুষের জন্মতো ঈশ্বরের পৃথিবীতে এক অসাধারণ ঘটনা– মানুষের জন্মইতো টিকিয়ে রাখছে সব সত্যের সারৎসার। সেই ছেলেটি আজ ওর দিকে তাকিয়ে আছে, যন্ত্রণা এবং কৌতুকের হাসি নিয়ে। যে রবীন্দ্রনাথকে ওর বাবা বাঙালি জাতির অস্তিত্ব মনে করে, তাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি ঘাম ঝরাচ্ছে। ছেলেটির হয়ে-ওঠার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছে। ছেলেটি নিজেও জানে ও কোনো ভুল করছে না।

আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছো কেন?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, তোকে দেখতে আমার ভালো লাগছে।

যাহ্ কী যে বলো।

হ্যাঁ রে সত্যি, এই যে তুই বড় হয়ে গেলি আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

বাবা তোমার রাগ হচ্ছে না?

ছেলেরা বড় হয়ে গেলে বাবাদের রাগ হবে কেন?

বাবা ঠাট্টা কোরো না। তুমি কথা ঘোরাচ্ছো। আমার প্রশ্নের জবাব দাও?

তোর প্রশ্ন যেন কি ছিলো?

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার কেমন লাগছে?

আমার গায়ের চামড়াটা খুলে নিয়ে কেউ ডুগডুগি বানালে আমার এত খারাপ লাগতো না জিতু।

বাবা? প্রতীকের কণ্ঠে আর্তনাদ বয়ে যায়।

আলী আহমদ সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে বলে, আবার প্রতিবাদ, আবার প্রতিরোধ।

প্রতীক জোরের সঙ্গে বলে, আসলে এটুকুই তোমার কথা।

আলী আহমদ সকৌতুকে তাকায়, বাকিটা?

বাকিটা তোমার আবেগ।

ক্লাসে যাবি না?

যাবো।

প্রতীক বলতে বলতে রান্নাঘরে যায়। এখন গরম চা চাই। সঙ্গে পরোটা আর আলু ভাজা।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় চারদিকে। পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি বেরুতে থাকে। ঘোষণার সমর্থনে দু'তিনটে বিবৃতি প্রকাশিত হয়। একটিতে স্বাক্ষর করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক। অন্যটিতে স্বাক্ষর করে চব্বিশজন সংস্কৃতিসেবী। তিরিশজন মওলানাও বিবৃতি দেয়। জুলাই মাসের এক তারিখে 'আজাদ' পত্রিকায় সে বিবৃতি পড়ে হাসতে হাসতে পেট ফাটে প্রতীকের। ও কিছুতেই রাগতে পারে না। একসময় বিবৃতির খানিকটা অংশ নিজের একলা ঘরে জোরে জোরে পড়ে ঃ পাকিস্তান এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচী লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানীরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোন প্রচেষ্টাই বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল।'

এসবের মাঝে সরকারি ঘোষণার প্রতিবাদ ছিলো ব্যাপক। প্রথমে উনিশজন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন।

এই প্রতিবাদের শুরু আর থামে না। ঝড়ের মতো বয়ে যায় প্রতিবাদ– যার গতি তীব্র এবং একমুখী। মওলানা ভাসানী, ঢাকার এগারোজন উর্দু কবি, তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান, প্রাদেশিক পরিষদের স্বতন্ত্র দলের নেতা থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দাবি করেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বঙ্গসংস্কৃতির ওপর হামলা হলে বায়ান্নোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। শুধু বিবৃতি বা সভা অনুষ্ঠান নয়– বিক্ষোভ মিছিলও হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে বারবার বাবার কথা মনে হয় প্রতীকের। প্রতিবাদ সভায় বক্তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে মিলিটারির হাতে মার খাওয়া প্রদীপ্তর পিঠটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতীকের তখন এইসবের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে লড়তে ইচ্ছে করে।

আন্দোলনের এই তীব্রতায় সরকারের টনক নড়ে। শেষে জাতীয় পরিষদে বিবৃতি দিয়ে তথ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হন

BanglaBook.org

সবুর খান। জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের শেষের দিনেও দম্ভোক্তি কমে না তার। সেদিন তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে তিনি ক্রুদ্ধ ভাষায় বলেন, ড. রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যারা আন্দোলন করছে সেসব Howling idiot-দের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি নেই।

দীর্ঘ বক্তৃতাটি পড়ার পর কাগজটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও আবার মুড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেয় প্রতীক। প্রতিদিন একটি খবরকাগজের ওপর রাগ ঝেড়ে কি লাভ? ঘরে পায়চারি করে। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, আন্দোলনকারীরা Howling idiot? আমি, আমার বড়ভাই, বাবা সবাই এই দলের? আর তুমি, সবুর খান, জারজ সন্তান, তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি। তাই থাকো, পাকিস্তানিই থাকো। তোমার মতো জাউরাদের বাঙালি হবার দরকার নেই। তাহলে ভিটেমাটি উপড়ে ওখানে চলে যাও না কেন? খুব অশ্লীল ভাষায় অনেকক্ষণ গালাগাল করে।

একসময় ওর মনে হয় ওর সামনের দিনগুলো কেমন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পালাবদলের মতো এও যেন সাংস্কৃতিক চেতনার স্তর। ওকে, এই স্তর পেরুতে হবে– আবার নতুন পলি পড়বে– সে পলিতে বুনতে হবে– কি বুনতে হবে? ও নিজেকে প্রশ্ন করে না, এখন এটা বোনার সময় না– এটা জ্বলার সময়। সবুর খানরা পূর্ব বাংলা নামক তানসেনকে দীপক রাগ গাইতে বলছে– বলছে পুরো মরতে– চাইছে মৃত্যু। ইসলামী সংস্কৃতির কাছে বাঙালি সংস্কৃতির মৃত্যু। ওরা তো জানে না তানসেনরূপী পূর্ব বাংলা দীপক রাগ গাইবে– সঙ্গে সঙ্গে মেঘমল্লার গাইবার জন্যও তৈরি হয়ে আছে শত শত মানুষ– এ রাগ শেখাতে হয় না। প্রত্যেকের বুকের ভেতর থেকে বেজে ওঠে এ রাগ। আসে বৃষ্টি-স্নিগ্ধ বৃষ্টি– শ্যামল হয় ধরিত্রী। ভাবতেই মন কেমন কোমল হয়ে আসে প্রতীকের। মনে হয় এতক্ষণে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। আরো স্থিত হতে চাই– আরো গভীরে প্রবেশ করতে চাই। ও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়। বাইরে কুর্চি ফুলের গাছ। ওর প্রিয় ফুল। বসন্তে শুরু হয়েছিলো ফুল ফোটা– এখন বর্ষা, ফুল কমে এসেছে, তবে পাতার কোলে সাদা ফুল না খুঁজেই পাওয়া যায়। চমৎকার গন্ধ। বসন্ত থেকে বর্ষা পর্যন্ত মৃদু গন্ধে ভরে থাকে ওর ঘর। ঢাকায় আসার পর প্রথম যেদিন বলধা গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলো সেদিন পুষ্পিতা একটি চারা নিয়ে এসেছিলো। বলেছিলো, এই ফুল গাছটা আমার বাবার খুব প্রিয় ছিলো। এর পাতা বা ডাল ভাঙলে সাদা রঙের কষ বের হয়। আমাদের এলাকায় এর নাম ছিলো ক্ষীরি বৃক্ষ। এটা দীপু আর জিতুর জানালার পাশে লাগাবো। ফুলের গন্ধে ঘুম আসবে ওদের।

প্রতীক জানে পুষ্পিতা খুব যত্ন করে গাছটা বড় করেছে। যেদিন প্রথম ফুল ফুটেছে সেদিন বাবার কথা মনে করে খুব কেঁদেছিলো পুষ্পিতা। সে রাতে ওদের সবার মন খারাপ ছিলো। ওরা মাকে কত আদর করেছিলো, শহরের গল্প বলেছিলো, ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা বলেছিলো। তারপর আলী আহমদ সবাইকে হাজীর বিরিয়ানি খেতে নিয়ে গিয়েছিলো। শুকনো কাঁঠাল পাতার ঠোঙায় বিরিয়ানি খেয়ে খুশি হয়ে ঘরে ফিরেছিলো ওরা। এই মুহূর্তে প্রতীকের মনে হয় কিছু কিছু স্মৃতি থাকে যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কিছু কিছু স্মৃতি লালন করে মানুষ সুখ পায়। সুখের কথা ভাবতে ভাবতে ও ঘর ছেড়ে উঠোনে নামে। কুরচি গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। কত নামে যে ডাকা যায় তোমাকে, কুটজ, ইন্দ্রযব, গিরিমল্লিকা। প্রদীপ্ত সবসময় গিরিমল্লিকা বলে। বলে, জানিস বসন্তে রমনায় যখন গিরিমল্লিকা ছেয়ে যায় তখন আমার কবি হতে ইচ্ছে করে। এমন সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারি না বলে নিজের ওপর রেগে যাই।

প্রদীপ্তর এই কথা ভাবতে ভাবতে গাছটির কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটি ডাল টেনে নেয় প্রতীক। ঘন-পাতার গাছ। অথচ শীতের শেষে সব পাতা ঝরে যায়। বসন্ত আরম্ভ হওয়ার

BanglaBook.org

সময় কচিপাতা আসার আগে অজস্র ফুল ফোটে। থোকায় থোকায় ছোট ছোট মঞ্জুরী হয়। ও এক থোকা ফুল নাকের কাছে নিয়ে আসে, গন্ধ তীব্র কিন্তু মিষ্টি। ফুলের নিচের অংশ নলের আকারের মতো। দুধ-সাদা রঙ পবিত্র, স্নিগ্ধ– ওর মনে হয় এই রঙ মা'র স্মৃতির উপযোগী। স্মৃতির রঙ হয় না, কিন্তু কোনো কোনো স্মৃতি এমন যে তা রঙিন। একদিন পুষ্পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, মা তোমার বাবা এই গাছটাকে এত পছন্দ করতো কেন?

এই গাছের ভেষজ গুণের জন্য। ফুল, বাকল, ফল সবই আমাশয়ের ওষুধ। শুধু কি তাই? কত যে উপকারী গাছটা। এর বাকলে চর্মরোগ সারে। রক্তদোষে ফুল খুব কাজ দেয়। ব্রংকাইটিস, বাত, ফোঁড়া, ক্ষত ও মুখ-ক্ষতের জন্য পাতা কাজে লাগে।

হয়েছে বাপু থাম, থাম– তুমিও দেখছি সব মুখস্থ করে রেখেছো।

পুষ্পিতা উদাস কণ্ঠে বলে, জানিস, বাবা যখন এসব ওষুধ বানাতো আমি বাবার সঙ্গে থাকতাম। বাবা আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছিলো। বাবা বোধহয় আমাকে অন্য ভাইবোনের চেয়ে বেশিই ভালোবাসতো রে। আমি বাবার খুব ন্যাওটা ছিলাম।

বাবার কথা উঠলেই পুষ্পিতার চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। সেদিন খেতে পারতো না। চোখের পানি মুছতে মুছতে আঁচল ভিজে যেত। পরে ওরা তিনজনে ঠিক করে পুষ্পিতার সামনে তার বাবার প্রসঙ্গ আর কখনো ওঠাবে না। কখনো কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে আলী আহমদ চট করে অন্য কথায় চলে যেত। দীর্ঘদিন এ বাড়িতে পুষ্পিতার বাবা আড়াল হয়ে আছে।

হঠাৎ করে প্রতীকের মনে হয় এই গাছ কি ওর কোনো স্মৃতি হবে? ভাবতেই বুকটা ভরে ওঠে। মনে হয় এ ফুলের মিষ্টি গন্ধ বন্যার উপস্থিতির মতো– ওর সঙ্গে কথা বললে এমন এক স্নিগ্ধ আনন্দদায়ক বোধে চারদিক ভরে ওঠে। ও দু'হাতের মুঠোতে করে কুরচির গুচ্ছ নাকের কাছে উঠিয়ে এনে বড় করে শ্বাস টানে, যেন হৃদয়ে ফুসফুসে ঢুকে যাচ্ছে বন্যা– রক্তের সঙ্গে বন্যার মাখামাখি। তখন ও নিজেই নিজেকে বলে, বন্যা আমার গিরিমল্লিকা, স্মৃতি, তীব্র স্মৃতি, রঙিন স্মৃতি। কোনোদিন ভুলবার নয়। ওকে আমি গিরিমল্লিকা ডাকবো।

তখন পুষ্পিতা ওর পেছনে এসে দাঁড়ায়, কি রে এখানে কি করছিস?

কিছু না মা। গাছটা দেখছিলাম। আর কুরচি গাছ নিয়ে তুমি একটি গল্প বলতে না তা মনে পড়ছিলো।

গল্প নয় রে কিংবদন্তি।

তুমি গল্পটি বলতে খুব আনন্দ পেতে মা।

আনন্দ পেতাম কেন জানিস? গল্পটি যে আমার বাবা আমাকে বলতো। বাবার গল্প আমাকে–

প্রতীক প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য দ্রুত উচ্চকণ্ঠে বলে, রামায়ণের হনুমান চরিত্রটি আমার খুব প্রিয় মা।

পুষ্পিতা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, রামায়ণের হনুমান একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে অমৃত দিয়ে জীবিত করেন। ঠিক সেই সময় হনুমানের গা থেকে এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়ে যায়।

প্রতীক মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তারপর কি হয়েছিলো আমি জানি। সেই এক ফোঁটা অমৃত থেকে কুরচি গাছের জন্ম।

বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি এই গল্প।

শুনবেই, বাবারা বাচ্চাদের গল্প বলতে ভালোবাসে।

BanglaBook.org

ছেলের হালকা কথার ঢঙে পুষ্পিতা হেসে ফেলে। বলে, তুইও ঠিক আমার বাবার মতো কথা বলছিস।

এই গাছের ওষুধ দিয়ে তোমার বাবা কত লোকের অসুখ সারিয়েছে মা?

অনেক। একটু থেমে বলে, আমি এখানে কেন এসেছি জানিস?

কেন মা?

কাল রাতে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি।

বলতে বলতে পুষ্পিতার চোখে জল আসে। প্রতীক মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ আমার মনটা খুব খারাপ মা। তোমার চোখে পানি দেখলে ভাতই খেতে পারবো না। তুমি তো জানো না সকাল থেকে ভীষণ রাগে নিজেকে ঠাণ্ডা করতে পারছিলাম না। এই প্রিয় গাছটি আমাকে স্বস্তি দিয়েছে মাগো। এই গাছ শুধু শরীরের রোগ সারায় না। মনকেও শান্ত করে। পুষ্পিতা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়।

মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ও বলে, হ্যাঁ মা, ঠিকই বলছি। তোমার মতো এই গাছও আমার জীবনে দারুণ স্মৃতি হবে। আমি একে গিরিমল্লিকা বলেই স্মরণ করবো।

পুষ্পিতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। প্রতীকের হাত ধরে গদগদ কণ্ঠে বলে, তুই আমার বাবা, বাবা।

প্রতীক মনে মনে হাসে। মা কত সহজে অভিভূত হয়ে গেলো। জানতে চাইলো না কেন কুরচি ফুল গিরিমল্লিকা নামে ওর কাছে স্মৃতি হলো। জানলো, প্রতীক একজন বাবাকে একজন মেয়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। ও ভাবে, আহা মা কত সরল! কত ভালো।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিতর্ক সম্পর্কীয় গত কয়েকদিনের পেপার কাটিংগুলো যত্ন সহকারে একটি খাতায় পেস্ট করেছে আলী আহমদ। ওর ধারণা এগুলো একসময় সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার সহায়ক হবে। পক্ষে-বিপক্ষে সবরকম খবরই রেখেছে, কোনোকিছু বাদ দেয়নি। রাতে ভাত খেয়ে সেই খাতাটা নিয়ে পড়তে বসে আলী আহমদ। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের কুখ্যাত উক্তিটি, যিনি আইয়ুবের পেয়ারের লোক।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে বিতর্কের সময় গভর্নর হাউসে পাকিস্তানবাদী কবি-সাহিত্যিকদের ডেকে রেগেমেগে বলেন, 'আপনারা কি করেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?' সেদিন তার সমর্থক ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরাও এই কাণ্ডজ্ঞানের বহর দেখে না হেসে পারেনি। এটি মুখে মুখে চালু হয়ে গেছে জোক হিসেবে। এ ওকে দেখে বলে, কি রে বেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারিস না? আলী আহমদ পাতা ওল্টাতে গিয়ে কথাগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয়, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদেরই শাসকগোষ্ঠী পছন্দ করে। কেননা এদের দিয়েই নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। আসলে এদের ভেতরের সাংস্কৃতিক বোধের শূন্যতাই এদের বড় শত্রু। এরা তা বুঝতেও পারে না। ও পাতা উল্টে যায়। বাঙালি সংস্কৃতিতে এই বিতর্কের অভিঘাত, এমন একটি বিশ্লেষণমূলক লেখার কথা চিন্তা করছে। যারা বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছে সেই নামগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসে ও। আসলে অনেক সময় মানুষকে চেনা বড় দায়। ঠিক সময়ে মানুষটি তার আপন খোলস ফেলে বেরিয়ে আসে। স্বার্থ উদ্ধারের নানা কারণে যে খোলস ফেলে দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না।

পরিষদের বিতর্কের কাগজগুলো ঘাঁটতে থাকে। সাতাশ জুলাই তারিখে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তিনি বলেছিলেন, 'এই নীতি অনুসৃত হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। ছয় কোটি বাঙালির

BanglaBook.org

নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। যুগযুগান্তরের সাধনায় তা বর্তমান স্তরে এসেছে; নিছক শক্তির জোরে একে ধ্বংস করে নতুন সংস্কৃতি চালু করতে চাইলে তা জাতির পক্ষে আত্মঘাতী হবে। তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানান।' এই বিতর্কে সরকারি দলের সদস্যরা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে হেয় করার চেষ্টা করে। তিনি কীভাবে পাকিস্তানিদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এই পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্য এ. কে. সোলায়মান এইসব বক্তব্য নিয়ে ঢাকা শহরে পা রাখার চ্যালেঞ্জ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়।

এই ঘটনায় খুব মজা পায় আলী আহমদ। একদিকে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে আন্দোলনের জোয়ার, অন্যদিকে পরিষদে চ্যালেঞ্জ। বেশ জমে উঠেছে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবস্থা। তথ্যমন্ত্রী বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য বাধ্য হয়, কিন্তু একই সঙ্গে সংবাদপত্রসমূহকে দায়ী করে তাঁর বক্তব্য বিকৃত করে পরিবেশন করার জন্য। আলী আহমদ ভাবলো এটুকু চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা– কিন্তু কতদিন বাঁচবে? আগুনতো লেগেই গেছে, ওটা আর পিছু ছাড়বে না। আলী আহমদের মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে রাজনীতির যে অগ্রগতি তার ওপর একটি লেখা লিখবে বলে ও চিন্তা করে ফেলে। তখন প্রতীক কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, বাবা আমরা যুদ্ধে জিতেছি, না?

হ্যাঁ, বিজয়তো বটেই। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য বেশ একটি দাঁতভাঙা জবাব হয়েছে।

এখন ওদের নিজেদের অবস্থাটা বোঝা দরকার, না বাবা?

বুঝবে কে? ওরাতো শুরু থেকে গায়ের জোর দেখাচ্ছে। তবে গায়ের জোর তো বেশিদিন চলে না। এখনো সংযত না হলে পরিস্থিতি যদি খারাপ হয় তবে সে দায়িত্ব ওদেরই নিতে হবে।

কতটা খারাপ হবে বাবা? আগুন জ্বলবে?

জ্বলতেও পারে।

ভালোই হবে। আমি মেঘমল্লার গাইবো।

প্রতীক গুনগুন করতে করতে বেরিয়ে যায়। ওর গানের রেশ আলী আহমদকে আচ্ছন্ন করে– লেখাটা শুরু হয়।

লিখতে লিখতে অনেক রাত হয়ে গেলে একসময় আলী আহমদের চিন্তা গাঢ় হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবোধ বড় তীব্র হয়ে উঠছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো আপোস নেই। জাতীয়তাবোধ কি মানুষকে খণ্ডিত করে? 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীর সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে।' কী চমৎকার কথা, মানুষকে নিজের আমিত্বটুকু অক্ষুণ্ন রেখে বিশ্বমানব হতে হয়। বিশ্বমানব না হতে পারলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জাতিসত্তা। শুধু জাতিসত্তা নিয়ে আধুনিক বিশ্বে থাকা সম্ভব নয়। গোর্কি তাঁর 'লোয়ার ডেপথ্‌স' বইয়ে এমন একটি কথারই অনুধাবন করতে চেয়েছেন, যে অনুভব একের ভেতর বহুর সংমিশ্রণ ঘটায়। যেমন : What's a man? Nor you, nor me, nor him. Oh no! But you and me and the old man and Napoleon, and Mohammad— all in one!

এটুকু লিখে আলী আহমদ কিছুক্ষণ কলম থামিয়ে চুপ করে ভাবে, এই বিশ্বজনীন বোধ প্রত্যেক জাতির জন্য জরুরি। কিন্তু তার আগে চাই জাতিসত্তার বিকাশ। আমরা এখন তেমন বিস্ফোরণোন্মুখ সময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

আজকের, এই সময়ের পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবোধের তীব্রতা গাঢ় হয়ে উঠেছে–

BanglaBook.org

ব্যাপৃত হয়ে যাচ্ছে এই ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নিজের ইতিহাসকে বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম করবে এই ভূখণ্ড। এগিয়ে আসছে তেমন দিন। জাতীয়তাবোধ তীব্র না হলে জাতি জেগে ওঠে না– আর জেগে না উঠলে বড়র সঙ্গে মিশবে কিভাবে? তাই নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা প্রথম শর্ত, নিজেকে বিকশিত করা দ্বিতীয় শর্ত। দু'টোকে এক করেই বিশ্বকে আপন করতে হয়, কাছে আনতে হয়।

লিখতে লিখতে আলী আহমদ চমকিত হয়, অভিভূত হয়। রাত বাড়ার কথা ভুলে যায়। মনে হয় কতকাল পর ও নিজেই মগ্ন-চৈতন্যে ডুবে যেতে পারছে। প্রবল সুখ অনুভব করে নিজের ভেতর।

লেখা শেষ করে ঘুমুতে গেলে বিছানাটা অন্যরকম লাগে। প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে পুষ্পিতাকে। ঘুম ভেঙে যায় পুষ্পিতার। আলী আহমদের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, কি হয়েছে?

আলী আহমদ উত্তর দেয় না। বলার তো কিছু নেই। কি হয়েছে ও কি নিজেও তা জানে? বরং নিবিড় করে কাছে টানে পুষ্পিতাকে। কতকাল আগে পুষ্পিতার সঙ্গে যাত্রা শুরু। তার কিছুইতো মুছে যায়নি, কিছুইতো মুছবার নয়। পুষ্পিতা ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে, ছাড়ো।

আলী আহমদ গাঢ় কণ্ঠে বলে, না পুষ্প, না, ছাড়ার কথা বোলো না। আমরা কেউ কাউকে ছাড়বো না। তোমাকে আমি স্ত্রীর বাইরে আরো বড় করে বুঝতে চাইনি ঠিকই, কিন্তু এও জানি তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমিই সত্য শুধু, তুমিই, পুষ্প, তুমিই।

পুষ্পিতা আলী আহমদের হৃদয়ের কথা শুনতে পায় না। ততক্ষণে ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ওর ডান হাত আলী আহমদের গলা জড়িয়ে থাকে।

আলী আহমদের ঘুম আসে না। ভাবে এ সমর্পণ কীসের? হৃদয়ের না যুক্তির? পরক্ষণে আপন মনে হাসে। নিজেকেই বলে, এ সমর্পণ জীবনের পূর্ণতার কাছে। যেখানে মানুষ পরাজিত হতে চায় না।

সে রাতের পর থেকে আলী আহমদ নিজের কাছে স্বস্তি খুঁজে পায়। দিনগুলো ভালো কাটে। এ ধরনের অনাবিল আনন্দ ওকে পেয়ে বসে। গুনগুনিয়ে গান গায়। লেখার মধ্যে ডুকে থাকে। দিনতো গড়াবেই, গড়াতে হয় দিনের। নতুন বছর শুরু হয়। দেখতে দেখতে পৌষ মাস ফুরিয়ে যায়। আলী আহমদের মনে হয় এ বছরে মাঘের শুরুতে শীত বেশি পড়েছে। হাড় কাঁপানো বলা যায়। পুষ্পিতা ভোরে উঠে ভাপা পিঠে তৈরি করার তোড়জোড় করছে।

ভোরবেলা কাগজটা হাতে নিয়ে চমকে ওঠে আলী আহমদ। রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেকসুর খালাস দিয়ে গেটের বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়।

আলী আহমদ কাগজটা হাতে নিয়ে থমকে থাকে। এর কিছুদিন আগে দু'জন সি. এস. পি. অফিসারসহ আটাশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। প্রেসনোটে বলা হয়েছিলো, 'গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো।' প্রেসনোটে আরো বলা হয়, 'এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্তানুষ্ঠান সমাপ্ত প্রায়। শীঘ্রই মামলার শুনানি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।' শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়।

খবরটি পড়ে আলী আহমদ আবার অস্বস্তিতে পড়ে। স্বস্তির যে ব্যক্তিগত আনন্দে

BanglaBook.org

ও বেশ মেতে উঠেছিলো তার অনেকখানি নষ্ট হয়। ওর বুকের ভেতরে স্তব্ধতা দানা বেঁধে ওঠে। মুখ দেখে পুষ্পিতা জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমার? কিছু ভাবছো মনে হয়?

আলী আহমদ অসহায়ের মতো বলে, কি যে হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না পুষ্প।

পুষ্পিতা মৃদু হেসে বলে, মাঝে মাঝে তুমি কেমন যেন দূরের মানুষ হয়ে যাও। বুঝতে পারি না।

আলী আহমদ হাঁফ ছেড়ে হেসে বলে, আমিও পারি না।

ও পুষ্পিতাকে কিছু বলে না। জানে, শুনলে নানারকম আশঙ্কায় বেচারা ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে।

পরদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবার খবর। প্রথমে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। পরে আঠারো জানুয়ারি দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি দিয়ে আর্মি, নেভি এ্যান্ড এয়ারফোর্স এ্যাক্টে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রদীপ্ত বলে, বাবা ব্যাপারটা কি?

আলী আহমদ বলে, ছয় দফার খেসারত।

প্রদীপ্ত চিন্তিত হয়ে বলে, তাই হবে।

পরদিন এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। একদিন পর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ সরকারের কাছে প্রকাশ্য বিচারের দাবি করে।

এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইস-এডমিরাল এ. আর. খান ছাব্বিশ জানুয়ারি পত্রিকায় বিবৃতি দেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত আটক উনত্রিশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তকার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই দেশের আইন অনুসারে তাহাদের প্রকাশ্যে বিচার করা হইবে।'

দৈনিক 'সংবাদ'-এ খবরটি পড়ে প্রতীক বন্যাকে বলে, দেশে বোধহয় একটা কিছু হতে যাচ্ছে বন্যা।

বন্যা না বুঝেই বলে, একটা কিছু হলে তো ভালোই হয়। আমি তো আমার জন্মের পর থেকে সবকিছু একরকম দেখছি।

প্রতীক বলে, একটা কিছু হওয়ার খেসারত কিন্তু অনেক। পারবে সইতে?

বন্যার চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। বলে, আমার মায়ের মৃত্যুর চেয়ে বড় খেসারত আর কি হতে পারে প্রতীক ভাই?

এই দেখো, কোথাকার কথা কোথায় গড়িয়ে নিলে। চলো দু'জনে মিলে গান গাই।

কোনটা?

জানি না। তুমি বলো।

বন্যা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, আমার কিছুই মনে আসছে না।

থাক। গান গাইতে হবে না। আমাদের আজ মন ভালো নেই।

প্রতীক গভীর চোখে বন্যার দিকে তাকায়। বন্যা বুঝতে পারে তাকানোটা অন্যরকম। ওর বুক কেঁপে ওঠে। ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। যেন দূরের কিছু দেখছে।

এপ্রিল মাসে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে তার ওপর শেখ মুজিবুর রহমানসহ আটক ব্যক্তিদের বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক এই ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ নেই। উনিশ জুন তারিখে

BanglaBook.org

দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আনীত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী শুরু হয়।

প্রদীপ্ত সাংবাদিক। ও শুনানী শোনার সুযোগ পেয়েছে। ও ফিরে না আসা পর্যন্ত আলী আহমদ ঘরে-বাইরে পায়চারি করে। কিছুতেই সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। বাড়িতে কেউ নেই। ও একা। পুষ্পিতা পাশের বাসায় বেড়াতে গেছে। খালি বাড়িতে আলী আহমদের দম আটকে আসে। ওর মনে হয় বেরিয়ে পড়া উচিত। কোথায়? জানি না, কোথাও।

ও পাঞ্জাবি গায়ে দেয়। পুষ্পিতাকে ডেকে বাড়িতে রেখে বেরুবে। গেটের কাছে আসতেই প্রদীপ্তর মুখোমুখি। ও চেঁচিয়ে বলে, বাবা সবটাই সাজানো। আইয়ুব খানের নীল নকশা। কি দেখলি, কি শুনলি, সব খুলে বল আমাকে।

আমাকে এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে। তবে পত্রিকায় পড়তে পারবে। সব ছাপা হবে।

আলী আহমদ আর বাইরে বেরুতে চায় না। ফিরে আসে বারান্দায়। ওর অস্থিরতা কেটে গেছে। চৌকির ওপর বসে ভাবে, জানতাম সাজানো। দমনপীড়ন করার জন্য একটা কিছুতো সাজাতেই হবে।

প্রদীপ্ত তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলো। কত রাতে ফিরবে কে জানে, আদৌ ফিরবে কি না কে জানে। যাবার সময় বলে গেলো, আইয়ুব খান কাজটি ভালো করেনি বাবা। জনগণের চেহারা বদলে যাচ্ছে। মানুষ বোধহয় মানবে না।

মানুষ বোধহয় মানবে না, কথাগুলো আলী আহমদ নিজেও উচ্চারণ করে। দু'চোখ মেলে পেছনের দিনগুলোর দিকে তাকায়। কত দুর্যোগ পেরিয়ে এসেছে। মানুষ অনবরত দুর্যোগ পেরুতে থাকে। ভয় পায় না, ভয় নেই।

আলী আহমদ তখন বারান্দায় পায়চারি করে আর গুনগুনিয়ে গায়, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে–'

হয়তো এ গানটি সেদিন প্রতীক আর বন্যা গাইতে চেয়েছিলো। হয়তো এ গানটি গাইতে গাইতে প্রদীপ্ত অফিসে কাজ করছে।

গানটি গাইতে গাইতে আলী আহমদের গলা চড়তে থাকে। খালি বাড়ি সে কণ্ঠে গমগম করে।

BanglaBook.org

১০

দু'জনে ফুলার রোড ধরে হাঁটছিলো। মঞ্জুলিকা থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকা করে বলে, তারপর? এখন?

প্রদীপ্ত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, এখন মানে?

বাহ্, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলে, সাংবাদিক হিসেবে চাকরি পেলে।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে তোমার এম. এ. পাস হয়ে যাক। আমি তো মূর্খ বউ চাই না। কি বলো?

এম. এ. পাস না করলে মূর্খ হয়?

হয়, হয়। পাশ করেও হয়, না করেও হয়।

নিজে কি হয়েছো?

মূর্খতো হয়েইছি, সঙ্গে গাধাও। মগজে কিছু নেই।

হয়েছে, থামো।

মঞ্জুলি তুমি জানো, আমার কোথাও কোনো সমস্যা নেই। আমার বাবা মা রাজি। তোমাকে ঘরে উঠানোর জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। বাধ সাধছি তো আমি নিজে। পড়াশোনায় একবার বাধা পড়লে তা আর হয়ে উঠতে চায় না।

ঠিক বলেছো। তবে তফাতটা কি জানো? আমি বলেছি মাত্র দু'টো বাক্য, তুমি বললে শত শত।

বলবোইতো। না বললে কি তোমার মন ভরবে? তাছাড়া, তোমাকে আমি বারবার প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে চাই না।

বেশি কথা বললে সেদিনের মতো মুখের মধ্যে মিষ্টি দিয়ে দেবো কিন্তু।

হো-হো করে হাসে প্রদীপ্ত। বলে, সেদিন কলাভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুমি অমন চট করে আমার মুখে মিষ্টি দিয়ে দেবে আমি তা ভাবতেই পারিনি।

আগে থেকে যদি ভাবতেই পারবে তাহলে মজাটা কোথায়!

এমন মজা রোজ রোজ হয় না?

হয় না, হয় না। হলে মজা আর মজা থাকে না। ওটা পানি হয়ে যায়।

উহুঁ তেমন নয়, মাসের তিরিশ দিনকে তিরিশ রকম করা যায় না?

এমনই কথা হয় ওদের, এমন গলগল করে দু'জনের মধ্যে। দু'জনে শহরের নির্জন ফুটপাত ধরে হাঁটে, রিকশায় ঘুরে বেড়ায় কিংবা রমনা পার্কে বসে, নয়তো বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা নিয়ে ফেরে– চমৎকার সময় কাটে। কেটে যায় দিন। দিন গড়ালেই হয় না, দিনকে দিনের মতো করতে হয়।

দিনকে দিনের মতো করা কি? অনেক ভেবেছে মঞ্জুলিকা। কেউ কেউ তো দিনকে দিনের মতো করতে পারে না, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেটা অন্যরকম হয়ে যায়। যেমন হয়েছে তিতুমীর কিংবা টুম্পার। মানুষ চাইলেই সব পায় না। টুম্পার জন্য ওর খুব কষ্ট হয়। মঞ্জুলিকা হাঁটতে হাঁটতে ওদের গল্প বলে প্রদীপ্তকে। ও বেশ গুছিয়ে, গলার ওঠানামা বজায় রেখে গল্প বলতে পারে। বলে, জানো একদিন দুপুরের পর চুয়ান্ন নম্বর বাড়ির বারান্দা থেকে উধাও হয়ে গেলো তিতুমীরের মা। তখন মনিপুরী পাড়া বেশ নিঝুম ছিলো। গলির মোড়ে ছেলেদের আড্ডা ছিলো না, গাড়ি-রিকশাও ছিলো কম। বাড়িটার সামনের কাঠলিচু গাছের কালচে সবুজ পাতায় দৃষ্টি ফেলে ও শূন্য বারান্দায় গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসেছিলো। সেদিন তিতুমীর ওর জগতে একদম একা হয়ে যায়। বারোটার দিকে মা ওকে সানকিভরা ভাত দিয়েছে– কাছে বসে ওর খাওয়া দেখেছে। জিজ্ঞেস করেছে, তিতু পেট ভরেছে তোর? ও লম্বা করে মাথা নেড়েছিলো। মা ওকে কখনো এমন করে জিজ্ঞেস করে না। ভিক্ষে করে যা জোটে তা মা-ছেলে দু'জনে ভাগ করে খায়। ওকে থালা চেটেপুটে খেতে দেখেও মা কখনো জানতে চায়নি পেট ভরেছে কি না, ও নিজেও কিছু বলেনি। দু'জনেই জানে এসব প্রশ্ন করতে নেই। ভরলে তো তৃপ্তি ঢাঁই করা সুখ। না ভরলে ড্যাগড্যাগি, ভাবাভাবির কিছু নেই। খুব ছোটতে হয়তো কাঁদতো, কিন্তু বুদ্ধি হবার পর থেকে ও এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। জেনেছে এটাই নিয়ম, ও নিয়মের ছেলে। নিয়মের বাইরে পা দিতে নেই, কিন্তু দুপুরের পর মা যে আসি বলে চলে গেলো, আর ফিরলো না, রাতে হাপুস নয়নে কাঁদলো ও। পরদিন পাগলের মতো পরিচিত

BanglaBook.org

জায়গাগুলোয় খুঁজলো, নেই, কোথাও নেই। সেদিন থেকে বুঝলো ও নিয়মের বাইরে ছিটকে পড়েছে। এখন ওর চারদিকে উদোম, হা-হা বাতাস বয়, রোদ আসে, বৃষ্টি লাগে, দুম করে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ে এসে নাকমুখ ধাঁধিয়ে দেয়, ওর ভালোই লাগে। ও বুঝতে পারে ওর বয়স হয়েছে, বড় হয়েছে, চারদিকে এখন আর কোনো বেড়ার দরকার নেই। তবুও মায়ের হারিয়ে যাওয়া ওকে ভীষণ কষ্ট দেয়। এই বারোটা বছর মা ওকে আগলে রেখে পালন করেছে। তাই যখন তখন ওর বুক ফেটে কান্না আসে।

গল্পের এটুকু শুনে থমকে দাঁড়ায় প্রদীপ্ত। বলে, তুমি তো ভারি সুন্দর করে বলেছো মঞ্জুলি। মনে হচ্ছে গল্পটি তুমি এইমাত্র বানালে।

একটুও বানানো নয়। তোমাকে একদিন ছেলেটিকে দেখাবো। তুমি ওকে নিয়ে পত্রিকায় ফিচার করতে পারবে।

তাছাড়া তোমার বান্ধবী টুম্পা আর তিতুমীরের গল্পটি আমি ওর কাছ থেকেই শুনতে চাই। তা তো বলবেই, আমার কথা কি তোমার শুনতে ভালো লাগবে?

হয়েছে ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মতো অভিমান করতে হবে না। আমি তো জানি তোমার কথা আমার কাছে অমৃত সমান। শোনো কালকে তিতুমীরকে খবর দাও। দু'জনে বসে ওর কথা শুনবো।

তারপর একদিন দুপুরবেলা রমনা পার্কের কোণায় দু'ঠোঙা বাদাম নিয়ে ওরা বসে। সামনে তিতুমীর। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। তিতুমীর ওর কথা বলে। কিন্তু ওর মতো করে বলে না। একজন বাইরের মানুষের মতো– যেন গল্পটা ওর নয়, অন্য কারো।

একদিন রাস্তার ধারে তিতুমীরকে কাঁদতে দেখে পাড়ার আজিজ গিয়া কষে থাপ্পড় দেয়।

বেটাছেলের কান্না কীসের? চল আমার সঙ্গে। ফের কাঁদবি তো তোর ঘাড় ভেঙে ফেলবো।

আজিজ হাত ধরে টানতে টানতে নিজের চায়ের দোকানে নিয়ে আসে, কাজে লাগিয়ে দেয়। কোনোকিছু ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই ও এখানে ফিট হয়ে যায়। সারাদিন চা বানায় দুদু। একদিন কাজের ফাঁকে বললো, পুরুষ মানুষের জন্য সারা দুনিয়া খোলা। শুধু চোখকান খোলা রাখলে হলো। দেখবি কত ফূর্তি, কত মজা।

তিতুমীর বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। এইসব কথাবার্তা ও বেশি বোঝে না। মায়ের ছায়া এখনো ওকে আগলে আছে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়া কি এত সহজ? ও বোকার মতো কাজ করে। টেবিলে টেবিলে চা দেয়, লোকজনের গালগল্প শোনে, কেউ এক টাকা বখশিস দিলে বর্তে যায়। রাতে কাঠের বেঞ্চে ঘুমিয়ে থাকে। আজিজ লোকটা ভালো মনে হয়। ও ভালোবাসে। ঠিকঠাক মতো খেতে দেয়। ও এতেই খুশি। এর বেশি কিছু চাইতে হয় এই বোধই ওর নেই। দুদু পয়সা চুরি করে সিনেমায় যায়, সারারাত কোথায় কাটিয়ে চোখ লাল করে ফেরে, নবাবের মতো আচরণ করে, এসব ওকে তেমন স্পর্শ করে না। ওর মায়ের কথা মনে হয়।

দুদু ওকে গালি দেয়, তুই একটা গাধা। পুরুষ মানুষের অন্যরকম হতে হয়। তিতুমীর চুপ করে থাকে। অন্যরকম কি ও বোঝে না। মাঝে মাঝে যে ওর কাছে সবকিছু শূন্য হয়ে যায় এটা ও দুদুকে বোঝাতে পারে না। আজিজ ওকে প্রায়ই সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়। দোকানের জন্য এটা ওটা কেনার সময় ওকেও একটা কিছু কিনে দেয়। ওর মনে হয় আজিজ ওকে বুঝতে পারে। আচ্ছা আজিজ কি জানে ওর মা কোথায় গেছে?

BanglaBook.org

জানার চেষ্টা করেও জিজ্ঞেস করতে পারে না। প্রশ্নটা ঠোঁটে এসে থেমে যায়। জিজ্ঞেস করলে আজিজ কি মনে করবে? কিংবা ভীষণ ভয়ানক খবর যদি ওকে দেয়? ওর মা মরে যায়নি তো? একদিন দুদু জিজ্ঞেস করেছিলো, তোর মা কার সঙ্গে ভাগলো রে?

ভাগবে কেন?

ও রুখে দাঁড়ায়। দুদু কাঁধে হাত রাখে।

মেজাজ খারাপ করিস না। না ভাগলে গেলো কোথায়?

জানলে কি তোমার সঙ্গে কাজ করি?

দুদু দাঁত বের করে হি-হি হাসে। সেই হাসিতে গা জ্বলে যায় তিতুমীরের। দু'টো ঘুঁষি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না, গায়ের জোরে পারবে না বলে।

দুদু ওর হাত ধরে রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। তিতুমীরের গলায় কান্নার দলা জমে থাকে। ও মুখচোরা, লাজুক গোছের ছেলে। কারো সঙ্গেই জোর করে কথা বলতে পারে না। বেশিরভাগ সময় সয়ে যায়। এজন্য মায়ের হাতে অনেক মার খেয়েছে। মা বলতো, তোর কপালে ভাত নেই। আমি মরলে তোকে শকুনে খাবে।

এখন শকুনে খায় না কেন ওকে? খেলে তো বেঁচে যায়। নাকি এই দুদুর মতো হাজারজন যে ওর বুকে আঁচড় দিচ্ছে এটাকেই শকুনে খাওয়া বলে? মা না মরেই ওকে শকুনের ধারালো ঠোঁটের সামনে ফেলে গেছে, এজন্য ওর চোখে জল আসে।

আচ্ছা দুদু– ও ঢোক গিলে। দুদু ওর চাইতে বয়সে বেশ বড়, ওকে ও নাম ধরেই ডাকে।

কি বলবি বল?

মা যদি ভেগেই যাবে তাহলে আমাকে বললো না কেন?

তুই যদি সঙ্গে যেতে চাস এইজন্য বোধহয়।

মোটেই না, আমি কখনো যেতে চাইতাম না।

তাহলে তোর দুঃখ হবে এজন্যে বোধহয়।

আমি একটুও কাঁদতাম না। বলতাম, মা তুমি যেখানে খুশি যাও।

দুদু হো-হো করে হাসে। বলে, তুই একটা গাধা। না রে তুই বড় ভালো ছেলে।

দুদু ওর কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রমনা পার্কে আসে। বাদাম কেনে, মেয়েদের দেখে শিস বাজায়, খিস্তি করে।

তুই এখানে থাক। আমি আসি। যাবি না কোথাও, এক সঙ্গে ফিরবো কিন্তু।

তিতুমীর বাদামের ঠোঙা নিয়ে কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে। দুদু দু'টো মেয়ের পিছু নেয়। বাদাম খেতে ওর ভালোলাগে না। মায়ের কথা মনে হয়। রাত্রিবেলা মেজাজ ভালো থাকলে মা ওকে গল্প বলতো, শীতের রাত আর রেনট্রি গাছের গল্প। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেত ও। এই এতটা বয়স পর্যন্ত ও কোনো বাসাবাড়ির স্বাদ পায়নি। মা'র সঙ্গে ফুটপাথে কাটিয়েছে গরমে, বৃষ্টি বা শীতে কারো বাড়ির বারান্দায়। কখনো খারাপ লাগেনি ওর। বরং শীতের রাত আর রেনট্রি গাছের গল্প ওকে যেন এক স্বপ্নের দেশে নিয়ে যেত। কখনো কল্পনা বিশাল হলে নিজে নিজেই রাজা হয়ে যেত। এখন ওর মনে হয় যতদিন মা ছিলো ততদিন এক সোনালি সময় ছিলো। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া মিষ্টি-মধুর আমেজ ছিলো। এখন সবটাই নিরেট, সবটাই শুকনো খটখটে। পা ফেললে কষ্ট হয়। বারো বছর কি মানুষের জন্য ভীষণ খারাপ সময়? তখন কি সবাই একা হয়ে গিয়ে নতুন কিছু জানা শুরু করে? ও বুঝতে পারে না। কাঠের বেঞ্চিতে মাথা রেখে পার্কের ফুল গাছগুলো দেখে, দেখতে দেখতে ওর সময় নষ্ট হয়ে যায়, চলে যায় চলমান মুহূর্তগুলো।

BanglaBook.org

ওর বুকে চঞ্চলতা দানা বাঁধে, ও বড় হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর দুদু ফিরে আসে। চিবুক কেটে গিয়ে লাল হয়ে আছে।

তোমার কি হয়েছে?

কিছু না। দুদু দু'পা বেঞ্চের ওপর উঠিয়ে বসে।

বলো না? তিতুমীর জেদ করে। ও কখনো জেদ করেনি, এই প্রথম। দুদু অবাক হয়ে তাকায়। তারপর হেসে বলে, যাদের পিছু নিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে লোক ছিলো বুঝতে পারিনি। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আচমকা এমন ঘুঁষি দিলো যে সামলাতে পারিনি। তুমি কিছু বলোনি?

বলেছি বলেই তো মার খেলাম।

গেলে কেন ওদের পিছে পিছে?

সে তুই বুঝবি না।

বুঝবো বলো?

মেয়ে দেখলে আমার শরীর কেমন শিরশির করে।

তিতুমীর আর কথা বলে না। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

কিছু বললি না যে?

তাড়াতাড়ি চলো। মহাজন রাগ করবে।

রাখ ঐ শালার কথা।

আমাকে কেউ বকলে আমার খুব খারাপ লাগে।

ঐ সব বাতিক আমার নেই। আমি ঐসব প্যানপ্যানানি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেই। বকলে, লাথি দিলে আমার কিছু হয় না।

আমি একদম সইতে পারি না।

তুই একটা নবাবের বাচ্চা। ঠিক তোর বাপ নবাব ছিলো। যতসব ফুটানি। ফুটপাথের ছেলের অতো কিছু মনে করতে নেই।

তিতুমীরের বুক মুচড়ে ওঠে। দুদুর কথাগুলো ওর একটুও ভালোলাগে না। আসলে দুদুর সঙ্গে ওর অনেক ফারাক। এত ফারাক নিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। ওর কেবলই মনে হয় বারো বছর বয়সে ভিন্ন জীবন শুরু করতে হয়। ভালো হয়েছে মা চলে গেছে। এই বয়স মায়ের আঁচল ছাড়ার বয়স। বাপকে ও দেখেনি, সেজন্য বাপের প্রসঙ্গে ও কোনোকিছু ভাবতে পারে না। মা ওকে এমন করে আগলে রেখেছিলো যে বাপের অভাব ওকে কোনো কষ্ট দেয়নি।

কি রে চুপ মেরে গেলি যে?

তিতুমীর কথা বলে না। চুপচাপ হেঁটে যায়।

শোন মহাজন যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় গিয়েছিলাম তাহলে পার্কের কথা বলবি না।

কি বলবো?

বলবি আমার এক খালা হাসপাতালে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

মিথ্যে বলবো?

ইস্ নবাবের বাচ্চা। মিথ্যে বলতে পারে না।

দুদু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

দেখো, তুমি আমাকে বারবার নবাবের বাচ্চা বলবে না।

বলবো, একশো বার বলবো। ফুটপাথের ছেলেদের বাপের ঠিক থাকে না। ওদের বাপেরা নবাবই থাকে। ঐ জন্যতো তুই নবাবের মতো কথাবার্তা বলিস।

BanglaBook.org

তিতুমীর আচমকা দুদুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুদু বাম হাত দিয়ে ওর ছোট শরীর সামলে নেয়। ও তেমন সুবিধা করতে পারে না।

আমি ঠিকই ধরেছি। মেজাজটাও তোর শাহী। মাগো এতসব নিয়ে তোর কি যে হবে।

তিতুমীর জবাব দেয় না। হনহনিয়ে আগে আগে হাঁটে। দুদু কাছে এলে দৌড় দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। দোকানে যখন পৌঁছে তখন সন্ধ্যা। দু'জনে নীরবে মহাজনের গালমন্দ শোনে।

রাতে কাঠের বেঞ্চির ওপর শুয়ে ওর ঘুম আসে না। নবাব শব্দটা ওর কাছে নতুন, এর আগে কখনো শোনেনি। মা থাকলে ঠিকই জিজ্ঞেস করতো, আমার বাবা কি নবাব ছিলো? আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনে রেনট্রি গাছ বিশাল হয়ে ওঠে। আজিজ বলে, আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে, কিন্তু সয় না কেন? কেন একলা হলে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে সামনে আসে? মায়ের মুখ-চোখ-নাক কোনো কিছু আলাদা করে চেনা যায় না। থেঁতলে থাকে পুরো শরীর। এসব শুনলে দুদু হাসে। ও সুযোগ পেলেই ওকে খোঁচা দেয়, খোঁচা দিয়ে আরাম পায়। বলে, মায়ের আঁচলই ছাড়তে পারলি না, তুই বেটাছেলে হবি কবে?

কিছুদিন ধরে আজিজ লন্ডনে যাবার তোড়জোড় করছিলো। ওখানে ওর ভাই আছে। রেস্টুরেন্ট চালায়। আজিজকে ওর কাজে লাগবে। এতদিনে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। আবার আশ্রয়হীন হবার আশঙ্কায় তিতুমীরের চোখে ঘুম নেই। আজিজ পিঠ চাপড়ে আদর করে বলে, তোর কোনো ভয় নেই, একটা ব্যবস্থা করে যাবো। দেখবি এখানকার চাইতেও ভালো থাকবি।

ওর কি যে হয়, যেন বমি পাচ্ছে, যেন নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে আসছে, আজিজের শরীর যেন বিশাল রেনট্রি গাছের গুড়ি হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। ও ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, তখন প্রচণ্ড দুপুর, রাস্তায় অবিরাম গাড়ি-রিকশার আসা যাওয়া। ওর শরীরে রোদের চুঁয়ানি, ঘামে নেয়ে উঠছে বারবার, তবুও গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, জেদ বাড়তে বাড়তে তেতে ওঠে। আস্তে আস্তে ওর নিজের শরীরটাও প্রচণ্ড দুপুর হয়ে যায়। তাতানো রাগী। হঠাৎ দমকা বাতাসের চাবুক স্পর্শ করলেও ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ফার্মগেটের দিক থেকে মানুষের ঢল আসছে। ও কখনো চোখ বুঁজলে এমন ঢল দেখতে পায়। গলির মোড়ের রিকশার গ্যারেজের সোবহান বলেছে, শেখ মুজিবকে জেল থেকে বের করে আনার জন্যে মাঝে মাঝে এমন মিছিল যায়। এই সব কথায় সোবহানের খুব উৎসাহ। ও গলা ফাটিয়ে চিল্লাতে পারে। তিতুমীরের তেমন উৎসাহ নেই। আগরতলা মামলা ও বোঝে না, শেখ মুজিবকে চেনে না, এইসব ব্যাপার ওকে আলোড়িত করে না। ও রাস্তার পাশে হাঁ করে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখতে ভালোবাসে।

আজিজ লন্ডনে যাবার আগের দিন ওকে বনানীর এক বাড়িতে দিয়ে যায়। সপ্তাহখানেক হলো এখানে এসেছে ও। কাজ তেমন নেই, গাড়ি মোছা, বাগানে পানি দেয়া, টুকটাক ফাই ফরমাশ খাটা, এই আর কি। ওর তেমন পরিশ্রম হয় না। দুপুরবেলাটা ওর একদম একলার। বেলা আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত কেউ ওকে ডাকাডাকি করে না। ওর ইচ্ছে এখান থেকে ও আর কোথাও যাবে না। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে সারাজীবন এখানে কাটিয়ে দেবে।

এই বাসায় সাহেব, বেগম সাহেব, টুম্পা আপা ওকে তিতু বলে ডাকে। টুম্পা আপার ডাক ওর সবচেয়ে ভালোলাগে। ইচ্ছে করে ওর পাশে বসে দিন রাত গল্প শুনতে। কিন্তু টুম্পা আপার সময় নেই। কলেজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নইলে একগাদা বান্ধবী আসে, ওদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, সারাদিন হৈ-চৈ হয়। ঘনঘন তিতুমীরকে ডাকে, এটা ওটা নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে হয়। ওর খারাপ লাগে না, কিন্তু টুম্পার সঙ্গে একলা কথা বলতেই ওর আনন্দ।

বান্ধবীরা না এলে টুম্পা আপা গান শোনে। কী যে সব আজেবাজে গান একটুও ভালো লাগে না ওর। গানের সঙ্গে সে কী চিৎকার, একটা কথাও বোঝা যায় না। তারওপর আছে শনশন আওয়াজ, কানে তালা লাগার উপক্রম। চায়ের দোকানের পাশের দোকানে হিন্দি গান বাজতো, দুদু গলা মিলিয়ে গাইতো। দুদুর অনেক গান মুখস্থ ছিলো। তিতুমীর কিছু বুঝতো না, কিন্তু কখনো কোনো সুর কানে খট্ করে লাগতো, মনে হতো কতকাল ধরে যেন এই গান শুনে আসছে, কোনোদিনও ভুলবে না আর। কিন্তু তা কি হয়? ভুলে গেছে সবকিছু, কিছুই মনে আসে না। কিন্তু টুম্পার এইসব গান একদিনও ওর কানে খট করে বাধেনি। বরং বিরক্ত লাগে, রাগ হয়। কিন্তু টুম্পাকে সে কথা বলা যায় না। আসলে টুম্পা একা একা থাকে। বেচারি করবেই বা কি? সাহেব, বেগম সাহেব অফিসে চলে গেলে, টুম্পার সেদিন কলেজ না থাকলে বড় বেশি অস্থির থাকে ও। টেলিফোন বারান্দায় এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। কত বিচিত্র আলাপ যে করে, ওর মজাই লাগে শুনতে। ও কখনো কাছে দাঁড়িয়ে শোনে, টুম্পা না বললেও ওর জন্য চা বানিয়ে আনে। রেলিংয়ে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। টুম্পা একসময় টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। ভুরু নাচিয়ে হাসে।

তুই ভালো ছেলে তিতু।

ও খুশি হয়ে যায়।

তোর মা নাই?

না।

মরে গেছে?

না।

তাহলে কোথায়?

জানি না।

সে কি রে, কেমন ছেলে তুই যে মায়ের খোঁজ রাখিস না?

তিতুমীর চুপ করে থাকে। মুখে কথা জোগায় না। মায়ের সম্পর্কে কিছু বলে টুম্পার সামনে ছোট হতে রাজি নয়। টুম্পা চায়ে চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখে।

তোর বাবা নেই?

মা বলতো আমার বাবাই নেই। মাও জানে না বাবা কে।

ওমা তাই নাকি? খুব মজাতো।

টুম্পা হাসিতে ভেঙে পড়ে। হাসি আর থামতে চায় না। তিতুমীরের মন খারাপ হয়ে যায়। বলতে পারে না, টুম্পা আপা অমন করে হাসলে আমি কষ্ট পাই। আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কি লাভ? ওর মুখে বেদনার ছায়া লক্ষ করে টুম্পা হঠাৎ করে থেমে যায়। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে।

তিতু তুই লেখাপড়া শিখবি?

না।

কেন রে? টুম্পা বিস্মিত হয়।

ফুটপাথের ছেলেদের লেখাপড়া শিখতে নেই।

কে বললো তোকে?

আমি জানি।

তুই ছাই জানিস। কাল থেকে আমি তোকে পড়াবো। কি রাজি?

না।

BanglaBook.org

ধুত তুই একটা গোঁয়ার ছেলে। শোন তিতু তুই তো এখন আর ফুটপাথের ছেলে না, তুই তো বাসায় থাকিস।

ও কথা বলে না। টুম্পার দিকে তাকায় না। মুখ নিচু করে থাকে। তখন ফোন বেজে ওঠে। আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে টুম্পা। ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলে, জানিস আমাদের কাজের ছেলেটির না বাবার পরিচয় নেই। বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা। জারজ ছেলেমেয়ে আমার খুব ভালোলাগে। ওরা নাকি দারুণ ব্রিলিয়ান্ট হয়। এর আগে কোনো জারজ ছেলে বা মেয়ে আমি দেখিনি। কী সাংঘাতিক বলতো? হ্যাঁ, তুই আজ বিকেলেই চলে আয়। দু'জনে মিলে ওকে নিয়ে মজা করবো।

টুম্পা গল্পে মেতে গেলে তিতুমীর কাপ নিয়ে উঠে পড়ে। দুদু বলেছিলো, নবাবের বাচ্চা। আজ শুনলো জারজ। শব্দটা নতুন, নতুন শব্দ ওর বয়স বাড়িয়ে দেয়। এই আলো, বাতাস, রোদ, রঙ এক হয়ে ওকে মায়ের বলা গল্পের ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়। রান্নাঘরে কাপ রেখে ও একজন চিন্তিত বয়স্ক মানুষের মতো গ্যারাজের ওপর নিজের ঘরে ফিরে আসে। এখানে ড্রাইভার আবদুলের সঙ্গে ও থাকে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে থেকে আলো মুছে গেলে ভীষণ কষ্ট হয়। ঘরে আবদুল নেই। ও দরজার চৌকাঠের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে। ছাদের ওপর জমে থাকা পানিতে একটি কাক মনের আনন্দে গোসল করছে। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কী কুচকুচে কালো ওর রঙ, পানির ঝাপটায় জেল্লা আরো বেড়ে গেছে। কাকটা কি জানে ওর বাবা কে? তাহলে ওটা কি নবাবের বাচ্চা না কি জারজ? ওকে নিয়ে কি কোনো মেয়ে-কাক হেসে গড়িয়ে পড়ে? তিতুমীর একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে কাকটার গায়ে ছুঁড়ে মারে। বুকে কেমন জ্বালা, টুম্পার হাসি তারাবাতির মতো জ্বলছে, নিভতে চায় না। কাকটা উড়ে গিয়ে সামনে আম গাছের ডালে বসেছে, চুপচাপ, যেন বিষণ্ন, যেন আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ়। কাকটার কুচকুচে কালো রঙে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলে ও মায়ের সঙ্গে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেইলি রোডের প্রেসিডেন্ট হাউসের পাশের রেনট্রি গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। এই রাস্তাটা ওর পছন্দ। যেমন ছায়াচ্ছন্ন, তেমনি নির্জন। মা বলেছিলো, গাছের নিচে অন্ধকারে ভীষণ শীতের রাতে ওর জন্ম। ওর মা ওকে গাছটা দেখিয়েছে। রাস্তার লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ও জেনেছে ঐ গাছটার নাম রেনট্রি। কতদিন ও ঐ গাছের নিচে দুপুরবেলায় রোদে ঘুমিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলেছে। খুব আপন মনে হয় জায়গাটা। ঐ জায়গাটা ওকে নরম, কোমল করে দেয়। তখন মায়ের জন্য কষ্ট হয়, দুলু খালার জন্য মায়া বাড়ে, খোঁড়া বাবলুর জন্য কেঁদে ফেলে। আশেপাশের সবার জন্য ওর হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। প্রত্যেকের জন্য একটা কিছু করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু ঐ জায়গাটুকু পেরিয়ে এলে ওর আর সেইসব কথা মনে থাকে না। তখন বাবলুর সঙ্গে মারামারি হয়, দুদুর উপর রাগ বাড়ে, আরো কত কী। কখনো খুব খিদে পেলে ঐ গাছের নিচে এসে বসে। মন নরম হলে নিজেকে শোনায়, আমি খুব ভালো হবো, খুব ভালো থাকবো। বুঝতে পারে না কেন ভালো থাকবে, ভালো থাকার প্রয়োজন কি? ভালো না থাকলে কী হয়? মানুষকে ভালো না বাসলে কোনো ক্ষতি আছে কি? আস্তে আস্তে বুকের ভেতরের তারাবাতির ফুলকি নিভতে থাকে। সামনের গাছ থেকে কাকটা উড়ে গেছে, যেন ভীষণ কুচকুচে কালো অন্ধকার দূর হয়েছে। তিতুমীর একজন বয়স্ক মানুষের গাম্ভীর্যে প্রবেশ করে। ওর পৃথিবীর এ্যাসফল্টের মসৃণ রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের মিছিল। মা যতদিন ছিলো ওকে শুধু কষ্টের কথা বলেছে। ওর জন্মের সময় মায়ের খুব কষ্ট হয়েছিলো, রাত-দুপুরে মায়ের পাশে কেউ ছিলো না। অন্ধকারে হাতড়ে মা ওর নাড়ি কেটে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো। হঠাৎ আলোর ঝলক ফেলে দু'একটা গাড়ি যাচ্ছিলো সাঁই করে। গাছের

BanglaBook.org

আড়ালে ছিলো বলে মাকে কেউ দেখেনি। দৃশ্যটা ভাবলে তিতুমীরের বুক হিম হয়ে যায়। পরদিন ভোরবেলা ওকে কোলের মধ্যে আড়াল করে কত কষ্টে যে বসেছিলো, যন্ত্রণায় মায়ের শরীর ভেঙে আসছিলো। বেলা উঠলে দুলু খালা শুকনো রুটি আর বাসি তরকারি এনে দিয়েছিলো। ভাতের জন্য নাকি মায়ের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তিন দিন পর ভাত যোগাড় করে এনেছিলো দুলু খালা। মা ওকে এই গল্পটা প্রায়ই বলতো। কষ্টের গল্প ছাড়া মায়ের কি কোনো গল্প ছিলো না? টুম্পার মতো ঝলমলে হাসিখুশি মেয়ে ও আর দেখেনি। এখন এই কষ্টের গল্পগুলো ভুলে যেতে চায়। টুম্পা ওকে ভিন্ন জগতে নিয়ে এসেছে।

ও একদিন টুম্পাকে ঐ রেনট্রি গাছটা দেখাতে নিয়ে যাবে। টুম্পা কি তখনো হেসে গড়িয়ে পড়বে? বলবে জারজ ছেলে-মেয়ে আমার খুব ভালোলাগে? তিতুমীর ছটফটিয়ে উঠে। পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়।

তিতু? তিতু?

টুম্পার ব্যস্ত-সমস্ত ডাকে ওর চমক ভাঙে। দ্রুত হাতের তালুতে চোখ আর গাল মোছে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নিচে এসে দাঁড়ায়।

কি রে কোথায় ছিলি?

ঘরে।

কেন?

এমনি। কাক দেখছিলাম।

কাক? টুম্পা হাসিতে ভেঙে পড়ে। কাক কেমন দেখলি?

ভাবলাম কাকটা কি জারজ।

তুই তো ভারি সেয়ানা ছেলে। সব কথা ধরে ফেলিস।

টুম্পা আপা? গম্ভীর হয়ে ডাকে ও। কাক কি জারজ হয়?

জানি না। আমি তোর মন খারাপ করে দিয়েছি, নারে তিতু?

না তো। ও ফিক করে হেসে ফেলে।

যা মোড়ের দোকান থেকে আইসক্রিম নিয়ে আয়। দু'টো আনবি। একটা তোর, একটা আমার।

আমার? খুশিতে ওর চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে।

এতদিন কখনো টুম্পা ওকে আইসক্রিম খেতে বলেনি। তবে টুম্পা সব সময় ওর প্রশংসা করে। বলে, রাস্তায় রাস্তায় থেকেছিস এই বয়সেতো তোর বখে যাওয়ার কথা। নষ্ট পরিবেশে থেকেও তুই এমন ভালো রয়ে গেলি কি করে রে?

ও কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। মানুষ বখে যায় কি করে? টুম্পা কি বখে গেছে? ধুত না। নিজেকে শাসন করে দ্রুত পা চালিয়ে দোকানে আসে। দোকানদার মিজানের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গেছে। ওকে দেখলেই হেসে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে, টুম্পা আপা কেমন আছে রে? ও ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, ভালো। কখনো জিজ্ঞেস করতে পারে না যে টুম্পার খবরে তোমার কি? কেন জিজ্ঞেস করো? টুম্পা তো তোমার কথা বলে না। কিন্তু বলা হয় না। ও কাউকেই জোর করে কিছু বলতে পারে না। মিজানও মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে মজা করে।

একদিন তোদের বাসায় যাবো তিতুমীর।

কেন?

টুম্পাকে দেখতে।

মিজান ওকে চোখ টিপি দেয়। তিতুমীরের রাগ হয়। তুই যদি আমাকে নিয়ে যাস তাহলে তোকে আইসক্রিম খাওয়াবো।

BanglaBook.org

ও কথা বলে না। আইসক্রিম কিনে নেমে আসে।

রাগ করলি তিতুমীর? মিজান দৌড়ে এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখে। ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে গলিতে ঢোকে।

একেই কি বখে যাওয়া বলে? কি জানি। মিজান কি করে টুম্পার কথা ভাবে? ও কি টুম্পার যোগ্য?

আইসক্রিম নিয়ে লাফাতে লাফাতে ও যখন বাড়ি ফিরে তখনো টুম্পা ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। টুম্পা হাত বাড়িয়ে একটি নেয় আর অন্যটি ওকে ইশারায় খেতে বলে। ও পেছন দিকের বারান্দায় বসে মজা করে আইসক্রিম খায়। এমন একটা অপূর্ব জিনিসের স্বাদ পেতে ওর বারো বছর গড়িয়ে গেছে। এখন মনে হয় দিনগুলো ভালোই যাচ্ছে। একটু পর বাবুর্চি এসে কান ধরে, খুব মুখ চালানো হচ্ছে?

তোমার কি?

ইস্ পুঁচকে ছোঁড়ার ডাট দেখো। দেবো কষে একটা।

দিয়ে দেখো? টুম্পা আপাকে বলে দেবো।

বাবুর্চি খিস্তি করে গালি দেয়। তারপর গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে যায়। তিতুমীর জানে বাবুর্চি ওকে হিংসে করে। তাই কিছু বলে না।

একটু পর টুম্পা ওকে ডাকে। জিজ্ঞেস করে, আইসক্রিম খেয়েছিস?

ও ঘাড় কাত করে।

এখন থেকে তোকে আমি রোজ আইসক্রিম খাওয়াবো।

খুশিতে ওর দৃষ্টি চক্‌চক্ করে।

আচ্ছা, তিতু তোর বয়স কত রে?

ও চুপ করে থাকে। শেষে টুম্পা নিজেই বলে, বারো-তেরো হবে হয়তো। ঠিকমতো খেতে পাসনি তো সেজন্য শরীরটা তেমন বাড়েনি।

মা যা পেতো বেশির ভাগ আমাকে দিতো।

সে আর কতটুকু। জানিস আমাদের দেশটি গরিব কেন?

না তো।

সব নাকি বৃহৎ শক্তির খেলা। বাবা এসব বলে। আমিও তেমন বুঝি না। আমরা নাকি বৃহৎ শক্তির দাবার ঘুঁটি। ওরা হাসালে আমরা হাসি, ওরা কাঁদালে আমরা কাঁদি।

তিতুমীর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এসব কথার মাথামুণ্ডু ও বোঝে না। টুম্পা যখন বলে সুন্দর করে বলে। সেটা শুনতেই ওর ভালোলাগে। ওর মাও এমন সুন্দর করে গল্প বলতে পারতো না।

জানিস এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও নাকি সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত।

সাম্রাজ্যবাদ কি?

জানি না তো। দাঁড়া বাবা এলে এসব জেনে নেবো। আমার বাবা অনেক কিছু জানে। অহংকারে টুম্পার গলার স্বর বদলে যায়।

তখন তিতুমীরের মিছিলের কথা মনে হয়। মিছিলের স্লোগানগুলো ওর তেমন মনে থাকে না, কিন্তু বজ্রপাতের মতো শব্দগুলো সারা শহর আলোকিত করে রাখে।

তুই শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনেছিস রে?

না।

আমিও শুনিনি। আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করে। তুই ভাসানীর বক্তৃতা শুনেছিস?

না।

BanglaBook.org

ধুত্ তুই একটা গাধা ছেলে। আচ্ছা তিতু বাবা নেই বলে তোর মন খারাপ করে না?

ও চুপ করে থাকে।

তোর মনে খুব দুঃখ না রে?

ও ভালো করে তেমন কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ে। দুঃখবোধে ও তেমন আক্রান্ত নয়, যে বাবাকে ও দেখেইনি তার জন্য আবার দুঃখ কি? তবে টুম্পার মতো বাবাকে নিয়ে অহংকার করার মতো কেউ ওর জীবনে নেই। টুম্পার মতো বিশাল বাবা থাকলে ওর কী যে মজা হতো। এই মুহূর্তে টুম্পার মতো অহংকারে গর্বিত হবার জন্য ওর বুক ফেটে যাচ্ছে, ওর কষ্ট বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয় ওকে গ্রাস করে। ঐ ভয়টা ও কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। ঘুমুবার সময় কিংবা খেতে বসলে পা থেকে মাথার দিকে কি যেন উঠতে থাকে। শিরশিরে অনুভূতি ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলে। ও অস্থির হয়ে যায়।

বিকেলে টুম্পা ওকে ডাকে।

চল সবজি বাগানে পানি দিবি।

ও বালতি নিয়ে আসে।

জানিস এবার টমেটোগুলো অনেক বড় হবে।

কি করে বুঝলেন?

আমি সব বুঝতে পারি। মনে হয় আরেক জন্মে আমি বুঝি চাষার ঘরের মেয়ে ছিলাম। আমার বাবার চাষবাস ছিলো। গোলাভরা ধান, বাগান ভরা ফল, ক্ষেতভরা আনাজ, পুকুর ভরা মাছ ছিলো। এসব ভাবতে আমার খুব ভালোলাগে রে। এই শহুরে জীবনে কেমন হাঁফ ধরে। কেন এমন হয় বলতো?

তিতুমীর হাঁ করে টুম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবাক হয়ে শোনে, কথাগুলো রূপকথার মতো। টুম্পা আপা কথা বলতে বলতে থেমে যায় কেন? দিনভর বলতে পারে না?

জানিস মনে হয় আমি ধানক্ষেতের আল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দু'পাশে সোনালি ধানের ছড়া আমার পায়ের কাছে বিছিয়ে আছে। পথ যায় ফুরোয় না রে। হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেক দূর যেতে পারি।

ফুটপাথের ছেলে তিতুমীর, এইসব দৃশ্যের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। টুম্পার স্বপ্ন ও ধরতে পারে না। শুধু মনে হয় টুম্পা এই বাড়ির কেউ না, অনেক দূরের কেউ ওই আকাশে যার বাসাবাড়ি। তখন ওর সাথে টুম্পার দূরত্ব বেড়ে যায়। ও বুঝতে পারে না মানুষ এমন বদলে যায় কেন? ওর কষ্ট হলে কি ওকে কেউ চিনতে পারে না? কৈ দুদু তো ওকে কোনোদিন এমন কথা বলেনি কিংবা আবদুল? ওর মনে হয় ওর দুঃখ বাড়লে ও মানুষের কাছাকাছি হয়। অমন একা এবং দূরের লোক হয়ে যায় না। এইসব মুহূর্তে টুম্পাকে ওর একদম পছন্দ হয় না।

তোকে পেয়ে আমি একটা কথা বলার লোক পেয়েছি রে তিতু, এখন আমার আর কলেজের বন্ধুদের তেমন ভালোলাগে না। ওরা বোঝে কেবল নিজেদেরটা, তোর মতো সরল কেউ না।

টুম্পা ঝর্ণা হাতে টমেটো গাছে পানি দেয়। ও একবার ভাবে টুম্পাকে কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি বলবে? ও টুম্পার কাছে এসে দাঁড়ায়, টুম্পা আপা?

কি রে?

আপনার দুঃখ কি?

BanglaBook.org

দুঃখ? জানি না তো। টুম্পার উদাস কণ্ঠ অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। আমরা কি সবাই একটা দুঃখের বাঁশের কেল্লার মধ্যে থাকি রে তিতু?

পরক্ষণে হেসে ওঠে। সেই উচ্চকিত হাসিতে হকচকিয়ে যায় তিতুমীর। ওর মনে হয় আজিজের দোকানে একটা পাগল আসতো। লোকটি এমন করতো। খেতে দিলে কখনো গপগপিয়ে খেতো, কখনো দু'মুঠি খেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতো কাকদের। কখনো উচ্চস্বরে হেসে উঠতো, পরমুহূর্তে মাথা গুঁজে বসে থাকত। ওই লোকটির জন্যে তিতুমীরের মায়া জন্মেছিলো। ওর ক্ষমতা থাকলে ও ওকে ভালো করার জন্য পাগলদের হাসপাতালে নিয়ে যেত। অনেকদিন ও বলতে চেয়েছে তুমি মানুষ হও, মানুষ হয়ে যাও। কিন্তু বলা হয়নি, ওতো জানে না কেমন করে ভালো হবে।

কি রে হাঁ করে দেখছিস কি? হেই তিতুমীর, তুই একটা বাঁশের কেল্লার তিতুমীর।

টুম্পা হৈ-চৈ করে ওর হাত ধরে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে আসে। খেয়ালই করে না দু'টো টমেটো গাছের ডাল মাড়িয়ে দিয়ে এসেছে। তিতুমীরের মনে হয় আসলে ওই পাগলটির সঙ্গে টুম্পার খুব একটা পার্থক্য নেই।

এতদিন মনেই ছিলো না আমার, তুই যে একটা বাঁশের কেল্লা বানাতে পারিস। এটা আজ আমার আবিষ্কার। বল কি খাবি?

তিতুমীর কথা বলে না। এই সবের সঙ্গে ওর কোনো পরিচয় নেই। ফুটপাথের জীবনে এমন সুবাতাস ছিলো না। এ উচ্ছ্বাস, হাসি, আনন্দ একদম ভিন্ন। এই নতুন জীবন ওকে কখনো কাঁদায়, কখনো ব্যথিত করে রাখে। সবকিছুই ওর নাগালের বাইরে, ওর মুঠিতে কিছুই নেই, কেবল কষ্টটুকু ছাড়া। সেজন্যই এইসবের সঙ্গে ও পাল্লা দিতে চায় না।

কি রে বললি না তুই কি খাবি? ঠিক আছে তোকে একটা নতুন জিনিস দেবো। আর এখন থেকে তোকে বাঁশের কেল্লার তিতুমীর ডাকবো। কী যে মজা লাগছে।

বাঁশের কেল্লা কি?

সে এক মস্ত গল্প। আর একদিন শুনিস।

টুম্পা হুড়মুড়িয়ে দোতলায় উঠে যায়।

টুম্পার কাছে বাঁশের কেল্লার গল্প আর শোনা হয় না তিতুমীরের। পরদিন থেকে টুম্পা আবার নিজের জগতে চলে যায়। চড়া ভল্যুমে গান শোনে, নইলে টেলিফোনে গল্প। এ বাড়িতে তিতু নামের কোনো ছেলে আছে, এ কথা ও মনে করে না। বড় একা একা লাগে ওর। তিন-চার দিন ধরে আবদুলও নেই। সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রাম গেছে। বেগম সাহেবও রাতের আগে ঘরে ফিরে না। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে ওর। মনে হয় বাসাটা একটা প্রেতপুরী। ওর কখনো ইচ্ছে করে ছুটে বেরিয়ে চলে যেতে, পরক্ষণে গুটিয়ে যায়। ফুটপাথের জীবনের বিভীষিকা হা-হা করে তেড়ে আসে। ও গেটের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গলি দেখে।

পরদিন খুব ভোরে বারান্দায় টুম্পাকে একলা পেয়ে যায়, টুম্পা আপা?

কিরে মুখটা অমন হাড়ির মতো কেন? মন খারাপ? রাতে ভাত খাসনি?

আমি কয়দিনের ছুটি নেবো।

কোথায় যাবি?

আমি দুদুর কাছে যাবো।

ও কোথায় থাকে?

কাঁটাবন বস্তিতে। আপনি বেগম সাহেবকে বলবেন।

এই তিতু শোন, শোন– ও আর দাঁড়ায় না। দৌড়ে লন পেরিয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ায়। প্যান্টের পকেটে কয়েক মাসের বেতন। এই নয় মাসে কিছুই খরচ করেনি,

BanglaBook.org

কিপ্টের মতো জমিয়েছে।

ও যখন বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তখন রোদ উঠেছে। লোক চলাচল তেমন শুরু হয়নি। ও হাঁটতে হাঁটতে মহাখালি আসে। এখান থেকে বাসে উঠে শাহবাগ নামে। কাঁটাবন বস্তিতে দুদুকে খুঁজে-বের করতে বেশ কষ্ট হয় ওর। দুদু কেবল ঘুম থেকে উঠেছে। ওকে দেখে হৈ-চৈ করে ওঠে।

আরে তিতু তুই তো ভালোই ঢ্যাঙা হয়েছিস? কিন্তু শরীরে চিকনাই ধরেনি কেন? বড়লোকের বাড়িতে খাবারে তেজ নেই বুঝি? বস, আমি আসছি।

তিতুমীর দুদুর চৌকির ওপর বসে। চারদিক এলোমেলো, নোংরা। বাসনকোসন, কাপড়চোপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সিগারেটের খালি প্যাকেট, ছোট টুকরো ঘরময় ছড়ানো। ওর গা ঘিনঘিন করে। এতদিনে অভ্যেসটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। এখন এইসব জঞ্জাল ভালোলাগে না। একসময় এসবের ভেতর দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। দুদু এক ঠোঙা ডালপুরি আর গ্লাসে করে চা নিয়ে আসে।

নে, খা। তাহলে তুই ভালোই আছিস তিতু?

ও ঘাড় কাত করে। গরম ডালপুরিতে ওর জিভ পুড়ে যায়।

তুমি এখন কি করছো?

কত কি? টুকটাক কাজ আর কি? যখন যেটা জোটে। তোকে কিন্তু ছাড়ছি নে, কিছুদিন আমার এখানে থাকবি।

কেন?

দেখছিস না দেশের আবহাওয়া কেমন বদলে যাচ্ছে। রোজ পল্টনে মিটিং হয়। তুই আমার সঙ্গে যাবি। আমরা দু'জনে আবার চায়ের দোকানে কাজ করবো।

দুদুর কথা ওর ভালোলাগে। একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। ওই বাড়িতে আপাতত না যেতে পারলেই বেঁচে যায়। দুদু ওর আপন কাছের লোক। কিন্তু টুম্পা দূরের, অনেক দূরের। কাছে যেতে চাইলেও যাওয়া যায় না।

কি ভাবছিস তিতু?

কিছু না।

তোর মায়ের দেখা পেয়েছিলি?

না।

চল বেরিয়ে পড়ি। জানিস তিতু শহরটা পাল্টে গেছে।

দু'জনে পথে নামে। তিতুমীর খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকায়। পাল্টে যাওয়া শহর ও দেখতে চায় না। শহরটা কি ওর আপন হবে না পর?

এ পর্যন্ত বলে তিতুমীর থেমে যায়। প্রদীপ্ত বলে, বুঝেছি আজ এই পর্যন্ত, তাই না?

তিতুমীর মাথা নাড়ে। মঞ্জুলিকা ওর পকেটগুলো ভরে বাদাম দিয়ে বলে, আবার কবে দেখা হবে রে?

যেদিন আপনারা বলবেন।

ও আর দাঁড়ায় না। বাদাম ভেঙে খেতে খেতে চলে যায়। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার হাত ধরে, গরম হাতের তালু। প্রদীপ্তর মুঠিতে সে হাত পেলব হয়ে থাকে।

দু'দিন পর শাহবাগের মোড়ে দেখা হয় অহিউল্লাহর সঙ্গে। চমকে ওঠে প্রদীপ্ত। অহি ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, চমকে উঠলি যে?

BanglaBook.org

তোমাকে দেখলে ভয় করে অহি ভাই। এই শহরের প্রলয় বুঝি কাছে?

অহি হাসে না। ওর মুখ বিষণ্ন হয়ে যায়।

প্রদীপ্ত বলে, আবার রক্ত আর মৃত্যু, না?

অহি প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, তুমি কেমন আছো প্রদীপ্ত?

ভালো। এম. এ. পাস করেছি। সাংবাদিক হয়েছি। মঞ্জুলিকাকে ভালোবাসি।

বাহ্ বেশতো।

তুমি কেমন আছো অহি ভাই? কতদিন তোমাকে দেখিনি।

ভালোইতো আছি। বলেছিলাম না সময়মতো দেখবে। প্রয়োজনে দেখবে।

তা তো বলেছিলে। কিন্তু বললে না তো সে সময় কি হয়েছে?

বুঝতে পারো না? আমি তো জানি তোমার চোখ-কান খোলা থাকে প্রদীপ্ত।

খোলাইতো আছে। তবু তোমার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি। তুমি কিছু বলো?

প্রদীপ্ত জোরে কথা বলে উঠলে আশেপাশের লোকজন ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। ও মুহূর্তে থমকে গিয়ে খানিকটা বিব্রত হয়। না, কোথাও অহিউল্লাহ নেই। অনুভব করে পিঠে একটি হাতের স্পর্শ। পেছন ফিরে দেখে নসিব। প্রদীপ্ত ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কি অমন বোকার মতো তাকিয়ে আছো কেন?

বুঝতে পারিনি যে আপনি অহি ভাই নন। ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমার প্রিয় মানুষ।

অহি কে?

সেই অহি, অহিউল্লাহ্ যে একুশের মিছিলে গুলি খেয়ে শহীদ হলো।

এসব তো আমি জানি। কিন্তু ও তোমার পিঠে কিভাবে হাত রাখবে?

রাখে, রাখে। এসব আপনি বুঝবেন না নসিব ভাই।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে প্রদীপ্ত?

তখন প্রদীপ্ত মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। ঘোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝতে পারে নিজেকে। বিড়বিড়িয়ে বলে, সবাই কি সবাইকে দেখতে পায় নসিব ভাই। দেখার চোখ চাই যে!

তারপর হেসে বলে, আপনি কেমন আছেন? ভাবীর খবর কি? দোদুল কেমন আছে? কথা বলতে শিখেছে তো?

এত প্রশ্ন একসঙ্গে করলে কি করে জবাব দেবো? একটা প্রশ্নের উত্তর শোনো, ভালো নেই। চলো কোথাও গিয়ে বসি।

তার চেয়ে চলুন না বাসায় যাই। দোদুলকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

যাবে? ঠিক আছে চলো।

নসিব এক মুহূর্ত ভেবে রিকশা ডাকে।

নাসিমা প্রদীপ্তকে দেখে খুশি হয় না। এই ভর দুপুরে বাইরের লোক অসহ্য। ভুরু কুঁচকে থাকে ওর। তবু জিজ্ঞেস করে, এতদিন পর তুমি কোথা থেকে এলে? কেমন আছো? ভালো।

আপনি কেমন আছেন ভাবী?

আর থাকাথাকি। জীবনটা একটা ঘানি বুঝলে। আগে জানলে কে বিয়ে করতো!

দোদুল কই ভাবী?

BanglaBook.org

ঘুম পাড়িয়েছি।

ও আচ্ছা। আমি ওকে দেখতে এসেছিলাম।

এসো না, দেখবে এসো।

নসিব ডাকে। প্রদীপ্ত তাড়াতাড়ি বলে, না থাক। শব্দ হলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আমি যাই নসিব ভাই।

থাকো না, দুপুরে খেয়ে যাবে।

দেরি হবে। রান্না হয়নি। নাসিমা বিরক্তি প্রকাশ করে।

না, না দরকার নেই। আমি যাচ্ছি।

প্রদীপ্ত দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। পেছনে নসিব। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কথাই হলো না নসিব ভাই। আপনি এখন কি লিখছেন? ভুলতে পারি না সেসব দিনের কথা, যখন আপনি লিখতেন আর আমি পড়তাম।

সেসব দিনের কথা আমি ভুলে গেছি প্রদীপ্ত।

সে কি কথা?

দেখলে না, কি নরকে আছি। এখানে কি লেখা হয়? লিখতে বসলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে। বলে, কালচার করতে হবে না। কালচারের গোষ্ঠী উদ্ধার করি। প্রদীপ্ত আমাকে দিয়ে বোধহয় আর কিছু হবে না।

প্রদীপ্ত হাত চেপে ধরে, ভালোবাসার মূল্য কি এভাবে দিতে হচ্ছে নসিব ভাই?

হ্যাঁ তাই, এসব ভাবলে কেন জানি শহীদ সাবেরের কথা মনে হয়। আমিও বোধহয় ওর মতো পাগল হয়ে যাবো।

আহ্, এসব কি ভাবছেন।

তখন তীক্ষ্ণস্বরে নাসিমা নসিবকে ডাকে। প্রদীপ্ত তাড়াতাড়ি বলে, হাত ছাড়ুন আমি যাই। ভাবী আপনাকে ডাকছে।

জানি না এভাবে কতদিন চলবে। দেখবে, হয়তো বেশি দিন না। হিসহিস কণ্ঠে কথাগুলো বলে নসিব ঘরের দিকে যায়। নাসিমা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। উগ্র মূর্তি, যেন কোনোকিছু হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

প্রদীপ্ত দাঁত কিড়মিড়িয়ে উচ্চারণ করে, ডাইনি।

একটা রিকশা ডেকে উঠে বসে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। সোজা প্রেসক্লাবে যাবে। ওখানে রান্না ভালো হয়। যেকোনো হোটেলের চাইতে এখানকার খাবার ওর মায়ের হাতের রান্নার মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে মাকে বলে, তোমার রান্না আমার জিভের তৃপ্তি নষ্ট করে দিয়েছে মা। বাইরে কোথাও খেয়ে স্বাদ পাই না। মনে হয় তোমার মতো নয়।

আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলবে, এটা একদম ভালো কথা নয় দীপু। মায়ের রান্না ছাড়া আর কিছু মুখে না রুচলে বৌমার ঝামেলা হবে। ঐ বেচারা কেন কষ্ট পাবে? অভ্যেস বদলে ফেলো।

কি যে বলো বাবা। প্রদীপ্ত মাথা চুলকে সরে পড়ে। প্রেসক্লাবের ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখতে পায় অনেকে খেতে বসেছে। খাসির মাংসের রেজালা থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে। বাঁশমতি চালের ভাত মৃদু ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। ও চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

খাওয়া শেষ করতে পারে না, দেখে শহীদ সাবের উঠে আসছে। প্রদীপ্তর বুক ধড়ফড় করে ওঠে। সাবেরের প্রেসক্লাব প্রিয় জায়গা। বেশির ভাগ সময় এখানে থাকতেই ভালোবাসে। কদিন আগে প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলেছিলো, সাবের ভাই কবিতা লিখতে হবে আপনাকে?

BanglaBook.org

ভুরু উঁচিয়ে বলেছিলো, কবিতা? ছাপবে কে? পড়বে কে?

আমি ছাপবো। আমরা সবাই পড়বো।

সব মূর্খ। কেউ কিছু পড়ে না। তারপর বলে, কবিতা লিখে দিতে পারি, টাকা দিবি?

এক্ষুণি যদি লিখে দেন তাহলে পাঁচ টাকা দেবো।

কাগজ-কলম দে।

প্রদীপ্ত কাগজ-কলম দেয়। শহীদ সাবের দ্রুত কয়েক লাইন লেখে। তারপর কাটে, আবার লেখে। একসময় কাগজটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে। আর এক টুকরো কাগজ চেয়ে নেয়। পাঁচ-ছয় লাইন লিখে বলে, আর তো লিখতে পারছি না।

প্রদীপ্ত মাথা নেড়ে বলে, শেষতো হলো না।

শহীদ সাবের সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঠিক আছে তাহলে পাঁচ টাকা পুরো দিতে হবে না। কিছু কেটে দিয়ে দে।

প্রদীপ্ত কোনো কথা না বলে পাঁচটা টাকা দেয়। সাবের নেয় না। দু'টাকা রেখে বাকিটা ফেরত দিয়ে দেয়।

আজও ঘরে ঢুকে শহীদ সাবের সরাসরি প্রদীপ্তর কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রদীপ্ত বলে, ভাত খাবেন সাবের ভাই?

না।

তারপর বাম মুঠিতে পেঁচিয়ে রাখা কাগজটা প্রদীপ্তর সামনে রেখে বলে, দেখতো কবিতাটা কেমন হয়েছে? আমি ওদিকে বসছি। ভাত খেয়ে আয়।

প্রেসক্লাবে তার নিয়মিত ভাত খাবার ব্যবস্থা আছে। এজন্য পয়সা দিতে হয় না। কিন্তু সাবের রোজ খায় না। এখানকার জমজমাট আড্ডা এড়িয়ে এক কোণায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানে, একটার পর একটা। কোনোদিকে খেয়াল নেই, অসম্ভব চুপচাপ, বিষণ্ন। মাঝে মাঝে সে-মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্তর হাত নিশপিশ করে। মনে হয় ও শিল্পী হলে এ মুখটা আঁকত। এ মুখটায় মোনালিসার মতো শিল্পকর্ম হবার উপাদান আছে। কোথায় এ মুখের অসাধারণত্ব তা বোঝার সাধ্য হয়তো অনেকের নেই।

সাবের চলে গেলে করিম বলে, মনে হয় না যে ও পাগল।

মোরশেদ যোগ করে, আমিও মাঝে মাঝে তা ভাবি। এই ভালো, এই মন্দ, কি করে তা সম্ভব।

মহাদেব বলে, জানেন সাবের ভাই এখন রাতেও 'সংবাদ' অফিসে থাকছেন। যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন– মেঝেতে, বারান্দায়, সম্পাদকীয় বিভাগের টেবিলে। 'সংবাদ' থেকে তাঁকে দু'টাকা করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রদীপ্ত বলে, মনে হয় সংবাদ-এর চত্বর আর প্রেসক্লাব এ দু'টো তার প্রিয় জায়গা।

মহাদেব আনমনা হয়ে বলে, মানুষের খানিকটুকু আপন জায়গা না হলে মানুষ বাঁচবে কিভাবে প্রদীপ্ত। রাস্তাতো মানুষের আশ্রয়স্থল নয়। তবে একটা কথা কি জানো, আমি সাবের ভাইকে বুঝতে পারি না। গত সপ্তাহে মোরশেদ ওনাকে নিয়ে ফিচার লিখেছিলো।

উনি সরাসরি ওকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, অ্যাম আই এ কমোডিটি? আমি কি পণ্য নাকি? আমাকে নিয়ে পত্রিকায় লিখেছেন কেন?

কদিন আগে তো আপনিও লিখলেন মহাদেবদা, আপনাকে কিছু বলেনি?

বলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পড়েছেন লেখাটা? বললো, লেখা দিয়ে কি হবে? পয়সা দেন। বুঝেছো প্রদীপ্ত একজন জীবনবাদী লেখক আর লেখার কথা জানতে চায় না।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলেছিলো, এখন তিনি তাঁর সব বোধ সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেন। একজন দার্শনিকের মতো লাগে। যেন একমাথা জট পাকানো চুলের মতো তার ভেতরটা পাকিয়ে আছে মহাদেবদা।

ভালো বলেছো। মহাদেব ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

অনেকেই খাওয়া শেষে টেবিল থেকে উঠে গেছে। মহাদেব আর প্রদীপ্ত মুখোমুখি বসে আছে। প্রদীপ্ত উঠতে পারছে না এই ভেবে যে শহীদ সাবেরকে ও কি বলবে। তখন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে শহীদ সাবের। কাগজের টুকরোটা নিতে নিতে বলে, নিয়ে যাচ্ছি কবিতাটা। তোর তো পড়ার সময় নেই।

কে বলেছে সময় নেই। দিন। এখুনি পড়বো।

থাক, দরকার নেই।

মহাদেব হাত বাড়িয়ে বলে, আমাকে দিন সাবের ভাই। আমি 'পূর্বদেশ'-এ ছেপে দেবো। সাবের এক মুহূর্ত দীপ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কবিতাটি। তারপর চেয়ার টেনে বসতে বসতে চেঁচিয়ে বলে, অ্যাই কে আছিস ভাত দে।

বেয়ারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কি খাবেন? মাছ না মাংস?

খাবো তোর মাথা আর আমার মগজ। জানিস এ দেশে কারো মাথায় মগজ নেই। আমরা একজনেরটা আর একজন খেয়ে ফেলেছি।

আধা-খাওয়া সিগারেটের টুকরো গুঁজে দেয় সামনে রাখা খালি পিরিচের মধ্যে। তারপর পা তুলে চেয়ারের ওপর জাঁকিয়ে বসে। নোংরা আঙুলগুলো মুখে পুরে নখ কাটে।

ভাত-মাছ নিয়ে আসে বেয়ারা। সাবের হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের ওপর, যেন কতকালের খিদে। প্রদীপ্তর মনে হয় শহীদ সাবেরকে এখন আর চেনা যায় না। সেও কাউকে চিনতে পারছে না। মুহূর্তে পুরো পরিবেশ দু'জনের কাছে অচেনা হয়ে যায়। ও রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

BanglaBook.org

দু'দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ঘরে বসে কুঁকড়ে থাকে আলী আহমদ। কদিন ধরেই শহীদ সাবেরের কথা খুব মনে হচ্ছে, কেন যে এই মনে পড়া নিজেও বুঝতে পারে না। এ এমন এক খারাপ লাগা, যা কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া বুকের ভেতর জন্মেছে। তা চট্ করে সরিয়ে ফেলাও যায় না। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমী কাউন্সিল এক হঠকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ঘোষণায় বলা হয় বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতির সংস্কার সাধন প্রয়োজন। সবাই বিস্মিত, হতবুদ্ধি হয়েছে। বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে আলী আহমদ নিজেও। কিন্তু বুকের ভেতর ভয় এবং ক্রোধ জমে আছে। বুঝতে পারছে কোথাও কোনো গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আবার লড়াই, আবার। বাহান্নোতে রক্ত দিয়ে যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে তার গায়ে আবার হাত, তা কি কেউ সইবে? সইবে না বলেইতো ঢাকা শহরে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেদিন মন খারাপ নিয়ে আলী আহমদ 'সংবাদ' অফিসে আসে। ইচ্ছে সাবের এবং মতিউর দু'জনের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সাবের নেই। মতিউর টেবিলে বসে কাজ করছে। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, মাথার চুল কবে যে সব সাদা হয়ে গেলো, মনে হয় বয়স বেড়েছে। আলী আহমদকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে হাত জড়িয়ে ধরে, কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা? কেমন আছেন? আলী আহমদ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কেমন অপরাধী বোধ হয়। জুলেখা মারা যাবার পর এই নিঃসঙ্গ

লোকটিকে ওর সঙ্গ দেওয়া উচিত ছিলো। দিতে পারেনি কিংবা দেওয়ার কথা আগে মনে হয়নি। এখন যেমন তীব্রভাবে মনে হচ্ছে।

একথা-ওকথার পর মতিউর বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গ ওঠায়, বলুনতো ওরা আবার কেন আগুনে হাত দিয়েছে? বাহান্নোতে ওদের শিক্ষা হয়নি?

আলী আহমদ বড় করে শ্বাস নিয়ে বলে, গভীর ষড়যন্ত্র।

মতিউর ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বলে, এবারের মূল্যটা বোধহয় একটু বেশি দিতে হবে।

অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে হালকা মনে বাড়ি ফেরে আলী আহমদ। কিন্তু মতিউরের কঠিন মূল্য শব্দ দু'টো মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারে না। মূল্যটা কি? ভাবতে ভাবতে ও পুষ্পিতার মুখোমুখি হয়। পুষ্পিতা বারান্দার চৌকিতে শুয়ে গান শুনছিলো। ও আলী আহমদের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায় না। আলী আহমদ নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। ওর ইচ্ছে করছিলো পুষ্পিতার পাশে বসে পড়তে, আচমকা অবাক করা অনেক কথা বলতে, কিন্তু পারলো না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে এবার বড় মূল্য দিতে হবে, একথা পুষ্পিতাকে বললে ও ভয় পাবে, কাঁদবে। এবং এত বছর পরও ও এদেশে উদ্বাস্তু, এই বোধে মন খারাপ করে থাকবে। বেচারীর শান্তি নষ্ট করে লাভ কি?

কিছুদিন পর আইয়ুব খান ঢাকায় এলে নজরুল একাডেমী তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। আইয়ুব খান তাঁর ভাষণে এক জায়গায় বলেন, 'একদিন দেশের সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি পাকিস্তানি ভাষা হবে।'

প্রেসক্লাবে বসে এই ভাষণ পড়তে পড়তে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ে প্রদীপ্ত। বলে, বাহান্নোতে মিছিলে গিয়েছিলাম কিছু না বুঝে, এখনতো সবই বুঝি মহাদেবদা।

মহাদেব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, কি হয়েছে?

কি আর, নতুন ষড়যন্ত্র। কাজটি অত সহজ নয়।

মহাদেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, জানি। এসব আমাকে তেমন ভাবায় না। আমি বুঝি বাধা দিলে লড়তে হবে। হয় জীবন, নয় মরণ।

আমার ভেতরটা পুড়ে যায় মহাদেবদা। সহ্য করতে পারি না।

তোমার আবেগ বেশি।

এ আবেগ দিয়ে তো কবিতা লিখতে পারি না।

আবেগের প্রকাশ এক একজনের এক একরকম।

মহাদেব চুরুট ধরায়। প্রদীপ্ত সরে পড়ে। সোজা বাড়ি ফিরে আসে। আলী আহমদের শরীর খারাপ। ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। আজ ক্লাসও ছিলো না। পুষ্পিতা ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস রান্না করেছে। সে গন্ধ ভুরভুর করছে বাড়িজুড়ে। অন্যদিন হলে এ গন্ধ প্রদীপ্তকে পাগল করে দিতো। আজ ওর মন খারাপ। বাড়িতে বাবাকে দেখে জিজ্ঞেস করে, বাবা পাকিস্তানি ভাষা কি? আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, আইয়ুব খানের মরণ।

ঠিক বলেছো।

প্রদীপ্ত খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। তুড়ি বাজাতে বাজাতে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। শরীর বেয়ে পানি গড়াতে থাকলে ওর মনে হয় এতক্ষণে ভালো লাগছে। অনেক কষ্ট ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

খেতে খেতে একসময় খাওয়া বন্ধ করে ও স্তব্ধ দৃষ্টিতে আলী আহমদের দিকে তাকায়। পুষ্পিতা বলে, কি রে অমন করে চেয়ে রয়েছিস যে? কি হয়েছে?

পুষ্পিতার প্রশ্নে আলী আহমদ এবং প্রতীকও ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত স্বগত কণ্ঠে বলে, এই শহরে অহিকে দেখেছি বাবা। কদিন আগে। শাহবাগের ওখানে।

প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, অহি? শহীদ অহিউল্লাহ?

আলী আহমদ এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে বলে, নেতারা পাকিস্তানি ভাষার স্বপ্ন দেখলে অহি কি চুপ করে থাকবে ভেবেছিস?

ওরা তিনজনে সোজাসুজি আলী আহমদের দিকে তাকায়। দেখতে পায় আলী আহমদের চেহারায় জ্যোতি। আলী আহমদ ওদের দিকে তাকায়। দেখতে পায় ওদের চেহারায় জ্যোতি। ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। দেখতে পায় প্রত্যেকের চেহারায় জ্যোতি। অনেককাল পর এই পরিবারের প্রত্যেকের চেহারা একরকম হয়ে ওঠে।

মাসখানেক পর সাতাশে অক্টোবর আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহা আড়ম্বরে উন্নয়ন দশক পালিত হয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে জাঁকজমক করে সামরিক প্রভুর গুণকীর্তনে মেতে উঠেছে প্রভুভুক্ত অনুচরেরা। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের সামনে তখন প্রিয় স্বদেশের অন্য চিত্র। বেশ কিছুকাল আগে থেকেই হিসেবনিকেশ কষছে দেশের রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদরা। দেখা যাচ্ছে দেশের দু'ভাগের মধ্যে সর্বত্র ব্যবধান, সর্বত্র অসম বণ্টন। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের ব্যবধান আকাশ সমান। কোটি টাকা ব্যয়ে মরুভূমিতে খাল খনন করা হয়, কিন্তু পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো বাস্তব ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। এমন নজির সব ক্ষেত্রে। অবিশ্বাস্য বৈষম্য রয়েছে পণ্য আমদানিতে– বৈষম্য কৃষি ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, চাকুরিতে, সেনাবাহিনীতে। কেন্দ্রীয় সরকারের সব দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে।

এতকিছুর পর উন্নয়ন দশকের প্রহসন সাধারণ মানুষ হজম করতে পারে না। সর্বত্র ছোটখাটো জটলা। পথেঘাটে, চায়ের দোকানের আড্ডায়, বাজারে, অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যেখানে দাঁড়ায় ঘৃণা প্রকাশ করে। তরুণরা খিস্তি করে। এসবের মাঝে মুষ্টিমেয় মানুষের দল আইয়ুব খানের গুণকীর্তন করে প্রতিদিন সভাসমিতি করছে। বক্তৃতা-বিবৃতি চলছে। এছাড়া সরকারি কাগজপত্র, খাম-পোস্টকার্ড, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার ফরম ইত্যাদি সবকিছুর ওপর উন্নয়ন দশকের সিল মারা হয়েছে। চারদিকে উন্নয়ন দশকের ধুম।

প্রদীপ্ত মহাদেবকে তিক্ত কণ্ঠে বলে, মহাদেবদা, সাবের ভাইর বুকেপিঠে উন্নয়ন দশকের সিল মেরে দিলে হয় না?

মহাদেব ভুরু কুঁচকে তাকায়।

প্রদীপ্ত শাণিত কণ্ঠে বলে, পূর্ব বাংলার উন্নয়নতো এরকমই হয়েছে মহাদেবদা। শুধু ন্যাংটো হয়ে ধেই ধেই নাচটুকু বাকি।

মহাদেব নিঃশব্দে ওর ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, তোমার মতো সবার ক্রোধ দিয়ে ওদের সিল আমরা পোড়াবো। ভেবো না।

দু'দিন পর গনগনে দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে প্রদীপ্তর মনে হয় শহরের সর্বত্র ও অহিকে দেখতে পাচ্ছে। অনেক উঁচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ও। কিন্তু কোথাও অখণ্ড অহি নেই। দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো শরীর। এখানে এক টুকরো তো ওখানে আর এক টুকরো। প্রদীপ্ত মন খারাপ করে। বাড়ি ফিরে আলী আহমদকে বলে, বাবা অহিকে দেখলাম ছিন্নভিন্ন অবস্থায়।

আলী আহমদ শুকনো মুখে বসেছিলো। কথা না বলে প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় ক্রোধের ভেতরেও ভীষণ সবুজ দেখাচ্ছে প্রদীপ্তর মুখ, রঙ গাঢ়।

BanglaBook.org

বাবা এমন করে তাকিয়ে আছো কেন? বাবা কি ভাবছো?

অহিতো ছিন্নভিন্ন হবেই। সেজন্যই তুমি নিজে শ্যামল পূর্ব বাংলা।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রদীপ্ত ভাবলো, বাবার আবেগ সবসময় একটু অন্যরকম।

পরক্ষণে নিজের দিকে মুখ ফেরায়। ওর নিজের অহিকে দেখার মানে কি? ও একটুক্ষণ ভাবে। তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়। বলে, এর মানে নিজের ভেতর শক্তি খুঁজে পাওয়া। অন্যের আত্মাহুতির ভেতরে নিজেকে আবিষ্কার করা।

ভেবেই শিস দিয়ে গান গেয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় বুকের ভেতর মঞ্জুলিকার উচ্ছ্বসিত হাসি। ওর এমন ভাবনার কথা শুনলে মঞ্জুলিকা দু'চোখ মেলে কৌতুকের হাসি হেসে তাকিয়ে থাকবে। বলবে, আচ্ছা তুমি এমন করে শক্তি সঞ্চয় করো কেন?

আমার শক্তি নিজের ভেতর জমা থাকে।

তাহলে বুঝতে হবে তুমি একটা বিরাট স্টোর হাউস।

হ্যাঁ তা বলতে পারো। আমি কোনোকিছু ধার করতে চাই না।

নিজের ঘরে এসে বন্ধ জানালা খুলতে খুলতে ও ভাবে, আমিও ধার করতে চাই না মঞ্জুলি। নিজের অতীতের কাছ থেকে গ্রহণ করা ধার নয়। বরং যেটুকু আছে তার সঙ্গে বাড়তি কিছু যোগ করা। আমি তোমার সঙ্গেও আমারটুকু যোগ করতে চাই। তাহলে কি হবে? তুমি আর আমি সময়কে জয় করে বিস্তৃত হবো। ওহ্, কী সুখ!

চারতলার ওপরের খোলা জানালা দিয়ে হু-হু বাতাস ঢোকে ঘরে। মনে হয় একটু আগে পেরিয়ে আসা গনগনে দুপুর এখন কী আশ্চর্য শান্ত এবং স্নিগ্ধ, ঠিক মঞ্জুলিকার লাবণ্যভরা শরীর। ও বাতাসে দু'হাত বাড়ায়, যেন মঞ্জুলিকা দু'বাহুর ভেতর আটকা পড়েছে। বাতাসে ফিসফিসিয়ে ওঠে অদ্ভুত কণ্ঠ, এখনই তো সময় হুটোপুটির– প্রদীপ্ত ঘোরের ভেতর বাথরুমে ঢোকে। শাওয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য, জলের ভেতরও মঞ্জুলিকার কণ্ঠ, এখনতো আমাদেরই সময়। প্রদীপ্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ও বুঝতে পারে ওর চারপাশে পদ্মফুলের ঘ্রাণ।

BanglaBook.org

১১

রাজপথ জুড়ে বিশাল মিছিল যাচ্ছে। পাশাপাশি হাঁটে প্রতীক আর বন্যা। বন্ধুরা আরো অনেকে ওদের সঙ্গে ছিলো, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে টের পায়নি। প্রতীক বন্যার হাত ধরে রেখেছিলো, তাই দু'জনে এখনো একসঙ্গে। বন্যা ওর হাত ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবেনি। প্রতীকের মুঠিতে ওর হাত রাখতে ও কোনো আপত্তিও করছে না, বরং সে হাত ঘামে ভিজে গেছে।

বন্যার মনে হয় ও ভীষণ ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে। ওর ভেতরে এখন ওলটপালট হচ্ছে। ও টের পায় ও কৈশোরের লাজুক বিনম্রতা কাটিয়ে উঠেছে। এখন ও কিছুটা সপ্রতিভ, খানিকটা বিহ্বল। কারণে-অকারণে বুকের ভেতর শঙ্কা। চট্ করে কোনোকিছু করে ফেলতে ভয় পায়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। এক সময় প্রতীক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

ও ঘাড় নাড়ে, একটুও না।

আমি বলতেই তুমি অমন চট্ করে মিছিলে চলে আসবে ভাবিনি।

আমি যে আগে কখনো মিছিলে যাইনি।

মিছিলে যাওয়ার বয়স তোমার ছিলো না। এখন হয়েছে। তুমি বড় হয়েছো বন্যা।

বন্যা চাপা স্বরে আবেগহীন কণ্ঠে বলে, মিছিলে যেতে বয়স লাগে নাকি!

প্রতীক হোঁচট খায়, থমকে থেকে বলে, তবে কি লাগে?

সাহস। ওটা আমাদের রক্তে আছে।

বন্যার কণ্ঠের অহঙ্কার প্রতীককে ছুঁয়ে যায়। ও বন্যার হাতটায় আর একটুখানি চাপ দিয়ে ধরে ওর দিকে তাকালে বন্যা চটুল হাসি হেসে বলে, অমন করে তাকাবেন না। চারদিকে মানুষ।

প্রতীক বুঝতে পারে ওর সঙ্গের কিশোরীটি নারী হয়ে গেছে। ওর করোটিতে এক দারুণ খেলা। কার সাধ্যি ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবে। ওর ভীষণ ভালোলাগে চারদিক। স্লোগানের শব্দ তুমুল হয়ে উঠলে মনে হয় ওদের জন্য চারদিক আড়াল হয়ে গেছে। এখনই সময় একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার।

বলে, বন্যা এখন যদি মিছিলে গুলি হয়?

হবে।

ভয় করবে না?

না।

বন্যার কণ্ঠে না শুনে চমকে ওঠে প্রতীক। ও জানে বন্যা বিনাদ্বিধায়ই বলে গেলো। ও কি এই মুহূর্তে মায়ের কথা ভাবছে, এই মুহূর্তে কি বাঁচামরা ওর কাছে খুব সহজ?

শিক্ষকদের কমনরুমে বসে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিলো ততক্ষণ নিজের ভেতর একরকম শক্তি অনুভব করছিলো আলী আহমদ। এখন ও বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায়। গতমাসে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাসা পেয়েছে। এত কাছাকাছি যে হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। রিকশা পাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার ঝামেলা নেই। রাস্তায় বেরুতেই শুনতে পায় দূর থেকে ভেসে আসা মিছিলের শব্দ। এখন রাজপথ মানেই মিছিল। আলী আহমদ ভাবলো, মানুষ বোধহয় বাঁচামরার সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ও ঘরমুখো হয়। ওর ঘর এখন চারতলায়। পুষ্পিতা বলে, এমন উপরে থাকতে আমার ভালোলাগে না। আমি মাটির কাছে থাকতে চাই। গাছপালা না লাগাতে পারলে বাঁচবো কেমন করে?

প্রতীক মাকে সমর্থন করে, আমারও খারাপ লাগছে। জানালার পাশের কুরচি গাছটা ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে মা।

প্রদীপ্ত বলে, থাক, তোমাদের মা-ছেলের আর গাছপালা নিয়ে শোক করতে হবে না। আমার ভালোই লাগছে ফ্ল্যাটটা। বাবার একটা চমৎকার পড়ার ঘর হয়েছে। তাই না বাবা?

আলী আহমদ মৃদু হাসে। প্রদীপ্তর কথার জবাব না দিয়ে বলে, তোর মায়ের জন্য কতগুলো টব কিনে আনিস দীপু। পুবদিকের বারান্দায় টবের বাগান করে ফেলবি।

বাহ্, মায়ের সমস্যাতো মিটলো। আমার কুরচি গাছের কি হবে?

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, ভাবনা কি, তোমাকে আমরা রমনা পার্ক দিয়ে দিলাম।

প্রতীক রেগে উঠে বলে, দেখো ভাইয়া সবসময় ঠাট্টা ভালোলাগে না। সবারই কিছু কিছু আবেগ থাকে যা একদম নিজস্ব।

প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে ওঠে, ও বাবা শোনো, শোনো জিতুর কথা। ও দার্শনিক হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

বেশ হয়েছে। প্রতীক ভেংচি কেটে ঘরে ঢোকে।

আলী আহমদের মনে হয় এটুকু ওর ছোট্ট সুখের স্মৃতি। এমন টুকরো টুকরো অজস্র স্মৃতি মালার মতো গেঁথে আছে বলেই জীবনটা বেশ একরকম ভালোই কাটলো। আর কতদিন বাঁচবে? কতটা কাল ওর সামনে অপেক্ষা করছে? কে জানে, আলী আহমদ হেসে হাত উল্টায়।

নভেম্বর থেকে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। মানুষ কোনোকিছু জানতে চাইছে না। ডাক দিলেই হাজার হাজার লোকের মিছিলে ভরে যায় রাজপথ। দূর থেকে ভেসে আসা মিছিলের শব্দ মিলিয়ে গেছে। রাস্তা ফাঁকা বললেই চলে। ও ধীরেসুস্থে রাস্তা পেরিয়ে যায়। ডিসেম্বরের রোদ মিষ্টি লাগছে। হাতে একগাদা পরীক্ষার খাতা। দু'দিনের মধ্যে দেখে শেষ করতে হবে। কিন্তু দিনে দিনে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে কে জানে!

পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর গ্রেফতার এবং মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে চলছে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন। নভেম্বরের তিন তারিখে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ভাষণ দিয়েছেন ভাসানী। আঠারো তারিখে ঢাকার আইনজীবী সমিতি সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছে। বাইশ তারিখে বারো জন বুদ্ধিজীবী পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। ছাব্বিশ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদ জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। উনত্রিশ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করে। পয়লা ডিসেম্বর সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে মিছিল করে এবং গভর্নর হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মিছিল শেষে এক সভা হয়। সভা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিন্দা করে। সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের পূর্বাঞ্চল শাখা পাঁচ থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে দুই ডিসেম্বর অটোরিকশা চালকরা ধর্মঘট আহ্বান করে।

এইসব খতিয়ান হিসেব করতে করতে আলী আহমদ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। আজ পাঁচ তারিখ। আগামীকাল পল্টনে সভা আছে। ভাসানী বক্তৃতা করবে। তিনতলায় উঠে দম নেয়ার জন্য দাঁড়ায় ও। বুঝতে পারে বয়স যথেষ্ট বেড়েছে। বুকে হাঁফ ধরেছে। বড় করে শ্বাস টানতে হয়। নিজে নিজে রাজনীতির যে পর্যবেক্ষণ করেছে তা ওকে ভাবিত করে। আইয়ুবের শাসনের শূন্যতা থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছে– এটাই এই মুহূর্তের মূলকথা। তাই বাঁচামরার এই সময়কে মানুষ আঁকড়ে ধরেছে। ও আবার সিঁড়িতে পা রাখে। চারতলায় উঠতে হবে।

প্রদীপ্ত খুব ব্যস্ত। প্রায়ই অনেক রাতে ঘরে ফিরে। পুষ্পিতা এখন আর রাত জাগতে পারে না। দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। শরীর ভালো যাচ্ছে না। প্রদীপ্তর জন্য প্রতীককে জেগে থাকতে হয়। প্রতীক একদিন রেগে বলে, এবার বিয়েটা সেরে ফেলো ভাইয়া।

বিয়ে? এখন?

নয়তো কি? কে তোমার জন্য রোজ রোজ রাত জেগে বসে থাকবে? আমি পারবো না।

প্রদীপ্ত জোরে হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয়, পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, দেশের এমন উত্তাল সময়ে কেউ বিয়ে করে জিতু?

BanglaBook.org

শহরে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে। রোজই সভা, রোজই মিছিল। তিতুমীর এই মন খারাপ থেকে বাঁচার জন্য গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। আজ বিকেলে ছুটি নেবে এই চিন্তায় নিজের কাজগুলো তাড়াতাড়ি সারে। গোসল করে পরিপাটি চুল আঁচড়াবার সময়ে ও দেখতে পায় টুম্পা বাগানে ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। অনবরত পাতা ছেঁড়ে, ফুল ছেঁড়ে। ওর মনে হয় এ এক অচেনা টুম্পা, আর কিছুক্ষণ পর ও ওর মায়ের মতো ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। কোনোদিন বুঝি দেখা হবে না। আজই টুম্পার সঙ্গে ওর শেষ দেখা। ও দৌড় দিয়ে বাগানে আসে।

টুম্পা আপা! এখানে দাঁড়িয়ে যে? যা রোদ? ঘরে যাবেন না?

রোদ আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে তিতু। বিয়ে বাড়ির এত আলো, আলো মনে হয় না।

তিতুমীর টুম্পাকে প্রশ্ন করতে পারে না। খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। টুম্পা ওর ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, আমার ভীষণ ভয় করে তিতু। তিতু আমি তোর সামনে মুখ দেখাতে পারি না। ভীষণ লজ্জা করে। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। তুই আমাকে মাফ করে দিস রে। টুম্পার চোখ ছলছল করে। তিতুমীরের মনে হয় ও বয়স্ক হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বয়স্ক হয়। এই বয়স্ক হবার মুহূর্তটি দারুণ। ও তখন স্থির, অনড়, কিন্তু শান্ত। বিশাল রেনট্রির ব্যাপ্তি ওর চেতনায় দুপুরের রোদ হয়ে তেতে ওঠে।

টুম্পা আপা আপনার কি হয়েছে?

টুম্পা ওর ঘাড় খামচে ধরে, ভীষণ জোরে, যেন মাংস ছিঁড়ে ফেলবে। ও ব্যথা পেয়েও শব্দ করে না। টুম্পার জন্য ও সব সইতে পারে এমন মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জানিস তিতু আমি এই বাড়ির কেউ না, এরা আমাকে রাস্তার ধারে তোয়ালের মধ্যে পেয়ে উঠিয়ে এনে মানুষ করেছে। এদের নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই।

মিথ্যে কথা।

তিতু প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে।

চার-পাঁচ দিন আগে বাবা-মা এইসব আলোচনা করছিলেন। আমি আড়াল থেকে শুনে ফেলেছি। মা চাচ্ছেন বরপক্ষকে সব বলতে, বাবা কিছুতেই রাজি না। বাবা রিস্ক নিতে চাচ্ছেন। টুম্পা ডালিম গাছের কাণ্ডে মাথা রেখে ফুপিয়ে কাঁদছে।

আমি কোনোদিনই জানবো না, আমার বাবা-মা কে? আমি জানতে চাই রে তিতু, আমি জানতে চাই।

টুম্পার কান্না থামে না। অন্ধকারময় শীতের রাত তিতুমীরের সামনে। মুছে যায় টুম্পা, ডালিম গাছ, সবজি বাগান, বিশাল বাড়ি। কাঁদতে-কাঁদতে টুম্পা চলে যাচ্ছে। টুম্পা আপা কাঁদবেন না, আপনাকে আমি পল্টনের মিটিংয়ে নিয়ে যাবো, টুম্পা পেছন ফেরে না। ও তিতুমীরের দলে নয়। জন্ম যেখানেই হোক তিতুমীরের সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ। নিজের উচ্চারিত ডাক নিজের বুকের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে ও টুম্পার চলে যাওয়া দেখে। তারপর গেটের বাইরে আসে, গলি ছাড়িয়ে রাজপথে নামে।

তখন প্রচণ্ড দুপুর। মাথার উপর খাঁ-খাঁ রোদ। তিতুমীর হাঁটতে থাকে। আজ আর ও বাসে যাবে না। দীর্ঘপথ মিছিলের সঙ্গে অতিক্রম করবে। মানুষের ঢল রাস্তায়। মিছিল বাড়তে থাকে, আশেপাশে থেকে লোক এসে জুড়ে যায় মিছিলে, এক সময় সেটার আর কোনো আকার থাকে না। তিতুমীরের মনে হয় এই থৈ-থৈ লোক-সমুদ্রে উচ্চতা বাড়ছে, ওর মাথা আকাশ ছুঁতে যাচ্ছে। মিছিলের লোকেরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ওরা ওর কাছে কিছু শুনতে চায়, ও ওদের আজ কিছু বলবে। ও প্রবল বেগে হাঁটে, যেন ডিঙ্গিয়ে

BanglaBook.org

যায় মানুষের মাথা। ওর মাথার মধ্যে এখন আর কোনো টুম্পা নেই, দুদু নেই, ওর সামনে বিস্তৃত পথ। এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে পুরো স্বদেশ। ডিসেম্বরের দুপুরগুলো ও দীর্ঘ পদক্ষেপে অতিক্রম করার জন্য ছুটছে।

এই পর্যন্ত বলে তিতুমীর সরাসরি ওদের মুখের দিকে তাকায়। দু'জনেরই দৃষ্টি ওর মুখের ওপর স্থির, অনড়। কয়েক মুহূর্তে ওরা দু'জনে কথা বলতে পারে না। এক সময় মঞ্জুলিকা বলে, শেষ?

তিতুমীর মাথা নাড়ে, হ্যাঁ। তারপর বলে আমি আর ও বাসায় যাবো না।

কোথায় থাকবি?

রাস্তার ছেলে রাস্তায়। ছোটখাটো কত কাজ জুটে যায়। কাজের কি অভাব আছে?

প্রদীপ্ত ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ঠিক বলেছিস। এখনতো শহরটা তোর আর আমার। অর্থাৎ মিছিলের। আমাদের কত কাজ। না রে?

তিতুমীর আবারও মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

মঞ্জুলিকা বলে, তুই আমাদের বাসায় যাবি তিতু?

না।

তাহলে প্রেসক্লাবে থাকবি?

প্রদীপ্তর প্রস্তাবে ও আগ্রহী হয়ে বলে, হ্যাঁ, থাকবো।

কাল আসিস। দেখি তোকে ক্যান্টিনে লাগানো যায় কি না।

টুম্পার কি হলো তা একবার দেখে আসবি না?

তিতুমীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, কেন?

ও তো তোকে ভালোবাসতো? এখন ওর দুঃখের সময়।

ও মৃদু হেসে বলে, ঠিক হয়ে যাবে।

প্রদীপ্ত ওর কণ্ঠের রেশ ধরে বলে, আমিও জানি ঠিক হয়ে যাবে।

টুম্পা ওই বড়লোকের বিলাস থেকে বেরুতে পারবে না।

আমি যাই।

মঞ্জুলিকা ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলে, কিছু কিনে খাস।

আচ্ছা। টাকাটা জামার পকেটে রেখে আবার বলে, যাই।

দু'জনে ঘাড় কাত করে, আয়।

ও পকেটে রাখা ছোট বাঁশিটা বাজাতে বাজাতে অল্প সময়ের মধ্যেই গাছের আড়ালে হারিয়ে যায়।

শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মানুষ তা উপেক্ষা করে হরতাল পালন করে। জনতা মারমুখী। নীলক্ষেতের কাছে পুলিশ প্রথম লাঠিচার্জ করে। মানুষ ক্ষেপে গিয়ে পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হয় দু'জন। বেলা পৌনে বারোটার দিকে গুলিস্তানের কাছে আবার গুলিবর্ষণ। নিহত হয় একজন বালক। সোয়া একটার সময় সেকেন্ড গেটের সামনে এবং বিকেল পাঁচটায় নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর আবার গুলিবর্ষণ। নিহত তিনজন, আহত তিরিশ। তিনশ' লোককে গ্রেফতার করে পুলিশ। সারাদিন শহরে ঘুরে মাথা বোঁ বোঁ করে প্রদীপ্তর। মাঝে মাঝে মনে হয় অনুভূতি অসাড় লাগছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। বিকেলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলার সময় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে সভার কাজ কয়েক ঘণ্টার জন্য মুলতবি

BanglaBook.org

রাখার প্রস্তাব ওঠে। সরকার পক্ষের সদস্যরা আপত্তি জানায়। তুমুল উত্তেজনায় গমগম করে পরিষদ কক্ষ। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্যরা পরিষদ অধিবেশন বর্জন করে আহতদের দেখার জন্য মিছিল নিয়ে হাসপাতালে যান।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দাঁড়িয়েছিলো প্রদীপ্ত। শহর ঘুরে মিছিলের রিপোর্ট করছে। এখন এসেছে আহতদের খবর নিতে। সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে তিতুমীর। ও খুব মারমুখী। খিস্তি করছে। প্রদীপ্তকে বলে, আমার নয় বাপের ঠিক নেই, যারা গুলি করে এদেরও কি বাপের ঠিক নেই?

প্রদীপ্ত ওকে দেখে, কথার জবাব দেয় না। ওর ভালোলাগে যে তিতুমীর বিনাদ্বিধায় নিজেকে বাপের পরিচয়হীন ছেলে বলার সাহস অর্জন করেছে। এখন থেকে ও আর ভয় পাবে না। বুঝবে, শুধু বাপের পরিচয়ই মানুষকে বড় করে না। মানুষকে হাজার রকম গুণাবলি আয়ত্ত করতে হয়। শহর ঘুরে এমন শত শত মানুষতো ও দেখেছে। তিতুমীরের মতো রাগী, জেদী, বেপরোয়া। তিতুমীরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে কি হবে? এসব প্রশ্নের জবাবও হয় না।

দু'দিন পর প্রেসক্লাবে বসে শুনতে পায় আইয়ুব খানের ক্রুদ্ধ গর্জন। দিনাজপুরের এক জনসভায় ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন, 'বিরোধীদলের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতেই হবে। কেননা সরকার দেশকে বিভক্ত হতে দিতে পারে না।'

কাগজ পড়তে পড়তে প্রদীপ্ত আপন মনে হাসে। পাশ থেকে মহাদেব বলে, হাসছো যে? বুঝতে পারছি লৌহমানবের অসার গর্জন পড়ছো।

প্রদীপ্ত মাথা নেড়ে পত্রিকার পাতা উল্টায়।

রাতে খেতে বসে আলী আহমদ বলে, কেমন বুঝছিস দীপু?

ও সরাসরি বলে, এবার আইয়ুব খানকে যেতে হবে।

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, স্বায়ত্তশাসনের কি হবে?

বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় হবে না।

কেন?

একজন ফিল্ড মার্শাল ক্ষমতা ছাড়লেও তা আর একজন ফিল্ড মার্শাল বা জেনারেলকে দেবে। সামরিক শাসন এমনই জগদ্দল দীপু।

প্রদীপ্ত বাবার মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে বাবার স্বাস্থ্য ভেঙেছে। বাবাকে বয়সের চেয়ে একটু বেশি বুড়ো দেখাচ্ছে। সামরিক শাসন মানুষকে কি এভাবে ধ্বসিয়ে দেয়? তাই হবে। প্রদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেয়। পাশ থেকে প্রতীক বলে, মনে আছে সে দিনটির কথা? মার খেয়ে তোমার পিঠে কালশিরে পড়েছিলো?

শুরুটা দেখেছিলাম, শেষটাও দেখছি জিতু।

কিন্তু বাবার কথা অনুযায়ী শেষ হয়েও হইবে না শেষ।

প্রতীকের কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে।

এক এক করে ঘটে যায় ঘটনা– কেবলই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। মিছিলে গিয়ে, কখনো না গিয়ে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আলী আহমদ নিজের দিকে ফিরে তাকায়। টেবিলের ওপর জমে থাকে পরীক্ষার খাতা, নিজের লেখা– গল্প কিংবা উপন্যাস নইলে প্রবন্ধ, কবিতা– কত যে প্রকাশের তাড়না। মনে হয় পুরো স্বদেশ এভাবেই জাগছে–

BanglaBook.org

খুঁজছে নিজেকে, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাচ্ছে নিজেরই বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা নিজেরই হৃৎপিণ্ড। আলী আহমদ ঘরে ফিরে চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো হঠাৎ মনে হয় উড়ে যাচ্ছে অহি, সেই কিশোর অহি, যে অন্যদের মতো নয়, আলাদা। আলী আহমদ হাত উঠিয়ে বলে, অহি এইতো আমি। কোথায় যাচ্ছিস? একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।

পুষ্পিতা পেছন থেকে ডাকে, কার সঙ্গে কথা বলছো?

আলী আহমদ ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে বলে, নিজের সঙ্গে।

কী যে ছেলেমানুষী। বলতে বলতে পুষ্পিতা কাজে যায়। আলী আহমদের বলতে ইচ্ছে করে, চলো আমরা এক্কা-দোক্কা খেলি। বলা কি যায়, পেছনে যে জমে আছে ফেলে আসা অনন্ত সময়। আর সামনে আর এক মহাকাল, কঠিন, দুঃসহ। পেরুতে হবে রক্তের নদী, মানুষের চামড়ায় তৈরি নৌকায়। এখন এক অন্য সময়ের পাড়ি। আলী আহমদের শরীর শিউরে ওঠে।

পাবনায় ডিসির বাড়ি ঘেরাওর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন। বছর ফুরিয়েছে। উনসত্তরের শুরু।

জানুয়ারির চার তারিখে ডাকসু অফিসে ছাত্ররা এগারো দফা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। আট জানুয়ারি আট দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে।

পড়ার টেবিলে বসে আলী আহমদ ডায়রিতে লিখলো, এই শহর এখন গর্ভধারিণী। প্রতিদিন নতুন খবরের জন্ম দিচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে। ওর টেবিলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাপত্র। ও মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। মনে হয় প্রতিটি শব্দ যেন ওর চারপাশে একটি করে দেয়াল তুলে দিচ্ছে। ওর গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারবে না।

পুষ্পিতার খুব একা একা লাগছে। ঘরে ছেলেরা কেউ নেই। কখন ফিরবে ও জানে না। বেশ শীত পড়ছে। তবু ও মাঝে মাঝে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে। অসহায় বোধ ওকে জাপটে ধরে। ওর মনে হয় কাউকে চাই যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। ওর কালো খালার কথা মনে হয়। ওরা কেমন আছে? কেমন আছে রাজশাহী? এ দেশে ওদের প্রথম শহর। প্রচণ্ড টান অনুভব করে সে শহরের জন্য।

ও নিঃশব্দে আলী আহমদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। ঘাড়ে হাত রাখে। আলী আহমদ চেয়ারে বসে থেকেই পেছন ফেরে। নিজের মুঠিতে ওর ডান হাতটা তুলে নেয়।

কি হয়েছে পুষ্পি?

রাজশাহীর জন্য খুব মন খারাপ লাগছে। কতদিন ওদের খবর পাই না। যাবে রাজশাহী?

যাবো, যাবো পুষ্পি, যাবো। রাজশাহীকে ঘিরেই তো আমাদের স্বপ্নগুলো দানা বেঁধে উঠেছিলো। ওটা আমাদের প্রাণের শহর।

কবে যাবে?

দেখি কবে যেতে পারি। এই সময়ে কি আর যেতে পারবো? দীপু, জিতু ফিরুক। ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

কত রাত হয়ে গেলো ওরা এখনো ফিরলো না।

ফিরবে, চিন্তা কোরো না। তুমি বরং শুয়ে পড়ো।

আমার ঘুম আসবে না। এই অস্থির সময় আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

আলী আহমদ পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকায়। দেখতে পায় মহানন্দার আঁকাবাঁকা

BanglaBook.org

স্রোত, দেখতে পায় রিফিউজির যন্ত্রণা, দেখতে পায় নিজ বাসভূমি খুঁজে বেড়ানো মানুষের কান্না। পুষ্পিতা মৃদু স্বরে বলে, কি দেখছো?

তোমাকে, তুমিই আমার স্বদেশ পুষ্পিতা। জেনে রেখো এটা কোনো অস্থির সময় নয়, এটা হয়ে ওঠার সময়। স্থির হবার আগের সময়। এটা আমাদের বোধের সময়।

বলতে বলতে আলী আহমদ ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের মধ্যে মাথা রাখে। পুষ্পিতার শরীর শিউরে ওঠে। মনে হয় এ যেন সেই যৌবনের মানুষটি, যাকে ঘিরে প্রচণ্ড মাদকতার শেষ ছিলো না– যার সঙ্গে স্বপ্ন দেখার শুরু। পুষ্পিতা আলী আহমদের মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে সে মাথার ওপর মুখ রাখে।

১২

প্রদীপ্তর নতুন নতুন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে শহরটা। ও হাঁটতে ভালোবাসে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হেঁটেই যাতায়াত করে। ও দেখতে চায়, আবিষ্কার করতে চায়– মানুষ এবং মানুষের নিশ্বাসের পতনের সঙ্গে এক দীর্ঘ যোগসূত্র। মানুষের রক্ত এবং মৃত্যু। মানুষের মিছিল এবং ফুলে ওঠা পেশি– মানুষইতো পারে, মানুষইতো। সদরঘাট থেকে কুর্মিটোলা, হয়তো গতির হিসেবে দীর্ঘ পথ নয়, কিন্তু চটজলদি পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না– তবু মানুষের পায়ে এখন পাখা, মানুষ উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এ শহরের আকাশে-বাতাসে-পাতালে সর্বত্রগামী হয়েছে মানুষ।

মিছিল, স্লোগান, শপথ, গুলি, বারুদ, ধোঁয়া, মৃত্যু– এসবের মধ্যে তলিয়ে গেছে এ শহর। প্রদীপ্তর মনে হয় এ শহরে নদী নেই– নেই স্নিগ্ধতা, কোথাও ফুল ফোটে না– নেই রঙের ঔজ্জ্বল্য। ওর মনে হয় যেদিকে তাকায় সেদিক থেকেই আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা প্রবলবেগে ঢেকে দিচ্ছে শহরের রাস্তাগুলো– চারদিকে ধোঁয়া– শ্বাসরুদ্ধকারী ধোঁয়া– গুঁড়ি গুঁড়ি কালো আস্তরে ঢেকে যাচ্ছে শহরের বাড়িগুলো। এ কেমন শহর? ও কি কোথাও দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াবে? কোনো ছায়ার নিচে? রাজশাহীর মহানন্দার পাড়ে? কিংবা বিল ভাতিয়ার প্রান্তরে? ওখানে কি ছায়া আছে? হয়তো আছে। ওই শহরে ওর শৈশব ফেলে এসেছে। মানুষের শৈশব এক চমৎকার ছায়া। প্রদীপ্ত নিজেকেই প্রশ্ন করে, আমি কি ফিরে পাবো সেই ছায়া?

ভাবতে ভাবতে চমক ভাঙে প্রদীপ্তর। মিছিল আসছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পুলিশ ও ই. পি. আর-এর জুলুমের প্রতিবাদে এবং এগারো দফা আদায়ের দাবিতে ঢাকাসহ প্রদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভা শেষ করে মিছিল আসছে। প্রদীপ্ত শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদকে, মিছিলের সামনে– স্লোগান দিচ্ছে। শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে গিয়ে মিছিল রশীদ বিল্ডিং পেরিয়ে যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং হঠাৎ করে গুলি ছোঁড়ে। গুলির শব্দে চমকে ওঠে প্রদীপ্ত। ভিড় ঠেলে সামনে এগুতে এগুতে শুনতে পায় আসাদ আহত হয়েছে। ছাত্ররা ওকে ধরাধরি করে মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায়। ডাক্তাররা ওকে মৃত ঘোষণা করে।

তখনো আসাদের রক্তে ছাত্রদের শার্ট-প্যান্ট মাখামাখি, তখনো গরম রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। সে মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠে ছাত্রদের মুখে– প্রতিটি মুখ যেন আগুনে পুড়ছে। রক্ত

BanglaBook.org

আগুনের অনির্বাণ শিখা হয়ে যায়। সেই লালচে শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে প্রদীপ্ত। ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করতে চাইলে পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনী মেডিকেল কলেজ ঘিরে রাখে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। কালো পতাকা নিয়ে খালি পায়ে মিছিল করে ছাত্ররা। সে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে প্রদীপ্ত দেখতে পায় অনির্বাণ শিখা হয়ে যাওয়া ছাত্রদের মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মানুষ– আগুনে-মানুষ।

পরদিন একুশ জানুয়ারি। পল্টন ময়দানে আসাদের গায়েবানা জানাজা পড়ছে লক্ষ মানুষ। জানাজা শেষে ১৪৪ ধারা ভেঙে শুরু হয় লক্ষ মানুষের মিছিল।

হাঁটতে হাঁটতে প্রতীক প্রদীপ্তকে বলে, উনসত্তরের এই আন্দোলন শুরুর পর এত বড় মিছিল আর হয়নি ভাইয়া।

হ্যাঁ তাই। প্রদীপ্ত খানিকটা বিষণ্ন হয়ে থাকে।

তুমি কি বাবাকে দেখেছো ভাইয়া?

না, দেখিনি।

আমিও না। বাবা কাছে থাকলে আমার খুব ভালোলাগে। ভাইয়া দেখো দেখো বাড়ির ছাদ ও জানালা থেকে ফুলের পাপড়ি ছিটানো হচ্ছে। তুমি না বলেছিলে এই শহর আগুন আর রক্তের। ফুল আর ফুটছে না।

ভুল বলেছিলাম জিতু, ভীষণ ভুল।

প্রদীপ্তর বিষণ্নতা কেটে যায়। ওর হাতের মুঠিতে পাপড়ি। চারদিকে পুষ্পবৃষ্টি, প্রদীপ্ত দেখতে পায়, পুষ্পবৃষ্টির তোড়ে শহরের রাস্তাগুলো ফুলের পাপড়িতে ভরে গেছে।

আবার এ দিনের গুলিবর্ষণে ছয়জন নিহত ও চৌদ্দজন আহত হয়। চব্বিশ জানুয়ারি হরতাল পালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। শহরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। মানুষের সব বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রেসক্লাবে টেবিলের ওপর কনুই রেখে তিতুমীর প্রদীপ্তকে বলে, গুলি করলেতো মানুষ মরে যায় জানতাম। এখন দেখছি গুলি করলেও মানুষ মরে না, বেঁচে ওঠে।

কেমন? প্রদীপ্ত অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

দেখছেন না যত গুলি, তত মানুষ। চব্বিশ তারিখে যে মিছিল হবে আমি সবার আগে থাকবো।

তোর ভয় করবে না? যদি গুলি চলে?

হা-হা করে হেসে ওঠে তিতুমীর, ভয় কীসের? গুলিতো হবেই। ওরা পাগলা কুকুর হয়ে গেছে না? আমি ভয় পাই না। চা খাবেন স্যার?

খাবো? তোর হাতে চা খেলে আমার কোনো ভয় থাকবে না।

আপনার তো ভয়ই নেই। বলতে বলতে তিতুমীর রান্নাঘরের দিকে যায়। প্রদীপ্ত মনে মনে হাসে, ও কি ঠিক বলেছে যে আমার ভয় নেই? বাইরে থেকে মানুষকে আর কতটুকুই বা চেনা যায়?

চব্বিশ তারিখে মানুষের ঢল প্লাবিত করে রাজপথ, গণজাগরণের উত্তাল জোয়ার। পুলিশ, ই.পি.আর. কুলোতে পারে না। গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী। সেক্রেটারিয়েটের সামনে প্রথম মৃত্যুবরণ করে রুস্তম। মিছিল এগুতে থাকে। আবার গুলি। এবার কিশোর মতিউর, নবকুমার স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। মতিউরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্তর মনে হয় ওর মগজের মধ্যে অজস্র জলপিপি ডাকছে। পাখির ডাক ছাড়া ও আর কোনোকিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

পুরো শহর বিক্ষোভে ভেঙে পড়ে।

BanglaBook.org

তিতুমীর এসে ওর হাত ধরে, আপনি না বলেছিলেন এই শহর থেকে পাখিগুলো চলে গেছে। তাহলে আমি কেন হাজার হাজার পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি?

দুপুরে মতিউরের জানাজা হয় পল্টন ময়দানে। সেখান থেকে মিছিল এসে জমায়েত হয় ইকবাল হলের মাঠে। জমায়েতে বক্তৃতা করেন শহীদ মতিউর রহমানের বাবা। বলেন, 'এক মতিউরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিউর পেয়েছি।'

মতিউরের বাবার কণ্ঠস্বর শুনে ওর মনে হয় দেখতে পাচ্ছে ছায়া, যে ছায়ার নিচে ও দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলো। ওই কণ্ঠস্বর এক বিশাল গাছ– ওকে ওর শৈশবের ছায়ার নিচে বসার জন্য ডাক দিচ্ছে।

প্রদীপ্তর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো নসিব হাফিজউদ্দিন। ও প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে বলে, প্রদীপ্ত তোমার না মনে হয়েছিলো এ শহর রক্ত আর মৃত্যুর। এ শহরে গাছ নেই, তাই শ্যামলিমা নেই। দেখো, শহীদের বাবার কণ্ঠ থেকে শ্যামলিমা কিভাবে বেরিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো যে শ্যামলিমারও শব্দ আছে, ভাষা আছে। শ্যামলিমা কথা বলতে পারে, না?

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে, নসিব ভাই ঠিকই বলেছেন। আমার ভুল ধারণা হয়েছিলো।

সে তারিখে সেনাবাহিনী আদমজী নগরে এবং নারায়ণগঞ্জে গুলিবর্ষণ করে। খুলনার দৌলতপুর এবং খালিশপুর এলাকায় গুলিবর্ষণ করলে তিনজন নিহত হয় ও বহু আহত হয়। সন্ধ্যায় ঢাকা শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনাবাহিনী তলব করা হয় ও সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়।

এ রকমই দিন গড়ায়। সময়তো পেরুবেই, সময়ের কাজ দীর্ঘ পাড়ি অতিক্রম করা। সময়তো কারো জন্য থেমে থাকে না। অনেক রাত জেগে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে আলী আহমদ। টিক টিক শব্দ শোনে। রাত বাড়ে, কিন্তু ঘুম আসে না আলী আহমদের। ও বুঝতে পারে এখন আর সামনে কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নেই– আন্দোলন এখন নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার আগের মুহূর্তে। মানুষ, মানুষইতো পারে সব। তবু ঘুম আসছে না কেন?

ঘুম নেই এ শহরের চোখে। দিনের বেলা এ শহরের সহস্র চোখ খোলা থাকে– রাতের বেলা সেই খোলা চোখ আলো জ্বেলে রাখে। হেঁটে আসে হাজার শহীদ– শহরের রাস্তাগুলো পেতে রাখে বুক– শব্দহীন সে হাঁটা সামরিক কুচকাওয়াজের মতো নয়, বুটের শব্দ নেই– সে হাঁটায় মথিত হতে থাকে মানুষের চৈতন্যের রাজপথ। আলী আহমদ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বুক তোলপাড় করে। ও চেয়ার টেনে বসে। মনে হয় সারারাত জেগে থেকে পাহারা দেবে এ শহরকে।

ও দেখতে পায় প্রতিদিন ঘটনা ঘটে। ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সাতাশ জানুয়ারি করাচি ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব করা হয় এবং সান্ধ্যআইন জারি করা হয়। পরদিন পেশোয়ারে সেনাবাহিনী নামে। মানুষ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। উনত্রিশ জানুয়ারি গুজরানওয়ালায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়। গুলিবর্ষণে তিনজন নিহত হয়। পয়লা ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বেতার ভাষণে বলেন, সতেরো ফেব্রুয়ারি তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

এই ঘোষণা শুনে বিরোধী দলের নেতারা জানায়, নেতাদের জেলে রেখে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া বৈঠকে যোগ দেয়া যাবে না। আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। বিমানবন্দরে

BanglaBook.org

সাংবাদিকদের বলেন, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পরদিন তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আট ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

কাজে বেরুবার আগে প্রদীপ্ত উত্তেজিত হয়ে বলে, বাবা দেখতে পাচ্ছো একের পর এক নতি স্বীকার?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, আমি তো এখন দু'চোখ মেলে ঘটনাগুলো দেখছি আর হিসেব করছি। লৌহমানবের দিন ঘনিয়েছে দীপু।

প্রদীপ্ত বলে, আইয়ুব খান এখন নরম হলেও কোনো লাভ হবে না। ছেলেরা কাল 'শপথ দিবস' পালন করবে। পল্টন ময়দানে সভা হবে। সে সভায় ঘোষণা করা হবে এগারো দফা দাবি প্রতিষ্ঠার সংকল্প। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়া হবে।

ও বেরিয়ে গেলে পুষ্পিতা আলী আহমদকে বলে, দীপুটা কেমন ঘোরের মধ্যে আছে। হ্যাঁগো, ও কি ভবিষ্যতে রাজনীতি করবে?

আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, করতে পারে। তোমার ছেলে দেশের প্রেসিডেন্ট হবে। তোমার কী মজা, তুমি হবে প্রেসিডেন্টের মা।

পুষ্পিতা হেসে বলে, আর তুমি?

আমি মাস্টার। ছাত্র পড়াই। আমার আর কি!

কেন প্রেসিডেন্টের বাবা?

আলী আহমদ হো-হো করে হাসে।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে একা বসে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ওর মনে হয় আবার সেই ফেব্রুয়ারির সময় এখন ওদের জীবনে। ফাগুন আসেনি। তবু জানালা পথে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাতেই মনে হলো দক্ষিণা বাতাসের স্পর্শ। সেই নভেম্বরে আন্দোলনের সূত্রপাত। গড়িয়ে গড়িয়ে ফেব্রুয়ারি অব্দি চলে এলো। ফেব্রুয়ারি! ও মনে মনে আওড়ালো, প্রভু আমার, প্রিয় আমার। ভাবনার কি ঠিক আছে, যখন-তখন, কী যে হয়! কী যে হয়!

BanglaBook.org

এগারো ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক করা রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় বিনা শর্তে। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি হয় না। আওয়ামী লীগ জানিয়ে দেয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া বৈঠকে যোগ দেবে না। মওলানা ভাসানীও একই ধরনের সিদ্ধান্তের কথা আগে ঘোষণা করেছিলেন। বারো ফেব্রুয়ারি তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তি লাভ করেন। এইদিন সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং এগারো দফার সমর্থনে বিরোধী দলীয় সাতজন সদস্য জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সেদিন জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি হয়ে যায়। চৌদ্দ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেন– সতেরো ফেব্রুয়ারি থেকে জরুরি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

রাত জেগে ডায়রির পৃষ্ঠায় ঘটনাগুলো লিখছিলো আলী আহমদ। বেশ রাতে প্রদীপ্ত ফিরে। বাবাকে দরজা খুলতে দেখে ও বিব্রত হয়ে বলে, তুমি এখনো জেগে আছো বাবা?

তোর মায়ের জেগে থাকাটাই তো কষ্টের রে। আমি জেগে থাকলে বরং আমার নিজের কিছু কাজ হয়। আর কোনো খবর আছে? আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুনতে গিয়েছিলি আজ?

গিয়েছিলাম বাবা। তবে ওদের ওপর দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে এটা খুব কষ্টের,

সহ্য করা যায় না।

হ্যাঁ, এসব বিবরণতো পড়ছি।

পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে বলে মানুষও সবকিছু জানতে পারছে। ভীষণ রাগ, অসন্তোষ চারদিকে।

যা তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। বাতি বন্ধ করতে ভুলিস না যেন।

প্রদীপ্ত গুনগুন করতে করতে বাথরুমে ঢোকে। মনে হয় ক্লান্তিহীন দিনগুলোতে এটুকুই আনন্দ। গুনগুনিয়ে গান গাইলে মন চাঙ্গা হয়।

পরদিন পনেরো ফেব্রুয়ারি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে হত্যা করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয় আসামী পালাতে চেষ্টা করেছিলো বলেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

এ খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে শহরে। থমথমে হয়ে থাকে চারদিক। কেউ যেন কারো দিকে তাকাতে পারছে না। যেন এ লজ্জা সবার। প্রদীপ্ত তখন বলে যাচ্ছে, আসলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি সেনাবাহিনী সহ্য করতে পারছে না। এ হত্যা নিশ্চয় ওদের নীল নকশার বাস্তবায়ন। ওরা হয়তো এভাবে সবাইকে মেরে ফেলবে।

প্রতীক হা করে তাকিয়ে থেকে বলে, সে সুযোগ কি ওরা পাবে? প্রতীকের মুখটা সমান্তরাল হয়ে যায় ওদের সামনে। ওরা কেউ কোনো কথা বলে না। সবাই জানে উত্তরটা সবার জানা।

পরদিন ষোলো ফেব্রুয়ারি। দাউদাউ জ্বলে ওঠে ঢাকা শহর। জনতা আগুন দিয়েছে স্টেট গেস্ট হাউসে। বাংলা একাডেমীর পাশের বিল্ডিং। এখানে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমান থাকতেন। আগুন গড়াচ্ছে। আগুন আবদুল গনি রোডে। পুড়ছে প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমেদ ও প্রাদেশিক পূর্ত মন্ত্রী মংশোয়ে প্রুর সরকারি বাসভবন। আগুন পরিবাগে। পুড়ছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাসভবন। আগুন কোথায় নেই? পুড়ছে প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা আসকারির বাসভবন। পুড়ছে বিভিন্ন অফিস, প্রেস, দোকান।

আর্ট কলেজের সামনে বন্যার সাথে প্রতীকের দেখা। প্রতীক অবাক হয়ে বলে, তুমি এ সময়?

আমি শহর দেখতে বেরিয়েছি। বাড়িতে কাউকে কিছু বলিনি। চুপচাপ বেরিয়ে পড়েছি।

ভালোই করেছো। তোমাকে পেয়ে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। অনুভব করছো কি আমাদের পায়ের নিচে মাথার ওপরে সবখানে আগুন। চলো আমরা হেঁটে যাই এ আগুনের ভেতর দিয়ে।

বন্যার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। বলে, পারবো?

নিশ্চয় পারবো।

দু'জনে হাঁটতে থাকে। একসময় প্রতীক বন্যার হাত ধরে। ওর দিকে তাকায়। পথ বন্ধ, ওরা কোনোদিকে যেতে পারছে না। সামনে-পেছনে-ডানে-বামে– চারদিকে মিলিটারি আর আগুন। ওরা আর কোথায় যাবে?

প্রতীক গাঢ় কণ্ঠে ডাকে, বন্যা?

বন্যা মুখ নিচু করে বলে, জানি তুমি কি বলবে।

তুমি আমাকে ভীষণ আবেগ তাড়িত করছো। আমি তোমাকে ভালোবাসি বন্যা।

আমিও।

BanglaBook.org

প্রতীকের প্রবল আবেগের অনুচ্চ উচ্চারণ, সত্যি!

বন্যার চোখে ঝিলিক। প্রতীক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায় বন্যার দু'চোখের কালো মনিজুড়ে এক আগুনের মহাসাগর, সে মহাসাগরের তল থেকে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠে আসছে ঢাকা শহর, পটভূমিতে সবুজ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

বিকেলে পল্টনে সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা পরিচালনা করেন মওলানা ভাসানী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'দুই মাসের মধ্যে এগারো দফা কায়েম এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হইলে খাজনা বন্ধ করা হইবে।'

প্রতীক এবং বন্যার তখনো বাড়ি ফেরা হয়নি। লক্ষ লোকের সমাবেশ। ওরা একদম শেষে দাঁড়িয়ে। শুনতে পায় ভাসানী তখনো বলছেন, 'প্রয়োজন হইলে করাচি বিপ্লবের মতো জেলখানা ভাঙিয়া মুজিবকে নিয়া আসিবো।' ওরা আরো দেখতে পায় মানুষের কালো কালো মাথার ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে সেটা একটা ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। যেন পল্টন ময়দান এক বিশাল বঙ্গোপসাগর দু'কূল ছাপিয়ে এক মহাপ্লাবন নিয়ে ছুটে আসছে। ঐ দিনই প্রেসিডেন্ট দেশ থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করেন।

সতেরো ফেব্রুয়ারি সারা দেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। আঠারো ফেব্রুয়ারি খবর আসে রাজশাহী থেকে। সেদিন ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিলসহ শহরের দিকে যাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে সমবেত হয় ছাত্ররা। ছাত্রদের চারজন করে বেরিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছিলেন ড. শামসুজ্জোহা, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং রসায়ন বিভাগের রিডার। গেটের সামনে মোতায়েন ছিলো সেনাবাহিনী। ওরা গুলি ছোঁড়ে। ড. জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করা হয়।

এ খবর যমুনা নদীর ওপার থেকে আগুন বয়ে আনে। যমুনা সে আগুন নিজের জলে নিভিয়ে দিতে পারে না। জলও আগুন হয়ে যায়। সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে রাত এগারোটায় বেরিয়ে পড়ে মানুষ। নিরস্ত্র মানুষ আবার বুলেটের সামনে– আবার গুলি। এলিফ্যান্ট রোডে বিশাল মশাল মিছিলের সঙ্গে হেঁটে যায় আলী আহমদ। পাজামার ওপর একটা হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কেমন করে কোথা দিয়ে যাচ্ছে ও তা ভুলে গেছে। প্রতিবাদ জানানোর জন্য হেঁটে যাচ্ছে এটাই ওর কাছে সত্য। গুলির মুখেও পিছিয়ে যায় না মানুষ– সামনেই এগোয়। যেন সামনে যোজন যোজন পথ, তা পেরুতে হবে। মশালের আলোয় আলোকিত শহর। মশালের আলো আলী আহমদের করোটি উজ্জ্বল করে তোলে। এদেশে রাজশাহী শহরে ওর শুরুর দিনগুলো এমন ছিলো, যেন হাজার হাজার মশাল জ্বলতো চারপাশে– গাছে, মাটিতে, নদীতে। ও জানে মানুষের জীবনে কখনো মাটি আলো ফোটায়– কখনো নদী। এবং কখনো রক্ত। রাজশাহীতে এখন রক্তের আলো– ওটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অন্ধকার ফুটো করে দিয়ে। পড়ে আছে ড. জোহা– রক্তে ভিজে গেছে সাদা শার্ট-ট্রাউজার্স। মতিহারের সবুজ চত্বর এবং পিচ-ঢালা রাস্তা করোটিতে নিয়ে হাঁটতে থাকে আলী আহমদ। বুঝতে পারে মহানন্দা, পূর্ণভবা, পদ্মা আলী আহমদ হয়ে গেছে– এবং ড. জোহা মহানন্দা, পূর্ণভবা, পদ্মা নদী হয়ে গেছেন। মানুষ কখনো নদী হয়, নদী কখনো মানুষ– সবকিছু মিলেমিশে স্রোত হলে সামনের সব বাধা দূর হয়ে যায়। এটাই নিয়ম, এটাই সত্য। ও জানতেও পারে না যে ওর মাথার ওপর মশালের ছাই ছড়িয়ে পড়ছে।

একসময় বাড়ি ফেরে ও। নির্ঘুম শহরের মানুষের মুখে তখনো স্লোগান, চিৎকার। ও বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ওপর থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে। দরজা খুলে দেয়

BanglaBook.org

পুষ্পিতা। আর্তকণ্ঠে বলে, ফিরলে? আমি ভেবে মরি।

ওই কণ্ঠে চমকে ওঠে আলী আহমদ। যেন রাজশাহীর কণ্ঠ। ওই শহর নারী হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে– আশ্চর্য রূপবতী, মায়াবতী নারী। এই নারীর দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা কখনো ফুরোয় না।

কি হলো এমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? মনে হচ্ছে কান পেতে কিছু যেন শুনছো।

শুনছিলাম। তোমার কণ্ঠ শুনে মনে হলো আমাদের রাজশাহী বুঝি কথা বলছে।

আহারে, রাজশাহীর কথা খুব মনে হয়। ওটা একটা সোনার শহর।

তাই নাকি? তুমিও তাই ভাবো? আলী আহমদ খানিকটা সামনে এগিয়ে যায়। শার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে আচমকা শরীরটা কেঁপে ওঠে। বুঝতে পারে না কেমন করে নিজেকে আড়াল করে রাখতে হয়।

পুষ্পিতা কাছে দাঁড়িয়ে বলে, হাতমুখ ধুয়ে নাও। ভাত খাবে না?

তুমি খেয়েছো?

না। তোমার জন্য বসে রয়েছি।

আহ্, পুষ্পিতা আমি তো বলেছি খিদে পেলে তুমি খেয়ে নেবে। নিজেকে কষ্ট দিও না।

তোমার জন্য আমার কোনো কষ্ট নেই। তোমার জন্য বসে থাকতে ভালোলাগে।

আলী আহমদ এক মুহূর্তে পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকায়– যেন শহরের মানুষগুলো সবাই মিলে বলছে, আমাদের কোনো কষ্ট নেই। আমরা হাসিমুখে কষ্ট সইতে পারি।

ও বাথরুমে ঢোকে। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে কেঁদে ফেলে। আমার রাজশাহী। ওর নিজের বুকইতো রাজশাহীর ইতিহাস– শঙ্কা ও সংকটের ইতিহাস– অস্তিত্ব খোঁজার যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। আঁজলা ভরা পানি নিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে আলী আহমদ। চোখের পানির সঙ্গে সে পানির এক মহামিলন ঘটে যায়। নিজেকে বলে, এইতো আমি। আমি তো টিকেই আছি এবং থাকবো। ভয় তো নেই।

বিশে ফেব্রুয়ারি পাঁচটায় সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনে জনসভার আয়োজন করে। এদিন আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বেতার ভাষণে বলেন যে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন না।

সরকার গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেয়। শেখ মুজিবকেও সে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বলা হয় তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে, শেখ মুজিব প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে পারবে না। শেখ মুজিব নিজেও প্যারোলো মুক্তি নিতে অস্বীকার করেন। পল্টন ময়দানের জনসভায় গর্জে ওঠেন ভাসানী, 'প্যারোলে নয়, শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। না হলে সেনাবাহিনীর ঐ ব্যারাক, তোমাদের প্রহসনের রঙ্গমঞ্চ বিচারালয় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে বাংলার সংগ্রামী জনতা।'

শেষ পর্যন্ত জনগণের দাবির মুখে নতি স্বীকার করে সরকার। বাইশে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে অভিযুক্তদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

পরদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা জানানো হবে। প্রদীপ্ত বেশ আগেই এসে পড়েছে। লোক জমতে শুরু করেছে। ও জানে অল্পক্ষণেই ভরে যাবে রেসকোর্স ময়দান। নসিব আসবে বলেছিলো, এসেছে কি

BanglaBook.org

না ও জানে না। এই থৈ-থৈ মানুষের ভেতর তাকে খুঁজে বের করাও সম্ভব নয়। ও সে চেষ্টাও করে না। ও জানে ওর বাবা আসবে– একা আসবে, একা ফিরবে। বাবা বলে, একা থাকলে ঘটনার বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে সহজ হয়। নিজের মনে অনেক কিছু ভাবতে পারে। সঙ্গে কেউ থাকলে সেটা হয়ে ওঠে না।

সভা শুরু হয়েছে। মুহূর্মুহু করতালি– গগনবিদারি স্লোগান, যেন মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কালবোশেখি। প্রদীপ্তর বেশ ভালোই লাগে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। শব্দটি শুনে প্রদীপ্ত উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ওর মনে হয় ঐ শব্দের তোড়ে রেসকোর্স নদী হয়ে যাচ্ছে– প্রবল খরস্রোতা, গর্জনমুখী, দু'কূলপ্লাবী। রেসকোর্স কোন নদী? যমুনা, কর্ণফুলি, আগুনমুখা, মেঘনা, পদ্মা নাকি বুড়িগঙ্গা? ওহ্ বুড়িগঙ্গা– বুড়িগঙ্গার বাঁধ ভেঙে গেছে– ভেসে যাচ্ছে এ শহর। শান্ত, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী শুষে খেয়েছে আগুন– জল উর্বরা করে শস্যক্ষেত্র, গড়ে তোলে বসতি– জীবন, জীবন। প্রদীপ্ত অনুভব করে ওর নিজের বুকের ভেতর রেসকোর্স– এই রেসকোর্সে খোলা আকাশের নিচে ও মঞ্জুলিকাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলো। তাহলে কি মঞ্জুলিকা ওর জীবনে বুড়িগঙ্গা? জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তার সবটুকুই দেবে ওকে? হঠাৎ খুশিতে ভরে যায় মন। সভা শেষে ও চট্ করে বেরুতে পারে না। চুপচাপ বসে থাকে। জনশূন্য মাঠ। ও চারদিকে নদীর বিস্তার অনুভব করে।

সন্ধ্যায় ও মঞ্জুলিকার হাত ধরে হেঁটে যায় রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে। মঞ্জুলিকা প্রবল অভিমানে ফুঁসছে। বলছে, তুমি তো ভুলেই গেছো আমাকে। কতদিন পাত্তা নেই তোমার তার হিসেব আছে?

প্রদীপ্ত উত্তর দেয়নি। বলেছে, আজ এই মাঠের ওপর দিয়ে এক বিশাল নদী বয়ে গেছে মঞ্জুলিকা। আমি হৃদয় দিয়ে দেখেছি।

তবে যে তুমি বলো এ শহরে নদী নেই।

আমি ভুল বলেছিলাম। আছে, আছে। তুমি আমার নদী– বুড়িগঙ্গা। আমার দু'কূল ভাসিয়ে নিয়েছো।

সন্ধ্যার আঁধারে প্রদীপ্তর চোখ দেখতে পায় না মঞ্জুলিকা, দেখতে পায় ওর হৃদয়– সে হৃদয় চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে– সে হৃদয়ের দেখার ক্ষমতা আছে।

BanglaBook.org

১৩

ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। মার্চের শুরু। আলী আহমদ ভোরবেলা ডায়রিতে লিখলো, রাজপথ থেকে আন্দোলন এখন গোলটেবিল বৈঠকে। এখন চলছে দাবি আদায়ের দর কষাকষি। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'গোলটেবিলে বসে ছয় দফা, এগারো দফা আদায় করে আনবো অন্যথায় গোলটেবিল বর্জন করবো।'

আলী আহমদ আর লেখে না। মন খারাপ হয়ে যায়। ও ডায়রি বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লাহোর গেছেন। ভাসানী বৈঠক

বর্জন করেছেন। যদি দাবি আদায় না হয় তখন কি হবে? আবার কি রাজপথ? না, ঢাকার রাজপথের কথা মনে হয় না আলী আহমদের। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে রাজশাহী, ওর প্রিয় শহর। আবার কি রক্তে লাল হবে ড. জোহার ধবধবে সাদা শার্ট? মতিহারের গাছগুলোর মাথায় বয়ে যাবে ঝোড়ো হাওয়া? কাঁটাতার পেরুতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাবে ছাত্রীরা? আর রাজশাহীর বাতাস ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে যাবে সেনাবাহিনীর গুলি?

পুষ্পিতা এক কাপ চা এনে টেবিলে রাখে।

পুষ্প বুঝলে কি করে যে আমি চা-ই চাইছিলাম?

আমি তো তোমাকে সবসময় বুঝেই এসেছি, তুমি আমাকে বোঝোনি।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে, ঠিক বলেছো। এ আমার অক্ষমতা। আমি তোমার মতো বিবেচক নই।

পুষ্পিতা হেসে বলে, ভাবছো কি যে আমি তোমার ছাত্রী? এই ঘর তোমার ক্লাসরুম।

না, তা নয়। আমিই তোমার ছাত্র। তোমার চেয়ে আমার বোধ যে অনেক কম।

আলী আহমদ পরাজিতের নিশ্বাস ফেলে চায়ে চুমুক দেয়। পুষ্পিতার হাতের কাঁচের চুড়ি টুংটাং বেজে ওঠে।

মন খারাপ করে দিলাম?

সত্যি কথা মানুষকে আহত করে পুষ্পিতা। সত্যি কথা মানার জন্য ভীষণ সাহস দরকার।

থাক, এসব কথা। কোথাও বেরুবে?

হ্যাঁ, সংবাদ অফিসে যাবো। যাই গোসলটা সেরে ফেলি।

পুষ্পিতা খালি কাপটা উঠিয়ে নিয়ে যায়। আলী আহমদের দু'কান ভরে বাজতে থাকে ওর কাঁচের চুড়ির শব্দ।

BanglaBook.org

সংবাদ অফিসে যাওয়া হয় না আলী আহমদের। নবাবপুর রোডে শহীদ সাবেরকে দেখে রিকশা থামায়। বলে, উঠুন?

শহীদ সাবের ভুরু কোঁচকায়, কোথায় যাবো?

আপনার যেখানে খুশি।

আমার খুশি? হা-হা করে হেসে ওঠে সাবের। আমার খুশি বলতে বলতে রিকশায় ওঠে। নোংরা শরীর থেকে বিদঘুটে গন্ধ আসছে। আলী আহমদের মুখভর্তি থুতু উঠে আসে। গিলে ফেলে সেটা।

একটু পর সাবের বলে, বাহ্ বেশ লাগছে এমন রিকশায় ঘুরতে। আপনি খুব ভালো বন্ধু।

এখন কিছু লিখছেন?

হ্যাঁ, কবিতা। হাজার হাজার কবিতা লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।

ছেঁড়ার আগে আমাকে দেখাবেন?

দেখাবো কেন? চুরি করবেন আমার লেখা? খবরদার, আর যদি কোনোদিন দেখতে চান তো আমি আপনাকে খুন করবো।

আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার আর ভুল হবে না।

জানেন, সারাজীবন যা লিখলাম সবকিছু আমার চুরি হয়ে গেলো।

চলুন কোথাও বসি, চা খাবেন?

না, চা খেতে ভালোলাগে না। পৃথিবীর সব পানীয় আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তবু এই বুকটা জ্বলে যায়, ভীষণ জ্বালা। সাবের দু'হাতে বুক চেপে ধরে বলে, একটা সিগারেট দিন।

আলী আহমদ সিগারেট দেয়।

জানেন এই একটি জিনিস আমার খুব ভালোলাগে। ওটা নিজে পোড়ে আমাকেও পোড়ায়। দারুণ না?

আবার হা-হা করে হেসে ওঠে সাবের। হাসির শব্দে পথচারিরা ঘুরে তাকায়।

দেখুন, দেখুন সব মানুষ আমাকে কেমন করে দেখছে? যেন আমি এক আজব চিজ। কি বলেন?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে।

সাবের চেঁচিয়ে বলে, এই রিকশা আজিমপুর গোরস্তানে যাও।

আলী আহমদ চমকে বলে, ওখানে কেন?

সাবের নির্বিকারভাবে বলে, এমনি। ভালোলাগে। শান্তি পাই। কেন জানেন? মাটি আমার জন্য নয়। দেখবেন কাক হয়ে উড়ে চলে যাবো অন্য কোথাও।

আজিমপুর পৌঁছে রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে যায় সাবের। আলী আহমদ নামতে গেলে বাধা দেয়।

খবরদার আপনি আর আমার সঙ্গে আসবেন না। আমি একা থাকতে চাই।

আলী আহমদ রিকশার ওপর থ হয়ে বসে থাকে। চলে যাচ্ছে শহীদ সাবের– একমুখ চুল-দাড়ি, ছেঁড়া কাপড়ে শরীর পুরো ঢাকেনি। দুষ্টু ছেলেরা পিছু নিয়েছে। বলছে, পাগলা তুই থাকিস কোথায়? সাবের কারো দিকে তাকায় না। গোরস্তানের গেটের ভেতর ঢুকে গেছে। একলা থাকতে চায় সাবের? ও তো একাই। যে মানুষের চেতনা কাজ করে না, বোধ সাড়া দেয় না তার চেয়ে বড়ো একা আর কে আছে? তবুই কি মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে একা হতে চায় ও? আসলে ব্যক্তির একা হয়ে যাওয়ার কিছু এসে যায় না, কিন্তু সমষ্টির একক হওয়া ভীষণ জরুরি। এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে এ জাতি সমষ্টির একক।

রিকশা চলতে শুরু করে। আলী আহমদ নিজেও জানে না যে ও কোথায় যাবে? কিন্তু ওর মনে হয় ও চাইলেও একা হতে পারে না। ওর মনের ভেতর হাজার মানুষ কথা বলে। ওরা একের মধ্যে অনেক এবং অনেকের মধ্যে এক।

শেষ পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন। বক্তৃতায় বলেন, গণদাবি আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

সেদিন বিমানবন্দর থেকে ফিরে প্রদীপ্ত বলে, বাবা আবার রাজপথ।

আলী আহমদ চিন্তিত মুখে বলে, হয়তো তাই। ভেবেছিলাম রাজপথ শান্ত হয়েছে।

দু'জনে চায়ে চুমুক দেয়। কেউ কোনো কথা বলে না। দু'জনের নিস্তব্ধতার মাঝে পুষ্পিতা এসে দাঁড়ায়। খানিকটা ঘোষণার মতো করে বলে, আমি রাজশাহী যেতে চাই।

এমন আকস্মিক সিদ্ধান্ত ঘোষণায় দু'জনে ওর মুখের দিকে তাকায়, কি হয়েছে পুষ্পিতার! ওর কণ্ঠে কেন এমন সব হারানোর চাঞ্চল্য! পুষ্পিতা তো নিজের দাবির কথা এমন কঠিন স্বরে বলে না!

BanglaBook.org

শোনো, কাল রাতে কালো খালাকে স্বপ্ন দেখেছি। আমার খুব মন খারাপ লাগছে। কতদিন ওদের দেখিনি। ও আবার একই অনড় ভঙ্গিতে বলে, আমি রাজশাহী যেতে চাই।

আলী আহমদ টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা ঠক করে রেখে বলে, হ্যাঁ, চলো, আমরা রাজশাহী যাবো। কালো খালাদের নাচোলে দেখে এসে তোমাকে নিয়ে পদ্মার ধারে ঘুরে বেড়াবো, মতিহারে যাবো। সাহেববাজার থেকে তিলের খাজা কিনবো।

পুষ্পিতা দু'চোখ বিস্ফারিত করে হেসে ওঠে, ওহ্ ভাবতে কেমন জানি লাগছে! কবে যাবে?

সামনের সপ্তাহে। হাতের কাজগুলো গুছিয়ে নিই।

তাই যাও বাবা। আমি আর জিতু বাড়ি পাহারা দেবো।

প্রদীপ্ত বাবা-মার দিকে তাকিয়ে দেখলো, একটি জায়গার কথা মনে হতেই দু'জন মানুষ কত কাছাকাছি হয়ে গেলো! মঞ্জুলিকা ওকে কতদিন বলেছে রায়েরবাজারে সতীশ বুড়োর কাছে নিয়ে যেতে, যাওয়া হয়নি। ওখানে গেলে কি মঞ্জুলিকার সঙ্গে ওর অনুভবের ক্ষেত্রগুলো গভীর হবে? হয়তো হবে, হয়তো ওরা এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা দু'জনের সম্পর্কের রশিটাকে গিট্টুহীন করে দেবে, সহজ হয়ে যাবে পরস্পরকে বুঝতে পারা। আজ গেলে কেমন হয়? যাবার কথা শুনলেই মঞ্জুলিকা নিশ্চয়ই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবে, এতদিনে তোমার সতীশ বুড়োর কথা মনে হলো? ও নিজেকেই বলে, মনে যে হয়নি তা নয়, সতীশ বুড়ো আমার করোটির ভেতরের রঙিন পট, নতুন করে মনে করার ব্যাপার নয়। ঊনসত্তরের এই গণআন্দোলন আমার সম্পর্কের রশির বাঁধনগুলো আলগা করে রেখেছিলো মঞ্জুলি। এরপর মঞ্জুলিকার উত্তরটা ওর জানা। বলবে, যাহোক, তবুতো সময় হলো। চলো আজই যাবো। আমি তো তোমাকে বলেছিলাম আমাদের বিষয়ে আগে আমি সতীশ বুড়োর আশীর্বাদ নিতে যাবো। প্রদীপ্ত নিজের মনে হাসে, তাহলে কি আমাদের বিয়ের সময় হয়েছে মঞ্জুলি? ওর মাথার ভেতর সম্পর্কের রশিটা রেশমি হয়ে যায়– মৃসণ এবং রঙিন। এ রশির বাঁধন অন্যরকম, ভাবতে ভাবতে প্রদীপ্ত বাড়ি থেকে বের হয়। দু'জনে যখন রায়েরবাজারে আসে তখন প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে বলে, বাবা মাকে নিয়ে নদীর কাছে যেতে চেয়েছেন, প্রকৃতির কাছেও। আমি তোমাকে নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছি।

কোনটা তোমার প্রিয়? প্রকৃতি না মানুষ?

দু'টোই। দু'টো দু'ধরনের সত্য। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা নয়।

আমারও তাই মনে হয়। আমিও দু'টোকেই ভালোবাসি।

তাহলে আমি কি তোমার প্রকৃতি না মানুষ?

কখনো মানুষ, কখনো প্রকৃতি। কতভাবে যে দেখি।

মঞ্জুলিকার গাঢ় কণ্ঠ প্রদীপ্ত কান দিয়ে শোনে না, হৃদয় দিয়ে শোনে। নিজের বাম হাত দিয়ে আলতো করে ওর ডান হাতে চাপ দেয়। তখন রিকশা সতীশ বুড়োর বাড়ির কাছে এসে থামে। ওরা দেখতে পায় বাড়ির সামনে ছোট জটলা।

মধুমালতী আত্মহত্যা করেছে। তখনো ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে ওর লাশ ঝুলছে। ঘরের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো সতীশ বুড়ো। প্রদীপ্তকে দেখে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তারপর চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, ভোরবেলা আমি বেরিয়েছিলাম পটের জন্য মাটি আনতে। দুপুরের পর বাড়ি ফিরে ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতেই–। সতীশ বুড়ো বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠুকতে থাকে। প্রদীপ্ত ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। মঞ্জুলিকা দু'জনকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মধুমালতীকে দেখে– চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, জিভ ঝুলে আছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আতঙ্ক। মঞ্জুলিকা চৌকাঠ

BanglaBook.org

পেরিয়ে ঘরে ঢোকে। মধুমালতী লাল-কালো ছাপার শাড়ি পরে আছে, গায়ে হলুদ রঙের ব্লাউজ, সাদা পেটিকোট অনেকখানি বের করা। মধুমালতী কোনো গয়না পরেনি– খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, কালো কুচকুচে সে চুলের ভারি, মোটা গোছা। মধুমালতীকে কি খুব ভয়ঙ্কর লাগছে? আশ্চর্য, মঞ্জুলিকা দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। ওর তো আঁতকে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার কথা ছিলো। পারছে না কেন? শরীরটা কি চুম্বক? মঞ্জুলিকা এক-পা দু-পা করে ঘরে ঢোকে। ও নিচের দিক থেকে মধুমালতীকে দেখতে শুরু করে, প্রথমে পায়ের পাতা। আলতা দিয়ে ফুল-পাতা আঁকা পায়ের পাতায়, বোঝাই যায় সময় নিয়ে বেশ যত্ন করে এঁকেছে। ওকি আর একটু কাছে যাবে? আরো দু'পা এগুলে দেখতে পায় নিরাভরণ দু'হাতেও আলতার ফুল-পাতা আঁকা, কোথাও কোথাও আলতা লেপ্টে গেছে। মঞ্জুলিকা আরো দু'পা এগোয়– এখন ও লাশের মুখোমুখি। আশ্চর্য, মুখজুড়েও ফুল-পাতা আঁকা। কী সুন্দর চিকন রেখায় ভরিয়ে তুলেছে নিজেকে। চিবুকের ওপর আঁকা বেশ বড় একটি ফুল ছুঁয়ে আছে বেরিয়ে আসা জিহ্বা। মঞ্জুলিকা নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। আসলে কি ও চোখ দিয়ে দেখছে না শুনছে? কেন সতীশ বুড়ো এমন বিকট স্বরে কাঁদছে? নাকি কোথাও মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, নাকি সে কণ্ঠ আরতির ঘণ্টা– ঢং, ঢং, ঢং। নাকি কোনো এক সেবাদাসী তার অনন্তকালের মন্দিরে নৃত্য করে চলেছে– পায়ের ঘুঙুরে শব্দ হচ্ছে, ঝম ঝম। চমকে ওঠে মঞ্জুলিকা। বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি। ও জানে না কে মানে কি, কোথায় মানে কি। ও বুঝতে পারে না কে কোথায় কি হারাচ্ছে, কোথায় নতুন করে শুরু হচ্ছে। সতীশ বুড়োর কণ্ঠে এখন শুরুর রেশ নেই, সবটাই হারানোর আর্তনাদ। মঞ্জুলিকা আবার প্রথম থেকে দেখা শুরু করে। মধুমালতীর পা ধবধবে ফর্সা– শাড়ি হাঁটুর কাছাকাছি উঠে আছে। যেন শাড়িটা ক্রমাগত উপরে উঠে যাচ্ছে, কে টানছে শাড়ি? উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছে কি মধুমালতী? বেরিয়ে আসছে ধবধবে ফর্সা উরু, জঙ্ঘা, নাভিমূল, পেট, বুক, গলা- ওহ্ মধুমালতী! মঞ্জুলিকা দু'হাতে মুখ ঢাকে। সব ফর্সা মুছে গিয়ে জেগে থাকে পাপড়ি মেলা একটি কালো পদ্ম– ওই অঙ্গের জন্য মধুমালতীকে দাঙ্গা খেলো– ঘর গেলো, স্বামী গেলো। মঞ্জুলিকার মনে হয় সব ফর্সার বিপরীতে জেগে থাকা কালোই– নিয়ন্ত্রণ করে জীবন। তাহলে কি বুঝতে হবে যা আপাত কালো সেটা কালো নয়, সেটাই সবচেয়ে বেশি ফর্সা– আর সব ফর্সাকে ঢেকে দেয়ার প্রবল ক্ষমতা রাখে? তাই হবে। মঞ্জুলিকা অবসন্ন বোধ করে। তাহলে কেন তুমি আলতা দিয়ে নকশা করেছো তোমার ফর্সা গায়ে? কেন? মধুমালতী ঝুলে আছে, প্রাণহীন– অপরিসর ঘরটার ভেতরে চৌষট্টি সাল ফুটে ওঠে, যেন ওই নকশাগুলো নদী এবং সমতল। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় নদী, নদীই তৈরি করতে পারে নতুন ভূখণ্ড। মধুমালতীর শরীর বাতাসে নড়ে। মঞ্জুলিকা শুনতে পায় কণ্ঠ, কার কণ্ঠ? বলছে, দাদাবাবু ওকে স্বামী ত্যাগ করলে ও নিজের হাতে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে। বলতো, ওটা সিঁদুর নয়, রক্ত। মানুষের রক্ত কি মানুষের কপালে লেগে থাকতে পারে? দাদাবাবু, ও জানে না কিন্তু আমি ঠিকই জানি মানুষের রক্তই মানুষের নিয়তি।

প্রদীপ্তর কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ, না, ঠিক বলোনি। রক্তের হোলি খেলা কখনো নিয়তি হতে পারে না।

সতীশ বুড়োর কণ্ঠে কান্নার শব্দ থিতিয়ে এসেছে। উঠোনের জটলাটা বড় হয়েছে। একে-দুয়ে আরো অনেকে ভিড় জমিয়েছে। প্রদীপ্ত সতীশ বুড়োর দু'হাত জড়িয়ে বলে, তুমি তো ওকে ভালোবাসা দিয়েছিলে। কতগুলো বছর বাঁচিয়ে রাখলে। তোমাকে না পেলে ও তো আরো আগেই মরে যেত।

দাদাবাবু, আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো মধুমালতী। আমরা ঘর চাই না, শুধু বেঁচে থাকা চাই।

মঞ্জুলিকা দু'পা পিছে সরে আসে। ভাবে, দাঙ্গার বিপরীতে মানুষকে বেঁচে থাকতেই হবে। এই বেঁচে থাকার স্বপ্নই কি মধুমালতী এঁকে গেছে এইসব নকশার ভেতর? তাহলে ও মরলো কেন? নিজের জীবন দিয়ে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখাই কি মানুষের ধর্ম? তখন আবার ভেসে আসে সতীশ বুড়োর কণ্ঠ, দাদাবাবু আমার কথা শুনে ও হাসতো। বলতো, জীবন কতবার গড়া যায় পটুয়া? আমি বলতাম, হাজার বার। ও আরো জোরে হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে প্রণাম করতো। বলতো, তোমার পরাণটা এত বড়ো কেন গো? আমি যে সইতে পারি না। দাদাবাবু, আমি ওকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে মানুষের কিছু হারায় না। যারা দাঙ্গার সময় ওকে ধর্ষণ করেছিলো তারা ওর কতটুকু নিয়েছে দাদাবাবু?

মঞ্জুলিকা আরো দু'পা পেছনে সরে আসতে আসতে বলে, মধুমালতী কে তোমার কতটুকু নিয়েছিলো? কি হয়েছে তাতে? জীবনের ওইটুকু বাদ দিলেওতো জীবনের অনেক কিছু থাকে, তুমিই তো সেটুকু এঁকে রেখেছো নিজের শরীরে, তাহলে মরলে কেন?

ভেসে আসে সতীশ বুড়োর কণ্ঠ, দাদাবাবু ও আমাকে বলেছিলো আমি তোমাকে দুঃখ দেবো না। ও কি ভেবেছিলো যে ও মরে গেলে আমি দুঃখ পাবো না? ও কি আমাকে সুখ দিয়ে গেলো দাদাবাবু?

মঞ্জুলিকা দ্রুতপায়ে ফিরে আসে দরজার কাছে। দরজার কপাটে ওর মাথা ঠুকে যায়। ওর মনে হয় ওর ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। ও অস্ফুট আর্তনাদ করে দু'হাতে কপাট আঁকড়ে ধরে। ছুটে আসে প্রদীপ্ত, কি হয়েছে মঞ্জুলিকা? আমি তো খেয়ালই করিনি যে তুমি ঘরে ঢুকেছো? এ দৃশ্য কি দেখা যায়? এসো, বাইরে এসো। আমি ভেবে পাই না যে তোমার এত সাহস হলো কি করে?

আহ্, এভাবে বোলো না। আমি যা দেখেছি তুমি তা দেখোনি। এসো দেখবে।

না।

মৃদু ধমক দিয়ে প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে টেনে বের করে।

তখন পুলিশ আসে। সতীশ বুড়ো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একজন ওকে রাইফেলের গুঁতো দিয়ে বলে, চুপ করো বুড়ো। আমরা লাশ মর্গে নিয়ে যাবো।

সতীশ কাঁদতে কাঁদতে বলে, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যান।

ওরা প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কেউ হয়?

হ্যাঁ। প্রদীপ্ত সতীশ বুড়োর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে।

ওর বউটা মরলো কেন?

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে।

বুড়োটা মারধোর করতো?

প্রদীপ্ত তিক্তকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, বনিবনা ছিলো না।

এখন আবার ঢং দেখিয়ে কাঁদছে।

একজন বয়স্ক পুলিশের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। দু'তিনজন ভেতরে গেছে লাশ নামানোর জন্য। মঞ্জুলিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি এভাবে কথা বললে কেন?

প্রদীপ্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, ওদের সাধ্য কি এদেরকে বোঝার। সতীশ বুড়োকে শুধু আমার কাছেই রাখতে চাই মঞ্জুলি। ওকে সবার কাছে ঠেলে দিলে ওর অপমান হবে।

লাশ নিয়ে যাবার সময় প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, পোস্টমর্টেম কখন শেষ হবে?

কাল হাসপাতালে গিয়ে খবর নেবেন।

সতীশ বুড়ো লাশের পিছে পিছে গাড়ি পর্যন্ত যায়। কাঁদে না, চেঁচায় না, কথা বলে

BanglaBook.org

না, শুধু তাকিয়ে থাকে। গাড়ি চলে গেলে প্রদীপ্ত বুড়োর ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে, ঘরে চলো।

সতীশ বুড়ো স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে ঘরে আসে। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। মঞ্জুলিকার দিকে তাকিয়ে বলে, দিদিভাই জল খাবো।

মঞ্জুলিকা রান্নাঘরে গেলে ও প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে বলে, দাদাবাবু কাল আমার সঙ্গে শ্মশানে থাকবে তো?

আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? সব তো হারালে।

সতীশ বুড়ো নির্বাক হয়ে থাকে। ও ধরে রাখতে চেয়েছিলো, পারেনি। ও নিজে কাউকে হারানোর জন্য দায়ী নয়, তবু কেন জীবনের এই প্রতারণা?

চলো, আজ আমার সঙ্গে থাকবে।

সতীশ বুড়ো মাথা নাড়ে, আর কদিন বাঁচবো দাদাবাবু।

যতদিন বাঁচার ইচ্ছে করবে ততদিন। দেখলে না মধুমালতীকে–

সতীশ বুড়ো আবার মাথা নাড়ে, আসলে ও আমাকে ভালোবাসেনি।

মঞ্জুলিকা বড়ো কাঁসার গ্লাস ভরে জল আনে। সতীশ বুড়ো এক চুমুকে শেষ করে ওর দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আরো।

তুমি দিদিভাইকে নিয়ে বাড়ি যাও দাদাবাবু।

তুমি যাবে না?

কেন মরে যেতে বলছো? আমি তো মরতে চাই না।

একা একা ভয় করবে না?

কেন? সতীশ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। তুমি কি ভেবেছো মধুমালতী মরে পেত্নী হয়ে গেছে?

মঞ্জুলিকা জল নিয়ে এলে ও আরো এক গ্লাস জল খায়। তারপর দু'হাতে কাঁসার গ্লাসটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত মিনতিভরা কণ্ঠে বলে, দিদিভাই বাড়ি যাও।

প্রদীপ্ত উঠে দাঁড়ায়। ওরা বুঝতে পারে পুরো বাড়িতে সতীশ বুড়োর একা হয়ে যাওয়া এখন খুব দরকার। ও একবার সব হারিয়ে পথ থেকে তুলে এনেছিলো ঘর। ও আবার ঘর থেকে পথে। যে মানুষ সব হারায় তার শূন্যতা কে ভরে দেবে? এখন ওর চারপাশে নেমে আসবে আকাশ– একমাত্র নীলিমার সখ্য দিয়েই ও হয়তো নিজের শূন্যতা ভরে রাখতে পারবে। ওর দু'কানে এসে আছড়ে পড়বে বাতাসের গর্জন। যেতে যেতে মঞ্জুলিকা বলে, রাতে কি সতীশ বুড়ো ঘুমোবে?

প্রদীপ্ত ওর দিকে না তাকিয়ে নিজের মনেই বলে, উঠোনে জ্যোৎস্না ভরে গেলে ও গান গাইবে। তারপর মাটি নিয়ে বসবে। ওকে যে অনেক পট বানাতে হবে।

আজ ও ঘুমুতে পারবে না। মঞ্জুলিকা নিজেকে বলে, আমারও মনে হয় ঘুমুনোর আগে ওর অনেক পট বানাতে হবে। মঞ্জুলিকা রিকশায় বসে প্রদীপ্তর হাত ধরে বলে, আমার জীবনে এমন একটি অভিজ্ঞতা না হলে আমি বুঝতেই পারতাম না যে জীবনের অর্থ কত বিচিত্র। দীপ, তোমার সঙ্গে আমার যেন এমন সম্পর্ক না দাঁড়িয়ে যায়, যেন আমরা খুব সহজভাবে জীবনের যাত্রা শেষ করতে পারি।

আমার দিক থেকে তেমন ভয় নেই।

আমারও নেই। তবু বলা তো যায় না কি হবে। পরিস্থিতি আমাদের আমূল বদলে ফেলতে পারে।

তেমন পরিস্থিতি হলে তুমি কি আত্মহত্যা করবে?

BanglaBook.org

মঞ্জুলিকা চুপ করে থাকে। প্রদীপ্ত জোরের সঙ্গে বলে, আমি করবো না। আমি কাপুরুষের মতো মরতে চাই না।

আমিও তেমন মৃত্যু ঘৃণা করি।

তবে যে চুপ করে ছিলে? দ্বিধা ছিলো কেন?

দ্বিধা নয়, ভাবছিলাম আমাকে এ প্রশ্নটি করা তোমার উচিত হয়নি। মুহূর্তের জন্য তোমার ওপর আমার রাগ হয়েছিলো।

তাই বলো সোনার মেয়ে।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার দু'হাত ধরে রাখে। ছাড়ে না।

পরদিন শ্মশানঘাট জ্বলে ওঠে মধুমালতীর চিতা। অল্পক্ষণে পুড়ে যায় ও। নিভে আসে আগুন। একটু দূরে ডোমগুলো বাংলা মদ নিয়ে হৈ-চৈ করছে। সতীশ বুড়ো গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে ওদের বলে, আমি আমার বউ পার্বতীকে চিতায় তুলতে পারিনি দিদিভাই। দু'ছেলে দু'মেয়েকেও না। ওরা মুসলমানের জ্বালানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ওরা স্বর্গে যেতে পারেনি, আমি জানি মধুমালতীও পারবে না। আমার সঙ্গে যারা থাকে তার কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। আমি ঠিক করেছি আমার ওই বাড়িতে আমি আর ফিরবো না।

ফিরবে না? কোথায় যাবে?

পথে। শ্মশানে। কত জায়গা আছে।

কি বলছো তুমি?

এই নাও আমার ঘরের চাবি। এটা তোমাকে দিলাম।

আমি কি করবো?

যা খুশি।

তোমার চাবি তোমার কাছেই রাখো। যখন পথ ভালো লাগবে না তখন ঘরে যেও।

দিদিভাই তুমি নাও।

মঞ্জুলিকা কেঁদে ফেলে, না, আমি পারবো না।

তাহলে কি ওই ডোমগুলোকে দিয়ে দেবো?

তুমি কি চাও তোমার পার্বতী আর মধুমালতীর ঘরে ডোমরা মদ খেয়ে হল্লা করবে?

সতীশ বুড়ো থমকে যায়। তারপর চাবিটা নিজের ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলে, আমি এখন নদীতে চান করবো। তোমরা বাড়ি যাও দিদিভাই।

সতীশ বুড়ো আর একবারও ওদের দিকে না তাকিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে। বটগাছের মাথায় পাখি পাখা ঝাপটায়। গা ছমছম করে ওঠে মঞ্জুলিকার। এতক্ষণে ওর খারাপ লাগা প্রবল হয়ে ওঠে। মর্গে উলঙ্গ মধুমালতীকে দেখার পর থেকে ওর খারাপ লাগতে শুরু করেছিলো। তলপেট থেকে মাথা পর্যন্ত দু'ফাঁক করা হয়েছিলো পোস্টমর্টেমের জন্য– সেই সেলাই করা মৃতদেহ ওর মনোজগতের পরিধি থেকে সরাতে পারছে না। চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখলেও কোনো কোনো দৃশ্য এভাবে টিকে থাকে– একজন মানুষকে নিরুপায় বোধে ফেলে দেয়ার জন্য সেটা যথেষ্ট শক্ত ভিত। মঞ্জুলিকার মনে হয় এই বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্মশানের স্তব্ধতা এবং পাখির ডাক– এবং এসব কিছুর ভেতর দৃশ্যমান সতীশ বুড়ো, যে খানিকটা দূরে নদীতে ডুবছে আর উঠছে। সে অতিক্রান্ত সময়ের ঊর্ধ্বে এক গভীর অথচ ভয়াবহ সত্যের ভেতর মঞ্জুলিকাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। বলছে, দেখো, যেন বুড়োর ভেতর ভর করেছে শ্মশানের যাবতীয় শব্দ, দৃশ্য এবং কণ্ঠ।

প্রদীপ্ত ওকে তাড়া দেয়, চলো।

BanglaBook.org

দাঁড়াও। তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ, অনেক কিছুই শুনতে পাচ্ছি। বাতাসের শনশন, পাখির ডাক, ডোমদের–

আহ্, আমি এসব কিছুর কথা বলিনি। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না যে সতীশ বুড়োর কান্না ওর একার নয়, তা হাজার মানুষের।

মঞ্জুলিকা!

এ কান্না সমষ্টির দীপ। দাঙ্গা ঘটিয়ে মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয়ার জন্য আমাদের অপরাধের কান্না।

প্রদীপ্ত এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে মঞ্জুলিকার দিকে তাকিয়ে থেকে সতীশ বুড়োর দিকে চোখ ফেরায়। সে ভিজে কাপড়ে নদী থেকে উঠে আসছে। একবার নিভে যাওয়া চিতার দিকে তাকায়, তারপর উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। মঞ্জুলিকা চোখ মুছে বলে, আমি এমন দৃশ্য দেখিনি।

প্রদীপ্তর চোখেও জল। ওর হাত ধরে বলে, চলো যাই।

উনিশ মার্চ পাকিস্তান ছাত্র শক্তি গভর্নর মোনায়েম খানের অপসারণ ও এগারো দফা আদায়ের দাবিতে হরতাল ডাকে। সেদিন অসুস্থ নসিবকে দেখতে হাসপাতালে যায় প্রদীপ্ত। নসিব জণ্ডিসে ভুগছে, ফ্যাকাসে বিবর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। দু'হাতে প্রদীপ্তর হাত জড়িয়ে ধরে, যেন কাউকে ওর ভীষণ প্রয়োজন– কাউকে নির্ভর করতে পারলে ও বুঝি বেঁচে যায়।

কেমন আছেন নসিব ভাই?

ভালো। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না।

তাহলে শুয়ে শুয়ে কিছু একটা লিখে ফেলুন।

ঠিক বলেছো। জানো আমার মনে হয় আমার মাথার ভেতর জণ্ডিসের হলুদ আভা ক্রমাগত বাড়ছে। আমিও ভাবছি কিছু একটা লিখবো। তুমি আমাকে একটা নোটবুক দিয়ে যাবে। কেমন?

হ্যাঁ, কালই দিয়ে যাবো। কিন্তু ভাবী দেখলে তো রাগ করবে।

ওকে দেখাবো না। লুকিয়ে রাখবো।

একজন পরাজিত মানুষের ক্লান্তি ফুটে ওঠে নসিবের চেহারায়। প্রদীপ্ত কমলা ছিলে খেতে দেয়। নানা কথা বলে। আনন্দে রাখতে চায় নসিবকে। তবু ওর কষ্ট হয়। কেবলই মনে হয় একজন অমিতাভ গফুর এবং অসীম রায়হানের মৃত্যুকে ঠেকানোর চেষ্টায় প্রাণান্ত নসিব হাফিজউদ্দিন। একদিন কি ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসবে নসিব?

কি ভাবছো প্রদীপ্ত?

কই কিছু না তো।

ভাবছো আমার দুঃখের কথা। ভাবছো–

আহ্ নসিব ভাই আমি কিছু ভাবছি না– আমি মনে করছি সেসব দিনগুলোর কথা যখন আপনি ভীষণ প্রাণবন্ত এবং সজীব ছিলেন।

আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলি যার জন্য শুধু কষ্টই থাকে।

নসিব নিশ্বাস ফেলে চোখ বোজে।

আপনার ঘুম পাচ্ছে নসিব ভাই? তাহলে আপনি ঘুমোন। আমি যাই।

আর একটু বোসো। তোমার ভাবী এলে যেও। তোমার হাতটা দাও আমি ধরে রাখি।

BanglaBook.org

একসময় নসিব ঘুমিয়ে পড়লে প্রদীপ্ত নিঃশব্দে উঠে আসে। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত অবাক হয়ে দেখে হুড ফেলা রিকশায় প্রতীক আর বন্যা যাচ্ছে। দু'জনে হাসি ঠাট্টায় দু'জনের মধ্যে ভীষণ মগ্ন– চেহারা দেখেই প্রদীপ্ত বুঝে ফেলে যে উল্টেপাল্টে গেছে ওদের বুকের ভেতর।

রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতীককে জিজ্ঞেস করে, ঘটনাটা কবে ঘটলো?

প্রতীক হকচকিয়ে যায়। প্রথমে না বোঝার ভান করে। প্রদীপ্ত হাত চেপে ধরে বলে, সব জেনে গেছি লুকোবার চেষ্টা করিস না।

প্রতীক আমতা আমতা করে বলে, ইয়ে, মানে, ঘটনাতো একদিনে ঘটে না–

প্রদীপ্ত চাপা ধমক দেয়, ফের দার্শনিক হবার বাখোয়াজী? কবে ভালোবাসার কথা বলার সাহস হলো?

প্রতীক এক দমে বলে ফেলে, এইতো সেদিন যেদিন শহরটা জ্বলছিলো– আগুন নদীর মতো গড়াচ্ছিলো–

বাহ্, বেশ কবিতার মতো বলা হচ্ছে। তাহলে সেদিন তোরা ভালোবাসার জল ঢেলেছিস। যাক ভালো। অভিনন্দন।

ভাইয়া, বাবা-মাকে–

নিশ্চিত থাক, বলবো না।

প্রতীক পালিয়ে বাঁচে। প্রদীপ্ত ভীষণ মজা পায়। নিজেকে বেশ অভিভাবক, অভিভাবক মনে হয়।

দু'দিন পর নিঃশব্দে ঢাকা থেকে পালিয়ে যায় গভর্নর মোনায়েম খান। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে আলী আহমদের ঘুম ভাঙায়, বাবা শয়তানটা পালিয়েছে!

আকস্মিক চেঁচামেচিতে আলী আহমদের ঘুম ভাঙে কিন্তু রেশ কাটে না। চোখ কচলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। কি বলছিস?

বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান গভর্নর পালিয়েছে।

ওহ্। আলী আহমদ হাই তোলে। কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না।

তুমি অবাক হওনি বাবা?

না। এত বড়ো আন্দোলনের পর, এটাই তো স্বাভাবিক দীপু।

আমার ভীষণ মজা লাগছে। যাই শহরের অবস্থা দেখি গিয়ে।

প্রদীপ্ত বেরিয়ে গেলে পুষ্পিতা আলী আহমদের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, কী ব্যাপার! এমন মুখ করে বসে আছো যে?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, ভাবছি আজ বাজারে যাবো। কতদিন বাজারে যাই না।

হঠাৎ এমন মত বদল? এতদিনতো শুধু বলেছো ফেরিওয়ালার কাছ থেকে শাক-সবজি, মাছ-মুরগি রাখো।

আহ্ পুষ্পি প্রশ্ন কোরো না। শুধু বলো কি আনতে হবে, যত খুশি, যা খুশি।

পুষ্পিতার অবাক-দৃষ্টির সামনে দিয়ে ও বাথরুমে যায়।

দুপুরে মঞ্জুলিকার সঙ্গে দেখা হতেই প্রদীপ্ত দু'আঙুলের ভি দেখায়। মঞ্জুলিকা মাথা নেড়ে বলে, জানি।

BanglaBook.org

মোনেম ব্যাটা পালিয়েছে, তাই আজ উৎসব। চলো উৎসব পালন করি।

কিভাবে? চাইনিজ খাবে?

উঁহু, অত অল্পে হবে না।

তাহলে?

চলো, কাজী অফিসে যাই।

সে কি কথা, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন হুট করে।

হুট করে কোথায়? যেদিন ভালোবাসার শুরু সেদিন থেকেই তো ঠিক হয়ে আছে যে বিয়ে করবো। আমি কি তোমাকে ভালোবাসি না?

তা কি বলেছি নাকি? কিন্তু আজ নয়। আমার মানসিক প্রস্তুতি চাই।

ঠিক আছে তোমার মানসিক প্রস্তুতির সময় দিচ্ছি। কবে বলো?

মঞ্জুলিকা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, পঁচিশ তারিখ।

প্রদীপ্ত হিসেব করে মাথা নাড়ে, পঁচিশ মার্চ। ঠিক আছে আপত্তি নেই।

কিন্তু ঐদিনতো ছাত্ররা হরতাল ডেকেছে?

অসুবিধা কি? আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে কাজী অফিসে চলে যাবো।

মঞ্জুলিকা উত্তেজিত হয়ে বলে, ভীষণ থ্রিল লাগছে।

পরে দু'জনে শহরটা ঘুরে বেড়ানোর জন্য রিকশা ডেকে উঠে পড়ে।

দু'দিন পর নতুন গভর্নর শপথ গ্রহণ করে। জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেয়। জনগণের সহযোগিতা কামনা করে।

প্রতীক হাসতে হাসতে বলে, খুকুমনির পুতুল খেলা। একজনকে ধরেটরে বর সাজিয়ে দিলেই হলো আর কি!

আলী আহমদ গম্ভীর হয়ে বলে, এরও শেষ আছে জিতু।

BanglaBook.org

পঁচিশ তারিখ কাজী অফিসে বিয়ে হয় প্রদীপ্ত ও মঞ্জুলিকার। পঁচিশ পয়সার কাবিন। দু'জনের বেশ কয়েকজন বন্ধু এসেছে। সব শেষ করে ওদের চাইনিজ খাইয়ে, আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। দু'জনে মিলে দরজায় কড়া নাড়ে। প্রদীপ্ত বলে, এখন যে দরজাটা খুলবে সেটা আমাদের নতুন প্রবেশ পথ।

মঞ্জুলিকা ফিসফিসিয়ে বলে, আমার ভয় করছে।

প্রদীপ্ত হেসে ওঠে, কোনো ভয় নেই।

পুষ্পিতা দরজা খোলে।

মঞ্জুলিকা তড়িঘড়ি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। প্রদীপ্ত নিজেও মাকে সালাম করে বলে, আমরা বিয়ে করেছি মা।

পুষ্পিতা মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলে, তা আমাকে বাদ দিয়ে করলি কেন? আমি কি দোষ করেছি?

বলতে বলতে গলার চেন খুলে মঞ্জুলিকাকে পরিয়ে দেয়। হাত ধরে বলে, এসো বৌমা। ওগো শুনছো–

আলী আহমদ এবং প্রতীক দু'জনেই যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আলী আহমদ অনুভব করে ওর ঘরে আর একজন মানুষ বাড়লো। এভাবেই মানুষ বাড়ে। এটাই

নিয়ম। এটাই প্রকৃতির ধারাবাহিকতা।

ও পুষ্পিতাকে বলে, আমার বাবার সোনার মোহরটা নিয়ে এসো। তারপর আমি বৌমার মুখ দেখবো।

প্রতীক ফ্রিজ খুলে মিষ্টি নিয়ে আসে। নিজ হাতে সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে দেয়। মঞ্জুলিকাকে ঘিরে ওরা বৈঠকখানায় বসে। মঞ্জুলিকার কাছে ওদের কতকিছু জানবার আছে। একজন নতুন মানুষ পরিবারকে মাতিয়ে তোলে।

সন্ধ্যা উতরে গেলে প্রতীক বলে, মা বাজারে যেতে হবে না? কিছু বলছো না যে?

বৌমা লক্ষ্মী মেয়ে। ওর জন্য আমার ঘরে খাবার মজুদ আছে।

ফাঁকি দিয়ো না মা। ভালো মেনু চাই কিন্তু।

পুষ্পিতা প্রতীকের মাথায় হাত রেখে বলে, খাসির বিরিয়ানি আর মুরগির কোর্মায় হবে তো?

হবে মানে, দারুণ হবে। সালাদ বানাতে ভুলো না।

পুষ্পিতা হাসতে হাসতে রান্নাঘরে যায়।

প্রতীক মঞ্জুলিকার হাত ধরে নিয়ে যায় প্রদীপ্তর ঘরে। বলে, তুমি এখানে বোসো ভাবী। আমি দেখছি তোমার বাসরের কি ব্যবস্থা করা যায়।

মঞ্জুলিকা ওকে বাধা দেয়, না, না কিছু করতে হবে না। আমি তো কিছুই চাই না।

প্রতীক জোর দিয়ে বলে, তুমি না চাইলে কি হবে, আমি চাই। নিদেন পক্ষে একটি নতুন চাদরের বিছানা আর কিছু তাজা ফুল। চাদর মা'র স্টকে হয়তো আছে। আর ফুল কলোনির ভেতরই পেয়ে যাবো।

প্রদীপ্ত ওদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। বলে, ছেলেমানুষী করিস না জিতু। এসবে আমি লজ্জা পাই।

তুমি চুপচাপ থাকো ভাইয়া, বলে প্রতীক দরজা টেনে বেরিয়ে যায়।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে বুকে টেনে নেয়। বলে, সারাদিন কেমন ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেলো মঞ্জুলি। এখন তোমার আর আমার পালা।

মঞ্জুলিকা কিছু বলার আগেই একটি দীর্ঘ চুম্বন স্পর্শ ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়।

BanglaBook.org

বৈঠকখানায় আলী আহমদ একা। প্রদীপ্ত বিয়ে করেছে ভাবতেই ওর ভালো লাগছে। এই রক্ত-মৃত্যুর অনিশ্চিত সময়কে ও নিজের জীবনের সঙ্গে বাঁধলো। সামনের দিনগুলো ওর জন্য আনন্দের হোক, আলী আহমদ মনে মনে এমন প্রার্থনা করে। এক ঝলক রান্নার সুগন্ধী এসে নাকে লাগে। রান্নাঘরে গিয়ে পুষ্পিতার কাছে বসবে না কি করবে ভাবতে ভাবতে ট্রানজিস্টার টেনে নিয়ে নব ঘোরায়। জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজছে। আলী আহমদ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। এমন অসময়ে জাতীয় সঙ্গীত? তাহলে কি প্রেসিডেন্ট কিছু বলবে? হয়তো তাই। ক'দিন ধরে খুব গুজব চলছে সামরিক শাসন জারি হবে। এক জেনারেল আর এক জেনারেলের হাতে ক্ষমতা দেবে। আলী আহমদের মগজে আইয়ুব খানের বিভিন্ন সময়ের মন্তব্য মৌমাছির মতো হুল ফোটাতে থাকে। তিনি বলেন, দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব সামরিক বাহিনীর হাতে থাকা উচিত। কারণ সামরিক বাহিনীই দেশের একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র। আমাদের সেনাবাহিনী পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দেশকে চরম বিশৃঙ্খলা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। তারাই দেশের বুকে

শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে বেসামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

এইসব ভাবনার মাঝে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলে ও আকস্মিকভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, দীপু, দীপু!

ছুটে আসে প্রদীপ্ত ও মঞ্জুলিকা, রান্নাঘর থেকে পুষ্পিতা।

কি হয়েছে বাবা?

প্রেসিডেন্টের ভাষণ।

তাহলে কি সামরিক শাসন? আজ রাত থেকেই?

ততক্ষণে ভাষণ শুরু হয়েছে, 'আমার প্রিয় দেশবাসী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরূপে আপনাদের সামনে ইহাই আমার শেষ ভাষণ। দেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি সাধিত হইতেছে। প্রশাসনিক সংস্থাসমূহকে বিকল করা হইতেছে। জনতা আপন আপন ইচ্ছা মোতাবেক ঘেরাও শুরু করিয়াছে এবং জবরদস্তির মাধ্যমে তাহাদের দাবি-দাওয়া আদায় করিতেছে।...'

চলতে থাকে দীর্ঘ ভাষণ। ওরা কয়েকজন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। প্রতীক বাড়িতে নেই। ও বাসর সাজাবে বলে ফুল আনতে গেছে।

প্রেসিডেন্ট তাঁর দীর্ঘ ভাষণ শেষ করলেন এভাবে, 'দেশে দ্রুত এবং পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাহাতে আমরা গণতন্ত্রের পথ ধরিয়া উন্নতি এবং অগ্রগতির যাত্রা অব্যাহত রাখিতে পারি। আমিন।'

প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে বলে, গণতন্ত্র? কেমন গণতন্ত্র? সামরিক গণতন্ত্র?

আলী আহমদ কথা বলে না। নিশ্বাস ভালো করে টেনে বলে, পুষ্পিতা চুলোয় তোমার কোর্মা বোধহয় পুড়ছে।

পুষ্পিতা তড়িঘড়ি রান্নাঘরে যায়। প্রদীপ্ত চমকে বাবার দিকে তাকায়। পুড়ছে, শব্দটা প্রদীপ্তর বুকে গেঁথে যায়। ওর মনে হয় ওর শরীরের সব জায়গায় আগুন।

এমন অনির্ধারিত বক্তৃতার পর আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। সারা দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান সময় রাত সোয়া নয়টায় জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন। বাতিল হয়ে যায় শাসনতন্ত্র, বিলুপ্ত হয় পরিষদসমূহ, প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও মন্ত্রী পদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ সে পদে থাকবেন না বলে ঘোষণা করা হয়। জারি করা হয় সামরিক শাসনের বিধিবিধান। সামরিক শাসনের বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু, ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে; অনধিক চৌদ্দ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড; অনধিক তিরিশটি বেত্রাঘাত।

বেতারে এসব ঘোষণা শেষ হতে না হতে দরজার গায়ে দড়াম করে লাথি মারে প্রতীক। যাবার সময় ও দরজা টেনে গিয়েছিলো, তাই হাট করে খুলে যায়। ও হাতে একগাদা গাঁদা ও কাঠমল্লিকা নিয়ে বৈঠকখানায় এসে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে বলে, বাবা?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, সামরিক শাসন তৃতীয় বিশ্বের নিয়তি জিতু।

ও গাঁদা ফুল ছিঁড়তে থাকে। হলুদ পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দেয় ঘরে। আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলো, কত বয়স হলো ওর? এ বছরই ওর বাইশ হবে।

প্রদীপ্ত দেখলো, ওদের সবার প্রিয় জিতুকে। ও ফুলগুলো শুধু ছিঁড়ছে না, পায়ের নিচে পিষ্ট করছে। ওর মনে হলো, ও যা করছে তাই করুক।

BanglaBook.org

পুষ্পিতা চুলো থেকে কোর্মা নামিয়ে বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতীককে দেখে। ওকে বাধা দেয় না।

ও ফুলগুলো ছিঁড়ে-মাড়িয়ে মঞ্জুলিকার পাশে এসে বসে। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, এভাবেই তোমাদের বাসর।

মঞ্জুলিকা শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরে বলে, হোক পায়ের নিচে থেঁতলানো, তবুতো ফুল ছড়িয়েছো।

BanglaBook.org

গায়ত্রী সন্ধ্যা

৩য় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৯৯
প্রচ্ছদ : মঈন আহমেদ
উৎসর্গ : যে পরাক্রান্ত, ইতিহাস সৃষ্টি করে তার জন্য আহ্বান : তিষ্ঠ ক্ষণকাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

প্রকাশিত হলো 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : তিন'।

এ খণ্ডের ব্যাপ্তি উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর, মাত্র সাত বছর। কিন্তু বছরের হিসেব দিয়ে এ সময়ের পরিমাপ করা যাবে না। এ সময়ে অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশের– এ সময় বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল– তারা অর্জন করেছে সব ধর্মের মানুষের জন্য একটি ভূখণ্ড, যেখানে প্রতিদিনের গায়ত্রী সন্ধ্যায় মানুষের মঙ্গলধ্বনি বাজে। এ ভূখণ্ড স্থিত করেছে একটি জাতির স্বপ্নসাধ।

এ খণ্ড লেখার সময়ে বারবারই মনে পড়েছে প্রখ্যাত মনীষী এস.ওয়াজেদ আলীর কথা। যিনি তাঁর 'বাঙালি মুসলমান' অভিভাষণে বলেছিলেন, "বাঙালির, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র হচ্ছে পূর্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙ্গালী রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন যে পূর্ববঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।" ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এস.ওয়াজেদ আলীর 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' গ্রন্থ। এ বইয়ে তিনি লিখেছেন, "প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ অন্যতম।... আমাদের মনে হয়, প্রকৃতি দেবী– নিত্য-নূতনের সৃষ্টিতেই যাঁর প্রধান আনন্দ– ভারতের এই পূর্ব্ব ভূখণ্ডে নূতন এক জাতির, নূতন এক সভ্যতার, নূতন এক জীবনধারার, নূতন এক কৃষ্টির, নূতন এক আদর্শের সৃষ্টি প্রয়াসে নিরত আছেন।...এই বাঙ্গালী জাতিও তেমনি ভবিষ্যৎ গৌরবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত তার অবচেতনায় পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে...বাঙ্গালী ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে...অদূর ভবিষ্যতে সেই সহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই, আর তার ফলে বাঙ্গালী এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে; এবং সেই শুভ দিন যখন আসবে, তখন বাঙ্গালী কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে– সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের। বাঙ্গালী এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন– ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে আমার ইতিহাসের সেই মহামানব মনে হয়। তিনি বাঙালিকে তার গৌরবময় জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। বাঙালি অভিনব জীবনের আস্বাদ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আশা করেছিলেন এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দেশে এক পরিত্রাণকর্তার দেখা পাবেন, যিনি মানুষকে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা শোনাবেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো বলেন, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু এই কথাও আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের যেভাবে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, মানুষ হিসেবে মানুষকে যে আশ্বাসের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, এ দেশে এমন আর কে চেয়েছেন!

এই বাঙালির জীবন 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ী উপন্যাসের পটভূমি।

এ ত্রয়ী উপন্যাসের সূচনা করেছিলাম পঁচাশিতে শেষ হলো পঁচানব্বইয়ে– যে স্বপ্ন আমি দশ বছর লালন করি, তা আমার চিরদিনের; তা-ই আমার আশা, তা-ই আমার বেঁচে থাকা।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫
চব্বিশতম বিজয় দিবস
ঢাকা

সেলিনা হোসেন

আলী আহমদের এক নতুন অসুখ হয়েছে।

এমন উপসর্গ ওর আগে ছিলো না। ও নিশ্চিত যে ক্ষণিকের জন্যও হয়নি। যে রাতে ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে তার পরদিন ঘুম ভাঙলে অনুভব করে মুখের ভেতর তেতো বিস্বাদ। জিভ নড়ালে সে বিস্বাদে মুখের ভেতরটা ভরে যায়। কিন্তু না, কোনো থুতু উঠে আসে না, উল্টো মুখের ভেতরের দেয়ালে এবং জিভজুড়ে লেপ্টে থাকে। আলী আহমদ চায় যে ঐ বিস্বাদ তরল হয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গড়িয়ে আসুক– ও ফেলে দিয়ে মুক্ত হবে, কিন্তু হয় না। ফলে ভীষণ অস্বস্তিতে সকাল কাটে। দাঁত মেজে কয়েকবার পানি খেলে অস্বস্তি খানিকটা কমে, কিন্তু ঐ বিস্বাদের ঘাপটি মেরে থাকা অবস্থাটা একদম অসহ্য। আলী আহমদের স্নায়ু অথর্ব করে রাখে।

ওর চিন্তার শেষ নেই। এ কেমন অসুখ? কিসে সারবে? ডাক্তার কয়েকরকম ওষুধ দিয়েছে। পেশাব, পায়খানা, রক্ত পরীক্ষা করেছে, কিন্তু কিছুই ধরা পড়ে না। পুষ্পিতার মন খারাপ। তবুও জোর করে বলে, ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যদি দেখতে পায় আলী আহমদ রাত জেগে বসে আছে তখন ওর চোখ ছলছল করে। ওকে জড়িয়ে ধরে ভেজা কণ্ঠে বলে, এসো ঘুমুবে।

তুমি ঘুমোও পুষ্পিতা।

তুমি বসে থাকলে আমার ঘুম আসে না।

তখন আলী আহমদকে বালিশে মাথা রাখতে হয়, চোখ বন্ধ করতে হয়, যেন ঘুমের সঙ্গে লড়াই। ভীষণ কষ্ট! চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করে রাখলে ভারী হয়ে যায়, বুঁজে রাখতে খারাপ লাগে।

দেখেশুনে প্রতীক চেঁচামেচি করে বলে, বাবার আসলে কিছুই হয়নি। বাবা শুধু শুধু অসুখ অসুখ করে। বয়স বাড়লে কি মানুষ এমন বোকা হয়?

ছেলের কথায় আলী আহমদ প্রথমে চমকে ওঠে। সত্যি কি ওর কিছুই হয়নি? অসুখের মতো ওর যা কিছু অনুভব তা কি মিথ্যে? পরক্ষণে নিজেই বুঝতে পারে যে ওর যা হয়েছে আসলে সেটা শারীরিকই, মানসিক নয়। ও বোকা হয়নি– ওর কোনো বোকামি নেই। বয়স তো মানুষকে বাঁকে বাঁকে বদলে দেয়; কিন্তু বয়সের ধর্ম কি মানুষকে বোকা বানিয়ে দেয়া? নইলে অসুস্থতার সঙ্গে বয়সকে এমন মিলিয়ে ফেললো কেন প্রতীক? আলী আহমদের মন খারাপ হয়।

দু'দিন ধরে ওর জ্বর। দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা। মাড়ি ফুলে গেছে। ডাক্তার বলেছে, দু'টো দাঁত ফেলে দিতে হবে।

ডাক্তারের সামনেই চেঁচামেচি করেছে প্রতীক। বলেছে, কিছুতেই দাঁত ফেলা চলবে না। বাবাকে বুড়ো দেখাবে।

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, বাবা কখনোই বুড়ো হবে না জিতু। বাবার বয়স তো শরীরে নয়, মনে। বাবার মনের বয়স আর বাড়বে না।

BanglaBook.org

আলী আহমদ ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বোঁজে। ভাবে শরীর এবং মন– একটার আকার আছে, অন্যটার নেই। কোথায় আমার সমর্পণ বেশি? আকারে না নিরাকারে? দীপুর মতে আমি মনের দিক দিয়ে তরুণ– কিন্তু তরুণ থাকতে পারছি কৈ? বয়স বাড়ছে বলেই তো বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হচ্ছি। সামরিক শাসন আমাকে কাবু করেছে। ওদের মতো আমি লাথ্থি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারিনি। আর পারিনি বলেই শরীর খারাপ হচ্ছে। আমার আরো কতকিছু দেখার বাকি! আলী আহমদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবে, যে দাঁত দু'টো নড়ছে সে দু'টো ফেলে দিলে সমস্যার শেষ। ও ভালো থাকবে, অন্তত শারীরিক কষ্ট পাবে না– কিন্তু যে মন ক্রমাগত বিধ্বস্ত হচ্ছে তাকে কিভাবে ভালো রাখবে? আলী আহমদের মনে হয় ওর কাছে আকার এবং নিরাকার দু'টোই সমান। ভাবতেই ওর মুখের ভেতরের তেতো বিস্বাদ বেড়ে ওঠে। ওর রাগ হয়। নিজেকেই বলে, যদি সামরিক শাসন মেনেই নিতে হবে তাহলে আমি কেন মিছিলে যাই? কি আমার স্বার্থ, প্রয়োজনই বা কি? আমি তো কোনো দলের নেতা নই, কর্মী নই। আমার ক্ষমতার মোহ নেই। নেহাতই সাধারণ মানুষ। আমার প্রত্যাশা আমার একার ভালো নয়, প্রত্যাশা সবার জন্য। আসলে অধিকার আদায়ের জন্য আমার ক্রোধ আমাকে জাগিয়ে তোলে। সেজন্য আমি মিছিলের মানুষ হই। উনসত্তরের মিছিল দেখেছি কী দীর্ঘ! মিছিলের মাথা কুর্মিটোলা পৌঁছে গেলে লেজ থাকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সেনাছাউনির অস্ত্রধারী সৈনিকরা সে মিছিল ঠেকাতে পারে না। এ ভাবনায় ওর বুকের ভেতরের পোড়ানো ভাবটা মিইয়ে আসে। এই সরল সিদ্ধান্তে আসতে পেরে স্বস্তি বোধ করে। মনে মনে বলে যতদিন বাঁচবো মিছিলের মানুষ হয়ে থাকবো। ভাবনাটা ক্ষণিকের মাত্র– সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসে– কেন সারা জীবন মিছিল করবো? তাহলে কি অধিকার আদায় হবে না? স্থিতি কখনোই আসবে না?

আলী আহমদের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়। খুব কাছের জিনিসটাও হলুদ মনে হয়। রান্নাঘরে পুষ্পিতা আর মঞ্জুলিকা কথা বলছে– সে কণ্ঠ যেন ধাতব কণ্ঠ, বুলেটের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ছুটে আসে। ঐ কণ্ঠস্বর আলী আহমদের যাবতীয় সুখানুভূতি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। ও অবসন্ন বোধ করে। বালিশটা খামচে ধরে অস্ফুট উচ্চারণ করে, পুষ্পিতা! কাছেধারে পুষ্পিতা নেই, ঐ ডাক শুনতে পায় না। ও মঞ্জুলিকার সঙ্গে গল্প করছে। মঞ্জুলিকাকে পেয়ে ওর ভুবনের হাজার দরজা খুলে গেছে। কত গল্প যে রাতদিন করে– যখনই সময় পায় পুষ্পিতা তার শৈশবের খানিকটা, কৈশোরের কিংবা যৌবনের কোনো টুকরো মঞ্জুলিকার সামনে মেলে ধরে। বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পুষ্পিতার মুখ, যেন এতদিন ওর কোনো কথা বলার লোক ছিলো না, এখন ও একজন মনের মতো লোক পেয়েছে। মঞ্জুলিকা মুগ্ধ শ্রোতার মতো ওর কথা শোনে– মাঝে মাঝে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে– কখনো দু'জনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। আলী আহমদের মন ভালো থাকলে সে ঐ হাসি উপভোগ করে। কিন্তু আজ ওর কিছুই ভালো লাগছে না। বালিশটা বুকের নিচে টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শোয়। পিঠের ব্যথা বাড়ছে। স্পনডিলাইসিসের ব্যথা– অনেকদিন ধরেই চলছে। ডাক্তারের নির্দেশ শক্ত বিছানা এবং বালিশ ছাড়া শয়ন। কাঁহাতক আর এতকিছু মেনে চলা যায়। কিন্তু শারীরিক কষ্টের কাছে সবকিছুই মানতে হয়– ব্যথা বাড়লে উঠে ঠিকই মেঝের ওপর চাদর বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। আর এভাবে শুয়ে থাকলে ওকে ছাদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই এবং এভাবেই একসময় ওর ব্যথা কমে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চলাফেরা করে। আজ আর ওঠার কথা ভাবে না। মনে হয় খাটের নিচ থেকে যে শব্দ আসছে সেটা একটা টানা সোঁ-সোঁ শব্দ– সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে বাতাস মিশলে এমন শব্দ বুঝি তৈরি হয়। সে শব্দের অনুভবে আলী আহমদের বেশ আরাম লাগে। ওর কষ্ট থাকে না। বরং এক অন্যরকম ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

BanglaBook.org

সেদিন সামরিক শাসন জারির পর ইয়াহিয়া খান ছাব্বিশ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বেতার ভাষণে দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। আলী আহমদ হিসেব মেলাতে পারে না– জেনারেলদের ক্ষমতার উৎস সেনাছাউনি– দেশের মানুষ নয়। তারা কি সহজে ক্ষমতা ছাড়বে? তারা কি পারবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সংবিধান প্রণয়নের অধিকার দিতে? নাকি ভাঁওতা? নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়ার জন্য সময় ক্ষেপণ মাত্র? ভয়ে বুক হিম হয়ে যায়। মনে হয় মিছিলে যাওয়া মিথ্যে হয়ে যাবে– ওদের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এক জেনারেলের হাত থেকে অন্য জেনারেলের হাতে! সামরিক শাসন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি– হিসেব যে কিছুতেই মেলে না। ওর কপালটা ঘামে ভিজে ওঠে। ও কপালের ওপর হাত রাখে এবং ভূমিস্পর্শী হয়ে থাকার কারণে ওর ভীষণ ঘুম পায়। অবচেতনে দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পর ঘরে এসে আলী আহমদকে ওভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে পুষ্পিতা। দ্রুত কাছে এসে বসে, একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকায়– নিমীলিত চোখের পাতায় চুমু দিতে ইচ্ছে করে। কেন ওর প্রিয় মানুষটি এমন করে শুয়ে আছে? ওর কীসের কষ্ট? মানুষটাকে ঠিকমতো বুঝতেই পারলো না। এই মুহূর্তে যদি মনে হয় চিনি, অন্য মুহূর্তে মনে হয় নাতো এ তো এক মানুষ নয়। পুষ্পিতা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদের বুকের ওঠানামা দেখে। আলতো করে বুকের ওপর হাত বুলোয়। টের পায় আগের সেই ভরাট বুকটা আর নেই, হাড্ডি জেগে উঠেছে– মানুষটা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। পুষ্পিতার বুক হু-হু করে ওঠে। বিড়বিড়িয়ে বলে, ওগো বলো আমাকে কিসে তোমার কষ্ট? কেন কষ্ট? আমি কি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না?

নড়ে ওঠে আলী আহমদ। ও শুনতে পায় যেন বলছে, না পুষ্পিতা না, এ কষ্টের ভাগ কাউকে দেয়া যায় না। নিজেকেই বয়ে বেড়াতে হয়।

পুষ্পিতাকে খুঁজতে এসে মঞ্জুলিকা দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। দেখতে পায় ওর পায়ের শব্দে পুষ্পিতা এক অদ্ভুত বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছে। ও কিছু বলতে গেলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা না বলার জন্য ইশারা করে। তবু মঞ্জুলিকা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবার কি হয়েছে? পুষ্পিতা মাথা নাড়ে, জানি না।

তারপর নিঃশব্দে উঠে আসে। ভাবে, ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। ওর ভীষণ ঘুমের কষ্ট।

মঞ্জুলিকা বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবাকে ডাকবেন না মা?

না, থাক।

দু'জনে ডাইনিং টেবিলে এসে বসে। এতক্ষণে ভিজে ওঠা চোখ মুছে পুষ্পিতা বলে, জানো আমার বাবা যেদিন মারা যান সেদিন তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মা দেখলেন বাবা বিছানায় নেই। ক'দিন ধরে বাবা বেশ অসুস্থ ছিলেন। মাথার কাছে হারিকেন জ্বলছিলো– সেটা উস্কে দিলেন। মা বিছানা থেকে নেমেই দেখলেন বাবা উত্তর দিকে মাথা দিয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন। মা দরজা খুলে অন্যদের ডাকলেন। তারপর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন– দেখলেন বাবার গলার কাছটা থরথরিয়ে কাঁপছে, চোখ বোঁজা। আমার বড়ভাই চামচ দিয়ে মুখে পানি দিলেন। সেটা মুখে গেলো না, ঠোঁটের বাইরে গড়িয়ে পড়লো। মায়ের কোলেই মাথাটা কাত করে ফেললেন বাবা। মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বড়ভাই অনেক কষ্টে মাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ছোট চাচা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভাইজান কেমন করে বুঝলেন যে তাঁর সময় হয়ে গেছে– এখন উত্তর দিকে মাথা রেখে শেষ ঘুম ঘুমুতে হবে। ছোট চাচার ঐ কথা শুনে

BanglaBook.org

আমি এমন চিৎকার করে কেঁদেছিলাম যে সে কান্না শুনে আমার মা অজ্ঞান হয়ে যান। আমার কান্না থামতেই চায় না। আমি কি করবো, আমি তো বুঝিই না কান্না কোথা থেকে আসে। বাবা যে নেই– বাবা না থাকলে তো শরীরের সব জায়গা ফুটো হয়ে যায়, শরীরের সবকিছু বেরিয়ে আসে সে ফুটো দিয়ে। আমার কি ক্ষমতা যে আমার কান্না আমি থামাবো! আমার কান্না শুনে আত্মীয়স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ওরা বলাবলি করছিলো, মেয়েটি বাপের বেশি আদুরে ছিলো তো–। ওরা এর বেশি আর কিইবা বলবে? একসময় বাড়িজুড়ে আমার বুকের গোঁ গোঁ শব্দ– আমার বাপের লাশের ওপর–।

ওহ্, মা থামেন। মঞ্জুলিকা অস্থির হয়ে ওঠে, মা এসব কথা আপনি কেন মনে করছেন?

জানি না, জানি না। পুষ্পিতা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

মঞ্জুলিকা বিড়বিড়িয়ে বলে, এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কতদিন মাকে দেখি না–

তুমি তো দু'দিন আগেও মায়ের বাড়ি গিয়েছো বৌমা।

আমি আবার যাবো, আজ বিকেলেই যাবো।

যেও। পুষ্পিতা উদাস হয়ে যায়। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। ও তো বিশ বছর মায়ের কবর জিয়ারত করতেও যায়নি। ওর কি মায়ের কবর দেখতে ইচ্ছে করে না? নাকি ও ভুলে গেছে মায়ের কথা, বাবার কথা– গাঁয়ের কথা? নিজের জীবনের একটা সময়ের কথা? মঞ্জুলিকা এখন ওর জীবনের সেই সময়টায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো মাকে দেখতে ইচ্ছে করবেই– বারবার দেখতে চাইবে।

তখন প্রদীপ্ত ও প্রতীক একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। দু'জনের রিকশা দু'জায়গা থেকে একসঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকেছে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হেসেছে। বলেছে, আমরা আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছি। কড়া নাড়লে মঞ্জুলিকা দরজা খুলে দেয়। ওকে দেখে প্রদীপ্ত অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? ও ইশারায় পুষ্পিতাকে দেখিয়ে দেয়। দু'ভাই মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কি হয়েছে মা?

কিছু না রে। আমার বাবার কথা মনে পড়ছিলো।

প্রতীক তুড়ি বাজিয়ে বলে, বাবার কথা তো মনে পড়বেই। এ আর এমন কী ব্যাপার!

কিন্তু তাই বলে তোমরা দু'জনে এমন স্তব্ধ হয়ে থাকবে কেন?

প্রদীপ্ত দু'জনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ কোনো কথা বলে না। তখন ও চেঁচিয়ে বলে, বাবা কৈ মা?

পুষ্পিতা শান্ত স্বরে জবাব দেয়, শুয়ে আছে।

এমন অসময়ে।

থাক ঘুমুতে দে। ডাকিস না।

প্রতীক বিরক্ত হয়ে বলে, বাবা মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় না।

ওরা দু'জনে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, বাবা নিচে শুয়েছে কেন?

পুষ্পিতা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। বলে, তোরা বলতে পারিস তোদের বাবার কীসের কষ্ট?

প্রতীক একই ভঙ্গিতে বলে, কষ্ট? কষ্ট আবার কেন? খাচ্ছে-দাচ্ছে শান্তিতে আছে।

প্রদীপ্ত ওকে মৃদু ধমক দেয়, আহ্ জিতু।

জানি তুমি এখন একটা দার্শনিক উত্তর দেবে। বলবে, বাবাকে আমরা কতটুকু চিনি বল।

BanglaBook.org

বোগাস! এই যে বাবার একটা অসুখ হয়েছে, আমার তো মনে হয় পুরো ব্যাপারটা মানসিক।

সেটাই তো মায়ের প্রশ্ন। বাবার কষ্টটা কোথায়?

মঞ্জুলিকা বলে, আসলে আমরা কেউই বাবাকে বুঝতে পারি না।

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে, বাবাকে বোঝা কঠিন।

কি যে সব বাজে আলোচনা হচ্ছে, বলতে বলতে প্রতীক দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা, ও বাবা, ওঠো।

আলী আহমদ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, কি হয়েছে?

আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে ভাবছি।

কেন?

তোমার কি হয়েছে?

আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবল একটা ব্যথা বয়ে গেলো। আমি আমার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো ওটার ওপর ভীষণ চাপ, বুঝি ভেঙে পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি তো জানি মাটিতে টান টান শুয়ে থাকলে আমার মেরুদণ্ড সোজা থাকে, কোনো ব্যথা হয় না। কি বলিস দীপু?

আলী আহমদ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রদীপ্তর দিকে তাকায়। প্রদীপ্ত দেখতে পায় আলী আহমদের দৃষ্টিতে দ্যুতি, সব বাধা পেরিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে-যাওয়া মানুষের সঙ্কল্প। একে কি কষ্ট বলে? ও হাত ওল্টায়: জানি না। বলে, বাবা তুমি এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে যে–।

আমি তো ঘুমুতে চাইনি। কেমন করে যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও জানি না। আসলে ঐ মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যাওয়ার পর আমার ঘুম এলো। ভীষণ ভালোলাগলো ঘুমুতে।

আলী আহমদ লাজুক হাসে।

পুষ্পিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, যাও গোসল করে এসো। আমরা তোমার জন্য বসে রয়েছি। হ্যাঁ, যাই। বলতে বলতে আলী আহমদ বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, দেখলে তো বলেছিলাম না বাবার কিছু হয়নি। তোমরা অযথা ভাবো।

অযথা নয় জিতু। প্রদীপ্ত গম্ভীর স্বরে কথা বলে নিজের ঘরে যায়। পেছনে মঞ্জুলিকা। পুষ্পিতা টেবিলে খাবার দেয়। অনেকদিন পর সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাবে। হাসিতে-গল্পে খাবার টেবিল জমে ওঠে। নিজের সংসারের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে যায় পুষ্পিতার– কত দীর্ঘকালের স্বপ্ন, কোথাও ভাঙেনি, চিড় ধরেনি– কেমন সুন্দর নির্বিবাদে পেরিয়ে গেলো, আগামী দিনগুলোও কি যাবে? যাবে– নিজেকে প্রবোধ দেয় ও। তখুনি বিষম খায়। কাশতে কাশতে চোখ লাল হয়ে যায়। আলী আহমদ পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়, পানি খাও ঠিক হয়ে যাবে।

পুষ্পিতা এক গ্লাস পানি খেয়ে দম নেয়। এতক্ষণ আলী আহমদ হৈ-চৈ করে গল্প করছিলো। পুষ্পিতা বিষম খেলে থেমে যায় সে কণ্ঠ। আলী আহমদ পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। পুষ্পিতা লজ্জা পেয়ে বলে, দিলাম তোমাদের গল্পের আসর নষ্ট করে। আলী আহমদ কোনো কথা উচ্চারণ করে না– মনে মনে বলে, তুমি আমার কিছুই নষ্ট করোনি পুষ্পিতা। তুমি আছো বলেই আমার বেঁচে থাকা এত সহজ। তোমার ঋণ আমি কখনোই শোধ করতে পারবো না। কিন্তু মনের কথা কাউকে বুঝতে না দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে বলে, দেখেছিস দীপু তোদের মা কেমন ফর্মাল হয়ে যাচ্ছে।

সবই এই সামরিক শাসনের দোষ বাবা। মানুষকে মেকী করে দেয়।

BanglaBook.org

টেবিলে হাসির হল্লা ওঠে। প্রদীপ্তর কথার ভঙ্গিতে সবচেয়ে বেশি হাসে পুষ্পিতা– এ সংসারে যার বাঁধন সবচেয়ে বেশি শক্ত, আলগা হলেই ছারখার হবে। যে তার শ্রম আর ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে সংসারের সবক'টি খুঁটি।

ক'দিন পরের এক বিকেল বেশ অস্বস্তিতে কাটে আলী আহমদের। দুপুরের পর থেকে বাড়িটা ফাঁকা। সন্ধ্যায় এ দেশের জেনারেল-প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবেন– কি বলবেন এটা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে আলী আহমদ। ওর মুখের তেতো-বিস্বাদ যেন ঘন হয়ে লেপ্টে আছে মুখ-গহ্বরে– তাই অস্বস্তি ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পুষ্পিতা থাকলে ও কিছুটা স্বস্তি পেতো। কিন্তু মঞ্জুলিকা পুষ্পিতাকে নিয়ে ওর মায়ের বাড়িতে গেছে। প্রদীপ্ত আর প্রতীক দুপুরে ফেরেনি। আলী আহমদের মনে হয় এই মানুষহীন বাড়িতে ওর চিন্তাগুলো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যে কথা ও উচ্চারণ করে না তার ইকো হয় কি করে? তবু তো এমনই লাগছে। ও পায়চারি করলে যে মৃদু পদশব্দ হয় সেটাও আজ মৃদু নেই– এমনকি ও হাঁচি দিলেও বাড়ি কেঁপে উঠছে। কেমন করে যেন সবকিছু কোথায় গিয়ে ঠোক্কর খায়। আলী আহমদ বুঝতে পারে না। নাকি নিজের করোটি ওর নিজের সঙ্গে খেলছে? যদি তাই হয় তাহলে তো বেশ খেলা! খেলা তো জমবেই, কারণ ও একজন মিছিলে যাওয়া সাহসী সাধারণ মানুষ, একটি বেতার-ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছে। কার জন্য অপেক্ষা? কোনো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নয়– কোনো গণতান্ত্রিক সরকার নয়– বিকেল থেকে একজন জেনারেল-প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। ও জানে ঐ কণ্ঠস্বর শুনলে ওর বিবমিষা প্রবল হবে এবং তেতো বিস্বাদ গলিত লাভার মতো দ্রুতবেগে গ্রাস করবে ওর মুখ-গহ্বর এবং পরিশেষে মগজ। একজন জেনারেল এ দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে– তার হাতে বাজবে বাঁশি– একজন জেনারেল একজন হ্যামিলনের বাঁশিঅলা হয়ে যাবে এবং এ দেশের মানুষকে ছোটাবে ইঁদুরের মতো।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামে। বারান্দার রেলিঙে ভর করে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসা দেখে আলী আহমদ। ওরা কেউ কেন ফিরে আসছে না? জেনারেলের ভাষণ কি ওকে একাই শুনতে হবে? আলী আহমদের মন খারাপ হয় এবং নিজের ভেতরে করোটির বেজে ওঠা শুনতে থাকে। ও ঘরে ফিরে নিজের পড়ার টেবিলে রাখা ট্রানজিস্টার অন করে। একটুপর শুনতে পায় ঘোষণা এবং সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত। তার পরপরই জেনারেলের কণ্ঠ ভেসে আসে, My dear countrymen–। শূন্য বাড়িতে সে কণ্ঠস্বর প্রথমে গুঞ্জনের মতো শোনায়, যেন একঝাঁক মৌমাছি হুল ফোটাতে ছুটে আসছে। আমার প্রিয় দেশবাসী? কেমন করে? কণ্ঠস্বর হুল ফোটালে প্রবল বিষে আক্রান্ত হয় আলী আহমদ। বন্দুকের নলে কি ভালোবাসা থাকে নাকি থাকে মৃত্যুবান? যে জেনারেল দেশবাসীর দিকে বন্দুক তাক করে থাকে, তার মুখে কি প্রিয় শব্দটি শোভা পায়? ও নড়েচড়ে বসে এবং স্থির হবার চেষ্টা করে। কারণ জেনারেল বলছেন, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ বিলুপ্তি এবং তার বদলে পূর্বের অবলুপ্ত প্রদেশগুলোর পুনর্বহাল; এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে জনসংখ্যানুপাতে নির্বাচন অর্থাৎ সংখ্যাসাম্যনীতির অবলুপ্তি; ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার প্রতিষ্ঠা; নতুন নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে একশ বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা ও সংবিধান রচনার পর গণপরিষদের জাতীয় সংসদে রূপান্তর; ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ; সংবিধান রচনা পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ; পাঁচ অক্টোবর ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন।

জাতিকে দেয়া জেনারেলের এতকিছু প্রতিশ্রুতি মগজে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আলী আহমদ। ও ট্রানজিস্টার বন্ধ করে দিয়েছে– ঘরে আর কোনো শব্দ নেই। রাস্তা

BanglaBook.org

থেকে গাড়ির হর্ণের শব্দ ভেসে আসে কেবল, সে শব্দ ওকে টুকরো টুকরো করে দেয়– ও চমকে ওঠে। পরক্ষণে আবার নিজের দিকে তাকায়। পুরো ভাষণটি ওর একা একা শুনতে হয়েছে। কেউ নেই যে ওকে প্রশ্ন করবে, কেউ নেই যে তার সঙ্গে ও নিজের ভাবনা ভাগ করে নেবে। জেনারেলের এত প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। আসলে জেনারেল এতকিছু একসঙ্গে বললে তা ভেবে কুলিয়ে ওঠা কঠিন। আলী আহমদ আপন মনে হেসে ওঠে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। প্রতীক ফিরেছে। আলী আহমদ দরজা খুললে প্রতীক চেঁচিয়ে বলে, ভাষণ শুনলে বাবা?

হ্যাঁ।

আমি এক চায়ের দোকানে বসে শুনলাম। দেখলাম বাড়িতে এসে শুনতে পারবো না, ততোক্ষণে শেষ হয়ে যাবে।

তোরা ছিলি না, আমার খুব একা একা লেগেছে।

মা আর ভাবী ফেরেনি?

আলী আহমদ মাথা নাড়ে।

ভালোই হয়েছে। মায়ের একটা বেড়ানোর জায়গা হয়েছে।

তুই চা খাবি?

না। ভাষণ শুনতে শুনতে কয়েক কাপ চা খেয়েছি। ভাষণ শুনে তোমার কি মনে হলো বাবা?

আলী আহমদ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, গণদাবির বিজয় হয়েছে, কিন্তু উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। একটি সাধারণ নির্বাচন হবে তার জন্য সামরিক শাসন রাখতে হবে কেন? দেশের ও দেশের মানুষের জন্য এটি মোটেই মর্যাদার ব্যাপার নয়, তাই না?

প্রতীক মাথা নাড়ে, হ্যাঁ তাই।

আলী আহমদ বলে, সেজন্য দেশ থেকে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি আমাদের সামনে জরুরি।

তখন পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকা ফেরে। বেড়িয়ে ফিরে দু'জনে খুব খুশি। সঙ্গে একগাদা খাবার নিয়ে ফিরেছে।

প্রতীক মঞ্জুলিকাকে খোঁচা দেয়, খেয়েছো আবার বেঁধেও এনেছো। তোমরা কি আদ্যিকালের পুরুত ঠাকুর হলে?

মঞ্জুলিকা বাঁকা চোখে তাকায়, একটুপর খাবারগুলো টেবিলে দেবো, দেখবো কে বেশি খায়।

আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে বৌমা। বিকেলে চাও খাইনি।

খাবার দিচ্ছি বাবা।

মঞ্জুলিকা দ্রুত হাতে টেবিল সাজায়। এর মধ্যে প্রদীপ্ত ফেরে। খাবারের গন্ধ নাকে টেনে বলে, ভূরিভোজের আয়োজন দেখছি?

প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। তাড়াতাড়ি এসো।

জমে ওঠে খাবার টেবিল। প্রেসিডেন্টের ভাষণ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। আলী আহমদের বিশ্লেষণ ফুরোয় না। বলতে থাকে, বুঝলি জিতু, অনেকগুলো বিষয় আছে ভেবে দেখার। যেভাবে সবকিছু ঘোষণা করা হয়েছে, এভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন কার্যকরী থাকবে। তার ওপর জাতীয় পরিষদ

BanglaBook.org

১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারলে সামরিক শাসনের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় নির্বাচনের পরপরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই দেশের শাসনভার অর্পণ করা উচিত। আরও একটি জিনিস ভাবার আছে। তিনি বলেছেন জাতীয় পরিষদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর তা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবে। এই অনুমোদন দানের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরদানের ব্যাপার মাত্র কিনা তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিয়েই ভীষণ জটিলতা তৈরি হতে পারে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে আলী আহমদের কথা শোনে। ও এক লোকমা পোলাও মুখে পোরার ফাঁকে পুষ্পিতা বলে, এসব নিয়ে তুমি আর ভেবো না। যত ভাববে তোমার শরীর খারাপ করবে।

আলী আহমদ মুখের খাবার গিলে বলে, স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে–

প্রতীক দ্রুত বলে, বাবা থাক। এ আলোচনা পরে হবে।

প্রদীপ্ত প্রতীককে থামিয়ে দিয়ে বলে, জেনারেল একটি কাজ ভালো করেছেন বাবা।

কি?

এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। আমার তো মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল হলে আগের চারটি প্রদেশ বহাল থাকবে এবং সবগুলোর আলাদা আলাদা নাম হবে। তাই না? তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'পূর্ব বাংলা' হতে বাধা কোথায়?

বাধা তো নেইই, হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আমার তো মনে হয় বাবা 'পূর্ব বাংলা' না করে শুধু 'বাংলা' রাখলেই ভালো।

আলী আহমদ কোনো মন্তব্য করে না, শুধু মাথা নাড়ে। প্রদীপ্ত এমন একটা সিদ্ধান্ত দিতে পেরে খুশি হয়। প্রতীকও সায় দেয়।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে বলে, তোমাদের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে দু'ভাই মিলে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলা' নামে স্বাধীন করে ফেলেছো।

আলী আহমদ চমকে ওর দিকে তাকায়। অন্যরাও মঞ্জুলিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জুলিকা হাসতে থাকে।

একসময় পুষ্পিতা আস্তে করে বলে, ভাত খাও বৌমা।

মঞ্জুলিকা এক গ্রাস খাবার আগেই প্রতীক বলে, বুঝেসুঝে কথা বলো ভাবী, দেশ থেকে কিন্তু সামরিক আইন উঠে যায়নি।

মঞ্জুলিকা ঠোঁট ওল্টায়, ঐ বেটা আমার কি করবে?

ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করো যে কি করবে। ভাইয়া তোমার পিঠে কি এখনো সামরিক শাসনের উপহার সেই কালো দাগ আছে?

প্রদীপ্ত গম্ভীর হয়ে বলে, আছে। তবে মঞ্জুলিকা যা বলেছে তেমন দিন যদি আসে, তাহলে এবার পিঠে নয়, বুকেই কালো দাগ পড়বে, হয়তো বুকটা ফুটোও হয়ে যেতে পারে।

পুষ্পিতা চেঁচিয়ে ওঠে, উহ্ তোরা থাম। এমন কথা শুনলে আমার মনে হয় সবকিছু ভেঙে ফেলি।

আলী আহমদ নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। ওর খাওয়া শেষ। পুষ্পিতার কথা যেন শুনেও শুনতে পায় না। ও হাত ধুয়ে নিজের পড়ার টেবিলে আসে। রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে চোখ পড়লে মনে হয় ছবিটার দেয়ালজোড়া আকার হয়েছে। ওটা সব শূন্যতা আড়াল করে দিতে চাইছে।

BanglaBook.org

রাতে ঘুম আসে না প্রদীপ্তর। শুয়ে থেকে গান শুনছে। মঞ্জুলিকা বিছানায় এলে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, তুমি এমন একটা কথা কেন বলেছো মঞ্জুলি?

এমনি, কোনো কারণ নেই। তোমরা যে এমন সিরিয়াস হয়ে উঠবে কে জানতো? আমারই ভুল হয়েছে।

না। প্রদীপ্ত ওকে নিজের বুকে পিষ্ট করে। প্রবল আবেগে কেঁপে ওঠে মঞ্জুলিকা। প্রদীপ্ত একটি দীর্ঘ চুমু দিয়ে বলে, আমি চাই 'পূর্ব বাংলা' থেকে 'পূর্ব' শব্দটি ঝরে যাক। আমরা পূর্ণ হয়ে উঠি। মঞ্জুলিকা হেসে বলে, পূর্ণ হয়ে ওঠা? শোনো আমাদের যদি মেয়ে হয় তার নাম রাখবো পূর্ণ।

আর ছেলে হলে?

ছেলের নাম তুমি রাখো।

প্রদীপ্ত একটু ভেবে বলে, অজেয়।

দেখো প্রথমে মেয়েই হবে। আমি জিতবো।

ও হবে আমার। তোমার কোনো জিত নেই।

কখনোই না। ও হবে আমার।

প্রদীপ্ত হেসে ফেলে, সারেন্ডার। ছেলেও তোমার, মেয়েও তোমার। আমাকে একটু ভাগ দিও শুধু।

মঞ্জুলিকা হাসতে থাকে।

মঞ্জুলি তাহলে আজ রাতেই–।

মঞ্জুলিকা শাসন করে, আমরা না ঠিক করেছি এক বছরের মধ্যে ছেলেমেয়ে চাই না।

এত আইন কি মানা যায়?

আইন নয়, সামরিক আইন।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে প্রদীপ্তর বুকে মুখ ঘষে।

একসময় ওদের শরীর ঘনিষ্ঠ হয়– একসময় ওদের কাছে সময়ের হিসেব থাকে না– একসময় ওরা দেশ-কালের বাইরে চলে যায়– তখন ওদেরই জগৎ, শুধু দু'জনের একলার– স্বাধীন এবং সার্বভৌম।

BanglaBook.org

দেখতে দেখতে শীত এসে যায়। জানুয়ারির শেষে আলী আহমদের মনে হয় এবারে মাঘের শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে– হাড় পর্যন্ত স্পর্শ করে। ও তসরের চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে পেছনের বারান্দায় বসে ছাত্রছাত্রীদের টিউটোরিয়াল খাতা দেখছে। বারোটার দিকে ক্লাস আছে, একবারে খেয়েদেয়ে বেরুবে। খাতাগুলো দেখে শেষ করতে হবে। প্রতীক ক্লাসে যাবার আগে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়, বাবা তাহের চাচা অসুস্থ। বিকেলে যাবে দেখতে?

কি হয়েছে?

নানা জটিলতা। ডায়াবেটিস, হাঁপানি, এখন শুনতে পাই হার্টের–

বেচারা। যা শীত পড়েছে হাঁপানি নিশ্চয় বেড়েছে। দেখাশুনা ঠিকমতো হচ্ছে তো?

তুমি তো জানো বাবা, সেটি হবার উপায় নেই। পুরো ফ্যামিলি তার ওপর অসন্তুষ্ট।

জানি। তাহেরের আবেগকে আমি সম্মান দেখাই বলে ওরা আমার ওপরও খুশি নয়। আমি ওকে দেখতে যাই সেটা ওর বৌ চায় না। তবু আমি ওকে দেখতে যাবো।

প্রতীক যেতে গিয়েও ফিরে এসে বলে, আচ্ছা বাবা, আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও।

বল।

তাহের চাচা যে একুশের মিছিলে যাবার স্মৃতিকে সম্বল করে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

আলী আহমদ অবাক হয়ে প্রতীকের মুখের দিকে তাকায়, এমন একটি প্রশ্ন কি তোমার করা ঠিক হয়েছে জিতু?

প্রতীক বিব্রত হয়ে বলে, না, আসলে ঠিক হয়নি। একজন লোক চাকরির সামান্য আয় দিয়ে জমি-বাড়ি করতে পারবে এমন ভাবাই তো ঠিক নয়।

আসলে ফ্যামিলির কাছে তাহেরের অপরাধ ও একুশের স্মৃতি স্মরণ করতে ভালোবাসে। উজ্জ্বল মুখে সে স্মৃতির কথা বলে আনন্দ পায়। ওর বৌ ওর ওই অপরাধকেই বড় করে দেখে। ঐটুকু না থাকলে ওর বৌ হয়তো জমি-বাড়ি না থাকার জন্য আর একটি ইস্যু দাঁড় করাতো।

ঠিকই বলেছো বাবা। বুঝতে পারি যে ফ্যামিলির ক্ষোভের কাছে তাহের চাচা অসহায়। আসলে হারুন যখন অভিযোগ করে তখন আমিও খানিকটা বায়াসড হয়ে যাই।

আলী আহমদ হো-হো করে হেসে ওঠে। প্রতীক বাবার সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচে। হারুনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব, সেই সূত্রে ওর বাবা তাহেরের সঙ্গে আলী আহমদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এ বছর একুশের ভোরে দু'জনে একসঙ্গে প্রভাতফেরীতে যায়। আজিমপুর গোরস্তানে বরকতের মাজারে গিয়ে দোয়া পড়ে।

তাহেরের প্রসঙ্গ ওঠাতে আলী আহমদ আর খাতায় মন বসাতে পারে না। এজি অফিসে কেরানির চাকরি করে লোকটি বুড়ো হয়েছে। আলী আহমদকে যে কতবার শুনতে হয়েছে তার স্মৃতিচারণ। আলী আহমদ আগ্রহ নিয়ে শুনেছে, কখনো বাধা দেয়নি– সে কথা বলার সময় তার চোখেমুখে যে আলো ফুটে ওঠে সেই আলো আলী আহমদ কখনো নিভিয়ে দেয়নি। আবার পরিবারের খুঁটিনাটি বর্ণনার সময় যে অদ্ভুত এক বিষণ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে আসে সে কণ্ঠস্বরও কোনোদিন ছিন্নভিন্ন করেনি আলী আহমদ। দু'টোকেই ও সমান মূল্য দেয়। আজকের ভোরেও ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাহেরের সংসার। সে ছবি এমন : সকালে খবরের কাগজ না পেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তাহেরের। হকারকে বিশেষভাবে বলা আছে এবং বাড়তি পয়সাও দেয়া হয় ওকে। হকার ছেলেটি ভালো। খুব ভোরে কাগজ নিয়ে তাহেরের বাড়িতে আগে আসে।

বয়স যা তাতে অত বুড়ো হবার কথা নয় ওর, কিন্তু অসুখের কারণে শরীর ভেঙেছে অনেক বেশি। নইলে রিটায়ার করার পরও অনেকে অনেক কাজ করতে পারে, ও পারেনি। বড় ছেলে ইউসুফ পড়াশোনা না করে চাকরিতে ঢুকেছে, মেজো হারুন ফুটবল খেলে– পড়ালেখার মধ্যে নেই। মেয়ে রুনা নাইনে উঠেছে। সঞ্চয় বলতে কিছু নেই– বাড়ি, জমি, ব্যাঙ্কে টাকা কিছুই না। এজন্য বৌর সঙ্গে যখন-তখন লেগে যায়। আমেনা বেগমের কণ্ঠস্বর চড়চড়িয়ে বাড়ে, ছেলের সামান্য আয় আর পেনশনের ক'টা টাকায় এ বাজারে সংসার চালানো দায়। রিটায়ার করার আগে সবাই কেমন সুন্দর গুছিয়ে বসে, কেবল তুমিই পারলে না। সামনে যে কি আছে আল্লাহই জানে।

বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তাহের। শুরু হয় ঝগড়া।

রুণা প্রতিদিনই বাবা-মার ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করে। তাহের ব্যাপারটি বুঝতে পারে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। মেজাজ ভালো হয়ে যায়। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দরই হয়েছে– যে কোনো ছেলে দেখলেই ওকে পছন্দ করবে, দিতেথুতেও বোধহয় তেমন কিছু হবে না। তাহের নিজের মনের মধ্যে একটা স্বর্গ তৈরি করে সুখ পেতে থাকে। ও বুঝতেই চায় না যে এখনকার ছেলেদের দাবি অনেক এবং সে দাবি পূরণ করতে না পারলে বিয়ে

BanglaBook.org

দেয়া খুব কষ্টের। বৌর এসব কথা ও কানেই তোলে না।

কাগজ পড়তে পড়তে ও আনমনা হয়ে যায়। আমেনা বেগমের সঙ্গে যেদিন ওর বিয়ে হয় তার পরদিন ছিলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহর গরম। চারদিকে উন্মাতাল মিছিলের বন্যা। নতুন বৌ ঘরে রেখে দিনভর মিছিল করেছে তাহের। টিয়ার গ্যাস, গুলি, রক্তাক্ত ছেলেরা, শহীদ– অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে একটি ঝোড়ো দিন পার করে অনেক রাতে ঘরে ফিরেছিলো ও। আমেনা বেগম রাত জেগে বসেছিলো– কোনো অনুযোগ করেনি। প্রবল ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলো ওকে।

এই স্মৃতি বুকে নিয়ে ও সারাজীবন কাটিয়ে দিলো। হারামের পয়সা ছুঁতেই পারলো না। বুকের ভেতর গুলি, রক্ত, মৃত্যু টের পায়– কিছুতেই ভুলতে পারে না। তখন জমি-বাড়ি ইত্যাদি ওর কাছে কেমন তুচ্ছ হয়ে যায়। যারা মুখের ভাষার জন্য নিজের প্রাণকে উপেক্ষা করে, সেসব ঘটনার কাছে এগুলো কি কোনো একটা ব্যাপার হলো? এক-একটি জীবন সুতোয় গাঁথা মালা হয়ে সময়কে আটকে রাখে। জীবনভর এসব কথা কিছুতেই ফেলতে পারেনি ও।

আমেনা বেগম ছেলেমেয়েদের কাছে প্রায়ই অনুযোগ করে, তোর বাপের পাগলামির জন্য কিছুই হলো না আমাদের।

ইউসুফ, হারুন মাকে সমর্থন করে। ওরা সংসারের ওপর বিরক্ত। তাহের ওদের কথা শুনে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে। শুধু বুকের বাম দিকে একটা ব্যথা। ও কাউকে কিছু বলে না। ব্যথা বাড়তে বাড়তে সেটা দু'হাতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ও চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে। কেউ ওকে খেয়াল করে না। জিজ্ঞেসও করে না, তোমার কি কিছু হয়েছে?

আস্তে আস্তে ওর ব্যথা কমে যায়। ভাবে, ক'টা দিনই বা বাঁচবো! যেনতেন করে কেটে গেলেই হলো। শুধু বুকের ভেতর কষ্ট জেগে থাকে যে আমেনা বেগম ওকে বুঝলো না। সেই একুশের রাতের আমেনা বেগম এত বছরের সংসার জীবনে আমূল পাল্টে গেছে। বলে, ঐসব স্মৃতিটিতি আমাকে নাড়া দেয় না। ভুলেই গেছি প্রায়। সংসারের কত কাজ। ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হলো না। মেয়েটার বিয়েই বা কিভাবে দেবো? এসব চিন্তা আমাকে অস্থির করে রাখে। তুমি তোমার স্মৃতি নিয়ে সুখে থাকো, আমি আগুনে পুড়ছি, পুড়তেই থাকি।

এভাবেই তাহেরের দিন কাটে– এভাবেই আমেনা বেগম তার অসন্তোষ নিয়ে পুড়ে মরে এবং সে গল্প অদ্ভুত এক বিষাদময় কণ্ঠে বলে যায় তাহের– একদা একসময়ে এক মিছিলের মানুষ হবার কারণে যে আর কোথাও আপোস করতে পারলো না। আলী আহমদের ভাবনা ছুটে যায় পুষ্পিতার কণ্ঠে, কি ব্যাপার এমন করে বসে রয়েছো যে? আজ ক্লাস নেই?

আছে। আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে। মনে মনে ভাবে, পুষ্পিতার অনেক ধৈর্য। সেজন্যই এ সংসারে ও টিকে গেলো। নইলে হয়তো তাহেরের মতো পুড়তে হতো কোনো এক চুলোয়– ওহ্ আগুন!

পুষ্পিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার হাসলে যে?

একটা কথা মনে পড়লো।

কি কথা?

সেই যে বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনে আমাদের মফিজুল প্রাণ দিলো–

সেটা ভেবে তোমার হাসি পেলো? পুষ্পিতা ভয়ানক অবাক হয়।

হাসির অনেক রকম অর্থ হয় পুষ্পিতা। সব কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?

বলতে বলতে আলী আহমদ খাতাপত্র গুছিয়ে নিজের ঘরে যায়। টেবিলে খাতাগুলো রাখতে রাখতে ওর আবার তাহেরের কথা মনে হয়। বেঁটেখাটো, চোয়ালসর্বস্ব শুকনো মানুষটি একদম সাদামাটা, চোখে-পড়ার মতোই না। অথচ কত অবলীলায় নিজের ভেতর

BanglaBook.org

এক কঠিন প্রত্যয় ঠেসে রেখেছে। পাশাপাশি আমেনা বেগমের কথা মনে করে ও ভাবলো, কোনো কোনো মানুষ নিজের জ্বালানো আগুনে নিজেই পোড়ে, তাদের সুখ আর কখনোই হয় না। ও গভীর শ্বাস ফেলে। এক জীবনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হলো– কত জন পথের বাঁকে যে যার পথে চলে গেলো– তাহেরের সঙ্গে পরিচয়ও তেমনি আকস্মিক। একদিন হয়তো তাহেরও হারিয়ে যাবে ওর জীবন থেকে– হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না– শুধু ওর স্মৃতিতে এক মোটা দাগ রেখে যাবে।

সেদিন বিকেলে তাহেরকে দেখতে যাওয়া হলো না আলী আহমদের। সকালে ওর খেয়াল ছিলো না যে আজ 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি'র সভা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি না ফিরে সোজা 'সমকাল' অফিসে চলে যায়। ভাবে, আর একদিন না হয় তাহেরকে দেখতে যাবে। লেখকদের এই সভাটি অত্যন্ত জরুরি। সভায় তুমুল আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে শিল্প-সাহিত্যের মতো সৃজনশীল এলাকা থেকে সরকারি নির্যাতনমূলক তৎপরতা বন্ধ না করা পর্যন্ত এবং প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল না করা পর্যন্ত এই সংগঠন তার আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। এছাড়া বক্তারা তীব্র ভাষায় পর্যালোচনা কমিটিরও বিরোধিতা করে। সম্প্রতি সরকার শিল্প-সাহিত্যের পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। বক্তারা একে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জানিয়ে বলে এটি একটি অশুভ পাঁয়তারা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার আওতাভুক্ত কোনো কমিটি দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের পর্যালোচনার উদ্যোগ দমনমূলক– একে প্রতিহত করতে হবে।

সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে আলী আহমদের বারবার মনে হয় সৃজনীশলতার বিকাশ নয়, তাকে সামরিক আওতায় নিয়ন্ত্রণ– এজন্যই কি ভাষা আন্দোলন হয়েছিলো? এবং তাহেরের মতো দু'একজন ক্ষীণজীবী মানুষ সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে অবিচল থাকলো? এজন্যই কি আমরা রাজপথে মিছিলের মানুষ?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় বাতি জ্বলছে। রিকশায় আলী আহমদ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। ওর মুখটা প্রচণ্ড তেতো বিস্বাদে ভরে যেতে থাকে। একই সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে নিজের বুকের ভেতর তাহেরকে অনুভব করে। তাহেরের নিজস্ব গৌরববোধ নয়– তাহেরের বিষাদ ওকে আচ্ছন্ন করে– মনে হয় এক্ষুণি ওকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত। ও রিকশাঅলাকে কায়েতটুলি যেতে বলে। রিকশাঅলা সঙ্গে সঙ্গে পথ বদলায়। পরক্ষণে মনে হয় তাহেরের কি হয়েছে? ও বেঁচে আছে তো? প্রবল মৃত্যুচিন্তা ওকে ঘায়েল করে ফেললে আলী আহমদ রিকশায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ওর কপাল ঘামতে থাকে। ও শক্ত হাতে রিকশার হুড চেপে ধরে। তাহেরের বাড়ি নয় ওর এখন নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া উচিত, মনে হচ্ছে এই রিকশার ওপরই ও মরে যেতে পারে– ওর চোখের সামনে দুলে ওঠে শহরটা– একবার এদিকে বাঁকা হয়তো, আর একবার অন্যদিকে– মনে হয় অজস্র রঙিন বাতি জ্বলছে শহরের বুকে– কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে ওর অপেক্ষায়। কারা? আলী আহমদ ওদের চেনে না। ভয়ে ওর বুক চুপসে যায়। মনে হয় এই রিকশার ওপর ও মরে গেলে ওর প্রিয়জনেরা ওর মৃত্যু দেখবে না, পুলিশিতার কাছে পৌঁছতে পারলে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যাওয়ার ভয় ওর থাকবে না। ও কিছুতেই এই শহরে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকতে পারবে না, কিছুতেই না। মৃত্যুচিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেললে সাদা হয়ে যায় ওর চেহারা।

ও রিকশাঅলাকে বলে, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাও ভাই। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দাও।

রিকশাঅলা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, কি লাগাইছেন সাব? একবার এইদিগে রিকশা ঘুরান, আর একবার ঐদিগে? আমি পারমু না চালাইতে।

BanglaBook.org

আলী আহমদ রাগে না। শান্তস্বরেই বলে, এবার বাড়িই যাবো, আর কোথাও না। তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

কান্নার মতো নিস্তেজ সে কণ্ঠস্বর। রিকশাঅলার মায়াই হয়। বলে, আপনের কি শরীল খারাপ লাগতাছে?

আলী আহমদ মাথা নাড়ে। রিকশাঅলা রিকশার গতি বাড়িয়ে দেয়। আলী আহমদের মনে হয় এই গতির সঙ্গে ঝলক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর দিকে ছুটে আসছে। ও খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছে।

বাড়ি ফিরলে কেউ ওকে তেমন করে খেয়াল করে না। ওর কিছু হয়েছে এটাও কারো মনে হয় না। প্রতীক অনুযোগ করে, তুমি এত দেরি করে ফিরলে বাবা? তাহের চাচাকে দেখতে যাবো বলে সেই বিকেল থেকে আমি তোমার জন্য বসে রয়েছি?

কাল সকালে যাবো।

সকালে তোমার ক্লাস নেই?

বারোটায় ক্লাস। তার আগেই তাহেরকে দেখে আসবো।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকলে পুষ্পিতাও পিছু পিছু আসে। ও পুষ্পিতাকে বলে, দরজাটা বন্ধ করে দাও পুষ্পি।

পুষ্পিতা চোখ গোল করে তাকায়, কেন?

বলছি বন্ধ করতে, করো। আলী আহমদ বিছানায় শুয়ে পড়ে।

পুষ্পিতা দরজা বন্ধ করে কাছে এসে দাঁড়ায়, কি হয়েছে?

আলী আহমদ কথা না বলে ওর হাতটা টেনে বুকের ওপর চেপে ধরে। চোখ বোঁজা। পুষ্পিতা টের পায় হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ওঠানামা। ওর ভয় করে। ও ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? আলী আহমদ চোখ বন্ধ করে বলে, কিছু জানতে চেয়ো না।

মঞ্জুলিকা আলী আহমদের জন্য এক গ্লাস দুধ গরম করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ দেখে থমকে দাঁড়ায়। আজ ওর একটা স্কুলে চাকরি হয়েছে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আলী আহমদকে দেখাবে বলে অপেক্ষা করছিলো। দরজা বন্ধ দেখে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। প্রতীক নিজের ঘরে চলে গেছে। পুষ্পিতা বন্ধ দরজার ওপাশে। ডাইনিং স্পেসে ও একা দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকেই বলে, বাবার যে কখন কি হয় বোঝাই যায় না।

রাতে তাহের আলীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় আমেনা বেগমের। ওর অসুস্থতা আমেনা বেগমের কাছে খুব একটা গ্রাহ্যের বিষয় নয়। সকালে ডাক্তার দেখে গেছে, ওষুধ দিয়েছে একগাদা। প্রেসক্রিপশন দেখে মুখ শুকিয়ে গেছে ইউসুফের। এত ওষুধ ও কিনবে কীভাবে? জরুরি কয়েকটা কিনেছে মাত্র। বলেছে, পরে কিনবে। এসব নিয়ে তাহেরের মাথা ব্যথা নেই, ও কোনো অভিযোগও করে না। কিন্তু আমেনা বেগম ছাড়বে কেন? তার তো অভিযোগের শেষ নেই।

রাতে ঘুমুতে এসে প্রসঙ্গ ওঠায় ও। মশারি টানাতে টানাতে বলে, রুণা তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

কি ব্যাপারে?

ইউসুফ একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

তাহের শুনে চুপ করে থাকে। ছেলের বয়স হয়েছে ও তো প্রেমে পড়তেই পারে, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কি হলো, তা ও ভেবে পায় না।

আমেনা বেগম তেতো কণ্ঠে বলে, কিছু বলছো না যে?

বলার কি আছে?

BanglaBook.org

আমেনা বেগম রেগে ওঠে, হ্যাঁ, তুমি তো এভাবেই বলবে। বলবে, ছেলের বয়স হয়েছে প্রেম তো করবেই। তোমার উত্তর তো আমি জানি।

আহা চটছো কেন?

ও ভেংচি কাটে, চটছো কেন? যেন আমি সারাক্ষণ চটেই থাকি। কি যন্ত্রণায় যে জ্বলছি সেটা তো দেখো না।

তাহের চুপ করে থাকে। জানে কথা বাড়ালেই বাড়বে, তার চেয়ে নীরবতা ভালো। আমেনা বেগম আলো নিভিয়ে বালিশে মাথা রাখে। নিজে নিজেই বলতে থাকে, ছেলে প্রেম করছে, দুদিন বাদে বিয়ে করবে। বিয়ের পর আলাদা সংসার করবে। ছেলে কি তখন বাপের সংসারে টাকা দিতে পারবে? যা আয় তা থেকে দেবেই বা কীভাবে? আমাদের কি যে হবে? একটা বাড়িও যদি থাকত, একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। কিছুই করতে পারলে না সারাজীবনে।

তাহের হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, সারাজীবন কেবল বাড়ি বাড়ি করলে। ঢাকা শহরে কত লোকেরই তো বাড়ি নেই। আমাদেরও নেই। তাতে হয়েছেটা কি? আমাদের যে সম্পদ আছে তা একটা জাতিকে বড় করে, মহান করে। তুমি আর তোমার ছেলেমেয়েরা এসব বুঝবে না। তোমাদের কাছে আমি একজন ব্যর্থ মানুষ। এজন্য আমার নিজের কোনো লজ্জা নেই।

আমেনা বেগম প্রথমে বিস্মিত হয়। অবসর নেয়ার পর থেকে তাহের কখনো এত রাগ করেনি। আজ ওকে একদম অন্যরকম লাগছে। আমেনা বেগম কথা না বাড়িয়ে পাশ ফিরে শোয়। ওর ঘুম পাচ্ছে। পাগলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে ঘুম নষ্ট করতে রাজি নয় ও। কিন্তু সেই প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহেরের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ নিঃশব্দে থেমে যায়। আমেনা বেগম টেরই পায় না যে তাহের আর নেই। ভোরবেলা যখন ও বিছানা ছাড়ে তখন তাহেরের দিকে না তাকিয়েই নেমে যায়। ইউসুফের জন্য নাস্তা বানাতে হবে। ও সকাল সকাল বেরুবে বলেছিলো।

ন'টার দিকে রুণা বলে, বাবা তো কোনোদিন এতক্ষণ ঘুমোয় না। আজ কি হলো?

ও বাবাকে জাগাতে যায়। মশারি খুলে তাহেরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে চমকে ওঠে। এ মুখটা তো বাবার নয়, এমন মুখ করে ও বাবাকে কখনো ঘুমুতে দেখেনি। ও গায়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ও মাগো বাবার কি হলো?

ছুটে আসে সবাই। কান্নার রোল ওঠে বাড়িতে। আমেনা বেগম খানিকক্ষণ কেঁদে স্তব্ধ হয়ে যায়। রুণার কান্না থামে না। ইউসুফ আর হারুন কেঁদেকেটে থেমে গেছে। ওদের সামনে অনেক কাজ। তখন দরজায় কড়া নাড়ে আলী আহমদ আর প্রতীক। হারুন দরজা খুললে প্রতীক বলে, চাচা কেমন আছে? বাবা চাচাকে দেখতে এসেছেন?

ভেতরে আয়।

ওরা উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠে। কান্নার শব্দ খামচে ধরেছে আলী আহমদের হৃৎপিণ্ড– ওর মনে হয় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহের বিছানায়, তখনো কেউ ওকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়নি। ঘরের সবগুলো জানালা খোলা– কী সুন্দর রোদ এসে ভরে গেছে ঘরে। আমেনা বেগম খাটের পাশে একটি মোড়ায় বসে আছে, খাটের রেলিঙে মাথাটা ঠেকানো। রুণা তখনো উপুড় হয়ে কাঁদছে। আলী আহমদ বিছানার পাশে যায়– তাহেরের দিকে তাকিয়ে থাকে– এই রোদভরা সকালের সঙ্গে এই নেই হয়ে-যাওয়া তাহেরকে ও মেলাতে পারে না। আশ্চর্য রকমের শান্ত-স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওকে– মনেই হয় না যে বিশাল এক আবেগ ওর বুকে ব্যাপ্ত হয়েছিলো। ও অন্যরকম

BanglaBook.org

মানুষ হয়ে সযত্নে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলো। হঠাৎ ওর মনে হয় তাহেরের এভাবে থাকা উচিত নয়, ওকে ঢেকে দিতে হবে, ও এখন অনেক দূরের– চাইলেই ওকে ছোঁয়া যায় না। ও ওকে ঢেকে দেবার জন্য চাদর খুঁজতে গেলে আমেনা বেগমের চোখে চোখ পড়ে। বুঝতে পারে প্রচণ্ড এক ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমেনা বেগম ওর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন অন্য সময়ের মতো বলতে চাইছে, আপনি ওকে প্রশ্রয় দিয়ে ওর মাথাটা আরো খারাপ করে দিয়েছেন। আবার এসেছেন কেন? এখন কি ও আপনার কোনো কথা শুনতে পাবে?

আলী আহমদ অস্ফুট স্বরে বলে, ভাবী?

আমেনা বেগম মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ভাবী একটা চাদর দিন ওকে ঢেকে দেই।

আমেনা বেগম মুখ তোলে না। খাটের রেলিঙে মাথা আড়াল করে রাখে। রুণা আলী আহমদের কথায় উঠে গিয়ে চাদর এনে দেয়। তাহেরকে ঢেকে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদের মনে হয় তাহের আর কোনো একক সত্তা নয়– ও বহু, বহুর সমষ্টি। এ ভাবনা ওকে আমেনা বেগমের ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে মুক্তি দেয়। ও দৃঢ়পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ইউসুফ আর হারুনকে বলে, তোমরা তোমাদের আত্মীয়স্বজনকে খবর দাও। সবাই শেষ দেখা দেখে যাক। দাফনের জন্য তোমরা চিন্তা করো না। সব দায়িত্ব আমার।

ইউসুফ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় কবর দেবেন?

আজিমপুরে। দেখি বরকতের কবরের কাছাকাছি কোনো জায়গা খালি আছে কি না। জিতু আমার সঙ্গে আয়। ওর কাছে আমি কাফনের কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তাহেরকে ধোওয়ানোর ব্যবস্থা করো।

রিকশায় যেতে যেতে আলী আহমদের মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব নিয়মে বাঁচতে চায়। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। একটু অন্যরকম দেখলে আমরা তাকে ব্যতিক্রম মনে করি কেন? তাহের তো ওর নিজস্ব ধরনের স্বাভাবিক জীবনযাপন করেই মারা গেছে। আসলে, গোলমাল বেধেছে তখন যখন অন্য মানুষ তার নিজের মতো করে তাহেরের জীবনযাপনকে বিচার করেছে। আমেনা বেগম এক অর্থে দেখেছে, আলী আহমদ নিজে অন্যভাবে দেখেছে। এই দেখাটা এক হয় না বলে সংঘাত হয়। এখানে বোধহয় কিছু করার নেই। কেউ কি নিজেকে অন্যের জন্য বদলে ফেলতে পারবে? না, এ হবার নয়, আলী আহমদ নিজেই নিজেকে জবাবটা দিয়ে দেয়। তখন ও খানিকটা হালকা বোধ করে। আমেনা বেগমের নীরব ভর্ৎসনার জন্য ওর খারাপ লাগে না।

গোরস্তানে সবকিছু শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গেলো। আলী আহমদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একে-দুয়ে চলে যাচ্ছে আত্মীয়স্বজনেরা, তারা আর ক'জন, সব মিলিয়ে পনেরো জন হবে– এইতো তাহেরের গণ্ডি, হয়তো আরো কেউ কেউ থাকতে পারে যারা তাহেরকে শেষ দেখা দেখতে আসতে পারেনি। এরা তাহেরকে মনে রাখবে আত্মীয়তার সূত্রে– ও একজন বড় মাপের মানুষ ছিলো এ পরিচয় ওরা কেউ জানবে না। যে গৌরব নিয়ে তাহের মারা গেলো সে গৌরবের ভাগীদার ওরা হবে না। আলী আহমদ থমকে গিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, ঠিক বললাম কি? না, না ঠিক বলিনি। একদম ভুল। ভাগীদার যদি নাই হবে তাহলে মিছিলে এত মানুষ আসে কোথা থেকে? তাহলে কি সবার বুকের ভেতরে অবচেতনে একজন তাহের থাকে? থাকে, এই শব্দটি উচ্চারণ করে আলী আহমদ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। একটু আগে ও ভেবেছিলো গোরস্তানের কাজ শেষ হয়েছে। এই শেষ হয়ে যাওয়া আপাত সত্য, গভীর অর্থে কোথাও কিছু শেষ হয়নি। আবার জোয়ার আসবে– নীল সমুদ্রের ঢেউগুলো আকাশ সমান উঁচু হয়ে গড়িয়ে আসবে। আলী আহমদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে। ওর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। বাড়ি ফেরা দরকার। ফেব্রুয়ারির বিকেল, গোরস্তানের ওপর দিয়ে ফুরফুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। প্রতীক এসে ডাকে, বাবা যাবে না?

ওর পেছনে ইউসুফ আর হারুনও দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার ভাষা, চাচা আপনি বাবার জন্য যা করলেন না–!

আমি ওকে খুব ভালোবাসি ইউসুফ। আমি তো ওর জন্য কিছুই করতে পারিনি। ওর তো আরো অনেক বড় কিছু পাওয়া উচিত ছিলো। একটি রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হতে পারতো– বিউগলে করুণ সুর বাজতে পারতো– সামরিক অভিবাদন পেতে পারতো তাহের।

প্রতীক বিস্মিত কণ্ঠে বলে, বাবা এসব তুমি কি বলছো?

ভুল, ভুল কথা বলছি জিতু। একজন জেনারেল-প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায়। সে তো আমাদের লোক না। একুশের আবেগে তার কিছু এসে যায় না– বরং একুশের আবেগ ওর শত্রু। ঐ আবেগের দিকে ও তাক করে রেখেছে রাইফেলের নল। কিন্তু তাহেরের জন্য আমরা আছি, আমরা সাধারণ মানুষেরা। আমরা ডাক দিলে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসবে– শহরজুড়ে একটা জানাজা হতে পারে তাহেরের জন্য।

বাবা বাড়ি চলো, আমরা বুঝতে পারছি তোমার ভীষণ মন খারাপ।

কে বলেছে, একটুও মন খারাপ না।

চাচা আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মোটেই না। বরং ভালো লাগছে। জানিস জিতু মনে হচ্ছে আমার শরীরের তেতো ভাবটা আর নেই।

ও পকেট থেকে দু'শো টাকা বের করে ইউসুফকে দেয়।

টাকাটা রাখো বাবা, কুলখানির জন্য।

না, না। দরকার হবে না।

কোনো কিছুই তো তোমার দরকার ছিলো না। আমি তো আমার জন্য করছি। নাও। না নিলে আমি কষ্ট পাবো।

ইউসুফ টাকাটা নেয়, কিন্তু বুঝতে পারে না হারুনের বন্ধু প্রতীকের বাবার এত কীসের দরদ। আলী আহমদ ওর কাছে পরিচিত একজন মানুষ হয়েও অপরিচিতই থেকে যায়। মনে মনে ভাবে, কিছু কিছু পাগল থাকে বলেই বোধহয় সংসারের একজনের কষ্ট আর একজনে বয়ে বেড়ায়।

হুড-ফেলা রিকশায় বাড়ি ফেরার পথে ঠাণ্ডা বাতাসে আলী আহমদের চোখ জুড়িয়ে আসে। তবু ও চোখ বন্ধ করতে পারে না, ক্ষণিকের জন্যও না। বারবার মনে হয় ইউসুফের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ছিলো– ও হয়তো বুঝতে পারছিলো না, সত্যি কি আলী আহমদ ওর বাবাকে ভালোবাসে! তখুনি ও আমেনা বেগমের কণ্ঠ শুনতে পায়, যে কথাটি কত অসংখ্যবার আলী আহমদের সামনে বলেছে। বলতো, যে মানুষ সংসারের প্রয়োজন ঠিকমতো মেটাতে পারে না স্মৃতিটিতি নিয়ে তার আবার গর্ব কীসের? আসলে একজন ব্যর্থ মানুষের অহঙ্কার সহ্য হয়নি আমেনা বেগমের। এখানেই জেনারেলের সঙ্গে আমেনা বেগমের মৌল পার্থক্য। তাহের প্রচুর বিত্তের অধিকারী হলে এমন একটি স্মৃতিতে আমেনা বেগম আপত্তি করতো না। বরং স্বামীর গৌরবের ভাগীদার হতে চাইতো। হয়নি বলেই আমেনা বেগমের মতো অনেক স্বজন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। আর জেনারেলের রাইফেলের নল সার্বক্ষণিক পাহারা দিয়েছে তাহেরের বুক– যেন ওর বুকের শব্দ আর কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে তাহেরের বুক ছড়িয়েছে কোটি কোটি শব্দ– নইলে আমরা কি এমন একটা ইতিহাস তৈরি করে এতখানি পথ আসতে পারতাম!

BanglaBook.org

বাড়ির কাছে এসে প্রতীক ডাকে, বাবা?

আলী আহমদ ওর দিকে তাকায়।

তোমার কি মন খারাপ?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। তাহেরের জন্য বুকের খানিকটুকু তো ধরেই আছে, এটাকে কি ঘটা করে বলতে হবে? জেনারেলের ভাষণ শুনলেও তো মন খারাপ হয়– সেটার সঙ্গে কি আজকের মন খারাপের খুব তফাৎ আছে? জেনারেলের কণ্ঠ কি ওর কাছে মৃত্যুর বার্তার মতো লাগে না? তখনও তো ওর বুকের খানিকটা ধরে যায়, ওর খারাপ লাগে। আলী আহমদ প্রতীকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রিকশার ভাড়া মেটায়– তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। প্রতীক ওর পেছনে। আলী আহমদ ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, তুই লাফিয়ে উঠে যা জিতু। আমি আস্তে আস্তে উঠি।

একা থাকলে দু'তিনটা সিঁড়ি লাফিয়ে উঠি, কিন্তু এখন আমি তোমার সঙ্গেই উঠবো বাবা।

আলী আহমদের বুক ভরে যায়। ও নিজের মুঠিতে প্রতীকের হাত টেনে নেয়। ছেলেটি ওকে এক নিশ্চিত, নির্ভার আশ্বাস দিয়েছে। এর বেশি আলী আহমদের আর কিইবা চাইবার আছে? ও ওদেরকে বোঝা দিতে চায় না, চায় ওদেরকে ওদের পথ খুঁজে নেবার সহযোগিতা দিতে।

মাস দেড়েকের মধ্যেই আবার জেনারেল-প্রেসিডেন্টের ভাষণ বেজে ওঠে বেতারে। এবার নির্বাচনের জন্য আইনগত কাঠামো আদেশের ঘোষণা। একদিন পর প্রকাশিত হবে। শহরজুড়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। কি আছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও জেনারেল-প্রেসিডেন্টের এই আদেশে, যিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরদিন ভোরবেলা নীলক্ষেতের মোড় থেকে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকাটি কিনে আনে প্রদীপ্ত। রাস্তা প্রায় ফাঁকা, দু'একটা রিকশা বেরিয়েছে মাত্র। বাসায় ফিরে দেখে আলী আহমদ ঘুম থেকে ওঠেনি। বাবাকে না জাগিয়ে ও ডাইনিং টেবিলে কাগজটা নিয়ে বসে। মঞ্জুলিকা রান্নাঘরে, নাস্তা বানাচ্ছে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ওকে স্কুলে যেতে হয়। একবার মুখ বাড়িয়ে বলে, কাগজে তোমার রেগে যাবার মতো কিছু থাকলে জানিও।

প্রদীপ্ত খুঁটিয়ে পড়তে থাকে। মঞ্জুলিকা ওর সামনে এক কাপ চা দিয়ে গেছে, সেটাও জুড়োতে থাকে। আলী আহমদ ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকেছে। তখন প্রদীপ্ত টেবিলের ওপর সশব্দে ঘুষি মারে। উল্টে যায় চায়ের কাপ। মঞ্জুলিকা ছুটে আসে, জানতাম এমন কিছু তুমি করবে।

ও একটা ন্যাকড়া নিয়ে টেবিলে গড়িয়ে যাওয়া চা ঠেকায়। বলে, আমার বেরুবার মুখে একটা ঝামেলা বাধালে। এখন কি আমার সময় আছে এসব করার।

তুমি তৈরি হতে যাও মঞ্জুলি। আমাকে ন্যাকড়া দাও। আমি মুছে ফেলি।

ও ন্যাকড়াটা টেনে নিয়ে টেবিল মুছতে থাকে। আলী আহমদ বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়, বুঝেছি জেনারেল-প্রেসিডেন্ট তোকে খুশি করতে পারেনি। বল দেখি কি আছে?

সোজা ভাষায় এটি একটি চক্রান্ত। ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে। তুমি এই পঁচিশ আর সাতাশ ধারাটি পড়ো কেবল।

BanglaBook.org

বল না কি আছে?

পঁচিশ ধারায় বলা হয়েছে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ একশ বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করবে এবং তা প্রেসিডেন্টের চূড়ান্তকরণের জন্য পেশ করবে। প্রেসিডেন্ট তা চূড়ান্ত করতে সম্মত না হলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে, বুঝেছি। দেখা যাচ্ছে সামরিক শাসনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও তাকে বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে রাখার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত পরিষদের কোনো সার্বভৌমত্ব নেই। আর শাসনতন্ত্র গৃহীত না হলে পরিষদ বিলুপ্ত হবে এবং জেনারেল-প্রেসিডেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকবেন। তাই না দীপু? সাতাশ ধারায় কি বলা হয়েছে, বল তো?

এই নির্দেশের কোনো ধারার অর্থ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে আলী আহমদ। বলে, জেনারেল আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে। কার সাধ্য তাকে নড়ায়।

চুপ করে থাকে প্রদীপ্ত, যেন ওর মুখে কথা জোগায় না। আলী আহমদ দেখতে পায় ওর মুখটা থমথম করছে।

পরদিন থেকে বয়ে যেতে লাগলো প্রতিবাদের ঝড়। রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন সবার মুখে এক কথা, এই আইনগত কাঠামো গণতান্ত্রিক মূলনীতি পরিপন্থী। এই আদেশ সংশোধন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সভা ও বিক্ষোভ দেখতে দেখতে আলী আহমদের চোখের সামনে উনসত্তর ভেসে ওঠে– নিজের ভেতরে এক ধরনের গর্জন এবং কলকল ধ্বনি বয়ে যায়। ওরা বক্তৃতা করছে– তীব্র ভাষায় বলছে, ইয়াহিয়ার ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল করে ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারোদফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য সার্বভৌম গণপরিষদ গঠন করতে হবে।

চমকে ওঠে আলী আহমদ। কিভাবে হবে? কে দেবে এই অধিকার? জেনারেল? ক্ষমতার লোভ ছাড়লে তো এমন আইন প্রণীত হতো না! ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে সার্বভৌম পার্লামেন্ট দিতে হবে। নির্বাচনী কাঠামো সংশোধন করো। মিছিল বেরিয়ে গেলে ও রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আবার স্লোগান ওঠে, সামরিক আইন বাতিল করো।

থমকে দাঁড়ায় আলী আহমদ– মিছিলের লেজটুকু মিলিয়ে যাবার পরও ও দাঁড়িয়ে থাকে। নিজে নিজেই বলে, সামরিক আইন বাতিল করো– তোলপাড় করে ওঠে বুক। মুখের ভেতরের তেতো বিস্বাদ গড়িয়ে আসে জিভে। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে। পেরিয়ে আসে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি। রাস্তা পেরুতে হবে। সামনেই গেট। ওর বাসার চত্বর। পুলিশ ফাঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আলী আহমদ– কেন যে বাহান্নোর কথা মনে হয়– ঐ খাকি পোশাক-পরা লোকগুলো ওকে আনমনা করে দিচ্ছে– ওরাও তো মানুষ, তবু ওদেরকেই নিরীহ মানুষের বুকে গুলি চালাতে হয়। ওরা নিজেরাও বোঝে না যে ওরা কি করছে! গাড়ির হর্ণ শুনতে শুনতে ও ভাবে, ছেলেরা কতদূর গেলো? মিছিলটা ঠিকঠাক মতো যাচ্ছো তো, নাকি বাধা পেয়েছে? এখন এই মুহূর্তে ও যদি ওই খাকি পোশাক-পরা লোকগুলোর সামনে চিৎকার করে স্লোগান দেয়, সামরিক শাসন নিপাত যাক, তাহলে ওদের প্রত্যেকের হাতের নল একযোগে কি ওর বুক বরাবর উঠে আসবে? নাকি ওদের মধ্যে কেউ কেউ ভাববে, হ্যাঁ,

BanglaBook.org

লোকটি তো ঠিকই বলেছে, একজন জেনারেল কেন দেশের সাধারণ মানুষের জায়গা দখল করে রাখবে? আইন কেন দেশের মানুষের পছন্দমতো লোকের হাতে থাকবে না?

একটি ছেলে ওর পাশে এসে দাঁড়ায়, স্যার? আপনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কি রাস্তা পার হতে পারছেন না স্যার?

আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। ও আবার বলে, আমার নাম মিজান। ফাইনাল ইয়ার। আপনি আমার হাত ধরেন স্যার, আপনাকে পার করে দিচ্ছি।

আলী আহমদ কথা না বলে ওর হাত ধরে। ও হাতের ইশারায় রিকশা গাড়ি থামিয়ে অনায়াসে রাস্তা পার হয়ে যায়। ওর মুখে সাফল্যের হাসি। আলী আহমদ ওর আনন্দটুকু নষ্ট করতে চায়নি।

দু'জনে বলাকা হল থেকে 'স্পার্টাকাস' সিনেমা দেখে বেরিয়েছে– বন্যার চোখ তখনো লাল, নায়ককে ক্রুশবিদ্ধ করার পর ও চুপিচুপি কেঁদেছে। প্রতীককে বুঝতে দিতে চায়নি। এসব নিয়ে প্রতীক মাঝে মাঝে এমন রসিকতা করে যে ও আহত হয়। আজও হল থেকে বেরিয়ে ও বুঝলো বন্যা কেঁদেছে– চালাক মেয়ে, নাকও ঝাড়েনি। নিঃশব্দ চোখের জল আর কি। তবু রিকশায় উঠে খোঁচা দিতে ছাড়লো না প্রতীক। বললো, আমি বুঝতেই পারিনি যে তুমি বলাকা সিনেমা হলকে বুড়িগঙ্গা নদী বানাতে চেয়েছিলে।

দেখো বাজে কথা বলবে না।

তবে তোমার চোখ লাল কেন?

চোখ দিয়ে পানি পড়েছে বলেই।

আগে জানলে পকেটভর্তি রুমাল নিয়ে আসতাম।

তোমার রুমাল ব্যবহার করতে আমার ঘেন্না হয়।

প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, ঘেন্না হয়?

ঘামের গন্ধ– ওয়াক থুঃ!

ইস, বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।

মোটেই না। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

ঠিক আছে, রুমালগুলো তোমাকে দিয়ে দেবো। ধুয়ে পারফিউম মাখিয়ে দিও।

আমার বয়ে গেছে।

কথা বলতে বলতে শাহবাগের কাছে এলে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। কখন যে আকাশে মেঘ করলো, ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলো, ওরা টেরই পেলো না। উপায় না দেখে দু'জনে আর্ট কলেজে এসে ঢোকে। বারান্দায় আরো ক'জন পথচারি দাঁড়িয়ে ছিলো।

সামনে রমনা রেসকোর্স লোকে-লোকারণ্য। সাত জুন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সভা। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকেরা– রেসকোর্সের ওপর দিয়ে স্রোতের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে পানি– ধুলোমাখা ঘাসগুলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে, সজীব দেখাচ্ছে। চারদিক ধোঁয়াটে।

গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে প্রদীপ্ত দাঁড়িয়ে আছে– বৃষ্টি ওর ভালোই লাগছে, ভিজতে ওর আপত্তি নেই। পত্রিকা থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতা কভার করতে– সাত জুনের স্মরণ সভা হলেও আজ থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করবেন। আজকের সভায় তিনি একাই বক্তা।

জয় বাংলা স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে– মানুষ এসেছে মিছিল করে, কাছ থেকে দূর থেকে, এসেছে বাসে-ট্রাকে-ট্রেনে-লঞ্চে। যেন মানুষের এই স্রোত বৃষ্টিরই মতো– ধুয়ে

BanglaBook.org

দিচ্ছে রেসকোর্সের ঘাসগুলো, কোথাও কোনো ধুলো রাখতে চায় না কেউ। প্রদীপ্তর মনে হয় বৃষ্টির পতন এবং জয় বাংলা স্লোগান বুঝি একই সমান্তরালে গগণবিদারী হয়ে পড়ছে এবং বৃষ্টিমাখা প্রান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে– যেন বৃষ্টি এই স্লোগান নিয়ে যাচ্ছে চারদিকে– শহর থেকে দূরে, গোটা দেশে।

বৃষ্টির তোড় কমেছে, ওর হাতের কাগজপত্র ভিজে গেছে, এখন স্মৃতি-নির্ভর করে রিপোর্ট লিখতে হবে। ও সামনে কিছু দেখতে পায় না, শুধু অগণিত মানুষের মাথা– কখনো কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মেজাজ খারাপ হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। কাকে বলবে? কার গুঁতো লেগেছে ও তো দেখেনি। অনেকদূরে মঞ্চ– সামিয়ানার নিচে নেতারা– স্লোগান শেষ হলে মাইকে ভেসে আসে কণ্ঠ– সভা শুরু করার ঘোষণা দিচ্ছে। প্রদীপ্ত এতদূর থেকে দেখার চেষ্টা করে না, ও কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে– নিজেকে তৈরি রাখে, যেন মনোযোগ ছুটে না যায়– যেন কিছু অনুধাবন করার আগেই খেই হারিয়ে না ফেলে। এ নির্বাচন তো শুধুই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ নয়– এ নির্বাচন সামরিক সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই– একে অন্যভাবে মূল্যায়ন করতে হবে– রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কি হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে জরুরি বিষয়। এই বৃষ্টিস্নাত দিনে প্রদীপ্তর মনে হয় সামনে এক অনিশ্চিত কঠিন সময়।

ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর জলদগম্ভীর কণ্ঠ। নিশ্চুপ হয়ে যায় জনসমুদ্র, সেখানে কোনো কলরোল নেই, সবাই কান পেতে আছে। তাঁর কণ্ঠের শব্দরাজি গড়িয়ে যায় মানুষের বুকের ওপর দিয়ে– প্রতিটি কথা ছুঁয়ে যায় ওদের হৃদয়, যেন একজন মানুষ কথা বলছে না, বলছে সবাই। অথচ আশ্চর্য এক সংহতি সেসব কথায়, এ জনসমুদ্রের একজন মানুষকে যদি বলতে বলা হতো তাহলে সে বুঝি ঐ কথাটাই বলতো। এক সময় ও চমকে ওঠে– বঙ্গবন্ধু বলছেন, আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট।

বক্তৃতা শুনে বাড়ি ফেরার পথে প্রদীপ্তর মনে হয় সামনে বুঝি এক অনিশ্চিত সময়– সামরিক সরকার কি মানবে এই ছয়দফা-ভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণা? আইনগত কাঠামো আদেশের সঙ্গে তো এর মিল নেই, বরং এক উল্টো স্রোত? নাকি সব বানচাল করে দেবে? আসবে আর একজন জেনারেল, যে জাতিকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না, বলবে সামরিক শাসনই শেষ কথা।

রিকশার ভাড়া চুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসব ভাবনায় মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে ওর। দোতলা পর্যন্ত উঠলে দেখতে পায় মঞ্জুলিকা উঠছে, ও দু'হাতে শাড়ি সামলাচ্ছে– বৃষ্টিতে ওর শাড়ির বেশ খানিকটা অংশ ভিজে গেছে। প্রদীপ্ত দু'লাফে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। চমকে ওঠে মঞ্জুলিকা, বাবা এমন করে চমকে দাও না।

প্রদীপ্ত ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, বৃষ্টি তোমাকে একদম ভেজা শিউলি করে দিয়েছে। চুলের আগায়, কপালে জলের ফোঁটা– দারুণ লাগছে। ও মঞ্জুলিকার ঘাড়ে হাত রাখে।

ধ্যাৎ, কি যে করো না?

কিছু তো করিনি, করবো।

মানে?

এই দেখো। ও মঞ্জুলিকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

আহ্ ছাড়ো।

কেন ছাড়বো? মঞ্জুলি, কি যে ভালো লাগছে ভাবতে যে এই সিঁড়িগুলো আমাদের দখলে।

BanglaBook.org

কেউ তো আসতে পারে?

আমরা তার পায়ের শব্দ পাবো।

কেউ তো দরজা খুলে বেরুতে পারে?

আমরা দরজা খোলার শব্দ পাবো।

আহ্, দীপ তুমি যে কি শুরু করলে।

বৃষ্টিতে ভিজলে নতুন কিছু শুরু করার ভীষণ ইচ্ছে হয় মঞ্জুলি।

তবে বলো বৃষ্টি কি সব পাপ ধুয়ে দিতে পারে?

পাপের প্রশ্ন আসছে কেন?

পাপ ছাড়া তো জীবন নেই। কেউ তো একশ ভাগ পুণ্যের ভাগীদার নয়।

তুমি একটা ইয়ে– দিলে সব আবেগ চটকে।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মঞ্জুলিকা। বলে, না দিলে তো তুমি এই সিঁড়িটাকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলতে। হা-হা করে হেসে ওঠে প্রদীপ্ত, যেন প্রবল বাতাসে বুকের দরজা হাট করে খুলে গেছে। তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি পাপের কথা তুলে আমার কাছ থেকে পরিত্রাণ চাইলে মঞ্জুলি? আমি মনে করি আমার তো কোনো পাপ নেই।

আমিও মনে করি আমারও কোনো পাপ নেই।

আমরা দু'জনের কেউই মানুষের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিনি।

এই আনন্দ নিয়ে চলো আমরা ঘরে ফিরি।

মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর হাত ধরে। প্রদীপ্ত উঠতে উঠতে বলে, এমন ভিজেভুজে বাড়ি ফিরলে–

বকুনি আছে কপালে।

মঞ্জুলিকা বাক্য শেষ করতে করতে দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খোলে পুষ্পিতা। চেঁচিয়ে বলে, জানতাম তোমরা ভিজেই ফিরবে। তোমরা আবার বৃষ্টি ভালোবাসো কিনা। দু'জনে একসঙ্গে হলে কোথায়?

প্রদীপ্ত মাথা চুলকে বলে, এইখানে মা, সিঁড়িতে।

যাও ভিজে কাপড় ছাড়ো, জ্বর না এলেই বাঁচি।

ততোক্ষণে আলী আহমদ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মিটিঙে গিয়েছিলি দীপু?

হ্যাঁ।

খবর কি?

বোঝা যাচ্ছে ইয়াহিয়া খান শিগ্‌গিরই আর একজন নতুন জেনারেলের হাতে ক্ষমতা দেবেন। চমকে ওঠে আলী আহমদ, মানে?

বঙ্গবন্ধু যে ভাষায় বক্তৃতা করলেন তা আইনগত কাঠামোয় পড়ে না বাবা।

বলতে বলতে প্রদীপ্ত নিজের ঘরে যায়। মুহূর্তে ও আবার ফিরে এসে বলে, আর আমরা তো দেখলামই জেনারেলরা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলে সেটা জন প্রতিনিধিদের হাতে না দিয়ে আর একজন জেনারেলের হাতে দিতেই নিরাপদ মনে করে।

আলী আহমদ অনুভব করে ওর মুখের ভেতরে তেতো স্যালাইভা ওকে গ্রাস করছে– ওর শরীর খারাপ লাগছে। রাজনৈতিক নেতারা আইনগত কাঠামো আদেশের আওতায় নির্বাচন করতে না পারলে সত্যি কি আবার সৈনিকের বুটে, হেলমেটে, রাইফেলে ছেয়ে যাবে রাজপথ? আবার কি নামতে হবে লড়াইয়ে? সেটা কেমন লড়াই হবে? লড়াইয়ের কোনো পরিষ্কার ধারণা আলী আহমদ মনে করতে পারে না– শুধু লড়াই শব্দটা গেঁথে থাকে ওর মগজে।

BanglaBook.org

২

খুব আকস্মিকভাবেই সোনাখালি যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেলো ওদের। সোনাখালিতে মঞ্জুলিকার চাচার বাড়ি, আপন চাচা নয়, ওর মায়ের চাচাতো ভাই, তিনশ বিঘা জমির মালিক, দবদবা অবস্থা। ঐ বাড়ির অনেক গল্প প্রদীপ্ত শুনেছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি।

চিঠি এসেছে চাচী অসুস্থ, মঞ্জুলিকার মা যাবে দেখতে, সঙ্গে নিয়ে যাবে ওদের দু'জনকে। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মঞ্জুলিকা খুশিতে আটখানা– গলগল করে পুষ্পিতার সঙ্গে কথা বলে, মা কি যে খুশি লাগছে যে সোনাখালি যাওয়া হবে। সেই ম্যাট্রিক পাসের পর গিয়েছিলাম, আর যাওয়া হয়নি। এমন সুন্দর গ্রাম বুঝি আর হয় না। সোনাখালি খাল বয়ে গেছে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে, বেশ চওড়া খাল– বলেশ্বর নদীতে গিয়ে মিশেছে। আর জানেন তো মা বলেশ্বর নদীর ওপারে সুন্দরবন। সেবার আমি কুদ্দুস চাচার সঙ্গে সুন্দরবন গিয়েছিলাম। চাচা পাকা শিকারি। প্রথমে তো ভীষণ খুশি লাগছিলো যে শিকার করা দেখবো। কিন্তু বালিহাঁসগুলো যখন উপর থেকে টুপটুপ করে মাটিতে পড়ে পাখা ঝাপটাতে লাগলো তখন খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু চাচা যখন একটা হরিণের বাচ্চা মারলেন তখন আমার বুক ফেটে গেলো, আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। আমাকে কাঁদতে দেখে চাচা তো অবাক। বলেন, তোর জন্যই তো এলাম হরিণ শিকার করতে। তোকে বাচ্চা হরিণ রোস্ট করে খাওয়াবো। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি খাবো না, কিছুতেই না। চাচা হাসতে হাসতে বলেন, তাহলে কি খাবি? বাঘের মাংস? চল বাঘ শিকার করবো। আমি তো থ। চাচার হাত ধরে বলি, চাচা আপনি বাঘ মারতে পারবেন না।

কেন রে?

পশুপাখি মারতে দেখলে যে আমার কষ্ট হয় এখন তা বুঝতে পারছি। বাঘও তো দেখতে খুব সুন্দর প্রাণী চাচা।

কিন্তু বাঘ তো তোকে সামনে পেলে ছাড়বে না।

কারোই বাঘের সামনে যাওয়া উচিত না। ওরা তো জঙ্গলে থাকে। ওদেরকে ওদের মতো থাকতে দেয়া উচিত।

ওরে বাবা, মেয়ে দেখি মাস্টারের মতো কথা বলছে। তারপর চাচা শক্ত গলায় বলেন, আমি বাঘ মারতে চাই।

কেন?

গতবার একটা বাঘ আমার একজন বর্গাচাষীকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে খেয়েছে। যে আমার শত্রু আমি তাকে খতম করবোই।

চাচার সে কথা শুনেও না শুনে আমি চেঁচিয়ে বলি, চাচা দেখেন কুমীর, কুমীর।

বিশাল এক কুমীর শরীর দুলিয়ে ডাঙা থেকে নদীতে নেমে যায়।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমার মনে হচ্ছিলো চাচার হাত নিশপিশ করছে ট্রিগার টেপার জন্য। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে সে বন্দুক আর ওঠাতে পারেন না। আমি যে কখন চাচার হাত চেপে ধরেছি তা নিজেও জানি না। বলেশ্বর নদীতে নৌকাটা তখন–

পুষ্পিতা হেসে ফেলে। বলে, পাগল মেয়ে। তুমিও দেখছি দীপুর মতো। ও তো কোথাও যাওয়ার কথা শুনলে বেহুঁশ হয়ে যায়।

মঞ্জুলিকা হেসে নিজের ঘরে যায়– বারবার শৈশব-কৈশোরের দেখা সোনাখালি ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে– ও এই আচ্ছন্নতা নিয়ে কাপড় ছাড়ে, বাথরুমে যায়, রান্নাঘরে এসে চা বানায়। আলী আহমদকে পড়ার টেবিলে চা দিয়ে আসে। পুষ্পিতা ড্রইংরুমে টিভি দেখছে। ওর জন্য চা নিয়ে আসে। চা খেতে খেতে ও নিজে টিভির দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

থাকলেও টিভি দেখা হয় না, যেন সে পর্দায় ভেসে যাচ্ছে সোনাখালির নিসর্গ।

রাতে বিছানায় শুয়েও প্রদীপ্তর কাছে সোনাখালির গল্প করে মঞ্জুলিকা। শুনতে শুনতে প্রদীপ্তর মনে হয় ম্যাট্রিক পাসের পর ওর আর যাওয়া হয়নি, এর আগে দু'বার গিয়েছে, তখন কতইবা বয়স ছিলো ওর– অথচ সোনাখালি ওর বিস্ময়, যেন এই বয়সেই ওর জন্মের দেখা হয়েছে। নাকি কৈশোরের বিস্ময় ওকে এখনো আবিষ্ট করে রেখেছে? প্রদীপ্ত ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবে, মানুষের শৈশব-কৈশোর যে তাকে কতভাবে নাড়া দেয়, হুট করে স্মৃতির দরজা খুলে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় আনন্দে মাতিয়ে তোলে। ওর চিন্তা আর এগোয় না। সবার কি আর আনন্দ হয়? কারো তো দুঃখের স্মৃতি থাকতে পারে, ভীষণ দুঃখ, যে দুঃখের কথা মনে পড়লে তার সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে। ভাগ্যিস, ওর আর মঞ্জুলিকার তেমন স্মৃতি নেই।

তুমি কি আমার কথা শুনছো না অন্যকিছু ভাবছো?

শুনছি এবং ভাবছি।

এটা কি করে সম্ভব?

একশ ভাগ সম্ভব। তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো, আমাদের দু'জনের কোনো বিষাদের স্মৃতি নেই।

কে বললো নেই? আছে।

কই আমাকে তো কখনো বলোনি।

সে স্মৃতি মনে করলে আমার কষ্ট হয় যে তাই তেমন করে বলি না।

আমি শুনবো। বলো।

ওই যে আমার পিঠাপিঠি বোনটার মৃত্যু।

ও তো সবার মুখেই শুনি। মা বলবে সবচেয়ে বেশি।

স্মৃতি তো শুধু কথা নয় দীপ। এমন অনুভব থাকে যেটা বলে বোঝানো যায় না। ও এক রাতের মধ্যে কলেরায় হুট করে মরে গেলো– ও ছিলো সে বয়সে আমার কাছে প্রচণ্ড বিস্ময়, কারণ মৃত্যু কি আমি জানতাম না। আর ও নেই, এটা যখন আমি ভাবি তখন আমার ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে।

কথা বলা শেষ হতে না হতেই মঞ্জুলিকা উঠে বাথরুমে যায়। প্রদীপ্তর মনে হয় না শুনতে চাইলেই ভালো ছিলো। সে রাতে ও ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না, বারবার ঘুম ভেঙে যায়।

দু'দিন পর লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে মঞ্জুলিকা বলে, আমাদের দু'জনের এই প্রথম ঢাকার বাইরে যাওয়া।

প্রদীপ্ত ফিসফিসিয়ে বলে, হানিমুন বলবো কি?

মঞ্জুলিকা সায় দেয়, বলতে পারো। হোক না এক বছর পর, তবু হানিমুন।

মঞ্জুলিকার উজ্জ্বল মুখের ওপর চূর্ণ কুন্তল খেলা করে– আহা কী মনোরম দৃশ্য, জীবন ধন্য হয়ে যায়। প্রদীপ্তর মুগ্ধ দৃষ্টি ওর মুখ থেকে সরতে চায় না।

দেখো, দেখো ঐ বাচ্চা ছেলেটি কেমন সুন্দর ডিঙি বেয়ে চলে যাচ্ছে। মাগো, কী সাহস!

আমি এমন একটা সাহসী ছেলের বাবা হতে চাই।

আমি শুধু সাহসী ছেলে না সাহসী মেয়েও চাই।

তোমার নিজের মতো?

BanglaBook.org

আমি কি সাহসী?

ভীষণ সাহসী। এমন সাহসী মেয়ে আমি দুটো দেখিনি।

দেখো বাড়িয়ে কথা বলো না।

আমি চাই তোমার সাহসটুকু সারাজীবন থাকুক।

ধ্যাৎ, বাণী দিও না।

বাণী হলো বুঝি?

এসব কথা শুনলে আমার রাগ হয়।

তাহলে প্রেমের কথা বলি। তোমার রাগ জল হয়ে যাবে।

বলো, বলো, কোটি কোটি বার বলো।

সোনাখালি তোমার স্মৃতির একটি প্রিয় জায়গা, তাই তো?

হ্যাঁ, কেন?

সোনাখালিতে গিয়ে প্রেমের গভীর কথা বলবো। আমরা দু'জনে আলাদা ঘর পাবো তো?

বুঝেছি, যত সব খারাপ চিন্তা।

প্রদীপ্ত দুষ্টুমির হাসি হাসে। মঞ্জুলিকা অখণ্ড মনোযোগে নদী দেখতে থাকে। লঞ্চ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে এখন মেঘনায়। তারপর একসময় পেরিয়ে যাবে স্বরূপকাটি, ভাণ্ডারিয়া, হুলারহাট। পৌঁছে যাবে তুষখালি। ওখান থেকে রিকশায় মঠবাড়িয়া, তারপর সোনাখালি। কত লম্বা পথ!

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, এ সময়ে প্লেনে লন্ডনে আসা-যাওয়া করা যায়।

কিন্তু এই নদী, গ্রাম, চাঁদনি রাত, মানুষের হৈ-চৈ- হাঁকডাক কিছুই দেখা হবে না। না বাপু, আমার নদীপথই ভালো। আমি ঐসব প্লেনের সঙ্গে আপোস করতে চাই না। আমি কখনোই চাইবো না যে ঢাকা থেকে সোনাখালি আমি এক লহমায় উড়ে চলে যাবো।

তুমি একটা যাচ্ছেতাই ভেতো বাঙালি। তোমাকে লাল সালাম।

প্রদীপ্ত হো-হো করে হেসে ওঠে। মঞ্জুলিকা চোখ গরম করে তাকায়, সবসময় কেবল ইয়ার্কি।

তুষখালির ঘাটে এম.ভি. সাঁতারু নামের লঞ্চটা যখন প্রবল ভেঁপু বাজিয়ে থামলো, তখন প্রদীপ্তর মনে হলো এই দীর্ঘ পথ ওকে ক্লান্ত করতে পারেনি। শাশুড়ি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে বাবা?

এমন সুন্দর জার্নি হয় না মা। মঞ্জুলিকা ঠিকই বলেছে।

মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে মঞ্জুলিকা প্রথমে ওকে জিভ দেখালো, তারপর বললো, এখন আমরা রিকশায় করে সোনাখালি যাবো। কাঁচা রাস্তার দু'পাশে খোলা-

থাক আর বলতে হবে না, প্রদীপ্ত ওকে থামিয়ে দেয়। আমি জানি দু'পাশের ধানক্ষেত, গ্রাম ছুঁয়ে আমার দৃষ্টি দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মঞ্জুলিকা দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, হ্যাঁ তাই। আর এমন দৃশ্য প্লেনে বসে দেখা যায় না।

তোমরা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। আমাদের আরো খানিকটা পথ তো যেতে হবে।

কুলির মাথায় ব্যাগ-স্যুটকেস চাপিয়ে ওরা নেমে আসে। অনেকেই নেমে গেছে, তাই ভিড় বেশ পাতলা। বেরুবার মুখে প্রদীপ্ত দেখতে পায় যাত্রী ছাউনির দেয়ালে বড় বড় করে লেখা আছে : শ্রেণীশত্রু খতম করো- কৃষক রাজ, শ্রমিক রাজ কায়েম করো

অন্যরা এগিয়ে গেলেও প্রদীপ্ত দেয়ালের সামনে দাঁড়ায়- বড় বড় অক্ষরগুলো ওর সামনে স্পষ্ট, তবু বুঝতে কষ্ট হয়। ঐ স্লোগানটিকে ওর নিজের উপলব্ধির মধ্যে আনতে চায়, পারে

BanglaBook.org

না। ওর বিশ্বাস স্থিত হয় না। ও মিছিলের মানুষ, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। বছর দুই-আড়াই আগে মুকিত ওকে এই পার্টির সদস্য হতে বলেছিলো। বলেছিলো, মেহনতী মানুষের সংগ্রামে শামিল হতে। চেয়েছিলো, দু'জন একসঙ্গে গোপন এলাকায় কাজ করতে। প্রদীপ্ত রাজি হতে পারেনি। তারপর থেকে মুকিতের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই। মুকিত নকশাল হয়েছে। কোথায় আছে ও? কট্ করে ওঠে বুকের ভেতর, ও জানে না মুকিত এখন কোন গোপন অবস্থানে থেকে জোতদার হত্যায় ব্যস্ত– ও এখন খতিয়ে দেখছে পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক-জনতার সাথে দেশীয় সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য লড়াই করছে। জয়তু মুকিত, ও মনে মনে বলে, তোর পথ তোর কাছে মহীয়ান হয়ে উঠুক। আমার পথ আলাদা। পেছন থেকে মঞ্জুলিকা ওকে ডাকে, একি তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আসছি।

ঐ স্লোগান পড়ছিলে?

হ্যাঁ।

মঞ্জুলিকা বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এটুকু পড়তে এত সময় লাগে?

চলো। প্রদীপ্ত মৃদু হেসে পা চালায়।

ওটার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বোধহয় কোনোকিছু ভাবছিলে?

প্রদীপ্ত কথা না বলে এগিয়ে যায়। রিকশা ঠিক করা হয়েছে। ওর শাশুড়ি একটা রিকশায় বসে আছেন। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি, কি হয়েছে বাবা?

কিছু না মা। এমনি চারদিক দেখছিলাম। নতুন জায়গা তো।

প্রদীপ্ত আর মঞ্জুলিকা অন্য রিকশায় ওঠে। বাজারের মধ্য দিয়ে রিকশা এগোয়, সরু পথ। বাজার পেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ে আর একটা স্লোগান : সিরাজ সিকদার লাল সালাম। একদিনই দেখেছিলো ও সিরাজ সিকদারকে। মালিবাগের মাও-সে-তুং গবেষণা কেন্দ্রে। মুকিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। তিনি বাম দলগুলোর সঙ্গে মত-বিরোধ হওয়ায় নিজে 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নামে বিপ্লবী গোপন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর থিসিসের চারটি মূলদ্বন্দ্বের একটি ছিলো– পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ঔপনিবেশিক শাসনকে উৎখাত করতে হবে। এই থিসিস প্রকাশের কয়েক মাস পরই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচি পেশ করে প্রচারপত্র বিলি করেছিলো। ওরা বলেছিলো, চীনা, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নকশাল বাড়ি, প্যালেস্টাইনের আরবদের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে। ওরা বলেছিলো, আসুন মাও-সে-তুংয়ের শিক্ষাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি ও গ্রহণ করি 'বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'।

সেদিন ঐ প্রচারপত্রটি ও আলী আহমদকে পড়তে দিয়েছিলো। পড়া হলে প্রশ্ন করেছিলো, বাবা তুমি কি মানো যে বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস?

আলী আহমদ সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করে বলেছিলো, মানতেই যদি পারবো তাহলে একজন জেনারেল আমার মগজ ছিঁড়েখুঁড়ে খায় কেন? আমার তো মনে হয় না জনগণের বন্ধুরা কখনো বন্দুক হাতে তাদের কাছে যেতে পারবে। ঐ অস্ত্রটিই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অস্ত্রের রাজনীতির কথা চিন্তা করলে আমি শিউরে উঠি দীপু।

প্রদীপ্তর মনে হয় সেদিন বাবার চোখেমুখে ও আতঙ্কের ছাপ দেখেছিলো, যেন তিনি তাঁর চিন্তায়-অনুভবে এর পরিণতি প্রত্যক্ষ করছিলেন। সোনাখালির বিস্তৃত মাঠ, দূরে দূরে সবুজ হয়ে থাকা বসতির চিহ্ন, খাল, উপুড় হয়ে থাকা আকাশ শুধুই তাকিয়ে দেখছিলো

BanglaBook.org

ও। মগজে রেলের মতো ছুটে যাচ্ছিলো সেই প্রচারপত্রের কথাগুলো স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করতে হলে গ্রাম বাংলায় জোতদার, মহাজন ও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হবে। সামন্তশ্রেণীকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠন করতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জনতার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে এবং শাসকগোষ্ঠীকে চূড়ান্ত ভাবে উৎখাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে।

এরাই গত ফেব্রুয়ারি মাসে পল্টন ময়দানের সভায় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার এগারো দফা কর্মসূচি পাঠ করেছিলো এবং তা গৃহীত হয়েছিলো।

হঠাৎ করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে মঞ্জুলিকার হাত চেপে ধরে প্রদীপ্ত। চিন্তার রেল তখনো মগজের ভেতর দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে– এভাবে কি হবে? যারা ক্ষমতায় তারা কি ছাড়বে? প্রয়োজনে আকাশ পথে উড়ে এসে গুঁড়িয়ে দেবে সমস্ত গেরিলা ঘাঁটি। গেরিলা আক্রমণ তখন হয়ে দাঁড়াবে কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় হয়– কিন্তু স্বাধীনতার জন্য চাই একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ।

মঞ্জুলিকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কি হয়েছে দীপ? তুমি কিছুই দেখলে না। তোমার দৃষ্টি দিগন্ত ছুঁতে পারছে না।

তা নয়, দেখেছি তোমার সোনাখালি বদলে গেছে মঞ্জুলিকা। এখানে শ্রেণীশত্রু উৎখাত শুরু হয়েছে।

বুঝেছি, ঐ দেয়াল-লিখনটা পড়ার পর থেকেই তুমি সোনাখালিকে অন্যভাবে দেখছো।

ঠিকই বলেছো, আমার দৃষ্টি দিগন্তই ছুঁয়েছে।

মঞ্জুলিকা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, এখানে কি গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব দীপ?

কেন নয়?

লুকিয়ে থাকার জায়গা কৈ? নদীনালা ভরা দেশটা এতই সমতল! পাহাড় যেটুকু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় আর কতটুকু!

প্রদীপ্ত অবাক হয়ে মঞ্জুলিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি কি মনে করো?

এভাবে বোধহয় এগুনো যাবে না।

প্রদীপ্ত স্বস্তি বোধ করে। মঞ্জুলিকার হাতটা কোলের ওপর টেনে নেয়। দেখতে পায় ওর চূর্ণ কুন্তল কপালে গড়াগড়ি যাচ্ছে– চমৎকার ফুরফুরে বাতাসে দু'জনের শরীর মাখামাখি– ওদের বিশ্বাস গণমানুষের ক্ষমতায়– ওরা বিশ্বাস করে না বন্দুকের নলে। যুদ্ধ যদি হয়ই সেটা হবে জনযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ নয়। ভাবনার এই শেষ মুহূর্তে ও মঞ্জুলিকার হাতে জোরে চাপ দেয়। মঞ্জুলিকা হেসে বলে, তুমি এখনো নিজেকে সামলে উঠতে পারলে না দীপ?

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, পেরেছি।

তাহলে এই মুহূর্তে আমার হও।

আমি তোমার থেকে বেরিয়ে তো যাইনি মঞ্জুলি।

বলেছিলে না সোনাখালিতে গিয়ে প্রেমের কথা বলবে?

উঁহু এমন কড়া দিনের আলোয় খোলা মাঠে নয়।

তবে কখন?

নিশীথে শিশিরের পতনের শব্দ শুনতে শুনতে–

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মঞ্জুলিকা। বলে, গাঢ় অন্ধকারে নাকি জ্যোৎস্নায়?

দুটোতেই, দু'রকম উপলব্ধির ভেতরে। চলো আমরা সোনাখালিকে আমাদের জীবনে গেঁথে ফেলি।

BanglaBook.org

কিভাবে?

এখানেই তো আমরা একটি ভ্রূণকে সজীব করে তুলতে পারি– সোনাখালিকে আমরা শুধু স্মরণের আবরণে নয় আমাদের শরীরের ভেতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা কোনো সজীব মাংসপিণ্ডের মধ্যে গেঁথে রাখতে পারি– বলতে পারি সোনাখালি আমাদের মেয়ে অথবা ছেলে।

থরথর করে কেঁপে ওঠে মঞ্জুলিকার শরীর। প্রবল আবেগের স্রোত বয়ে যায় দেহে– জেগে ওঠে সোনাখালি খাল, বেগুনি ফুলে ভরা অড়হরের লতা– ধানক্ষেত– আকাশ– শ্রেণীশত্রু খতম করার স্লোগান– জেগে ওঠে মঞ্জুলিকার অস্তিত্ব, যেন ও নিজের ভেতর শুনতে পায় শিশুর পদধ্বনি– ওর নারীজীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে, মাতৃত্বের গর্ব ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রদীপ্ত খানিকটা আহতস্বরে বলে, তুমি কিছু বললে না মঞ্জুলি?

ও গভীর নিশ্বাস নিয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করে, দীপ তুমি যা বললে তার চেয়ে অন্য কোনো গভীর আবেগময় প্রেমের ভাষা আমি শুনতে চাই না– এটিই শ্রেষ্ঠ, এটিই।

তাহলে তুমি রাজি?

মঞ্জুলিকা সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ে।

তাহলে আজ রাত থেকে, প্রতিরাতই।

প্রতিরাতই?

হ্যাঁ, আমরা তো জানি না ও কবে আমাদের ডাকে সাড়া দেবে!

প্রদীপ্তর গাঢ় কণ্ঠের উচ্চারণে মঞ্জুলিকা অভিভূত হয়– স্বপ্ন ওকে ঘিরে রাখে– ও স্বপ্নের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না– এ এক গভীর সত্য যে ওদের জীবনে একজন শিশু আসবে। ওদের ভাবনা যদি প্রকৃতি অনুভব করতে পারে তাহলে সোনাখালির বাতাসে বয়ে যাচ্ছে একজন শিশুর আগমনের স্বপ্ন-দেখার বার্তা– পানিতে, মৃত্তিকায়, ঘাসে বয়ে যাচ্ছে একই বার্তা। প্রদীপ্ত আবার বলে, এখনই আমাদের মিলন যদি সার্থক হয় তাহলে আগামী বছরের মার্চের কোনো একসময় ও ভূমিষ্ঠ হবে।

মঞ্জুলিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সে সময়ে আমি সোনাখালিতে চলে আসবো। এটাই হবে ওর জন্মস্থান।

প্রদীপ্ত উৎফুল্ল হয়, দারুণ বলেছো। হাসপাতাল নয়। এখানেই, এক মাটির ঘরে তুমি ওকে জন্ম দেবে। আমি প্রবল উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করবো আঙিনায়। প্রতিটি মুহূর্তে আমার মনে হবে আমি কেন নবজাতকের কান্না শুনছি না।

মঞ্জুলিকা স্বপ্নের ঘোরে বলে, কেমন যে হয়ে গেলাম আমরা। এখানে আসার আগে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি, এখনই মা হবো। ভাবিনি নিজেদের এভাবে বুঝে ওঠার জন্য সোনাখালিতে আসার প্রয়োজন ছিলো।

প্রদীপ্ত ওর পিঠের ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। মঞ্জুলিকা বিড়বিড়িয়ে বলে, মা হবো। মেয়ে হলে পূর্ণ, ছেলে হলে অজেয়।

ততক্ষণে ওরা পৌঁছে গেছে ওদের গন্তব্যে– সামনেই ওদের কুদ্দুস চাচার বাড়ি। বাড়ির সামনে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়।

বিকেলে রোদ কমে গেলে কুদ্দুস ওদের দু'জনকে নিয়ে হাঁটতে বের হয়। ধানক্ষেতের আল দিয়ে ওরা যাচ্ছে– ঘাসের মধ্যে সাদা ফুলের গুচ্ছের মতো শামুকের ডিম– কোথাও নালা দিয়ে বয়ে যায় স্বচ্ছ পানি– তিতপুঁটি ভেসে বেড়ায় সে পানিতে। গাঁয়ের লোকজন সালাম দেয়, দাঁড়িয়ে কুশল জিজ্ঞেস করে। সবাই তাকে পেসিডেন সাব বলে। তিনি তিনবার এই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন– গাঁয়ে তার প্রতাপ-প্রতিপত্তির

BanglaBook.org

শেষ নেই। কুদ্দুস আগে আগে হাঁটছে। প্রদীপ্ত পেছন থেকে দেখতে পায় তার চওড়া শরীর, শুনতে পায় গমগমে ভরাট কণ্ঠ– মাঝে মাঝে হাসি শুনে চমকে ওঠে ও। যারা তাকে সালাম দিচ্ছে, কথা বলছে, ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ও। ভাবে, এই লোকগুলো কি কোনোদিন বুঝবে যে কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট তাদের শ্রেণীশত্রু? এই লোকটিকে খতম করলে ওদের শোষণ-বঞ্চনার অবসান হবে? কুদ্দুস খানিকটা এগিয়ে গেলে এই কথা ও মঞ্জুলিকাকে বলে। মঞ্জুলিকা মাথা নাড়ে। ফিসফিসিয়ে বলে, আমিও এসবই ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে আমরা এক লড়াইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি এখানে বেশিদিন থাকতে চাই না দীপ।

এখন আমরা ইচ্ছে করলেই হুট করে চলে যেতে পারবো না। মা রাজি হবেন না। এরাও ছাড়বে না।

কুদ্দুস বেশ দূর থেকে ওদের ডাকে, কি হলো তোমরা দেখি হাঁটতেই পারছো না?

দু'জনে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়। মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি– চারদিকে দিগন্ত, উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা আকাশের মাঝখানে তিনি এক বিশাল বপুর মানুষ। বাতাসে পাঞ্জাবি পতপত করে ওড়ে কখনো-কখনো– এলোমেলো হয়ে যায় একমাথা সাদা ঝাঁকড়া চুল। ওরা কাছে এলে বলেন, তাকিয়ে দেখো চারপাশে, তোমাদের যতদূর চোখ যায় ততোদূর পর্যন্ত আমার জমি।

প্রদীপ্ত কৌতুক করে বলে, চাচা দৃষ্টিকে যদি লাটাইয়ের সুতোর মতো ছেড়ে দেই ততদূরও কি আপনার জমি?

কুদ্দুস ওর কথা গায়ে না মেখে বলতে থাকে, বাবাজী ছেড়েই দেখো না যে তোমার দৃষ্টির লাটাইয়ের সুতো কতদূর যায়? বলতে পারো এটা আমার একটা রাজ্য। এখানে দেড়শ-দুইশ কামলা খাটে। কত দূর দূর গাঁয়ের লোকেরা আমার এখানে আসে। চার মাস থাকে। আমি ওদের পরিবারের জন্য আগাম মজুরি দিয়ে দেই, যেন ওরা ঘন-ঘন বাড়ি যেতে না চায়। ওদের পরিবারের অসুবিধা না হয়। তোমরা তো জানো না, আমি আছি বলেই ওরা বেঁচে আছে। নইলে ওরা কোথায় যেত? সবার পক্ষে কি শহরে গিয়ে কাজ করা সম্ভব? তাই ওরা আমাকে মানে, ভালোবাসে। তোমরা তো আসতে দেখেছো সোনাখালি বাজারে কত সোনার দোকান। দোকানিরা লুটপাটের ভয়ে আমার বাড়িতে সোনা রেখে যায়। আমি ওদের ধন হেফাজত করি। আর নকশালরা বলে আমি ওদের শোষণ করি। ওদের মজুরির পঞ্চাশ ভাগ আগাম দিয়ে ওদেরকে কাজ করতে বাধ্য করি। এটা জুলুমবাজি।

গমগমে ভরাট গলায় হা-হা করে হেসে ওঠে বিশাল বপুর মানুষটি। পিলে চমকে ওঠে প্রদীপ্তর। মঞ্জুলিকা ভয় পায়। মানুষটি সামনে না থাকলে ও বুকে থুতু দিতো। কুদ্দুস হাসির দমক কমিয়ে বলে, আমি ওদের শ্রেণীশত্রু। ওরা দু'তিনবার আমাকে চিঠি দিয়েছে যেন শেষ খাওয়া খেয়ে রাখি। আমিও শত্রুকে ছাড়বো না। সে শত্রু সাপই হোক, আর মানুষই হোক।

কিভাবে লড়বেন?

আমি সঙ্গে বন্দুক রাখি। রাতেও মাথার কাছে বন্দুক রেখে ঘুমোই।

প্রদীপ্ত বলে, বন্দুক ব্যবহারের যদি সুযোগ না হয়?

কুদ্দুস বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে তেতো কণ্ঠে বলে, তোমরা এসব বুঝবে না। আমার কৌশল আছে। প্রদীপ্ত প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়, চাচা আপনি নাকি খুব ভালো শিকার করেন?

কুদ্দুস উদ্ভাসিত মুখে বিনয়ের ভঙ্গিতে বলে, এই একটু-আধটু আর কি। তবে নিশানা কখনো ভুল হয়নি। তোমাকে নিয়ে যাবো সুন্দরবন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে– হালকা আলোয় কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে চারপাশের দিগন্তরেখা।

BanglaBook.org

মঞ্জুলিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ইস কী সুন্দর। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে থাকবো। আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

আঁতকে ওঠে কুদ্দুস, না, না তা হবে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আমি রাতে বাইরে থাকি না। তোমাদেরকেও থাকতে দেবো না। চলো, তোমার মা ভাববে।

দু'জনকে তাড়া দিয়ে আগে আগে হেঁটে যায় ও। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু কে জানে যখন-তখন ভরে উঠতে পারে মেঘে– তবু দু'জনের ইচ্ছে করছে এই মাঠে ঘুরে বেড়াতে। ওরা ভাবছে কুদ্দুস চাচা চলে যাক, ওরা ধীরেসুস্থে ফিরবে। বৃষ্টি যদি এসে যায় আসুক, ওটা আরো মজার হবে– দু'জনে একসঙ্গে ভিজবে, ময়ূরের মতো পেখম খোলা আর কি! কিন্তু তা হয় না, কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট ফিরে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে ওদের ডাকে, ফেরার জন্য তাড়া দেয়।

প্রদীপ্ত বলে কণ্ঠ তো নয়, যেন কোনো ধাতব দ্রব্যের পতনের শব্দ। কানে তালা লেগে যায়। উপায় নেই, ফিরে চলো।

তোমার চাচা কি ভাবছেন যে নকশালরা আমাদেরকেও মেরে ফেলবে?

আহ্ দীপ, এসব কি বলছো।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জুলিকা মৃদু হেসে বলে, মেজাজ খারাপ করো না প্লিজ। আজ রাত শুধু তোমার আর আমার। মঞ্জুলিকার এমন কথার পরও প্রদীপ্তর মেজাজ খারাপ থাকে। বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই টিপটিপিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। মঞ্জুলিকাকে বাড়ির মেয়েরা ঘিরে ধরলে প্রদীপ্ত ওদের জন্য ঠিক করে রাখা ঘরে আসে। কাঠের দোতলা বাড়ি। ধানের মটকার পাশ দিয়ে একটি আলগা সিঁড়ি আছে ওপরে ওঠার জন্য। খুব সাবধানে উঠতে হয়, নইলে পড়ে যাবার ভয় ষোল আনা। ওপরে বেড়া দিয়ে ভাগ করা আছে ছোট ছোট কুঠুরি। চাচাতো বোন জ্যোৎস্না প্রদীপ্তর পিছে পিছে আসে। ঘর ও গুছিয়ে রেখেছে। বিছানায় চমৎকার নকশিকাঁথা পাতা, ফুলতোলা বালিশ। হারিকেন জ্বলছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর গ্লাসে কতগুলো গাঁদা ফুল সাজিয়ে দিয়েছে, দুটো বেলি ফুলের মালাও আছে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ হয়। জ্যোৎস্না বলে, আপনার পছন্দ হয়েছে দুলাভাই?

ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তুমি দারুণ মেয়ে জ্যোৎস্না। মালা তুমি গেঁথেছো?

হ্যাঁ। গন্ধটা সুন্দর না?

বেলির সঙ্গে অন্য কোনো ফুলের গন্ধের তুলনাই হয় না।

আমিও তাই ভাবি।

জ্যোৎস্না খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, আপনারা শীতকালে এলে আরো মজা হতো। শীতকালে আমাদের উঠোনে গান হয়, পুঁথি পড়া হয়। অনেক রাত পর্যন্ত আসর জমে থাকে। বাবা বড় হ্যাজাক ভাড়া করে নিয়ে আসে। অনেক লোকে উঠোন ভরে যায়। এত মানুষ গান শুনতে ভালোবাসে কেন দুলাভাই?

প্রদীপ্ত একটুক্ষণ ভেবে বলে, আমার মনে হয় সুরের মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। গান মানুষের আনন্দ আর দুঃখ। তুমি গান জানো জ্যোৎস্না রাণী?

না। ও লজ্জা পায়। তবে আমার খুব শিখতে ইচ্ছে করে। শুনে শুনে আমি গাইতে পারি। আমাদের গাঁয়ের বিমল এমন সুন্দর রয়্যানি গান গায় না, শুনলে চোখে পানি আসে।

বিমলকে তোমার ভালোলাগে?

হ্যাঁ, খুব ভালোলাগে। ওর মতো গানের গলা এ গাঁয়ে আর কারো নেই।

প্রদীপ্তর মনে হয় জ্যোৎস্নার চেহারায় চকিত ছায়া খেলে গেলো– খানিকটা দীপ্তি,

BanglaBook.org

হারিকেনের মৃদু আলো যাকে আড়াল করতে পারেনি। ও আকস্মিকভাবে জিজ্ঞেস করে, তুমি কাউকে ভালোবাসো জ্যোৎস্না রাণী?

এমন আকস্মিক প্রশ্নে বিমূঢ় হয়ে যায় ও। লজ্জায় মাথা নিচু করে, মুহূর্তে আবার দরজার দিকে তাকায়। না, আশেপাশে কেউ নেই।

আমি কাউকে বলবো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো জ্যোৎস্না।

ও ফিসফিসিয়ে বলে, বিমল।

ওহ্, তাই। তুমি তো ওর কাছেই গান শিখতে পারো।

চুপ, আস্তে দুলাভাই। বাবা জানলে আমাকে দু'টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। ও প্রদীপ্তর পায়ে হাত রাখে, আপনি কাউকে বলবেন না দুলাভাই।

ছি, ছি কখখোনো না।

বাবা জানলে বিমলকেও মেরে ফেলবে। ও বিধবা মায়ের একটাই ছেলে। ওর কিছু হলে ওর মাও বাঁচবে না।

বিমল জানে তোমার কথা?

জানে। এজন্য ও আর এদিকে আসে না। ও এও জানে যে ওর পক্ষে আমাকে ভালোবাসা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতো। আমি যখন মঠবাড়িয়ায় কলেজে যাই তখন যাওয়া-আসার পথে কখনো-সখনো দেখা হয়। ও খুব লাজুক ছেলে।

প্রদীপ্তর বেশ ভালোই লাগে জ্যোৎস্নার প্রেমের গল্প শুনতে। আজ ও একজন নীরব শ্রোতা পেয়েছে– ওর বুক তো ফেটে যায়, কিন্তু কারো কাছে মুখ খোলার উপায় নেই। ও বলতে থাকে, আমরা জানি আমাদের কোনোদিন বিয়ে হবে না। বিমল আমার জীবনে একটা দুঃখের গান হয়ে থাকবে দুলাভাই।

প্রদীপ্ত চমকে ওঠে। মেয়েটির গভীর অনুভূতি ওকে নাড়িয়ে দেয়। বলে, তোমরা দু'জনে পালিয়ে ঢাকায় চলে এসো। আমি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।

শিউরে ওঠে জ্যোৎস্না। ম্লান হেসে বলে, আপনি তো বাবাকে চেনেন না। বাবা ঠিকই আমাদের খুঁজে বের করবে। এবং গলায় দড়ি লাগিয়ে টেনে নিয়ে আসবে। বিমল হিন্দু। তাছাড়া যে ছেলে আসরে গান গেয়ে বেড়ায়, যার চালচুলোর ঠিক নেই, তার সঙ্গে তো কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। হলেও ছেড়ে দেবে না। শাস্তি পেতেই হবে। এতকিছু জানার পরও ওকেই কেন আমার মন চায় দুলাভাই?

এটাই বুঝি জীবনের ধর্ম। জীবন নিয়ম মানতে পারে না।

সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেলে জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়ায়, যাই। আপনার কিছু লাগলে আমাকে ডাকবেন।

জ্যোৎস্না চলে গেলে প্রদীপ্ত হারিকেন উস্কে দেয়। মঠবাড়িয়া কলেজের ছেলেমেয়ের বের করা একটা ম্যাগাজিন জ্যোৎস্না খাটের ওপর রেখে দিয়েছিলো। ও টেনে নিয়ে পাতা ওল্টায়। পড়ার তেমন কিছু নেই। রেখে দেয়। ছোট্ট এই কুঠুরিটা কেমন দম-আটকানো। খাটই ঘরের প্রায় সবটুকু দখল করে রেখেছে। খাটের পাশে একটা জানালা। দিনের বেলা দেখেছে জানালার সামনে বিশাল এক কাঠবাদাম গাছ। হাত বাড়ালে পাতা ছোঁয়া যায়। ও জানালার কপাটে পিঠটা হেলিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে।

হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। বাদাম পাতার ওপর টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকেছে। বৃষ্টি ওর গায়ে লাগতেই প্রদীপ্তর মনে হয় জ্যোৎস্না যতটা আবেগপ্রবণ, তার চেয়ে বেশি বাস্তববাদী। ও প্রেমের জন্য মরতে রাজি নয়। তাহলে কি ও সত্যিকার প্রেমিক– জীবনভর স্মরণ করবে কৈশোরের প্রথম ভালোবাসা? একা একা হো-হো করে হেসে ওঠে প্রদীপ্ত। এ

BanglaBook.org

এক মজার বয়স, একে ফেলাও যায় না, গেলাও যায় না। তাহলে কি জ্যোৎস্নার এটা শুধু বয়সের আবেগ? প্রেমের নয়? প্রদীপ্তর মনে হয় এটা প্রেম নয়– আসলে বিমলকে নিয়ে জ্যোৎস্নার দুঃখের বিলাস আছে, এটাই ওর আনন্দ। বাবা ওকে মেরে ফেলবে কি ফেলবে না, এটা নিয়ে প্রদীপ্তর দ্বিধা আছে– এটা নিশ্চিত কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট এ বিয়েতে বাধা দেবে, এ বিয়ে তার জন্য কোনো সামাজিক সম্মান নয়। তাই বলে মেরে ফেলবে এবং সে কল্পিত ভয়ে জ্যোৎস্না বিমলকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও চাইবে না, এটা বোধহয় যুক্তিতে পড়ে না। প্রদীপ্তর মনে হয় জ্যোৎস্না খেলায় মেতেছে– বাবাকে প্রেমের পথে বিশাল বাধা ভেবে নিজের সঙ্গে নিজে খেলছে। প্রদীপ্তর মজাই লাগছে। জ্যোৎস্নার এখন খুনসুটির সময়– ও প্রদীপ্তকে বুড়ি বানিয়েছে এবং সে বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটুপর এক কাপ চা নিয়ে জ্যোৎস্না আসে।

দুলাভাই চা?

তুমি কি করে জানলে যে আমি মনে মনে চা চাইছিলাম?

জ্যোৎস্না হেসে এ প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা দুলাভাই আপনি আমাকে জ্যোৎস্না রাণী বললেন কেন? আমার নাম তো শুধু জ্যোৎস্না।

তুমি যে আমার শালী, সেজন্য জ্যোৎস্নার সঙ্গে রাণী আমার কাছ থেকে তোমার পাওনা হয়েছে।

প্রদীপ্তর উত্তর গ্রাহ্য না করে ও আবার বলে, আমার মনে হয় বিমল একদিন বলতে চেয়েছিলো, আমি যদি চাঁদ হই, তাহলে তুমি আমার জ্যোৎস্না রাণী।

কিন্তু কথাটা বিমলের তো বলা হয়নি?

না, তা হয়নি। তবে ও বলবে।

হো-হো করে হেসে ওঠে প্রদীপ্ত। বুঝে যায় রাণী শব্দটি ওর মনে ধরেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ও এটা এভাবে কল্পনা করে নিয়েছে। জ্যোৎস্না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, হাসলেন যে?

তুমি একটা মজার মেয়ে, তাই।

আপনি কাউকে কিন্তু কিচ্ছু বলবেন না। ঠিক তো?

হ্যাঁ, একদম ঠিক।

জ্যোৎস্না চলে যায়। প্রদীপ্ত জানালা দিয়ে হাত বাড়ায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ মেঘলা। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কাছেধারে কোথাও বসে একটি পেঁচা ডাকছে। প্রদীপ্তর ভীষণ মন খারাপ হয়– মনে হয় ও কেন এত বছরের শহুরে জীবনে একদিনও পেঁচার ডাক শোনেনি। শহরে কি পেঁচা থাকে না? নাকি যেখানে বসে ডাকে সেখানে ওর যাওয়া হয় না? এমন বুক থমথম করা ডাক শুনতে কার না ভালো লাগে!

পরমুহূর্তে ও ভয়ার্ত চোখে নিজের দিকে তাকায়। এ বাড়িতে একজন মানুষ অসুস্থ, তাকে দেখতে ওর শাশুড়ি এসেছে। ও এসেছে বেড়াতে। অসুস্থ মানুষটিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে যাবার চিন্তা করছেন ওর শাশুড়ি। কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট রাজি হয়েছেন। আয়োজন চলছে যাবার। দু'একদিনের ভেতর ওরা চলে যাবে। তবুও ওর সময় ভালো কাটছে। কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করে ও। তবে কি আমার সময় নষ্ট করবো? আমি কি পেঁচাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলবো, পেঁচা তুই ডাকিস না। তোর ডাকে কোনো মঙ্গল নেই বলেই তো কতকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে। তোর ডাক আমার ভালো লাগবে কেন? দূর হ, দূর হ। তারপরও পেঁচার ডাক থামে না। অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত প্রদীপ্ত আর মঞ্জুলিকা পেঁচার ডাক শুনতে পায়।

পরদিন সোনাখালি বাজার, মঠবাড়িয়া ঘুরে দুপুরে অনেকক্ষণ পুকুরে সাঁতার কেটে চোখ লাল করে বাড়ি ফেরে প্রদীপ্ত। সঙ্গে বাড়ির ছেলেরা জুটেছে– সবাই মিলে বেশ হৈ-

BanglaBook.org

হল্লা করছে, ছোটরা প্রদীপ্তর ভক্ত হয়ে গেছে। পুকুরঘাটে বসে ও মানিককে জিজ্ঞেস করেছিলো, এ গাঁয়ে সবচেয়ে ভালো গান করে কে?

মানিক জবাব দেবার আগেই চার-পাঁচজন চেঁচিয়ে বলে, বিমল।

তোরা ওকে ধরে নিয়ে আসতে পারবি? ওর গান শুনবো।

মানিক মাথা নাড়ে, ও তো গাঁয়ে নেই। টিকিকাটা গাঁয়ে গেছে রয়্যানি গাইতে।

পরশুদিন তো আমরা চলে যাবো। তাহলে কি ওর গান শোনা হবে না?

সবাই মাথা নাড়ে, বোধহয় হবে না। ও কোথাও গেলে কবে ফিরবে তার কিছু ঠিক থাকে না।

তাহলে আমরাই যাই না কেন টিকিকাটা?

হ্যাঁ, চলেন। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, কখন যাবেন?

খেয়েদেয়ে বিকেল বেলা।

হুররে। ছেলেরা যে যার মতো ছুট দেয়। প্রদীপ্ত ঘরে ফিরলে মঞ্জুলিকা চোখ গরম করে, আজ রাতে ঠিক তোমার জ্বর আসবে।

আসুক, আসুক। শ্বশুরবাড়িতে অসুখ হওয়া ভীষণ মজার।

বলতে বলতে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। মঞ্জুলিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে, এখানে এসে তুমি দেখছি বালক হয়ে গেছো।

দারুণ বলেছো। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মঞ্জুলি। সময় বিশেষে আমি বালক হতে চাই। এখন আমার তেমন সময়। আজ বিকেলে আমি টিকিকাটা যাবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

এসব প্রোগ্রাম কখন হলো?

এসব প্রোগ্রামের মা-বাবা নেই। যখন-তখন হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না বলো?

টিকিকাটা কেন যাবে সেটা বলবে তো?

বিমল নামের এক গায়ক আছে সেখানে। ও দারুণ গান গায়। ওর গান শুনতে যাবো।

আমার এত মাথা খারাপ হয়নি। আমি যাবো না।

না গেলে যা মিস করবে তার জন্য সারাজীবন আফসোস করবে।

কচু। মঞ্জুলিকা ভেংচি কাটে।

তখন আমার সঙ্গে রাগ করতে পারবে না কিন্তু!

বয়ে গেছে রাগ করতে। তোমার যেখানে খুশি সেখানে যাও।

মঞ্জুলিকার কণ্ঠ অভিমানে আর্দ্র হয়ে যায়। প্রদীপ্ত দু'লাফে সিঁড়ি টপকাতে গিয়ে হোঁচট খায়। অস্ফুট আর্তনাদ, উঃ মাগো।

মঞ্জুলিকা ছুটে আসে। পেছনে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে হাসে। বলে, আপার সঙ্গে ঝগড়া করার ফল পেলেন তো!

কোথায় লেগেছে দেখি? একটা কিছু না বাধিয়ে তুমি ছাড়বে না।

সামান্য ব্যথা পেয়েছি। জ্যোৎস্না যতটা আশা করেছিলো, অতটা নয়। তুমি আমার সঙ্গে একটু উপরে আসো না মঞ্জুলি।

ওঠো, আসছি।

আপার দরদ একটুও কমে না দেখছি।

চুপ কর, দুষ্টু মেয়ে।

দু'জনে হাসতে হাসতে উপরে উঠে যায়। জ্যোৎস্না সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওর ইচ্ছে করে কুড়োল এনে সিঁড়িটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে। আর ঐ কাঠের

BanglaBook.org

পাটাতনে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়া যেত তাহলে দুটোই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মন্দ হতো না। জ্যোৎস্নার ভুরু কুঁচকে থাকে।

কুদ্দুস প্রথমে প্রদীপ্তকে যেতে দিতে চায়নি– ঢাকা থেকে একটি ছেলে এসে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবে এটা তার পছন্দ না। কিন্তু প্রদীপ্ত অনড়, যাবেই।

কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই।

ও সপ্রতিভ জবাব দেয়, রাতে তো ঘুমুবো না। সারারাত গান শুনবো। ভোররাতের দিকে যদি গান শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসবো।

তারপরও কুদ্দুস চুপ করে থাকে। প্রদীপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলিকার মা বিষয়টি চুকিয়ে দেয়ার জন্য বলে, যেতে দেন ভাইজান। ও অন্যরকম ছেলে– হৈ-চৈ ভালোবাসে। না যেতে দিলে ওর বুক ফেটে যাবে।

কুদ্দুস ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, জানতাম বাপ-মা ছেলেপেলের মাথা খায়, শাশুড়িও যে খায় এটা আমার জানা ছিলো না।

উপস্থিত সবার মধ্যে হাসির হল্লা ওঠে। মঞ্জুলিকার মা বিব্রত হয়ে মৃদু হাসে।

কুদ্দুস বলে, ঠিক আছে যাক। যার ধন সে যদি বলে তাহলে আমি বাধা দেবার কে?

উপস্থিত সবার আর এক দফা হাসির হল্লার মধ্যে প্রদীপ্ত ঘর ছাড়ে। বাকিরা তো বাইরে অপেক্ষা করছিলো। ওকে যেতে দেখে হিপ্ হিপ্ হুররে করতে করতে এগিয়ে যায়। মঞ্জুলিকা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। প্রদীপ্ত পেছন ফিরে ওকে দেখে হাত নাড়ে। কে একজন ওর হাতে একটা সাদা রুমাল ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও প্যাকেট থেকে রুমাল বের করে ওড়াতে থাকে। যতক্ষণ ওরা পথের বাঁকে আড়াল না হয় ততোক্ষণ রঙিন রুমালগুলো উড়তেই থাকে। দৃশ্যটি মঞ্জুলিকার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

সে সন্ধ্যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মঞ্জুলিকার মনে হয় এত বৃষ্টি ও আগে দেখেনি– মুহূর্তের মধ্যে উঠোনে পানি জমে গেছে। চাচীর শরীর খারাপ। প্রবল হাঁপানির কারণে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা তাকে ঘিরে বসে আছে। পিঠ মালিশ করে দিচ্ছে ওর মা। ওরা সবাই জানে গ্রামে এর কোনো ওষুধ নেই। এমন রাতে বাজারের ডাক্তার আসতে রাজি হবে না। কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট ঘরে পায়চারি করছে– সে উদ্বিগ্ন এবং একই সঙ্গে বিরক্ত। বৃষ্টি ওর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। টিনের চালে এমন একটানা ঝমঝম শব্দ অসহনীয়। একসময় আস্তে আস্তে চাচীর শ্বাসপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, বৃষ্টি হলেই আমার কষ্ট বাড়ে। মঞ্জুলিকার মনে হয় তার ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চেহারায় ঘাম জমে আছে, তাকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে। মঞ্জুলিকার মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আল্লাহ যে কেন আমাকে তুলে নেয় না বুবু।

কুদ্দুসের তিক্তকণ্ঠ ঘোঁত করে ওঠে, আল্লাহ্ কি তোমার বন্ধু যে তোমাকে তার কাছে নেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠবে?

মঞ্জুলিকা চমকে তার দিকে তাকায়– কেমন নিষ্ঠুরের মতো শোনালো তার কণ্ঠ। চাচা কি চাচীকে নিয়ে বীতশ্রদ্ধ?

মঞ্জুলিকার মা তাড়াতাড়ি বলে, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করেন ভাইজান। ভাবীকে নিয়ে এখন তো আর ভয় নেই।

একই ভঙ্গিতে কুদ্দুস উত্তর দেয়, ভয় তো ফুরাবে না। কতকাল ভয় টেনে বেড়াবো?

মঞ্জুলিকার মা রেগে যায়, তবু ঠাণ্ডা মাথায় বলে, ভাইজান আপনি ভাত খেয়ে ঘুমুতে যান।

কুদ্দুস ভাত খাবার জন্য পাশের ঘরে যায়, সঙ্গে জ্যোৎস্না। মঞ্জুলিকার ভীষণ মন

BanglaBook.org

খারাপ হয়। চাচী চুপিচুপি কাঁদছে। আঁচলে চোখ মুছছে। ফিসফিসিয়ে বলে, আমার অসুখ বেশি হওয়ার পর থেকে জ্যোৎস্নার বাপ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। মানুষটা আগে ভালোই ছিলো।

মঞ্জুলিকার মা তাকে নানা ধরনের সান্ত্বনা দিচ্ছে, সেসব কথা কানে যায় না মঞ্জুলিকার। ওর মনে হয় মানুষটা কখনোই ভালো ছিলো না। যৌবনে যদি ভালো থেকে থাকে তো সেটা নিজের প্রয়োজনে ছিলো, এ বয়সে যদি খারাপ হয় সেটাও নিজের প্রয়োজনে। আসলে মানুষটা নিজের দিকটি বেশি বোঝে। ও ওর নিজের বাবা-মার সম্পর্ক দেখেছে– প্রদীপ্তর বাবা-মার সম্পর্ক দেখেছে– তারা তো কেউ কাউকে এমন তিক্ত কণ্ঠে কথা বলে না। এমন রূঢ়ভাবে আঘাত করে না। তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক, একতরফা নয়। কিন্তু কুদ্দুস চাচা-চাচীর সম্পর্ক একতরফা– প্রভু-ভৃত্যের এবং ব্যাপক অর্থে শোষণের, তাই এমন চিড় ধরেছে। এসব ভেবে মঞ্জুলিকার প্রথমে রাগ হয়, তারপর মন খারাপ। প্রদীপ্তও কি পরিণত বয়সে এমন হয়ে যাবে? এমন বৃষ্টিমুখর রাতে ওকে একলা রেখে চলে যাওয়ার তো কথা ছিলো না। সোনাখালির রাতগুলো ওদের দু'জনের হবে এমনই তো কথা ছিলো। তাহলে আজকের রাত কেন দু'জনের দু'রকম হয়ে গেলো? অভিমানে মঞ্জুলিকার চোখ ছলছল করে, গলার কাছটা ধরে থাকে। ঘুম আসে না। মাঝে বৃষ্টির তোড় কমেছিলো, আবার প্রবল হয়েছে। মুষলধারে পড়ছে। একেই কি গাঁয়ের বর্ষা বলে? এত বৃষ্টির মধ্যেও ভ্যাপসা গরম কমে না। মঞ্জুলিকা জানালা খুলে রাখে। হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছে। ঘুম আসে না। বৃষ্টির শব্দ মঞ্জুলিকার অভিমান কমিয়ে দেয়– বারবারই মনে হয় প্রদীপ্তর গান শোনা হচ্ছে না– এমন বৃষ্টিতে কোথায় আর আসর বসবে? পরক্ষণে এটা ভাবতে ভালোলাগে ওর যে বাজারের কোনো একটি চালার নিচে আসর বসিয়েছে ও। গানের পর গান গাইছে বিমল। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর কণ্ঠও মুষলধারে বর্ষণ করে যাচ্ছে। কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে প্রদীপ্তর হৃদয়। এমন মধুর কিছু ভাবতে ভাবতে ওর চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণে ওর মনে হয় নিচে যেন অনেক মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে, চাপা কণ্ঠস্বর। ও কান খাড়া করে। কেউ একজন কামলাদের ডাকছে, এ্যাই দরজা খোলো, আমরা থানা থেকে এসেছি।

থানা থেকে?

মঞ্জুলিকা জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়। মনে হয় নিচে অনেক লোক, অন্তত বিশ-পঁচিশ জন। থানা থেকে এত লোক কেন? কে একজন চারদিকে টর্চ ফেলে। এত রাতে ওদের কি দরকার? এই বৃষ্টির মধ্যে? ওরা তো সকালেও আসতে পারতো। মঞ্জুলিকা অন্ধকার হাতড়ে দরজা খোলে। চাচাকে ডাকবে কি?

ও কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই সিঁড়িতে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ– ছোট সিঁড়িটা বুঝি ভেঙে পড়বে– কাঠের পাটাতন নড়ে ওঠে।

আমরা থানা থেকে এসেছি। কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট কই?

দড়াম করে দরজায় লাথি পড়ে। টর্চের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মঞ্জুলিকা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওই শালা। শুয়োরের বাচ্চা বেরিয়ে আয়। আজ তোকে জবাই করা হবে।

মঞ্জুলিকা থরথর করে কেঁপে ওঠে। জবাই করা হবে? ওরা কারা? নকশাল না তো? ভাবতেই ও পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দু'হাতে দরজা আঁকড়ে ধরে। দেখতে পায় টর্চের একফালি আলো এসে লম্বালম্বি মেঝেতে পড়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেউ একজন উঁকি দেয়। কাউকে দেখতে না পেয়ে সরে যায়। মঞ্জুলিকা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করে, পারে না।

BanglaBook.org

দোতলার ঘরে কেউ আসে না বলে কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট কখনো দরজা বন্ধ করে ঘুমোয় না, আজও দরজা খোলা। নিচ থেকে কেউ ডাকলে শুনতে পাবে না বলে এই ব্যবস্থা। ছেলেরা টর্চের আলো ফেলে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েকজন ঘরে ঢুকে গেছে। মাথার কাছে রাখা বন্দুকটা হাতে নেয়ারও সুযোগ হয়নি। তার আগেই ওরা ক্ষিপ্র হাতে ওটা দখল করে। প্রেসিডেন্টের গভীর ঘুম ছিলো, কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেলো ও বন্দী।

আমরা আজ শ্রেণীশত্রু খতম করবো।

ছোট ঘরটায় ওদের কণ্ঠ ছুটে যাওয়া গুলির মতো সাঁই করে বেরিয়ে যায় এবং লক্ষ্যভেদ করে। বিপুলদেহী কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছে, কপালের ঘাম টপটপিয়ে পড়ে। কিন্তু মনোবল নষ্ট হয়নি। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ লড়াইটা লড়বে বলে প্রস্তুতি নেয়। একজন ওর মুখের ওপর টর্চ মারে– ও দৃষ্টি ঘোরায় না, মাথা নড়ায় না, তাকিয়ে থাকে সরাসরি, কেননা এই মুহূর্তে ও চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে চায় না। ওর খালি হাত নিশপিশ করছে এবং খালি হাতে লড়াই করবে বলেই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে কষে একটা লাথ্থি দেয়। ছেলেটি ছিটকে পড়ে।

এত সাহস! মরণকামড় দিতে চায়।

কুদ্দুস দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, লড়াই করেই মরতে চাই কুত্তার বাচ্চা।

তোকে লড়াই করাচ্ছি বাহেনচোত

চার-পাঁচজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। দু'হাত পেছনে নিয়ে মুচড়ে ধরে রাখে, তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধে। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়তে থাকে কুদ্দুস। আকস্মিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে ওঠার পর এখন তার মুখে খিস্তি-খেউড়। সমানে চিৎকার করে এবং নিচের কামলাগুলোকে ডাকতে শুরু করে।

শুয়োরের বাচ্চা চুপ কর। তোর ডাকে কেউ আসবে না। সবগুলো বন্দুকের মুখে বসে আছে।

একজন কুদ্দুসের ব্যবহৃত গামছা দিয়ে ওর মুখ বেঁধে দেয়। তারপর পাছায় একটা লাথ্থি দিয়ে বলে, চল, খানকির পুত।

মঞ্জুলিকা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে ওরা। খুব সাবধানে পা ফেলছে, নইলে সিঁড়ির ফাঁকে পা ঢুকে যেতে পারে। নিচতলায় বাড়ির মেয়েরা কান্নাকাটি করছিলো। ওদের নামতে দেখে সব চুপ। কারো মুখে মৃদু আর্তনাদের শব্দও নেই। শুধু ঘরের মেঝেতে জেগে থাকে ওদের পায়ের শব্দ। মৃদু কথাবার্তা। একদল কুদ্দুস প্রেসিডেন্টকে টানতে টানতে বেরিয়ে যায়। অন্যদল তখনো কামলাগুলোকে শাসাচ্ছে, একটা শব্দ করলে মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখবো। বাপের নাম ভুলে যাবি শালারা।

তারপর দু'একটা গুলি শূন্যে ছুঁড়ে বেরিয়ে যায়। মঞ্জুলিকা ওপরের জানালা দিয়ে দেখে তুমুল বৃষ্টির মাঝে হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকারে শরীর গোনা যায় না, নইলে ও গুনে দেখতো যে কয়জন। চরাচর তোলপাড় করা বৃষ্টিতে জলের স্রোত গড়ায় পায়ের নিচ দিয়ে। ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাস্তা– কাদা থৈ-থৈ করছে, কী ভয়াবহ অন্ধকার চারদিকে। নিচ থেকে কান্নার শব্দ শুনে মঞ্জুলিকা দৌড়ে নামে। দেখে চাচী অজ্ঞান হয়ে গেছে। ও মায়ের সঙ্গে চাচীর শুশ্রূষায় হাত লাগায়। ভয়ে, আতঙ্কে চুপসে থাকা মানুষের মুখগুলো যেন পাথরের চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। হারিকেনের নিভু নিভু আলোতে ঘরের ভেতরে ভৌতিক ছায়া। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছে। মঞ্জুলিকা সবচেয়ে ছোটটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ওর ভেতরটা ভয়ে ছমছম করে ওঠে। ওরা কি চাচাকে মেরে ফেলবে?

BanglaBook.org

হয়তো তাই, কিন্তু কিভাবে মারবে? লাশটা ফেরতে দেবে তো? ভাবতেই মঞ্জুলিকার শরীরে কাঁপন জাগে এবং ও অন্যদের মতো ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে শব্দ শুনে অন্যরাও দ্বিগুণ বেগে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন কেয়ামতের আলামত ঘনিয়ে উঠেছে ওদের জীবনে।

শ্রেণীশত্রু খতম করার দলটা যখন হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালি আর টিকিকাটা সংযোগ পুলের কাছে আসে তখন বৃষ্টির তোড় কমেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার– ওদের কাদা-লাগা শরীর, হাঁটুর ওপর লুঙি ওঠানো, ভিজে চুপসে আছে প্রত্যেকে। একজন প্রেসিডেন্টের মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, ঐ শালা ছাগলের মতো ব্যাঁ-ব্যাঁ করে ডাকবি তো ডেকে নে, একটু পর তোকে জবাই করা হবে।

কয়েকজন ওকে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপর পা দিয়ে রাখে। গরগর শব্দ হয় কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের গলায়। একটু পর ও জোরে জোরে দোয়া-দরুদ পড়তে থাকে। হাসির রোল ওঠে। একজন বলে, ছাগলটা ডাকতে শুরু করেছে।

আর একজন খালপাড় থেকে ঘুরে এসে বলে, কাজটা কি এখনই করবি? খালে তো জোয়ার।

জোয়ার তো কি হয়েছে?

ভাটির সময় লাশটা খালে ফেললে ভেসে অনেক দূরে চলে যাবে।

ধুস্ শালা, তোর অত চিন্তার দরকার কি? ক'দিন পর ওটা তো ভেসেই উঠবে।

খেঁকিয়ে ওঠে আর একজন, শালা, তুই একটা ন্যাকা। মাগীদের মতো পুতুপুতু করছিস। তোর দিল কি নরম হয়ে গেছে যে লাশ নিয়ে ভাবনায় পড়েছিস? দেবো পোঁদ ফাটিয়ে। ঐ খানকির পুতের মুণ্ডু তো আমরা পুলের ওপর রেখে যাবো।

ঠিক বলেছিস। যত লোক এ পথে হাঁটবে, ঐ মুণ্ডু দেখে ভিরমি খাবে।

শুধু ভিরমি খাবে না, ছিটকে পড়বে খালের পানিতে।

হাসির রোল ওঠে। সে শব্দে ভয়াবহ অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। তখনো গভীর রাত। ভোর হতে অনেক সময় বাকি। একসময় হাসির শব্দ প্রকৃতিতে মিলিয়ে যায়। ওদের কেউ কেউ জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে ট্যাক হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই বের করে। ভিজে চুপসে আছে দুটোই। জ্বলে না ম্যাচ। দূরে ফেলে দিতে দিতে শিশির বলে, মেজাজ যখন খিঁচেই গেলো তখন কাজটা শেষ করে ফেলি। এ্যাই সানু দাটা দে।

হ্যাঁ, শেষ করে ফেলি।

সবাই মিলে বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র গুঞ্জন ওঠে– সে গুঞ্জন আবার মিলিয়ে যায় প্রান্তরে। হঠাৎ করে প্রচণ্ড শব্দে কড়কড় করে ওঠে মেঘ। বাজ পড়ে কোথাও। মুহূর্তে আলোর ঝলকানি নিভে গেলে কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের মুখের ওপর টর্চ ফেলে কেউ। দু'জনে হাঁটু গেঁড়ে বসে হাত চেপে ধরে– অন্য দু'জন একই ভঙ্গিতে পা চেপে রেখেছে। যারা বুকের ওপর পা দিয়ে রেখেছিলো তাদের পা আরো শক্তভাবে চেপে বসে প্রেসিডেন্টের থলথলে শরীরে। ওর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। চরাচরের গাঢ় অন্ধকারে টর্চের এককণা আলো শুধু মুখটা আলোকিত করে রাখে– ঐ আলোকিত মুখের নিচে গলা– ওখানে আলো-আঁধারী। টর্চটা নড়ালে আলো গলাতেও পড়ে, আবার সরে যায়। তবু শিশির ওকে বলে না আলোটা গলার ওপর স্থির করে ধরতে। ওর প্রয়োজন নেই। ওর পাকা হাত, ও জানে কোথায় পোঁচ দিতে হবে। অনায়াসে অভ্যস্ত হাতে আলো-আঁধারী ভেদ করে ধারালো দা বসিয়ে দেয় কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের গলায়– ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে– গোঁ-গোঁ শব্দের মাঝে ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে যায়।

BanglaBook.org

ভেজা ঘাসে দা মুছে নিয়ে ওটা সানুর কাছে ফেরত দেয় শিশির। তারপর পুলের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে একটি সিগারেট ওর ভীষণ দরকার।

অন্যরা মুণ্ডহীন দেহটা চ্যাংদোলা করে ধরে খালের পানিতে ছুঁড়ে মারে। জোয়ার-ভরা খালে খলবলিয়ে ওঠে পানি। শিশির ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ভারী বস্তু পতনের পর পানির এমন নেচে ওঠার দৃশ্য দেখতে ওর ভালোলাগে– অবশ্যই সে বস্তুটি যদি হয় মানুষের দেহ– এ দৃশ্য কয়েকবার দেখা হয়েছে ওর। ও আরো দেখতে চায়, যতদিন শ্রেণীশত্রু মুক্ত করা না যাবে এলাকা, ততদিন পর্যন্ত। তারপর ও নিজেই মুণ্ডুটা এনে পুলের রেলিঙের থামের ওপর বসিয়ে দেয়। চারপাশে ছোট ইটের টুকরো বা শুকনো লাঠি বা পাতা দিয়ে ঠেকনা দেয়, যাতে বাতাসের ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ে না যায়। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে সে জায়গাটা জমাট হতে থাকে। ওরা কেউ সেটা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। কাজ শেষ ওদের। ওরা এখন সোনাখালি খালের পাড় দিয়ে হাঁটছে। ওরা চলে যাচ্ছে। একজন স্লোগানের মতো বলে, ঢেউয়ের মতো যুদ্ধ করো–। অন্যরা সমস্বরে উত্তর দেয়, টু স্টেপ ফরোয়ার্ড, ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড।

তখন প্রদীপ্ত পুলের ওপারে টিকিকাটা বাজারে বিমলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আজ হাটের দিন নয়। লোকজন তেমন নেই। যে দু'চারজন বাজারে ঘোরাফেরা করে আকাশে মেঘ দেখে তারাও ঘরে চলে গেছে। একটি মাত্র খোলা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলো বিমল। সন্ধ্যার দিকেই বিমলকে খুঁজে পায় ওরা। সঙ্গের ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরে আনন্দে ফেটে পড়ে, তোমাকে যে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো আমরা ভাবতেই পারিনি বিমলদা।

চায়ের কাপে আর চুমুক দেয়া হয় না। বিমল সবার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

ভাগ্যিস তোমাকে পাওয়া গেছে বিমলদা, নইলে দীপু ভাইর কাছে কেমন করে যে মুখ দেখাতাম। বিমল প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলে, আদাব।

তোমার গানের প্রশংসা শুনে আমি আর সোনাখালি থাকতে পারলাম না বিমল, একটানে টিকিকাটা চলে এলাম। সারারাত গানের আসর চলবে, কি বলো?

সারারাত? আমি রাজি। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে বিমল।

হালকা-পাতলা দীঘল চোখের ছেলেটি মুহূর্তে ওর মন কাড়ে– প্রদীপ্ত ওর হাসি দেখে মুগ্ধ হয়। মনে মনে ভাবে, জ্যোৎস্নার কী দোষ! বিমল তো ভালোবাসা পাওয়ার মতো ছেলে। দরকার হলে জ্যোৎস্নার জোতদার বাপকে ও রাজি করাবে। কিন্তু বিমলকে দুঃখ দেবে না তো জ্যোৎস্না? না, বিমলের দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। বিমলের দুঃখের কথা ভেবে প্রদীপ্তর বুক ভার হয়ে যায়।

বিমল আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে প্রদীপ্তকে বলে, দীপু ভাই ওনার অনেক রঙ। ওনার রঙের সঙ্গে পারবে কোন শালা। এইতো কালো বৌ নিয়ে ঘর সাজিয়েছে, এখন রাতভর মৌজ করবে। ভিজে মরবো আমরা।

না, বিমল তা নয়। আমার মনে হয় বৃষ্টি হলে গানের আসর দারুণ জমবে। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমার গলা ছুটবে।

বিমল ঘাড় নিচু করে লাজুক হাসে। প্রদীপ্ত দোকানের সব মুড়ি কেনে, সরষের তেল আর কাঁচামরিচ, পেঁয়াজও। ছেলেরা হল্লা করতে করতে চালাঘরের দিকে ছুট দিয়েছে। ওখানে গানের আসর বসবে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে এবং মুহূর্তের মধ্যে ঝমঝমিয়ে নামে। একে অন্ধকার, তারওপর এমন প্রবল বর্ষণ, প্রদীপ্ত মুড়িভরা টিন নিয়ে যখন

BanglaBook.org

চালায় পৌঁছে তখন ওর গা বেয়ে জল ঝরতে শুরু করেছে। দোকানিও ওদের সঙ্গে জুটেছে। ও প্রদীপ্তকে নিজের গামছাটা এগিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত হেসে বলে, মুছবো না, সোনাখালির বৃষ্টি আমার গায়েই থাকুক। এমন খোলা প্রান্তরে ও কখনো এমন বৃষ্টিমুখর রাত দেখেনি। কোথাও কেউ আছে কি না ও জানে না, এটুকু সত্য যে ও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। হয়তো কোথাও কেউ থাকতেও পারে– অন্ধকার এবং বৃষ্টি যার প্রয়োজন। মানুষের কতরকম কাজ আছে, সব মানুষ কি তার সব খবর রাখে? নাকি রাখা যায়? এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষতো প্রত্যেকেই নিজের নিয়ম বানিয়ে চলছে। বাধা এলে লড়বে, নইলে থেমে যাবে। এটাই কি নিয়ম? ধুস্ শালা আমি দার্শনিক হবার চেষ্টা করছি। পরক্ষণে মনে হয়, আজ রাতে কোথাও কেউ যদি বৃষ্টি মাথায় করে এই প্রান্তরে হেঁটে যায় তাহলে বুঝতে হবে আমি দার্শনিক। আমি বাজি ধরলাম। কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও কিছু করছে। ও খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে মঞ্জুলিকার মুখ। ও এখন কি করছে? একলা বিছানায় ভীষণ ঘুমে কাতর, কিংবা হালকা ঘুমে বারবার হাত বাড়ায় প্রদীপ্তর গলাটা ধরবে বলে। প্রদীপ্ত হেসে ফেলে, বেচারা! বিমল বলছিলো, আকাশ কালো মেঘের সঙ্গে মৌজ করছে, তাই এমন বর্ষণ! কথাটি কি ও বুঝে বলেছে নাকি না বুঝে? ও কি জানে কথাটার ব্যাখ্যা করলে একটা ভীষণ অশ্লীল ব্যাখ্যা দাঁড়ায়? হয়তো জানে না, হয়তো ওর ভেতর একটা কবি-মন আছে, তাই ও নতুন কিছু বলতে চেয়েছে। ঐ হাসি এবং দৃষ্টি নিয়ে বিমল নষ্ট ছেলে হতে পারে না। ওর আবেদন মানুষের কাছে সহজ ভালোবাসা পাওয়ার। জয়তু বিমল।

কেউ একজন চেঁচিয়ে ওঠে, মুড়ি মাখিয়েছি দীপু ভাই।

আপনার কি হয়েছে? মন খারাপ?

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে ওদের মাঝে গিয়ে বসে। বলে, সোনাখালির এই রাতটা দেখছিলাম। এমন রাত আর আমার জীবনে আসবে না রে।

বিমল আপত্তি করে, কেন আসবে না? আপনি বর্ষাকালে চলে আসবেন আমরা এমন রাত বানাবো।

বানাবে? হো-হো করে হাসে ও।

হাসবেন না দীপু ভাই, বিমল ঠিকই বলেছে। বৃষ্টি, গান, মুড়ি, অন্ধকার সবই তো থাকবে। তাহলে হবে না কেন?

বিমল শান্ত গলায় বলে, হবে না রে। কারণ তখন এই দীপু ভাই সেই দীপু ভাই থাকবে না।

শুধু তাই নয় বিমল। আমরা কেউই একরকম থাকবো না। আজকের রাতটায় যা কিছু ঘটবে, যেমন করে ঘটবে, তেমন রাত তো আমরা আর পাবো না। যাকগে, এসব কথা। মুড়ি খেয়ে আমরা গান শুনবো। তার আগে আমি আমার হেঁড়ে গলায় কিছু একটা গেয়ে ফেলি বিমল?

ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, হিপ্ হিপ্ হুররে দীপু ভাই।

প্রতীকের কাছ থেকে শেখা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে শুরু করে প্রদীপ্ত। মনে হয় কতদিন যেন বুকের মধ্যে এমন সাধ ছিলো যে কোনো এক শ্রাবণ রাতে হৃদয় উজাড় করে গান গাইবে। পরপর কয়েকটা গাইলো ও। নিজেই অবাক হয় নিজের বুকের তৃষ্ণা দেখে– ঢাকা শহরে কখনো তো এমন করে গান গাইবার সাধ হয়নি ওর। নাকি ভুল সুরে গাওয়ার লজ্জায় কখনো চেষ্টা করেনি? আজ সব বাঁধ ভেঙে গেছে। আজ রাত মন খুলে গান গাইবার রাত। প্রদীপ্ত ছেড়ে দেবার পর আরো দু'একজন গাইলো, যার যেটুকু সাধ্য সেরকম করে। তারপর শুরু করলো বিমল। এখন মধ্যরাত শুরু হয়েছে। বৃষ্টির তোড় তখন কমেছে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ

BanglaBook.org

হয়ে অনুভব করে ওর কণ্ঠ আশ্চর্য এক লয়ে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে মেঘে, আকাশে, শ্রাবণের বর্ষণে। ভরে দিচ্ছে হৃদয়, ভরে দিচ্ছে সব মানুষের বেঁচে থাকার সাধ।

একসময় বৃষ্টি থেমে যায়। অন্ধকার ফিকে হয়– ভোরের আলো ফুটিফুটি করছে। এখানে–ওখানে পানি জমে আছে। বিমলের কণ্ঠও থেমে যায়। বলে, আজ আর না দীপু ভাই।

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমাকে আমি ঢাকা নিয়ে যাবো বিমল। শহরের মানুষকে তোমার গান শোনাবো।

সোনাখালি ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

প্রদীপ্ত ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, আমি তোমাকে বুঝেছি।

চলেন বাড়ি যাই। বাড়ি গিয়ে তো আপনার ঘুমুতে হবে।

না ঘুমুলেও চলবে। আমি টায়ার্ড নই। টায়ার্ড হলেই মানুষের ঘুম পায়।

বলতে বলতে প্রদীপ্ত চালাঘর থেকে নিচে নেমে যায় এবং মাঠে ঘাসের ভেতর জমে থাকা পানিতে ছপছপিয়ে হাটে। ভাগ্যিস সঙ্গে মল্লিকা নেই। থাকলে, হাজারটা নিষেধ চাপাতো। কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন প্রিয়জনের সঙ্গও ভালোলাগে না– মা বা স্ত্রী বা সন্তান যেই হোক না– সময়টুকু শুধু নিজের করে ভরে রাখতে চায়। আর কাউকে প্রয়োজন নেই। এমন সময়টায় শৈশব-কৈশোরে ফিরে যেতে না পারলেই বরং ওর দুঃখ হতো। ও যেখানেই পানি পায় সেখানে গিয়েই পা দিয়ে পানি ছিটোয়। পেছনে ছেলের দল, ওরা ক্লান্ত, কেউ কেউ হাই তুলছে। ঘরে ফিরে কষে ঘুম দেবো, কলকল করে বলছে তা।

প্রদীপ্ত দেখতে পায় সামনে পুল। তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। ও ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, মরদ পোলাপানের এত ঘুম পায় কেন রে? তোরা দৌড় দে সব ঘুম ছুটে যাবে। পুলের ওপারে গিয়ে রেস লাগাবো দেখি কে সবার আগে বাড়ি পৌঁছতে পারে? যে ফার্স্ট হবে সে ঢাকা যাওয়ার টিকিট পাবে আমার কাছ থেকে।

ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে, হুররে! এবং পুলের ওপর দিয়ে ছুট লাগায়। ওপারে গিয়েই ওরা চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রদীপ্ত দ্রুতপায়ে পুলটা পেরিয়ে আসে এবং প্রবল এক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ওর মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। ও রেলিং ধরে নিজেকে সামলায়। দেখে কুদ্দুসের ধড়হীন মুণ্ডুর চোখ দুটো খোলা। ছেলেগুলো কে আগে এই খবর বাড়িতে পৌঁছবে সেই প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়েছে। অপর পাশের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিমল। প্রদীপ্তর চোখে চোখ পড়তেই ও আকস্মিকভাবে বলে, দীপু ভাই জ্যোৎস্নার কি হবে?

বাপ-মরা মেয়ের যা হয় ওরও তাই হবে।

কিন্তু এমন মৃত্যু? ও সইবে কি করে?

ও-হো-হো-ও করে কেঁদে ওঠে বিমল। কেমন যেন বিকৃত শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ। ভাবাই যায় না যে এই কণ্ঠ থেকে গান বের হয়। প্রদীপ্ত ওকে জিজ্ঞেস করে, বিমল তুমি কি ওদের কাউকে চেনো, যারা শ্রেণীশত্রু খতম করে?

দু'জনকে চিনি। কিন্তু ওরা তো কেউ গাঁয়ে থাকে না। কোথায় থাকে জানি না।

ওরা দেখতে পায় দূর থেকে গাঁয়ের লোক লাঠিসোটা, এমনকি বন্দুক হাতে ছুটে আসছে। ওরা কামলাদের মুখে খবর পেয়ে প্রেসিডেন্টকে খুঁজতে বেরিয়েছিলো। পথে ছেলেগুলো ওদের সঙ্গে মিলিত হয়। চারদিক থেকে মানুষ আসতে থাকে। থানায় খবর দিতে লোক গেছে। যতক্ষণ পুলিশ না আসে ততোক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রদীপ্ত। ও কোনোকিছুর সঙ্গেই এই নিষ্ঠুরতার পরিমাপ করতে পারে না।

পুলিশ এসে মুণ্ডু নিয়ে যায়। ধড়টা কোথাও খুঁজে পায় না। বিমল আস্তে করে বলে, দীপু ভাই আমার ধারণা ধড়টা খালে ফেলেছে। দেখবেন কালই ভেসে উঠবে। থানা থেকে

BanglaBook.org

যারা এসেছিলো তারাও তাই মনে করে।

তখন দূর থেকে একদল লোক মিছিল করতে করতে আসে। ওরা সবাই এ গাঁয়ের এবং আশেপাশের গাঁয়ের কৃষক। ওরা স্লোগান দিচ্ছে : প্রেসিডেন্ট হত্যার বিচার চাই– হত্যাকারীর ফাঁসি চাই। ওরা মিছিল নিয়ে থানায় যায়। থানার সামনে জমায়েত হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মানুষ ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। প্রদীপ্ত এবং বিমল সবার সঙ্গে থানায় এসেছে। আজ আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। রোদের তাপে ভ্যাপসা গরম, সবার গেঞ্জি-জামা ভিজে যায়। থানার সামনে কোনো বড় গাছ নেই যে কোথাও একদণ্ড ছায়ায় দাঁড়ানো যাবে। তখনো মিছিলকারীরা থেকে থেকে স্লোগান দিচ্ছে।

প্রদীপ্ত বিমলকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, ওরা কি সত্যি সত্যি বিচার চায় বিমল?

বিমল জোর দিয়ে বলে, চায়, আমি বিশ্বাস করি চায়। কারণ কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট ওদের মজুরি আগাম দিতো।

কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট একজন জোতদার। ওদেরকে ঠকায়নি?

দীপু ভাই, যাদের অনেক আছে ঠকানো তো তাদের নিয়ম, ঠকায় সবাই। কিন্তু আবার টাইম মতো দিতেও চায় না। কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট টাইম মতো দিতো। এখন ওরা কোথায় কাজ পাবে? কি খাবে?

যারা শ্রেণীশত্রু খতম করছে ওরা তো কৃষকরাজ কায়েম করবে। এর জন্য ওদের কষ্ট সইতে হবে।

বিমল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, কষ্ট সওয়া? মিথ্যে কথা। ওরা সোনা লুট করে, টাকা-পয়সা লুট করে, কখনো কখনো বাড়ির মেয়েদেরকে ধর্ষণও করে।

আহ্, চুপ করো বিমল।

চুপ তো করেই থাকবো। চুপ না করলে আমার লাশও পড়ে যাবে খালে। মাখন আমাকে অনেকদিন বলেছে ওদের দলে যোগ দিতে। আমি পারিনি। এসব খুন খারাবি আমি সহ্য করতে পারি না। আপনি পারবেন?

গুপ্ত হত্যা করে বড় কিছু করা যাবে এমন বিশ্বাস আমার নেই।

উপস্থিত লোকেরা আবার স্লোগান দিতে শুরু করে। থানার দারোগা বিচারের আশ্বাস দিলে ওরা থেমে যায়, কিন্তু গুঞ্জন থামে না। মুণ্ডুটা মর্গে চলে গেছে। থানায় ডায়রি করা হয়েছে। দুপুর গড়িয়ে গেলেও লোকেরা থানা থেকে নড়ে না। প্রদীপ্ত মনে হয় এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, তোমরা কার বিচার চাচ্ছো? কুদ্দুস প্রেসিডেন্ট তোমাদের লোক না। ও শোষক, তোমাদেরকে ঠকায়। যারা শ্রেণীশত্রু খতম করছে তারা তোমাদের জন্য লড়ছে। তাহলে ওরাই তোমাদের লোক। তোমাদেরকে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তোমাদের সুদিন এত তাড়াতাড়ি না এলে তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আসবে– তাও যদি না হয় তাহলে তাদের ছেলেমেয়েরা পাবে, নইলে আরো পরের কারো জন্য। ওরা তো বলে, মানুষকে নির্যাতন না করলে প্রতিবাদী হয় না। তোমরা প্রতিবাদী হও। কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের হত্যার বিচার চাইছো কেন?

কি ভাবছেন দীপু ভাই?

প্রদীপ্ত বিমলের দীঘল চোখে চোখ রাখে। উত্তর দেয় না।

বাড়ি যাবেন না?

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে, না। ঐ কারবালায় আমি এখন যেতে পারবো না।

তাহলে আমার বাড়িতে চলেন।

তোমার বাড়িতে? গুড আইডিয়া, চলো।

BanglaBook.org

থানা থেকে লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। দু'জনে আবার মেঠো পথে নেমে আসে। প্রদীপ্তর মাথার মধ্যে গুঞ্জন– ওর মগজ খোলাসা হচ্ছে। ওরা কি চায়? ওরা আসলে অন্যায়ের বিচার চাচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের বিচার চাচ্ছে। ব্যক্তি এখানে বড় নয়, বড় আইন– বড় মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার।

বিমলের মা সরলা বারান্দায় বসে নিজের ছেঁড়া শাড়িতে তালি দিচ্ছিলো। ওদের দেখে আঁতকে ওঠে, শাড়িটা দু'হাতে মুচড়ে ধরে তড়িঘড়ি বলে, তুই কোথায় ছিলি বাবা? তোর চিন্তায় আমার ঘুম হয়নি। সেই যে দশদিন আগে বাড়ি ছেড়ে গেলি–

ওহ্, মা থামো তো। দেখো কাকে এনেছি। ইনি হলো ঢাকার অতিথি।

ঢাকার অতিথি? ও বাবা, তুমি আমাদের দেশে বেড়াতে এলে আর কেমন একটা ঘটনা ঘটলো দেখো তো। দুঃখে মরে যাই। হ্যাঁরে বিমলা পাওয়া গেছে পেসিডেনের ধড়?

অত সহজে কি পাওয়া যাবে।

আহা রে, সকালে গিয়েছিলাম ও বাড়িতে।

প্রদীপ্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি করছে ওরা?

আহা রে, এমন দৃশ্য কি দেখা যায়। সবাই মাথা খুঁড়ছে। পেসিডেনের বৌর এই জ্ঞান আসে তো, এই যায়। ঢাকা থেকে একটি মেয়ে এসেছে। ভারি কাজের। ঐ সব সামলাচ্ছে।

প্রদীপ্ত আর কিছু শুনতে চায় না। বলে, মাসীমা জল খাবো।

দেই।

সরলার কণ্ঠ থেমে যায়। যেন কথার স্রোত বাধা পাওয়াতে ও ক্ষুণ্ন হয়েছে।

শুধু জল না, মুড়ি-পাটালি দিও মা।

মায়ের পিছে পিছে বিমলও ঘরে ঢোকে। গাছগাছালিভরা এমন স্নিগ্ধ পরিবেশেও প্রদীপ্তর মন খারাপ হতে থাকে। একটি পরিবারের লোকের মাতম ও দেখতে চায়নি বলে বাড়ি না গিয়ে এখানে এসেছে। অথচ মঞ্জুলিকা সামলাচ্ছে। মঞ্জুলিকা ওকে স্বার্থপর বলবে নয়তো অভিমানে কেঁদে ফেলবে। এটাতো সত্যি ও থাকলে মঞ্জুলিকার খানিকটা সাহায্য হতো? এটাই তো করা উচিত ছিলো। অনুতাপে ওর ভীষণ কষ্ট হয়। নিজের ওপর রাগও বাড়ে।

সরলা মুড়ি-পাটালি, নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, পেয়ারা ইত্যাদি নিয়ে আসে। বিমলের হাতে ডাব। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না প্রদীপ্তর। ও বুঝতে পারে ওর খিদে নেই।

খান দীপু ভাই। দুপুর পর্যন্ত তো আপনার কিছু খাওয়া হয়নি।

বিমল আমি বাড়ি যাবো। মাসীমা যাই।

একটু খাও বাবা।

প্রদীপ্ত কথা না বলে উঠোন পেরিয়ে যায়। বিমল পিছু পিছু আসে, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো দীপু ভাই। প্রদীপ্ত কিছু না বলে ওর হাত ধরে। সরলা কিছু বলে ওঠার আগেই বিমল বলে, মা সবকিছু গুছিয়ে রাখো। আমি এসে খাবো। মাকে হতবাক এবং ব্যথিত করে রেখে দু'জন ছেলে অনায়াসে চলে যায়। মেঠো রাস্তাটা পেরিয়ে যাবার পর প্রদীপ্ত হঠাৎ করে বিমলের মুখোমুখি দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, তুমি কি জ্যোৎস্নাকে ভালোবাসো বিমল?

বিমল হকচকিয়ে যায়। তারপর প্রদীপ্তর চোখে চোখ রেখে বলে, না।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে কথাটা ও সত্যিই বলেছে। ওর কণ্ঠ কাঁপেনি, চোখের দৃষ্টি নত হয়নি। বরং বিমল যেন খানিকটা অপমানিত বোধ করছে, কিছু বলতে চাচ্ছে। হয়তো বলবে, এ প্রশ্ন করার অধিকার আপনি নিলেন কেন? জ্যোৎস্না কি আপনাকে কিছু বলেছে?

কিন্তু বিমল সম্পূর্ণ উল্টো ভঙ্গিতে বলে, দীপু ভাই আমি শ্রেণীশত্রু খতম করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু শত্রু চিনতে ভুল করি না। কোথায় যেতে হবে, কোথায় হবে না

BanglaBook.org

সেটা বুঝতে পারি।

ওর মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। প্রদীপ্ত দেখতে পায় ওর টানা চোখে কোনো আর্দ্রতা নেই। বিমল এখন অন্যরকম ছেলে। প্রদীপ্ত ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বলে, আমি সরি বিমল।

দু'জনে হাঁটতে শুরু করলে বিমল ওর ঘাড় থেকে প্রদীপ্তর হাতটা খুব আস্তে করে নামিয়ে দেয়। প্রদীপ্ত মনে মনে নিজেকে বলে, এটুকু আমার পাওনা ছিলো।

দু'দিন পর সোনাখালি খালের ভাটিতে ভেসে ওঠে কুদ্দুসের মুণ্ডুহীন ধড়। জোয়ারে ফেলে দিয়ে গেছে খানিকটা উপরে, ফলে কাদার মধ্যে আটকে গেছে। শকুন উড়ে এসেছে। শকুনের ওড়া দেখে কামলারা অনুমান করে খুঁজতে বেরিয়েছিলো। কামলাদের অনুমান সঠিক দেখে প্রদীপ্ত আকাশে তাকায়, কতদূর থেকে যে নিশানা ঠিক করতে পারে পাখিগুলো! শুধু তাই নয় ওরা খাবলেছে পচা শরীর– বুকের কাছের এক জায়গা গর্ত করে ফেলেছে। পুলিশের উপস্থিতিতে কামলারা কলাপাতা দিয়ে মুড়ে লাশটা পাড়ে টেনে আনে, তারপর বাঁশ দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে থানায় রওনা হয়। একঝাঁক নীল মাছি উড়ে এসেছে কোথা থেকে। লাশের পিছে পিছে হাঁটতে হাঁটতে প্রদীপ্ত মাছির গুঞ্জন শোনে, দেখতে পায় লাশের ওপর শকুনের ছায়া। নাকে গামছা বেঁধেও দুর্গন্ধ এড়াতে পারে না ওরা– নাড়িভুঁড়ি উপড়ে আসতে চায়।

থানার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে মর্গ থেকে মুণ্ডুটা পাওয়া যায়। কামলারা ওটা ঘাড়ের কাছাকাছি রাখে, কিন্তু জুড়ে দেওয়া যায় না। কোনোকিছুই জোড়া লাগানো যায় না, মানবশরীরও না। প্রদীপ্ত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। মৃত্যু তো কতই দেখেছে, কিন্তু এমন মৃত্যু নয় এবং এমন লাশও নয়। মানুষই পারে মানুষকে জবাই করতে, এমন বোধ ও নিজের মধ্যে ধারণ করতে চায় না। এ কোনো দর্শন নয়, এ কোনো মানবিকতাও নয়। তাহলে এ কি? ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে চায় সবকিছু। ও প্রবল কষ্ট নিয়ে সোনাখালির মাঠঘাট আকাশ দেখে– ওর চোখ পূর্ণ হয়ে যায় জলে। এ দু'দিন ও কাঁদেনি– কান্না পায়নি। আজ ও কাঁদছে। ওর কান্না মানুষের হাতে মানবিকতার নষ্টামীর জন্য। বিমল ওর হাত ধরে টানে, দীপু ভাই? ও বিমলের দিকে ফিরে বলে, তোমাকে আমি কষ্ট দিয়েছি এটা ভুলে যেও ভাই।

ধুর কী যে বলেন! ওটা কোনো কষ্ট না। এই আলাদা হয়ে যাওয়া মাথা এবং ধড় দেখে যে কষ্ট পাচ্ছি মায়ের মৃত্যু হলেও বোধহয় এতটা ধাক্কা আমি খেতাম না। আপনি বলেন দীপুভাই এটা কি কোনো দৃশ্য? এটা কি মানুষের কাজ?

দু'জনের ভেতরটা হাউ-হাউ করে ওঠে– দু'জনের মুখে কোনো শব্দ নেই। দাফন সেরে পুকুরে গোসল করে বাড়ি ফিরলে মঞ্জুলিকা ওকে জিজ্ঞেস করে, ভাত খাবে? প্রদীপ্ত ওর দিকে তাকাতে পারে না। চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ও শুধু বলে, না। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়। ঘরে ঢুকে দু'হাতে বালিশ আঁকড়ে ধরে মুখ গোঁজে। কোথায় লুকোবে এ লজ্জা?

একটুপর মঞ্জুলিকা খানিকটুকু ভাত নিয়ে উপরে আসে। প্রদীপ্তর পিঠে হাত দিয়ে ডাকে। বলে, আমি জানি তোমার খিদে পেয়েছে দীপ। এ ক'দিন আমি কতজনকে ভাত খাইয়েছি। শুধু তোমাকে ছাড়া। আজ তোমাকে খাইয়ে দেবো।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার কোলে মাথা রাখে। ওর আঁচল টেনে চোখ মোছে। বলে, শেষ পর্যন্ত তুমিই সব। তবু তোমাকেই ভুলে যাই।

মঞ্জুলিকা হেসে বলে, কখনো হারাও বলেই তো পাওয়াটা আবার নতুন হয়। আমি চাই তুমি মাঝে মাঝে আমাকে হারিয়ে ফেলো। নইলে একঘেঁয়ে হয়ে যাবো।

প্রদীপ্ত জবাব দেবার সুযোগ পায় না। মঞ্জুলিকা এক লোকমা ভাত ওর মুখে

BanglaBook.org

দিয়েছে। ভাতটা চিবুতে চিবুতে ও ভাবে, আসলে মঞ্জুলিকা যা বলেছে তার কোনো জবাব হয় না। হয়তো এটাই সত্যি– ক্ষণিকের বিস্মৃতিই আনন্দের।

তিনদিনের জন্য এসে পনেরো দিন থাকতে হলো ওদের। কুলখানির পরও চাচী মঞ্জুলিকার মাকে ছাড়লো না আরো দশদিন। যাবার আগের দিন রাতে জ্যোৎস্না এলো ওদের ঘরে।

আবার কবে আসবেন দুলাভাই?

তোমার বিয়ের সময় খবর দিও। আসবো।

জ্যোৎস্না চুপ করে থাকে। মঞ্জুলিকা খোঁচা দেয়, কিরে চুপ করে গেলি যে? দাওয়াত দিবি না?

জ্যোৎস্না চোখে আঁচল দেয়, বাবা থাকলে আমার বিয়েতে কত আনন্দ হতো! বাবা গাঁয়ের সব লোককে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতো।

ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। প্রদীপ্ত প্রসঙ্গ ফিরিয়ে বলে, সেদিন টিকিকাটায় রাতভর বিমলের গান শুনেছি জ্যোৎস্না রাণী।

জ্যোৎস্না মাথা নামিয়ে বলে, গান দিয়ে কি পেট ভরে?

প্রদীপ্ত চমকে উঠে ওর দিকে তাকায়, খানিকটা রূঢ় কণ্ঠে বলে, গান গেয়ে পেট ভরে না সেটা ঠিক, কিন্তু বিমল ঠিক গাঁয়ের ছেলের মতো সরল আর মূর্খ না। ও অন্যরকম, ভীষণ শার্প। ও নিজের মগজ দিয়েই অনেক কিছু বুঝতে পারে।

মঞ্জুলিকা অবাক হয়ে বলে, বিমল কে?

ও এক দারুণ গায়ক ছেলে।

তাই নাকি? তাহলে আমি ওর গান শুনবো।

এবার আর হবে না। জ্যোৎস্নার বিয়েতে ওকে নিয়ে আসবো গান গাইবার জন্য।

ছিটকে ওঠে জ্যোৎস্না, অসম্ভব। আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর দুলাভাই।

বিমল আরো কঠিন ছেলে। তুমি ওর কিছুই চেনো না।

আমি চিনতে চাই না।

জ্যোৎস্না দ্রুতপায় বেরিয়ে যায়। মঞ্জুলিকা পেছন থেকে ডাকে। ও ফিরে তাকায় না। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার কাছে জ্যোৎস্নার ভালোলাগার কথা বলে, তারপর বিমলের গল্প করে। বলে, ও যেমন গায়, তেমন ওর মেধা। যে নিজের মতো করে ভাবতে পারে তাকে আমি সবচেয়ে বেশি মেধাবী বলি মঞ্জুলি।

তাহলে সোনাখালিতে বিমল তোমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

তুমি নিজেও তো বুঝলে যে সোনাখালিতে আমাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা কত ব্যাপক হলো।

মঞ্জুলিকা গভীর নিশ্বাস ফেলে হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। তারপর বলে, এ যাত্রায় সোনাখালিতে আজকেই আমাদের শেষ রাত।

প্রদীপ্ত দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, আমি আমাদের স্বপ্নের কথা ভুলিনি। স্বপ্নের শস্য আমাদের ঘরে উঠবেই।

তখন বাদাম গাছের পেঁচাটা ডেকে ওঠে। দু'জনে জানালার বাইরে তাকায়। ওদের মনে হয় ডাকটা কর্কশ নয়, একটু ভিন্ন যেন সুর আছে– ঐ ডাক শুনতে ওদের ভালোলাগে। ঐ ডাকের সঙ্গে মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর বুকে মুখ গোঁজে। সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিলো। মধ্যরাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। ভেসে যায় সোনাখালি।

BanglaBook.org

৩

প্রতিদিন সকালে কাগজ হাতে নিয়ে আগে বন্যার খবর পড়ে আলী আহমদ। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে– বন্যা পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপই হচ্ছে। চুয়ান্ন সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিলো– রিলিফ নিয়ে বন্যা-দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলো। একজন ব্যতিক্রমী মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ওর– এখনো মনে আছে সেই লোকটির বসে থাকার অনড় ভঙ্গি। লোকটি এখন কোথায় ও জানে না। পেরিয়ে গেছে ষোলো বছর– জীবনের ওপর দিয়ে কত জল গড়ালো। ষোলো বছর একটা দীর্ঘ সময়। আলী আহমদ কাগজের অন্য পৃষ্ঠায় চোখ বুলোয়। কিন্তু পত্রিকা পড়ার চেয়েও স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো খুলে যাচ্ছে বেশি। শুধু বন্যা নয়, চুয়ান্ন সালের আরো একটি ঘটনা ওকে তাড়িত করেছিলো প্রচণ্ডভাবে। এ বছরই সরকার কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় গড়ে তোলা গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প সম্পর্কে ভারত সরকারকে জানিয়েছিলো যে এই প্রকল্পের জন্য দুই হাজার কিউসেক পানির প্রয়োজন হবে। কারণ একান্ন সাল থেকে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বাঁধ নির্মিত হয়ে গেলে পূর্ব বাংলায় পদ্মা তার নাব্যতা হারাবে এবং ভবিষ্যতে জলহীন হয়ে যাবে নদী। শুধু তাই নয় তখন গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প কোনো কাজে আসবে না। বুক শুকিয়ে যায় আলী আহমদের। এমন দিন কি সত্যি আসবে যখন গঙ্গার ভাটিতে জল থাকবে না? ভেড়ামারার পাম্প হাউজের পাম্প ছুঁতে পারবে না পদ্মার জল? বন্যার এমন থৈ-থৈ পানি হয়ে যাবে পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য স্বপ্ন? ওর প্রিয় শহর রাজশাহী, প্রিয় নদী পদ্মা। পদ্মা বালুময় হয়ে গেলে রাজশাহী কি মরুভূমি হয়ে যাবে? অসম্ভব, এমন দিনের কথা কখনোই ভাবতে পারে না। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, এমন দিন যদি আসে তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। সবুজ শ্যামল পূর্ব বাংলা ছাড়া আমি কোথাও বাঁচতে চাই না।

বাবা তোমার কি হলো? এমন ঝিম মেরে বসে আছো যে?

তেমন কিছু না রে। এমনি বসে আছি।

হুঁ, বললেই হলো। কিছু তো হয়েছেই। আমি তো জানি তোমার মাথা একটা না, তোমার মাথা দশটা। তুমি হাজার রকম চিন্তা করো। বাবা তোমার মাথায় এত পোকা কেন?

আলী আহমদ প্রতীকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। ও জবাব শোনার জন্য দাঁড়ায় না। আসলে ও জবাব চায়ও না। বাবাকে এমন খোঁচাতেই ভালোবাসে। আলী আহমদ শুনতে পায় ও গলা ছেড়ে গান করছে। ইউনিভার্সিটিতে যাবে হয়তো, তৈরি হচ্ছে। আলী আহমদের চিন্তার রেশ ফুরোয় না। ভেবে দেখলো এই ষোলো বছরে দুই দেশের সরকারের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ফারাক্কা বাঁধের প্রশ্নে আলোচনা হয়েছে। পানির পরিমাণ বাড়ানোর কথা হয়েছে। প্রথম মিটিং হয়েছিলো ষাট সালে। যতদূর মনে পড়ে শেষ মিটিং হয়েছে আটষট্টির মে মাসে– দিল্লিতে দুই দেশের সরকারের সচিব পর্যায়ের সভা। এ সভায় পাকিস্তান সরকার এপ্রিল মাসের জন্য উনপঞ্চাশ হাজার কিউসেক পানি দাবি করে। এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে দিন গড়াচ্ছে– গড়াচ্ছে বাঁধের কাজ। আর ওদিকে ফারাক্কার উজান থেকে হুগলি নদীর জঙ্গিপুর পর্যন্ত ফিডার ক্যানেল খোঁড়ার কাজ চলছে পুরোদমে। হয়তো আগামী দু'চার বছরের মধ্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন কি হবে? এই বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠকের মধ্যে কি অনিশ্চিত হয়ে থাকবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ? কেমন হিম লাগে আলী আহমদের শরীর। ও আবার কাগজের দিকে তাকায়। ছাপার অক্ষরে বন্যার খবর ওর চোখের সামনে বাঁধের মতো কঠিন এবং নিরেট হয়ে ওঠে।

এক কাপ দুধ নিয়ে মঞ্জুলিকা এসে দাঁড়ায়। এটা ওর রুটিন কাজ। আলী আহমদ কাগজ পাশে রেখে দিয়ে হাত বাড়ায়, দাও।

BanglaBook.org

কোনো খবর আছে বাবা?

তেমন কিছু না। তবে বন্যা পরিস্থিতি খুব খারাপ হচ্ছে।

খারাপ যে হবে সোনাখালি থেকে আসার পথেই আমরা বুঝেছিলাম বাবা। নদীগুলো যেন ফুলছে, আকার এত বেড়েছে যে এপাশ ওপাশ দেখা যায় না। আর যা বৃষ্টি হয়েছে সোনাখালিতে! যেদিন চাচাকে ওরা মেরে ফেললো সেদিন কী যে তুমুল বৃষ্টি।

থাক মা এসব কথা। তুমি স্কুলে যাবে না?

যাচ্ছি। এখনই বেরুবো। আপনি কি কখনো মানুষের কাটা মাথা দেখেছেন বাবা?

আলী আহমদ মাথা নাড়ে, না। প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে, তুমি না বলেছিলে রিলিফের জন্য তোমাদের স্কুলে সাহায্য দিতে হবে?

আমি তো এক গাঠ্ঠি পুরনো কাপড় নিয়ে যাচ্ছি আজ।

মঞ্জুলিকা খালি কাপটা উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। আলী আহমদের মনে হয় ওকে আজ চঞ্চল মনে হচ্ছে। রাতে কি ওর ভালো ঘুম হয়নি? ওকে তো ও একটা কথা বলতে চেয়েছিলো। সেটা বলা হয়নি। ও বলতে চেয়েছিলো, জানো মা হয়তো একদিন পূর্ব বাংলার উত্তরাঞ্চলের মানুষ জানবে না বন্যা কি? নিজেকেই শাসন করে ও, আহ্, আলী আহমদ তোমার ভাবনায় একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। নদীমাতৃক এই দেশটার এমন দুরবস্থা নিশ্চয়ই কখনো হবে না। কেন এমন দুঃস্বপ্ন ওর করোটি জুড়ে বাদুড় হয়ে ঝুলে আছে? ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে, তোমার মনে নেই সাতচল্লিশ সালে বহরমপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলে মহানন্দার উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে? তুমি পূর্ণভরা নদীর যৌবন দেখেছো? রাজশাহীতে কীর্তিনাশা পদ্মার গর্জন শুনেছো? তোমার নদীগুলো তো প্রমত্ত। এরপরও তুমি ভয় পাচ্ছো? পাচ্ছি, পাচ্ছি। আলী আহমদ নিজেকেই জবাব দেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি ফারাক্কা আমার বুকের ওপর কালো বিশাল পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে– ফারাক্কা আমার প্রিয় পদ্মাকে বন্ধ্যা করে ফেলবে। চুয়ান্ন সালের পর এই প্রথম আর এক সর্বগ্রাসী বন্যা আমাকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ভাবনায় বিচলিত করে তুলেছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কি আমার ভবিষ্যৎ। ভাবতে ভাবতে আলী আহমদ রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশ ভীষণ কালো হয়ে উঠেছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে।

প্রদীপ্ত আর প্রতীক রিলিফ টিমের সঙ্গে বন্যা দুর্গত এলাকায় চলে গেছে। বন্যার জন্য স্কুলে ছুটি দিয়েছে। মঞ্জুলিকা ওর মায়ের বাড়িতে। পুষ্পিতার খুব একা লাগে। সকালবেলা তবু রান্নাবান্নার কাজ থাকে, সময় পেরিয়ে যায়। দুপুরের পর একদম ফাঁকা। ছোটবেলা থেকেই দুপুরকে ও ভয় পেতো, মনে হতো কেমন যেন দম আটকানো– থমকে থাকা, এগোয় না। ক'দিন থেকে তেমন লাগছে। পেছনের বারান্দায় গোল হয়ে পড়ে থাকা রোদের বৃত্ত ওকে ছোটবেলার ছি-বুড়ি খেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। সবাই ওকে বুড়ি বানিয়ে অমন একটা গোল বৃত্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতো– ওর ভালোই লাগতো ওই গোল বৃত্তের ভেতর ঢুকে যেতে। পুষ্পিতা ভেবে দেখলো এতটা বয়স পর্যন্ত ও ওই গোল বৃত্তের মধ্যেই থেকে গেলো– বেরুনোর কথা ভাবতেই পারেনি। তবু ভালো যে সময়টা ভালোই কেটেছে, আর ক'টাদিন কাটলেই বেঁচে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দুপুরবেলা আলী আহমদ খেতে বাড়ি এলো না। পুষ্পিতা একা একা ভাত খেলো। ওর কেমন ভয় করলো– তবু খুশি মনে খাওয়াটা শেষ করতে চাইলো, পারলো না। ওই একা থাকার ভয়টা ওকে ছাড়লো না। কি করবে ভাবতে গিয়ে কালো খালার চিঠির কথা মনে হলো ওর। রাজশাহী থেকে কালো খালা পরপর তিনটি চিঠি দিয়েছে। জবাব দেয়া হয়নি। তোষকের নিচ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসলো। মনে হলো এখন ও একা নয়, একজন কেউ আছে ওর কাছে। চিঠি পড়তে

BanglaBook.org

পড়তে মগ্ন হয়ে যায়– কত খুঁটিনাটি বিষয় জানিয়ে চিঠি লিখেছে কালো খালা, চিঠিতো নয় যেন কাছে বসে গল্প করছে– সুখ-দুঃখের গল্প। রাজশাহীতে যেতে লিখেছে। পুষ্পিতা কাগজ-কলম এনে চিঠির জবাব লিখতে বসে। শুধু কালো খালা নয়, নাসিরুদ্দিন, হুসনা বু, তরিকুল এবং ওর বৌ রহিমুনকেও লেখে। লিখতে লিখতে বেলা গড়িয়ে যায় টের পায় না। চিঠিগুলো খামে ভরার পর মনে হয় ফজলে গাজী মরার পর কালো খালা একদম একা– তাকে ঢাকায় নিয়ে এলে কেমন হয়? বেচারির শেষ দিনগুলো তো ওদের সঙ্গেই কাটাতে পারে। এখন বয়স হয়েছে, তেমন কাজ করতে পারে না। আসবে কি? হয়তো বলবে, আমার রাজহাঁসগুলো কে দেখবে? গরুটা কার কাছে রেখে যাবো? ক্ষেতে লাল শাক হয়েছে। মরিচ গাছের মরিচগুলো আর সবুজ নেই। চালকুমড়ো পাকিয়ে রেখেছি। মাসকলাইয়ের ডাল পিষে বড়ি বানাবো। আমার কত কাজ! সত্যি তো কালো খালার কত কাজ। এতকিছুর মধ্যে আছে বলেই কালো খালা একা হয় না– এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখতে পারে। চিঠি তো নয় যেন ঘরগেরস্থির ছবি।

তখন দরজায় কড়া নড়ে। আলী আহমদ ফিরেছে। কালো খালার ঘরগেরস্থি থেকে নিজেকে বের করতে চায় না পুষ্পিতা। বসেই থাকে। ভাবে, কালো খালার জায়গায় ও নিজেকে দাঁড় করিয়েছে কি? সেজন্যই কি পুরো চিত্রটা ওর আপন মনে হয়েছে? আবার কড়া নড়ে। পুষ্পিতা ওঠে না। ও নিজেও তো আলী আহমদের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছে। আলী আহমদ ফেরেনি। এখন দাঁড়িয়ে থাকুক। কড়া নাড়ুক। কেন এমন করছে ও? ও কি নিজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে? চমকে ওঠে পুষ্পিতা। পরক্ষণে দমে যায়। ও পারবে না বেরুতে। কারণ আলী আহমদকে ওর প্রয়োজন। মঞ্জুলিকা পারবে। কারণ ওর রোজগার আছে। ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবার আরো জোরে কড়া নড়ে ওঠে। পুষ্পিতা আবার চমকে ওঠে। আলী আহমদ কি গায়ের জোর খাটাচ্ছে? খাটাতেই পারে। মানুষ তো প্রভুত্ব চায়। আর যে নারী নিজের থেকেই বৃত্তের মধ্যে থেকে যায় তাকে তো প্রভুত্ব মানতেই হবে। এখন ও ইচ্ছে করলেই মঞ্জুলিকা হতে পারবে না। ও উঠে দরজা খোলে।

আলী আহমদ বিরক্ত হয়ে বলে, কি করছিলে? ঘুমিয়েছিলে?

পুষ্পিতা বলে, হ্যাঁ।

আলী আহমদের কণ্ঠে শ্লেষ, একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

পুষ্পিতা কিছু বলে না। আলী আহমদ শোবার ঘরে যায়। পুষ্পিতা রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি বসায়। চায়ের পানি ফুটতে থাকে টগবগ করে। পুষ্পিতা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ও ভুলে গেছে কি করতে হবে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না যে কি করার কথা ও ভেবেছিলো। শুধু ফুটতে থাকা পানির বাষ্প ওর চোখের সামনে বৃত্ত তৈরি করতে থাকে। ও আর কিছুই জানে না। আলী আহমদ ওকে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরে এসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, কি হয়েছে পুষ্পি?

ও ঘোলাটে চোখে তাকায় এবং কিছু বলার আগেই মাথা ঘুরে উঠলে আলী আহমদ ওকে দু'হাতে ধরে ফেলে। জ্ঞান হারিয়েছে পুষ্পিতা। কোলে করে বিছানায় নিয়ে আসে ওকে। পাশের ফ্ল্যাটের প্রফেসর জামানকে খবর দিলে তিনি ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার বললো, প্রেসার হাই। রেস্টে রাখুন।

সন্ধ্যায় প্রতীক ফিরে মঞ্জুলিকাকে নিয়ে আসে। প্রদীপ্ত ফেরে দশটার দিকে। পুষ্পিতা ঘুমিয়েছে। রাত বাড়ে। তবু ওরা সবাই মিলে বৈঠকখানায় বসে থাকে। কারো খাওয়া হয়নি– খেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। ওদের মনে হলো, পুষ্পিতার কিছু হলে ওরা সবাই এমন জড়ো হয়ে যায়। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ওদের মরমে মারে। আসলে পুষ্পিতাকে ছাড়া ওরা

BanglaBook.org

এ সংসার ভাবতে পারে না। মঞ্জুলিকা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলো, মায়ের পরিশ্রমের কোনো দাম নেই, কিন্তু এই সংসারে মাও একজন উপার্জনশীল ব্যক্তি। ভেবে দেখো, এ সংসারে মা নেই ভাবলে তোমরা কেমন মুষড়ে পড়ো।

প্রদীপ্ত ওর সঙ্গে একমত হয়েছিলো। প্রতীকও স্বীকার করেছিলো যে, কথাটা সত্যি। এখন এই মুহূর্তে এই সত্যি কথাটা স্বীকার করে অনুতাপে পুড়তে থাকে আলী আহমদ। কেন ও পুষ্পিতার সঙ্গে মেজাজ খারাপ করলো? আসলে ওর মেজাজ তো আগেই খারাপ হয়েছিলো। যখনই শুনেছে জেনারেল-প্রেসিডেন্ট বন্যার অবস্থা দেখার জন্য ঢাকা এসেছে, তখন থেকেই মেজাজ খচে যায়। ঠিকমতো ক্লাসও নিতে পারেনি। দুপুরে চা-সিঙ্গাড়া ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি। বিভাগে মিটিং ছিলো। তাহলে কার রাগ ও পুষ্পিতার উপর ঝাড়লো? প্রদীপ্ত আড়চোখে বাবাকে দেখে বলে, বাবা, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।

আলী আহমদ হ্যাঁ-না বলে না। মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর কথার রেশ ধরে বলে, বাবা চলুন, আপনাকে খেতে দি।

ভালো লাগছে না।

প্রতীক চেঁচিয়ে বলে, বুঝেছি বাবার মেজাজ কেন খারাপ।

প্রদীপ্ত সংশোধন করে, মেজাজ খারাপ নয় জিতু। মন খারাপ।

প্রতীক জোর দিয়ে বলে, মা'র প্রেসার ধরা পড়েছে এজন্য তো মন খারাপ হবেই। বাবার মেজাজও খারাপ।

বল কেন?

জেনারেল-প্রেসিডেন্ট যে ঢাকায়। ঠিক বলিনি বাবা?

আলী আহমদ মাথা ঝাঁকায়, বলেছিস।

বেটা বন্যা-দুর্গতদের জন্য মাত্র বিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আমাদের দরকার কোটি কোটি টাকা। তাছাড়া অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে উদ্ধারকাজ আর সাহায্য সামগ্রী পাঠানোর জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের দরকার হবে বাবা।

প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে কথা বললে আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, ও কেন এসেছে দীপু? ও তো ওর প্রিয় হুইস্কি ব্ল্যাক ডগ নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। পূর্ব বাংলা বন্যায় ভাসলো না ডুবলো তাতে ওর কি এসে যায়?

একজন অসহায় মানুষের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে আলী আহমদের মুখে। ওরা তিনজন এই অনুভবের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট ঢাকায়। বন্যার্তদের পর্যাপ্ত সাহায্য দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে এ দাবিতে আওয়ামী লীগ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। একই দিনে শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তি, দেশে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি দাবিতে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। সে সভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, বন্যার অজুহাতে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত আওয়ামী লীগ বরদাশত করবে না। এসব খবর পত্রিকায় পড়ে আলী আহমদ ভাবলো, জেনারেল-প্রেসিডেন্টের নাকের ডগায় এতকিছু কি তিনি বরদাশত করবেন? নাকি এর খেসারত দিতে হবে চরম। এর পাঁচ-ছয়দিন পরই জেনারেল-প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণায় নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিলেন। ঘোষণায় বলা হলো সাত ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে কিংবা তারও আগে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষণা শুনে আলী আহমদ প্রমাদ গুনলো। কি আছে জেনারেলের মনে কে জানে! ক্ষমতা ছাড়া কি এত সহজ? তাও আবার নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে? তবু ভালো, একটি তারিখ ঘোষণা করেছেন। বন্যার অজুহাতে নির্বাচন

BanglaBook.org

স্থগিত করে দেননি। এখন অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ঘটনা কি ঘটে না দেখার জন্য। দু'দিন পর যারা নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানালো সে নামগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো আলী আহমদ। মওদুদী, গোলাম আযম, নূরুল আমীন, খাজা খয়েরুদ্দীন প্রমুখ। নিজেকেই প্রশ্ন করলো ও, ওরা কারা?

এর ক'দিন পরই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, যদি নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন হতে দেয়া না হয় তাহলে তিনি সারা প্রদেশে দুর্বার গণআন্দোলন শুরু করবেন। টঙ্গীর জনসভায় দেয়া এ ভাষণের ওপর প্রেসক্লাবে বসে কথা বলছিলো নসিব হাফিজুদ্দিন আর প্রদীপ্ত। অনেকদিন পর দু'জনের দেখা। অনেক কিছু ওদের বলার ছিলো, কিন্তু সেসব দিকে না গিয়ে দু'জনে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে। নসিব বলে, সময় এখন বঙ্গবন্ধুর অনুকূলে প্রদীপ্ত।

আপনার তাই মনে হয় নসিব ভাই?

মনে হয়। কারণ উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাবার পর পূর্ব বাংলার মানুষের আস্থা তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিটি জনসভার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তাছাড়া ছয় দফা এবং এগারো দফা ভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার কারণেও তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর কাছে এখন মানুষের প্রত্যাশা অনেক।

আপনি কি ভাবছেন বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রের ক্ষমতায় যেতে পারবেন?

নসিব হাত উল্টে চোখ নাচিয়ে বলে, যেতেও পারেন। কে জানে?

মানবে কি ওরা? সাতচল্লিশের পর থেকে ইতিহাস তো মানার কথা বলে না।

থাক, এসব কথা। দেখা যাক কি হয়।

আপনি কেমন আছেন নসিব ভাই?

দেখে বুঝতে পারো না? কত দ্রুত বুড়িয়ে গেলাম। ক্লান্তি ছাড়া আর কোনোকিছু খুঁজে পাই না। জীবনকে বয়ে বেড়ানো কি তা আমাকে দেখে শেখো।

কিছু লিখছেন এখন? কোনো নতুন উপন্যাস? যে জীবনযাপন করছেন এটাই তো একটা চমৎকার থিম।

আমি জানতাম তুমি এভাবেই কথা বলবে। আমি একটি গল্প লিখেছি এবং সেটা তোমাকে পড়াবো বলে তোমাকে খুঁজে এখানে এসেছি।

প্রদীপ্ত অস্ফুটভাবে বলে, নসিব ভাই?

চলো কোণার দিকে বসি।

জায়গা বদল করে দু'জনে কোণায় চলে আসে। একদম নিরিবিলি, তাছাড়া প্রেসক্লাবে এখন তেমন ভিড় নেই। নসিব পাঞ্জাবির পকেট থেকে লেখাটা বের করে প্রদীপ্তকে দেয়। প্রদীপ্ত বেয়ারাকে চা-কাটলেটের অর্ডার দিয়ে গল্পটা পড়তে শুরু করে:

"যে সময় মানুষের ঘুমুনো উচিত সে সময় ওর ঘুম আসছে না। এজন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয় নাজিমুদ্দিন। ও সেলের লোহার শিকে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন সেল। চারদিক স্তব্ধ।

আকাশ দেখার চেষ্টা করে, যদিও জানে ঘুটঘুটে রাতে সেলের ফোকর দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। খোলা আকাশ দেখার জন্য খোলা প্রান্তর চাই। যার সামনে খোলা প্রান্তর নেই তার সামনে থেকে অনেক কিছু আড়াল হয়ে থাকে। নাজিমুদ্দিন একটি সিগারেটের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই শূন্য ঘরে প্রয়োজনীয় কিছুই নেই। কারণ এখানে এখন একমাত্র অপেক্ষা মৃত্যুর।

নাজিমুদ্দিন পায়চারি করে। সামান্য জায়গা, তবু এই পায়চারির মধ্যেও একটা গতি

BanglaBook.org

খুঁজতে চায়। নাকি ও ভয় পেয়ে পায়চারি করছে? অসম্ভব, এই মুহূর্তে আর যাই হোক ওর কোনো মৃত্যুভয় নেই। এই একটি চিন্তাকে ও ওর ভাবনার অন্তরালে নির্বাসিত করেছে। আসলে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটি ওকে উত্তেজিত করছে বলে ও পায়চারি করছে। পরশুদিন মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটে। ঠিক তখন বাড়ির পাশের পুলিশ ফাঁড়িতে তিনটার ঘণ্টা পেটানো হয়েছিলো। ওর উনিশ বছরের ছেলে পাশার পায়ের শব্দ পাচ্ছিলো ডাইনিং স্পেসে। ও প্রতি মধ্যরাতেই পানি খেতে ওঠে, ওর এক ধরনের অভ্যেস। পাশার পায়ের শব্দ এক মুহূর্তের জন্য ওদের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে থেমেছিলো। কোনো কারণে হয়তো আর ডাকেনি। ও কি কিছু আঁচ করেছিলো? হয়তো করেছিলো, হয়তো না। নাজিমুদ্দিন ওর চলে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলো এবং দেখেছিলো ধীরে ধীরে নাসিমার ঘাড় কাত হয়ে আসে, চোখ বুঁজে যায় এবং মেঝেতে রক্ত গড়াতে থাকে।

ভোরে নাজিমুদ্দিন দরজা খুললে পাশা চিৎকার করে বলেছিলো, বাবা তুমি? তারপর এক মুহূর্ত থমকে থেকে বলেছিলো, যেভাবে চলছিলো হয়তো এমনটিই ঘটতো। তারপর ও বিড়বিড় করে নাজিমুদ্দিনের মুখের ওপর বলে, কী অর্থহীন জীবন!

নাজিমুদ্দিন ভেবেছিলো ওর ছেলে মায়ের লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং শোক সামলে নিয়ে আক্রমণ করবে বাবাকে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। ও দু'চোখ বিস্ফারিত করে দেখেছিলো মেঝেতে পড়ে থাকা মাকে এবং দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে। নাজিমুদ্দিন ছেলের দিকে তাকিয়েছিলো। ওর বিড়বিড় করে বলা শব্দে প্রবলভাবে চমকে উঠেছিলো। ও তো ওর ছেলেকে কোনো অর্থহীন জীবনের অভিজ্ঞতা দিতে চায়নি। এই একটি বোধ এই নির্জন সেলে ওকে মরমে মারে। এজন্য ও ঘুমুতে পারছে না।

নইলে ও ভেবে দেখলো কাজটি ও ঠাণ্ডা মাথাতেই করেছে। খুব যে আঁটঘাট বেঁধে এগিয়েছিলো তা নয়, তবে আকস্মিকভাবেও করা নয় কিংবা উত্তেজনার বশেও নয়। ওর অবচেতনে এমন একটি ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই ছিলো। ওদের দাম্পত্য জীবনের অন্ধকারটুকুই দেখেছে পাশা, সে জন্যই ওর এমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং এই অন্ধকার একটু একটু করে জমেছে পাশার বুকে। নাজিমুদ্দিন কখনো বোঝেনি যে ছেলে এমন করে ওদের বিচার করেছে। ও সেলের শিক ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয় নিজেকে। ইচ্ছে করে সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলতে। ওর আর এখন ভাঙার সময় নেই। তাহলে কি ভাঙবে পাশা? কি ভয়াবহ ক্ষতি হয়ে গেলো ছেলেটির। জীবনে প্রবেশের আগেই জীবন সম্পর্কে এক বিশ্রী নেতিবাচক ধারণা হয়ে গেলো ওর। এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতটা অসহনীয় হয়ে যায় নাজিমুদ্দিনের কাছে। ও নাসিমার সঙ্গে বাইশ বছরের দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে। ভেবে পায় না কখন এই ছেলেটি নিঃশব্দে বুঝতে শিখলো যে বাবা এবং মায়ের এই জীবনযাপন অর্থহীন? ও বাবা-মা'র প্রতিদিনের ঝগড়া দেখেছে, প্লেট-গ্লাস ভাঙা দেখেছে, কাজের মেয়ে নিয়ে বাবার প্রতি মায়ের সন্দেহ দেখেছে, কুৎসিত গালাগাল শুনেছে এবং ভেবেছে এই জীবনের সবকিছু পুঁতি গন্ধময়। নাজিমুদ্দিন এই কলহমুখর দাম্পত্য জীবনের প্রতিক্রিয়া ছেলের ওপর কিভাবে পড়বে তা ভাবেনি কিন্তু ছেলে ঠিকই নীরব প্রতিবাদে অবলোকন করেছে এবং একটি সিদ্ধান্তে এসেছে। এখন এই অন্ধকার রাত ওর শরীরের সর্বত্র বেত্রাঘাত। ও সহ্য করতে পারছে না, চুঁইয়ে পড়ছে রক্তের রেখা। এখন ও এক অসহায় পিতা।

ও ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বসে পড়ে। জামাটা খুলে ছুঁড়ে দেয় দূরে। খালি গায়ে দরদরিয়ে ঘাম নামে। ও রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে বসে। ওর সামনে সেদিনের ছুরিটা জেগে ওঠে। মাঝারি আকারের ছুরিটা তেমন ধারালো ছিলো না। পরশুদিন মধ্যরাতে ও লিখছিলো। সন্ধ্যা থেকে শরীরটা খারাপ লাগছিলো, মধ্যরাতে বমির ভাব হয়। নাসিমা তখন ঘুমিয়ে। ও রান্নাঘর থেকে

BanglaBook.org

লেবু এবং ছুরিটা নিয়ে আসে। লেবুর টুকরোয় লবণ মাখিয়ে খেলে ওর বমির ভাব চলে যায়। তারপর থেকে দু'দিন ধরে ছুরিটা ওর টেবিলেই পড়ে থাকে। নাসিমা কখনো ওর টেবিল গোছায় না। বললে বলে, নিজের কাজ করে সময় পাই না। তোমারটা দেখবো কখন। এখানেই শেষ নয়। শ্লেষ মিশিয়ে কড়া গলায় উপদেশ দেয়, সেলফ হেলফ ইজ দ্য বেস্ট হেলপ। এ ধরনের অনেক উপদেশই নাজিমুদ্দিন নীরবে হজম করে। উপায় কি? সংসার তো রণক্ষেত্র হয়ে আছে। প্রতিমুহূর্তে কাড়া-নাকাড়া বাজালেই কি হয়? ফলে নিজের ছোটখাটো কাজগুলো সবসময় নিজেই করে ফেলে। ছুরিটা ও ইচ্ছে করে রেখে দিয়েছিলো। ওর ভেতরে অন্যরকম ইচ্ছে ছিলো। ছুরিটা দেখলে সে ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতো।

মাঝারি আকারের ছুরিটা তেমন ধারালো নয়। অথচ কত অবলীলায় ওটা নাসিমার পেটে ঢুকে যায় এবং নাড়িভুঁড়ি ছিটকে বেরিয়ে আসে। একটুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ভাবে, এত দ্রুত কি করে ছুরিটা চামড়া ভেদ করলো? তাহলে কি ওর ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকার কারণে দ্রুত ঘটে গেলো? ও চেয়েছিলো এভাবে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটাতে। দীর্ঘদিন ধরে এমন আকাঙ্ক্ষাই ওর অবচেতনে ছিলো। আসলে কোনোকিছুই দ্রুত ঘটেনি। ছুরিটা তার স্বাভাবিক গতিতেই নাসিমার চামড়া ভেদ করেছে। ঝগড়ার সময় নাসিমা যখন কুৎসিত ভঙ্গিতে এবং অশ্লীল ভাষায় মারমুখী হয়ে উঠতো তখনই ওর ইচ্ছে হতো ঐ ভঙ্গি এবং শব্দগুলো নিস্তব্ধ করে দিতে। ভাবলেই ও আস্তে আস্তে কেমন মিইয়ে যেত এবং নাসিমা ওকে দুর্বল ভেবে প্রবলবেগে সরব হয়ে উঠতো। নাসিমার এই ভঙ্গিটি ওর রুচিতে বাধতো এবং সবচেয়ে খারাপ লাগতো। ও অনেক ভেবে দেখেছে যে নাসিমার সঙ্গে ওর যে ব্যবধান সেটা কালচারাল ব্যবধান। ওর যে চাকরি এবং বেতন তা নিয়ে ও সামাজিকভাবে সম্মান এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই ছিলো। তবু এই নিয়ে মাঝে মাঝে নাসিমা অনুযোগ করতো। বলতো, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ও এসব অভিযোগ গায়ে মাখেনি। কারণ ও জানে নুন আনতে পান্তা ফুরোলে নাসিমার নিত্যনতুন শাড়ি গয়না হতো না। ওটা ও অভিযোগ করার জন্যই করতো। আসলে নাসিমার কালচারাল লেভেলটা ছিলো নীচু। এই একটি জায়গায় আপোস করা কোনোমতেই সম্ভব হয়নি নাজিমুদ্দিনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ও নাসিমার জন্য পাগল ছিলো। তখন কেন ও বুঝতে পারেনি নাসিমাকে? যৌবনের ভালোবাসার উন্মাদনায় অন্ধ ছিলো বলে? হয়তো তাই হয়তো না। নাসিমাকে ও আর কতটুকু সময়ই বা কাছে পেতো? যখন পেতো তখন এইসব সাংস্কৃতিক বোধটোধের ভাবনা তো সামনে আসেনি। তখন ও যা বলতো সেটাই প্রিয় হয়ে যেত। সেখানে ফাঁকের কোনো ব্যাপার ছিলো না। সবটাই মুগ্ধতা, সবটাই আবেগ। নাসিমা ওর প্রথম চুমু। তখন কি করে বুঝবে যে বিয়ের পর এই মেয়ে অন্য মেয়ে হয়ে যাবে? কোনোদিন বুঝতে চাইবে না। ওর কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক এবং জীবনযাপনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রুচি-অরুচির দিকগুলো। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ও যখন প্রথম হতো, সবচেয়ে খুশি হতো নাসিমা। তাহলে সবটাই কি ছিলো তারুণ্যের উচ্ছ্বাস? এর মৌলিক দিকটি কি নাসিমার দৃষ্টিতে আড়াল হয়েছিলো? এটাই সত্য। বিয়ের পরবর্তী সময়ে দু'জনেরই মুগ্ধতা এবং আবেগ কেটে গেছে। গড়ে উঠেছে যার যার জীবন এবং পছন্দ-অপছন্দের নানা দিক। নেহাতই রুটিন-বাঁধা জীবনযাপনে দু'জনের উপস্থিতি দু'জনের কাছেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিলো। তাহলে ওরা ঘর ভাঙেনি কেন? নাজিমুদ্দিন নিজেকে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পায় না। সেটা কি পাশার কারণে? নাকি সামাজিক সম্মানের কথা চিন্তা করে? না, কোনো উত্তরই নাজিমুদ্দিনের মনমতো হয় না। ও ভেবে দেখলো ডিভোর্সটা ওর রুচিতে বেধেছিলো। তাহলে এখন যে ঘটনাটি ঘটলো সেটা কি খুব সম্মানজনক? না, সেজন্যই ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

BanglaBook.org

রুচিহীন কোনোকিছুই যখন ওর কাম্য নয় তখন ইতি টানাই শ্রেয়। আর পেছন ফেরা নয়।

যৌবনের শুরুতে ও তো নাসিমাকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছিলো। স্টেশনের কাছের সেই বাড়িটার অন্ধকার বারান্দায় নাসিমার ঠোঁট স্পর্শ করলে কী গভীর মমতায় নাসিমা ওর কাছে সমর্পণ করেছিলো নিজেকে। তখন তো এই আধুনিক শহরটি ছিলো না। এখনকার মেডিক্যাল হাসপাতালে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন। রমনার এপাশে ছিলো ঘনসবুজ গাছের সারি। নির্জন রাস্তায় হেঁটে গেলে নাসিমার চপ্পলে উঠে আসতো রমনার ধুলো। জীবনের সবটাই ছিলো পূর্ণতা, মনে হতো হ্যামলকের পেয়ালায় উপচে পড়ছে বিষ নয়, অমৃত। জীবনের বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করার বাসনা তো ছিলো দু'জনের মধ্যে। তবু কেন পরাজিত হয়ে গেলো ওরা? এই শহর ক্রমাগত বদলেছে। জীবনযাত্রা জটিল হয়েছে। এই শহর এখন সিঙ্গারের 'ফুল' গল্পের নায়ক গিমপেলের মতো। এই শহর এখন আর নিজেকে বুঝতে চায় না। কারণ বুঝতে না চাওয়াটাই জ্ঞান, বুঝতে চাওয়াটা মূর্খতা। নাজিমুদ্দিনের মনে হয় এই শহরে যা কিছু ঘটছে দৃষ্টি খুলে সেটা না দেখতে শিখিয়েছে গিমপেল। এই একই গোলকধাঁধায় আবর্তিত হতে হতে নাজিমুদ্দিন যৌবনের সবকিছু হারিয়ে এখন প্রকৃতই হ্যামলকের পাত্র মুখে তুলেছে।

দু'দিন আগে এই নির্জন সেলে প্রবেশ করেছে ও। ভেবে দেখলো প্রবেশ শব্দটা ঠিক নয়। ও প্রবেশ করেনি, ওকে ঢোকানো হয়েছে। যেখানে নিজের ইচ্ছায় ঢোকে না সেটা কি প্রবেশ? না প্রবেশ নয়। যেমন নাসিমার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমুনোর পরও মনে হতো এটা দাম্পত্য ঘুম নয়। নেহাতই রুটিন, গৎবাঁধা জীবনযাপনের অংশ। যেমন রাত নামে, অন্ধকার হয়, অন্ধকার বাড়ে, অন্ধকার বাড়লে ঘুমুতে হয়। না ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়। সেজন্য নিয়ম মানতে হয়। নাসিমার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমুনো এই নিয়ম মানা। নাজিমুদ্দিনের বাবা মারা গেছে আশি বছর বয়সে। ও দেখেছে সাতাত্তর বছর বয়সেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওর বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। পাঁচ-সাত দিন কোনো ছেলেমেয়ের বাসায় কাটিয়ে আসতো। নাজিমুদ্দিন নাসিমার সঙ্গে এত ঝগড়ার পরও ঘর ছাড়েনি। ঘর ছাড়াটা ও রুচিহীন মনে করেছে। যে ঘরে আবার ফিরতে হবে সে ঘর ছেড়ে লাভ কি? ঘর যদি ছাড়তে হয় একবারেই ছাড়বে যেখানে আর ফিরে আসতে হবে না।

এখন একটি খুনের আসামী হয়ে ও ভেবে দেখলো জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বাধা ছিলো। বাধা ও অতিক্রম করতে পারেনি। বারবারই মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রতিবারই নিজের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের উপর হাত দিয়ে অনুভব করেছে যে একটা কিছু ঘটা দরকার। সিঙ্গারের নায়ক গিমপেল হয়ে থেকে লাভ নেই। গিমপেল সেজে এ জীবনের অনেক ঘটনা ও দেখেও দেখেনি। আর কত? এই অনুভবের মধ্য দিয়েই তো ও মুক্তি চেয়েছিলো। সেটা খুনের মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং ধরে নিতেই হবে যে এর জন্য ও প্রস্তুত ছিলো।

ও বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। এতক্ষণে কিছুটা ক্লান্তি লাগছে। চোখ বুঁজে আসতে চায়। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রার মতো আচ্ছন্নতায় ও ঝিমিয়ে থাকে। ও প্রাণপণে নিজের কোনো ভালো দিনের কথা মনে করতে চায়। জীবনের সবটাই তো তিক্ততা বা অন্ধকার নয়, ক্ষণিকের জন্য হলেও এক ফোঁটা উজ্জ্বল আলো কিছু মুহূর্তকে আলোকিত করেছিলো। পাশার জন্মের দু'দিন পর এমন একটি মুহূর্ত দু'জনকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিলো। ফিরোজা বেগমের ক্লিনিকে পাশার জন্ম। ঐ ঘুমন্ত শিশুর লাল মুখ দেখে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরেছিলো নাসিমাকে। সেদিন কী পেলব ছিলো নাসিমার শরীর, কী স্নিগ্ধ ছিলো দৃষ্টি। কী মোহনীয় হাসিতে মাতিয়ে দিয়েছিলো নাজিমুদ্দিনকে। নাজিমুদ্দিন বলেছিলো, চলো লং ড্রাইভে তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবো।

BanglaBook.org

নেচে উঠেছিলো নাসিমার চোখের পাতা। বলেছিলো, কোনো দোকানে নেমে আইসক্রিম খাবো কিন্তু।

তাই সই।

নাজিমুদ্দিন হাসতে হাসতে বাচ্চাকে আদর করেছিলো। আয়ার কাছে ওকে রেখে দু'জনে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে পড়ে। গাড়ি চালাচ্ছিলো নাজিমুদ্দিন নিজে, পাশে নাসিমা। মিরপুর ব্রিজ পেরিয়ে তরা নদীর ধার পর্যন্ত চলে এসেছিলো ওরা। ঝকঝকে সাদা ভক্সওয়াগন সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিলো, তরা নদীর শান্ত পানিতে ছিলো শেষ বিকেলের আলো, খেয়াঘাটে মানুষের ভিড়। দু'জনে সবুজ ঘাসে হেঁটেছিলো, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের মাছ ধরা দেখেছিলো, গরু নিয়ে ঘরে ফেরা কৃষকেরা ওদের দেখেছিলো।

নাসিমা হাসতে হাসতে বলেছিলো, কী সুন্দর জীবন না?

নাজিমুদ্দিন সায় দিয়েছিলো, ঠিক আমাদেরই মতো। নাসিমা ভুরু কুঁচকে ছিলো, আমাদেরই মতো? নাজিমুদ্দিন জোর দিয়েছিলো নিজের কথায়, নয়তো কি? এমন শান্ত, স্নিগ্ধ সংসার, ঘরে এসেছে নতুন অতিথি।

এখন এই অন্ধকার সেলে এই কথাগুলো হাতুড়ির বাড়ির মতো নাজিমুদ্দিনের বুকের ওপর পড়ে। একজন মানুষ পিতা হলে কি জীবনকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করে? হ্যাঁ, তাই হবে। তেমন উচ্ছ্বাস ওকে ব্যাকুল করেছিলো।

ও ভুলে গিয়েছিলো ওর বাবার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। যে বাবা সাতাত্তর বছর বয়সে দাম্পত্য-কলহের কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্টেশনের বেঞ্চে বসে রাত কাটিয়েছিলো। পরদিন ওরা যখন তাকে খুঁজে পায় তখন সে অসুস্থ, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। পাশার লাল মুখ দেখেও ও ভুলে গিয়েছিলো যে নাসিমার সঙ্গে ছোটখাটো বিরোধ শুরু হয়েছে, প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয় এবং মনোমালিন্যও। কিন্তু এখন সে শিশুটি যুবক, যুবকের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র হয়, জীবনের নানা দিক সে আবিষ্কার করে। কিন্তু শুরুতেই এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হোক পাশা– এটা নাজিমুদ্দিন চায়নি। তাহলে কেমন করে কাটবে ওর সারাটি জীবন? ও জোর করে দু'চোখের পাতা বুঁজে রাখে। ওর ইচ্ছে ও মৃত্যু সম্পর্কে কিছু ভাববে, অন্তত কিছু দার্শনিক চিন্তা করবে। মন বলে করা উচিত নয়। কেন নয়? জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে হাজার রকম ভাবনা আসছে। মানুষের চিন্তাশক্তি যতক্ষণ সক্রিয় থাকবে ততোক্ষণ মানুষ চিন্তা না করে পারবে না। ও এই মুহূর্তে নিজেকে ব্যর্থ মানুষ মনে করে না। এই মৃত্যু ওর আনন্দেরই। তখন ওর ঘুম পায়। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর পক্ষে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। দু'দিন ধরে উকিল এবং তার সহযোগীরা যাওয়া-আসা করছে। ও মুখ খুলতে নারাজ। সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে যা ঘটেছে সেটা সত্য। আমি আমার স্ত্রীকে নিজের হাতে খুন করেছি।

উকিল জোর গলায় বলে, আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে। কারণ আপনার কোনো সাক্ষী নেই।

সাক্ষী আছে?

কে?

আমার ছেলে।

ও তো পরে জেনেছে। ঘটনার মুহূর্তে ও ঘরে ছিলো না।

চেঁচিয়ে ওঠে নাজিমুদ্দিন, ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। আপনারা আমার সঙ্গে আর কথা বাড়াবেন না।

নিজের ওপর আপনার এই বিতৃষ্ণা কেন?

BanglaBook.org

নাজিমুদ্দিন উকিলের মুখের দিকে তাকায়। থ্যাবড়া চেহারা। বুদ্ধির কোনো ছাপ নেই। এই লোকটি ওর সঙ্গে দার্শনিক কথা আলাপ করতে চায়। কী বাজে রসিকতা। ও বিরক্তি বোধ করে। সেভ করেনি বলে লোকটির মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি এবং সাদা গোঁফ গজিয়েছে। জঘন্য লাগছে। ওর গা ঘিন ঘিন করে। আগের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে উকিল দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, ছেলের জন্যও কি আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না?

আপনি কি আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন?

কেন একা থাকতে চান? আল্লাহ্‌কে ডাকবেন? কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবেন?

নাজিমুদ্দিন আর কথা বলে না। উকিলের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসে।

উকিল মরিয়া হয়ে বলে, আপনি কি আপনার ছেলেকে দেখতে চান?

হ্যাঁ, চাই। কিন্তু দেখাতে পারবেন না।

নাজিমুদ্দিনের চেহারায় প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। তীব্রস্বরে বলে, আপনি কি দেখাতে পারবেন দুই দিনের ঘুমন্ত লাল শিশুকে? আমি আমার সেই ছেলেটিকেই দেখতে চাই। এখন আপনি কাকে দেখতে বলছেন? যার কাছে জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে?

উকিল কি বলবে বুঝতে না পেরে বলে, আপনি শান্ত হোন। আমি আবার কাল আসবো।

না, আসবেন না। দোহাই লাগে আসবেন না।

নাজিমুদ্দিনের চেঁচামেচিতে উকিল বিব্রত হয়ে বেরিয়ে আসে। ওর পানির পিপাসা পায়, কিন্তু হাতের কাছে পানি নেই। ও পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে থাকে। বুকে হাঁফ ধরেছে। ও বড় করে শ্বাস নেয়। শেষের দিকে এমন করে শ্বাস নেয়া ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। জীবনে কিছুই পাওয়া হলো না এমন একটা বোধে আক্রান্ত হলেই ওর বুক ফুটো হয়ে যেত। এখন তেমন লাগছে। পরদিন আবার উকিল আসবে। উকিলকে দেখেই ও নিশ্চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। উকিল অনেক কথা বলে যায়– যুক্তির কথা, আবেগের কথা, জীবনের কথা। ও লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় ও লজ্জা পেয়ে বলে, আপনি কিছু বলছেন না যে?

আমি তো শুনছি।

আপনি কিছু বলবেন না?

না।

তাহলে আপনার সিদ্ধান্তই কি চূড়ান্ত?

ফাঁসির আসামীর সিদ্ধান্ত একটাই থাকে। কারণ আমার কৃতকর্মের জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই।

অনুতাপ নেই?

না।

আপনি যা করেছেন সেটাই ঠিক?

হ্যাঁ।

তাহলে তো বাঁচার ইচ্ছা থাকার কথা।

নাজিমুদ্দিন চুপ করে থাকে।

উকিল জোর দিয়ে বলে, বলুন?

বলার কিছু নেই।

তাহলে কি বুঝবো আপনার বাঁচতে না চাওয়ার অন্য কোনো কারণ আছে?

আহ্। আপনি বড় বেশি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টানছেন। আমি আপনার সঙ্গে আর কোনো কথা বলতে চাইনে।

BanglaBook.org

ঠিক আছে, আমি কাল আবার আসবো।

নাজিমুদ্দিন চেঁচিয়ে বলে, না আর আসবেন না। উকিল জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন নাজিমুদ্দিন ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে থাকে। ওর কান্নার শব্দে জেলখানার কিছু লোক জড়ো হয়ে যায়। ওরা সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে নাজিমুদ্দিনের জন্য মমতা অনুভব করে। ওদের সজল দৃষ্টিতে তেমন ভাষাই ফুটে ওঠে। ওদের মুখে অস্ফুট ধ্বনি। নাজিমুদ্দিন পাশার জন্য কাঁদে– পাশার আগামী দিনগুলোর জন্য ও বুক ফাটিয়ে কাঁদে। নাসিমার মৃত্যুর জন্য ওর কোনো অনুতাপ নেই। ছেলের ভবিষ্যৎ ওকে গভীর অনুতাপে দগ্ধ করে। কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে যে পাশাকে জীবনযাপন করতে হবে। পিতার এই ব্যর্থতায় নাজিমুদ্দিনের চোখের জল ফুরোয় না।"

পড়া শেষ হলে প্রদীপ্ত ভুরু কুঁচকে বলে, বাজে লেখা।

নসিব লেখাটা টেনে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখে।

খুব যত্ন করে রাখলেন দেখছি?

নসিব প্রদীপ্তর খোঁচার জবাব না দিয়ে বলে, তুমি না বলেছিলে আমার জীবনযাপনই উপন্যাসের থিম?

সেটা এ জীবন নয়। খুন কোনো মানবিক ঘটনা নয়।

তোমার কাছে যা খুন আমার ঐ গল্পের নায়কের কাছে তা বেঁচে যাওয়া প্রদীপ্ত।

অসম্ভব। এই মৃত্যুর সঙ্গে শ্রেণীশত্রু খতমের পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য তো আছেই। তাদের পটভূমি বড়। ওরা একটি আদর্শে বিশ্বাস করে।

আমি পার্থক্য দেখতে পাই না নসিব ভাই। কারণ দুটো মৃত্যুর মধ্যে আছে জীবন সম্পর্কিত ধারণায় ভ্রান্তি-বিলাস।

প্রদীপ্ত তুমি ভুলে যাচ্ছো যে এটা আমার জীবনেরই গল্প।

কিভাবে এটা আপনার জীবনের গল্প হলো?

হয়নি, হবে। দোদুলের বয়স যখন বাইশ বছর হবে তখন ঘটনা এমনই ঘটবে। তবে আমি অতদিন অপেক্ষা করবো না, ঘটনা আগেই ঘটবে। এটা তার একটা চিত্র।

প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে বলে, এসব কি বলছেন নসিব ভাই?

প্রশ্ন করছো কেন প্রদীপ্ত? আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সবই বোঝ।

তাহলে আপনি কি নিজেই আপনার মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

করবো।

এভাবে?

হ্যাঁ, এভাবেই।

নসিব দু'ঠোঁটে জুড়ে থাকা সূক্ষ্ম হাসির সঙ্গে এক অদ্ভুত চাউনি দিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রদীপ্তর দিকে। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে না কি আছে সে দৃষ্টিতে– আনন্দ, বিষাদ, ঘৃণা নাকি ভালোবাসা? ও নিজের পরিবর্তন টের পায়– যে মানুষটার অন্ধ ভক্ত ছিলো ও, যাকে একজন ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে দেখতে পেয়ে ওর মুগ্ধতার শেষ ছিলো না, সে মানুষটাকে এখন অমানবিক, নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। ও যা করতে চাচ্ছে তাতে ও কিছুতেই সায় দিতে পারছে না। ওর ভেতরে রাগ বাড়তে থাকে। ও বুঝতে পারে ওর ঘৃণার আগুনে পুড়ছে নসিবের মগজ– যেন ও আর কিছু চিন্তা করতে না পারে। পুড়ছে চোখ, যেন ও কিছু দেখতে না পায়, পুড়ছে ঠোঁট যেন কথা বলতে না পারে। পুড়ছে নসিবের অবয়ব।

নসিব ঠোঁটের হাসি অবিকল রেখে সুঁচালো চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বলে, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করছো?

BanglaBook.org

সেটাই তো আপনার প্রাপ্য।

হো-হো করে হেসে ওঠে নসিব। তারপর প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে বলে, আমি এখন ঘৃণা-ভালোবাসার বাইরে।

আপনি কি সুস্থ নেই?

একশ ভাগ সুস্থ।

আপনি নিজে যা খুশি তা করতে পারেন, কিন্তু অন্যকে–

নসিব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, সেটাই যদি বুঝতে তাহলে তুমি নসিব হাফিজুদ্দিন হতে। নিজে মরে গেলে আনন্দ নেই। আমি আর একজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আনন্দ পেয়ে মরতে চাই।

আপনার ঐ গল্পে আনন্দের কথা নেই।

ওটা গল্প নয়। ওটা আমার স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্টে আনন্দকে প্রকাশ করতে চাই না। ওটা নিজের ভেতরে থাকুক।

তাহলে কি আপনি এ স্টেটমেন্টের মধ্য দিয়ে অন্যের সহানুভূতি চেয়েছেন?

মৃত্যুর পর কি ঘটবে তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই।

প্রদীপ্ত রেগে চেঁচিয়ে বলে, আই হেট ইউ।

নসিব হো-হো করে হেসে ওঠে। তখন শহীদ সাবের ঢোকে। সোজা ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়, দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, পরণে চট, খালি গা। চুল এবং দাড়ি এমনভাবে জট পাকিয়েছে যে ওটা আর কোনোদিন খুলবে বলে মনে হয় না। নসিবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, হাসছিস কেন? একটা টাকা দে। নসিব একটা টাকা বের করে দেয়। শহীদ সাবের চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে তীব্রভাবে প্রদীপ্তর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, বলো এটা বেঁচে থাকা না মৃত্যু?

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। নসিব সশব্দে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর যুক্তি দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না প্রদীপ্ত। আমি খোঁজার চেষ্টা করি না। একটা সহজ সমাধান বের করে ফেলি।

প্রদীপ্তর কাছ থেকে জবাব আশা না করে বেরিয়ে যায় নসিব। প্রদীপ্ত চেয়ারের পেছনে দু'হাত তুলে হেলান দিয়ে বসে থাকে। নসিবের চলে যাওয়া নিয়ে ওর ভাবনায় কোনো তোলপাড় হয় না। ভাবে, সৃজনশীল মানুষের খেয়ালিপনা বোধহয় ন্যাচারাল। নসিব হাফিজুদ্দিন এখন এক ন্যাচারাল অবস্থার বাসিন্দা, যখন সে এর বাইরে যাবে তখনই তার কষ্ট বাড়বে, বেঁচে থাকার কষ্ট। আর শহীদ সাবেরের এই জীবনযাপন ইন্দ্রিয়ের অতীত। একে প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকা বলে না। তাহলে এটা কি? প্রদীপ্ত নিজেকেই উত্তর দেয়– নসিব থাকলে ওকেও সে এই একই কথা বলতো– আসলে এটা মৃত্যু।

সে মুহূর্তে শহীদ সাবের এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ওর টেবিলে এসে চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে। নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে সিগারেট বের করে আগের টুকরো থেকে ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, চা খাওয়াবি?

প্রদীপ্ত বেয়ারাকে এক কাপ চাপ আনতে বলে।

সাবের মুখ নিচু করে ধোঁয়া ছাড়ে। প্রদীপ্ত ওর দৃষ্টি দেখতে পায় না। ওর মনে হয় দৃষ্টির সঙ্গে পুরো মুখ দেখতে না পেলে সে মুখের অভিব্যক্তি ধরা পড়ে না। ও কপাল এবং গালের পাশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও বুঝতে পারে এ মুখ স্বাভাবিক নয়– এ মুখে অভিব্যক্তি নেই। কাউকে ভালোবাসার ছাপ আর ফুটে ওঠে না ঐ মুখে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি ওর মুখভরা দাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং মিলিয়ে যায়। ও মুখ তোলে না কেন? ও

BanglaBook.org

কি কিছু চিন্তা করছে? ও কি আসলেই কিছু ভাবতে পারে? নাকি ওর মগজের প্রতি কোষে কোষে মৃত্যু, সাবের তো বেঁচে নেই।

বেয়ারা ওকে চা দিয়ে যায়। ও কাপটা টেনে নিয়ে নিমেষে শেষ করে ফেলে। চা খাওয়ার ফাঁকে প্রদীপ্ত ওর দৃষ্টি দেখতে পায়, না ঐ দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই, ওটা শূন্য দৃষ্টি। যে মানুষের দৃষ্টি শূন্য সে বেঁচে থাকে কি করে? চা খেয়ে আর একটি সিগারেট জ্বালায় আগের টুকরোটি থেকে, তারপর সে টুকরো ফেলে দেয় মেঝেতে। প্রদীপ্ত কুড়িয়ে নিয়ে চায়ের কাপে গুঁজে দেয়। সাবের তখনো অন্যমনস্ক, ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। একসময় ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, কি দেখছিস?

মৃত্যু।

মৃত্যু? হা-হা করে হেসে ওঠে সাবের। ঘরের মধ্যে যারা ছিলো তারা ওর দিকে ঘুরে তাকায়। প্রদীপ্ত ভ্রুক্ষেপ করে না। ও সাবেরকেই দেখে। সাবের হাসতে হাসতে বলে, মৃত্যু একটা কাক।

কাক? প্রদীপ্ত দেখতে পায় সাবের সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যাচ্ছে। এখন আর হাসি নেই। কাকেদের মুখে হাসি থাকে না। প্রদীপ্তর নসিবের কথা মনে হয়। নসিবও কি একটা কাক?

তিন দিনের মাথায় পত্রিকার পৃষ্ঠায় খবর হয় নসিব। খবরটি এমন : 'স্ত্রীকে খুন করার দায়ে লেখক নসিব হাফিজুদ্দিন গ্রেফতার। তিনি খুনের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন।' সকালবেলা কাগজে এ খবর পড়ে আলী আহমদ প্রদীপ্তকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ওঠায়। ও রাত করে ফেরে বলে সকালে কখনোই ঘুম থেকে ওঠে না। আলী আহমদের ডাকাডাকিতে সবাই ছুটে আসে। আচমকা ঘুম থেকে উঠে সবচেয়ে অস্থির হয় পুষ্পিতা। চোখ বড় করে বলে, কি হয়েছে, কি? তোমার চেঁচামেচি শুনে আমার প্রেসার বুঝি বাড়লো।

প্রদীপ্ত বাবাকে মৃদু ধমক দেয়, এমন চেঁচাচ্ছো কেন বাবা? জানো যে মা প্রেসারের রোগী।

চেঁচাবো না? তোর বন্ধু নসিব বৌকে খুন করেছে। এতবড় একটা খবর! কী সাংঘাতিক!

ও আমাকে বলেছিলো যে এমন ঘটনাই ঘটাবে।

তাহলে জেনেশুনে একদম ঠাণ্ডা মাথায়?

হ্যাঁ, একদম ঠাণ্ডা মাথায়। আমি ঘুমুতে গেলাম।

মঞ্জুলিকা, প্রতীক, পুষ্পিতা ওকে একগাদা প্রশ্ন করতে চাইলে ও সবাইকে উপেক্ষা করে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে। সোজা জবাব, এ ঘটনার কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা যাবে না। তোমরা কিছু জানতে চেও না।

আলী আহমদ পেছন থেকে ডেকে বলে, ও পুলিশকে একটি গল্প দিয়েছে। বলেছে, ওতে সব লেখা আছে। তুই গল্পটা পড়েছিস?

পড়েছি। প্রদীপ্ত আর দাঁড়ায় না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়। মনে হয়, কাল ও নসিবকে বুঝতে পারেনি– বুঝতে পারলে অত রূঢ় না হয়ে ও আরো খানিকটুকু সহানুভূতিশীল হতে পারতো। নসিবকে ফেরানোর চেষ্টা করতে পারতো। বলতে পারতো, নসিব ভাই খুন, আত্মহত্যা এসব তো জীবনের কাছে নতি স্বীকার। আপনাকে আমি একজন পরাজিত মানুষ হিসেবে দেখতে চাই না। ও দু'হাতে নিজের চুল টেনে ধরে। মানুষের এমন যন্ত্রণা-কষ্ট থাকে বলেই তো– মানুষ– ওহ্ না, ও কিছুই ভাবতে পারছে না। নসিব তো সাধারণ মানুষ নয়, একজন সৃজনশীল মানুষ, যিনি তাঁর চারপাশ, সমাজ, দেশকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। সৃজনশীল মানুষই তো জীবনের

BanglaBook.org

পাতা উল্টে ফেলে– সবুজ পাতাগুলোকে লাল করে দেয় বা পাতাঝরা শূন্য গাছটা কিশলয়ে ভরিয়ে তোলে। নসিব কি? কেমন করে ও নসিবকে চিনবে?

তখন দরজায় শব্দ করে মঞ্জুলিকা ওকে ডাকে। না খুললে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, কি হলো খুলছো না কেন?

প্রদীপ্তর রাগ হয়। ও চায়নি কেউ ওকে বিরক্ত করুক। ধড়াম করে দরজা খুলে রেগে বলে, কি চাও?

মঞ্জুলিকা বাঁকা চোখে তাকায়, রেগে আছো কেন? প্রদীপ্ত একই ভঙ্গিতে বলে, তোমার কোনো কাজ না থাকলে আমি দরজাটা বন্ধ করতে চাই।

আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে নসিবের এই ঘটনায় পুলিশ কি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে?

করতে পারে।

ধরে নিয়ে যাবে?

যেতে পারে, নাও পারে। আমি কি জানি তার।

এভাবে বলছো কেন?

কীভাবে বলবো? নসিব ভাইর জন্য পুলিশ যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে আমি একশ'বার যেতে রাজি। কিন্তু আমার মনে হয় সে সম্ভাবনা কম। নসিব ভাই কাউকেই নিজের কৃতকর্মের সঙ্গে জড়াবে না। তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

মঞ্জুলিকা খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রদীপ্তর এমন আচরণের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না। ও বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদে প্রদীপ্ত। খোলা দরজা দিয়ে সে শব্দ পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে যায়। পুষ্পিতা আর মঞ্জুলিকা ছুটে আসতে গেলে আলী আহমদ বাধা দেয়। তবু ওরা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ঢোকে না। আলী আহমদ নিজের পড়ার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রতীক ওর পড়ার টেবিলে বসে কান্নার শব্দ শোনে, ও কাগজে খুনের বিবরণ পড়ছিলো। একবার মাথা তুলে আবার পড়তে থাকে। একজন অনাত্মীয় মানুষের জন্য বাড়িতে শোকের ছায়া নামে। তখন একদমই সকালবেলা, দিনের শুরুর সময়– অথচ সময় এই বাড়িতে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়, যেন এ বাড়িতে আজ দিনটা অনেক লম্বা– এ দিন পেরিয়ে কিভাবে যে রাত আসবে ওরা তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আজ সবারই সব কাজে দেরি হবে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে শুয়েছিলো প্রতীক, তেমন গাঢ় ঘুম হয়নি, খানিকটা তন্দ্রার মতো এসেছিলো। এর মধ্যে এলোমেলো-আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে। ঘুম ভাঙতে ধড়মড় করে উঠে টেবিলের ওপর থেকে হাতঘড়িটা টেনে নিয়ে তাকাতেই স্থির হয়ে যায়। সর্বনাশ, পাঁচটা দশ। পাঁচটায় বন্যার সঙ্গে দেখা হবার কথা জিন্নাহ এভিন্যুর বেবি আইসক্রিমের দোকানে। এতক্ষণে বন্যা পৌঁছে গেছে, ওরা দু'জনেই সাক্ষাতের সময় কখনোই সময়ের এদিক-ওদিক করে না, বরং নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যায়। বন্যার সঙ্গে দেখা হবে আর ও দেরিতে পৌঁছবে এমন ঘটনা ওর জীবনে একদিনও হয়নি। আজ যে কি হলো? ইস, বন্যা বসে থেকে ক্ষেপছে, ভাবতে ভাবতে ও ছুটলো বাথরুমে। কোনো রকমে কাপড় পরে সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে তখন আরো দশ মিনিট পেরিয়েছে, রিকশা ধরে যেতে যেতে আরো বিশ মিনিট। বন্যার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালো প্রতীক, তখন ও চোখ তুলে তাকালো না। একমনে নখ দিয়ে টেবিলের ওপর আঁকিবুকি কাটছে। প্রতীক চেয়ার টেনে ওর সামনে বসে ডাকলো, বন্যা? ও তাকালো– ওর দৃষ্টি দেখে হিম হয়ে গেলো প্রতীকের ভেতরটা, কেমন এক বিষাদময় ঠাণ্ডা নিস্পৃহ দৃষ্টি, যেন কাঁদতে চাইছে, কিন্তু পারছে না,

BanglaBook.org

ফেটে যাচ্ছে বুকের ভেতর- চড়চড় শব্দ উঠছে চারদিক তোলপাড় করে।

আমি কি খুবই দেরি করেছি? বন্যা উত্তর না দিলে ও আবার বলে, হ্যাঁ, ভীষণ দেরি করেছি। তোমার এবং আমার জন্য এ এক দীর্ঘ সময়। তুমি ভেবেছো প্রতীক্ষার এই সময়ে মহাকাল পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কি জানো, আজ সকালে খবরের কাগজে নসিব হাফিজুদ্দিনের খুনের খবরটা পড়ে আমরা সবাই যেন কেমন হয়ে গেলাম। আমি ঠিক তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না বন্যা। নসিব হাফিজুদ্দিন ভাইয়ার প্রাণের বন্ধু ছিলো। তুমি কি কাগজে পড়েছো ঘটনাটা?

পড়েছি। আমি জানতাম নসিব হাফিজুদ্দিন দীপু ভাইয়ার বন্ধু। আমি এ ঘটনায় তেমন আলোড়িত হইনি।

বলো কি? আমি-

থামো জিতু।

বন্যা আকস্মিকভাবে ওকে থামিয়ে দেয়। প্রতীক চুপ করে যায়।

তুমি তো আসার পর থেকে তোমার নিজের কথাই বলে যাচ্ছো।

তোমার কি হয়েছে বন্যা? আমি তোমার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি যে আমার দেরিতে আসার কারণ ছাড়াও, তোমার আরো কিছু হয়েছে। আগে বলো কি খাবে?

ভ্যানিলা।

আমিও তাই।

প্রতীক কাউন্টারে যায়। ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে গা-এলিয়ে চেয়ারে বসে। ওর স্বস্তি লক্ষ করে বন্যা বলে, ছেলেরা যখন পারিপার্শ্বিক না বুঝে নিজেদের কথা একতরফাভাবে হড়বড় করে বলতে থাকে তখন তাকে আমার ভীষণ হাবা মনে হয়।

প্রতীক ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, ঠিকই বলেছো। আমি আজকে তেমন আচরণই করেছি। আসলে আমি খুব টেনশনে ছিলাম। তুমি একা এখানে বসে রয়েছো।

এখানে বাঘ নেই।

হেসে ফেলে প্রতীক। বেয়ারা আইসক্রিম দিয়ে যায়। বন্যা মুখ নিচু করে খেতেই থাকে। মুখ তোলে না। প্রতীক কিছুই বুঝতে পারে না, কি করবে তাও ভেবে পায় না। এক সময় আইসক্রিমের বাটিটা সামনে ঠেলে দিয়ে বন্যা বলে, আজ আমার কান্না পাচ্ছে না রাগ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমার জীবনে কখনো এমন দিন আসেনি। কখনো মনে হচ্ছে চিৎকার করে কেঁদে ঢাকা শহরটা ভাসিয়ে দেই, কখনো মনে হচ্ছে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরি। আমি কি করতে চাই আমি নিজেই জানি না।

প্রতীক চুপ করে ওর কথা শোনে, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। একটু পর আইসক্রিমের বাটিটা টেনে নিয়ে বন্যা আবার মুখ নিচু করে। এক চামচ খেয়ে বলে, গতকাল রাতে বাবা বিয়ে করে বাড়ি ফিরেছেন। বলেছেন, তোমাদের মা। সালাম করো। আমরা দু'ভাই বোন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বাবা খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সালাম করো। নতুন মা তাড়াতাড়ি বললেন, থাক সালাম করতে হবে না। এসো আমার কাছে এসো। তিনি পার্থর হাত ধরতে গেলে পার্থ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই শুনতে পাই ও চিৎকার করে কাঁদছে। নতুন মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমারও কি কান্না পাচ্ছে? আমি তীব্র চোখে তার দিকে তাকাই, জবাব দেই না। বাবা নতুন মাকে বললেন, সুরমা, চলো ঘরে চলো। নতুন মা খানিকটুকু এগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার হাতটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে আবার ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, বন্যা, তোমার বাবার ইচ্ছায় আমি তোমাদের

BanglaBook.org

সংসারে এসেছি। জোর করে আসিনি। তোমাকে এবং পার্থকে আমি ভালোবাসবো। কিন্তু বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকেও ভালোবাসা চাই। একতরফা কোনোকিছুতেই আমি বিশ্বাস করি না। কথাগুলো বলে তিনি শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা তো আগেই ঢুকেছিলো। আমি বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। শোবার ঘরে মা'র একটা ছবি ছিলো। ওটা আছে না বাবা সরিয়ে রেখেছেন দু'একদিনে সেটা আমি খেয়াল করিনি। আমার মনে হচ্ছিলো নতুন মা'র কঠিন কথাগুলো আমার মা'র চারপাশে কঠিন দেয়াল তুলে দিলো। আমি নিজের ঘরে এলাম, কাঁদতে পারলাম না। মনে হলো কাঁদবো কেন? পার্থর ওপর রাগ হলো। ও-ইবা কাঁদবে কেন? ওর দরজায় ধাক্কা দিলাম, ও দরজা খুললো না। নিজের ঘরে ফিরে এলাম। কি করবো? কাঁদবো নাকি ঐ দরজাটার গায়ে লাথথি মারবো? অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারলাম না। ভোর রাতের দিকে ঘুম এলো। সকালে বাবার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, পার্থ কৈ? বললাম, জানি না। বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমি পার্থর ঘরে ঢুকলাম। বালিশের নিচে আমার জন্য একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছে ও। লিখেছে : 'আমি চলে যাচ্ছি। কোথায়, জানি না। এ বাড়িতে আর থাকবো না।' চিরকুটটা হাতে নিয়ে নিজের ঘরে এলাম। পার্থ নেই, তবু আমার কান্না পেলো না। এ শহরে ও হারিয়ে যাবে, ওর কিইবা বয়স, ও কোথায় যাবে? ভাবতেই আমার মাথা কেমন করে উঠলো। আমি বিছানার ওপর পড়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। কেউ আমাকে ডাকেনি, আমার কাছে আসেনি। রানু তো আসতে পারতো? ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটে বাজে। রানু কি আজ কিছুই রান্না করেনি? রান্নাঘরে গেলাম, খিদে পেয়েছে। দেখলাম, রান্নাঘরে বসে রানু কাঁদছে। নতুন মা ওকে আমার ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছে। ও ভয়ে আমার কাছে যায়নি। আমাকে দেখে ও মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না সামলালো। তারপর আমাকে ভাত খেতে দিলো। আমি রান্নাঘরে ওর পাশে বসে ভাত খেলাম। চারটার দিকে বাবা ফিরলেন। বললেন, আত্মীয়স্বজন কারো বাসায় পার্থ নেই। আগামীকাল কাগজে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবেন। বিকেলে থানায় যাবেন। একটুপর কাউকে কিছু না বলে আমি চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আমিও কি পার্থর মতো হারিয়ে যাবো এই শহরে?

প্রতীক ওর হাত চেপে ধরে বলে, না।

তাহলে আমি কি করবো?

তুমি বাড়ি ফিরে যাবে।

বন্যা আঁতকে উঠে বলে, তুমি তাই বলছো?

মহিলা তো তোমার কাছে শুধু ভালোবাসা চেয়েছেন। আর তো কিছু চাননি। ভালোবাসা দেয়া কি খুব কঠিন বন্যা?

আমার মা?

তোমার মা তোমারই। তোমার মা'র স্থান তো কেউ দখল করতে পারবে না।

কিন্তু তাঁকে বাবার সঙ্গে দেখলে, মা'র ঘরে দেখলে–

আহ্ বন্যা, আমি বুঝি তোমার কষ্ট। কিন্তু এটাও সত্য যে মৃত মায়ের জন্য এই কষ্টের চেয়ে তোমার বেঁচে থাকা অনেক বড়।

উপদেশ শুনতে আমার ভালো লাগছে না। বন্যা দু'হাতে মুখ ঢাকে এবং কেঁদে ফেলে। প্রতীক ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলে, এখন কান্নার সময় নয়। চলো আমরা পার্থকে খুঁজি।

পার্থকে? কোথায় খুঁজবো?

ও ছেলেমানুষ। কতদূর আর যাবে? রাগ করে বেরিয়েছে, হয়তো পার্কে, স্টেশনে

BanglaBook.org

কোথাও থাকতে পারে।

বন্যা উজ্জ্বল চোখে বলে, ও বলধা গার্ডেনে যেতে ভালোবাসে জিতু। বাবা আমাদের একদিন বলধা গার্ডেনে নিয়ে গেছেন। ওখানে গেলে পার্থ কী যে ছুটোছুটি করে। যেন গাছগুলো ওর বন্ধু। আল্লাহ্, যেন পার্থকে ওখানে পেয়ে যাই। তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হবো। আমি পার্থকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো জিতু।

বন্যার হাসিতে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখ দেখে স্বস্তি ফিরে পায় প্রতীক। এ মুখটা এখন বলধা গার্ডেনের পদ্মপুকুরে ফুটে থাকা নীল পদ্ম, যেমন দ্যুতি, তেমন তার রঙের আভা। প্রতীকের মুগ্ধ দৃষ্টি ওর মুখে আটকে যায়। বন্যা এতকিছু খেয়াল করতে পারে না– ওর ভেতরটা ছটফট করছে। চলো জিতু, বলে ও হাঁটতে শুরু করে। যেতে যেতে বলে, আল্লাহ্, সন্ধ্যা হবার আগেই যেন পার্থকে পেয়ে যাই। ওকে না পেলে আমি ঠিক মরে যাবো। প্রতীক মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার কি হবে? বন্যা শুনেও শুনতে পায় না ওর কথা। ও একটি স্কুটারের জন্য এদিক-ওদিক তাকায়।

বলধা গার্ডেনের পদ্মপুকুরের সিঁড়িতে চুপচাপ বসেছিলো পার্থ। প্রায় পানির কাছাকাছি, দু'তিনটে সিঁড়ি উপরে বসে ও পানিতে পা ডুবিয়ে রেখেছে। ওপর থেকে ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে বন্যা, দেখো দেখো জিতু ও কেমন করে বসে আছে? যেন ওর কেউ নেই, ও এতিম।

পার্থকে ডাক দিয়ে বন্যা লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে যায়। পার্থর গলা জড়িয়ে ধরে। দু'ভাইবোন কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে। প্রতীক নিচে নামে না, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেন কাঁদছে ওরা? কীসের সংকট ওদের? প্রতীক ভেবে দেখলো ওদের সংকট একটি নতুন সত্যের মুখোমুখি হতে না পারার– এই কঠিন বাস্তব ওরা স্বীকার করতে পারছে না। এই সত্য ওদের এতদিনের জীবনযাপনকে এলোমেলো করে দিচ্ছে বলেই এই কান্না। সবচেয়ে বড় কথা ওরা বাবার ওপর ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারাচ্ছে, তাই নতুন মানুষটিকে সহ্য করতে পারছে না। নতুন মানুষটি ভালো কি মন্দ, এ প্রশ্ন ওদের নেই– মানুষটি কেন আসবে এ সংসারে– ওদের জগতে? ওরা তো জানে না এসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। ওরা তো জানে না ওদের বাবার প্রয়োজন ওদের মতো নয়, ওদের চেয়ে একদম ভিন্ন। যার সঙ্গে ওদের ভাবনার কোনো মিল নেই। তবু দিন গড়াবে এবং একসময় সবকিছু ওদের সয়ে যাবে।

বন্যা আর পার্থকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে প্রতীকের মনে হয়, ওরা দু'ভাই বোন ওদের বাবাকে হারিয়েছে। ওদের মা মারা যাবার পর যে বাবাকে ও দেখেছে, সে বাবা এখনকার মতিউর চাচা নয়। এটাই কি প্রকৃতির নিয়ম? কেমন অবলীলায় মতিউর বললো, আমি জানতাম ওরা নিজে নিজেই ফিরবে। তাই আর থানায় যাইনি। উটকো ঝামেলা পোহাতে ভালোলাগে না। বয়স তো হয়েছে! তাছাড়া বন্যাও যখন বেরিয়ে গেলো ভাবলাম বন্যা বোধহয় জানে যে পার্থ কোথায় গিয়েছে। আমার আর খোঁজার দরকার নেই। কী চমৎকার নিরুদ্বেগ, উৎকণ্ঠাহীন কণ্ঠ! দু'জনে বৈঠকখানায় বসে চা খাচ্ছিলো আর গল্প করছিলো। বোঝাই যায় পরিতৃপ্ত সময় কাটিয়েছে। সুরমাকে দেখিয়ে বললো, তোমার চাচী। তোমার বাবা কেমন আছে? আসতে ব'লো। চা খাবে?

না, থাক।

প্রতীক আর দাঁড়ায় না। ততক্ষণে বন্যা আর পার্থ নিজ নিজ ঘরে চলে গেছে। ওদের নতুন মা ওদেরকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি। রিকশায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো প্রতীকের। বিকেলে ও বন্যাকে যেসব কথা বলেছে এবং যা ভেবেছে তার সবটাই একতরফা– আসলে বন্যা আর পার্থই বুঝবে সময়টা ওদের জন্য কি রকম–

BanglaBook.org

বাইরে থেকে সবটা বোঝা যায় না। বাড়ি ফিরলে আলী আহমদ ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তোকে একটু বিষণ্ন মনে হচ্ছে জিতু?

মতিউর চাচা বিয়ে করেছেন বাবা।

পুষ্পিতা বিস্ময় প্রকাশ করে, বিয়ে? এই বয়সে?

আলী আহমদ হো-হো করে হেসে বলে, বিয়ের কি বয়স লাগে নাকি!

নিজের ঘর থেকে বাবার হাসি শোনে প্রতীক। হাসিটা ওর একটুও ভালোলাগে না। এখন যদি মা মরে যায় তাহলে বাবাও তো বিয়ে করতে পারে। তখন কি ও নিজেও বন্যা এবং পার্থর মতো ঘর থেকে পালাতে চাইবে? সে রাতে ওর বারবারই ঘুম ভেঙে গেলো, ও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না।

ক'দিন ধরে আলী আহমদের খুব অস্থির লাগছে– কেন ও তা জানে না, কোনো কারণ ছাড়া এমন মানসিক অবস্থা ওর কখনো-সখনো হয়। এই হওয়াটা ও মেনে নিয়েছে– এবং মনে হয় এই হওয়াটা প্রতিদিনের জীবনযাপনের বাইরে নিয়ে যায় ওকে। ওর সময় খারাপ কাটে ঠিকই, কিন্তু চিত্তসুখের একঘেয়ে অবস্থা থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় স্বস্তির সময়টা গা-ঘিনঘিন করা– পোকায় কাটা। তখন এই অবস্থা ওকে ঘুণপোকা করে দেয়– ও নিজের ভেতর বাসা বানিয়ে সময়ের কাঠ কাটে। তাহলে এই অস্থিরতা কি ওর নিজের তৈরি? না, সচেতন তৈরি নয়, অবচেতনের ডালপালা– কখন যে গজায় ও টের পায় না। সকাল থেকেই কোনো কাজে মন বসছে না ওর, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি, ক্লাস নেই, টিউটোরিয়াল নেই। লিখতে বসতে চেয়েছিলো, সেটিও হচ্ছে না। 'সমকাল'-এর সম্পাদক বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখতে। কি লিখবে চিন্তা করেছে, কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। এই সময়টাকে ও শূন্য সময় বলে– এটি একটি বিশাল কালো গহ্বর– এর ভেতর যা কিছু প্রবেশ করে তা ক্রমাগত অদৃশ্যে ধাবিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোনোকিছু আলী আহমদের সঞ্চয়ে থাকে না। ও ঘুরে ফিরে নিজের টেবিলে আসে। প্রদীপ্ত ইয়াহিয়া সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তিকাটি ওর টেবিলে কখন রেখে গেছে ও জানে না। ক'দিন আগে 'ভোটের আগে ভাত চাই' পুস্তিকাটি ও টেবিলের নিচে রাখা বইয়ের স্তূপ থেকে প্রদীপ্তকে খুঁজে দিয়েছিলো। ও একটি ফিচার লিখবে বলে নিয়েছিলো। কয়েক মাস আগে মওলানা ভাসানী ভোটের আগে ভাত দেয়ার দাবি তুলেছিলেন এবং ঐ নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সরকার পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করে। হঠাৎ করে আলী আহমদের মনে হয় ভাসানী কি নির্বাচন চান না? সেজন্য এই ধুঁয়া তুলেছেন যে ভোটের আগে ভাত চাই? সামরিক সরকারের পক্ষে কি সম্ভব জনগণের ভাতের দাবি নিশ্চিত করা? গণতান্ত্রিক সরকারই পারে সাধারণ মানুষের দুঃখ বুঝতে। যে বাহিনী প্রতিরক্ষার নামে দেশের সিংহভাগ বাজেট খায় গণমানুষের জন্য তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওরা বোঝে অস্ত্র এবং অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের দম্ভ– বোঝে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং তার কারণে জনগণকে পীড়ন। পূর্ব বাংলার মতো ছোট্ট প্রদেশে ওদের প্রয়োজন কি? ওরা আছে মিছিলে গুলি চালানোর জন্য এবং দুর্গত এলাকায় রিলিফ বণ্টনের দরকারে। আর এদের জন্য রক্ত জল করছে সাধারণ মানুষ। তাহলে জনগণের নেতা কার কাছে ভাত চাচ্ছেন? তিনি বিপ্লবের কথা বলছেন– লালটুপি বাহিনী নামে বিপ্লব দল গঠন করেছেন। তিনি স্লোগান দিচ্ছেন 'মুক্তির একই পথ, সশস্ত্র বিপ্লব'– বিপ্লবই যদি মুক্তির পথ হয় তাহলে তিনি নির্বাচন নিয়ে ভাবছেন কেন? নির্বাচন হলেই বা কি না হলেই বা কি! নির্বাচন তো তাঁর বিপ্লবের অন্তরায় নয়। তিনি তাঁর মতো বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকুন– উৎখাত করুন সামরিক সরকার– সাধারণের মন থেকে মুছে দিক গণতান্ত্রিক সরকারের স্বপ্ন। দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েমের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হোক জনগণের ভাতের দাবি। কিন্তু হঠাৎ

BanglaBook.org

করেই নিজেকে প্রশ্ন করে আলী আহমদ, জনগণ কি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত? জনগণ যদি প্রস্তুত হয় তাহলে ভাসানী ন্যাপের কেন স্লোগান দিতে হবে নির্বাচন, নির্বাচন- বর্জন, বর্জন। জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন বর্জন করবে- বিপ্লবীদের সহায়ক শক্তি হবে। বলবে সশস্ত্র বিপ্লব লাল সালাম। কোনো পরিবর্তন যদি সুফল বয়ে আনে তবে তা কে না চায়? সত্যি সামনে কি তেমন সুদিন? আলী আহমদ কি ওর জীবনকালে দেখে যেতে পারবে এমন এক অভাবনীয় ঘটনা? দেখে যেতে পারবে এ দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সরকার? ও হাত উল্টে একটা ভঙ্গি করে বলে, কে জানে। ওর অস্থিরতা ওকে আবার বারান্দায় নিয়ে আসে। ও চেয়ার টেনে পড়ার টেবিলে বসতে পারে না। কোনো বই খুলে বসতে পারে না- পায়চারি করে। ব্যক্তিগতভাবে ও নিজে চায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার, চায় গণতন্ত্র- মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর কেউ যেন হস্তক্ষেপ না করে- চায় মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে এমন একটি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি। কিন্তু ভোটের আগে ভাতের দাবি প্রধান হয়ে উঠলে হয়তো জেনারেল-প্রেসিডেন্ট আর একজন জেনারেলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে পড়বেন, বাঁচাবেন নিজের পিঠের চামড়া। জনগণের চারপাশের অন্ধকার আরো গাঢ় হবে। আবার পিছিয়ে যাওয়া; আবার নতুন করে শুরু।

কয়েকদিন আগে বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জে দেয়া এক ভাষণে বলেছিলেন, নির্বাচন হোক আর না হোক আমরা আমাদের দাবি আদায় করবোই করবো- এবং দাবি আদায়ের সংগ্রামে আমরা আর শহীদ হবো না, আমরা গাজী হবো।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদের প্রার্থী মনোনয়ন চলছে। বঙ্গবন্ধু পুরাতন ঢাকার একটি এবং নতুন ঢাকার টঙ্গী ও তেজগাঁও এলাকা- এ দুটো জাতীয় পরিষদ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও পি.ডি.পি. এক হয়ে 'ইসলাম-পছন্দ ঐক্যজোট' গঠন করে। তারা নিজ দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়। কিন্তু আলী আহমদ ধাক্কা খায় তখনই যখন দেখতে পায় ওর ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তাহলে তো ওরা নির্বাচন বর্জনের স্লোগান দিয়ে সাধারণ মানুষকে নির্বাচন বিমুখ করতে পারেনি। সেজন্যই কি নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলো? আলী আহমদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে জনগণ পক্ষ অবলম্বন করলো- গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের পক্ষ। রাতে এ নিয়ে প্রদীপ্তর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। ঘুমুতে যাবার আগে মঞ্জুলিকা দু'জনকে দু'কাপ চা দেয়। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনের আলোচনা ফুরোয় না। প্রদীপ্তর ধারণা এ নির্বাচনে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে। ও আলী আহমদকে বলে, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি বাবা সময়টা আওয়ামী লীগের অনুকূলে। সাধারণ মানুষ তো শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কোনো নেতার কথা ভাবতে পারে না। রাস্তাঘাটে, দোকানে-বাজারে তুমি লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখো বাবা- ওদের ওপিনিয়ন খুব স্ট্রং। বলে, শেখ একটা বাপের বেটা। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের মেজরিটি নিশ্চিত। ইসলামের ধ্বজাধারীরা যতই ঐক্যজোট করুক কাজ হবে না। সশস্ত্র বিপ্লবের স্লোগানেও কাজ হবে না। মানুষের ভেতর এখন জোয়ার।

আলী আহমদ মাথা নাড়ে। চুপ করে ছেলের কথা শোনে। ও যখন বলে বেশ গুছিয়ে বলে, শুনতে ভালোলাগে। আলী আহমদ উঠতে উঠতে বলে, অনেক রাত হলো ঘুমুতে যা দীপু।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত শেষ খবরটা বাবাকে দেয়, তুমি তো এখনো খবর পাওনি বাবা যে নির্বাচন কমিশন ইসলামাবাদ থেকে দেশের উনিশটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক সম্পর্কে এক ঘোষণা জারি করেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা।

ভালোই হয়েছে। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা। আর এসব নদীতে ঘুরে বেড়ায় হাজার রকমের নৌকা। দীপু, কী অপূর্ব এ দেশের নদীগুলোর নাম– আগুনমুখা, আন্ধারমানিক, নীলগঞ্জ, পায়রা, সুরমা, করতোয়া, কর্ণফুলি, মধুমতী, ইছামতী– আরো অনেকগুলো নাম বলতে বলতে আলী আহমদ শোবার ঘরে যায়।

প্রদীপ্ত হাসলো। ওর মনে হলো, বাবা বুঝি আঙুলের ডগায় নদীর নাম গুনছে। কিন্তু বাবা ওর প্রিয় নদী বুড়িগঙ্গার নাম বলেনি। মেঘনার নামও না। বাবা কি ভুলে গেছে, নাকি পরে মনে করেছে?

ভাবতে ভাবতে প্রদীপ্ত শোবার ঘরের দরজা লাগায়। সে শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মঞ্জুলিকার। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে, ক'টা বাজে? প্রদীপ্ত ঘড়িতে সময় দেখে, সর্বনাশ– আড়াইটা। কাল খুব ভোরে আমাকে মানিকগঞ্জ যেতে হবে। আমাকে ডেকে দিও মঞ্জুলি।

আমি পারবো না। তুমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখো।

হ্যাঁ, তাই রাখি। কাজের সময় তুমি একটুও আমাকে হেলপ করো না।

মঞ্জুলিকা জবাব দেয় না। ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোরে মঞ্জুলিকার যখন ঘুম ভাঙে তখন বেশ বেলা হয়েছে। আজ ওর স্কুল ছুটি। প্রদীপ্ত কখন চলে গেছে ও টের পায়নি। কিন্তু ওর উঠতে ইচ্ছে করছে না– মাথা ঝিমঝিম করছে, খানিকটা দুর্বলও লাগছে। পেটের ভেতর কিছু একটা পাক দিয়ে উঠছে। বমি লাগছে কি? মঞ্জুলিকা বিছানায় উঠে বসে। ওর ভয় করতে শুরু করে। দরজার দিকে তাকায়। প্রদীপ্ত দরজাটা খুলে রেখে যায়নি– ওটা মুখে মুখে লাগানো। ও উঠে দরজার ছিটকিনি দেয়। এখন ওর নিজের সঙ্গে বোঝা দরকার– একদম একা হয়ে, আর কাউকে না ডেকে। গতকাল থেকে চিন্তাটা মাথার ভেতর ঘুণপোকা হয়েছে, ঘুণঘুণ শব্দে কাটছে, কেটেই যাচ্ছে। এ মাসের মাসিক এখনো হয়নি, পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে। তাহলে কি– বুকটা ধ্বক করে ওঠে। মঞ্জুলিকার ভয় কেটে যায়, ও আনন্দিত হয়ে ওঠে। তাহলে কি সে সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওর শরীরে? সে, যে একটি বিন্দু থেকে পরিপূর্ণ মানবশিশু হবে। নিজের ভেতর চঞ্চলতা অনুভব করে মঞ্জুলিকা। একে একে খুলে ফেলতে থাকে কাপড়– প্রথমে শাড়ি, তারপর পেটিকোট, ব্লাউজ, সবশেষে ব্রা– ও নগ্ন হয়ে দেখতে চায় নিজেকে। এ শরীর কার? আমার না ওর? আমারই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে ভিন্ন কেউ, তাকে ছেড়ে দিতে হবে নিজের জায়গা-জমিন? এর নামই কি মাতৃত্ব? ওর ডান হাতের তালু স্থাপিত হয় উদরে– যেটা এখনো স্ফীত হয়নি– এখানে ও তিলে তিলে বাড়বে– প্রাণ পাবে, চোখ ফুটবে, প্রত্যেকটি অঙ্গ গঠিত হবে– তাহলে এই মুহূর্ত থেকে এই উদর ওর। বাম হাত স্থাপিত হয় জন্ম-খালের ওপর– এই খাল দিয়ে বেরিয়ে আসবে ও। এই পথ এখন থেকে ওর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে। দুটো হাতই উঠে আসে স্তনে– এখন থেকে এই স্তন বদলাতে থাকবে– বদলাবে আকার, রঙ– ভরে উঠবে নির্যাসে– সবই তো ওরই জন্য। তাহলে এ শরীর কি আমার নয়? মঞ্জুলিকা সারা ঘরে পায়চারি করে। একটি বিশেষ সময়ের জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমারই দখল। আমি অনবরত আমারই শরীরের ভেতর তৈরি করবো দ্বিতীয় আমি। আলমারির পাল্লায় লাগানো লম্বা আয়নায় ও দেখতে থাকে নিজেকে। আয়নার ভেতরের মঞ্জুলিকা ওকে প্রশ্ন করে, তোমার কেমন লাগছে মঞ্জুলিকা? ও প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে, জিজ্ঞেস করো না, জিজ্ঞেস করো না এমন প্রশ্ন। এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। শুধু এটুকু জেনো যে ওর জন্য আমি আমার

BanglaBook.org

সমস্ত অঙ্গ দিয়ে দিলাম। তবু আমি বলতে পারবো না যে আমার কেমন লাগছে। খোঁপা ভেঙে চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়ে পিঠের ওপর। ও চুলের গুচ্ছ দু'হাতে ছড়িয়ে দিতে দিতে বলে, আমি এখন একজন পরিপূর্ণ নারী।

দরজায় শব্দ হয়। পুষ্পিতা ওকে ডাকে, বৌমা তুমি কি উঠেছো? ও মেঝে থেকে কাপড় তুলে বাথরুমে যায়।

বৌমা তোমার কি শরীর খারাপ?

বাথরুমের দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলে, মা আমি বাথরুমে। একটুপর বেরুচ্ছি।

তুমি তো কখনো এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোও না, তাই ভাবলাম কি হলো?

আমার কিছু হয়নি মা।

তাড়াতাড়ি এসো। নাস্তা খাবে।

ও বুঝতে পারে পুষ্পিতা চলে গেছে। ও শাওয়ারের নিচে দাঁড়ায়। জল গড়ায় শরীরে। সত্যি কি আমার কিছু হয়নি? মা, আমি মিথ্যে বলেছি। আমার ভীষণ কিছু হয়েছে। আমি আর আগের আমি নেই। আমি নতুন আমি হয়েছি।

দুপুর নাগাদ মানিকগঞ্জ থেকে ফিরে প্রদীপ্ত সোজা জেলখানায় যায়। অনেক ধরাধরি করে নসিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেছে। নসিব হাফিজুদ্দিন স্ত্রীকে খুন করার পর এই প্রথম প্রদীপ্তর সঙ্গে দেখা হবে। নসিব কি খুশি হবে ওকে দেখে? যদি রেগে যায়? প্রদীপ্তর বুক শুকিয়ে যায়– তার ওপর লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছে। বাসে ভীষণ ভিড় ছিলো, ওর তেষ্টা পেয়েছে– কিন্তু ভেতরের তাড়নায় ও কোথাও দাঁড়াতে পারে না। নসিব ওকে দেখে ঠাণ্ডা গলায় বলে, কেন এসেছো প্রদীপ্ত?

প্রদীপ্ত জোর করে মুখে হাসি টানে, আপনাকে দেখতে নসির ভাই।

আর কখনো এসো না। এলে আমি দেখা করবো না।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে, নসিবকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ও মরিয়া হয়ে বলে, যে কাজ আপনি সচেতনভাবে করেছেন তার জন্য কি আপনার অনুতাপ হচ্ছে?

অনুতাপ? জ্বলে ওঠে নসিবের চোখ, ঐ শব্দটি আমার অভিধানে নেই।

তবে আপনি এত বিষণ্ন কেন? আপনার মনের জোর নেই কেন?

দোদুলের জন্য খুব খারাপ লাগছে। ওকে একটি অর্থহীন জীবনের দায়ভার থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি হয়তো ওর জীবনে গভীর কোনো জটিলতা তৈরি করে ফেললাম। একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে, যাকগে, সবই এখন টু লেট। তারপর মৃদু হেসে বলে, বাবা তো হওনি বাবা হলে বুঝতে পারতে।

বাবা? শব্দটি প্রদীপ্তকে আচ্ছন্ন করে। তারপর হেসে বলে, হইনি তো কি হয়েছে? একদিন তো হবো। এখন কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে প্রেসক্লাবে যাই। আপনি তো চা আর কাটলেট খেতে ভালোবাসেন। দু'জনে বেশ জমিয়ে আড্ডা দেবো। আর যত ইচ্ছে চা-কাটলেট খাবো।

প্রদীপ্ত তুমি আমাকে নস্টালজিক করো না।

আপনার 'এই সময়' উপন্যাসের সেই চরের বুড়োর কথা কি আপনার মনে আছে?

আছে। কেন?

ঐ বুড়োর ছেলেটি শহরে এসেছিলো কাজের খোঁজে। আর কোনোদিন গাঁয়ে ফিরে যায়নি। বুড়ো জানতেই পারেনি যে তার ছেলে ছয় দফার পক্ষে মিছিল করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেছে। সেই ছেলে আদমজী পাটকলে শ্রমিকদের নেতা ছিলো।

নসিব রেগে গিয়ে বলে, এসব কথা কেন বলছো?

BanglaBook.org

বলছি এজন্য যে আপনি আপনার ছেলের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। বাবারাও তো ছেলেদের জন্য কষ্ট পায়। আপনি নিজে সে গল্প লিখেছেন।

তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছো প্রদীপ্ত।

মোটেই না। আপনি যা করেছেন আমি তার জন্য আপনাকে বিষণ্ন দেখতে চাই না।

নসিব দু'হাতে মুখ ঢেকে বিড়বিড় করে বলে, বাবা হওয়া ভীষণ যন্ত্রণার।

প্রদীপ্ত নসিবের দিকে তাকিয়ে থাকে– সে কপালে ঘাম এবং মুখ জুড়ে যন্ত্রণার চিহ্ন। ও নসিবের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিজের মুঠিতে নিয়ে বলে, আপনাকে আমার বলার কিছু নেই নসিব ভাই। আপনি একজন সৃজনশীল মানুষ, কখনো আপনি অমিতাভ গফুর হন, কখনো অসীম রায়হান– আপনি মানসিক ভ্রমণে চলে যেতে পারেন পুশকিনের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিদারাবাদ গ্রামে। আপনাকে আমি ছুঁতে পারবো না, পারিও না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি আপনার প্রতিটি অনুভবে কষ্ট আছে– বাবা হওয়ার যন্ত্রণা আপনার জন্য কোনো আলাদা অনুভব নয়। আপনি শেষ দিনগুলো যন্ত্রণার আনন্দে থাকুন– যন্ত্রণার কষ্টে নয়।

যন্ত্রণার আনন্দ? নসিবের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রদীপ্তর মনে হয় ওই উজ্জ্বল চোখে বেঁচে থাকার আশ্বাসে ঝলক দিয়ে উঠেছে, ও আলো নিভবে না– নিভতে পারে না। কেউ যদি নেভাতে চায় তা ব্যক্তির ব্যর্থতা, সমষ্টির নয়– সমষ্টির বেঁচে থাকার আধার বিশাল, গভীর এবং আকাশ, পাতাল, মর্ত্যে পরিব্যাপ্ত।

জেলগেটে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্তর মনে হয় ও কোথায় যাবে? বাড়িতে নাকি প্রেসক্লাবে? ওর বুকটা হু-হু করছে। ও একা থাকতে চায়। একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। হুড তুলে দেয়। বৃষ্টি না হলে ও হুড তুলে রিকশায় বসে না। আজ ওর খোলা কিছু ভালো লাগে না। ও আড়াল চায়– চায় নিজেকে সামলানোর জন্য একটা কিছু অবলম্বন। বিদায় নেবার সময় নসিব বলেছিলো, তুমি আবার এসো প্রদীপ্ত। বলেছিলো, ফাঁসি দেবার আগে ওরা তো আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমি কার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চাই, আমি তোমার কথা বলবো প্রদীপ্ত। তুমি আসবে তো?

প্রদীপ্ত মাথা নিচু করে নিজেকে সামলেছিলো। ওর দু'চোখে জল, চোখ তুলে তাকাতে পারছিলো না। ওর সাড়া না পেয়ে নসিব আরো বলেছিলো, তুমি তো জানো আমার খুব প্রিয় এবং কাছের মানুষ কেউ নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনের শেষ কাঙ্ক্ষিত মানুষটি হবে। হবে তো প্রদীপ্ত?

ও শুধু মাথা নেড়েছিলো। কথা বলার মতো অবস্থা ওর ছিলো না। দু'হাতে নসিবের ডান হাত চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদতে। এসব ভাবনার মাঝে ওর চোখ আবার ভিজে ওঠে। ও পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মোছে। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে ও বাড়িতে ফেরে। ঠিক করে নসিবের এই কথাগুলো ও কাউকে বলবে না– কথাগুলো শুধু ওর নিজেরই থাক। নিজের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার সময় ও কিছুতেই বুঝতে পারলো না যে ও কেন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলো। কথাগুলো কি মঞ্জুলিকাকে বলা উচিত ছিলো না? দু'জনে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোবো না এমনই তো কথা ছিলো। তবু মঞ্জুলিকাকে কথাগুলো বলবে এ রকম সাড়া ও নিজের মনের কাছে পেলো না।

দরজা খুলে ওকে দেখে অবাক হয় মঞ্জুলিকা। পুষ্পিতা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। আলী আহমদ ইউনিভার্সিটিতে। প্রতীক বাড়িতে নেই। প্রদীপ্ত হেসে বলে, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি? যেন আমি একটা আজব মানুষ?

আজব মানুষ নও, কিন্তু তুমি আজব সময়ে ফিরেছো। এটা তোমার ফেরার সময় নয়।

BanglaBook.org

মনে হলো তোমাকে একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করার আছে।

শুধু এজন্য তুমি বাড়ি ফিরেছো?

প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি।

তুমি আমাকে অবাক করছো। প্রশ্নটি কি?

আমি কবে বাবা হবো মঞ্জুলি?

খিলখিল করে হেসে ওঠে মঞ্জুলিকা, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

একজন বললো বাবা হলে আমার কিছু নতুন উপলব্ধি হবে।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে বলে, তা তো হবেই। বাবা হলে তুমি অন্য মানুষ হবে। কিন্তু আমি কি করে জানবো যে তুমি কবে বাবা হবে?

তুমিই তো জানবে। তুমি ছাড়া কে আর আমাকে আমার সন্তানের খবর দেবে?

এসব কথা পরে হবে। এই দুপুরবেলা নিশ্চয় তুমি খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরোনি। ভাত খাবে?

হ্যাঁ খাবো। ভীষণ খিদে পেয়েছে। যাই, গোসল করে আসি।

মঞ্জুলিকা রান্নাঘরে এসে থমকে যায়। ও কেন প্রদীপ্তকে খবরটি জানালো না? কেন ও সবটুকু আবেগ নিজের ভেতর ধরে রাখলো? ব্যাপারটি কি শুধুই ওর একার? যদি বলি এই মুহূর্তে শুধু আমারই, তাহলে কে অস্বীকার করতে পারবে? মঞ্জুলিকা পুলকিত শিহরণ নিয়ে খাবার বাড়ে। ও সিদ্ধান্ত নেয় এখনই প্রদীপ্তকে কিছু বলবে না। যে অনুভবের সঙ্গে ওর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই তার থেকে ও দূরেই থাকুক। এ অনুভব আমার এতই ব্যক্তিগত যে ও তা শেয়ার করতে পারবে না। ওকে কি করে বোঝাবো যে আমার ভেতরে আর একটি মানবশিশুর নড়ে ওঠার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আজ সকাল থেকে আমি আমার শরীরে মৃগনাভির গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু ও তো পায়নি। পেলে ও প্রথমেই বলতো, মঞ্জুলি তোমার শরীরে পদ্মের গন্ধ কেন? আমার শুক্রানু কি তোমার ডিম্বকোষে ভ্রূণ হয়ে উঠেছে? বলে লাভ নেই, এসব ব্যাপারে সব পুরুষ মানুষই বোধহয় এমন স্টুপিডই থাকে। ও ভাবলো, এখন থেকে আমি আমারই শরীর নিয়ন্ত্রণ করবো। আমিই ঠিক করবো দ্বিতীয় সন্তান কখন হবে– তৃতীয় সন্তান আদৌ হবে কি না। কয়টি সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করবো এ আমারই স্বাধীনতা। প্রদীপ্ত গোসল সেরে খাবার টেবিলে এসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলিকার করুণা হয়। এখন ওকে মঞ্জুলিকার কাছে অনুনয় করতে হবে বাবা হওয়ার খবর জানার জন্য।

ভাত খেতে খেতে বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যায় প্রদীপ্ত। আসলে মঞ্জুলিকার কাছে ওর কোনো জরুরি প্রশ্ন ছিলো না। নসিব ওর মাথা জাম করে রেখেছে। প্রথমে নসিব ওকে দ্বিতীয়বার না আসার জন্য বলেছিলো, শেষে ও ওকে বিদায়-মুহূর্তের মানুষ হিসেবে মনোনীত করেছিলো। কেন? কেমন করে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে? প্রদীপ্ত ঠিকমতো খেতে পারে না। মঞ্জুলিকা যে গালে হাত দিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে ওকে দেখছে সেটা ও খেয়ালই করে না। মঞ্জুলিকা ওর প্রশ্নের উত্তর যে পাশ কাটিয়ে গেছে সেটাও ও খেয়াল করে না। ও এখন একজন মানুষের অস্থির চিত্তের গ্রন্থি খোলার চিন্তা করছে। ও জানে এটা ও কখনোই করতে পারবে না। ওর এই অন্যমনস্কতার সুযোগে এই প্রথম মঞ্জুলিকা ওকে পুরুষ হিসেবে অবজ্ঞা করে।

কয়েকদিন পর রাতের খাবারের সময় টেবিলে সবাই একসঙ্গে হয়। পুষ্পিতা বলে, আজ আমার কপাল ভালো। কতদিন পর সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসেছি।

BanglaBook.org

আলী আহমদ চটুল কণ্ঠে বলে, আমারও কপাল ভালো।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, কেন?

আমাদের জেনারেল-প্রেসিডেন্টের বোধোদয় হয়েছে।

কি রকম?

রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রচারের জন্য রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতার সুযোগ দিচ্ছে।

পুষ্পিতা অবাক না হয়ে পারে না। ভুরু কুঁচকে বলে, এর সঙ্গে তোমার কপাল ভালোর কি সম্পর্ক?

দেশে সুবাতাস বইতে শুরু করলে আমার আর শ্বাস নিতে কষ্ট হয় না। মুখ ভর্তি থুতু উঠে আসে না।

পুষ্পিতা বিরক্তির সঙ্গে বলে, কোথায় যে তোমার শুরু কোথায় শেষ বুঝি না।

প্রদীপ্ত বলে, আমি প্রতিবাদ করছি বাবা। তুমি খাবার টেবিলটাকে পল্টন ময়দান বানিয়ে ফেললে।

প্রতীক আপত্তি করে বলে, তোমরা কেউ বাবাকে বুঝতে পারো না। বাবার যে দশটা মাথা জানো না।

আলী আহমদ গম্ভীর হয়ে বলে, দীপু রাজনীতি মানুষের জীবনকে সুন্দর করে আবার ধ্বংসও করে। আমরা কেউই রাজনীতির বাইরে নই। রাজনীতির ভালোমন্দ আমাদের মেনে নিতে হয়। একজনের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা দিয়ে সমষ্টির ভালোমন্দ চিহ্নিত হয় না।

আমি তোমাকে আহত করতে চাইনি বাবা।

না, আমি আহত হইনি। তোমরা আলোচনার বিষয় আবার পরিবারে নিয়ে এসো।

পুষ্পিতা চামচে মাছের মুড়ো উঠিয়ে নিয়ে বলে, মাছের মুড়ো আজ কে খাবে?

বৌমাকে দাও। ও আজ টেবিলে একটা কথাও বলেনি। তুমি চুপচাপ কেন মা? ঠিকমতো খাচ্ছো না।

খাচ্ছি তো বাবা। পুষ্পিতা মাছের মুড়ো দিতে গেলে ও বাধা দেয়, আমি কিছুতেই খেতে পারবো না মা। আজ জিতু খাবে।

ও এতক্ষণে প্রাণপণে নিজেকে সামলে যাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে বমি হবে। এক লোকমা ভাত পেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি কেমন পাক দিয়ে উঠছে। সে কারণে খেতে পারছে না। আবার টেবিল থেকে উঠে যেতেও লজ্জা করছে। ও মনেপ্রাণে চাচ্ছে যে সবার খাওয়া শেষ হয়ে যাক। তারপর ও উঠবে। কিন্তু যেভাবে আলোচনা জমে উঠেছে তাতে মনে হয় না সহসা এই আসর ভাঙবে। মঞ্জুলিকা মাছের মুড়ো প্রতীকের পাতে উঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক বলে, আজ আমার কপাল ভালো। মাছের মুড়োটা অনেক বড়। জয়তু ভাবী।

মঞ্জুলিকা তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। ওয়াক শব্দ করে দৌড়ে বাথরুমে যায় এবং বমি করে। প্রদীপ্ত অবাক হয়। মা'র দিকে তাকায়। পুষ্পিতার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বলে, তুই বৌমার কাছে যা দীপু। ও উঠে চলে যায়। আলী আহমদ আর প্রতীক পুষ্পিতার দিকে ভুরু উঁচিয়ে তাকায়। পুষ্পিতা বলে, ওকে দেখে ক'দিন ধরে আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। আজ নিশ্চিত হলাম।

আলী আহমদ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, বলবে তো কি হয়েছে?

আমি দাদী হবো।

ওমা, তাই নাকি? চেঁচিয়ে ওঠে প্রতীক।

BanglaBook.org

আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, ক্রেডিট যে তুমি একাই নিলে। আমরা কিছু হবো না?

বাবা তুমি দাদা হবে। আমি কাকু। প্রতীক বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে চেঁচামেচি করে, ভাবী তুমি তো ভীষণ চাপা মেয়ে। কাউকে কিছু বলোনি।

আহ্, জিতু থাম।

কেন থামবো? ভাবী বড় জিতটা তোমরাই জিতলে। আজ তোমাদের দু'জনের কপাল সবচেয়ে ভালো। ভাইয়া তুমি বাবা হচ্ছো।

মঞ্জুলিকা দ্রুতপায়ে শোবার ঘরে চলে যায়। ওরা দু'ভাই খাবার টেবিলে ফিরে আসে।

আলী আহমদ বলে, আজ আমাদের পরিবারের কপাল ভালো। একজন নতুন মানুষ আসছে।

আলী আহমদের কথায় প্রদীপ্তর বুক ভরে যায়।

ক'দিন ধরে নেতাদের রেডিও-টেলিভিশনের বক্তৃতা চলছে। আলী আহমদ একটি বক্তৃতাও শুনতে বাদ দেয়নি। সময় হলেই রেডিও নিয়ে বসে যায়। সেদিন ভাসানীর বক্তৃতা ছিলো। বাড়িতে কেউ নেই। প্রদীপ্ত আর পুষ্পিতা মঞ্জুলিকাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। বক্তৃতা শুরু হয়েছে। তিনি বলছেন : 'আগামী সাধারণ নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য : পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর, সকল অঞ্চলের– পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধি হোক, বেলুচি হোক অথবা বাঙালি হোক– সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য একটি শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র রচনা করা।... আমি আশা করি, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করে, গোলাগুলি না ছুঁড়ে, মারামারি না করে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে নির্বাচন সমাধা হয় তজ্জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, এই-ই আমার অনুরোধ।' বক্তৃতা শেষ হলে রেডিও বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে আলী আহমদ। ভোটের আগে ভাত চেয়েছিলেন তিনি এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এখন তিনি চাইলেন প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র। ক'দিন আগে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা হয়ে গেছে। গমগম করে উঠেছিলো তাঁর ভরাট কণ্ঠ : 'প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা। সেই কণ্ঠ শুনে আলী আহমদ বিচলিত বোধ করেছিলো। তিনি যখন ওই অদ্ভুত কণ্ঠে 'জয় বাংলা' বলেন তা শুনেও আলী আহমদ বিচলিত হয়। ওর মনে হয় শরীরের কোথায় যেন সুবাতাস বয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে বাতাস দীর্ঘক্ষণ স্নিগ্ধ করে রাখে– ওর ভেতরের যাবতীয় গ্লানি বাষ্প হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষে বলেছেন, 'আমাদের ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।' তিনি ফারাক্কা প্রশ্নে কথা বলেছেন। আলী আহমদ সেজন্য স্বস্তি বোধ করে। ওর মনে হয় পূর্ব বাংলাকে বাঁচানোর জন্য সব রাজনৈতিক দলের উচিত ফারাক্কা বাঁধের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'ফারাক্কা বাঁধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।' কে করবে এই সমাধান? কেন্দ্রীয় সরকার? হাজার মাইল দূরে বসে থাকা মানুষগুলোর তো ওদের জন্য দরদ নেই। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষের ক্ষমতায় যেতে হবে। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদের করতে হবে। এসব

BanglaBook.org

ভাবনার মাঝে আলী আহমদ আবার রেডিওর নব ঘোরায়। ও বিবিসি শোনার চেষ্টা করছে। প্রতিদিন ওর বিবিসি শোনা চাই।

এ ফাঁকে সবাই বাড়িতে ফেরে। মঞ্জুলিকা, প্রদীপ্ত নিজেদের ঘরে যায়। পুষ্পিতা আলী আহমদের পাশে এসে বসে। ধানমণ্ডিতে ড. ওদুদের ক্লিনিক। সেখানেই নিয়ে গিয়েছিলো মঞ্জুলিকাকে। আলী আহমদ জিজ্ঞেস করে, কি বলেছে ডাক্তার?

ভালো। কোনো অসুবিধে নেই। আগামী মার্চের তিরিশে ডেলিভারির তারিখ দিয়েছে। ডাক্তার বলেছে, প্রথম ডেলিভারি তো পাঁচ-সাতদিন আগেও হয়ে যেতে পারে।

আলী আহমদ রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতেই বলে, তুমি নিজেও তৈরি হতে থাকো। কাঁথা সেলাই আরো কত কি!

সেটা আর বলতে। আমার মনে হচ্ছে গায়ে নতুন করে বল এসেছে। ভীষণ খুশি লাগছে।

হাসতে হাসতে পুষ্পিতা উঠে যায়। আলী আহমদ বিবিসি শুনতে শুনতে ভাবে, এই শিশুটি একদিন পঁচিশ বছরের যুবক বা যুবতী হবে। এই শিশুটির জন্য আমি চাই আমাদের মানুষেরা ক্ষমতায় যাক। সব সমস্যার সমাধান হোক। ও বড় হয়ে ওঠার আগেই পূর্ববাংলার ভূ-প্রকৃতি যেন বদলে না যায়– যেন এর কোনো অঞ্চল মরু এলাকা হয়ে না ওঠে– সেখান থেকে যেন ছুটে না আসে লু হাওয়া। আমি চাই এই শিশু যেন সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার মানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে পারে।

BanglaBook.org

৪

দু'দিন ধরে আকাশ মেঘলা, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, থেকে থেকে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। পুষ্পিতা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ওর বাতের ব্যথা বেড়েছে। এমন আবহাওয়ায় কিংবা একটানা কয়েকদিন তুমুল বৃষ্টি হলে ওর বাতের ব্যথা বাড়ে। আলী আহমদ খাটের পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে রেডিওর নব ঘোরাচ্ছে। পুষ্পিতাকে বললো, আবহাওয়ার রকম দেখে মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে।

পুষ্পিতা খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে বলে, একষট্টি সালের মতো আবার একটা জলোচ্ছ্বাস হয়ে না যায়। সাগরপাড়ের লোকেরা কেমন করে যে এমন ঝড়-জলের সঙ্গে দিন কাটায়।

আলী আহমদ ওর কথায় কান দেয় না। সে রেডিও নিয়ে ব্যস্ত। ক'দিন ধরে বিভিন্ন দলের নেতাদের নির্বাচনী বক্তৃতা শুনছে আর আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে। সরাসরি রাজনীতি না করলে কি হবে রাজনীতি তার সারাক্ষণের সঙ্গী। প্রদীপ্ত বলে, বাবা তুমি রাজনীতির চিন্তা-ভাবনায় যত সময় ব্যয় করো তা না করে কোনো দলে ভিড়ে গেলে একজন বড় নেতা হতে পারতে। আলী আহমদ হেসে বলে, প্রত্যেক মানুষ রাজনীতি সচেতন না হলে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে না। সমস্যা বুঝতে না পারলে অধিকার আদায় হয় না দীপু।

প্রদীপ্ত জানে, চাকরি এবং সাহিত্যকর্মের বাইরে রাজনীতি ওর বাবার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। এটা তার কাছে নেশার মতোও।

আবহাওয়া খারাপের কারণে রেডিওতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। পুষ্পিতা বিরক্ত হয়ে বলে, কি যে শুরু করলে, এবার বন্ধ করো না।

বিবিসি ধরার চেষ্টা করছি পুষ্পিতা। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম একটা সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, এর গুরুত্ব যে কতখানি তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?

পুষ্পিতা পাশ ফিরে শুয়ে কাঁথা দিয়ে মুখ ঢাকে। আলী আহমদ রেডিও নিয়ে বৈঠকখানায় আসে। একটুপরই বিবিসি ধরতে পারে। তখন খবরে বলা হচ্ছে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র আঘাত হেনেছে। ত্রিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে জনপদ। শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে আলী আহমদ। তখনো জানালার কপাটে ঝোড়ো বাতাসের মাতম। খবর শেষ হলে পায়চারি করে ও। একবার মনে হয় পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকাকে ডাকবে, পরক্ষণে মনে হয় কি দরকার ওদের উদ্বিগ্ন করার। এই মুহূর্তে কারো তো কিছু করার নেই।

রাতে প্রদীপ্ত ফিরে বললো, অবস্থা খুব খারাপ বাবা। ঢাকার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় কবলিত জেলাগুলোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে জানা যাচ্ছে না।

দু'একদিনের মধ্যে হয়তো সব খবর পাওয়া যাবে।

প্রদীপ্ত মাথা নেড়ে চলে যায়। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে ডাকে, খাবে না, ওঠো।

দু'দিন পর পত্রিকার পৃষ্ঠাজুড়ে বেরুতে থাকে ভয়াবহ মর্মান্তিক খবর।

দৈনিক পূর্বদেশ 'বাংলার মানুষ কাঁদো' শিরোনামায় লিখলো "পূর্ব বাংলা, তুমি কাঁদো। কাঁদো বাংলার মানুষ। এখন কান্না ছাড়া তোমার জন্য কি বাকি আছে বলো? খড়কুটোর মতো যারা নোনা পানির টানে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, তাঁদের জন্য কাঁদো। লাখো মানুষের গলিত শব ছড়িয়ে আছে জনপদে, পানিতে কচুরিপানার মতো ভাসছে অচেনা শবের মিছিল– তাঁদের জন্য কাঁদো, বাংলা কাঁদো।"

পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে থাকে আলী আহমদ। ঝড়ের পরদিন প্রদীপ্ত চলে গেছে ভোলা, পটুয়াখালি, রাঙাবালি এলাকার রিপোর্ট করবে বলে। এখন ও কোথায় জানে না। কবে ফিরবে তাও জানা নেই। ছেলের খবর জানতে চায় না আলী আহমদ– জানতে চায় দুর্গত এলাকার খবর। তখন ভোলার চর ফ্যাশন, দৌলতখান ও তজুমুদ্দীনে ছুটে বেড়াচ্ছে প্রদীপ্ত। গতকাল ঢাকা থেকে লঞ্চে ভোলা এসে পৌঁছেছে। মাঝে পেরিয়ে গেছে এগারো ঘণ্টা। ও পুলিশ টেলিকম্যুনিকেশনের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে। ওর মনে হয়েছে নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে এসব এলাকা। একদিকে দেড়শ মাইল বেগে বয়ে গেছে সামুদ্রিক ঝড়, অন্যদিকে বিশ থেকে তিরিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত করেছে সমতল। মানুষের সাধ্য কোথায় প্রকৃতির এই ভয়াবহ নির্মমতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার? পচা লাশের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, শ্বাস ফেলা যায় না। শ্বাস টানলে সে গন্ধে দূষিত হয়ে যায় ফুসফুস। খোলা আকাশের নিচে মুখ থুবড়ে, চিৎ হয়ে, উল্টেপাল্টে, দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে মানুষ। এ কেমন পূর্ব বাংলা? চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। ভোলা কি তোমারই শরীরের একটি অঙ্গ পূর্ব বাংলা? এমন নিস্তব্ধ প্রেতপুরী? এ কি তোমার চেনা অঙ্গ? হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখো চিনতে পারো কি না? আমি একজন মানুষ, একটি গবাদি পশু, একটি কাকে কেন তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না? সব কেন একাকার হয়ে যাচ্ছে আমার সামনে? পচা লাশের গন্ধ আমার শরীর জাপটে ধরলে আমি নিজের দিকে তাকাতে পারি না– মনে হয় পচন ধরেছে নিজের শরীরে– হাত লাগলে বুঝি

BanglaBook.org

উঠে আসবে গলিত মাংস। পূর্ব বাংলা কি অদ্ভুত কায়দায় তুমি বদলে দিলে তোমার মানুষের শারীরিক গঠন। নিরন্ন, বুক-পিঠ এক হয়ে যাওয়া, পাঁজরের হাড় বেরিয়ে থাকা মানুষগুলো কোথায়? সব তো ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে আছে জনপদ। কাঁদছে না কেউ। কী আশ্চর্য, কথায় কথায় চোখের জল বেরিয়ে আসা মানুষের চোখে জল নেই কেন? কান্নার জন্য কি কেউ বেঁচে নেই? নাকি যারা বেঁচে আছে তারা কাঁদতে পারছে না; শেষ শক্তিটুকু নিয়ে শুধু নিশ্বাসই ফেলতে পারছে? খোলা আকাশের নিচে নগ্ন মানুষ। কচুরিপানার মতো নদীতে ভেসে আছে গলিত শব। তুমি কি দেখতে পাও না পূর্ব বাংলা? উড়িয়ে আনো তোমার গাছের পাতা, ঢেকে দাও নারী-পুরুষের নগ্ন শরীর। এ তোমারই লজ্জা। যদি তা না পারো, তাহলে মাটিকে বলো ওদের বুকের ভেতর টেনে নিতে, নদীকে বলো ওদের পানির ভেতর ডুবিয়ে রাখতে। ওই লাশ উঠিয়ে দিও না শকুনের ঠোঁটে।

এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলো প্রদীপ্ত। ও বুঝতে পারছে যে ওর মাথা কাজ করছে না। ওর বমি পাচ্ছে। ওর শরীরে তাপ বাড়ছে। পেছন থেকে মহাদেব ওকে ডাকে, প্রদীপ্ত দাঁড়াও। ও দাঁড়ায় না। সকালে দেখা সেই ছেলেটির পাশ কাটিয়ে হেঁটে যায়। ছেলেটি লঞ্চঘাটে ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিলো। প্রদীপ্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ও চোখ নামায় না, রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রবল অস্বস্তিতে প্রদীপ্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু মনে করতে পারে না যে ওকে কোথাও দেখেছে কি না। এখন ও ওকে উপেক্ষা করে, ভাবে স্বজনহারাদের কেউ– কাঁদতে পারছে না– জগৎ-সংসারের ওপর রেগে আছে। বিভিন্ন কাগজের একদল সাংবাদিক এসেছে। ও কারো সঙ্গে কথা বলতে চায় না। যে অনুভব শেয়ার করা যায় না তাকে ও নিজের ভেতরেই রাখতে চায়। খানিকটা এগোতে দেখতে পায় নদীর পাড়ে বালুর ওপর বসে আছে একজন বৃদ্ধ। ও তার সামনে উবু হয়ে বসে। লোকটি হাত দিয়ে মুখ এবং পেট দেখায়। ওর খিদে পেয়েছে। কি করবে প্রদীপ্ত, ওর কাছে কিছু নেই। ও রিপোর্ট করতে এসেছে, রিলিফ নিয়ে তো আসেনি। কুঁকড়ে যায় ওর বুক, কেন ও এভাবে এলো? বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তখন সেই ছেলেটি পেছন থেকে বলে, আপনাকে আমি সোনাখালি বাজারে দেখেছি। আপনি প্রদীপ্ত আহমদ না? সাংবাদিক। খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন না? পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখলেই কি ওদের পেট ভরবে? কিজন্য ওর সামনে বসেছেন? জানতে চাইবেন ওর পরিবারের কয়জন মারা গেছে? কেমন লাগছে তার? এখনকার অনুভূতি কি? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলো? যত্তসব, ঝুটা জীবনবাজী। খালি হাতে এসেছেন কেন? দু'শো টাকার বিস্কুট কিনে আনতে পারতেন? আসলে এসেছেন মেয়েমানুষের ন্যাংটো শরীর দেখতে। ঐ যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে যান দেখুন। থুঃ। ইচ্ছে করছে সবগুলো সাংবাদিককে কেটে কুচিকুচি করে ফেলি।

মাটির মধ্যে একটা লাথ্থি দিয়ে চলে যায় ও। একটুপর এক টিন মুড়ি হাতে বিমল আসে। ও বুড়ো লোকটাকে মুড়ি দেয়। প্রদীপ্তকে দেখে অবাক হয়, দীপু ভাই আপনি?

বিমল তুমি?

আমার মায়ের কয়েকজন আত্মীয়ের খোঁজ করতে এসেছি। আসার সময় সের দশেক চিড়ামুড়ি নিয়ে এসেছি। তাই দিয়ে বেড়াচ্ছি।

আত্মীয়দের খোঁজ পেয়েছো?

অনেক খুঁজেছি। কেউ নেই। ঘরবাড়ির চিহ্নও উড়ে গেছে। বড় কড়ই গাছটা দেখে জায়গাটা খুঁজে বের করেছি। এই এলাকায় পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ লোক নেই দীপু ভাই।

একটুপর শিশির আবার এসে দাঁড়ায়। বিমলের হাত থেকে টিনটা টান দিয়ে বলে, দিয়ে শেষ করেছিস সব? নাকি আছে?

BanglaBook.org

আছে। অনেকেই কিছু খেতে চাচ্ছে না। ওদের খাওয়ার মতো অবস্থাও নেই।

শালা, ঢং দেখাচ্ছিস। টিনটা দে আমাকে। এই শালার সাংবাদিকগুলোর পোঁদে লাথ্‌থি দিয়ে লঞ্চে তুলে দে।

বলে আর দাঁড়ায় না ও। হনহনিয়ে হেঁটে যায়। এতক্ষণে প্রদীপ্তর খটকা লাগে, পাগল না তো ছেলেটা? না, পাগল হলে একটু আগে অমন গুছিয়ে বক্তৃতা করলো কীভাবে? প্রদীপ্ত বিমলের দিকে তাকায়। ঠাণ্ডা গলায় বলে, ও আমাকে সোনাখালি বাজারে দেখেছে বিমল।

আপনি শুনে চমকে উঠবেন না কিন্তু, ও শিশির। কুদ্দুস প্রেসিডেন্টকে নিজের হাতে জবাই করেছিলো।

তুমি জানলে কি করে?

শিশির আমার বন্ধু। সাবধান, কথাটা যেন দ্বিতীয় কান না হয়। আপনাকে কেন যে আমার ভালো লেগেছে আমি জানি না। আপনাকে আমার ভীষণভাবে নিজের লোক মনে হয় দীপু ভাই।

আমি একটুপরে পটুয়াখালি, রাঙাবালির দিকে চলে যাবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

রাঙাবালি যাবেন? আমিও যাবো। ওখানে আমার পিসী থাকে। দেখে আসি পিসী আছে কি না।

দুপুরের পরে লঞ্চ ছেড়ে গেলো। ঘাটে দাঁড়িয়ে বিমলকে প্রদীপ্তর সঙ্গে চলে যেতে দেখলো শিশির। একবার ও বিমলকে বলেছিলো, ঐ শালা কি বোবা নাকি? মুখে রা কাড়ে না।

তোর সঙ্গে রা কাড়লো না কেন কে জানে। আমার সঙ্গে তো কাড়ে।

হা-হা করে হেসে ওঠে শিশির। বলে, যেই প্যাঁদানি দিয়েছি, ভয়ে একদম সিঁটিয়ে গেছে।

হয়েছে থাম।

বিমল ওর দিকে তাকিয়ে বলে, শিশিরের কথায় কিছু মনে করবেন না দীপু ভাই।

মনে করবো কি, আমি তো ওর কথার জবাব দেইনি। এখানে এসে হুজ্জত করা মানায় না। শিশির কেন এখানে এসেছে? নাকি এখানেই ছিলো?

না, আত্মীয়দের খোঁজ নিতে এসেছে।

পেয়েছে তাদের?

একজনকে। বাকিদের কোনো খোঁজ নেই।

ঐজন্যই কি ওর মাথা গরম?

মোটেই না। ও ভীষণ শক্ত ছেলে। আপনাকে যা বলেছে বুঝেশুনেই বলেছে।

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। মুহূর্তের জন্য বিমলকেও অচেনা মনে হয় ওর। এই মুহূর্তে বিমল কি শিশিরের পক্ষ নিয়ে কথা বললো? ও ভেবে পায় না শিশির কেন ওর ওপর খাপ্পা? পরক্ষণে মনে হয়, কী বোকামী! শিশির তো ক্ষেপতেই পারে। শিশিরের পথ ভিন্ন– ও শিশিরের সুহৃদ নয়। শিশির ওকে শত্রু ভাবছে। ভাবুক, কিছু এসে যায় না। প্রদীপ্ত একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। বিমল বলে, কি ভাবছেন দীপু ভাই? ফেরার সময় সোনাখালিতে যাবেন?

এবার নয়। আমি দু'একদিনের ভেতর ঢাকা ফিরে যাবো। এবার এসেছি রিপোর্ট করতে। কোনো একটা রিলিফ দলের সঙ্গে আবার আসবো।

তখন লঞ্চের সারেং ভেজা কণ্ঠে আর্তনাদ করে, স্যার, এহানে গেরাম ছেলো– আমার লঞ্চ ভেড়তো এহানে। অহন তো দেখি সব সাফ।

BanglaBook.org

নদীর লেভেল থেকে বেশ খানিকটা উঁচু শূন্য জায়গাটির দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। অবিশ্বাস্য মনে হয়। জনবসতির ন্যূনতম চিহ্ন নেই। একটি লাশ, একটি মৃত গবাদি পশু, পাখি, ঘরের চাল, বেড়া, হাঁড়িকুড়ি কিংবা কাপড়ের টুকরো– কিছুই নেই। একটি গাছও না। যেন জায়গাটি ধুয়েমুছে সাফ করে রাখা হয়েছে। প্রদীপ্ত নিশ্বাস ফেলে বলে, ভাবা যায় না যে এখানে কখনো বসতি ছিলো।

বিমল বলে, শুনেছি পটুয়াখালির অনেক দ্বীপ তলিয়ে গেছে। চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রাঙাবালির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে আগুনমুখা নদী। আমার পিসীর বাড়ি নদীর ধারে। জানি না ওখানে গিয়ে কি দেখবো। বিমল দু'হাতে মুখ ঢাকে। তারপর বলে, আমি সইতে পারছি, কিন্তু এত মৃত্যুর খবর মা কি সইতে পারবে।

বিমল, নদীর নাম আগুনমুখা। লোকে নিশ্চয় জেনেশুনেই নাম রেখেছে। প্রলয়ের সময় ও বোধহয় আগুন হয়ে ওঠে। সর্বনাশের আগুন। এমন সব নদীর ধারে যারা বাস করে তারা সব দুঃখ সইতে পারে বিমল। তোমার মা আমাদের চেয়ে শক্ত। কারণ তাঁদের সইতে হয়েছে অনেক বেশি।

কাঠের বডির ছোট একতলা লঞ্চ। দু'জনে ছাদে বসে আছে। বিমলের ডান হাত প্রদীপ্তর বাম উরুর ওপর। কথা বলতে বলতে প্রদীপ্ত ওর ঘাড়ে হাত রাখে। দু'জনে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরপরই ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠে লাশ। গ্রামগুলো এলোমেলো– কেউ যেন টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না– দৃষ্টি নত হয়ে আসে।

প্রদীপ্ত বিমলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পিসীর বাড়িতে নারকেল গাছ আছে বিমল?

হ্যাঁ, অনেক। গাছগুলো এমন সুন্দর করে লাগানো যে দেখলে মনে হবে পুরো বাড়িটা নারকেল গাছ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। পিসী আর পিসেমশাই দু'জনে খুব শৌখিন। রাতদিন খাটতেও পারে। ছবির মতো করে রেখেছে বাড়িটা। ওদের আট ছেলেমেয়ে। ভারি কাজের সবাই। হঠাৎ ওর মনে হয় ও এত কথা বলছে কেন? বিব্রত হয়ে থেমে গিয়ে বলে, আপনি নারকেল গাছের কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন দীপু ভাই?

ডাবের কথা মনে হলো তাই।

বিমলের উৎসাহ বেড়ে যায়। বলে, কত ডাব খেতে পারেন দেখবো। আমি নিজে পেড়ে দেবো। মহাদেবের সঙ্গে পেছন থেকে আরো দু'চারজন বলে, আমরাও ডাব খেতে ভালোবাসি।

আপনাদের সবাইকে পিসীর বাড়ি নিয়ে যাবো। ডাব খাওয়ার কম্পিটিশন হবে। পিসীর বাড়ি লঞ্চঘাট থেকে কাছেই। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটের পথ।

হঠাৎ করে বিমল আবার থেমে যায়। পিসীর বাড়ির গল্প ও গলগল করে বলে যেতে পারে। ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত বলতে পারে না যে, তোমার গল্প এই ধ্বংসের মধ্যে জীবনের গল্প। তুমি আমাদের শোনাতে থাকো, আমরা স্বস্তি বোধ করি– দুঃখের কথা ভুলে যাই।

বিমল ততোক্ষণে বলা শুরু করেছে, জানেন, আমার পিসেমশায়ের আটচালা ঘর– সে ঘরের পেছনে ভারি সুন্দর ফলের বাগান আছে। সব পিসীর নিজের হাতে লাগানো গাছ। বারো মাস কোনো না কোনো ফল থাকে বাগানে। আটচালা ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে বড় একটা মাধবীলতার ঝাড়। উঠোন জুড়ে আছে জবা আর নয়নতারা– মাঝখানে তুলসীতলা। সন্ধ্যেবেলা পিসী যখন পিদিম দেয় কী যে ভালোলাগে। সেই সঙ্গে ধূপের ধোঁয়া সারা বাড়িতে ভেসে থাকে। গন্ধে প্রাণ ভরে যায়। রান্নায় পিসীর দারুণ হাত। মজার মজার নাড়ু বানাতে পারে। এমন মজা করে ইলিশ মাছের দোপেঁয়াজা রান্না করে খেলে

BanglaBook.org

ঐ স্বাদ জিহ্বা থেকে মুছে যায় না। আপনারা গেলে পিসেমশাইকে বলবো পুকুর থেকে গলদা চিংড়ি ধরতে। মালঞ্চ শাক খেয়েছেন আপনারা? খাননি তো? ওদের পুকুরে মালঞ্চ শাক আছে। ভীষণ স্বাদ। নারকেল, কুচো চিংড়ি দিয়ে মালঞ্চ শাক খেলে আপনারা আর ঢাকা যেতে চাইবেন না। জানেন, পিসীর বাগানে চন্দন গাছ আছে। পিসী বলে, এই চন্দন গাছের কাঠ দিয়ে আমার চিতা সাজাবি। জানেন তো চন্দন কাঠের চমৎকার গন্ধ–। উঃ মা, আমি এসব কি বলছি দীপু ভাই? আমার পিসী বেঁচে আছে তো?

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বিমল।

ওকে কাঁদতে দেখে চমক ভাঙে প্রদীপ্তর। মনে হচ্ছিলো বিমলের কণ্ঠে শোনা বৃষ্টির রাতের সেই গান এখন ও এক ভিন্ন গায়কীতে গেয়ে যাচ্ছিলো। ওর কাছে বসে যারা জীবনের গল্প শুনছিলো তাদের সবার চোখ ভিজে ওঠে। প্রদীপ্তও নিজেকে সামলাতে পারে না। দু'হাতে চোখ মুছে বিমলকে বলে, তুমি না বলছিলে তুমি সইতে পারো বিমল?

বিমল জবাব দেয় না। কেঁদেকেটে একসময় শান্ত হয়। প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে পিসীর খোঁজ নিতে যাচ্ছি। পিসীকে নিয়ে আমি কি এভাবেই রয়্যানি গান গেয়ে ফেললাম দীপু ভাই?

প্রদীপ্ত নিজের মুঠিতে বিমলের হাত টেনে নেয়। বিমল কাঠের রেলিঙে মাথা ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকে। বোঁজা চোখ থেকে জলের ধারা গড়াতে থাকে– ফোঁপানির শব্দ বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে– কিছুতেই ও আর নিজেকে সামলাতে পারে না। রাঙাবালি পৌঁছলে ও আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, এ কেমন রাঙাবালি দীপু ভাই? এটা রাঙাবালি না? আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। ও সারেং ভাই তুমি পথ চিনে ঠিক ঠিক আসতে পেরেছো তো?

সারেং বিড়বিড়িয়ে বলে, লোকটা পাগল হয়ে গেলো নাকি?

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, বিমল, চলো নামি।

ঘাটে নেমে বিমল দৌড়ুতে থাকে। ওদের দিকে খেয়াল নেই। প্রদীপ্ত ডাকতে গেলে মহাদেব বাধা দেয়, থাক, ওকে যেতে দাও। ও আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে।

মহাদেবদা দেখেছেন ধ্বংসযজ্ঞ! আমরা আণবিক বোমা বিধ্বস্ত হিরোশিমা দেখিনি– আমরা কালো বৃষ্টি দেখিনি, কিন্তু প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা দেখে মনে হচ্ছে বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমা দেখছি।

যা দেখিনি তা নিয়ে আমি তুলনা করতে পারবো না প্রদীপ্ত, শুধু একটি শব্দই মনে আসছে, কী নিষ্ঠুর! মনে হচ্ছে এই দেখা দিয়ে শুধু রিপোর্ট করলে বা ফিচার লিখলে আমাদের পাপ ক্ষয় হবে না।

হঠাৎ করে দু'জনে চমকে এদিক-ওদিক তাকায়। মনে হয় নারীকণ্ঠের কান্নার ধ্বনি আসছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ কি কোথাও বিলাপ করছে? বুকের ভেতর অদৃশ্য হাতের খামচি পড়ে। বিমল যেদিকে দৌড়ে গেছে সেদিকে দু'জনে হাঁটতে থাকে। বাকিরা যে যার মতো চলে গেছে। পাঁচ মিনিট হাঁটা হয়ে গেছে, কোথায় বিমলের পিসীর আটচালা ঘর? কোথায় ফলের বাগান? নাকি ওরা ভুল পথে এলো? চারদিক খাঁ-খাঁ করছে– পড়ে আছে মানুষ ও গবাদি পশুর শব। এসব লাশ ডানে রেখে, বামে রেখে পথ খুঁজে খুঁজে যেতে হচ্ছে। মনে হয় এখানে বুঝি ভিটে ছিলো, নেই– হয়তো ওখানে কাচারি ঘর, নেই– ওখানে রান্নাঘরের উনুনে বসানো হয়েছে ইলিশের দোপেঁয়াজা, নেই– হালের বলদ দুটোর কি হলো? গোয়াল যে শূন্য। ঢেঁকিতে ধান ভানা হচ্ছিলো– কার্তিক মাস তো, আর ক'দিন পর নবান্নের উৎসব। নতুন চালের গুঁড়িতে পিঠেপুলি হবে। আবার সেই কান্নার শব্দ। দু'জনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পড়ে। এবার শিশুর কান্না। ওরা বুঝতে পারে না কোনদিকে যাবে। কোনদিকে গেলে কান্নার উৎস পাওয়া যাবে? এলোপাতাড়ি এগোতে গিয়ে দেখতে পায় ছুটতে ছুটতে বিমল আসছে। চেঁচিয়ে বলছে, পেয়েছি দীপু ভাই, পেয়েছি। পিসে, পিসী আর মিনতিকে।

কোথায়?

চলেন। ও আর দৌড়ায় না। বুকে হাঁফ ধরেছে, সেজন্য হাঁটছে। বড় বড় শ্বাস ফেলছে। খানিকটা গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, আগে কাকে দেখবেন?

আহ্ বিমল, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে। যার কাছে আগে যাওয়া যাবে তার কাছে চলো।

আগে পিসীর কাছে চলুন। পিসীকে নিয়েই বাড়ি যাবো। পিসেমশাই জিজ্ঞেস করেছে পিসীর কথা। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছি এই বলে যে, যে করে হোক পিসীকে খুঁজে নিয়ে আসবো। খুঁজতে বেরুলাম। আমি তো জানি পিসী বেশিদূর যেতে পারবে না। পিসী নিজের বাড়িঘর ছেড়ে কোথাও যেত না। পিসীর সাধ্য নেই হেঁটে যাওয়ার, পিসীর সাধ্য নেই ভেসে যাওয়ারও। পিসী রাঙাবালির কোথাও না কোথাও থেকে যাবে। আমার কথাই ঠিক। পেয়ে গেলাম পিসীকে।

দু'জনে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপ করে থাকে। জিজ্ঞেস করতে পারে না যে বেঁচে আছে তো? ওদের ধারণা হয় বিমল যেভাবে কথা বলছে নিশ্চয় বেঁচে আছে।

বেশ খানিকটা পথ যাবার পর বিমল আঙুল তুলে দেখালো, ঐ দেখুন পিসী।

সামনে একটি ছোট খেজুর গাছ। সে গাছের কাঁটায় আটকে আছে বিমলের পিসী। মহাদেব আর প্রদীপ্ত পরস্পরের দিকে তাকায়। ওরা বিমলের পিসীর দিকে তাকাতে পারে না। ক্ষতিবক্ষত, ফুলে-ওঠা বীভৎস সে লাশ। দু'হাতের মোটা সোনার বালা রোদে চক্‌চক করছে। বিমল বলে, দীপু ভাই শিশির থাকলে, পিসীর হাতদুটো কেটে বালা খুলে নিয়ে যেত। কারণ বিপ্লবের জন্য ওদের অনেক টাকার দরকার। দুটো বালাতে দু'ভরি সোনা হবেই, না দীপু ভাই?

প্রদীপ্ত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। উৎকট গন্ধ আসছে। এখন কি করবে ওরা? বিমলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পিসেমশাই কোথায় দীপু?

আটচালা ঘরের নিচে মিনতি আর পিসে আটকে পড়েছিলো। মিনতি ভালো আছে। জ্ঞান হবার পর ও পিসেমশাইকে টেনে বের করেছে। পিসের ডান উরু ভেঙে গেছে। মনে হয় তক্তা পড়েছিলো। পিসে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। মিনতি একা একা কি করবে। বাবার কান্না শুনে নিজেও বিলাপ করে। তিনদিন ধরে ওরা কিছু খায়নি। একফোঁটা জলও না।

প্রদীপ্ত বলে, চলো আমরা ওদের দেখতে যাই।

পিসীর কি হবে?

তোমার পিসীকেও আমরা নিয়ে যাবো।

কিভাবে?

কলাপাতায় মুড়ে। ঐ যে কলা গাছগুলো উপড়ে পড়ে আছে, ঐ পাতাগুলো ছিঁড়ে আনি চলো।

তিনজনে কলাপাতা ছিঁড়ে সে পাতায় পেঁচিয়ে টানতে টানতে বিমলের পিসীকে নিয়ে আসে বাড়িতে। বিমল চেঁচিয়ে বলে, পিসেমশাই পিসীকে এনেছি?

নমিতা 'মাগো' বলে যে আর্তচিৎকার করে সে চিৎকারে ওর বাবা প্রথমে উঠে বসে, তারপর উল্টে পড়ে যায়। আর ওঠে না। ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখে। মহাদেব পালস দেখে। বুকের ওপর কান লাগিয়ে ধুকপুকি শোনার চেষ্টা করে। তারপর আস্তে চোখের পাতা বুজিয়ে দেয়। নমিতা বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকে মাথা ঠুকতে

BanglaBook.org

থাকে। আবার সেই তীক্ষ্ণ বিলাপ বাতাসে ভাসতে থাকে। বিমল ওর পাশে বসে থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অষ্টাদশ নমিতার আদিঅন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে অন্ধকার– ও কিছুই জানে না। ওর জ্ঞান হারিয়েছে।

প্রদীপ্ত আর মহাদেব সিদ্ধান্ত নেয় লাশ দুটোকে মাটি চাপা দিতে হবে। ওরা কোদাল খুঁজতে থাকে। আটচালা ঘরটা এমনভাবে ধ্বসেছে যে একটা অংশের নিচে অনায়াসে ঢোকা যায়। মাধবীলতার বিশাল ঝাড়টা আটকা পড়েছে ছাদের নিচে। জলোচ্ছ্বাস ছুঁয়ে গেছে পাতা-ফুল, কিন্তু উপড়ে যায়নি গাছটি– চালের নিচে তাজা হয়ে আছে ফুলের গুচ্ছ। ওরা দু'জনে মাধবীলতার চিকন চিকন ডাল ভেঙে পথ করে নেয়। খুঁজে পেতে কোদাল-দা-বটি পাওয়া যায়। ফলের বাগানের বড় বড় গাছগুলো সব ভাঙেনি– একটা অন্যটার ওপর পড়ে যাওয়ার ফলে কিছু কিছু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। খুঁজে পেতে জায়গা বের করে দু'জনে কোনোরকমে দুটো গর্ত করে। বিমলকে ডাকা হয়। ও নমিতার শুশ্রূষা করছে– চোখেমুখে পানি দিয়েছে। নমিতার জ্ঞান ফিরেছে।

প্রদীপ্ত বিমলকে বলে, আর অপেক্ষা করা যাবে না। পিসীর লাশ মাটি চাপা দিতে হবে। নমিতাকে ডাকি।

বিমল নমিতাকে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। ও হাত ধরে টেনে ওকে বাইরে নিয়ে আসে। বলে, পিসীকে–

চমকে তাকায় নমিতা, মা? মা কৈ? উঠোনে রাখা কলাপাতা মোড়ানো লাশটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেলে প্রদীপ্ত ওকে ধরে ফেলে। ও উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায়, আমাকে ধরলেন কেন? আমি মাকে দেখবো।

মাকে আর দেখা যাবে না নমিতা।

কেন দেখা যাবে না? ওটা আমার মা না। আমার মা অমন নয়। কলাপাতা খুলে দিন।

তুমি শান্ত হও নমিতা। শান্ত না হলে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে না।

শান্তি? নমিতা কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে ওর হেঁচকি ওঠে। ওরা তিনজনে বিমলের পিসীর লাশ মাটি চাপা দেয়। পিসেমশাইকে আনতে গেলে নমিতা দু'হাতে জাপটে ধরে রাখে, না, বাবাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না।

মহাদেব জোর করে নমিতাকে সরিয়ে দেয়। বিমল আর প্রদীপ্ত লাশ গর্তে নিয়ে ফেলে। কেমন নিষ্ঠুর মনে হয় নিজেকে। একি লাশের ব্যবস্থা হলো? প্রদীপ্তর ভেতর গ্লানি জমতে শুরু করে। ওর মনে হয় এখান থেকে দ্রুত চলে যাওয়া উচিত– এ ভার সহ্য করা যাচ্ছে না। বিমল জিজ্ঞেস করে, এখন কি করবো? প্রদীপ্ত বলে, নমিতাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দাও। তারপর তুমি আবার আসবে। বাকিদের খুঁজবে। এখন চলো।

বিমলকে আদেশ দিয়ে প্রদীপ্ত আর মহাদেব হাঁটতে শুরু করে। দ্রুত ফিরে যেতে চায় ঢাকায়। এই দমবন্ধ করা স্তব্ধতার কথা জানাতে হবে দেশবাসীকে, জানাতে হবে বিশ্বকে। আবার ছুটে আসতে হবে এদের বেঁচে থাকার সরঞ্জাম নিয়ে– কত কি প্রয়োজন– সামনে বিপুল কাজ। লঞ্চঘাটে এসে দেখতে পায় কাঁদছে ছেলেটি– কখনো কণ্ঠ উঁচুতে ওঠে, কখনো বিলাপের মতো গুণগুণ করে। এ শিশুর কান্নাই কি শুনেছিলো ও? যেন শব্দটা এখনো শ্রবণেন্দ্রিয়ে আটকে আছে। মোস্তফা জানালো ছেলেটিকে ও কুড়িয়ে পেয়েছে। একটি গাছের নিচে বসে কাঁদছিলো। ওকে নিয়ে অন্যরা ভাবছে। প্রদীপ্ত দেখে রোগা-পটকা ছেলেটির পেট ফুলে আছে, বয়স হয়তো দশ-এগারো হবে। ও জানিয়েছে ওর বাবার নাম আজমত। এটা ওর গ্রাম নয়। এ জায়গা ও চেনেও না। রাঙাবালিতে কিভাবে ভেসে এসেছে ও জানে না।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত বলে, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে এসেছে, এমন তো হতেই পারে। ও যে বেঁচে আছে এটাই অলৌকিক ঘটনা। ওকে আমি ঢাকায় নিয়ে যাবো।

মোস্তফা আপত্তি করে, তা কি করে হয়? আমাদের উচিত ওকে ওর বাবা-মার কাছে পৌঁছানো। প্রদীপ্ত জোর গলায় বলে, মোস্তফা ভাই এ মুহূর্তে ওর বাবাকে খোঁজা সম্ভব নয়। ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে আবার না হয় নিয়ে আসবো। এখন চলুক। নইলে না খেতে পেয়ে ঠাণ্ডায় ও মরেই যাবে।

সবাই সায় দেয়। প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে টানে, তোর নাম কিরে?

সোনাই। দু'হাতে চোখের জল এবং নাকের সর্দি মোছে।

ঢাকায় যাবি? ও ঘাড় কাত করে।

কাঁদবি নাতো?

মাথা নেড়ে না বলে। তখন ওরা দেখতে পায় বিমল নমিতার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ও কিছুতেই আসতে চায় না। সবার সামনে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি যাবো না, যাবো না।

তুমি একা একা এখানে কেমন করে থাকবে নমিতা? ক'দিন তুমি সোনাখালিতে থেকে এসো।

শেয়ালে যদি আমার বাবা-মার লাশ উঠিয়ে ফেলে? কে পাহারা দেবে? বলতে বলতে ও চিৎকার করে ওঠে, ও মা গো। মা আমার চন্দন কাঠের চিতা চেয়েছিলো। এই ছিলো আমার মা'র কপালে?

বিমল চাপা ধমক দেয়, আহ্ নমিতা থামো। দু'দিন বাদে আমি মাকে নিয়ে আবার ফিরে আসবো। তখন চন্দন কাঠ দিয়ে পিসীর চিতা সাজাবো।

সত্যি?

বিমল অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ে। সবাই বুঝলো এ মাথা নাড়ার কোনো অর্থ নেই। কেবল নমিতা অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার অলৌকিক আনন্দ ভুলে যন্ত্রণায় পিষ্ট হতে থাকে। শোক কি এটাও ও ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না।

শোক কি? এটা প্রদীপ্তরও প্রশ্ন। এই নিস্তব্ধ ধ্বংসপুরীগুলো থেকে ও এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না। ব্যক্তি হৃদয়ের হাহাকার শোক– কিন্তু হাহাকার আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেলে সেটাকে কি আর শোক বলা যায়? গত ক'দিনের দেখা এইসব এলাকার মৃতপ্রায় মানুষেরা একটু খাবারের জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওরা উপড়ে থাকা কলাগাছ থেকে কাঁচাকলা ছিঁড়ে এনে কাঁচাই খাচ্ছে– কলার থোড় সেদ্ধ করছে। ডাব, নারকেল কিংবা ফলমূল খুঁজছে। মনে হচ্ছে ওরা মহাপ্লাবনের পর এক নবজীবনের মানুষ– সব শেষের ওপর নতুন করে শুরু। ওদের এখন শোকের সময় নেই। নমিতা মামা তো ভায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি যাচ্ছে। সোনাই কত অনায়াসে এক জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে চলে যাচ্ছে। এখনো হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়ে আছে– ওরা ভেসে গেছে নদীতে, সাগরে। এখানে কি শোকের কোনো অর্থ আছে? ভট্‌ভট্ শব্দ করে লঞ্চটা পানি কেটে এগুচ্ছে। ওর পাশে গুটিসুটি শুয়ে আছে সোনাই, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঢাকা গিয়ে এদেরই কথা লিখবে প্রদীপ্ত– এরা নিউজ স্টোরি হবে। তারপর? রিলিফ আসবে। শুরু হয়ে যাবে জীবনের কোলাহল। কিন্তু কবে? কতদিন লাগবে এই কোলাহল ফিরে আসতে? সাতদিন পেরিয়ে গেছে। এখনো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মানুষ। তাদের পাশে কেউ নেই। খাবার নেই, পানি নেই, ওষুধ নেই। দেশের জেনারেল-প্রেসিডেন্ট সতর্ক হলে দু'দিনের মধ্যে আবার প্রাণস্পন্দন ফিরে আসতে পারতো এইসব মৃত্যুপুরীতে– নেই, সেই ভালোবাসা এবং দরদ নেই পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য। কি

BanglaBook.org

দেখে ফিরে যাচ্ছি আমি? কি আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়? এই কি হাসরের ময়দান? একেই কি বলে কেয়ামত? মাথার একহাত ওপরে নেমে আসা সূর্যের খাণ্ডবদহনে ধুঁকছে মানুষ? শুধু লাশ- মাটিতে এবং পানিতে। শুধু আর্তনাদ- মৃতপ্রায় মানুষের আহাজারি। পবিত্র ধর্ম রক্ষাকারী মুসলমানদের দেশে বেআব্রু পড়ে আছে নারীরা- ধর্মের দোহাই দিয়ে টিকিয়ে রাখা পাকিস্তানের মাটিতে কাফনের কাপড় নেই লাশের গায়ে। কোথায় গেলো দুই পাকিস্তানের সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির নমুনা? অবহেলিত বঞ্চিত পূর্ব বাংলার হৃদয়ের ক্ষতে এখন পোকা। ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে ওঠে সোনাই। প্রদীপ্তর মনে হয় ওর ঘুমে এখন দুঃস্বপ্ন।

কি করতে পারতো জেনারেল-প্রেসিডেন্ট? তাঁর সুসজ্জিত সেনাবাহিনী রয়েছে- তারা আলাদীনের দৈত্যের মতো কাজ করতে পারতো- তাদের ডাকেনি জেনারেল। খাবার নিয়ে উড়ে আসতে পারতো বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার- মৃত্যুপুরীতে ছড়িয়ে দিতে পারতো খাবারের প্যাকেট। নদীতে-সাগরে ভেসে যাওয়া নিখোঁজ মানবসন্তানকে তুলে নিয়ে আসতে পারতো নৌবাহিনী- সেনাবাহিনীর জওয়ানরা শবের গায়ে দিতে পারতো কাফন। কি না হতে পারতো? অল্প ক'দিনের মধ্যে নমিতাদের আটচালা আবার দাঁড়িয়ে যেত। সোনাই তার বাবা-মাকে খুঁজে পেতো। বাবা ঠিকই বলে, জেনারেল-প্রেসিডেন্ট বোঝে বন্দুকের নল, বোঝে না মানুষের মাথা। ওদের সঙ্গে আমাদের আর কীসের বন্ধন? আলাদা হয়ে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

ঢাকায় ফিরে ফেটে পড়ে প্রদীপ্ত, বাবা দেশে কি সরকার নেই?

আলী আহমদ ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী- ক্ষুব্ধ শিক্ষিত জনেরা, যারা পত্রিকায় পড়েছে প্রেসিডেন্টের নির্মম আচরণের কথা। প্রদীপ্ত আবার একই কথা উচ্চারণ করলে আলী আহমদ কঠিন গলায় বলে, আমাদের সরকার নেই। পূর্ব বাংলার জন্য সরকার নেই। থাকলে জেনারেল-প্রেসিডেন্ট চীন থেকে ঢাকা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার পথে তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে করাচি চলে যেতেন না। ছুটে যেতেন উপদ্রুত এলাকায়। দীপু, ওরা আমাদের মানুষই মনে করে না।

প্রদীপ্ত হাঁ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রান্নাঘরে পুষ্পিতা সোনাইকে খেতে দিয়ে এটা-ওটা গল্প করছে। মঞ্জুলিকা ওদের দু'কাপ চা দিয়ে যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে আলী আহমদ ঠাণ্ডা গলায় বলে, গতকাল মতিউরের কাছে শুনলাম বিমানবন্দরের নাটক। ভিআইপি কামরায় তিনি বসেছেন। সঙ্গে আছে পূর্ব বাংলার গভর্নর, আমলারা এবং সামরিক পোশাকধারী জেনারেলরা। বাইরে অপেক্ষমাণ অন্যান্যরা। ওদের সামনে বন্ধ দরজা। ভেতরে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে তিনি ইসলামাবাদ ফিরে যাওয়া বাতিল করে ঢাকায় থেকে যাবেন কি না। বুঝিস তো যতই পরামর্শ দেয়ার লোক থাকুক না কেন, সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি একা, এটাই নিয়ম। একসময় ভিআইপি কামরার দরজা খুলে যায়। রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষমাণ সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে বেরিয়ে আসেন সামরিক পোশাকধারী কোনো একজন কর্মকর্তা। তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট ইসলামাবাদ ফিরে যাবেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ। সেদিন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো উপস্থিত সবাই, কারো মুখে কথা জোগায়নি। তুই তো শুনিসনি দীপু, বিবিসি এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকে স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছে।

বাবা, বিবিসি আর কি বলবে, আমার নিজের চোখই তো বড় সাক্ষী। সরকার যদি কিছু না করে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী সাহায্য আসছে। নিজেরাই রিলিফ নিয়ে যাবো।

আমিও যাবো তোদের সঙ্গে। এর মধ্যে ভাসানী দুর্গত এলাকা থেকে ঘুরে

BanglaBook.org

এসেছেন। বঙ্গবন্ধুও গেছেন। কিন্তু তিনি ফিরেননি। আগামীকাল পল্টন ময়দানে ভাসানীর জনসভা। তিনি ভীষণ গরম। বোঝাই যাচ্ছে ফাটিয়ে দেবেন সভা।

প্রদীপ্ত চায়ে চুমুক দিয়ে শেষ করে। ওর মনে হয় এইসব খবর নিয়ে বাবা ওর জন্য অপেক্ষা করেছে– যে কয়দিন ও ঢাকায় ছিলো না সে ক'দিনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো বাবা ওকে জানিয়ে দিলেন। এটাই বাবার গুণ। যেখানে যার আগ্রহ তার মধ্যে সেটুকু জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

পুষ্পিতা সোনাইকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ড্রইংরুমে ওকে ঘুমুনোর জায়গা করে দেয়। আলী আহমদ সোনাইর দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের একটি দায়িত্ব রয়ে গেলো দীপু।

কি বাবা?

সোনাইর বাবা-মাকে খুঁজে দিতে হবে।

কঠিন কাজ।

তবু তো চেষ্টা করতে হবে। ওকে নিয়ে ওর গ্রামে আমিই যাবো।

প্রদীপ্ত খুশি হয়। ঘুমুতে যাবার আগে বাবাকে বলে, কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আর বোধহয় হবে না বাবা। এখন শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমাদের আরো বড় কিছু ভাবতে হবে। আমাদের অনেক দেখা হয়েছে।

আলী আহমদ নিজের মনে প্রদীপ্তর কথাগুলো নাড়াচাড়া করে, হ্যাঁ, অনেক দেখা হয়েছে। আর কত?

পরদিন পল্টন ময়দান লোকে-লোকারণ্য। প্রতিদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় দুর্গত এলাকার খবর পড়ে– অগণিত মানব সন্তানের বিকৃত-গলিত লাশের ছবি দেখে তারা ক্ষুব্ধ-উত্তেজিত। সরকারের অবহেলা-ঔদাসীন্য পূর্ববাংলাবাসীকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বর্ষীয়ান জননেতা কি বলেন, তা শোনার জন্য।

একসময় তিনি মঞ্চে উঠে আসেন। শুরু হয় বক্তৃতা– তাঁর কণ্ঠ কখনো প্রবল আবেগে কাঁপতে থাকে, কখনো তীব্র উত্তেজনায় গমগম করে। তিনি বলেন, 'সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসুন, বাঙালির জীবনে আজ মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে।... হযরত নূহের জামানার পর এতবড় প্রলয়কাণ্ড মানুষের ইতিহাসে ঘটে নাই। পূর্ব বাংলার উপকূলের দশ থেকে বারো লক্ষ নরনারী ও শিশু এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু মহাধ্বংসযজ্ঞের দশ দিন পরও প্রায় চার লক্ষ মানুষের লাশ পড়ে আছে। এদের দাফনের কোনো ব্যবস্থা নেই।... বাঙালির দুঃখের দিনে সরকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। অথচ কথায় কথায় জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। এইসব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোগাস।' এ সময় তিনি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। পল্টনের জনসমুদ্র তার প্রতিধ্বনি করে। স্তম্ভিত হয়ে যায় আলী আহমদ– মুহূর্তের মধ্যে এক বিমূঢ় অবস্থা ওকে গ্রাস করে। পরমুহূর্তে ভাসানী বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। মাত্র কয়েক মাস আগে এই সরকারের কাছে তিনি ভাত চেয়েছিলেন। আলী আহমদের চিন্তা দ্রুতলয়ে মানুষের সোচ্চার ধ্বনি, করতালি ইত্যাদি অতিক্রম করতে থাকে। ভাসানী তখনো গর্জন করছেন। পূর্ব পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হৃদয়হীনতার কথা বলছেন। বাঙালি মন্ত্রীরা যে এমন হতে পারে তা কল্পনা করতে পারেননি তিনি। তাঁদের ইসলামাবাদ থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং পূর্ব বাংলায় ফিরলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে জানিয়ে দেন। একসময় তিনি বলেন, 'দুর্গত মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে আমরা সংগ্রাম করবো, ঘেরাও আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আপনারা কি এই আন্দোলন সমর্থন করবেন?'

BanglaBook.org

আলী আহমদ দেখতে পায় জনতা হাত তুলে সমর্থন করে। সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান ওঠে, 'জ্বালো, জ্বালো আগুন জ্বালো'। সভাশেষে বিরাট মিছিল গভর্নর হাউস, জিন্নাহ্ এভিনিউসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

মিছিলে যায় না আলী আহমদ। পল্টন ময়দান থেকে বেরিয়ে জিপিওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রদীপ্তকে খোঁজে, না ও কোথাও নেই। হয়তো প্রেসক্লাবে চলে গেছে। প্রতীকের কথা মনে হয়। ও ঢাকায় নেই। রেডক্রসের দলের সঙ্গে রিলিফ নিয়ে সন্দ্বীপ গেছে। বাসায় ফিরবে না 'সংবাদ' অফিসে গিয়ে মতিউরের ওখানে আড্ডা দেবে ভাবছে– এমন সময় শহীদ সাবের পাশে এসে দাঁড়ায়। সোজাসুজি বলে, সিগারেট আছে? না থাকলে চার আনা পয়সা দিন।

এই মুহূর্তে শহীদ সাবেরের উপস্থিতি চমকে দেয় ওকে। মনে পড়ে তেরো বছর আগে শহীদ সাবের আর ও কাগমারী সম্মেলনে গিয়েছিলো। দু'জনে মাঠে বসে ভাসানীর বক্তৃতা শুনেছিলো। আজও কি সাবের ভাসানীর বক্তৃতা শুনতে এসেছিলো?

সাবের রেগে কটমট করে তাকিয়ে বলে, কি হলো দেবেন না?

আসুন। ইশারায় ওর সঙ্গে আসতে বলে ও পাশের দোকান থেকে চার প্যাকেট সিগারেট কিনে ওকে দেয়। সাবের একটি প্যাকেট নিয়ে বাকিগুলো ফেরত দিয়ে দেয়। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে, ম্যাচ। দোকানি একটা ম্যাচ দিলে সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে চলে যায়। আলী আহমদ দেখে ও আবদুল গনি রোড ধরে এগুচ্ছে। দোকানি হাসতে হাসতে বললো, সেয়ানা পাগল স্যার। দোকানির মন্তব্যে ভীষণ রাগ হয় আলী আহমদের। রুষ্ট কণ্ঠে বলে, ও পাগল না। দোকানি বিস্মিত হয়, পাগল না? নেংটি পরে পথে পথে ঘোরে। ওকে আমি অনেকদিন এই রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেছি। ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে খেতে দেখেছি।

চুপ করো। আলী আহমদ ধমক দেয়। দোকানি ওকে আর একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করে এই ভয়ে ও দ্রুত হাঁটতে থাকে। তারপর একটি রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। শহীদ সাবেরকে পাগল বললে ওর কেন খারাপ লাগবে? এ প্রশ্নের উত্তর আলী আহমদের নিজের কাছেও নেই। শুধু বোঝে সাবেরের পাগল হয়ে যাওয়া পূর্ব বাংলার ইতিহাসের মতো নির্মম। ভাসানী 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' চেয়েছেন। স্বাধীনই যদি হবে তাহলে পরিপূর্ণভাবে হবে– পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে পাকিস্তানের লেজুড়বৃত্তি কেন? প্রথমেই ঐ নাম ঝেড়ে ফেলতে হবে– নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মৌল নাম নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। তাহলে ভাসানী কি শুধু রাজনীতি করলেন? দর কষাকষির রাজনীতি? নাকি বাজিমাৎ করার চেষ্টা করলেন? জনসমুদ্র মাতিয়ে তোলার জন্য চমক দিয়ে জনপ্রিয় হবার বাহবা কুড়ালেন? অন্যদিকে ছয়দফা আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার এ দেশের জনগণ– কিন্তু তারা জানে না পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর ছয়দফা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। বঙ্গবন্ধু চাইছেন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত হবে ছয়দফার প্রতিটি দফা। যদি তা না পারেন তাহলে কি বঙ্গবন্ধু ধরে নিচ্ছেন ছয়দফার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীনতা? কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি এখন পর্যন্ত নীরব।

এর কয়েকদিন পর দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তীব্র ভাষায় সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করেন। বলেন, বিপর্যয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্ধার ও রিলিফ কাজ শুরু করলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা খাবার এবং চিকিৎসার অভাবে মরে যেত না। দুর্গত এলাকার জনগণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দশ

BanglaBook.org

দিন সময় লেগেছে। এটা ভাগ্যের পরিহাস যে পশ্চিম পাকিস্তানে যখন খুব ভালো শস্য ফলেছে তখন আমাদের কাছে প্রধান খাদ্যশস্যের চালান এসেছে বিদেশ থেকে। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, তখন পটুয়াখালিতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের লাশ কবর দিতে হচ্ছে ব্রিটিশ মেরিনদের। পশ্চিম পাকিস্তানের বস্ত্র মিলগুলো বাংলাদেশকে প্রধান বাজার হিসেবে ব্যবহার করলেও তারা নিহতদের জন্য একগজ কাফনের কাপড়ও দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার থাকা সত্ত্বেও রিলিফ কাজের জন্য আমাদের যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এজন্যই কি আমরা গত দু'দশক যাবৎ আমাদের সম্পদের শতকরা বাহাত্তর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করেছি? এজন্যই কি আমরা আমাদের বাজেটের শতকরা ষাট ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করেছি? দেশে জনগণের সরকার থাকলে সুষ্ঠু রিলিফ কাজের জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা সম্ভব হতো এবং জনগণের সরকারের কাছে জবাবদিহির ভয়ে আমলারাও এমন উদাসীন থাকতে পারতেন না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজের বক্তব্য বলে থামলেন বঙ্গবন্ধু। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক পরিপূর্ণ কক্ষ, তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য উদগ্রীব। মাত্র তিন দিন আগে ভাসানী প্রকাশ্যে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' ঘোষণা করেছেন– কিন্তু মানুষ তাকিয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর দিকে– তাঁর সমর্থনে বয়ে যাচ্ছে গণজোয়ার– নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের অগণিত মানুষের প্রত্যাশা তাঁর কাছ থেকে, তিনি এখন কি বলবেন? ছয়দফা দিক-পরিবর্তন ঘটাবে– মানুষের এই আশাকে তিনি কি পারবেন বাস্তবে রূপ দিতে? সাংবাদিকদের প্রশ্ন, নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করা সম্ভব হবে কি? তিনি বললেন, 'জনগণ যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দেয় তা হলে তা আদায় হবেই– আমি এই নির্বাচনকে ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে গণভোট বলেই মনে করি।' সাংবাদিকদের পরের প্রশ্ন, ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবি পূরণ না হলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আন্দোলন করবেন কি? তিনি বললেন, 'আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছি, স্বাধীনতার নয়। আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চাই। তারা যদি তা মেনে না নেয়, তাহলে জনগণই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।' তিনি আরো বললেন, 'বাঙালিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের লাখো লাখো ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তির জন্য আমরা আরো দশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারবো।' এ বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুটে এলো, আর দশ লাখ লোকের প্রাণ দেয়ার কথা বলতে আপনি কি দৈহিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বোঝাচ্ছেন? তাঁর জবাব, 'আমি এখনই তা বলছি না– ভবিষ্যৎই তা বলবে। আমার দল একটি গণতান্ত্রিক দল। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই শুরু করবো। কিন্তু তারা যদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেয়, তাহলে জনগণ তাদের নিজেদের পথই অনুসরণ করবে।'

রাতে খাবার টেবিলে বসে বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক সম্মেলনের কথা বাবাকে বলছিলো প্রদীপ্ত। ওর বলা হলে আলী আহমদ মাথা ঝাঁকায়। তারপর স্থির কণ্ঠে বলে, ভাসানীর এমন প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার পরও তিনি নীরব থাকলেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব জনগণকেই দিলেন। দেখা যাক জনগণ কি সিদ্ধান্ত নেয়।

তখন পুষ্পিতা বলে, তোমরা তো রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে সোনাই খুব কান্নাকাটি করছে। ও বাড়ি যেতে চায়।

হ্যাঁ, ওকে তো আমি নিয়ে যাবো ওর গাঁয়ে।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে বলে, ও কিন্তু বাড়িতে গিয়ে থাকবে না বাবা। বলে, বাবা-

BanglaBook.org

মাকে দেখে আবার ঢাকায় চলে আসবে। আমাদের এখানে থাকবে। বলে, এই চারতলার উপরের বাড়িটা ওর খুব পছন্দ। গাড়ির শব্দ শুনলে নাকি ওর ভীষণ আনন্দ হয়।

হেসে ওঠে সবাই। প্রদীপ্ত বলে, দেখলে বাবা, কত তাড়াতাড়ি ও শহুরে হয়ে উঠেছে।

মঞ্জুলিকা বলে, ওকে দেখে আমার তিতুমীরের কথা মনে পড়ছে।

তোমার তিতুমীর প্রেসক্লাবে ভালো আছে। হাসিখুশি ছেলে। সবাই ওকে পছন্দ করে। সেদিন ভাসানীর মিটিংয়ের পর মিছিল করে এসে আমাকে বলে, স্যার, কতদিন পর মনটা একদম ভরে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে? বললো, এই শহরে মিছিল না থাকলে শহরটা কেমন খালি খালি লাগে।

তোর কি মনে আছে দীপু এই শহরে অহিউল্লাহ ছিলো?

ভীষণ মনে আছে বাবা। আমার কিশোর বয়সে আমি অহিউল্লাহর সঙ্গে একুশের মিছিলে গিয়েছিলাম। ও শহীদ হলো।

পুষ্পিতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, তোমরা এসব কথা বলো না। ভুলে যেও না যে একুশের গুলির পর আমরা মফিজুলের লাশ খুঁজে পাইনি।

মফিজুল আমাদের পারিবারিক শোক। থাক এসব কথা।

আলী আহমদ টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। দেখতে পায় ড্রইংরুমে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে সোনাই। এই শহরে ওর বয়সী ছেলেরা মিছিলে গুলি খেয়ে শহীদ হয়, তারপরও ওরা মিছিলে যেতে ভালোবাসে। এ দেশের পরিবর্তনের কোনো পটভূমি যদি নেতারা তৈরি করে থাকে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তো জনগণই নেবে। এরা শুধু জনগণ নয়, ঢেউয়ের মতো ভেসে যায় না, এরা মানুষ। এবং মানুষ বলেই সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না। এখন পর্যন্ত এ দেশের মানুষ কোনো ভুল সিদ্ধান্তই নেয়নি– নেয়নি বলেই এক অনিবার্য ধারায় তারা যাত্রা শুরু করেছিলো– সে যাত্রা চলছে, এমন কোনো শক্তি নেই যে এ যাত্রা ঠেকাবে। ভাবতে ভাবতে আলী আহমদ হাত ধুয়ে পড়ার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কি হাসছেন? তাই তো মনে হচ্ছে। আলী আহমদ বিভিন্ন কোণায় দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখার চেষ্টা করে। সত্যি তিনি হাসছেন। অথচ যে কেউই বলবে এটা কোনো হাসির ছবি নয়। তাহলে আজ কি আলী আহমদের দৃষ্টিভ্রম হলো? এই হাসির কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে আলী আহমদ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'দিন পর রিলিফ নিয়ে ওরা প্রথমে সোনাইর গাঁয়ে যায়। লঞ্চ থেকেই ওরা দেখতে পায় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা গ্রামে গ্রামে কাজ করছে– গ্রামগুলোর চেহারা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে কোনোদিন জেনারেল-প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার উড়ে যাবে দুর্গত এলাকার ওপর দিয়ে। রাজনীতিবিদদের প্রতিবাদের মুখে জেনারেল-প্রেসিডেন্টের টনক নড়েছে। সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন, নিজেও দেখতে আসবেন পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল। নেহাতই চোখের দেখা, দায়রক্ষা– সমালোচনার মুখে বিশ্ববাসীর সামনে নিজের মান রক্ষা। শুধুই রাজনীতি, আর কিছু না– লাশের সঙ্গে এবং মানবতার অবমাননার সঙ্গে রাজনীতি। প্রদীপ্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে, বাবা, মানুষ কি এমনই? কত তাড়াতাড়ি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে দেখো। ক'দিন আগে কি চেহারা দেখে গেলাম, এখন একদম ভিন্ন। বুকের ভেতর আশার স্বস্তি ফিরে আসছে।

আলী আহমদের মনে হয় প্রদীপ্তর এ কথার সঙ্গে জেনারেল-প্রেসিডেন্টের রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। উপকূল অঞ্চলের মানুষ নিজের থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে, জেনারেল-প্রেসিডেন্ট আসুক বা না আসুক তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। সোনাইর হাত ধরে আলী আহমদ ওর গ্রামের লঞ্চঘাটে নামে। জুতো হাতে নিয়ে কাদা পেরিয়ে পাড়ে উঠতে হলো।

BanglaBook.org

চারদিক খোলা, কোথাও দৃষ্টি আটকায় না। ঘাটে ছুটে এসেছে কয়েকজন নারী-পুরুষ-শিশু। ওদের জন্য গরম কাপড় এনেছে ওরা। এবার বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। ঝকঝকে রোদ তবু উত্তুরের বাতাসের ছোঁয়ায় হি-হি কাঁপছে ক'জন মানুষ। আলী আহমদ প্রত্যেককে সোয়েটার, চাদর দেয়। বিস্কুটের প্যাকেট, দিয়াশলাই, মোম, চিড়ে-গুড় দিলে ওদের শীর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও সোনাইকে জিজ্ঞেস করে, তোর বাড়ি কোথায়?

ওদিগে। সোনাই আঙুল উঁচিয়ে দেখায়। আলী আহমদের মনে হয়ে বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। অনেক ভেতরে ওর বাড়ি। ওরা আট-দশজন মানুষ, বেশিরভাগই প্রদীপ্তর বন্ধুরা। রিলিফ সামগ্রী নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। বেশ খানিকটা পথ সোনাই আলী আহমদের হাত ধরে হেঁটেছে, কিন্তু যতই বাড়ির কাছাকাছি আসে ততোই ওর চঞ্চলতা বাড়ে। একসময় হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেয়। ওরা দেখতে পায় এপথ-ওপথ করে ও যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে শুনতে পায় ও চিৎকার করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ও দৌড়াদৌড়ি করছে– একবার এদিকে যায় তো আর একবার অন্যদিকে। ওদের দেখে ছুটে এসে আলী আহমদকে জড়িয়ে ধরে। বলে, মুই আরাইয়া গেলহাম। এহানে মোগ বাড়ি আলহে, এহন দেহি না। মোর মনে অয় মোরা ভুল জাগায় আইছি। ও আবার চারপাশ ঘুরে এসে বলে, না ভুল জাগা না, জাগা তো ঠিক আছে। ঐতো মোগ সেরেজ গাছড়া উলডাইয়া পইড়া আছে। অ্যা কোমমে অইলো? মোগ ঘরবাড়ি কৈ? মায়ে কৈ? বাবো কৈ? এহন মুই যামু কোম্মে?

প্রদীপ্ত উবু হয়ে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে, তোর ভয় কি সোনাই? আমরা আছি না তোর জন্য।

ও ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে তাকায়, যেন ও এতক্ষণ একজনা এত কথা বলেনি। ওর ভেতরের অবোধ শিশুটি অপার বিস্ময়ে এক নতুন জীবনের দিকে তাকিয়ে আছে। আলী আহমদ ওর হাত ধরে টেনে বলে, তোদের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলটা কোথায় রে সোনাই?

ওদিগে। ও আঙুল উঁচিয়ে দেখায়।

চল, আমরা ওদিকে যাই।

কিন্তু মোগ ঘর? ঘর পামু না?

প্রদীপ্ত সত্যি কথাটাই বলে ওকে, তোর ঘর সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ক্যান? একটু থমকে থেকে আবার বলে, মায়েরেও নিচে? বাবারেও?

সোনাই হাঁ করে প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা-মা হারিয়ে যেতে পারে এটা ওর বিশ্বাস হয় না। কান্না থেমে গেলেও ওর গলার ভেতর থেকে হেঁচকি উঠতে থাকে। এ শব্দ নিয়ে ও হেঁটে হেঁটে প্রাইমারি স্কুলে আসে। কোনোভাবে বেঁচে যাওয়া ওর চাচা আলেফ মিয়া স্কুলের বারান্দায় লম্বা হয়ে শুয়েছিলো। পায়ে ক্ষত, কিভাবে হয়েছে জানে না। প্রথমে সামান্য ক্ষত ছিলো, তখন বেশ চলাফেরা করেছে, কিন্তু ক্ষতটি দিনে দিনে বাড়ছে, এখন হাঁটতে পারে না, শুয়ে থেকে গোঙাচ্ছে এবং বিলাপ করছে, এর-ওর নাম ধরে ডাকছে। সোনাই দৌড়ে গিয়ে চাচার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দু'হাতে ওকে বুকে টেনে নেয়। এখন আর বিলাপ নয়, নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে বুড়ো।

প্রদীপ্তর বন্ধু ডাঃ শাহাবুদ্দীন এগিয়ে গিয়ে বুড়োর হাত ধরে বলে, চাচা ওঠেন, আপনার চিকিৎসা করবো।

মোর চিকিচ্ছা? বাবা এই ঘায়ের জ্বালায় বাঁচি না।

বুড়ো দারুণ উৎসাহে উঠে বসে। শাহাবুদ্দীন প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স খুলে ঘা পরিষ্কার করে। ডেটল দিয়ে ধুয়ে মলম লাগিয়ে দেয়। কেমন একটা বাজে গন্ধ আসছে,

BanglaBook.org

যেন পচন ধরেছে– শিউরে ওঠে শাহাবুদ্দীন। প্রদীপ্তকে বলে, মনে হয় ডায়াবেটিস আছে। তাই শুকোচ্ছে না। প্রদীপ্ত মৃদু কণ্ঠে বলে, সর্বনাশ! গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে তো। শাহাবুদ্দীন বলে, সে রকম আলামত টের পাচ্ছি।

বুড়ো তখন অন্য জগতে– চিকিৎসা হচ্ছে এই আনন্দে অধীর। ওদের কথায় কান দেয় না এবং ওদের কথা বুঝতেও পারে না। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলী আহমদ। অন্য ছেলেরা স্কুলঘরে আশ্রয় নেয়া অন্যদের রিলিফ সামগ্রী দেয়। তখন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় হেলিকপ্টার। সে শব্দে সবাই আকাশের দিকে তাকায়। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে বলে, এতদিনে সময় হলো ইয়াহিয়া খানের।

বুড়ো প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, ইয়াহিয়া খান? ঐ হালায় কেডা?

হা-হা করে হেসে ওঠে ছেলেরা। হাসতে পারে না আলী আহমদ। জেনারেল-প্রেসিডেন্টের নামও জানে না উপকূল অঞ্চলের এই কৃষক। এমন হাজার হাজার মানুষ আছে এখানে। ও কি আলেফ মিয়াকে বলবে যে ঐ লোকটি শালা না, ও তোমার দেশের প্রেসিডেন্ট। হেলিকপ্টারে করে তোমাদেরকে দেখতে এসেছে। তখন আলেফ মিয়া আলী আহমদকে জিজ্ঞেস করে, ঐ হালায় কি চায়? মোগ মাথার উপর দিয়া ঘোরে ক্যান? আলী আহমদ বলে, ও তোমাদেরকে দেখতে এসেছে আলেফ মিয়া।

অ্যা কেমন দেহা? মাথার উপর দিয়া ঘুরলে দেহা অয়? মাটিতে নামতে কন।

প্রেসিডেন্ট যে, মাটিতে নামতে পারবে না।

তাইলে চইলা যাইতে কন। লাগবে না অমুন পেসিডেন। পেসিডেনের হোগায় লাথ্‌থি মারি।

আলেফ মিয়ার মুখ রাগে কুঞ্চিত হয়ে যায়। আলী আহমদই অন্যরা আলেফ মিয়ার রাগ দেখে– জ্বলে ওঠা চোখ দেখে– ওর পায়ের ক্ষতে যেন বিরান জনপদের সমস্ত পোকা এসে হামলে পড়েছে– ঐ পা দিয়ে প্রেসিডেন্টের পাছায় লাথ্‌থি দেবে আলেফ মিয়া। আলী আহমদ মনে মনে বলে, সাবাস! বলে, তোমাদের বুঝতে হবে আলেফ মিয়া যে কেন মাটিতে ধ্বংস-মৃত্যু এবং আকাশে রাজনীতি।

শাহাবুদ্দীন বুড়োর পায়ে চমৎকার ব্যান্ডেজ করে দেয়। বুড়ো খুশিতে আত্মহারা। বারবার ওদের জন্য দোয়া করে। আবার কবে আসবে জিজ্ঞেস করে, পা ভালো হয়ে যাবে কি না জানতে চায়। প্রশ্নের উত্তর দেয় না শাহাবুদ্দীন। ও নিজেও জানে না যে বুড়োর পা ভালো হবে কি না, নাকি গ্যাংগ্রিন বুড়োর মৃত্যু–।

চাচার যতক্ষণ চিকিৎসা হয়েছে ততোক্ষণ সোনাই কিছু বলেনি। স্কুলের মাঠে আরো দু'চারটি বাচ্চার সঙ্গে ছুটাছুটি করেছে। ওদের যেতে দেখে কাছে এসে দাঁড়ায়। আলী আহমদ দেখতে পায় ওর চোখজুড়ে হারিয়ে যাওয়া বালকের আপন জায়গা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। ও এখনো বাবা-মা'র কথা জিজ্ঞেস করেনি। কাছে এসে দাঁড়াতেই ওর ভয় হয়। ও এখন আলেফ মিয়াকে একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে– কি হবে তার জবাব? আলেফ মিয়া ওকে কিছু বলেনি কেন? ও কি ইচ্ছে করে এই বালককে এড়িয়ে যাচ্ছে? সোনাই সোজাসুজি আলেফ মিয়াকে জিজ্ঞেস করে, চাচা মোর মায়ে কৈ? বাবো?

আলেফ মিয়া কাঁদতে শুরু করে। আলী আহমদ ওকে একটা গরম চাদর দিয়ে বলে, আর কত কাঁদবে আলেফ মিয়া? এখন তো লাথ্‌থি দেয়ার সময়। তুমি সোনাইকে সত্যি কথা বলো?

আলেফ মিয়া ফ্যালফ্যাল করে আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সোনাইকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, মুই ছাড়া তোর আর কেউ নাই বাজান।

BanglaBook.org

চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সোনাই।

সেই কান্নার ফাঁকে আলেফ মিয়া ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, মুই ওগো লাশ টাইন্যা নিয়া গাঙ্গে হালায়ে দিছি। তারপর চোখ মুছে বলে, আমনেহ পোলাডারে ঢাকা লইয়া যায়েন। মোরই থাঅনের জাগা নাই। অরে কোনহানে রাখমু? খাওয়ামু কি? কি কও গেদু?

সোনাই কথা বলে না। ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আলী আহমদের দিকে তাকায়। আলী আহমদ ওকে কাছে টেনে নেয়। ওরা যেতে শুরু করে। একসময় ও আলী আহমদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চাচার কাছে যায়- পা ছুঁয়ে সালাম করে আবার ফিরে আসে। আলী আহমদ আবার ওর ছোট মুঠি নিজের মুঠিতে নেয়। বুঝতে পারে না এই বালকটি কেমন করে বুঝে গেলো এই নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নেয়ার কথা। জীবন কি এমনই?

নৌকায় করে ওরা পাশের গ্রামে আসে। খবর পেয়েছে এ গাঁয়ে আমাশয় ও মহামারীর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ঘাট থেকে গ্রামের দিকে এগুতেই আবার মাথার উপর হেলিকপ্টার উড়ে আসে। এবার খাবারের প্যাকেট পড়ছে হেলিকপ্টার থেকে। দৌড়ে যাচ্ছে মানুষ- কাড়াকাড়ি করছে প্যাকেট নিয়ে, মারামারি বাধারও উপক্রম হয়েছে। সোনাই আলী আহমদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দেয়। ওরা ডাকলেও পেছন ফিরে তাকায় না। উজ্জ্বল মুখে একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে আসে, যেন ও একটা বড় কিছু জয় করেছে। প্রদীপ্ত রাগ করে বলে, কেন এনেছিস?

সোনাইর সপ্রতিভ উত্তর, খামু।

বিস্কুটের প্যাকেট ভর্তি ঝোলাটা প্রদীপ্ত ওর দিকে এগিয়ে নিয়ে বলে, নে ধর। সব তোকে খেতে হবে।

ও থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। আলী আহমদ ওর মাথায় হাত রেখে আস্তে করে বলে, তুই তো রিলিফ দিতে এসেছিস সোনাই। তুই তো কুড়াতে আসিসনি।

ও লজ্জায় মুখ কাচুমাচু করে। কারো দিকে তাকাতে পারে না। আলী আহমদ ভাবলো ও কি আসলেই লজ্জা পেলো? নাকি ভয় পেয়েছে? ও কি এটা মনে রাখতে পারবে যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে হাত পাততে নেই? রিলিফের জন্য মারামারি করার মধ্যে গৌরব নেই? রিলিফ নিয়ে বেঁচে থাকা গ্লানিকর? ও কি আত্মসম্মান কি বুঝলো? পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ- সাগরের সঙ্গে যারা লড়াই করে, তাদের সম্মানবোধ তো তীব্র হওয়ার কথা? প্রদীপ্ত ওকে ধমক দিয়ে বললো, যা ওটা ওই ছেলেটাকে দিয়ে আয়।

সোনাই এক দৌড়ে চলে গেলো। হয়তো ও লজ্জাই পেয়েছে, নইলে ফেরত দিতে চাইতো না। ও ফিরে এলে প্রদীপ্ত বলে, এখন থেকে এই জিনিসগুলো সবার হাতে তুই উঠিয়ে দিবি। ও বিশ্বাসই করতে পারে না। চেঁচিয়ে বলে, মুই দিমু?

ওর দৃষ্টি চক্‌চক্ করে। আলী আহমদ ভাবলো, এই বালক সব বুঝে গেছে। এখন থেকে ও আর কারো কাছে হাত পাতবে না। পারলে নিজেই কিছু দেয়ার চেষ্টা করবে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রদীপ্ত বলে, বাবা তাকিয়ে দেখো মানুষগুলোর দিকে? কত সামান্য খাবার পেয়ে ওরা কলরব করছে। যেন ওদের সব শক্তি ফিরে এসেছে। মনেই হয় না এ কদিন গাছের শেকড় বা কলার থোড় খাওয়ার ফলে এদের আমাশয় হয়েছে- দূষিত পানি খেয়ে কলেরা বাধিয়েছে? বাবা আমাদের জনশক্তির আছে অমিত সম্ভাবনা- শুধু কাজে খাটানোর জন্য কেউ নেই। কেবলই দাবিয়ে রাখার চেষ্টা।

আলী আহমদ হেঁটে যায় ক্যাম্পের দিকে। রোগীদের চিকিৎসা চলছে। প্রদীপ্তর কথাগুলো মনে করে ওর আশাবাদ জেগে ওঠে। ডেটল দিয়ে মানুষের ক্ষত ধুয়ে দেয় ও। ভাবে, একটা বড় পরিবর্তনের এখনই সময়।

BanglaBook.org

৫

মঞ্জুলিকার আনন্দ এখন নানা মাত্রার– নিজেকে কোথায় রাখি, কোথায় রাখি এমন একটা ভাব। আমি কি আকাশের মেয়ে নাকি মাটির? আমি বোধহয় মাটির নই– আনন্দে যে আমার মাটিতে পা পড়ে না, আমি তো ডানা মেলে উড়ে যাই আকাশে। আমি কি বৃষ্টি নাকি কুয়াশা? আমি দুটোই। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বুনে যাই শস্য– নীলাভ কুয়াশার ভেতর দীর্ঘ মাইল হেঁটে রচনা করি স্বপ্ন। ওর নানা মাত্রার আনন্দের মধ্যে ঢাপঢুপ শব্দ, পেটের ভেতর একজন কেউ আচমকা নড়ে উঠলে শরীর জুড়ে সাগর বয়– ওহ্, কী বিশাল, গভীর উপলব্ধি। নিজেকে দেখার আনন্দ ওকে বিহ্বল করে দেয়– দেখে নিজের স্ফীত উদর। বড় হয়ে যাওয়ার কারণে ফেটে ফেটে গেছে চামড়ার আবরণ– সেগুলো চিকন আঁকাবাঁকা রেখা হয়ে নদীর মতো ছড়িয়ে গেছে। বিস্ময় ওকে আবেগতাড়িত করে। ও নিজের উদোরে হাত রাখলে টের পায় শিশুটির চঞ্চলতা– যেন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, বলছে, মা টুকি! ও এমন করে নাড়া দিয়ে পালিয়ে থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলা মঞ্জুলিকার এখন নতুন আনন্দ। বলে, সোনা তুমি কোথায়? তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না যে? আমাকে ছুঁয়ে যাও দেখি? না, তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছো। তুমি কি আমাকে স্বপ্ন দেখছো? নাকি পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছো? তোমাকে তো বলা হয়নি যে তোমার বাবা রিলিফ দিতে গেছে। ভীষণ একটা ঝড় বয়ে গেছে এ দেশে। অনেক মানুষ মরে গেছে। তোমার বাবা সোনাইকে কুড়িয়ে পেয়েছে। ও ভীষণ মজার ছেলে। কত যে ওর কৌতূহল! জানো, মা তোমার জন্য একগাদা কাঁথা সেলাই করেছে। কী সুন্দর নকশিকাঁথা! ঐ কাঁথার ওপর তুমি যখন শুয়ে থাকবে তখন আমার মনে হবে তুমি জয়নুল আবেদিনের আঁকা জীবন্ত পেইন্টিং। আমার ভীষণ মন খারাপ সোনা। তোমার নানা সৈয়দপুরে বদলি হয়েছে। জানুয়ারি মাসে তাঁকে চলে যেতে হবে। চিন্তা করলে কেমন যে খালি খালি লাগে শহরটা। তুমি ভেবো না, তোমাকে কোলে নিয়ে আমি তোমার নানার বাড়ি বেড়াতে যাবো। তার আগে যাবো সোনাখালি– তোমার বাবার আর আমার প্রিয় জায়গা। সেখানে জ্যোৎস্না রাতে তুমি এক অলৌকিক শিশু হয়ে আমার কোলজুড়ে ফুটে উঠবে।

পুষ্পিতা দরজায় শব্দ করে, বৌমা, ঘুমিয়েছো? ও সাড়া দেয় না। বলতে চায়, আহ্ মা, চুপ করুন। কথা বলবেন না। আমি তো সোনাকে ঘুম পাড়াচ্ছি। কথা বললে ও কেঁদে উঠবে। পুষ্পিতা আরো দু'বার ডেকে চলে যায়। মঞ্জুলিকা তন্দ্রার ভেতর থেকে জেগে ওঠে। বুঝতে পারে না এ কি ওর স্বপ্ন নাকি জাগরণ? ওর উঠতে ইচ্ছে করে না, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ডান পা উঠিয়ে দেখে প্রথমে, তারপর বাম পা– দুটো পায়ের পাতা ফুলে আছে, পানি জমেছে। ডাক্তার বলেছে এ্যানিমিয়া। কাঁচা লবণ খাওয়া নিষেধ, বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে রাখা চলবে না। শরীর বেশ ভারী হয়ে গেছে, উঠতে-বসতে কষ্ট হয়। স্কুল থেকে এখনো ছুটি নেয়নি, ক্লান্তি লাগে। জানুয়ারি থেকে ছুটি নেবে। তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না সোনা। আসলে তোমার জন্য আমার কোনো সমস্যাই নেই। আমি সব সমস্যা অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারি।

দু'দিন পর সূর্য ওঠার আগেই লঞ্চ এসে ভেড়ে সদরঘাটে। আলী আহমদের হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সোনাই বলে, নানা, ঢাকা, ঢাকা।

হ্যাঁ, ঢাকা। এখন থেকে তোর শহর।

ওকে বেশ সজীব দেখাচ্ছে। সারারাত ডেকের ওপর শুয়ে নিঃসাড় ঘুমিয়েছে। ইলিশের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলো বেশ তৃপ্তি করে। আলী আহমদের ছোট ব্যাগটা ঘাড়ে ফেলে গটগটিয়ে নেমে যায় লঞ্চ থেকে। ওরা যখন বাড়িতে পৌঁছে তখন বেলা উঠেছে–

BanglaBook.org

রোদ ভরে গেছে চারতলার বারান্দায়। মঞ্জুলিকা জেগে শুয়ে আছে, বিছানা ছাড়তে চায় না। পুষ্পিতা রান্নাঘরে বসে চিতুই পিঠা ভাজছিলো। শীতের সময় এ পিঠা সবার পছন্দ। নূরীর মা দরজা খুলে দিলে সোনাই দৌড়ে রান্নাঘরে এসে বলে, নানু, মুই আইছি।

বেশ করেছিস। কেমন ছিলি?

ও কথা বলতে পারে না। চোখ টলটল করে।

পুষ্পিতা কাছে টেনে বলে, বুঝেছি তোর অনেক কথা বলার আছে। সব পরে শুনবো। হাতমুখ ধুয়ে আয়। দেখবো তুই কয়টা পিঠা খেতে পারিস।

ওকে বাথরুমে পাঠিয়ে দিয়ে পুষ্পিতা শোবার ঘরে আসে। আলী আহমদ বলে, ও বাবা-মাকে হারিয়েছে।

বুঝেছি। পুষ্পিতা আলী আহমদকে তোয়ালে দেয়।

ওদের সাড়া পেয়ে মঞ্জুলিকা উঠে দরজা খোলে। ঘরে ঢুকে প্রদীপ্ত ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপি দিয়ে বলে, বাহ, তুমি তো বেশ বড়সড়ো হয়ে গেছো মঞ্জুলি? বেশ অন্যরকম লাগছে।

কতদিন পর দেখলে আমাকে?

যতদিন পরই দেখি না কেন, মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে দেখিনি।

মনে ছিলো আমার কথা?

কাজের সময় তো মনে পড়ার কথা না। একলা হলে তুমি ছাড়া আর কে আছে? আকাশে-বাতাসে-পাতালে সর্বত্র তুমি।

বানিয়ে বানিয়ে যেমন লিখতে পারো, তেমন বলতেও পারো। মেলা গুণ তোমার।

দেখো মঞ্জুলি, এভাবে আক্রমণ করবে না। আমি কিছুই বানাই না। সব বাস্তব।

যাও, হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি নাস্তা–

ব্যস থামো, এত তাড়াতাড়ি তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে? আমার সোনাখালির খবর কি?

সোনাখালি? মঞ্জুলিকা বিস্মিত হয়।

বোঝো না কেন? তুমি কি খুকুমণি?

এসেই কিসব প্যাচাল শুরু করলে। যাই–

প্রদীপ্ত ওকে হাত ধরে বিছানায় নিয়ে আসে। পেটের ওপর কান পেতে বলে, হুঁ দিব্যি আছে। হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছা ও ভূমিষ্ঠ হলে ওকে প্রথম আমি দেখবো।

কিভাবে? ডাক্তার তোমাকে লেবার রুমে ঢুকতেই দেবে না।

দেবে, দেবে। না দিলে জোর করে ঢুকে যাবো। ওকি তোমার পেটের ওপর এমন রেখা পড়েছে কেন? পরমুহূর্তে হো-হো করে হেসে বলে, মঞ্জুলি তোমার পেটটা দেখছি নদী-মাতৃক পূর্ব বাংলা হয়ে গেছে।

হাসতে হাসতে প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে জড়িয়ে ধরে। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় মঞ্জুলিকার শরীর, যেন নদীর কুলুকুলু ধ্বনি ওর শরীরের ভেতর কলকল করছে। ওর আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ হয়।

চিতুই পিঠা আর গরুর মাংস খেয়ে চা নিয়ে বসে আলী আহমদ। পুষ্পিতা গত কয়েকদিনের একগাদা খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। উল্টেপাল্টে দেখছে ও। নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য শুরু হয়ে গেছে নতুন বিতর্ক। বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করেছেন। তিনি নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাচ্ছেন। বলছেন, 'বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন নিয়ে যদি কোনো খেলা শুরু হয়, তা হলে তা

BanglaBook.org

আগুন নিয়ে খেলারই শামিল হবে।' তিনি আরো বলেছেন, 'জনগণকে অবশ্যই সর্বময় ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। নির্বাচন হয় ভালো, আর যদি তা না হয়– জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তিতে তা আদায় করতে হবে।'

প্রদীপ্ত নাস্তা খেতে এসে বাবাকে কাগজে ডুবে থাকতে দেখে বলে, এমন মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছো বাবা? নতুন কোনো খবর আছে?

নির্বাচন পেছানোর দাবি উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে আমিও ভেবেছি বাবা। নিজের চোখেই তো আমরা ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা দেখে এলাম। সেখানে কি এখন নির্বাচন সম্ভব?

বিষয়টি আরো গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে দীপু। এখন নির্বাচন পেছানোর দাবি উঠলে সামরিক সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার আর একটি অজুহাত পেয়ে যাবে। এক হতে পারে ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকার আসনগুলোতে শুধু নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে, ঠিক। একে তো নাচুনে বুড়ি, তার ওপর পড়বে ঢোলের বাড়ি। তোমার জেনারেল-প্রেসিডেন্ট সুযোগ ছাড়বে না।

প্রদীপ্ত নাস্তা খেয়ে অফিসে চলে যাওয়ার পরই প্রতীক বাড়ি ফিরে আসে। হঠাৎ করে ওকে চিনতে পারে না আলী আহমদ। প্রায় পনেরো দিন চর অঞ্চলে ঘোরার ফলে রোদে-পুড়ে যেমন কালো হয়েছে, তেমন শুকিয়েছে। পুষ্পিতা হাসতে হাসতে বলে, তোকে কেমন বুনো দেখাচ্ছে জিতু। খুব কষ্টে ছিলি বুঝি?

মা, তুমি যদি দেখতে মানুষের অবস্থা, তুমি পালিয়ে আসতে। থাকতে পারতে না।

আলী আহমদ বলে, গোসল করে ফেল, ভালো লাগবে। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নে। তোর অভিজ্ঞতার কথা বিকেলে শুনবো।

প্রতীক নিজের ঘরে যাবার আগেই সোনাই এসে পুষ্পিতার গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়। প্রতীক অবাক হয়ে বলে, এই নতুন অতিথিটি কে মা?

অতিথি নয়, পরিবারের সদস্য। ওর কথাও বিকেলে শুনবি। আলী আহমদ ওকে আশ্বস্ত করে।

প্রতীক ভুরু নাচিয়ে সোনাইকে জিজ্ঞেস করে, এই তোর নাম কিরে?

সোনাই। তুমি কে?

ও বাব্বা এ যে দেখছি দারুণ ঘুঘু।

মুই ঘুঘু না। নানাও মোরে ঘুঘু কয় ক্যান?

ও তোর জিতু মামা সোনাই। তোকে আদর করে ঘুঘু ডেকেছে।

হুঁ বুঝেছি, ঘুঘুর অবস্থান বেশ পাকাপোক্ত। নিজের ঘরে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে ও। বলে, জানো বাবা হাতিয়া, সন্দ্বীপ, রামগতি, কুতুবদিয়া ঘুরে রিলিফ দিতে শারীরিক কষ্ট যা হয়েছে সেটা কষ্ট মনে হয়নি, কিন্তু একটা মানসিক কষ্ট আমাদের সবাইকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে। কখনো কখনো আমরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো প্রশ্ন করে না। জানে ও নিজের থেকেই বলবে।

বাবা, তোমার ঐ জেনারেল-প্রেসিডেন্ট আর তার পা-চাটা কুত্তারবাচ্চারা যে আমাদের মানুষই মনে করে না, এই ঘূর্ণিঝড় হলো তার শেষ প্রমাণ। ওদের সঙ্গে আমরা আর কিছুতেই থাকবো না। এরপরও ফেরেশতাতুল্য বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবে। কচু হবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে। ঐ বিটকেলে পশ্চিমা শয়তানরা আমাদের রক্ত চুষে খেয়ে শেষ করবে।

BanglaBook.org

আলী আহমদ মৃদু কণ্ঠে বলে, কি হয়েছে বলবি তো?

যেসব বিদেশী এসেছে ত্রাণকাজে সাহায্য করতে তাদের কাছে শুনেছি। এই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস মার্কিন সরকারের আবহাওয়া দফতর সাতদিন আগে পেয়েছিলো। তারা আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে এই খবর পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু রেডিও পাকিস্তানকে এই সতর্কবাণী প্রচারের অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। কলোনি বানিয়েছে আমাদেরকে। আমরাও এই কলোনির কেমন ঘুঘু তা ওদের জানিয়ে দেবো।

বলতে বলতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্যাগটায় একটা লাথ্থি দেয় প্রতীক। তারপর ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। কালো পাঁশুটে হয়ে যাওয়া প্রতীক এবং ওর বয়সী আরো অসংখ্য ছেলেমেয়ে নিজেদের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে ছুটে গেছে বিপন্ন দেশবাসীর কাছে। খাবার দিয়েছে, শুশ্রূষা দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে– বিনিময়ে অর্জন করেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বোধ। বড় বেশি মাটি থেকে পাওয়া এই চেতনা, মূলের সঙ্গে যার যোগ– এই চেতনা ওদের নিয়ে যাবে আরো গভীরে। আর পিছুহটা চলবে না, বলে আলী আহমদ টেবিলে ঘুঁষি মারে। কয়েকদিন আগে 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' ব্যানারসহ আমরা ঢাকা শহরের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলো– যার যা সামর্থ্য রিলিফের জন্য দান করেছিলো। আরমানিটোলা ময়দানে গায়েবানা জানাজা পড়ার সময়ও মানুষ শোক করেছিলো। এখন মনে হচ্ছে, সব মৃত্যু কান্নার জন্য নয়। এখন প্রতিরোধ। এবার ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। ব্যালট যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ওদের মৌলিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে। তারপর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রাম। ও আবার টেবিলে ঘুঁষি মারে। তখন সোনাই এসে কাছে দাঁড়ায়, নানা কি অইছে? আলী আহমদ ওর থুতনি নেড়ে বলে, ভাবছি তোর বয়স কুড়ি হতে আর কত বছর বাকি? তুই কবে যুদ্ধ করতে শিখবি।

যুদ্ধ? হি-হি করে হাসে সোনাই। বলে, মোরে একটা বন্দুক কিন্যা দেবেন?

আলী আহমদ নিজেকে বলে, তুই তো জানিস না সোনাই যে তোর বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেবার সুযোগ ছিলো। কিন্তু দেয়নি পাকিস্তান সরকার। দিলে আজ তুই এতিম হয়ে যেতি না। এই ঢাকা শহরে একটি উদ্বাস্তু ছেলে হয়ে তুই ভেসে আসতি না। মুহূর্তে সোনাইয়ের মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুই আমাদের সব হারানো পূর্ব বাংলা, তোকে আমাদের নতুন করে গড়তে হবে।

পুষ্পিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখে হাসে। বলে, ছেলেটিকে পেয়ে তুমি দেখছি অন্য মানুষ হয়ে গেলে।

বিকেলে ওকে নিয়ে বেরুবো পুষ্পি। ওকে জামা-জুতো, বইখাতা কিনে দিতে হবে।

একটা বন্দুক।

দেবো, দেবো। ভুলিসনি দেখি। যদি সব কথা মনে রাখতে পারিস তবে বুঝবো তুই একটা বাহাদুর ছেলে।

সোনাই কিছু না বুঝে হাসে। পুষ্পিতা যেতে যেতে বলে, ভালোই সঙ্গী পেয়েছো। আর তিন মাস বাদে আসবে আর একটি, তোমাকে আর পায় কে?

ঠিক বলেছো আমাকে আর পায় কে! আলী আহমদ আবার টেবিলে ঘুঁষি দিয়ে উঠে পড়ে। পড়ার ঘরে যেতে যেতে বলে, দুপুরে কৈ মাছের দোপেঁয়াজা দিয়ে ভাত খাবো কিন্তু। মনে রেখো সামনে আমার সুদিন।

পুষ্পিতা আর জিজ্ঞেস করে না, কেমন সুদিন? কীসের জন্য সুদিন? ওর মনে হয় সুদিনের স্বপ্নটুকু থাক। বাকিটুকু জেনে কি হবে।

BanglaBook.org

বিকেলে আলী আহমদের হাত ধরে নিউ মার্কেট এলাকায় ঘুরে বেড়ায় সোনাই। নতুন জামা-জুতো, বল-বন্দুক, বই-খাতা পেয়েছে। ও এখন রাজা। এখন পর্যন্ত এত জিনিস একসঙ্গে ও চোখেই দেখেনি। ঘোরা শেষ হলে ওকে আইসক্রিমের দোকানে নিয়ে আসে আলী আহমদ। নিজের আইসক্রিমের বাটিটা সামনে রেখে বলে, আমনেহ খাইবেন না? আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলে, না, তুই খা। এট্টু খান? ও এক চামচ আইসক্রিম আলী আহমদের মুখের কাছে নিয়ে আসে। আলী আহমদ মুখে নেয়। ওর সৌজন্য প্রকাশে আলী আহমদ খুশি হয়। মাথা নেড়ে বলে, এবার তুই খা। মনে মনে বলে, তোর কাছে আমাদের অনেক অপরাধ হয়েছে সোনাই। তোর বাবা-মাকে আমরা দাফনও করতে পারিনি। তোর চাচা খোঁড়া পা নিয়ে লাশ টেনে টেনে নদীতে ফেলেছে। আমরা গায়েবানা জানাজা পড়ে দায় সেরেছি। শুধু গায়েবানা জানাজা পড়লে কি মৃতের আত্মার শান্তি হয়? মানুষের কবর থাকতে হয় রে সোনাই। যে মানুষ কবর পায় না সে বড় হতভাগা।

খাওয়া-দাওয়া হলে ও মুখ মুছে বলে, নানা চলেন। নানু মোগ লাইগা ভাবনা করবে।

আলী আহমদ চমকে ওর দিকে তাকায়। মনে হয় ও যেন অবিকল বালক দীপু। বলছে, বাবা চলো মা আমাদের জন্য ভাবছে। কী আশ্চর্য! কেমন করে একজনের জায়গা আর একজনে পূরণ করে ফেলে। বলে, আজ বাড়ি না গেলে কি হয় সোনাই? ধর, তুই আর আমি সারারাত এই শহরে ঘুরলাম।

গুমাইবেন না?

না। ঘুমুবো কেন? ঘুমুলে কি রাতের শহর দেখা হয়?

অয় না। ও ভেবেচিন্তে মাথা নাড়ে। মুই ঢাকা শহর দেখমু।

তাহলে তোকে নিয়ে শুরু থেকেই শুরু করি। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আজিমপুর গোরস্তানে শহীদ বরকত আর শফিউরের কবরের কাছে আসে। ওকে ভাষার লড়াইয়ের কথা বলে। সোনাই কৌতূহল নিয়ে শোনে। এই রূপকথা ও শুনেই যায়। ওর বোঝা হয় না, কিন্তু আলী আহমদ বলতেই থাকে। ওখান থেকে রিকশায় করে শহীদ মিনারে নিয়ে আসে ওকে। বলে, যে শহীদদের কবর দেখলি, ওদের স্মরণে এই মিনার তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে ফুল দিতে আসি। এ দিনটিকে আমরা শহীদ দিবস বলি।

সোনাই ওর ধনসম্পদ আলী আহমদের কাছে রেখে বেদীর ওপর দৌড়াদৌড়ি করে। ওর বয়সী আরো দু'একটি ছেলে ওর সঙ্গে জুটে যায়। সোনাই ফিরে এসে বল আর বন্দুক আলী আহমদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। জমে ওঠে ওদের খেলা। আলী আহমদ দু'পাশের রাস্তার দেয়াল-লিখনগুলো পড়ে। বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'পদ্মা যদি মেকং নয়, এসো পদ্মা মেকং করি, এইখানেই ভিয়েতনাম গড়ি'। কত বৎসর হলো ভিয়েতনাম যুদ্ধের? আট বছর? নাকি নয়? এখনো লড়ে যাচ্ছে ওরা। আমাদের পক্ষে কি সম্ভব এভাবে লড়ে যাওয়া? পশ্চাদভূমি কৈ? কে জোগাবে রসদ? চারপাশে ভারতের সীমান্ত। ভারত ওর ছেড়ে আসা মাতৃভূমি। মুসলমান হওয়ার অপরাধে ওকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় হিন্দুরা, এক সাম্প্রদায়িক শক্তি। সে সময় থেকে যে দেশ ও আপন করেছিলো একুশ বছর পর সে দেশ আর একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে যেতে চাইছে ওরা। সামনে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তি নেই– সামনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বন্ধন। মানুষ চাইছে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্মের জিগির তুলে যে সংহতির কথা ওরা বলেছিলো, সেটা এখন বিষাক্ত

BanglaBook.org

জিহ্বা হয়ে মানুষকে ছুঁতে চায়। এ দেশের মানুষ আর ধর্মের গোলকধাঁধায় ঢুকতে চায় না, চায় খোলা আকাশ– চায় এমন একটি ভূখণ্ড যেখানে মানুষই সব। হবে কি পূর্ব বাংলা তেমন একটি ভূখণ্ড? আলী আহমদ নিজের ভেতর স্বস্তি বোধ করে। শীতের ছোট দিন। শহীদ মিনারের চারদিকে আলো কমে আসছে। খানিকক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে। এই সময়টা আলী আহমদের কাছে সবসময় এক অপূর্ব সময়। ঘরে থাকলে এই আলোর জ্যোতি অনুভব করা যায় না, কিন্তু বাইরে থাকলে এই আলো ও উপভোগ করতে ছাড়ে না। আজ শহীদ মিনার ওর সামনে এই আলোর জ্যোতিতে স্নাত। এই জ্যোতির সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে কতিপয় বালকের কণ্ঠ। ওরা এমাথা থেকে ওমাথায় ছুটে বেড়াচ্ছে। অনাবিল আনন্দে ওরা মশগুল। আলী আহমদের মনে হয় ঐ বালকদের কণ্ঠেও জ্যোতি আছে– এভাবে আলো এবং ধ্বনি জ্যোতি হয়ে গেলে আলী আহমদ নিজে নিসর্গ হয় এবং ওর ভেতরটা ক্রমাগত শেকড় হয়ে প্রোথিত হতে থাকে। তখন ভেসে আসে সন্ধ্যার আযান। আলী আহমদ ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ায়। দেখতে পায় ওর সামনে উদ্ভাসিত এক গায়ত্রী সন্ধ্যা– এমন সন্ধ্যাই তো ও চায়, যেখানে মানুষের মঙ্গল প্রার্থনার সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হবে। শোনা যাবে আযানের ধ্বনি, হতে থাকবে স্তোত্র পাঠ, বাজবে মঙ্গল ঘণ্টা– এক হয়ে যাবে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা। আলী আহমদ একপা, দু'পা করে শহীদ মিনারের পাদদেশে উঠে যায়। বলে, আমি আমার জীবনে এই স্বপ্নটুকু সফল করে তুলতে চাই, যেন মানুষের চেয়ে ধর্ম কখনো বড় না হয়ে ওঠে।

পেছন থেকে সোনাই এসে জড়িয়ে ধরে ওকে, নানা।

কি রে বাড়ি যাবি না?

হয় যামু। এইডা মোর বন্ধু নিমাই। ও সুজন।

বাহ্, বেশ তো। কোথায় থাকো তোমরা?

ঐদিকে।

যাও, বাড়ি যাও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ছেলেগুলো একছুটে রাস্তা পেরিয়ে যায়। আলী আহমদ সোনাইর হাত ধরে রাস্তা পার হয়। ওর ইচ্ছে এ পথটুকু ও হেঁটেই যাবে। চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে।

রাতে খেয়েদেয়ে আলী আহমদ পড়ার টেবিলে আসে। র‍্যাক থেকে এস. ওয়াজেদ আলীর বই নামায়, ওর প্রিয় লেখক। শহীদ মিনারে বসে থাকার সময়ই ওর এস. ওয়াজেদ আলীর 'বাঙালি মুসলমান' শীর্ষক অভিভাষণটির কথা মনে হচ্ছিলো। তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালির' তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র হচ্ছে এই পূর্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙালি রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন যে পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমিতেই মূর্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।' আলী আহমদের মনে হয় কত বছর আগে তিনি এমন ভবিষ্যৎ বাণী করতে পেরেছিলেন যে অবাক লাগে। ১৯৪৩ সালে তিনি লিখেছিলেন 'ভবিষ্যতের বাঙালি' বইটি। বইটির এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। ও সাবধানে পাতা ওল্টায়। পড়তে পড়তে রাত বাড়ে। কেউ জেগে নেই– ঘরে শব্দ নেই, দু'একবার টিকটিকি ডেকে ওঠে। এ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'বাঙালি ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে– একটা সম্পূর্ণ কৃষ্টির জন্য, একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম বিকাশের জন্য যেন বাঙালি এখনও প্রতীক্ষা করছে।... অদূর ভবিষ্যতে সেই সহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই, আর তার প্রভাবে বাঙালি এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে; এবং সেই শুভ দিন যখন আসবে, তখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভূখণ্ডের নয়,

BanglaBook.org

সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে– সত্য, সুন্দর শুভ জীবন-পথের। বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন– ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।'

কী গভীর অর্থবহ কথা। আসবে কি তেমন দিন যেদিন বাঙালি শুধু ভারতবর্ষের নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে? কিন্তু কে সেই মহামানব? যার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে বাঙালি? কে তিনি যিনি বাঙালিকে গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন? আলী আহমদের কণ্ঠ যেন তার স্বপ্নের দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। ও ক্রমাগত এক ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। পূর্ব বাংলায় কি এমন একটি সম্ভাবনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? সে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নামের মধ্যে? বাংলাদেশ নামের মধ্য দিয়ে কি সেই অযুত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে? এমন একটি ভাষাগত এবং জাতিগত রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে তো এ সময়ের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে যদি অনেক রাষ্ট্রের জন্ম হয় তাহলে আর কোনো বৃহৎ শক্তি থাকবে না। কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব করবে না। শান্তি ও কল্যাণের রাষ্ট্র হবে সেগুলো। আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা জানবে না বিশ্বযুদ্ধ কি। বাংলাদেশের মতো একটি একটি করে গড়ে উঠবে হাজারো রাষ্ট্র। আলী আহমদের মনে হয় এক অসম্ভব চিন্তায় ও নিজেকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। কি ভাবে কি হবে ও জানে না, কিন্তু হবে, এটা ওর কাছে স্পষ্ট। 'ভবিষ্যতের বাঙালি' বইটি বুকের ওপর রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বোঁজে ও। রাত তিনটা বেজে কুড়ি মিনিট। ঘুমুনোর ইচ্ছা ছিলো না, তারপরও কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙে দেখে ঘরে বাতি জ্বলছে। বইটি সন্তর্পণে টেবিলের ওপর রাখে। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গায়ে গরদের চাদর, তবু শীত লাগছে। ও রেলিং ধরে দাঁড়ালে দেখতে পায় কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে লোকালয়। ইচ্ছে করছে সবাইকে জাগিয়ে চিৎকার করে বলতে যে ওদের সামনে এক অযুত সম্ভাবনার দরজা আছে। সেটাকে খুলতে হবে। বইটি দীপু, জিতু এবং মঞ্জুলিকাকে পড়তে দেবে। ওরা জেনে রাখুক এই সম্ভাবনার কথা।

BanglaBook.org

নির্বাচন পিছিয়ে দেবার ব্যাপারে যে দাবি উঠিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা, শেষ পর্যন্ত সব বিতর্কের অবসান ঘটালেন জেনারেল-প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর বেতার ভাষণে বললেন, আগের ঘোষণা অনুযায়ী সাত ও সতেরো ডিসেম্বরে যথানিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দুর্গত এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের মোট ত্রিশটি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে একাত্তর সালের সতেরো জানুয়ারি। আলী আহমদের প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে মনে হলো জেনারেলের কাছ থেকে এর বেশি কিইবা আশা করার আছে। তিনি বললেন, আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এ নির্বাচন আইনগত কাঠামো আদেশ ও সামরিক শাসনের সার্বিক আওতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনের পর যদি শাসনতন্ত্র আইনগত কাঠামোর মূলনীতি অনুযায়ী রচিত না হয় তাহলে দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে। বক্তৃতা শুনে আপন মনে হাসে আলী আহমদ। বুঝতেই হবে যে জেনারেল-প্রেসিডেন্ট ভবিষ্যৎ দেখতে জানেন, তাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে না। কয়দিন আগেও বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমরা এখন নিশ্চিত যে, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে ছয়দফা আর এগারোদফার ভিত্তিতে আমাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে।' এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয় তাহলে কি করে আইনগত কাঠামোর মূলনীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত

হবে? হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। আলী আহমদ নিশ্চিত হয়ে যায়। এরপর কি? এরপর দীর্ঘযাত্রা– পথ নির্ধারণ করবে জনগণ।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে আলী আহমদ পোস্টারটি দেখতে পায়। ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ির দেয়ালে লাগানো ছিলো। 'সোনার বাংলা শশ্মান কেন?' শিরোনামায় পোস্টারটিতে দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখানো হয়েছে। রাজস্ব ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানে পনেরোশত কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা– উন্নয়ন খরচ পূর্ব পাকিস্তানে তিন হাজার কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা পনেরো ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য শতকরা পঁচাশি ভাগ। এমন অনেকগুলো বিষয়ের তুলনামূলক চিত্র আছে। দাঁড়িয়ে থেকে পোস্টারটি পড়ে আলী আহমদ। কেন জানি ও অনেকক্ষণ পোস্টারটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মুসলমানের দেশে এত মিথ্যাচার কেন? মুখে বলছে একরকম, কাজ করছে অন্যরকম। সব ধর্মেরই দুটি দিক থাকে। একটি বিশ্বাস, অন্যটি আচরণ। এ দেশে হয়তো বিশ্বাসের মূল ভিত্তিটা এক, কিন্তু আচরণ এক নয়। আচরণে হাজার গলদ, এত গলদ নিয়ে ইসলামের নামে হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি দেশ এক রাখা যায় না? একই দেশের লোক অথচ ওরা খাবে পঁচিশ টাকায় এক মন চাল, আমরা খাবো পঞ্চাশ টাকায়। ওরা তেল খাবে আড়াই টাকায়, আমাদের খেতে হবে পাঁচ টাকায়। কেমন করে ওদেরকে ভাই বলে ডাকবো? কেমন করে মনে করবো ওরা আমাদের সুহৃদ?

ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরছিলো প্রতীক। বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পেছনে এসে দাঁড়ায়। বলে, বাবা আমি দূর থেকে দেখেছি যে তুমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছো।

তুই আগে দেখেছিস এই পোস্টারটা?

হ্যাঁ, দেখবো না কেন। ঢাকা শহরের দেয়ালগুলো ছেয়ে ফেলা হয়েছে এই পোস্টার দিয়ে।

এটার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম পোস্টারটি আমার কাছে শুধুই পোস্টার নয় জিতু, এটা একটা বিমূর্ত চিত্রকলার মতো। এর ভেতরে হাজার রকম অর্থ আছে। শুধু চোখের দেখা দেখলে এটাকে বোঝা যাবে না।

তোমার ভাবনা আমি বুঝি না বাবা। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এই পোস্টার পড়ে মানুষের চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই পোস্টার মানুষকে জঙ্গী করে তুলেছে বাবা।

আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। হাসির কি ব্যাপার ঘটলো তা বুঝতে না পেরে বলে, হাসছো কেন বাবা?

দেখতে পাচ্ছি তুই নিজেও খুব এক্সসাইটেড।

হবোই তো। এখনই তো সময় নিজেদের জন্য কিছু করার।

বাড়ি যাবি না?

চলো। তারপর খানিকটা অভিমানের সুরে বলে, ভাইয়া হলে তুমি অনেক কথা বলতে। আমার সঙ্গে ঠাণ্ডা থাকো।

আলী আহমদ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, পাগল।

তুমি ভেবো না বাবা আমি তোমার সেই ছোট্ট জিতু।

হো-হো করে হেসে ওঠে আলী আহমদ। অনেকদিন পর প্রাণখুলে হাসতে ওর খুব ভালো লাগছে। দুপুরবেলায় রাস্তায় তেমন লোক নেই বলে রক্ষা। নইলে এমন অনাবিল আনন্দের মজাটুকু পেতো না ও। বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় প্রতীকের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তুই আমার ভবিষ্যতের বাঙালির এবং বাংলার স্বপ্ন জিতু। হয়তো সেদিন আমি

BanglaBook.org

থাকবো না, কিন্তু তুই থাকবি। তোর মাঝে বড় হয়ে উঠবে আমার স্বপ্ন। যদি তেমন দিন আসে তাহলে জানবি সেদিন সত্যিকার অর্থে আমার উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ ভুলবো। আমি সব ধর্মের মানুষের জন্য তেমন একটি জায়গা চাই যেখানে কেউ কাউকে তাড়িয়ে দেবে না।

আহ্ বাবা, তোমার কোনো দুঃখ নেই। তুমি অনেক পাপ ক্ষয় করেছো। তুমি একজন খাঁটি মানুষ। তুমি বাঙালি, এ দেশ তোমারই। এমন কেউ নেই যে আবার তোমাকে এখান থেকে উৎখাত করবে।

তাই যেন হয় জিতু।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

৬

আজ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলী আহমদের ভোট কেন্দ্র ঢাকা কলেজ। ও সকালের দিকেই এসেছে ভোট দিতে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে ও কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, সঙ্গে সোনাই। রাস্তায় মানুষের ঢল। প্রবল উৎসাহ চারদিকে– নৌকা মার্কায় সিল দিতে হবে। নৌকা তখন শুধু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নয়। সাধারণ মানুষ দল বুঝতে চাইছে না– বোঝে নৌকা, বোঝে বঙ্গবন্ধু। নৌকা ও বঙ্গবন্ধুর আড়ালে প্রার্থীদের পরিচয় হারিয়ে গেছে। আলী আহমদ হাঁটতে হাঁটতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত আসে। এই শীতের সকালে মানুষের স্রোত দেখে ওর একটা কথাই মনে হয়, যারা স্লোগান দিচ্ছে– পদ্মা যদি মেকং হয়, এসো পদ্মা মেকং করি– তারা কি বুঝতে পারছে যে এটা মেকংয়ের স্রোত? নাকি পদ্মার? এই মানুষের স্রোত থেকে যে স্লোগান উঠছে সেটা এমন– পদ্মা যদি মেকং হয়, এসো পদ্মা পদ্মা রাখি। নদী এবং নৌকার দেশ পূর্ব বাংলা। কে জানে এখানে কবে, কতদিনে সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমি গড়ে উঠবে নাকি ওটা শুধু দেয়ালের লিখন হয়ে থাকবে? ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানুষ কি এই জনস্রোত? যারা শত রকমের নৌকার প্রতিকৃতি দিয়ে ঢাকার রাস্তাকে পদ্মা বানিয়েছে? পদ্মা ওর প্রিয় নদী। মুর্শিদাবাদ থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে কতদিন ঐ পদ্মানদীর তীরের শহর রাজশাহীতে কাটিয়েছে। ঐ শহর প্রায়ই ওকে নস্টালজিক করে। এখনো মনে হয় ওটাই বোধহয় সবচেয়ে মধুর সময় ছিলো। বর্তমান উদ্বেগের, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের। একমাত্র অতীতই দেখা যায়। যা দৃশ্যমান, সেটা স্বস্তির।

সোনাই ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, নানা, মুই ভোট দিমু না?

দিবি। বড় হয়ে নে।

সোনাই জিজ্ঞেস করতে পারে না যে ভোট দিতে ওকে কত বড় হতে হবে। এখন পর্যন্ত ও জানে না ভোট দিলে কি হয়। এখন ভোট ওর কাছে এক ধরনের খেলা। এই যে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে এটা তো উৎসব। মাইকে বক্তৃতা হচ্ছে, গান হচ্ছে। লোকজন আনন্দ করছে। সোনাই মাঝে মাঝে দৌড় দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়। আবার এসে আলী আহমদের হাত ধরে। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের কাছে আসে। এখানে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। বাড়ির সামনে লেক। আলী আহমদ লেকের পাড় দিয়ে হেঁটে যায়। কুয়াশা কেটে গেছে। ঝকঝকে রোদ চারদিকে। ও লেকের পাড়ে

BanglaBook.org

বেঞ্চিতে বসে। সোনাই ছুটোছুটি করে লেকের পানিতে পা ডুবিয়ে আসে। আলী আহমদ একবার ওকে নিষেধ করতে চায়। ভাবে, ওর ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আবার ভাবে, থাক। ও ওর খুশিমতো হেসেখেলে বেড়াক, এখনই তো সময়– যত বড় হবে ততোই জটিল হবে ওর জীবন। সেই জটিলতার পাঁকে পচতে পচতে ও বুঝবে জীবন ভীষণ কঠিন। একটি ভুল পদক্ষেপ ওকে নিয়ে যাবে ভুল ঠিকানায়– অথচ সঠিক পদক্ষেপ ফেলতে চাইলেই ও ফেলতে পারবে না– সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে এক অদৃশ্য কালো হাত ওর পা বেঁকিয়ে দেবে; ওটা ভুল জায়গায় পড়বেই।

সেই কত বছর আগে দেশ ভাগ হলো। বড় শক্ত পায়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো ও। পায়ের নিচে মাটি তৈরি করার চেষ্টা করেছে– একটি প্রিয় ভুবন তৈরির স্বপ্ন ওকে তাড়িত করছে। প্রয়োজনে আন্দোলন হলে ও আবার মিছিলের মানুষ হবে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থা তৈরি হলে সে যুদ্ধেও নামবে ও। ও তো মিছিলের শেষ মানুষ– স্বপ্ন ধরে রাখার মানুষ। একসময় সোনাই এসে হাত ধরে টানে, নানা বাড়ি লন।

বাড়ি? ও সোনাইর দিকে তাকায়। কত সহজে ও ওর পরিবারের ছেলে হয়েছে। পারবে কি এ পরিবারে টিকে থাকতে? কে জানে! আলী আহমদ ওর হাত ধরে হাঁটতে থাকে। বড় রাস্তায় উঠে সোনাই বলে, নানা, মোরে একটা নাও কিন্যা দেবেন?

কেন রে? নৌকা দিয়ে তুই কি করবি?

এই যে নদী–

এটা নদী না, এটাকে বলে লেক।

না, লেইক না, এইডা একডা খাল। মুই এই খালে নাও বাম্। দ্যাশে কত ডিঙা নাও বাইছি। বাবোর লগে মাছ ধরতে যাইতাম। আচ্ছা নানা, এইখালে এ্যাতো নাও ক্যান? এ্যাতো নাও বায় কে?

একজন মানুষ।

কেডা? হ্যার নাম কি?

বঙ্গবন্ধু।

হ্যারে কইয়েন মোরে লগে লইতে। কইবেন তো?

আলী আহমদ হো-হো করে হেসে বলে, আচ্ছা বলবো। বলবো, আমাদের সোনাই একটা সেয়ানা ছেলে।

সোনাই খুশিতে মাথা নাড়ে। বলে, বঙ্গবন্ধুরে কইবেন, সোনাই সোন্দর ডিঙা বায়। মুই ডেউয়ের মাথায় ডিঙা উডায়ে দি। মোর ডিঙা ডুবে না। কইবেন তো নানা?

ওর ব্যাকুল কণ্ঠে হঠাৎ করে চোখ খুলে যায় আলী আহমদের। তাই তো শত শত সোনাই ছাড়া নৌকা ভাসিয়ে রাখবে কে? যে জনগণের কথা বঙ্গবন্ধু বারবার বলেন সোনাই তো তার অংশ এবং আলী আহমদ নিজেও তার অংশ। রাজপথে যদি ধেয়ে আসে বুড়িগঙ্গার স্রোত তখন সোনাই ওর হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠবে, নৌকার হাল ধরবে ও। তখন সোনাই জোরে ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। বলে, আপনে মোর কতা বঙ্গবন্ধুরে কইবেন না, নানা?

আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, না।...

না? ক্যান কইবেন না? ও কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে।

তোর কথা আমি কাউকে বলবো না সোনাই। তুই এ দেশের মানুষ। দেশের জন্য যা কিছু ভালো তা করার জন্য তোকে তৈরি থাকতে হবে, কি করতে হবে সে সিদ্ধান্তও তোর নিজেকেই নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন সিদ্ধান্ত জনগণ নেবে।

সোনাই আলী আহমদের কোনো কথা বুঝতে পারে না। আলী আহমদ জানে

BanglaBook.org

কথাগুলো ও নিজেকেই বললো, সোনাই উপলক্ষ মাত্র। সোনাই ওর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, নাওগুলা বানাইলো কারা?

কারা? আলী আহমদও ছেলেদের চাঁদা দিয়েছে নৌকা বানাবার জন্য। তাহলে এগুলোও কি বানালো জনগণ? মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাড়ায় পাড়ায় নৌকা বানিয়েছে। আওয়ামী লীগ থেকে টাকা পাওয়া যাবে কি যাবে না, তার ধার ধারেনি কেউ। পার্টি কি করলো না করলো সেটাও বড় কথা ছিলো না। মানুষের জোয়ারে ভেসে এসেছে হাজার হাজার নৌকা। নৌকার ভোট দাও– ভোট নিয়ে ভাত দাও। ক্ষমতায় গিয়ে আমাদের হিস্যা বুঝে নাও। ভাবতে ভাবতে আলী আহমদের মাথা সাফ হয়ে যায়।

সোনাই আবার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আপনে কথা কন না ক্যান নানা? কারা এ্যাতো নাও বানাইলো?

আলী আহমদ ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে, এ দেশের মানুষ।

মানুষ, মানুষ, কত্তো মানুষ– সোনাই সুর করে বলতে থাকে। ওর কচিকণ্ঠ আলী আহমদের কানে দেবদূতের বাণীর মতো প্রবেশ করে। ওর মনে হয় সোনাই ওকে বেঁচে থাকার এক ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে আবার বেরুলো আলী আহমদ। এবার একা। ভাত খাওয়ার সময় সোনাই বেরুনোর জন্য বায়না তুলেছিলো। পুষ্পিতা না করেছে। দুপুরবেলা পুষ্পিতা ওকে পড়তে বসায়। ওর মেধা খারাপ নয়, দ্রুত শিখতে পারছে। ভাষাও শিখছে। যদিও আলী আহমদের কাছে ঐ আঞ্চলিক টানটা ভালোলাগে, মনে হয় ওকে এখান থেকে ছাড়িয়ে আনলে ওর নিজেরটুকু হারিয়ে যাবে। কিন্তু বাড়ির সবাই উঠেপড়ে ওকে শহুরে বানাচ্ছে। আলী আহমদ ওকে বলে দিয়েছে, আমার সঙ্গে তুই তোর ভাষাটাই বলবি। ও চোখ বড় করে বলে, নানু বকবে না? উঁহু, তোর নানুকে আমি বলে দেবো। কেউ তোকে বকবে না। এখন সোনাই সঙ্গে নাই দেখে ওর খারাপই লাগে। কেবলই মনে হয়, এই শহরটা ওকে চিনিয়ে দিতে হবে; এর পথঘাট, গলিঘুপচি, মানুষের আচরণ ইত্যাদি সবকিছু। না দেখলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে না। অভিজ্ঞতা থাকলে জীবনকে মোকাবেলা করা সহজ হয়। সারাদিন ক্লান্তিহীনভাবে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ঘুরেও উত্তেজনা ফুরোয় না আলী আহমদের। সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরলে দৌড়ে আসে সোনাই, কয়ডা নাও জিতছে নানা?

এখনো জানা যায়নি। আরো পরে জানতে পারবো।

হাতমুখ ধুয়ে চা নিয়ে রেডিও খুলে বসে আলী আহমদ। গান হচ্ছে, ভলিউম কমিয়ে রাখে ও। পরপর কয়েক কাপ চা খায়। পুষ্পিতা বলে, কি হলো এত চা খাচ্ছো? রাতে ঘুম আসবে তো?

আলী আহমদ বলে, ঘুমুতে চাই না। সারারাত জেগে থাকবো। জানো মনে হচ্ছে মুখের ঐ তেতো বিস্বাদ বেড়েছে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। চা খেয়ে ওটা তাড়াতে চাইছি।

পাশ থেকে প্রতীক বলে, এখন তোমার ওটা এমনিতেই কমবে বাবা।

কেন?

বাহ্, কেন নয়? তোমার জেনারেল-প্রেসিডেন্ট সাধারণ নির্বাচন শেষ করলেন। সিভিল সোসাইটির হাতে ক্ষমতা যাচ্ছে। সামরিক শাসনের অবসান হবে। তুমি একজন মুক্ত মানুষ হতে যাচ্ছো বাবা। তেতো বিস্বাদ তোমাকে আর ঘায়েল করতে পারবে না।

আলী আহমদ হাসতে হাসতে বলে, তুই কিছুতেই বিশ্বাস করলি না যে এটা আমার শারীরিক অসুখ?

একদম না। তোমার কোনো অসুখ নেই।

BanglaBook.org

এক দুই করে নির্বাচনের ফলাফল আসতে শুরু করেছে। নৌকার প্রতীক নিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে তারা এগিয়ে আছে– শুধু এগিয়ে থাকা নয়, বিপুল ভোটে এগিয়ে আছে। আলী আহমদ এমন অভূতপূর্ব ফলাফলে বিমূঢ় হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য মনে হয়। পরক্ষণে ভাবে এমনটি হওয়াই তো উচিত ছিলো– এমন পরিস্থিতিই তো তৈরি করেছেন বঙ্গবন্ধু। মানুষ এখন নিজেদের হিস্যা বুঝে নেবে।

এক ফাঁকে প্রতীক প্রশ্ন করলো, আচ্ছা বাবা বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যাননি কেন? তিনি কি ভেবেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জেতা না জেতায় কিছু এসে যায় না? তিনি কি ভেবেছেন নিজের ঘরে জিতেই পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলবেন?

একসঙ্গে এত কঠিন প্রশ্ন করলি? বিষয়গুলো আমারও ভেবে দেখতে হবে জিতু।

যেভাবে ফলাফল আসছে অবস্থা কি দাঁড়াবে ভেবেছো?

ভাবাভাবির কিছু নেই। ক্ষমতায় আমরা যাচ্ছি।

হিপ হিপ হুর রে! প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে। মা বিরিয়ানি রাঁধতে হবে।

না বাবা, এই রাতে আমি আর রান্নাঘরে ঢুকতে পারবো না। কাল দুপুরে খেয়ো।

খাওয়া-দাওয়ার উৎসবটা কালই হোক জিতু। এর মধ্যে আমরা পুরো ফল পেয়ে যাবো।

তুমি মায়ের পক্ষে চলে গেলে বাবা। নাহ, জমলো না। বলতে বলতে ও নিজের ঘরে যায়। একটুপর আবার ফিরে আসে, বাবা একটা জিনিস খেয়াল করেছো? এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি।

তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না।

আচ্ছা বাবা তুমি কি ভাবতে পারছো যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।

পারছি।

প্রতীক আবার চেঁচিয়ে ওঠে, হিপ্ হিপ্ হুররে! তারপর চোখ কুঁচকে ভুরু নাচিয়ে বলে, তোমার জেনারেল-প্রেসিডেন্ট এ ফলাফল মানতে পারবে তো?

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর ওর নিজের কাছেও নেই। যাই শুয়ে পড়ি, বলে প্রতীক নিজের ঘরে দরজা লাগায়। প্রদীপ্ত বাড়ি ফিরেনি, ফিরবে না বলে জানিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পত্রিকা অফিসগুলো ব্যস্ত। মঞ্জুলিকা খেয়েদেয়ে শুয়েছে। পুষ্পিতা ওকে রাত জাগতে দেয় না। আলী আহমদ ফ্লাক্স ভর্তি চা নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে। কেবলই মনে হয়, জেনারেল-প্রেসিডেন্ট মানবে তো?

ক'দিন ধরে খুব ভালো ঘুম হচ্ছে আলী আহমদের। সেদিন সকালেও ঘুম ভাঙতে ভাঙতে দশটা বেজে যায়। বিছানায় শুয়েই ও শুনতে পায় প্রদীপ্তর কণ্ঠ। ইদানীং প্রায়ই অফিসে রাত কেটে যায়। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাজার সেরে এসেছে। একগাদা বাজার দেখে প্রতীক মহাখুশি। কি কি রাঁধতে হবে তা বলে দিচ্ছে মাকে। আলস্য পেয়ে বসে আলী আহমদের। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে করছে না। প্রদীপ্ত বলছে, বাবার কি হলো? বাবা উঠছে না কেন? নিশ্চয় নির্বাচনের ফল শুনে একদম অবশ হয়ে গেছে। দেখি ডাকি।

মঞ্জুলিকা বাধা দেয়, না, না ডেকো না। বাবা রাত জেগে পড়াশোনা করে–

তাই বলে বেলা দশটা বেজে যাবে ঘুম থেকে উঠতে? না তা হবে না। বাবা? ও বাবা?

ও ঘরে ঢুকলে আলী আহমদ বলে, আয়। আমি জেগে আছি। শেষ খবর কি বল।

জাতীয় পরিষদের তিনশ আসনের মধ্যে একশ ষাটটি পেয়েছে আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে দুটি আসন হাতছাড়া হয়েছে। একটিতে জিতেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব

BanglaBook.org

রায়। অন্যটিতে পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন। অবশ্য রাজা ত্রিদিব রায় আওয়ামী লীগে জয়েন করেছেন। মজার ব্যাপার কি জানো বাবা নূরুল আমীন তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, জনগণের রায়কে শ্রদ্ধা করি।

বেটা সেয়ানা শেয়াল। আলী আহমদ লম্বা করে হাই তোলে।

তবে আমার একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে বাবা?

কি?

আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পেলো না। ফলে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও দলটি কিন্তু আঞ্চলিক মর্যাদার সীমানায় আটকে থাকলো। তাই না বাবা?

আলী আহমদ চুপ করে। তার কোঁচকানো ভুরুর মাঝে বেশ কতগুলো বলিরেখা। প্রদীপ্ত বলে, তুমি কি কিছু ভাবছো বাবা?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, আমাদের যেটুকু পাওয়ার দরকার ছিলো তা আমরা পেয়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আসন নিয়ে খুব বেশি কিছু ভাবার সময় বোধহয় আমরা পাবো না।

তুমি বোধহয় কিছু মিন করতে চাইছো বাবা। আমি তা বুঝতে পারছি। এও বুঝতে পারছি যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এখন এক ভয়াবহ জটিল সময়।

সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো। দেখেশুনে মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু যদি নৌকা প্রতীক দিয়ে কলাগাছ দাঁড় করিয়ে দিতেন মানুষ কলাগাছকেই ভোট দিতো।

ঠিকই বলেছো। দেখা যাক কি হয়। আমি একটু রেস্ট নিয়ে আবার বেরুবো। এতসব উত্তেজনা নিয়ে ঘরে থাকা যায় না বাবা।

আলী আহমদ হেসে বলে, তুই যে কখন ঘরে থাকিস সে তো আমি টেরই পাই না।

তুমিও আমার বিরোধী দলে যেয়ো না বাবা। বলতে বলতে নিজের ঘরে এসে ঢোকে ও। মঞ্জুলিকা জানালার ধারে রোদে গা এলিয়ে বসে ছোট্ট একটি কাঁথায় ফুল-পাখি তুলছিলো। প্রদীপ্ত হুড়মুড়িয়ে ঢুকে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে, রোজই দেখা হয় তবু মনে হয় কতকাল যেন তোমাকে দেখিনি মঞ্জুলি। তোমাকে ভীষণ ফ্রেশ লাগছে।

হয়েছে আর সাফাই গাইতে হবে না।

সাফাই গাইবো কেন? দেশজুড়ে বিজয়ের আনন্দ, আমি কি এর বাইরে থাকতে পারি। তুমি বলো? এমন বাধিয়ে বসে না থাকলে তুমিও ঘরে থাকতে পারতে না।

কি বললে আমি বাধিয়ে বসেছি?

থুড়ি, তুমি বাধাওনি। আমরা ইচ্ছা করে এমন একটা অঘটন ঘটিয়েছি। দেখি কেমন আছে আমার পূর্ব বাংলা, না, না বাংলাদেশ। বলতে বলতে ও কাপড় সরিয়ে পেটের ওপর কান পাতে। কিছুক্ষণ কান পেতে রেখে গম্ভীর মুখে বলে, তোলপাড়টা বেশি মনে হচ্ছে। দুটো নেই তো মঞ্জুলি? নিশ্চয় ওরা ঘুসোঘুসি করছে।

যাহ্। খিলখিল করে হেসে ওঠে মঞ্জুলিকা।

হাসির কথা নয় কিন্তু, আমি সিরিয়াস।

মঞ্জুলিকা আরো জোরে হাসতে হাসতে বলে, জমজ হলে ভালোই হয়। আমার ভীষণ শখ জমজ বাচ্চার।

প্রদীপ্ত হাততালি দিয়ে বলে, আমারও। ভুরু কুঁচকে বলে, একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দারুণ হবে। এককষ্টে সব পাওয়া হয়ে গেলো। বলতে বলতে প্রদীপ্ত বাথরুমে ঢোকে।

কি যে তোমার সব আজগুবী ভাবনা, বলতে গিয়েও বলা হয় না মঞ্জুলিকার।

BanglaBook.org

এলোমেলো ভাবনা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে। এভাবে বেঁচে থাকাই তো মজার, অন্তত একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না। একটুপর ও প্রদীপ্তকে বলে, আমরা সোনাখালি কবে যাবো দীপ?

মার্চের মাঝামাঝি, কি বলো?

হ্যাঁ, তাই। মঞ্জুলিকা মাথা নেড়ে সায় দেয়। তারপর বলে, আচ্ছা দীপ ঐ শিশুটি জন্মানোর পরে আমাদের কারো যদি কিছু হয়ে যায়?

মানে? সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

ধরো, আমি যদি মরে যাই তাহলে তুমি কি পারবে ওকে মানুষ করতে?

মানুষ? মা না থাকলে ও মানুষ হবে কি? হবে তো বানর। আমি ঐসব পারবো না। ওর জন্য তোমাকেই বেঁচে থাকতে হবে। তারপর কণ্ঠ নরম করে বলে, আর আমি যদি মরে যাই তবুও ও মানুষ হবে তোমার হাতে। আমার না থাকাটা ও বুঝতেই পারবে না।

কোথা থেকে যে কোথায় টেনে নিয়ে গেলে! মঞ্জুলিকার মুখ থমথম করে। ও চেয়েছিলো এক করুণ পরিবেশ তৈরি করে দু'জনের মধ্যে দুঃখের অনুভব জাগিয়ে তুলতে। কখনো কখনো এই কাল্পনিক দুঃখবোধ ভীষণ প্রিয় মনে হয়। আজ প্রদীপ্তর রসিকতা ওর ভালোলাগে না। প্রদীপ্ত বিষয়টি আঁচ করে বলে, রাগ হলো? উঁহু, আমার সঙ্গে রাগ করে তুমি থাকতেই পারো না। ও মা, তোমাকে একটা গাল-ফোলা হুলো বেড়ালের মতো দেখাচ্ছে মঞ্জুলি।

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেও মঞ্জুলিকার বিষাদের ভার কমে না। এক অকারণ দুঃখবোধে ও তাড়িত হতে থাকে।

BanglaBook.org

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভুট্টোর দাবি খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার চেষ্টা করে আলী আহমদ। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের দুটো প্রদেশে ভুট্টোর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে– পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। বেলুচিস্তানে ওয়ালি ন্যাপ জিতেছে। অথচ ভুট্টো পাঞ্জাব আর সিন্ধুর আসন যোগ করে বলতে লাগলো তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কি করে তা সম্ভব? আলী আহমদের ভুরু কুঁচকে থাকে। এক ইউনিট প্রথা ভেঙে দেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান যেমন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান তো তেমন একটি প্রদেশ নয়। অথচ ভুট্টো বলে বেড়াতে লাগলো পূর্ব পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগ, পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন পিপলস পার্টি। দুটোই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দুটোই সমান সমান। আলী আহমদের মাথায় ঢোকে না যে ভুট্টো এটা কীভাবে বলে? জাতীয় পরিষদের নির্বাচন পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের নয়– এটা সমগ্র পাকিস্তানের। এখানে সমান বলে ভাগ করার তো প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেল-প্রেসিডেন্ট বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন ভেবে আলী আহমদ শঙ্কিত বোধ করে। জেনারেল-প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় এতদিনে বুঝে গেছেন যে তাঁর হিসেবে ভুল হয়েছে। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ নির্বাচনের ব্যাপারে যথাযথ রিপোর্ট দিতে পারেনি। পারলে জেনারেল-প্রেসিডেন্টের পায়ের নিচ থেকে এভাবে মাটি সরে যেত না– তিনি আগেই ব্যবস্থা নিতেন, সামরিক শাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতেন। এখন কি করবেন? কি হবে তাঁর ভূমিকা? আলী আহমদ বুঝতে পারে বর্তমান সময়টি দেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

সেদিন প্রদীপ্ত অফিস থেকে ফিরে এসে বললো, বাবা জানো ভাসানী আজ সাংবাদিক সম্মেলনে কি বললেন?

নিশ্চয় এমন কিছু যা তাঁকে হিরো বানাবে। আমি তাঁর আচরণ বুঝতে পারি না দীপু।

আমিও না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজ তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এই প্রদেশের মানুষের রায় যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি করেন। বঙ্গবন্ধু যে বলেছিলেন, নির্বাচনের এ রায় ছয়দফা, এগারোদফা ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনগণের রায়, মওলানা ভাসানী তা বাতিল করে দেন। বলেন, এটা কোনো দফার পক্ষে জনগণের রায় নয়। যাকগে। কাল আমাকে দু'দিনের জন্য অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যেতে হবে বাবা। আমি ঘুমুতে গেলাম। কে জানে ঘুম আসবে কি না। ভীষণ মাথা ধরেছে।

আলী আহমদ প্রদীপ্তর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবে, মওলানাকে বোঝা ভার। বাষট্টি সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আইয়ুব খানকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন দিয়েছিলেন। উনসত্তরে আবার অন্যরকম ভূমিকা। এখন এতবড় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর আর একটি নির্বাচনের দাবি। পরদিন গোলাম আযমের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা বলে, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি। আলী আহমদ দাঁত কিড়মিড়িয়ে ভাবে ওদের কাছে নির্বাচন তো নিরপেক্ষ হবেই না। ধর্মের নামে সার্বক্ষণিক চেঁচামেচি করার পরেও এ দেশের মুসলমানরা ইসলামের ধ্বজাধারীদের ভোট দেয় না। এ দুঃখে তো ওদের দেশত্যাগ করা উচিত। পরক্ষণে একা একা হো-হো করে হেসে ওঠে আলী আহমদ, আসলে একটি নতুন দেশের স্বপ্ন তো ওদেরই দেখা উচিত। ওরা কেন এমন যাঁতাকলে পচে মরছে।

ক'দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় সরগরম। ছাত্ররা বিজয় মিছিল করছে। ডাকসু এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাফল্যকে অভিনন্দিত করে বলেছে বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে ছয়দফা ও এগারোদফার সামান্যতম রদবদল সহ্য করবে না। এসব দেখেশুনে আলী আহমদ শীতের রোদ গায়ে নিয়ে হেঁটে যায়। ক্লাস নেয়। ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে ওঠে। এরাই তো বাংলার মানুষের অংশ– ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে, এদের পূর্বপুরুষেরা সহ্য করতে করতে পাঁশুটে, চোয়াল-ভাঙা, নিরন্ন, জরাজীর্ণ। এরা এখন হুমকি দিচ্ছে সহ্য করবে না বলে– এরা কয় ধাপ এগুলো তাহলে? আলী আহমদের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এগিয়েছে, এগিয়েছে। এদের সামনে একজন প্রচণ্ড সাহসী মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এঁদেরকে সাহসের কথা বলছেন– সহ্য না করার মন্ত্র দিচ্ছেন। তিনি ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের জন্ম দেয়ার জন্য এদের তৈরি করেছেন– মনে হয় বাংলার মানুষ আর পেছন দিকে তাকাবে না।

স্যার?

আলী আহমদের চমক ভাঙে। ক্লাসে গুঞ্জন।

তুমি কি কিছু বলছিলে শওকত?

আপনি থেমে গেলেন কেন স্যার?

আমি একটু অন্য ভাবনায় চলে গিয়েছিলাম, সরি।

দু'তিনজন হৈ-চৈ করে বলে, আপনি যে অংশটুকু পড়ছিলেন সে অংশটুকু আমরা আবার শুনতে চাই।

কোনটুকু?

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা।

BanglaBook.org

ও আচ্ছা। শোনো ". হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়েছিলেন।... ।... বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে একক ছিলেন। ... তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন– আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না...। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিলো। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।" পড়া শেষ করে আলী আহমদ বলে, তোমরা কেন আমাকে এই অংশটি আবার পড়তে বলেছো?

আমাদের মনে হয় আমরা বিদ্যাসাগরের এই ধিক্কার মুছে দিতে পারবো। মনে হয় আমরা যা আরম্ভ করেছি তা শেষ করতে পারবো।

পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলে, স্যার আমরা দুর্বল নই, ক্ষুদ্র নই।

স্যার আমরা হৃদয়হীন নই, কর্মহীন নই।

আলী আহমদের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। গোটা ক্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন একটি মুখের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই। বিশ্বাস হতে চায় না যে এসব কথা এরাই বলছে। এরা কারা? এরা বিদ্যাসাগরের কয় প্রজন্মের পরের মানুষ? এরা কিভাবে নিজেদের তৈরি করেছে? কেমন করে এমন সাহসভরা কথা বলছে?

স্যার আপনি চুপ করে আছেন কেন? আমাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না?

আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলে, না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিনি সর্ববিষয়ে ইহাদের বিপরীত ছিলেন। এতই কি সহজ বিপরীতের দূরত্ব অতিক্রম করা? তাঁর কাছে পৌঁছতে হলে তাঁর মতো হয়ে উঠতে হবে। তোমরা কি তাঁর মতো হয়ে উঠতে চাও?

চাই।

পারবে তাঁর মতো জ্ঞানী, কর্মঠ, সহিষ্ণু, পরোপকারী মানবকল্যাণের দার্শনিক এবং আরো কি যেন?

ওসমান বলে দাম্ভিক নয় বিনয়ী, তার্কিক নয় যুক্তিবাদী স্যার।

হ্যাঁ, পারবে হতে?

গোটা ক্লাস চুপ। কারো মুখে কথা নেই। খানিকটুকু কথা থাকলেও মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ থাকত, সেটা অস্পষ্টভাবে হলেও আলী আহমদের কানে এসে লাগতো। কিন্তু না তেমন কোনো আভাস নেই। ওরা যে উৎসাহ নিয়ে শুরু করেছিলো, সে উৎসাহ এখন আর নেই। আলী আহমদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমরা এমনই। আমরা বিদ্যাসাগরকে ছুঁতেও পারবো না। তবে আমাদের নিজেদেরকে অতিক্রম করার একটা পথ আছে।

কি স্যার?

যদি আমরা স্বাধীনতার জন্য একটা যুদ্ধ করতে পারি, তাহলে হয়তো বাঙালি হিসেবে আমাদের মাথাটা আকাশ সমান উঁচু হবে।

পারবে?

পারবো স্যার, ওরা চেঁচিয়ে বলে। তখন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। ছুটি হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা বসে থাকে। আজ আর কেউ হুড়োহুড়ি করে বের হয় না। ওরা তাকিয়ে আছে আলী আহমদের দিকে।

আমরা যদি একটি যুদ্ধে জয়ী হতে পারি, যদি বাঙালিদের একটি রাষ্ট্র হয়, তাহলে বুঝবো আমরা বিদ্যাসাগরকে ছুঁতে যাবার পথে অর্ধেকটা রাস্তা পেরিয়েছি। এরপরে

BanglaBook.org

আমরা যদি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে বুঝবো আমরা বিদ্যাসাগরকে ছুঁয়ে ফেলার সবটুকু রাস্তা পার হয়েছি। পারবে এত দীর্ঘ এবং কঠিন পথ পেরুতে?

ছেলেমেয়েরা আবার চুপ। আর কোনো গুঞ্জন নেই। আলী আহমদ নিশ্বাস ফেলে বলে, ছুটি হয়ে গেছে। চলো বাড়ি যাই।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যায়। আলী আহমদ ওদের পরে বের হয়। ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে ওর মনে হয় পা কি ফুলে গেছে? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে কেন? ও পা থেকে স্যান্ডেল খুলে পা ঝেড়ে নেয়, না কোনো ব্যথা নেই, শুধু ঝিমধরা ভাব দু'পায়ে লেপ্টে আছে। ও সেমিনারে এসে চুপচাপ বসে থাকে। জানালা দিয়ে তাকালে শীতের উজ্জ্বল দুপুর অনুভব করা যায়। দেখতে দেখতে একটি বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর দু'দিন পর নববর্ষ। এদিন বাংলা বিভাগ থেকে ড. মুহম্মদ এনামুল হককে সংবর্ধনা দেয়া হবে। পণ্ডিত গবেষক এই মানুষটি ভাষা আন্দোলনের শুরুতে কী তীব্র ভাষায় বাংলার পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাধক মানুষ, দেশ-জাতি-ঐতিহ্যের প্রশ্নে অনড় থেকেছেন– নিজের জাতিসত্তার মূল্যায়ন করতে ভুল করেননি। আলী আহমদ আলমারী খুলে বই বের করে। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ও মগ্ন হয়ে গেলে ওর চারপাশের জগৎ সুনসান হয়ে যায়। বাইরে কমে আসতে থাকে শীতের দুপুরের আলো।

একাত্তরের পয়লা জানুয়ারি। বাংলা বিভাগে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাঁর বক্তৃতার একটি লাইন শুনে চমকে ওঠে আলী আহমদ। তিনি বললেন, 'এখন আমাদের বাঙালি হতে হবে?' শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকেও আলী আহমদ একা হয়ে যায়। ভাবে, আমরা কি বাঙালি নই? নতুন করে বাঙালি হতে হবে কেন? নাকি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালি হতে হবে? আলী আহমদ ধরে নেয় যে তিনি এটিই বুঝিয়েছেন। সমগ্র বাঙালির বিপরীতে একাকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির ঋজু বলিষ্ঠতা অর্জন করতে বলেছেন। তাঁর মতো সাহসী হতে বলেছেন, যিনি অনায়াসে প্রভু সেজে থাকা বিদেশীর নাকের ডগায় চটি জুতো পরা পা ওঠাতে পারেন। তাঁর মতো কর্মঠ হতে বলেছেন, যিনি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থেকেও নুয়ে পড়েন না। আরো কত কি, আরো কত– বলে তো শেষ করা যাবে না।

সে রাতে বাড়ি ফিরে আলী আহমদের খুব ভালো ঘুম হয়। স্বপ্ন দেখে সোনাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণমালার বই মুখস্থ করতে করতে বড় হয়ে গেছে।

দু'দিন পর রেসকোর্সে আওয়ামী লীগের তৈরি নৌকার আকৃতির বিরাট মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বন্যা হাসতে হাসতে প্রতীককে বলে, যদি তোমাকে ঐ মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হয় আপনি কিছু বলুন, তখন তুমি কি করবে?

ভেবেছো ঘাবড়ে যাবো? মোটেই না। আমি খুব স্মার্টলি কিছু বলতে শুরু করবো।

তোমার পা কাঁপবে না?

মোটেই না। আমি কি তোমার মতো ভীতু?

আমি মোটেই ভীতু নই।

যদি তোমাকে ঐ মঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে তোমার সামনে মাইক দিয়ে দেয়া হয়, তুমি কি করবে বন্যা?

BanglaBook.org

যারা আমাকে উঠিয়ে দেবে আমি সরাসরি তাদেরকে বলবো, আমার একটি ইচ্ছে আছে। ওরা তো আশ্চর্য হয়ে যাবে। বলবে কি ইচ্ছা? আমি বলবো, জিতু নামের একটি ছেলেকে আমার পাশে এনে দিতে হবে। ওরা তোমাকে খুঁজতে যাবে। দিগবিদিগ খুঁজে চ্যাংদোলা করে এই মঞ্চে এনে তুলে দেবে।

প্রতীক হাসতে হাসতে বলে, বেশ তো নাটক করে বলছো। বেশ মজা লাগছে শুনতে।

মাঝপথে বাধা দিও না জিতু। শোনো, তুমি যখন মঞ্চে আসবে আমি স্মার্টলি তোমার হাত ধরে মাইকের সামনে এসে দাঁড়াবো। তোমাকে আমি আগে থেকে কিছু বলবো না, কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে গাইবো, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। মুহূর্তে এই রেসকোর্সভরা হাজার হাজার মানুষ আমাদের সঙ্গে গাইতে শুরু করবে। কেমন মজা হবে না? আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াবে আমাদের গান।

প্রতীক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তুমি গ্রেট। তোমার কল্পনার কাছে আমি হেরে গেলাম।

বন্যার দু'চোখ চক্‌চক্ করে। প্রতীক জানে, ইদানীং সৎ-মার সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে।

রেসকোর্স ময়দানে মানুষের ঢল, চারদিকে লোক গিজগিজ করছে। ওরা দু'জনে অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চের মানুষগুলোকে চেনা যায় না। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। একটুপর আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবে। জনতার সামনে শপথ গ্রহণ, এই প্রথম এমন একটি ঘটনা ঘটছে। মানুষ উৎসুক, উদ্গ্রীব। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন বঙ্গবন্ধু। একে একে সংসদ সদস্যরা মঞ্চে উঠছেন– প্রবল করতালি চারদিকে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান গেয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। প্রতীক বন্যার হাত চেপে ধরে আছে। একটুপর আকাশে উড়ে গেলো সতেরোটি কবুতর– ছয়দফা ও এগারোদফার প্রতীক হয়ে। কবুতরগুলোর উড়ে যাওয়া অনুসরণ করে বন্যা ওপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ছোটবেলায় ওর একজোড়া কবুতর ছিলো। ও খাবার নিয়ে কাছে ডাকলে নির্ভয়ে কাছে চলে আসতো– কী যে মজা লাগতো। সকালে ঘুম ভাঙতো ওগুলোর বাকুম-বাকুম শব্দে। ঐ শব্দ শুনলে ওর মনে হতো আকাশজুড়ে মেঘের গান। কবুতরগুলো বুঝি ওর নাম দিয়েছে মেঘবতী। বলছে, মেঘবতী চলো যাই, বৃষ্টি ঝরাই। শস্য ফলাই। আমাদের ঠোঁটে শস্যদানা উঠিয়ে আনি। ও স্বপ্ন দেখতো মেঘের। বলতো, আমার হাত তো আকাশ। আমার হাতের তালু থেকেই তো তোমরা শস্যদানা খাও। তখন ওরা খুশিতে মেঘবতী, মেঘবতী বলতে বলতে উড়ে যেত অনেক দূরে।

একবার ঠিক ডিম-পাড়ার আগে আগে পাশের বাসার দুষ্টু ছেলেটা এক ফাঁকে কবুতর দুটো চুরি করে নিয়ে গেলো। বন্যা তো কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়েছে। দু'দিন পর বাড়ি বয়ে এসে ছেলেটি বললো, ভারি তো দুটো কবুতর তার জন্য এত কাঁদতে হয়? আমরা কয়বন্ধু মিলে ভীষণ মজা করে পিকনিক করেছি। ওহ্, যা চমৎকার রান্না হয়েছিলো?

বন্যা চিৎকার করে বলেছিলো, তোমরা খেতে পারলে আমার কবুতরের মাংস?

কেন পারবো না? আমি তো আর ওটাকে তোমার মতো পুষিনি। ঠিক আছে আমি তোমাকে আর একজোড়া কবুতর এনে দেবো।

ঠিক আমার দুটোর মতো হওয়া চাই।

দুষ্টু ছেলে হি-হি করে হেসে বলেছিলো, বোকার মতো কথা বলো কেন? একটি কবুতর কি কখনো আর একটি কবুতরের মতো হয়? যেটা যায় সেটা যায়ই। তুমি ভীষণ

BanglaBook.org

ভালো গান গাও, আর এই সহজ কথাটা বোঝ না বন্যা?

না বুঝি না, বুঝতে চাই না।

ছেলেটি বন্যার বেণী ধরে জোরসে টান দিয়ে বললো, ঝগড়া করো না, বাড়ি যাও। তুমি একটা ন্যাকা মেয়ে।

একে অন্যায় করেছে, তারওপর ওকে বকুনি দিচ্ছে, রাগে-দুঃখে ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলে মা বলেছিলো, ও খেয়ে ফেলেছে ভালোই হয়েছে। কবুতর বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেলে ভাগ্য খারাপ হয়। দরকার নেই কবুতর পুষে।

ও হাঁ করে মায়ের দিকে তাকিয়েছিলো। কবুতরগুলো কিনে দেবার সময় মা তো ওকে এসব কথা বলেনি, এখন বলছে কেন? ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। বারবার মনে হয়েছিলো মা ওকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিলো। কতইবা বয়স ছিলো তখন? আট নাকি নয়? তখন ও ভাগ্য বুঝতো না– ভাগ্য নিয়ে মাথাও ঘামাতো না। তখন পর্যন্ত ওর জীবন থেকে কোনোকিছু হারায়নি। মা মারা যাবার পর ও ভাগ্য বুঝতে শিখেছে। নিজের সঙ্গে একা একা বুঝতে শিখেছে। এখন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় উঠে বসে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে ওর ভাগ্যে কি আছে? প্রতীকের সঙ্গে কি ওর ভাগ্যের বন্ধন গড়ে উঠবে নাকি দু'জনে দু'জায়গায় চলে যাবে? কেউ কারো কথা মনে রাখবে না?

প্রতীক ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কি হয়েছে বন্যা?

দেখলাম কবুতরগুলো কতদূর গেলো?

বেশিদূর যায়নি কিন্তু। ওগুলো সব ঐ বটগাছের মাথায় গিয়ে বসেছে।

ছোটবেলায় মা আমাকে দুটো কবুতর কিনে দিয়েছিলো, সাদা রঙের। ওরা আমাকে মেঘবতী বলে ডাকত।

মেঘবতী? প্রতীক অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, ভারি সুন্দর নাম তো? আমিও তোমাকে মেঘবতী ডাকবো।

না, তুমি ও নামে ডাকবে না।

কেন?

ও নামে ডাকলে আমি তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবো।

যতসব বাজে ভাবনা।

বাজে ভাবনাই তো রোমান্টিকতা।

রেসকোর্স না হয়ে বাড়িতে বসে যদি তুমি আমাকে রোমান্টিকতার সংজ্ঞা দিতে তাহলে দেখাতাম মজা।

তখন মাইকে শপথ বাক্য উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। যদিও ওরা খুব নিচুস্বরে কথা বলছিলো, তবু পাশ থেকে একজন বুড়ো ওদের ধমক দিয়ে বলে, এই ছেলেমেয়েরা তোমরা একটু বেশি কথা বলছো। চুপ করে থাকো, নইলে এখান থেকে সরে যাও।

ওরা কথা বাড়ায় না। দু'জনে আরো পেছনে চলে যায়। ততোক্ষণে শপথ পাঠ শেষ হয়ে এসেছে। ওঁরা বলছেন : 'আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ তথা সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের নামে : জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব।' এরপরই শুরু হয় স্লোগান। ওরা দু'জনে দেখতে পায় সেই বুড়ো 'জয় বাংলা' বলে নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো আর একজনকে বলছে, আরো জোরে চিৎকার করতে।

BanglaBook.org

বন্যা বলে, দেখো বুড়োর কাণ্ড!

এখনকার মানুষের এটাই আবেগ। 'জয় বাংলা' এ দেশের মানুষের রণধ্বনি হয়েছে। এর মধ্যে যাদু আছে মেঘবতী। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতর যোশ আসে।

হ্যাঁ, আমারও তেমন লাগে। মনে হয় ঐ স্লোগান উচ্চারণ করে শত্রুর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বটে! প্রতীক কপট ভান করে বলে, আমার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ো না কিন্তু।

তুমি কি আমার শত্রু?

প্রতীকের জবাব দেয়া হয় না। মাইকে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুরু হয়েছে। অতোদূর থেকে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যায় না– সফেদ পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘকায় কৃতিমান একজন মানুষের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে থাকে ওদের সামনে। ওরা শুনতে পায় 'শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করলে দাবি আদায় হয় না। দাবি আদায়ের জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে।' তিনি বলছেন, ষড়যন্ত্রের কারণে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবু আপনারা নিরস্ত হবেন না। আরো বললেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তবে তাঁদের জ্যান্ত কবর দেবেন।

বন্যা ফিসফিসিয়ে বলে, কথাগুলো শুনতে আমার ভয় করছে। চলো বাড়ি যাই।

ভয় পিছু নিলে বাড়ি গেলেই কি ভয় কাটবে মেঘবতী? ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের সঙ্গেই আমাদের লড়তে হবে।

বন্যা দাঁতে ঠোঁট চেপে চুপ করে থাকে।

ছোট একটি ছেলে বাদামের ঝুড়ি নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতীক চার আনার বাদাম কেনে। দু'জনে বাদাম খেতে খেতে হাঁটছে। সামনে-পেছনে-ডানে-বামে মানুষ। সভা ভেঙেছে, যে যার পথে ফিরছে। এ যেন, খলখল-কলকল মানুষের স্রোত।

বাড়ি ফিরে প্রতীক আলী আহমদকে বলে, বাবা তুমি কি গিয়েছিলে রেসকোর্সের সভায়?

গিয়েছিলাম, আলী আহমদ জিজ্ঞাসু চোখে ছেলের দিকে তাকায়।

একটা বিষয় আমার ভালোলাগেনি বাবা। বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা এবং জয় পাকিস্তান একসঙ্গে বললেন কেন?

আলী আহমদ জানে, তার এই ছেলেটি সমালোচনা না করে কোনোকিছু মানতে পারে না। ওর যুক্তিতে না মিললে সেটি ও গ্রহণ করে না। তাই আলী আহমদ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, তুই তো জানিস বঙ্গবন্ধু এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রশ্নে নীরব। তিনি বলছেন জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। এ অর্থে তিনি তাঁর সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি মনে করি।

কি রকম? প্রতীক উৎসুক হয়ে তাকায়।

তিনি 'জয় পাকিস্তান' বলেছেন কারণ এ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। অন্যদিকে তোমার দেশ, আমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবং জয় বাংলা স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বপ্নকেও তুলে ধরেছেন। তাঁকে তো প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে দেখে ফেলতে হবে জিতু। পায়ের নিচে কাঁটা ফুঁটিয়ে অচল হয়ে গেলে তো চলবে না।

তোমার সঙ্গে আমি একমত নই বাবা। নির্বাচনের পরপর 'হাতিয়ার' নামে একটি পত্রিকা আমি তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম। ওরা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলো 'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।' ওরা বেশ কয়েকটা কারণ বিশ্লেষণ করেছে। আমিও এটাই বিশ্বাস করি

BanglaBook.org

বাবা। মানুষ এখন প্রস্তুত। জয় বাংলা– জয় পাকিস্তান বলে গোঁজামিল দেয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

উচ্চস্বরে কথাগুলো বলে গটমট করে চলে যায় প্রতীক। ওর চেহারার কাঠিন্য এবং চোয়ালের-কপালের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে থাকে আলী আহমদের সামনে। মনে হয় এটুকু যেমন সত্য বঙ্গবন্ধুর ঐ স্লোগান দুটোও সত্য। কোনটি আমার দেশ সে স্লোগান তো তিনি দিয়েই দিয়েছেন। একবার ভাবে প্রতীককে ডেকে বলে, নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহলে তিনিই সেটা সবার আগে বুঝতে পারছেন। তারপরও তার নীরবতা কেন এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রতীক। আজকের সভা থেকে ফিরে আমি নিজেও অনেক ভেবেছি। ভেবে সিদ্ধান্তে এসেছি। আমার মনে হয়েছে এটা তাঁর কৌশল। তুই যাকে গোঁজামিল বলিস, আমি তাকে কৌশল বলি। তুই তো জানিস তিনি বিপ্লবী নন। কম্যুনিস্টও নন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষ। এই মুহূর্তে তিনি কোনো ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। তাঁকে লড়তে হচ্ছে জেনারেল-প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাজটি কত কঠিন তা বোঝার বয়স তোর হয়নি প্রতীক। তোর ঐ শক্ত মুখ দেখার পরও আমার মনে হয় তিনি ঠিকই করেছেন। অন্তত আমি তাই মনে করি। তাঁকে পা ফেলতে হবে মেপে। এ দেশের অগণিত মানুষ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছে। এদের সবার দায়িত্ব তাঁর। তিনি এখন শুধু একজন ব্যক্তি নন– সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধি, একথা তাঁকে ভুললে চলবে না।

সেদিন প্রদীপ্ত রেসকোর্স থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। ওর শরীর খারাপ লাগছিলো, মনও খারাপ ছিলো। মঞ্জুলিকাকে বলে, বিমল ঢাকায় এসেছে।

মঞ্জুলিকা লাফিয়ে ওঠে, ঢাকায় এসেছে? ভালোই হলো এবার ওর গান শুনে ছাড়বো। আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছো?

না। প্রদীপ্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়।

বলোনি? কেন?

ওর সঙ্গে শিশির আছে।

মঞ্জুলিকা অবাক হয়, শিশির কে?

তুমি চিনবে না। সোনাখালির ছেলে।

তো হয়েছে কি? ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলো।

বিমলকে কাল প্রেসক্লাবে আসতে বলেছি। ওরা বাসায় আসতে পারবে না।

বাব্বা একদম রাজ কাজে ব্যস্ত। যাকগে, তোমাকে টায়ার্ড মনে হচ্ছে?

চা খাওয়াবে মঞ্জুলি?

এমন করে বলছো কেন? আসলেই তুমি টায়ার্ড দীপ। মা লুচি আর আলুর দম করেছে। দেবো এনে?

না, শুধু চা।

মঞ্জুলিকা বেরিয়ে গেলে প্রদীপ্ত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। রেসকোর্সে বিমল আর শিশির এক জায়গাতেই ছিলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলছিলেন, 'ইউনিয়নে, মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে তাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হন।' তারপর নকশালদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'চোরের মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র মানুষতে হত্যা করে বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।' এসব শুনে শিশির দাঁত কিড়মিড় করে বলেছে, বড় বড় কথা বলা হচ্ছে। আচ্ছামতো শিক্ষা দিয়ে দেবো। তারপর

BanglaBook.org

তীব্র চোখে প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বিমল ফিসফিসিয়ে বলেছিলো, কিছু মনে করবেন না দীপু ভাই। ও অবস্থা দেখতে ঢাকায় এসেছে।

ততোক্ষণে সভা ভেঙে গেছে। লোকজন চলে যাচ্ছে। ওরা ভিড় বাঁচিয়ে একপাশে এসে দাঁড়ায়। প্রদীপ্ত খানিকটা রূঢ় কণ্ঠে বিমলকে বলে, তুমি তো ওর বন্ধু নও। ওর দলেরও লোক নও বিমল।

ও আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। বলেছে, না এলে খতম করে ফেলবে।

তুমি ওকে ভয় পাও?

পাই। বিমল অকপটে উত্তর দেয়।

বুঝেছি, ও একা ঢাকায় আসতে চায়নি। তাই না?

হতে পারে। আমি জানি না।

চলো ওদিকে যাই।

না, আপনার সঙ্গে কোথাও যাবো না। কাল একবার প্রেসক্লাবে আসবো। থাকবেন।

কখন আসবে?

দুপুরের পর যে কোনো সময়।

তুমি একা আসবে?

ও আপনাকে পছন্দ করে না দীপু ভাই।

জানি। ক'দিন থাকবে ঢাকায়?

জানি না।

এ সময় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শিশির দ্রুতপায়ে কাছে এসে বিমলের হাত ধরে টানে, চলে আয়। বিমল কিছু না বলে ওর পিছু নেয়। শিশির প্রদীপ্তর দিকে না তাকিয়ে বলে, ইচ্ছে হয় মুখের ওপর মুতে দেই।

এ কথার পরও বিমল পেছন ফিরে তাকায় না। প্রদীপ্ত রাগতে পারে না। করুণা হয় ওর জন্য। কত জনের মুখের ওপর পেশাব করবে ও? ওর দলে আর ক'জনইবা আছে। যাদের ও পছন্দ করে না এমন মুখের সংখ্যাই তো বেশি। এত মুখের ওপর মুততে হলে তো ঢাকা শহর বঙ্গোপসাগর হয়ে যাবে। ইচ্ছে হয় হো-হো করে হাসে, কিন্তু হাসতে পারে না। চারপাশ দিয়ে লোক হেঁটে যাচ্ছে।

কিন্তু এখন ওর অবসাদ লাগছে। বারবারই শিশিরের মুখ ভেসে ওঠে– কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের মুণ্ডহীন ধড়টা–। না এসব ও ভাবতে চায় না। কিন্তু একটা মৌল প্রশ্ন ওকে কুরে খায়। রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে বঙ্গবন্ধু তাদের খতম করার জন্য তাঁর কর্মীদের বলেছেন। শিশিররা বলছে দেখে নেবে। তাহলে কি নিজেদের রক্ত নিজেদেরই পান করতে হবে? স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়, গৃহযুদ্ধ শুরু হবে দেশে? ওর প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগে– উঠে বাবার কাছে আসে। ওর প্রশ্নটির কথা বলে। আলী আহমদ চুপচাপ শোনে। তারপর হেসে বলে, ওরা আর ক'জন? ওদের ক্ষমতাই বা কি? তাছাড়া ওরা তো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। জনগণ থেকে দূরে থেকে কোনো বড় কাজ করা যায় না দীপু।

প্রদীপ্ত কোনো কথা না বলে বাবার সামনে থেকে উঠে আসে। চায়ে চুমুক দিলে মনে হয় অবসাদ কেটে যাচ্ছে। তখন মঞ্জুলিকা ওকে খবরটা দেয়, জানো বাবা সৈয়দপুর বদলি হয়েছে।

বদলি? কবে খবর হলো?

আজই। শোভন বলে গেছে। মা'র খুব মন খারাপ। আমার এমন সময়ে মা কাছে থাকতে পারবে না।

BanglaBook.org

পারবে না কেন? মাকে নিয়ে আসবো।

অতোদূর থেকে মা'র আসা হবে না। মঞ্জুলিকারও মন খারাপ হয়।

তোমার ভয় করছে? কীসের ভয়, আমি আছি না। তোমার ব্যথা উঠলে আমি মাথার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবো।

ফিক করে হেসে ফেলে ও। বলে, সে আশায় গুড়ে বালি।

কেমন আছে আমার বাচ্চা দুটো?

দুটো? সবসময় ইয়ার্কি ভালোলাগে না।

বলতে বলতে মঞ্জুলিকা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনের ভেতর খুশির রেশ ছড়িয়ে থাকে। প্রদীপ্তর ইয়ার্কি ওর ভালোই লাগে– মনে হয় সবকিছু ভালো লাগার এখনই বড় সময়। একদিন হয়তো এই সময়টুকুই ওর জীবনের সবচেয়ে ভালো স্মৃতি হয়ে থাকবে। একটুপরই মঞ্জুলিকা আপন মনে হাসতে হাসতে ফিরে আসে। প্রদীপ্ত বলে, কী ব্যাপার ভূতে ধরেনি তো?

জানো ওদিন সোনাই আমাকে বলে, মামী আপনি তো বেশি ভাত খান না, তাহলে আপনার পেটটা এত বড় কেন?

হুঁ, ছেলেটাকে ভালোই পাকিয়েছো তুমি। এখন তো বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথাও বলতে শিখে গেছে। তা তুমি কি জবাব দিলে?

বললাম, এই পেটের ভেতর একটা রাজপুত্তুর আর একটা রাজকন্যা আছে।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার মতো ভঙ্গি করে বলে, দুটো?

আহ্, শোনো না। ও হেসে জিজ্ঞেস করে, হাতিঘোড়া, রাজা-মন্ত্রীও আছে? বললাম, তাও আছে। ওতো মহাখুশি। বললো, কী মজা! কী মজা! রাজা খাবে ব্যাঙ ভাজা।

হো-হো করে হাসে প্রদীপ্ত। বলে, ডেঁপোটা কৈ? ওকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।

ঘরে নেই, খেলতে গেছে।

মঞ্জুলিকা রান্নাঘরে যায়। পুষ্পিতা আজ ভালোমন্দ রান্না করছে।

BanglaBook.org

পরদিন দুপুরের পরপরই বিমল এসে হাজির হয়। উস্কুখুস্কু চেহারা, দেখলে মনে হয় ঠিকমতো খাওয়া এবং ঘুম কোনোটিই হয়নি। প্রদীপ্ত ওকে দেখেই বলে, খিদে পেয়েছে, না?

ভীষণ।

তা নিজের শরীরটাকে মশাকে এভাবে দিয়ে রেখেছিলে কেন?

বলবেন না আর। শিশিরটা মানুষ না। মশারি ছাড়া মোষের মতো পড়ে পড়ে ঘুমুলো। আমার কথা ভাবলোই না।

এখন কোথায়?

ওর গোপন আস্তানায় গেছে। ওসব জায়গায় আমাকে আবার নেয় না।

তারপরও তুমি ওর বন্ধু?

ও আমাকে বন্ধু ভাবে না। প্রয়োজনে কাজে লাগায়। ওকে উপেক্ষা করার সাহস আমার নেই। হঠাৎ করে বিমল প্রদীপ্তর হাত ধরে বলে, দীপু ভাই ও হয়তো কোনো একদিন আমাকে মেরে ফেলবে।

হঠাৎ একথা মনে হলো কেন তোমার?

কুদ্দুস প্রেসিডেন্টকে ও খুন করেছে এটা আমি জানি যে।

পাংশু-বিবর্ণ হয়ে যায় বিমলের চেহারা। প্রদীপ্তর খুব মায়া হয় ওর জন্য। বলে,

এসব কথা ভেবো না। এসো ভাত খাবে। তোমার জন্য আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছি।

গোগ্রাসে ভাত খায় বিমল। প্রদীপ্ত তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ও সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে, মৃত্যুর খবর যদি পান অবাক হবেন না।

আহ্, বিমল চুপ করো।

বিমল মাথা নিচু করে। প্রদীপ্তর বুক মোচড়াতে থাকে। একজন মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা ভীষণ কষ্টের। নসিবের কথা মনে হয় ওর। অনেকদিন নসিবের সঙ্গে দেখা নেই। ও দেখা করার চেষ্টাও করেনি। পত্রিকায়ও কোনো খবর নেই। হয়তো ওর বিচারের বিষয়টি সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেছে। বিমল খেতে খেতে মাথা না তুলেই জিজ্ঞেস করে, কি ভাবছেন দীপু ভাই?

আমার একজন প্রিয় মানুষের কথা।

বেঁচে নেই?

আছে।

হঠাৎ তাঁকে মনে পড়লো কেন?

তিনি এখন জেলে। তিনি একজন অন্যরকম মানুষ। নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি পরেছেন।

বিমল আর প্রশ্ন করে না। ভাত খাওয়া শেষ করে। একটানে তিন গ্লাস পানি খায়। প্রদীপ্তর মনে হয়, ওর বুকে এত তৃষ্ণা কেন? কতইবা বয়স ওর?

চা খাবো দীপু ভাই।

প্রদীপ্ত চায়ের অর্ডার দেয়। বিমল হাতমুখ ধুয়ে এসে আবার বসে। ওকে খানিকটা প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। প্রদীপ্তর ভুরু কুঁচকে থাকে। বিমল নসিবকে নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি কেন? ওর কৌতূহল কি শেষ? নাকি নিজে নিজেই অন্যকিছু ভাবছে? চায়ে চুমুক দিয়ে ও বলে, চমৎকার বানিয়েছে। আপনিও খান না দীপু ভাই? ও নিজেই বেয়ারাকে আর এক কাপ চা আনতে বলে। প্রদীপ্ত ভেবে পায় না নসিবের কথা শুনেই কি বিমল এমন বদলে গেলো? তখন ও বলে, আমার ভাবতে খুব ভালো লাগছে দীপু ভাই যে আমিও আপনার প্রিয় মানুষ। কখনো এমন প্রিয় মুহূর্তে আপনিও আমাকে এভাবে স্মরণ করবেন। আপনার নসিব ভাই জেলে না থাকলে আমি তাঁকে দেখতে যেতাম। বলতে বলতে আর্দ্র শোনায় বিমলের কণ্ঠ। প্রদীপ্ত প্রসঙ্গ ঘোরায়, তোমার মা কেমন আছে?

শরীর বেশি ভালো নেই। আমার চিন্তায় আরো অস্থির থাকেন।

নমিতা কেমন আছে? রাঙাবালি ফিরে গেছে?

আর ফেরা। মা খাইয়ে দিলে ভাত খায়, নইলে ছুঁয়েও দেখে না। রাতদিন কাঁদে। ঠিকমতো ঘুমুতেও পারে না। চিৎকার করে জেগে ওঠে। তাছাড়া ওর ভাইবোন আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওকে তো পাঠানোও যাচ্ছে না। দূর সম্পর্কের এক কাকা আছে ওদের বাড়িতে। পাহারা দেয়, যাতে অন্যরা দরজা-জানালা ভেঙে না নিয়ে যায়।

প্রদীপ্ত মাথা নিচু করে থাকে। বলার কিইবা আছে। বিমলের মুখের ওপর বিধ্বস্ত রাঙাবালি লুটোপুটি খায়। প্রদীপ্ত কিছুতেই সে চিত্রটি সরাতে পারে না। একটুপরে কণ্ঠ ঝেড়ে বিমল হাত উল্টে বলে, এভাবেই তো কেউ মরে প্রকৃতির হাতে, কেউ মানুষের। ওর প্রফুল্ল ভাব আবার মিইয়ে যায়। ওর কণ্ঠের আর্দ্রতাও নেই। মুহূর্তে ও সবকিছু ঝেড়ে ফেলে। ও এখন রয়্যানি গানের গায়ক নয়, ও এখন দার্শনিক বিমল। জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে মোহমুক্ত হয়ে গেছে। ওকে আর পিছু টেনে ধরে রাখা যাবে না। বিদায় নেবার সময় বলে, আর দেখা হবে কি না জানি না দীপু ভাই।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, হবে না মানে, একশ'বার হবে। আমি মার্চের মাঝামাঝি মঞ্জুলিকাকে নিয়ে সোনাখালি যাবো। আমাদের প্রথম সন্তান ওখানে ভূমিষ্ঠ হবে।

বিমল অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্তর আকস্মিক উচ্ছ্বাস সে দৃষ্টিতে হোঁচট খায়। গলা নামিয়ে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিমল কঠিন কণ্ঠে বলে, না। পাগলামির সীমা থাকা উচিত দীপু ভাই। আমি বলছি আপনি আর কখনো সোনাখালিতে যাবেন না।

তাহলে কি জীবিত ফিরতে পারবো না?

কে জানে। আমি জানি না। আসি।

বিমলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্জুলিকাকে ও কি বলবে? যা ওর আর মঞ্জুলিকার কাছে স্বপ্ন তা বিমলের কাছে পাগলামি। এ এক রূঢ় সত্য, প্রদীপ্ত নিজেকে বোঝায়। কত ধরনের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পদে পদে ফিরিয়ে দেয় মানুষের স্বপ্ন, তার মুখোমুখি হওয়াই জীবন। বিমল যে উপলব্ধি থেকে ওকে সোনাখালি যেতে নিষেধ করেছে সে উপলব্ধির ভেতর ও শিশিরের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। ওর অপরাধ শিশির যে জোতদারকে খতম করে ও সেই জোতদারের আত্মীয় এবং গণতন্ত্রের বুলি কপচায়। এ রূঢ় সত্য মেনে নিয়ে প্রদীপ্ত প্রেসক্লাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিজের অস্বস্তি কাটাতে চেষ্টা করে। পারে না। অস্বস্তি নিয়ে অফিসে যায়। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরলে দেখে মঞ্জুলিকা ঘুমিয়ে গেছে। তখন ওর বুকের ভার নামে। নিজের এই মানসিক অবস্থায় মঞ্জুলিকার মুখোমুখি হতে ওর ভীষণ ভয় ছিলো।

BanglaBook.org

পরদিন রমনায় অনুষ্ঠান। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন, 'অতি বিপ্লবী কয়েকটা স্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার শিভালরির মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিলে সে ডাক আমিই দেবো।'

প্রদীপ্তর মাথা কেমন জাম হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে ও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। রাতে জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখে। ঘুম আসে না। শরীর খারাপ লাগছে। বমি বমি ভাবও হয়। বারবারই চোখের সামনে কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের কাটা মুণ্ডু ভেসে ওঠে– ভেসে ওঠে সোনাখালির আদিগন্ত ধানক্ষেত। দেখতে পায় সোনাখালির মাঠে হাজার হাজার শকুন নেমে এসেছে। প্রতিটি শকুনের লম্বা ঠোঁট ধারালো ছুরি হয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। সে শকুনের মাথার ওপর উল্লাস-ধ্বনিতে মেতে উঠেছে শিশিররা। ওরা কতজন? প্রদীপ্ত দেখতে পায় না। ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওর বুকের ভেতর থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ আসছে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় মঞ্জুলিকার। ও প্রদীপ্তকে ধাক্কা দেয়, এই কি হয়েছে? প্রদীপ্ত নড়তে পারে না। ও নড়বে কি করে? ওর বুকের ভেতরে যে হাজার হাজার কারা যেন চেপে বসেছে। মঞ্জুলিকা ওকে জোরসে ঝাঁকুনি দিলে ও উঠে বসে এবং বাথরুমে পৌঁছবার আগেই ঘর ভাসিয়ে বমি করে।

পুষ্পিতা দরজায় ধাক্কা দেয়, বৌমা দীপুর কি হয়েছে?

মঞ্জুলিকা দরজা খোলে, দেখুন কাণ্ড।

পানি খেতে এসেছিলাম আমি। মনে হলো ওকে বোবায় ধরেছে।

প্রদীপ্ত ততোক্ষণে বাথরুমে ঢুকে গেছে। পুষ্পিতা বলে, ওকে একটু লবণ-পানি খাইয়ে দেই। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।

ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা বমি থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে মঞ্জুলিকার মনে হয় ওর নিজেরও বমি পাচ্ছে। ও একবার ওয়াক করে শব্দ করে। তখন বাথরুম থেকে বালতি ভরা পানি আর ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়ে আসে প্রদীপ্ত।

মঞ্জুলি তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

তুমি সাফ করবে নাকি?

হ্যাঁ। এখান থেকে যাও।

মঞ্জুলিকা বাইরে চলে আসে। লবণ-পানি নিয়ে ফিরে আসে পুষ্পিতা, পানিটুকু খেয়ে নে দীপু।

আমার কিছু হয়নি মা। সারাদিন ঘুরেছি তো শরীর খারাপ লাগছিলো।

খাবি না?

ঠিক আছে, বলছো যখন দাও।

প্রদীপ্ত গ্লাস নিয়ে টেবিলের ওপর রাখে। মনে মনে বলে, এ লবণ-পানির ভয় নয়। একে বলে নসিয়া, বাংলায় বিবমিষা। তোমাকে কি করে বোঝাবো মা যে আমার কেন নসিয়া হয়! ও গ্লাসের পানি বাথরুমে ফেলে দেয়।

ক'দিন পর শহর গরম হয়ে ওঠে, জেনারেল-প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসেছেন। নির্বাচনের পর এই প্রথম। বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তিনি তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। আলী আহমদের মনে পড়ে মাত্র পাঁচ-ছয়দিন আগে বঙ্গবন্ধু তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আপনারা মনে করবেন না যে নির্বাচনে জিতেছেন বলে তারা সহজে আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে। আর একথাও ভাববেন না যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। আপনারা ভুলে যাবেন না যে ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিশালী– তাদের শক্তি আছে, অস্ত্র আছে, এজেন্ট রাখার ক্ষমতা আছে। আলী আহমদ কাগজ রেখে উঠতে উঠতে ভাবে, সবই সত্যি। এ দেশের সামরিক রাজনীতি এমন কথারই প্রতিধ্বনি করে। তারপরও দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

রাতে খাবার টেবিলে বসে প্রদীপ্ত বলে, বাবা তোমার জেনারেল-প্রেসিডেন্ট বেশ নরম স্বরেই কথা বলছে। বেশ ধৈর্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে।

প্রতীক ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তোমাকে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সাফাই গাইতে হবে না ভাইয়া।

আমি মোটেই সাফাই গাইছি না। যা হয়েছে তাই বলছি।

না, তাও বলতে পারবে না।

কেন তোর হুকুম আমাকে মানতে হবে নাকি?

আহ্ থাম তো তোরা। আলী আহমদ ধমক দেয়।

জিতুটার বেশি বাড় বেড়েছে বাবা।

কখনোই না। সত্যি কথা বললে–

তোরা যদি না থামিস তাহলে ভাতই খাবো না আমি।

পুষ্পিতা হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সবাই চুপ। যদিও দু'জনে রাগে ফুঁসছে। আলী আহমদ আস্তে করে বলে, খেয়ে নাও। জেনারেল-প্রেসিডেন্টের জন্য ঘরে ঝামেলা বাড়িও না। ঐ বেটা দূরেই থাকুক।

ঠিক বলেছেন বাবা। মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে বলে।

তিনদিন ধরে শহরের সবখানে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা চলছে। মানুষের ভাবনার

BanglaBook.org

শেষ নেই। কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করছে, বাঙালিদের হাতে কোনোদিনই ক্ষমতা দেবে না ওরা। কেউ আশাবাদী, এবার আমাদের পালা। আমাদের পাওনা আমরা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়বো। আলী আহমদ দ্বিধায় দিন কাটায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা মনে পড়ে। নির্বাচনে জেতাটাই শেষ নয়। কাপ আর ঠোঁটের মাঝখানে কতকিছু ঘটে যেতে পারে। কে জানে! এখন সময়ের অপেক্ষা।

যাবার দিন জেনারেল-প্রেসিডেন্ট বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বললেন, শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে। শিগ্রি দেশে শেখ মুজিবর রহমানের সরকার গঠিত হবে এবং শেখ সাহেব দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।

সাংবাদিকরা তাঁর কাছে জানতে চাইলো তিনি ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি না? তিনি বললেন ভুট্টোর এলাকা সিন্ধুতে পাখি শিকার করতে যাবেন। ভুট্টো সেখানে থাকলে দেখা করবেন।

খবরের কাগজ থেকে চোখ সরে না আলী আহমদের। ও অস্ফুট স্বরে বলতে চায়, পাখি শিকার? কিন্তু বলতে পারে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে। গলা-খাঁকারি দিলে ভেতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের হয়। আলী আহমদের মনে হয় ওর বোধগুলো কাজ করছে না। মনে হয় এত বছরের শিক্ষকতা জীবনের আজ এক ভীষণ ক্রান্তিকাল– ও পাখি শিকার কি বুঝতে পারছে না। এই মুহূর্তে ও যদি ক্লাসে থাকত এবং ছেলেরা জিজ্ঞেস করতো, স্যার ইয়াহিয়া খানের পাখি শিকার মানে কি? ও বোকার মতো তাকিয়ে থাকত। জবাব দিতে পারতো না। ওর জবাব জানা নেই। খবরের কাগজের ওপর তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখের সামনে পাখির আকার এবং রঙ বদলে যেতে থাকে। অর্থ তো স্পষ্ট নয়ই।

BanglaBook.org

৭

কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়েছে মঞ্জুলিকা। ওর ভীষণ মন খারাপ। দু'দিন ধরে ও মায়ের বাড়িতে। সে বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে। ওর মা ব্যস্ত, সারাক্ষণই তদারকি করছে– একে বকছে, ওকে বকছে। বাড়ি ছাড়তে হলে বোঝা যায় সংসারের খুঁটিনাটি কত কিছু জমা হয়। মঞ্জুলিকার প্রায় ভরা মাস, তেমন কাজ করতে পারে না। চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে আছে। এক ফাঁকে মা মঞ্জুলিকার পাশে এসে বসে, শীতের দিনেও কপাল ঘামছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলে, তোর বাবার যেমন বদলির চাকরি, আমার তেমন বদলির সংসার। বিয়ের পর থেকেই তো এই করে আসছি। সবাই বলে ঝামেলা। আমার কিন্তু গায়েই লাগে না। অভ্যেস হয়ে গেছে। নতুন নতুন জায়গায় যেতে ভালোই লাগে।

নতুন জায়গায় যেতে আমারও ভালোলাগে মা। তবে এই প্রথম আমি তোমাদের সঙ্গে নেই।

ওর মা একগাল হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তোর তো এখন সবচেয়ে খুশির সময়। দু'মাসের মধ্যে মা হবি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন ভালোয় ভালোয় খালাস হয়। আমি বাচ্চা দেখতে চলে আসবো।

ওর মা আবার কাজে চলে যায়। মায়ের ছুটোছুটি এবং গোছগাছ দেখে ওর মনে হয় যেন ওর শৈশব-কৈশোর ওর চোখের সামনে ভাসছে। ওর বাবা মীজানুর রহমান

রেলওয়ের চাকুরে– কত স্টেশনে যে ওদের থাকতে হয়েছে, তা এখন আর মঞ্জুলিকা মনে করতে পারে না। ওর জন্ম সিলেটের টিলাগাঁও স্টেশনে– ওটা ছিলো ওর বাবার তৃতীয় পোস্টিং, আর মায়ের সংসারের শুরু। ওর সবচেয়ে মজা লাগতো বদলির সময় মালগাড়িতে পুরো সংসার সাজিয়ে ওর বাবা যখন এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যেতেন। ঢিলে গতির মালগাড়ি– মনে হতো যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, সাতদিন-দশদিন লেগে যেত। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল মিলিয়ে কত কি ছিলো ওদের সংসারে। মালগাড়ির খোরা ওয়াগনে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটতো গরুগুলো। ছাগলদুটোর গলায় ছিলো লাল ফিতা দিয়ে ঘুঙুর-বাঁধা– টুংটাং শব্দ শুনলে মঞ্জুলিকা ছুটে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতো। প্রত্যেক স্টেশন থেকে ওগুলোর জন্য বিচালি সংগ্রহ করা হতো। তারপর একদিন একটা নতুন স্টেশনে ট্রেন এসে থামলে বাবা বলতো, আমাদের এখানে নামতে হবে। আবার নতুন করে সংসার সাজানো হতো। মায়ের কাজের শেষ ছিলো না এবং ওর মায়ের কোনো ক্লান্তি ছিলো না। বাড়ি গোছানো হয়ে গেলে মন দিতো বাগানে। ঝটপট মওসুমের সবজি লাগানো চাই। আর ওর প্রিয় খেলা ছিলো রেললাইনের ধার থেকে নুড়ি কুড়ানো। মাঝে মাঝে নুড়ি কুড়িয়ে ফ্রক ভরে নিয়ে এলে মা ভীষণ রেগে যেত। বলতো, এবার জামা ছিঁড়লে আর জামা বানিয়ে দেবো না। তখন তোমাকে রাতদিন খালি গায়ে থাকতে হবে।

সেই সাত বছর বয়সে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হতো মা'র কথা। ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকত– মায়ের ওপর রাগ হতো, মনে হতো মা গল্পে শোনা অনেক ডাইনিদের একজন। ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারলেই বেঁচে যায়। তবে মায়ের অমন নিষ্ঠুর কথা শুনেও ও নুড়ি কুড়োনো ছেড়ে দেয়নি। জামার জন্য ওর কোনো মায়া ছিল না– ছেঁড়া জামার চেয়ে নুড়িই ভালো। জামায় ফুটো থাকলে কিইবা এসে যায়। কিন্তু কবে ওর নুড়ি-খেলার দিন ফুরিয়েছে ও টের পায়নি। হয়তো সেটা ওর কৈশোরের শুরুতে, যখন নতুন জামা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াতে শিখেছে। তখন জামার জন্য ভীষণ মায়া– একবার বাগানের কাঁটাতারে বেঁধে গিয়ে জামা ছিঁড়ে গেলে কি ভীষণ কেঁদেছিলো। মা বলেছিলো, কাঁদছিস কেন? নতুন জামা বানিয়ে দেবো।

তখন ওরা শায়েস্তাগঞ্জে– জংশন স্টেশন, কত বড়, কত মানুষ– কত বিচিত্র আসা-যাওয়া। হঠাৎ করে কোনো তরুণকে দেখলে বুকের ভেতর কেমন করতো। তখনই বুঝতে শুরু করেছিলো, স্টেশন মানে আসা-যাওয়া। যাকে হঠাৎ করে দেখলো, সে হঠাৎ করেই হারালো। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নতুন কেউ চলে যায়, কেউ ওকে দেখে হাত তোলে, হাত নাড়ে, বিদায়ের ইশারা দেয়। দেবেই তো, তারা তো কেউ মঞ্জুলিকাকে চেনে না– শুধু দেখে যায় একজন কিশোরী অপার কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওর বড় হওয়া শুরু হয়ে গেছে। ওর দৃষ্টি ভাষা হয়েছে।

কিন্তু এখনকার বদলি মঞ্জুলিকার কষ্ট। মায়ের সংসার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা নতুন করে মনে পড়া। বিয়ের পর এমন কষ্ট হয়নি– নিজের সংসারের আনন্দ ছিলো। আজকে ওর মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বুঝি বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ছয় বছর বয়সে একবার ও এভাবেই নিজের কাছ থেকে নিজে হারিয়ে গিয়েছিলো। রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরে চলে যাওয়ার পর ওর মনে হয়েছিলো ও কোথায় এসেছে? কিছুই যে চিনতে পারছে না? ভয়ে-আতঙ্কে ও চিৎকার করে কান্না শুরু করে, আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে ট্রেন আসছে– দৈত্যের মতো ইঞ্জিন দেখে ও দিশেহারা হয়ে দৌড়ুতে থাকে এবং গড়িয়ে পড়ে যায় রাস্তার পাশে। ওর বাবা লোকজন নিয়ে ওকে যখন খুঁজে পায় তখন ওর জ্ঞান নেই। পুরো সুস্থ হতে সময় লেগেছিলো পনেরোদিন। রেলের

BanglaBook.org

শব্দ শুনলেই চিৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরতো। ওর মনে হয় এখনো তেমন মনে হচ্ছে– ছুটে যাওয়া রেলের চাকার নিচে থেঁতলে যাচ্ছে ও। কোথাও মা নেই, কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মঞ্জুলিকা নিজেকে সামলাতে পারে না, দু'হাতে চোখের পানি মোছে। ছোট বোন দীপালিকা এসে গলা জড়িয়ে ধরে, ওর বয়স বারো। মাঝে ওদের ভাই শোভন, কলেজে পড়ছে। ওদের দু'জনেরই মন খারাপ। ওরা ঢাকা ছেড়ে যেতে চায় না। দীপালিকা ওর গালে গাল ঠেকিয়ে বলে, কেঁদো না আপু। আমরা সবাই তোমার বাবু দেখতে দু'মাস পর ঢাকা আসবো। কী মজা হবে!

মীজানুর রহমান নিজেও ক্লান্তি বোধ করেন। এই বয়সে তারও আর বদলি হতে ভালোলাগে না। শুধু ওর মা'র কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রদীপ্তকে বলে রেখেছে, তোমাকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার শ্বশুর আর আগের মতো ধকল সইতে পারে না। এই প্রথম মঞ্জুলিকা আমাদের সঙ্গে নেই। তুমি গেলে আমরা বুঝবো যে আমাদের পরিবার থেকে কেউ বাদ পড়েনি। সংখ্যায় তো ঠিকই আছি। কি বলো?

প্রদীপ্ত তো এক কথায় রাজি। তাছাড়া মঞ্জুলিকারও ইচ্ছা, প্রদীপ্ত যেন ওর বাবা-মার সঙ্গে যায়। বাড়িটা গুছিয়ে দিয়ে আসে। বাড়ি শুনলে মা ক্ষেপে ওঠে। বলে, বাড়ি আবার কি? বলবি রেলওয়ে কোয়াটার। মঞ্জুলিকা বুঝতে পারে না মা কেন রেলওয়ে কোয়াটারকে বাড়ি বলতে চায় না। মঞ্জুলিকার ভালো লাগতো। লাল ইটের দেয়াল, সামনে ফুলের বাগান, সঙ্গে ছোট্ট একটু গেট। পেছনে সবজি ক্ষেত। ছোট ছোট ঘর, এক চিলতে বাঁধানো উঠোন– স্টেশন মাস্টারের মুখগুলোকে মনে হয় যেন কতকালের চেনা। প্রদীপ্ত সৈয়দপুর যেতে রাজি হওয়ায় মঞ্জুলিকা খানিকটা স্বস্তি পায়। উত্তরবঙ্গ যাওয়া সোজা কথা নয়– বাহাদুরাবাদ ঘাট দিয়ে বিশাল যমুনা নদী পার হতে হবে। এবার মালগাড়ি নয়, যাত্রী গাড়ি। প্রদীপ্ত বলে, মালগাড়ির স্বস্তি যাত্রী গাড়িতে নেই। যাত্রীগাড়ি মানেই মানুষের ভিড়, সিটের জন্য ঠেলাঠেলি, শেষ পর্যন্ত মারামারি। এবং শুয়ে-বসে নিশ্চিন্তে যাওয়ার কোনো আনন্দ নেই। মালগাড়ি খোলামেলা, ইচ্ছেমাফিক ঘোরাফেরা– স্টেশনে, স্টেশনে নতুন মানুষের মুখ, পরিচয়ের আনন্দ। না, মঞ্জুলি তোমার শৈশবের আনন্দ এই বুড়ো বয়সে আমার আর পাওয়া হলো না।

তুমি কি ভেবেছিলে নুড়ি কুড়োনোর খেলা খেলতে খেলতে যাবে?

প্রদীপ্ত হেসে বলে, ঠিক তাই। স্টেশনের নুড়ি কুড়িয়ে হাফ-প্যান্টের দু'পকেট ভরে ফেলতাম। আর পকেটটা ছিঁড়ে টুপটাপ পড়তে থাকত ওগুলো। মনে হতো আমি এক পথ-হারানো রাজকুমার, পথের মধ্যে নুড়ি ফেলে ফেলে এক অচেনা রাজকুমারীকে পথ চেনায় সাহায্য করছি। বাব্বা, কোথা থেকে কি যে ভেবে নিলে। এত মৌলিক ভাবনা নিয়ে ঘুমোও কি করে?

তোমার মতো রাজকুমারী পাশে থাকলে কার না ঘুম আসবে!

কথায় তোমাকে কে হারাবে! মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর নাক টেনে দেয়। তারপর দু'জনের হুটোপুটি। কিন্তু দু'দিন ধরে ও একদম নীরব, কেঁদেকেটে সারা, যেন এ যাত্রায় মা'র সঙ্গে ওর আর দেখা হবে না। প্রদীপ্ত মনে মনে বিরক্ত হয়। এ মঞ্জুলিকার বাড়াবাড়ি। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। মঞ্জুলিকা আহত হবে। ও জানে ওর মুখের একটি শব্দ মঞ্জুলিকার বুকে হাজার মন ওজন হয়ে আঘাত করবে। যাবার সময় ও প্রদীপ্তর হাত ধরে বলে, তুমি কয়দিন থাকবে দীপ?

মা যে ক'দিন চাইবে।

সত্যি তো?

BanglaBook.org

তিন সত্যি। এবার চোখের পানি মোছ। তুমি কি জানো না তোমার চোখে পানি দেখলে আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়?

স্টেশনে অনেকেই ওদের বিদায় দিতে এসেছিলো। এক করুণ দৃশ্যের সূচনা হলো। মঞ্জুলিকার মা আর পুষ্পিতা কাঁদলো। বাকিদের শুকনো মুখ, নীরব ভাষা– দৃষ্টি বিনিময় এবং গার্ডের বাঁশি বাজলে চঞ্চল হয়ে ওঠা প্রদীপ্তর চোখে লেগে থাকে। ওর মনে হয় এমন একটি দৃশ্য ও সহজে ভুলতে পারবে না। যাওয়ার মুহূর্তগুলো এমন ভারী হয়ে ওঠাই কি নিয়ম?

সৈয়দপুরে পৌঁছে প্রদীপ্তর মন খারাপ হয়ে যায়। কেমন ধুলোমলিন, রুক্ষ শহর– শীতের প্রকোপ বেশ। মাঘের শেষ বলে হয়তো শীত জাঁকিয়ে বসেছে। শুকনো ঝরঝরে দিন। মনে মনে ভাবলো, মঞ্জুলিকা আসতে পারেনি ভালোই হয়েছে– যে মেয়ের সোনাখালি স্বপ্ন হয়ে যায় তার সৈয়দপুর কিছুতেই ভালো লাগতো না। স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে প্রদীপ্তর মনে হলো এটা কি বাংলাদেশের কোনো শহর নাকি বিহার? চারদিকে অবাঙালি, উর্দু ভাষায় কথা বলছে– গিজগিজ করছে ওরাই। শোভন প্রদীপ্তর হাত চেপে ধরে বলে, আমরা কোথায় এলাম? প্রদীপ্ত নিচু স্বরে বলে, আমি আগেই শুনেছি এই শহরের আশি ভাগ লোক বিহারি। শোভন অস্ফুট স্বরে বলে, মাগো কেমন করে যে থাকবো!

প্রদীপ্ত কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, কেন বুক ফুলিয়ে থাকবে? মাটি তো আমাদের। ওরা উদ্বাস্তু। দেশটাকে আপন ভাবতে পারে না।

এটাই তো সমস্যা দুলাভাই। যে মাটি ওরা আপন ভাবতে পারে না, সে মাটির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

যদি তাই করে তাহলে ওদের ধ্বংস হতে হবে জেনে রেখো।

আমার একটুও ভালো লাগছে না।

শোভনের কথা শেষ হতে না হতেই ট্রেন স্টেশনে থামে।

স্টেশন মাস্টারকে নিতে এসেছে সবাই। তিনজন এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, তিনজন বুকিং ক্লার্ক, পার্সেল ক্লার্ক, টিকিট কালেক্টর, গুডস ক্লার্ক, ট্রেনস ক্লার্ক, ওয়েটিং রুমের আয়া, সান্টিং স্টাফ– সবাই পরিচিত হলো মীজানুর রহমানের সঙ্গে। ওদের সাথে যেসব মাল ছিলো কুলিরা সেগুলো স্টেশন মাস্টারের কোয়াটারে নিয়ে যেতে শুরু করলো। এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার আমীন হাসান, ইউ.পি. থেকে এসেছে, লম্বা-চওড়া শরীর। বয়স চল্লিশের ওপর। মিশুক, অনেক কথা বলে। ওদের কোয়াটারে নিয়ে এলো। দু'জন কুলি দিয়ে বাড়িটা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রেখেছিলো। ওদের কোনো অসুবিধে হলো না। বিহারি কুলি হাবিব, ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। ওর ঘর কাছেই। ওদের আসার খবর পেয়ে ওর বৌ চলে আসে, সঙ্গে ছয়টা ছেলেমেয়ে। মোটাসোটা থলথলে বৌটি বেশ হাসিখুশি। হাবিবের রোগা, রাগী চেহারার একদম উল্টো। প্রদীপ্ত নিজেকেই বললো, আমি তো মনস্তাত্ত্বিক নই, তবে এভাবে মানুষ দেখছি কেন? আসলে ট্রেনের সেই ঘটনার পর থেকে প্রদীপ্তর মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

লম্বা পথ পার হয়ে আসতে হয়েছে ওদের। ঢাকা থেকে বাহাদুরাবাদে ঘাট। যমুনা পার হতে হয়েছে স্টিমারে। নদীর এপারে তিস্তামুখ ঘাট থেকে আবার ট্রেন। কত ছোট ছোট স্টেশন ছুঁয়ে কোনারপাড়া-কাউনিয়া-পার্বতীপুর হয়ে সৈয়দপুর। কাউনিয়া থেকেই ট্রেনের কামরায় বিহারিদের ভিড় বাড়তে থাকে। ছোট কামরায় নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে প্রায় দশ-বারোজন। ওরা পাঁচজন একটি বেঞ্চে বসে আছে– বাকিটা ওদের দখলে, ওরা সারাক্ষণই এটা-ওটা খাচ্ছে। নোংরা কামরা– খাবারের গন্ধে বড় বড় মাছি উড়ে এসেছে।

BanglaBook.org

গা কেমন গুলিয়ে ওঠে প্রদীপ্তর। ও জানালায় মুখ রেখে বাইরে তাকিয়ে থাকে। ওর গা-ঘেঁষে বসে আছে দীপালিকা, ভীষণ কৌতূহলি এবং জেদী। একটুপর কপাল কুঁচকে বলে, দুলাভাই আমরা অন্য কামরায় যেতে পারি না?

কেন?

আমার বমি পাচ্ছে।

এখন কামরা বদল করা যাবে না। তাছাড়া অন্য কামরার অবস্থা যে ভালো তাই বা কে বলবে? চুপচাপ বসে থাকো। অল্পক্ষণেই আমরা পৌঁছে যাবো।

অসহ্য। ও মুখ বাঁকায়।

ওর মুখোমুখি বসেছিলো এক মহিলা, সঙ্গে তিন বাচ্চা। দীপালিকার বয়সী একটি মেয়ে, বাকি দুটো ছেলে। বাচ্চাগুলোর মুখ চলছে অনবরত। সারাক্ষণই মা'র কাছে এটা-ওটা খেতে চাইছে। দীপালিকা রেগে বলে, ওগুলোকে দেখতে শুয়োরের বাচ্চার মতো লাগছে, যেন কাদায় মুখ ঘষছে।

প্রদীপ্ত ওকে কাছে টেনে নেয়। ফিসফিসিয়ে বলে, দীপামণি চুপ করো। শুনতে পেলে ভীষণ ঝগড়া বাধবে।

বাধুক, আমিও ছাড়বো না।

প্রদীপ্ত ওর মুখে হাত চাপা দেয়। ও গজগজ করতে থাকে। মহিলাকে নকল করে প্রদীপ্তর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে, শাহনাজ বেটি খা লেও। আর বেটিরও বলিহারি, গিলছে তো গিলছেই।

শোনো দীপা, তুমি এমন করলে ঝগড়া নয়, ছোটখাটো দাঙ্গা বেধে যাবে। আমাদের কচুকাটা করে ফেলবে।

তা ঠিক বলেছেন। তাকানোর যা ছিরি মনে হয় আমাকে গিলে খাবে।

কথাটা বলে দীপালিকা অপাঙ্গে মহিলার দিকে তাকালে দেখতে পায় মহিলা তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও বুঝতে পারে মহিলাকে নিয়ে যে ও কথা বলছে তা মহিলা আঁচ করেছে। ও নিজের মুখের ওপর বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মাকে বলে, মা আমার আঙুলে যেন কি হয়েছে? তারপর হাতটা বাড়িয়ে মহিলার মুখের কাছাকাছি নাচিয়ে এনে এমনভাব করে যেন ওর আঙুলে ব্যথা হচ্ছে। মহিলা আরো ক্ষেপে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই ফেরিওয়ালার চেঁচামেচি শুরু হয়। শাহনাজ মায়ের কাছে লাড্ডু খাবার বায়না ধরে, আম্মি রুপায়া দি জিয়ে ম্যায় লাড্ডু খায়েঙ্গা। লাড্ডুওয়ালা ততোক্ষণে খানিকটা দূরে চলে গেছে। শাহনাজ অস্থির, আম্মি রুপায়া দি জিয়ে, আম্মি–। মহিলা দীপালিকাকে হুকুমের সুরে বললো, ওই বাঙালি লাড়কি শুনিয়ে?

দীপালিকার দিকে সরাসরি তাকিয়ে এই কথা বললে ও স্তম্ভিত হয়ে যায়। মহিলা ওর দিকে আট আনা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মেরি বেটিকে নিয়ে লাড্ডু লে আও।

দীপালিকা চেঁচিয়ে বলে, কেন? আমি কেন কিনতে যাবো?

কিউ নেই, তুম যায়ে গা, তুম।

দীপালিকা হিংস্র কণ্ঠে বলে, তুই যা, হারামজাদী।

কামরার লোকজন সচকিত হয়ে ওঠে। দীপালিকা চিৎকার করে আরো গালাগাল করলে ওর মা ওকে দু'হাত জাপটে ধরে। প্রদীপ্ত উঠে দাঁড়ায়। ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মহিলা ওর দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসে থাকে। প্রদীপ্ত বুঝলো এটা মহিলার প্রতিশোধ– তবে যেহেতু সে রণে ভঙ্গ দিয়েছে সেজন্য ব্যাপারটি বেশিদূর গড়ালো না।

BanglaBook.org

কিন্তু প্রকারান্তরে মহিলা বুঝিয়ে দিলো যে দীপালিকাকে সে চাকরানি মনে করে। ব্যাপারটি খুব তিক্তভাবে প্রদীপ্তকে স্পর্শ করলো। ও বিষয়টি মন থেকে তাড়াতে পারলে না।

হাবিবের বউ নূরজাহান চমৎকার রান্না করে রেখেছিলো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ভালোই হলো। নিজের জন্য খাবার নিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলো সন্ধ্যায় আবার আসবে। দীপালিকা বললো, ওকে আমরা হাসিখুশি ডাকবো মা।

মীজানুর রহমান অফিসে যাবার জন্য বেরুচ্ছিলেন, মেয়ের কথা শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আগ বাড়িয়ে বেশি কথা বলতে যেও না। আগে বুঝবে মানুষটি কেমন। তুমি বেরুবে নাকি প্রদীপ্ত?

ভাবছি কারখানা দেখতে যাবো।

ওটা তো কাছেই। বেরিয়ে ডান হাতের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। এটা রেলওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা।

শোভন জানতে চাইলো, প্রথমটা কোথায় বাবা?

চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে।

মীজানুর রহমানের সঙ্গে প্রদীপ্ত আর শোভন বেরুলো। কোয়াটারের সামনে দিয়েই চলে গেছে রেললাইন। একটি ব্রড গেজ, অন্যটি মিটার গেজ। বামে ওভার ব্রিজ। স্টেশন ফাঁকা, লোকজন তেমন নেই। প্রদীপ্ত বললো, মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে এই ওভার ব্রিজের ওপর এসে বসে থাকবে।

শোভন অবাক হয়ে বলে, কেন?

বাহ্, উঁচু জায়গা থেকে তুমি শহরের অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, তাই। সঙ্গে এক ঠোঙ্গা বাদাম রেখো।

একা একা এইসব শোভা দেখতে আমার ভালো লাগবে না।

নতুন জায়গায় মন বসাতে সময় লাগে। দেখবে ক'দিন পর সব ঠিক হয়ে গেছে।

প্রথম দৃষ্টিতে ভালো লাগার একটি ব্যাপার আছে দুলাভাই। সেটি হলো না।

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। ওর নিজেরও এমন অনুভব হয়েছে। শোভনকে আর কি বোঝাবে। দু'জনে কারখানার দিকে হাঁটতে থাকে। শোভন বললো, বাবা যেবার চট্টগ্রাম বদলি হলেন তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। ওখানে পাহাড়ের ওপর রেলওয়ের কয়েকটা বাংলো আছে। দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো কবি হয়ে যাই। আপা তো কবিতার মতো করে বললো, দেখ শোভন এই শহরটা না পাহাড় আর সমতলের মিতালী।

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, দু'ভাইবোন বেশ মিলেছো।

আপনি হাসছেন? আমার কান্না পাচ্ছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কোনো ছেলে এমন একটি শহরে থাকতে পারে?

ওরা ততোক্ষণে কারখানার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপ্ত ওর কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে। সে হাসি ঢেকে দিয়ে কারখানার সিটি বাজে। বড় গেটটি খুলে দেয় দারোয়ান। তখনো শ্রমিকরা বেরুতে শুরু করেনি। দু'জনে ঢুকতে চাইলে দারোয়ান বাধা দেয়, কিধার যায়েগা? প্রদীপ্ত ওর মুখের দিকে তাকায়, লোকটি ভুরু উঁচিয়ে আছে। খাকি পোশাক পরনে, হাতে বন্দুক। ও শোভনকে দেখিয়ে বলে, ইয়ে স্টেশন মাস্টারকে লাড়কা। ঘুরনে কে লিয়ে আয়া।

ঠিক হায়, যাও।

BanglaBook.org

দু'জনে বেশিদূর এগুতে পারে না। শ'য়ে শ'য়ে শ্রমিক বেরুতে শুরু করেছে। গেটের সামনে জটলা বেধেছে– একে-ওকে ঠেলতে ঠেলতে বেরুচ্ছে সবাই। বেশিরভাগই অবাঙালি। ওদের জামাকাপড় কালিঝুলি মাখা, কিন্তু পেটানো শরীর মেদহীন– চোখেমুখে এক ধরনের রুক্ষ কাঠিন্য– বোঝাই যায় ওরা এ দেশের মানুষ নয়। ওদের চেহারায় বাংলাদেশের জলহাওয়ার ছোঁয়া নেই। শোভন ফিসফিসিয়ে বলে, এরা কি আমাদের কেউ দুলাভাই? প্রদীপ্ত জবাব দেয় না– ওর মাথার ভেতর এক ভিন্ন চিন্তা। শোভনের হাত ধরে ভেতরের দিকে হাঁটতে থাকে। তখনো বয়লার থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কয়েকশ একর জুড়ে এই কারখানা ওর কাছে বিস্ময় মনে হয়। ও আগে কখনো রেলওয়ে কারখানা দেখেনি। ওরা বেশিদূর যেতে পারে না। দারোয়ান ওদের ফিরতে বলে। গেট বন্ধ করা হবে। তাছাড়া শীতের বেলা, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। গেটের বাম দিকে ছোট লাইনের ওপর কতগুলো ওয়াগন পড়ে আছে। এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে ওয়ার্কশপ। একেকটার ভেতর এক একরকম পার্টস তৈরির কাজ চলছে। একবার পেছনে তাকিয়ে দু'জনে বেরিয়ে আসে।

কারখানার উল্টো দিকে চায়ের দোকান। ভিড় তেমন নেই। শ্রমিকরা বাড়ি ফিরতেই ব্যস্ত। যে দু'চারজন দোকানে আছে ওরা আড্ডা দিচ্ছে। রাজনীতির কথা বলছে। চা খেতে ঢুকে প্রদীপ্ত শুনতে পায় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে ওদের উষ্মার কথা। একই সঙ্গে ওরা উদ্বিগ্ন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রদীপ্ত ঢাকাতেও ওদের শুকনো মুখ দেখে এসেছে। শুধু তাই নয় ওরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার চিন্তায় আছে। দোকানদার বিহারি। আর একজনের সঙ্গে বলছে, ম্যায় পাকিস্তান চাহাতা হুঁ, পাকিস্তান জিন্দা রহেগা। প্রদীপ্তর মনে হয় এই ব্যাপারে ওরা সতর্ক এবং মারমুখী। একসময় ওরা পাকিস্তানের জন্য লড়েছে– ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছে– রেলওয়ের চাকরিজীবীরা বেশিরভাগই পাকিস্তানে চলে আসার পক্ষে সম্মতি দিয়েছিলো। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে জান কবুল করেছিলো, এখন ওরা আর কোনো স্বাধীনতা চায় না। পাকিস্তানি প্রভুদের পা চেটেই ওরা ভালো থাকতে চায়, ওরা বাঙালিদের বঞ্চনা-অবহেলা বুঝবে কেন?

দুলাভাই কি হলো আপনি দেখছি একদম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন? ওকে বলেন কি খাবেন।

প্রদীপ্ত ছেলেটির দিকে তাকায়। কত বয়স হবে? তেরো-চৌদ্দ? ছেলেটি হাত কচলে বলে, চা পিয়েগি সাব?

তোর নাম কি রে?

গুলবখত।

বাবার নাম কি? কি করে?

হামার বাবা জয়নুল। কারখানা মে কাম করে।

কোথায় থাকিস?

গোলাহাট।

কয় ভাইবোন?

ও আঙুল মেলে বললো, দশ।

দুলাভাই আপনার কি হয়েছে? এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?

প্রদীপ্ত শোভনের দিকে না তাকিয়ে বলে, গুলবখত চা-সিঙ্গাড়া লে আও।

শোভন হাসতে হাসতে বলে, আপনাকে কি ভূতে ধরেছে?

বলতে পারো ধরেছে। এখানে যখন এসেই পড়েছি তখন এদের সঙ্গে মিশতে চাই।

আপা যে আপনার এত ভীমরতি কি করে সামলায় বুঝি না দুলাভাই।

BanglaBook.org

তোমার এত কিছু বুঝতে হবে না। চুপচাপ থাকো।

রাগ করলেন?

রাগতেই পারি না। তাও আবার এত ছোট কথায়?

শোভন জবাব দিতে পারে না। চা-সিঙ্গাড়া আসে। প্রদীপ্ত গুলবখতকে বলে, ম্যায় তোমহারা ঘর জানা চাতা হুঁ, লোগে?

ও সরাসরি বলে, নেহি।

ওরা দু'জনে অবাক হয়। প্রদীপ্ত বলে, কিঁউ নেহি?

হামলোগ গরিব হ্যায়।

গরিব হ্যায় তো কেয়া হুয়া?

গুলবখত কথা বলে না। ওর মুখ দেখে ওরা বুঝতে পারে যে ব্যাপারটি ওর পছন্দ হয়নি। ওরা ওর কাছে নেহাতই উটকো ঝামেলা। ও নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে চলে যায়। একটুপর দোকানের মালিক ওদের টেবিলে এসে বসে। প্রথমেই বলে, কই তকলিফ তো নেহি হুয়া সাব?

নেহি, নেহি। প্রদীপ্ত মাথা নাড়ে।

ও ভাঙা ভাঙা বাংলায় আলাপ শুরু করে, আমার নাম মোখতার আছে। আপনারা কি সৈয়দপুরে নতুন আসছেন?

হ্যাঁ। আমরা আজকে ঢাকা থেকে এসেছি। এর বাবা নতুন স্টেশন মাস্টার।

বহুত আচ্ছা। খুব ভালো আছে। তাকে আমার দোকানে চা খাওয়ার দাওয়াত দিবেন। বলিবেন আসিতে। আপনারাও আসিবেন। তুমহারা নাম কেয়া বেটা?

শোভন।

মোখতার ভুরু কোঁচকায়, শোভন? তোমলোক হিন্দু হ্যায়?

নেহি। মুসলমান হ্যায়।

শোভন কেমন নাম আছে?

প্রদীপ্ত জোর দিয়ে বলে, বাংলা নাম।

বাংলা নাম? ঠিক হ্যায়। ও ঠোঁট ওল্টায়।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে বিষয়টি ওর মনঃপুত হয়নি। কিন্তু চালাক লোক, এটা নিয়ে আর এগোয় না। ও অন্য প্রসঙ্গে যায়, আপনি এখানে কতদিন আছেন মোখতার সাহাব?

অনেকদিন হইল। স্বাধীনতার পর আমার মামা এই কারখানার মিস্তিরি আছিল। আমার বয়স তখন পঁচিশ বছর। মামার বাড়িতে বেড়াইতে আসিলাম। মামা আমাকে কারখানায় কাজ দিলো। মামার লাড়কির সাতে বিয়াভি দিলো।

ভালোই তো। রাজত্ব-রাজকন্যা সব পেলেন।

মোখতার বুঝতে না পেরে বলে, কেয়া বলিয়ে?

প্রদীপ্ত এড়িয়ে যায়, না, কিছু না।

তো মিস্তিরির কাজ আমার ভালো লাগিলো না। রোজ রোজ কাপড়া ময়লা হয়। আমি কাজ ছাড়িয়া দিলাম। মামা কিছু রুপায়া দিলো। আমি এই দোকান করিলাম।

আপনার আব্বা-আম্মা?

তাহারা বিহারের মুঙ্গেরে থাকিয়া গেলো। আমি আর মুঙ্গের যাইতে পারিলাম না। পাকিস্তানই ভালো। বহুত আচ্ছা। এইখানে জমি পাইলাম। ঘর হইলো। ব্যবসা হইলো। অনেক শান্তিতে আছি। সৈয়দপুর হামলোগকা সিটি হায়। হামলোগ রেলওয়ে ওয়ার্কশপ চালাতা হুঁ।

BanglaBook.org

প্রদীপ্তর মনে হয় একবার জিজ্ঞেস করে সৈয়দপুর কীভাবে তোমাদের শহর হলো? এ তো বাংলাদেশের শহর, এখানে যারা বাসিন্দা তারা চৌদ্দপুরুষ ধরে আছে। তোমাদের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। রেললাইনের দু'পাশে কিংবা খালি জায়গা যেখানে পেয়েছো সেখানেই কুঁড়ে তুলেছো। তোমাদের তো পোয়াবারো– পাকিস্তানি প্রভুদের সহায়তায় ইচ্ছেমতো বাঙালির মাথায় ডাণ্ডা মারো। কিন্তু কিছু বলা হয় না। শোভন যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে।

মোখতারও চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে। হঠাৎ করে প্রশ্ন করে, আপ কি জয় বাংলা কি সাপোর্টার?

প্রদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ। আমরা ইলেকশনে জিতেছি। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন।

মোখতারের মুখ থমথম করে। কিছু না বলে চলে যায়। চায়ের দাম দেবার আগে প্রদীপ্ত দশটা সিঙ্গাড়া কিনে গুলবখতের হাতে দিয়ে বলে, তোমহারা ভাইবহেনকো দে না।

ওর চোখে খুশির ঝিলিক। কাগজের ঠোঙাটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে বলে, সেলাম সাব।

ওরা বেরিয়ে আসে। পথে শোভন বলে, আপনি যেভাবে ওর বাড়িতে যেতে চাইলেন আমাদের কোনো ছেলেকে বললে ও অমন করে না করে দিতে পারতো না। যত গরিবই ও হোক না কেন।

প্রদীপ্ত অকপটে স্বীকার করে, ঠিকই বলেছো এখানেই বাঙালি-বিহারির সাংস্কৃতিক পার্থক্য।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে। শহরের টিমটিমে আলোতে প্রদীপ্ত যেন অনবরত মোখতারের মুখ দেখে। যেখানেই তাকায় সেখানেই গোলাকার ছায়া, একজন মানুষ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে– প্রচণ্ড ভর্ৎসনায় বলছে তোমার স্বাধীনতার স্বপ্ন আমার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে।

রাতে ঘুম আসে না প্রদীপ্তর। বারবার গুলবখতের মুখ ভেসে ওঠে, সেই সঙ্গে চৌষট্টির দাঙ্গা। ভুলতে পারে না– চোখ বুঁজলে দেখতে পায় সেদিনের ঢাকা শহর। শহরের রাস্তাগুলো বিহারিদের দখলে ছিলো, কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছিলো ওরা– বড় বড় ভোজালি হাতে ছুটে যাওয়া মানুষগুলোর কণ্ঠে ছিলো পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি। এই মুহূর্তে দাঙ্গার অমন দৃশ্য থেকে গুলবখতকে আলাদা করে রাখতে চায়। ভাবে, ঐ দাঙ্গার সঙ্গে গুলবখতের সরল-নিষ্পাপ চেহারার কোনো মিল নেই। কিন্তু চাইলেও ঐ দাঙ্গার দৃশ্য থেকে ও গুলবখতকে আলাদা করে রাখতে পারে না। ওর কৈশোরের সবটুকু নিষ্পাপ আবেদন নিয়েও ওকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। কোনো না কোনো ফাঁকে এসেই যায়। এটাই ওর নিয়তি। যারা ওর দু'প্রজন্মের আগের মানুষ– দেশ ভাগের পর এ দেশের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারাই ওর জন্য এমন একটি ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ওখান থেকে ও আর বেরুতে পারবে না। অথচ ও বাঙালিদের মতোই গরিব, লেখাপড়ার সুযোগ নেই, ভালো জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কে বোঝাবে ওকে ওর আসল অবস্থা– এক অন্ধ দিশপাশহীন বুনো জেদ ওদের গোষ্ঠীকে নিয়ে যাচ্ছে স্রোতের শ্যাওলা করে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনরা ওদের ব্যবহার করছে। পঞ্চাশের দাঙ্গায় ওরা হিন্দু নিধনের নামে বাঙালিদের মেরেছে। চৌষট্টির দাঙ্গায়ও তাই করেছে, আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো খ্যাতিমান মানুষ জীবন দিয়েছে ওদের ভোজালির আঘাতে। ওরা জানে না কি ওদের করণীয়? কোথায় ওদের মঙ্গল? ওরা অন্ধ। গুলবখতের মতো ছেলেমেয়েদেরও

BanglaBook.org

চোখ ফুটছে না, ওরা চাইলেও দেখতে পাচ্ছে না– সত্যিকার অর্থে ওদের পাশে কেউ নেই। এখন বাঙালি ক্ষমতায় যাবে তা ওরা ভাবতে পারছে না। প্রদীপ্ত শিউরে ওঠে– এবারও কি ওরা রামদা-ভোজালি-তলোয়ার হাতে উন্মত্ত হয়ে উঠবে বাঙালি নিধনে? বলবে কি শালা কুত্তেকি বাচ্চা? শালা গাদ্দার? চৌষট্টির দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন প্রদীপ্তর বুকের ওপর চেপে বসে। সে সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষত যেন তীব্র হয়ে উঠছে। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামের লিফলেটটি এখনো ওর কাছে আছে। কী ভীষণ ভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো ওরা। নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গা থামাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মুখ ভেসে ওঠে– কী দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বিহারিদের মাঝে গিয়েছিলেন, ওদের প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর কথা মনে করে গুলবখতের জন্য প্রার্থনা করে ও, তোরা এ দেশের আপন হয়ে যা গুলবখত। নইলে উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা কিছুতেই তোদের পিছু ছাড়বে না। যা করেছে তোদের বাপ-দাদারা তোরা তার আর মাশুল দিস না। তোদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলাদেশ প্রিয় স্বদেশ হয়ে উঠুক। তোরা নিজেদের জায়গা খুঁজে নে।

দেশভাগের সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওরা দলে দলে পাকিস্তানে এসেছিলো, ভিটেমাটি থেকে উপড়ে, ছিন্নমূল মানুষ হয়ে। পূর্ব বাংলায় ওরা বসতি করেছে– জীবিকা খুঁজে নিয়েছে, কিন্তু এই এলাকার মানুষ হতে পারেনি। ওদের দরদ সেই পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য, যে এলাকা ওরা দেখেনি, যেখানকার মানুষ ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়নি। নিজেদের দোকানের খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলেনি, এসো বসো এখানে, ডালভাতের ব্যবস্থা করে নাও। আমাদের মসজিদ আছে তোমরা এসে নামাজ পড়ো। ওরা অতিথিপরায়ণ পূর্ব বাংলার মানুষের আতিথ্য নিলো, কিন্তু মাটি চিনলো না, এ মাটির মানুষদেরও না। ভাবলো বাঙালিরা ওদের চেয়ে ভিন্ন– কারণ ওদের সংস্কৃতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন। দেশ ভাগের এত বছর ধরে ওরা সংখ্যায় বেড়েছে– এখন সংঘবদ্ধ হয়ে বাঙালিদের রুখতে চাইছে। উদ্বাস্তু হয়েছিলো প্রদীপ্তর পরিবার– কিন্তু ওদের সঙ্গে বিহারিদের রাতদিনের পার্থক্য। যে অনুভব নিয়ে আলী আহমদ মাটির টান বোধ করে, যে সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে ছিন্নমূল থাকে না, সেখানে এই বিহারিরা ছিন্নমূল থেকে গেলো। নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেও ওদের শেকড় গজালো না।

পাকিস্তান সরকার এদেরকে সুকৌশলে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। উল্টো মদদ যোগাচ্ছে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে ওদের বসতি গড়ে তোলায় সাহায্য করেছে, চাকরি দিয়েছে। ওদের অনেকেই ঢাকার নবাবপুর রোড ও বনগ্রাম এলাকায় হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করেছে। সরকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ওদেরকে জমি দিয়েছে। কম আয়ের লোকদের ছোট ছোট বাড়ি করে দিয়েছে। মফস্বল শহরের বেশিরভাগ খালি জায়গা ওরা রিফিউজি হিসেবে দখল করে নিয়ে নিজেদের এলাকা গড়ে তুলেছে। ব্রিটিশ রেলে চাকরিরত বিহারিরা চাকরির অপশন পাকিস্তানে দিলে রেলওয়ে সিটি সৈয়দপুরে বিহারিরা রাতারাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। তাই এত মাতবরী! এসব ভাবনার মাঝে ওর মনে হলো এ কারণে এলাকাটি ওর কাছে অচেনা মনে হচ্ছে, যেন এসব মানুষদের ও নতুন দেখছে– ওরা এখানকার কেউ নয়। এদের বুকের ভেতর ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল রুক্ষ পাথুরে এলাকা। এরা মেঘ চেনে না, বৃষ্টির ছোঁয়া পায়নি– সবুজ-শ্যামল ধান ক্ষেত দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়। সাদা ফকফকে ভাতে ওদের তৃপ্তি নেই। এদের স্বপ্ন সোনালি গমের দানা, থালাভরা তন্দুরি। ওদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে যাক এটা এ দেশের মানুষের কাম্য ছিলো না, বরং ওদের কাওয়ালি শুনতে এ অঞ্চলের মানুষ রাত জেগেছে– গজল গেয়েছে প্রাণভরে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এরা এ দেশের মানুষ

BanglaBook.org

হতে পারতো– যেমন আছে চাকমা, গারো, খাসিয়া, মণিপুরীরা। সমস্যা তো ছিলো না, সমস্যা ওরা তৈরি করলো।

ওরা এ দেশে পরবাসী হয়ে থাকলো। তাহলে পরবাসীর জন্য কি কোনো দায়দায়িত্ব থাকে দেশের মানুষের? প্রদীপ্ত নিজেকে প্রশ্ন করলো। নির্বাচনের পর থেকে ওরা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেদের ভূমিকা প্রমাণ করতে চাচ্ছে। ও ভাবলো, ওদের ঠেকাতেও আমাদের শক্তি ক্ষয় করতে হবে। আমাদের শত্রু ঘরে-বাইরে। সামনে দুঃসময়। ভাবতেই ওর অস্থির লাগে। ও উঠে বাইরে আসে। বাড়ির সামনে মিটার গেজের ওপর কতগুলো ওয়াগন রাখা আছে। সবগুলো পাট বোঝাই সি. জে. ওয়াগন– কাভার ওয়াগন ফর জুট, পার্বতীপুর হয়ে খুলনা যাবে। ওয়াগনের পাশে বসে কাঁদছে ছেলেটি। হাবিবের ছেলে নয়তো? এত রাতে বাইরে? রেললাইনের অপর পাশে হাবিবের ঘর, আশেপাশে তো আর কেউ থাকে না। প্রদীপ্ত এগিয়ে যায়। ওকে দেখে ছেলেটি জোরে কেঁদে ওঠে। হ্যাঁ ও তো দীন মোহাম্মদ, হাবিবের বড় ছেলে। দশ-বারো বছর হবে বয়স। প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে, আয় আমার সঙ্গে। কি হয়েছে? ছেলেটি কাঁদতেই থাকে। প্রদীপ্ত ধমক দেয়, কি হয়েছে বলবি তো?

আম্মি খানা নেই দিয়া। মেরা ভুখ লাগা হায়।

খিদে লেগেছে ভালো কথা, কিন্তু তুই বাইরে কেন?

আমাকে তাড়ায়ে দিয়াছে। আব্বা বলিছে, ঘরে থাকিতে পারিবি না।

কি করেছিস তুই?

সারাদিন ইস্টিশনে বাদাম বেচিলাম। দুই টাকা হইলো। আম্মি এক আনার চা সিঙ্গাড়া খাইলাম। আম্মি আমাকে পেটাইলো। বলিলো, কেন আমি এক আনা খরচ করিলাম। আব্বাও মার দিলো। ঘরের বাহার করিয়া দিয়া বলিলো আজ রাতে খানা দিবে না, ঘরে জায়গাও দিবে না।

প্রদীপ্ত ওকে বাড়িতে নিয়ে আসে। ওদের সাড়া পেয়ে দীপালিকা উঠে আসে।

কি হয়েছে দুলাভাই?

মিটসেফ খুঁজে দেখো কিছু ভাত-তরকারি আছে কি না।

আছে। আমিই তো রেখেছি।

ওকে দাও।

দীপালিকা অবাক হয়। প্রদীপ্ত দীন মোহাম্মদকে নিয়ে বৈঠকখানায় আসে। ওর বিছানার নিচ থেকে একটা ছেঁড়া কম্বল এনে বৈঠকখানায় বিছিয়ে দিয়ে বলে, ভাত খেয়ে এখানে ঘুমুবি।

ছেলেটি মাথা নাড়ে। মুখে তেমন ভাবান্তর নেই, শুধু চোখের জল মুছে ফেলেছে। দীপালিকা গরু থালা ভাত-ডাল আর মাংস এনে দিলে ছেলেটি হাফ প্যান্টে হাত মুছে নিয়ে খেতে বসে। দীপালিকা ওকে এটা-ওটা প্রশ্ন করছে। ও কখনো মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছে, কখনো কোঁত করে ভাত গিলে একগাদা কথা বলে নিচ্ছে। ও বললো, বাবা-মা ওকে স্কুলে পাঠায়নি। আট বছর বয়স থেকে স্টেশনে বাদাম বিক্রি করে। যা বিক্রি হয় তার সবটাই হিসাব করে বুঝে নেয় ওর মা। দু'এক পয়সার শনপাপড়ি খেলেও ওকে মারে। ওর বয়সী সব ছেলেমেয়েরা কাজ করে। কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না। সবাইকেই বাড়িতে পয়সা বুঝিয়ে দিতে হয়। না দিলে এমন শাস্তি পেতেই হবে।

দীপালিকা বলে, ওকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ওর বাবা-মা কি ঘুমুতে পারছে দুলাভাই?

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত উত্তর দেবার আগেই ও বলে, হ্যাঁ, ঘুমছে।

দীপালিকা বিশ্বাস করতে পারে না। ও প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্তর কাছেও ব্যাপারটি ভীষণ শকিং মনে হয়। এভাবেই ওরা ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। হয়তো সবাই না, হয়তো কেউ কেউ– প্রদীপ্ত এই আশ্বাসটুকু নিজের জন্য রেখে দেয়। হয়তো এটা ছিন্নমূল মানুষের নিজেদের টিকিয়ে রাখার ভিত্তি। হিংস্রভাবে মোকাবেলা করতে শেখায়। নিজে আহত হবার আগেই আক্রমণের কৌশল। ছেলেটি খেয়েদেয়ে বাইরে গেছে। ওখানে টিউবওয়েল আছে। পানি খাচ্ছে। থালাবাটি ধুয়ে রান্নাঘরের দরজায় রেখে দেয়।

দীপালিকা দু'হাত ঝাঁকিয়ে রাগত কণ্ঠে বলে, আমি যাকে হাসিখুশি বলেছিলাম সে হাসিখুশি নয় দুলাভাই। ওর বাইরে একরকম চেহারা, ভেতরে অন্যরকম।

প্রদীপ্ত নিজেকেই বলে, এমন লোকই মারাত্মক। যাদের সহজে চেনা যায় না।

ছেলেটি ফিরে এসে কম্বলের আর এক মাথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তখনো প্রদীপ্ত দীপালিকার সঙ্গে কথা বলছিলো। মুহূর্তে ছেলেটির ঘুম এসে যায়। দীপালিকা সেদিকে তাকিয়ে বলে, দেখলেন দুলাভাই ও কত সহজে ঘুমিয়ে গেলো।

প্রদীপ্ত ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি ওর কাছে থ্যাঙ্কু আশা করেছিলে দীপা?

করেছিলাম। আমরা হলে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে ঘুমুতে পারতাম না।

ঠিক আছে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দীপামণি। তুমি রাত জেগে আমার জন্য অনেক করেছো।

মোটেই আপনার জন্য করিনি। ঐ পিচ্চি শয়তানটার জন্য করেছি।

যাও শুয়ে পড়ো।

দীপালিকা নিজের ঘরে চলে যায়। প্রদীপ্তর মনে হয় আজ রাতে ওর আর ঘুম আসবে না। প্রতিমুহূর্তে মন খারাপই হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় দীন মোহাম্মদ কিছুতেই ওর গণ্ডির বাইরে আসতে পারবে না। বিছানায় ফিরে লেপের নিচে গুটিশুটি শুয়ে থাকে ও। জোর করে দু'চোখের পাতা বন্ধ করে, যেন ঘুমের সঙ্গে ওর প্রচণ্ড লড়াই। ও বুঝতে পারে মানুষের সামনে দুঃসময়ের স্পষ্ট ছবি থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুম উধাও হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্ধকার এখন তেমন ঘন কালো, মুছে দিতে চায় যাবতীয় সাদা রেখা।

পরদিন হাবিব দীন মোহাম্মদকে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে গেলো। কেন ও এখানে রাত কাটালো, এটা ওর অপরাধ। প্রদীপ্তর তখন ঘুম ভাঙেনি। পরে দীপালিকার কাছে ঘটনা শুনে ও গুম হয়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মন খারাপের যাবতীয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে শাশুড়ির সঙ্গে ঘর গোছানোর কাজে মেতে উঠলো। সামনের দিকের ঘরটা বৈঠকখানা এবং শোভনের শোবার ঘর হিসেবে বেশ ছিমছাম করে গুছিয়ে ফেললো। ছোট ছোট বেতের চেয়ারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেয়ালে সুঁচের কাজ করা ফ্রেমটি চমৎকার মানিয়ে গেলো। কি নিখুঁতভাবে নকশাটি করা হয়েছে, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে মনে শাশুড়ির কাজের প্রশংসা না করে পারলো না ও– যেমন ডিজাইন, তেমন সুতোর রঙের ব্যবহার। শোভন হাসতে হাসতে বললো, কি ব্যাপার দুলাভাই আপনি দেখি চোখ ফেরাতে পারছেন না? মা কি এতবড় শিল্পী?

হ্যাঁ, অনেক বড় শিল্পী শোভন। কাজটি অপূর্ব।

এবার আমার ব্যবস্থা করুন দুলাভাই।

প্রদীপ্ত হেসে কাজে মন দেয়। একপাশে শোভনের জন্য সিঙ্গল খাট, মাথার দিকে পড়ার টেবিল। টেবিলের সামনে জানালা। জানালার ওপর দুটি মাটির তৈরি ফ্লাওয়ার ভাস

BanglaBook.org

রাখে। ভাসে প্রতিদিন ফুল রাখবে বলে প্রমিজ করলো শোভন। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে বললো, এত ফুল আমি কোথায় পাবো? এ তো শালা গুলবখতদের এলাকা। ওদের ফুলের চেয়ে গরু বেশি প্রিয়। জবাই করবে আর খাবে। ফুলটুলের ধার ধারে না।

প্রদীপ্ত অবাক হয়ে শোভনের দিকে তাকায়। ও ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, তাকিয়ে আছেন কেন? মিথ্যে বলেছি? দেখছেন না এলাকার ছিরি।

গরু তো আমরাও খাই।

খাই, কিন্তু আমরা গরু-সর্বস্ব নই। আমরা হলেম গিয়ে মাছে-ভাতে বাঙালি। বুঝলেন? আমাদের মতো মাছলি ওদের প্রিয় নয়।

তুমি দেখছি ওদের ওপর বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছো?

বাবার সঙ্গে মেলা জায়গা ঘুরেছি না? অনেক অভিজ্ঞতা দুলাভাই। চট্টগ্রামে আমার সঙ্গে ইউসুফ জান পড়তো। ওর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো।

প্রদীপ্তর সঙ্গে এমন গুরু-গম্ভীর কথা বলে শোভন বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতে তাকায়। প্রদীপ্ত হেসে বলে, তুমি এত অভিজ্ঞতা নিয়ে কি করে ঘুমোও শোভন?

ঠাট্টা করছেন?

মোটেই না, তোমার প্রশংসা করছি।

একটা বিষয় কি আপনি খেয়াল করেছেন দুলাভাই?

কি?

হাবিব আব্বাকে বাঙালি বাবু বলে ডাকে।

হ্যাঁ, সেটা আমিও খেয়াল করেছি। লোকটার কথাবার্তাও ভালো না। ও বাঙালিদের সহ্যই করতে পারে না।

শোভন দাঁত কিড়মিড় করে, মেজাজ খারাপ হলে দেবো একদিন ঘাড়টা মটকে। বলতে বলতে শোভন খাটের ওপর চিৎপাত হয়। দীপালিকা ওদের জন্য চা আর ডালপুরি নিয়ে আসে। শোভন চা দেখে বলে, দীপালিকা জিন্দাবাদ।

প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, উঁহু জিন্দাবাদ নয়। দীপালিকা জয় বাংলা।

এমন স্লোগান শুনলে ঐ বিহারিদের মাথা গরম হয়ে উঠবে দুলাভাই।

তবু আমরা স্লোগান দিয়েই যাবো। দাও, চা দাও।

ডালপুরি খেতে খেতে প্রদীপ্তর মনে হয় দীপালিকার চেহারায় মঞ্জুলিকাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

ও তখন মঞ্জুলিকার কথার ভঙ্গি অনুকরণ করে বললো, স্টেশনের সামনাসামনি একটা গির্জা আছে দুলাভাই। খেয়াল করেছেন?

করেছি। ওটা রেলওয়ে হাসপাতালের দিকে যাবার রাস্তায় পড়ে।

শোভন লাফিয়ে উঠে বসে। আমিও অবাক হয়েছি এত ছোট জায়গায় দুটো গির্জা দেখে। রেলওয়ে কারখানার দিকে যাবার রাস্তায় আর একটি গির্জা খেয়াল করেছি।

খুব ভোরবেলা আমি যখন পেছনের বাগানে দাঁড়িয়েছিলাম দেখলাম একজন ফাদার গির্জায় ঢুকলেন। তিনজন সিস্টারও আছেন।

বিদেশী?

না, সবাই এদেশীয়। বাঙালি খ্রিষ্টান।

ভালোই হলো। বিকেলে যাবো ফাদারের সঙ্গে গল্প করতে।

প্রদীপ্ত উৎফুল্ল হয়ে শিস দিতে দিতে ঘর গোছানোর কাজ শেষ করলো। দীপালিকার সঙ্গে গান করলো, মনে হলো কেন জানি ওর ভীষণ ভালো লাগছে।

BanglaBook.org

বিকেলে প্রদীপ্ত আর শোভনকে পেয়ে গল্পে মেতে গেলো ফাদার। প্রদীপ্ত সাংবাদিক শুনে তার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। এক ফাঁকে ফাদার উঠে ভেতরে গেলে শোভন বললো, ফাদারের সবচেয়ে কি সুন্দর বলেন তো?

প্রদীপ্ত একবাক্যে বললো, কথায় কথায় সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়া ফাদারের চেহারা।

ঠিক বলেছেন। ঐ হাসি দেখলে খুব আপন মনে হয়।

ফাদার ব্যস্ত পায়ে ফিরে আসতে আসতে বললো, আমার পৈতৃক বাড়ি সৈয়দপুরেই। হাতীখানার ওদিকে। ঠাকুরদাদা হিন্দু থেকে খ্রিষ্টান হয়েছিলেন। কতকাল আগের কথা। জানো এই শতাব্দীর শুরুতে আমি সৈয়দপুর হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। সৈয়দপুর তখন খুব সুন্দর শহর। ইংরেজ শাসনের সময় রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই রেলওয়ে সিটি। তখন জেলা শহর ছিলো রংপুর। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না, বলতে গেলে সে সময় শহর নিয়ন্ত্রণ করতো সৈয়দপুরের রেলওয়ের কর্মকর্তারা। তারাই ছিলো এলিট শ্রেণী। বুঝতেই পারো তখনকার দিনে মাল ও যাত্রী পরিবহণের জন্য রেলওয়েই ছিলো ভরসা। তোমরা খেয়াল করলে দেখবে এই শহরের চার ভাগের তিন ভাগ জমি রেলওয়ের। রংপুর জেলা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত হয়েও সৈয়দপুর ছিলো রমরমা, ঝকঝকে তকতকে। রেলওয়ে অফিসারদের বাংলোগুলো ছিলো দেখার মতো– লাল ইটের একতলা-দোতলা বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান– দেশী-বিদেশী অজস্র ফুল ফুটে থাকত। রাস্তার দু'পাশে ছিলো বড় বড় গাছ– ইংরেজরা ইউক্যালিপটাসও এনে লাগিয়েছিলো। সে সময় রেলের বড় বড় কর্মকর্তারা সবাই ছিলো ইংরেজ। এখানে ছিলো রেলওয়ের সুপারেনটেনডেন্টের অফিস। শহরটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি বিস্তৃত। আর দক্ষিণ দিকে গড়ে উঠেছিলো অফিসার্স কলোনি। রোববার সাহেব-মেমসাহেবরা আসতেন গির্জায়, প্রার্থনা হতো। তখন আমিও আসতাম বাবার হাত ধরে। বুঝলে প্রদীপ্ত মন ভরে থাকত। মনে হতো কোথাও দুঃখ নেই। জানো ইংরেজ আমলে পার্বতীপুর ছিলো বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন। আমি যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি তখন বন্ধুরা মিলে মিটার গেজের লাইনে করে প্রায় চলে যেতাম পার্বতীপুরে। বেশ মজা লাগতো। তখনকার দিনে শেয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন আসতো পার্বতীপুরে। সেখান থেকে সৈয়দপুর হয়ে চলে যেত জলপাইগুড়ি, তারপর দার্জিলিঙ। তোমরা তো জানো দার্জিলিঙ ছিলো সাহেব-মেমসাহেবদের গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যনিবাস। ওখানে না যেতে পারলে গরমকালে ওদের ঘুমই আসতো না।

কথাটা বলে ফাদার আবার সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ফাদারের কথা শুনতে ওদের বেশ ভালো লাগছিলো। গল্পের ঢঙটা ভারি চমৎকার। শোভন বলে, আমি কিন্তু আপনার এখানে মাঝে মাঝে আসবো ফাদার?

নিশ্চয় আসবে। কোনো বাধা নেই। আর প্রদীপ্ত যে ক'দিন এখানে থাকবে রোজ আসা চাই কিন্তু। তোমাদের আমার খুব ভালো লেগেছে। সাতচল্লিশের পর থেকে শহরটা রাতারাতি বদলে গেলো। এখন আর তেমন মানুষ নেই, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতে পারি।

সাতচল্লিশের পর কি হলো বলুন না ফাদার?

ফাদার গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বললো, সে সময়টা আমার জন্য এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বুঝলে প্রদীপ্ত। এখন পর্যন্ত এই শহরটার বদলে যাওয়া আমার জন্য দুঃস্বপ্নের মতো।

সাতচল্লিশের আগে এ শহরে প্রায় হাজার পঁয়তাল্লিশের মতো লোক ছিলো। পাকিস্তান হতে না হতে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো। তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না যে পনেরোদিনের মধ্যে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। এত লোকের থাকার জায়গা

BanglaBook.org

কোথায়? স্কুল ঘর, অফিসের প্রাঙ্গণ, গুদাম ঘর, এমনকি স্টেশনের খালি বগিতে মানুষের থাকবার জায়গা করা হলো। ভালো লোক আর ক'জন? বেশিরভাগই কারখানার শ্রমিক, মজুর, কুলি ইত্যাদি। রেললাইনের পাশে, রাস্তার দু'ধারে, পতিত জমি– যেখানে যা ফাঁকা জায়গা ছিলো লোকজন কুঁড়েঘর তুলতে শুরু করলো। ওহ্ কী অবস্থা, মারামারি, চুরি-রাহাজানি, ঝগড়াঝাটি প্রতিদিনের ঘটনা, চারদিকে ময়লার স্তূপ জমতে লাগলো– দুর্গন্ধে হাঁটা যায় না, দেখা দিলো মহামারীর আশঙ্কা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতেও কিছু ছিলো না। সে সময় সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছিলেন হামিদ সাহেব। আমার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব ছিলো। বেচারার নাজেহাল অবস্থা। মহকুমা ও জেলা প্রশাসন ছুটে এলো পরিস্থিতি সামলাতে। কিন্তু বিহারিদের সামলাবে কে? একে তো উদ্বাস্তু, তার ওপর অসহিষ্ণু, অবিনয়ী এবং একরোখা– কথা শোনানো মুশকিল। জেলা প্রশাসন হামিদ সাহেবকে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলো। হামিদ সাহেব রেলওয়ের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং আরো অনেকের সহযোগিতায় কয়েকটি টিনশেড বানিয়ে বেশকিছু লোককে থাকার জায়গা করে দিলেন। বুঝতেই পারো রাতারাতি দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া জনসংখ্যা সামাল দেওয়া সহজ কাজ নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ বাড়ানো হয়েছিলো। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন ডি.এস.পি.ও.-র নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। কিছুদিন পর রাজশাহী রেঞ্জের ডি.আই.জি. অফিসও সৈয়দপুরে প্রতিষ্ঠিত হলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি মোটামুটি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে এলো। কিন্তু আমরা যারা পুরনো বাসিন্দা, তারা আর পুরনো সৈয়দপুর ফিরে পেলাম না– ছিমছাম, ঝকঝকে, মনোরম। বলতে বলতে আবার সরল হাসি হাসে ফাদার।

হঠাৎ করে ফাদার হাসি থামিয়ে বলে, এখন এই শহরটাকে বিহারের একটি থানা বললে ভুল হবে না– যেন এ শহর বাংলাদেশের নয়, বাঙালির নয়। আমার মনে হয় এ শহরটাকে ইচ্ছে করে অন্যভাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

কেমন? প্রদীপ্ত উৎসুক হয়ে ওঠে।

না, এটা আমার একটি ধারণা মাত্র।

বলুন না, তা কি? প্রদীপ্ত জোর করে।

একটি বিষয় আমার খুব খটকা লাগে। সৈয়দপুর, নীলফামারী মহকুমার একটি থানা। মহকুমার যত অফিস, আদালত সব নীলফামারীতে ঠিকই আছে, কিন্তু মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের অফিস সৈয়দপুরে।

প্রদীপ্তর মাথায় একটা সাদা রেখা ঝলক দিয়ে ওঠে। ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, সৈয়দপুরে একটি ক্যান্টনমেন্টও স্থাপিত হয়েছে।

ফাদার মৃদু হাসে। আর কথা বলে না। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে ফাদার আর কোনো কথা বলবে না। ও নিজের থেকেই বিষয়টি ভেবে নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহারিদের সাপোর্ট দেয়ার জন্য কি এত আয়োজন? কীসের স্বার্থ? কেন? ফাদার সরাসরি প্রদীপ্তর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, ও হ্যাঁ, সে সময়কার হামিদ সাহেব কিন্তু আবার সৈয়দপুরে বদলি হয়ে এসেছেন। এবার তিনি নীলফামারী মহকুমার পুলিশ কর্মকর্তা। প্রদীপ্ত তুমি ওর কাছ থেকে আরো অনেককিছু জানতে পারবে। ইংরেজ আমল থেকেই এখানে বেশ কিছু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী আছে, তাদের সঙ্গেও আলাপ করতে পারো। অনেককিছু জানতে পারবে। আমি তো এখন তেমন কোথাও যাই না। শহরের খবর বেশি রাখি না।

কেন যান না ফাদার?

বুড়ো হয়েছি, বয়স হয়েছে তো। তবে কেউ এলে কথা বলতে খুব ভালোলাগে।

BanglaBook.org

ছোটদের আমি ভীষণ ভালোবাসি। ওদের সঙ্গে আমার অনেক কথা বলার আছে। শোভন তো এখানে থাকবে। তুমি কিন্তু আমার বন্ধু হবে।

বন্ধু? ও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফাদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া কি যা তা কথা। ওর খুশি ধরে না। কিন্তু প্রদীপ্তর ভুরু কুঁচকেই থাকে। ওর চিন্তা পথ হাতড়ায়, ফাদার কি শুধু বয়সের কারণে বেরোয় না? নাকি শহরটাই তার কাছে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে? কিন্তু এ প্রশ্ন ফাদারকে জিজ্ঞেস করা হয় না। ফাদার সিস্টার মরিয়মকে ডেকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে, শোভন কিন্তু এখন থেকে এই শহরের ছেলে। ও আমাদের বন্ধু।

সিস্টার মরিয়ম মৃদু হেসে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, নাইস টু মিট ইউ শোভন।

শোভন হ্যান্ডশেক করে, কিন্তু লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। প্রদীপ্ত হাসতে হাসতে বলে, তুমি এত লজ্জা পাচ্ছো কেন শোভন?

ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। ফাদার হাসতে থাকে।

সিস্টার মরিয়ম হাসতে হাসতে বলে, আমার সঙ্গে দু'দিন গল্প করলে শোভন বড়মানুষ হয়ে যাবে। কি বলো শোভন?

ও জবাব দিতে পারে না। সিস্টার মরিয়মের দিকে তাকালে আসলে তো ওর ভয় করে, কেমন গম্ভীর– অনেক দূরের মানুষের মতো। হাসলেই কি মানুষ বন্ধু হতে পারে? এর চেয়ে ফাদারকে অনেক সহজ মনে হয়। ফাদার ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তোমার জন্য আর একটি মজার খেলা আছে। মিটার গেজের রেলে চড়ে সৈয়দপুর থেকে পার্বতীপুর চলে যাওয়া আর ফিরে আসা। দেখবে দারুণ লাগছে। একটু থেমে বললো, গুড বাই প্রদীপ্ত।

গুড বাই ফাদার। গুড বাই সিস্টার মরিয়ম।

দু'জনে অনাবিল আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে গির্জার লাল চূড়ার দিকে তাকায়। ভাবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের কত তফাৎ।

পরদিন প্রদীপ্ত আমীন হাসানের চায়ের দোকানে চা খেতে যায়। ভেবেছিলো গুলবখতকে কোথাও নিয়ে গিয়ে নিরিবিলি কথা বলবে। গিয়ে শুনলো ওর জ্বর, কাজে আসেনি। দোকানে এর-ওর সঙ্গে কথা বললো কতক্ষণ, কিন্তু ঠিক আড্ডা দেয়া হলো না। বিহারিরা মন খুলে কথা বলে না। ও চেয়েছিলো ওদের স্মৃতিচারণ শুনবে, শুনবে বিহারে ওদের জীবনযাপনের গল্প– যা ওর জন্য একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা বাঁকা চোখে তাকায়, ওদের চোখেমুখে সন্দেহ, অবিশ্বাস। তাছাড়া ওরা যে যার কাজে চলে গেলো। ওরা আশেপাশেই কাজ করে। কয়েকটি ওয়েল্ডিংয়ের দোকান, রিকশার গ্যারেজ, লাকড়ি কেনাবেচার আড়ত ইত্যাদি দিয়ে জায়গাটি জমজমাট। গুলবখত নেই বলে, আমীর হাসান নিজেই খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। একা একা চা খেয়ে প্রদীপ্ত বেরিয়ে পড়ে। ওকে দেখেই পাশের মুদির দোকানের রহমান আগ্রহ নিয়ে ওকে ডাকে।

কালকে শুনলাম আপনি ঢাকা থেকে এসেছেন। আমার দোকানে একটু বসে যান। ঢাকার খবর বলেন?

প্রদীপ্ত বসলে রহমানের কথার তোড় শুরু হয়, অবস্থা কেমন বুঝছেন ভাইসাব? বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন তো? এখানকার বিহারিগুলো খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আপনি তো ঢাকা থেকে এসেছেন তাই বুঝতে পারছেন না। ওরা আর আগের মতো নেই। বাঙালিরা নির্বাচনে জেতার পর ওরা দূরে দূরে থাকে। ভাবে, এই বুঝি ওদেরকে আক্রমণ করা হবে। সেজন্য পাল্টা আক্রমণ করার জন্য ওরা তৈরি হচ্ছে।

ওদের জন্য এখানে পুলিশ এবং আর্মি আছে।

BanglaBook.org

ঠিক বলেছেন। মহকুমার যে পুলিশ অফিসার তাঁকে জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ওরা কয়েকটা বাঙালি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই পাশের চায়ের দোকানটা ওদের একটা আখড়া। ওখানে বসে কত ধরনের কথা যে বলে ভাবতে পারবেন না। মাঝে মাঝে সহ্য করতে পারি না। ওরা জানে আমি জয় বাংলার লোক, সেজন্য দল বেঁধে আসে আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলে। ইদানীং বলছে, বাঙালিরা যদি স্বাধীনতার জন্য বাড়াবাড়ি করে তবে ওদেরকে জবাই করে ফেলবো।

প্রদীপ্ত প্রশ্ন করে, যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় তখন ওরা কি করবে?

বলে যে রক্তের শেষ বিন্দু থাকতেও তা হতে দেবে না। তা না হলে পাকিস্তানে চলে যাবে। আমার দোকানটা পড়ে গেছে ওদের মাঝখানে। কি যে করি, খুব ভয় হয়।

রহমানের আশঙ্কা প্রদীপ্তকেও স্পর্শ করে– চোখের সামনে চৌষট্টির দাঙ্গায় দেখা সেইসব বীভৎস মুখগুলো ভেসে ওঠে। রহমানের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুকের ভেতরটা ছটফট করে ওঠে। একজন অসহায় মানুষের ব্যাকুলতা রহমানের অবয়বে– সত্যি যদি তেমনি কিছু ঘটে যায় তাহলে ওকে সাহস নিয়ে থাকতে বলার কি কোনো অর্থ থাকবে?

রহমান তখন খানিকটা জোর দিয়ে বলে, সবই আল্লার ইচ্ছা, এই ভরসায় বুক বেঁধে আছি। এদের বাড়াবাড়ি বেশি হলে, মানে যদি বুঝি যে থাকা যাবে না তখন দেশের বাড়িতে চলে যাবো। ফেরার সময় প্রদীপ্তর মনে হলো তবু তো রহমানের দেশের বাড়ি আছে– বিপদের আশ্রয় আছে, এদের তো কিছু নেই। কোথায় পালাবে এরা? নিজের বাড়ির বন্ধ ঘরে দম আটকে মরতে হবে ওদের। এসব কথা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে ওর। মনে হয় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব শুধু বাঙালিদের জীবনে অর্থহীন হয়নি, বিহারিদের জীবনেও অর্থহীন হয়ে গেছে। ওরা এখন মুসলমান নয়– ওরা একদল বাঙালি, একদল বিহারি। একই ধর্মের লোকের মধ্যে ভেদ তৈরি করেছে– শোষণ করার কৌশলও উদ্ভাবন করেছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। ধর্মের নামে প্রায় নিরক্ষর বিহারিদের লেলিয়ে রেখেছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে– ওরা না বুঝেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর, বোঝেনি নিজেদের ভবিষ্যৎ। এসব ভাবনার মাঝে ও ঠিক করে গুলবখতকে দেখতে যাবে। কিন্তু ও তো ওর বাসা চেনে না, হাবিব কি নিয়ে যেতে পারবে? কিংবা দীন মোহাম্মদ?

বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখলো হাবিব সবজি ক্ষেতে কাজ করছে। চুক্তিভিত্তিতে হাবিবকে দিয়ে মাটি-খোঁড়ার কাজ করিয়ে নিচ্ছে মীজানুর রহমান। গ্রীষ্মকালীন সবজি লাগাবে সে নিজে। প্রদীপ্ত বাগানে ঢুকে খানিকটা অন্তরঙ্গভঙ্গিতে ওকে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো হাবিব? তোমার ছেলেমেয়েরা?

ও কথা বললো না, শুধু মাথা নেড়ে জানালো ভালো আছে। তারপর আবার কাজে মন দিলো। প্রদীপ্তর মনে হলো ওর সঙ্গে কথা বলে সুবিধে হবে না। তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, তুমি গুলবখতকে চেনো হাবিব?

হাঁ।

আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে?

ও ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললো, কিঁউ? কিঁউ তুম যায়ে গা?

এমনি, ওর জ্বর হয়েছে তাই দেখতে যাবো।

উসকো বুখার হুয়া তো তুমকো কেয়া হুয়া?

প্রদীপ্ত ধমক দিয়ে বলে, তুমি আমাকে নেবে কি নেবে না।

ও চুপ করে থেকে বলে, কব যায়েগা?

BanglaBook.org

আজ বিকেলে।

ঠিক হ্যায়।

প্রদীপ্তর দিকে না তাকিয়ে ও মাটি খোঁড়ায় মন দেয়।

হাবিবের গায়ে সবুজ রঙের জামা, লুঙি হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো। হালকা-পাতলা শরীর, চিকন পা দুটি বেরিয়ে আছে। ও একবার মুহূর্তের জন্য চোখ ওঠালে প্রদীপ্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। আবার চোখ নামিয়ে ফেলে। প্রদীপ্ত স্টেশন মাস্টারের মেয়ের জামাই তাই কিছু বলতে পারে না। অন্য কেউ হলে ও হয়তো ধমক দিয়ে দিতো, কেননা এই দাঁড়িয়ে থাকা ও পছন্দ করতে পারছে না। প্রদীপ্তর মনে হলো ওর তো এমন ইচ্ছে হতেই পারে, ও-ই বা কেন অকারণে দাঁড়িয়ে থাকবে? ও হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে যায়। গাড়ি আসার সময় হয়েছে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখবে বলে ও প্লাটফরমে উঠে আসে। লোকজন গিজগিজ করছে। ও পত্রিকার স্টলের সামনে এসে দাঁড়ায়। একটা সিনেমা পত্রিকা কেনে। উল্টেপাল্টে দেখে মুড়ে রাখে। আসলে ওর ম্যাগাজিনে মন বসছে না। ঘুরেফিরে হাবিবের আচরণ মনে হয়– একটু আগে ও যা উড়িয়ে দেবে ভেবেছিলো, দেখলো সেটা ওর মনে গেঁথে গেছে, ও তাড়াতে পারছে না। কেবলই মনে হয় স্টেশন মাস্টার, ওর শ্বশুর মীজানুর রহমান কি এক বিপজ্জনক স্থানে এসে পড়েছে? এমনিতে তিনি নেহাতই গোবেচারা, ভীরু মানুষ। চাকরির বাইরে কিছু বোঝেন না। সময় মতো অফিসে যান, সময় মতো ফেরেন। বাকি সময় বাসায় থাকেন। বাগান করতে ভালোবাসেন। সবজি ক্ষেতে তার বেশি আনন্দ। প্রদীপ্ত হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফরমের শেষ মাথায় আসে। তখন প্লাটফরমে ট্রেন ঢোকে– প্রদীপ্তর খুব ইচ্ছে করে ছোটবেলায় শোনা কু-উ- ঝিকঝিক শব্দ শুনতে, কিন্তু না ডিজেলের ইঞ্জিন তেমন শব্দ করে না। পোটলা-পুঁটলি-বাক্স-প্যাটারা নিয়ে নারী-পুরুষের ঠেলাঠেলি সহ মানুষের জীবনটা ওর সামনে এক গোলাকার বস্তুর মতো গড়াতে থাকে। ওর খুব খারাপ লাগে। এমন দৃশ্য স্বস্তির নয়, অস্বস্তির। তবু স্টেশন মানেই এমন একটি ছবি। সামনে না থাকলেও স্টেশন মানেই এ দৃশ্যটি ভাবতেই হয়। ট্রেন চলে গেলেও প্লাটফরম একদম খালি হয়ে যায় না। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। প্রদীপ্ত ভাবলো বাড়ি ফিরবে, তখন এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার এসে হাত ধরে টানে। প্রথমদিন আলাপ হয়েছিলো। মেহেদী হাসান নাম। একগাল হেসে বলে, আমার ঘরে আইসেন। আমরা চা পিয়াবো।

ওর আন্তরিকতা প্রদীপ্তর ভালোই লাগে। শুধু মনে হয় এরা এত বছর ধরে আছে, কিন্তু বাংলা ভাষা ঠিকমতো শিখলো না। ঘরে ঢুকে পিয়নকে চা আনতে পাঠায়। সৈয়দপুর কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করে, কবে ঢাকায় ফিরবে জানতে চায়। তারপর মেহেদী হাসান নিজের কথা বলে। ইউ.পি. থেকে এসে ওরা লালমনিরহাটে বসতি করেছে। বাবা-মা ওখানেই থাকে। ওর বদলির চাকরি, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বিভিন্ন স্টেশনে থাকতে হয়, ইত্যাদি অনেক কথা হয় দু'জনের। ভালোই সময় কেটে যায়। মেহেদী হাসান ওকে একদিন বাড়িতে আসতে বলে। প্রদীপ্ত ঢাকা ফেরার আগে যাবে বলে কথা দেয়। বিদায় নেবার আগে মেহেদী বলে, আপ কা নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রদীপ্ত আহমদ।

এইটা কেমন নাম আছে ভাইসাহাব?

বাংলা নাম।

আপনি তাহলে বাঙালি, মুসলমান না।

আমি বাঙালি এবং মুসলমান।

BanglaBook.org

তা কেমন করিয়া হয়?

আপনি কি?

আমি মুসলমান।

আপনি বিহারি। মুসলমান না।

কি বলিলেন? মেহেদী হাসান চটে ওঠে।

যেমন করিয়া আপনি বিহারি ও মুসলমান; তেমন করিয়া আমি বাঙালি ও মুসলমান। বুঝিলেন?

বাঙালিরা মুসলমান হইতেই পারিবে না। আপনার নাম মুসলমান নাম না।

প্রদীপ্ত আর কথা বাড়াতে চায় না, বুঝে যায় যে একে কিছুই বোঝানো যাবে না। ও খোদা হাফেজ, বলে হাঁটতে শুরু করে। মেহেদী হাসান আরো কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার সুযোগ না পেয়ে ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে প্রদীপ্ত পেছন ফিরে তাকায়, ও মৃদু হাসে। আসলে মেহেদী হাসানের জন্য ওর করুণাই হয়।

রাতে খেতে বসে প্রদীপ্ত সবার সামনে এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটির ঘটনাটা বলে। মীজানুর রহমান উদ্বিগ্ন হয়। বলে, আমি তো নিরীহ মানুষ। রাজনীতির সাতে-পাঁচে কখনো থাকিনি।

প্রদীপ্ত বলে, এখনকার পরিস্থিতিটা বাবা শুধু রাজনীতিতে নেই।

জানি। এটা এক ভিন্ন সময়। আমাদের সবাইকেই সরাসরি যে কোনো একটি পক্ষ নিতে হবে। কিন্তু সৈয়দপুরের পরিস্থিতি একদম অন্যরকম দেখছি। চাকরি জীবনের কোথাও আমি এত অস্বস্তিতে চাকরি করিনি।

দীপালিকা বলে, বাবা চলো আমরা ঢাকায় চলে যাই।

এই এলাম, এখনই তো আর যাওয়া সম্ভব না।

শোভন আরো একটু বাড়িয়ে বলে, চাকরির দরকার নেই। চলো আমরা চলে যাই।

তা কি হয়। হুট করে তো আর চাকরি ছাড়তে পারি না।

মীজানুর রহমান ঠিকমতো খেতে পারে না। সামান্য একটু খেয়েই দু'তিন গ্লাস পানি খায়। তারপর উঠে পড়ে।

প্রদীপ্ত শাশুড়ির দিকে তাকায়। তার খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। প্রদীপ্তকে বলে, তোমার শ্বশুর মনে হয় চিন্তায় পড়েছে।

পড়বেই তো মা। শোভন রাখঢাক না রেখে বলে, আসলে এখনকার সময়টা আমাদের, আর এই শহরটা বিহারিদের। সেজন্য বলেছিলাম ঢাকা যাওয়াই ভালো। নইলে অন্য কোথাও।

শোভনের কথায় থমথমে হয়ে যায় পরিবেশ। দীপালিকা মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আর খাবো না মা। আমার পেট ব্যথা করছে।

থাক, রেখে দে।

পেট ব্যথা না ছুতা, তুই ভয় পেয়েছিস।

পেয়েছি তো, তোমার কথা শুনে ভীষণ ভয় লাগছে আমার।

থাক, এসব কথা তোমরা আলোচনা করো না।

প্রদীপ্ত ওদের মৃদু শাসন করে। তারপর মনে মনে বলে, শহরটাই শুধু বিহারিদের না। ওদের পেছনে পুলিশ এবং আর্মি আছে। কিন্তু এই ভয়াবহ কথা তো এইসব নিরীহদের সামনে বলা যায় না। ঢাকা যাওয়ার সময় ওর শ্বশুরকে বলবে। শাশুড়িকে আস্তে করে বলে, আমার তো ফিরতে হবে মা। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলো। তাছাড়া

BanglaBook.org

মঞ্জুলিকার শরীর খারাপ। ওরা হয়তো ভাবছে।

শোভন ও দীপালিকা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, অসম্ভব, এত তাড়াতাড়ি যাওয়া চলবে না। আরো ক'দিন থাকতে হবে।

তোমার মা একাই মঞ্জুলির জন্য যথেষ্ট। মেয়েটি আমার ভাগ্যবতী। অমন একজন শাশুড়ি পেয়েছে।

প্রদীপ্ত হেসে বলে, বাড়িতে মেয়ে নেই তো। ও মায়ের মেয়ে হয়েছে।

মঞ্জুলিকার মা হেসে বলে, ওকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই। তুমি বরং আরো দু'চার দিন থেকে যাও।

চেঁচামেচি করে শোভন আর দীপালিকা, ঠিক, ঠিক।

পরদিন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন। এ অধিবেশন বসবে ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে তিন মার্চ বুধবার সকাল নয়টায়।

খবরটা শুনে মীজানুর রহমান খানিকটা স্বস্তি নিয়ে প্রদীপ্তকে বলে, ভালোয় ভালোয় হয়তো একটা রাজনৈতিক সমাধান হয়ে যাবে, কি বলো?

দেখা যাক, প্রদীপ্ত আমতা আমতা করে।

তুমি খুব একটা ভরসা পাচ্ছো না মনে হয়?

আসলে শেষ না হলে কোনোকিছু বলা মুশকিল।

মীজানুর রহমান গম্ভীর হয়ে যায়। প্রদীপ্ত চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ ওর মনে হয় পুলিশ অফিসার হামিদ সাহেবের অফিসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসা যায়। সাংবাদিক পরিচয়ে যে কোনো জায়গায় যাওয়া যায় এটাই সুবিধা। তাছাড়া এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে ফিচার লিখলে ওর সম্পাদক খুশি হবে। হামিদ সাহেব তো অনেককিছু জানে, তার একটা ইন্টারভিউ নিলেও মন্দ হবে না। প্রদীপ্ত একটা কাজ পেয়েছে এমন খুশি মনে রিকশায় ওঠে। শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায় এখানে-ওখানে বিহারিদের জটলা। ওদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে মনে হয় ইয়াহিয়ার ঘোষণায় ওরা খুশি হয়নি। বাঙালিরা ক্ষমতায় যাক এটা ওরা চায় না। যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে শহরের রাস্তা গরম করে রেখেছে। প্রদীপ্তর রিকশা থানার সামনে এসে থামে।

অফিসে হামিদ সাহেব খানিকটা ফ্রি ছিলেন। প্রদীপ্ত নিজের পরিচয় দিলো, কেন এসেছে তা জানালো। হামিদ সাহেব ওকে পেয়ে খুশিই হলেন। বললেন, মন খুলে কথা বলার লোক নেই। বসুন কিছুক্ষণ গল্প তো করি।

আপনার কথা ফাদার লুথারের কাছে শুনেছি। সাতচল্লিশ সালে আপনি এখানে ছিলেন। আবার বদলি হয়ে এসেছেন। আমার ধারণা আপনি এই শহরটাকে ভালো করে জানেন।

হামিদ সাহেব একগাল হেসে বললেন, ফাদার লুথার ঠিকই বলেছেন। বেশ কয়েকটি ক্রুশিয়াল সময়ে আমি এখানে ছিলাম। আটষট্টি সালে আবার এসেছি মহকুমার পুলিশ প্রশাসক হয়ে। তিন বছর হয়ে গেলো। একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে উনসত্তর সালের আগে বাঙালি-বিহারি প্রশ্নটি ছিলো। দাঙ্গাও হয়েছে। কিন্তু তার মাত্রাটা তেমন প্রকট ছিলো না। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি প্রবল হওয়ার পর থেকে এখানে বাঙালি-অবাঙালি ধারণা বেড়ে যেতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা তো ওরা শুনতেই পারে না। মনে পড়ছে সত্তরের শেষ দিকে কিছু সংখ্যক অবাঙালি ছাত্র অনশন ধর্মঘট শুরু করে। ওদের

BanglaBook.org

দাবি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। রেলওয়ে পুলিশ সুপারের অফিসের উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকে রাস্তার আইল্যান্ডের ওপর ওরা অবস্থান নেয়। তখন নিলফামারীর মহকুমা-প্রশাসক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি। তিনি আমাকে বলেছিলেন পুলিশ দিয়ে ছাত্রদের সরিয়ে দেয়া হোক। আমি তার কথায় রাজি হতে পারিনি। আমার ধারণা হয়েছিলো যে এতে পরিস্থিতির অবনতি হবে। শহরের অবাঙালি জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হতে পারে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে। সামনে নির্বাচন। যাহোক আমি তাঁকে বললাম, শক্তি প্রয়োগ করতে হলে আপনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আমিও পুলিশ সুপারকে জিজ্ঞেস করি। তিনি তাই করলেন। ফোনে কথা হলো। জেলা প্রশাসক পুলিশী শক্তি প্রয়োগের ধারণা বাতিল করে দিলেন। কেননা ওরা তো ধ্বংসাত্মক কিছু করেনি। ওরা তখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলো। অনশন ধর্মঘট হলেও ওদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়নি। শেষপর্যন্ত বেশ কয়েকদিন ধর্মঘট চালিয়ে ছাত্ররা মহকুমা প্রশাসনের অনুরোধে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। জানেন আমার বদ্ধ ধারণা এই ধর্মঘটের পেছনে অবাঙালি নেতাদের উস্কানি ছিলো। সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারেরও সায় ছিলো। এমনকি মহকুমা প্রশাসকের আচরণও আমার কাছে কেমন জানি ঘোলাটে মনে হয়েছে। এসব কথা কিন্তু আপনার সঙ্গে খোলামেলা আলাপ। আপনি আবার কোথাও আমাকে বিব্রত করবেন না।

প্রদীপ্ত মৃদু হেসে বলে, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার কোনো ক্ষতি আমার হাত দিয়ে হবে না।

এই ফাঁকে চা এলো। চা খেয়ে হামিদ সাহেব আবার শুরু করলেন। এদিকে দেশে তো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকে শহরের বিহারিরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন সন্ধ্যার সময় ওরা বাঙালিদের কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দিলো। এরপর ওরা সম্ভবত কিছু পরিকল্পনা করেছিলো। সে অনুযায়ী দু'একদিন পর পরই নিজেদের প্রায় ভেঙে-পড়া বাড়ি, খড়ের গাদা, গোয়াল ঘর এমন জায়গায় আগুন দিতে লাগলো এবং বলতে শুরু করলো যে, বাঙালি লোক আগ লাগা দিয়া। আমার হয়েছে যন্ত্রণা। প্রায়ই ঘটনাস্থলে ছুটোছুটি করতাম। দু'একটা ঘটনা সামাল দেয়ার পর আমার একটু খটকা লাগতে শুরু করলো। দেখতাম যে ফায়ার বিগ্রেড বা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আর্মির কেউ না কেউ পৌঁছে যেত সেখানে। এরপর আরো দু'একটা ঘটনার জায়গায় দেখে আমার বিশ্বাস হতে শুরু হলো আর্মি আগে থেকে জানতো যে এখানে ঘটনা ঘটবে। যাক অনেক কথা বললাম। আপনি কয়েকদিন থাকবেন তো এখানে?

না, আমি দু'চারদিনের মধ্যে চলে যাবো। এ সময় ঢাকা ছেড়ে দূরে থাকতে ভালো লাগছে না।

সময় পেলে আবার আসবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। একদম আগুনের উপরে আছি।

বুঝতে পারছি। প্রদীপ্ত সায় দেয়।

বেরিয়ে আসার সময় ওর মনে হয় কত মানুষের কত ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। কে কার কতটুকু খোঁজ রাখে। হামিদ সাহেব তেমন একজন মানুষ, এক অলিখিত ইতিহাস দেখে যাচ্ছেন নিজের চোখে।

BanglaBook.org

পরদিন জুলফিকার আলী ভুট্টো পত্রিকার পৃষ্ঠায় খবরের শিরোনাম হয়ে হাজির হন। তিনি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'জাতীয় পরিষদ অধিবেশন যোগ দিতে ঢাকায় যাবো না।' সকালবেলা 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা নিয়ে জোরে জোরে পড়ে প্রদীপ্ত। বাকিরা শোনে। মীজানুর রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। দীপালিকাকে পানি আনতে বলে। প্রদীপ্ত পড়া শুরু করেছে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার ব্যাপারে আপোস বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না। তিনি বলেন, এখন তো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ঢাকা যেতে হচ্ছে না, যেতে হচ্ছে প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে। প্রকৃত অবস্থা হলো, শাসনতন্ত্র ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং আওয়ামী লীগ আমাদের দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে চায়। এটুকু পড়ে প্রদীপ্ত কাগজটা শোভনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তুমি পড়ো।

শোভন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, শুনবে কে? কেউ না। বাবাই একমাত্র শ্রোতা, কিন্তু বাবাকে দেখছি অন্যমনস্ক।

থাক, তোকে পড়তে হবে না। বুঝতে পারছি পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক গভীর সংকট শুরু হলো।

ভুট্টো কিন্তু ছয়দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচিত হবার বিষয়ে অনেক আগে থেকেই আন্দোলনের হুমকি দিয়ে আসছে। এটা তো কোনো নতুন কথা নয় বাবা।

এটা নতুন নয় ঠিকই, কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ দিয়েছেন। বিষয়টি এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হবে।

ভাবার আর কিছু নেই। ভুট্টোর হুমকির প্রতিবাদে ছাত্ররাও বলেছে, ছয়দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে কোনো আপোস নেই।

মীজানুর রহমান চুপ করে থাকে। দীপালিকা চা এনে দেয়। সবাই মিলে চায়ে চুমুক দেয়। শোভন পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টায়। প্রদীপ্তর মনে হয় কালই ঢাকা চলে যাওয়া উচিত। অনেকদিন তো হলো এখানে?

সেদিনই বিহারিরা শহরে আনন্দ-উল্লাস করলো। মিষ্টি কিনলো, খাওয়া-দাওয়া হলো। ভুট্টোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকালের দিকে ইচ্ছে করেই আমীন হাসানের দোকানে গেলো প্রদীপ্ত। দোকানে বসার জায়গা নেই। ওকে দেখে আমীন হাসান, আইয়ে সাব, বলে হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলো। চা-মিষ্টি দিয়ে বললো, আজ আপ হামকো মেহমান।

প্রদীপ্ত সহজ গলায় বললো, বহুৎ আচ্ছা। শুকরিয়া।

ওকে দেখে গুলবখত এগিয়ে এলো, কি রে কেমন আছিস? তোর বোখার হয়েছিলো?

হ্যাঁ।

আমি তোকে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম। তা আর যাওয়া হয়নি। নে মিষ্টি খা।

নেহি, বলে ও আড়চোখে দোকানদারের দিকে তাকায়। আমীন হাসান অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত।

প্রদীপ্ত আর একবার সাধতেই মিষ্টিটা নিয়ে টুপ করে গালে ভরে দেয়। ও গুলবখতকে জিজ্ঞেস করে, আজ এত মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে কেন রে?

ভুট্টো সাব বাপকা বেটা।

কিঁউ?

হাম নেহি জানতা। আপ মালিককো পুছ লিয়ে।

প্রদীপ্ত চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, হায় গুলবখত তুই চিনিস তোর মালিককে, তোর

BanglaBook.org

মালিক চেনে ভুট্টোকে। তোরা শুধু ভুলে যাস যে তোদের সঙ্গে ভুট্টোর হাজার মাইলের ব্যবধান। কেমন করে যে এত দীর্ঘ পথ পার হবি তোরা নিজেরাই জানিস না।

গুলবখত চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে যাবার সময় বলে, আপনি কি কিছু বলিলেন স্যার?

না রে কিছু না। কাল আমি ঢাকা চলে যাবো। তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ক্যান হইবে না? আপনি আবার সৈয়দপুর আসিবেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছিস। আমার শ্বশুর যখন এখানে তখন আবার আসা হতে পারে।

গুলবখত দাঁত বের করে হেসে চলে যায়। ওর হাসিটি ভালোলাগে প্রদীপ্তর। মনে হয় কিছু কিছু জিনিস হয়তো থেকে যায়, যা সবকিছুর উপরে মানুষের জন্য এক স্থায়ী সুন্দর। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় প্রদীপ্ত আজ ওর হাজার রকমের দ্বিধাগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারে। আজকে আর ওকে রাত জাগতে হয় না। কোনোদিনই ওর সকালে ঘুম ভাঙে না। এটা ওর অভ্যেস। আজও ভাঙলো না। ঘুম ভাঙলো শোভনের চেঁচামেচিতে। ও উত্তেজিত হয়ে ওকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে, দুলাভাই, ও দুলাভাই ওঠেন। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।

প্রদীপ্ত আড়িমুড়ি ভাঙতে পারে না। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলে, কি হয়েছে?

সৈয়দপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে যে শহীদ মিনার আছে ওখানে কারা যেন পায়খানা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। ইচ্ছা করে এমন জঘন্য শয়তানি করেছে দুলাভাই। ভাবতে পারেন কত বড় সাহস।

মুহূর্তে ঘুম ছুটে যায় প্রদীপ্তর। ও লাফ দিয়ে উঠে বাথরুমে ছোটে। দু'মিনিটে তৈরি হয়ে নেয়। ওর শাশুড়ি ডাকে, নাস্তাটা খেয়ে যাও বাবা।

পরে মা। শোভন চলো।

স্টেশনের সামনে রিকশা ছিলো। দু'জনে লাফিয়ে ওঠে।

আমি একবার গিয়েছিলাম দুলাভাই। আজ আমার খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। ওভার ব্রিজের ওপরেও দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি আশেপাশের বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে কি সব বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে। প্রথম বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, এমনি যাচ্ছে লোকজন। পরে দেখি মানুষ বাড়ছে। তাই রাস্তায় এসে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? লোকটি ক্ষেপে গিয়ে বললো ঘরে বসে কি হয়েছে জানতে হবে না। চলো। লোকটি আমার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে বললো, বিহারিরা আমাদের শহীদ মিনার গু দিয়ে লেপে দিয়েছে। আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো দুলাভাই। আমিও ওদের সঙ্গে ছুটলাম। হঠাৎ মনে হলো আপনি তো ঘুমুচ্ছেন। তাই ছুটে এলাম আপনাকে নিতে।

শহীদ মিনার পৌঁছে প্রদীপ্তর বুক কেঁপে ওঠে। চারদিকে উত্তেজিত মানুষ, মারমুখী। আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়বে, এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্লোগান হচ্ছে, বিচার চাই, বিচার চাই, শয়তানদের বিচার চাই।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে এমন একটি ঘটনার খবর পেয়ে কেউ ঘরে নেই, সব ছুটে এসেছে। বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র, ওদের সঙ্গে আছে সাধারণ মানুষ। সাতটার মধ্যে পুলিশ অফিসার হামিদ সাহেব এসে যান। জনতাকে শান্ত থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু শুধু কথায় কি কাজ হবে? উত্তেজনা বাড়তে থাকে। একজন ছাত্র-নেতা চিৎকার করে বলতে থাকে, যে শহরের শহীদ মিনারে গু পড়ে এমন একটি শহর বাংলাদেশে না থাকলে কি হয়? আমরা এ শহর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবো– এ শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাই। তখন আবার স্লোগান ওঠে, চাই না এমন শহর– চাই না এমন শহর। জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।

BanglaBook.org

ও ছাত্রনেতাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু ভিড় ঠেলে এগুতে পারে না। ও এই শহরে নতুন, ওকে কেইবা চেনে? ও বলতে চায়, এমন কোনো পরিস্থিতি আপনারা তৈরি করবেন না, যেন সামরিক শাসন তার সুযোগ নিতে পারে। ও বুঝে যায় যে যারা এ কাজ করেছে তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ভুট্টোর হুমকি ওদের উন্মাদনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাধিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারলে তা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যাবে।

হামিদ সাহেব জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন। ছোটখাটো বক্তৃতা করছেন, ভাইসব আপনারা ধৈর্য ধরুন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপনারা সংযত হন। উত্তেজিত হবেন না। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেবেন না। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের বিচার করবো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ক্রমাগত ভিড় বাড়ছে, উত্তেজনা বাড়ছে– স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে এলাকা। শোভন স্লোগান দিতে দিতে কোন দিকে চলে গেছে প্রদীপ্ত জানে না। রাস্তায় গাড়ি-রিকশা চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে হামিদ সাহেব স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসককে আর্মি পাঠাতে অনুরোধ করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন, একজন লেফটেন্যান্টসহ এক কোম্পানি জোয়ান চলে আসে। তারা শহীদ মিনারসহ বেশ খানিকটা জায়গা অবরোধ করে রাখে। হামিদ সাহেব ছাত্রদের বলেন, মেথর দিয়ে শহীদ মিনার পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেরা না, না করে ওঠে। বলে, আমরা মেথর দিয়ে শহীদ মিনার পরিষ্কার করতে দেবো না। প্রয়োজনে নিজেরাই করবো। আপনি পুলিশদের সাহায্য করতে বলেন।

সে অনুযায়ী পুলিশের সাহায্য নিয়ে ছাত্ররা শহীদ মিনার পরিষ্কার করে। তারপর মিছিল নিয়ে শহর পরিক্রমণ করে। প্রদীপ্ত মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় হামিদ সাহেব মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পুলিশের গাড়িকে ছাত্ররা বাধা দেয় না। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে হামিদ সাহেব কোনোভাবেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে দিতে চান না। বিশাল মিছিলের একজন হয়ে প্রদীপ্তর মনে হয় পুলিশের কি ক্ষমতা আছে রাস্তা দখল করে রাখার? রাস্তা জনগণের। বাহান্নোতে জনগণের ওপর গুলি ছুঁড়ে পুলিশ কিছু করতে পারেনি– উনসত্তরেও পুলিশ এবং আর্মি রাস্তা নিজেদের দখলে রাখতে পারেনি। ওরা সাময়িকভাবে জনগণকে হটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু জনগণ চাইলে ওদেরকেই সরে যেতে হয়। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্তর মনে হয় দীপালিকার মতো হামিদ সাহেবের মুখের ওপর বুড়ো আঙুল নাচিয়ে দিতে। না, ব্যক্তি হামিদ সাহেবের মুখের ওপর নয়, পুলিশ হামিদ সাহেবের মুখের ওপর– যারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নামে নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি ছোঁড়ে।

মিছিল করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়। শোভনকে ছাড়াই ওকে ফিরতে হয়েছে, ও জানে না শোভন কোথায়।

মীজানুর রহমান গেটের সামনে পায়চারি করছে। ওকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বলে, সব খবর ভালো তো বাবা? পুলিশ গুলি ছোঁড়েনি তো?

না, তেমন কিছু হয়নি।

শোভন কোথায়?

ভিড়ের চাপে আমরা আলাদা হয়ে গেছি। ও এসে যাবে এক্ষুণি।

দীপালিকা হাসতে হাসতে বলে, মিছিল আপনাকে ছাড়লো না দুলাভাই।

ও চমকে দীপালিকার দিকে তাকায়, যেন মঞ্জুলিকা কথা বলছে। ওর মন খারাপ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

ঠিক বলিনি দুলাভাই?

বলেছো। আমি মিছিলের লোক হতে ভালোবাসি দীপা।

আপার মুখে আপনার অনেক মিছিলে যাওয়ার গল্প শুনেছি।

তখন শোভন ফিরে আসে। চেঁচামেচি করে বলে, ঐ পুলিশ অফিসার আর্মি না ডাকলে দেখিয়ে দিতাম বিহারিগুলোকে। ওরা ভেবেছে কি? তুমিই বলো বাবা?

মীজানুর রহমান ঠাণ্ডা মাথায় বলে, বাথরুমে যা। গোসল সেরে আয়। আমরা তোদের জন্য বসে রয়েছি। কেউ ভাত খাইনি।

আমরা তবু নাস্তা খেয়েছি বাবা। ওরা দু'জন তো সকাল থেকে উপোস। তাই না দুলাভাই?

প্রদীপ্ত ঘাড় নেড়ে বাথরুমে ঢোকে।

সবাই মিলে খেতে বসেছে। শোভনের উষ্মা শেষ হয় না। সারাদিনের ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয় বলতেই থাকে। প্রদীপ্ত চুপচাপ খায়। বুঝতে পারে শোভনের কাছে এই ঘটনাটি প্রথম এবং এটি ওর জীবনের মোড়-বদলের মতো ঘটনা। ওকে থামিয়ে দেয়া উচিত নয়, ও বলতেই থাকুক। কিন্তু কথা বলার কারণে ঠিকমতো খাওয়া হয় না ওর। মীজানুর রহমান গম্ভীর– ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তার ভেতরটা একদম শীতল হয়ে আছে। শোভনকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। একসময় খুব শান্ত কণ্ঠে বলে, এবার থামো বাবা। আগে খেয়ে নাও।

আমি থামতে পারছি না বাবা।

মীজানুর রহমান হো-হো করে হাসে। প্রদীপ্ত ভীষণ মজা পায়। মনে হচ্ছিলো এমন একটা উত্তরই ওর কাছ থেকে আসবে। ওর মা ওকে বলে, তোর জন্য আর একটা দুঃসংবাদ আছে শোভন।

দুঃসংবাদ?

হাবিব আর ওর বউ আমাদের বাসায় আর কাজ করবে না।

কেন?

আমরা বাঙালি, তাই।

স্তব্ধ হয়ে যায় শোভন। দীপালিকা ওর মুখের দিকে তাকায়, তারপর অন্যদিকে চোখ ফেরায়। প্রদীপ্ত একটানে বড় এক গ্লাস পানি খায়। মীজানুর রহমান খাওয়া শেষ করেছে। প্লেটে পানি ঢেলে হাত ধুতে থাকে। শোভন চেঁচিয়ে বলে, বাবা?

মীজানুর রহমান ওর দিকে তাকায় না। ও আবার ডাকে, বাবা?

বলো, কি বলবে?

আমরা কি একটা শত্রুপুরিতে আছি?

মীজানুর রহমান নিঃশব্দে উঠে যায়। প্রদীপ্ত বলে, ভাতটা খেয়ে নাও শোভন। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

আজ আর খাওয়া হলো না, বলে শোভন থালা ঠেলে উঠে পড়ে। প্রদীপ্ত ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বলে, এখনকার সময় আমাদের, কিন্তু এই শহরটা বিহারিদের দখলে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এমন কিছু ক'রো না যেটা পুরো পরিবারকে বিপদে ফেলবে। আমি কাল চলে যাবো। তোমাকে সব দেখেশুনে রাখতে হবে। বাবা-মাকে দেখতে হবে– আর দীপা তো আমাদের সবার চোখের মণি।

এসব শুনে শোভনের চোখ ছলছল করে, আপনি আমাকে এসব দায়িত্বের কথা বলছেন কেন দুলাভাই?

BanglaBook.org

তুমি তো বড় হয়েছো শোভন। দায়িত্ব নিতে হবে।

দায়িত্ব নেয়ার মতো বড় আমি হইনি। আপনি আমাকে জোর করে দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন? আপনার যাওয়া হবে না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন।

ও প্রদীপ্তকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।

পরদিন প্রদীপ্ত যাবার জন্য তৈরি হয়। দীপালিকা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে। চোখ ফুলে গেছে। প্রদীপ্ত বললো, মা আমি দীপাকে ঢাকায় নিয়ে যাই? মঞ্জুলিকা খুশি হবে।

না, না, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

মীজানুর রহমান আকস্মিকভাবে বলে, আমার মনে হচ্ছে ওদের সবাইকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেই।

কি বলছো তুমি? তোমাকে একা রেখে আমরা ঢাকায় যাবো? তা হবে না। আমরা সবাই এখানে থাকবো। দরকার হলে সবাই যাবো।

এর ওপর আর কথা চলে না। শোভন-দীপালিকা কেউই বাবাকে রেখে যাবে না। প্রদীপ্ত ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসে।

একসময় গাড়ি ছেড়ে দেয়। শোভন আর দীপালিকা হাত নাড়ে। অস্পষ্ট হতে থাকে ওদের মুখ– অস্পষ্ট হতে থাকে মীজানুর রহমানের দীর্ঘ শরীর। প্রদীপ্তর বুক কাঁপে। বারবার মনে হয় ওদের আমি কোথায় রেখে যাচ্ছি? শোভনের ভাষায় এক ভয়াবহ শত্রুপুরিতে কি? ট্রেনের কামরায় মুখ রাখলে অনবরত সরে যেতে থাকে সৈয়দপুরের নিসর্গ– কিন্তু সরে যায় না একদল মানুষের মুখ। ওরা স্থির, অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একই ভঙ্গিতে। চোখের সামনে না থাকলেও ওদের দেখতে পায় প্রদীপ্ত– ছবিটা ভীষণ স্পষ্ট। বারবার বুকের ভেতর গুমরে মরে একটি প্রশ্ন, সব দেখেশুনেও কেন ওদের রেখে চলে এলাম? কাজটা কি ঠিক হলো? যমুনা নদী পার হওয়ার পর ওর মনে হয়, কাজটা আমি ঠিক করিনি। জোর করে ওদের সবাইকে নিয়ে আসা উচিত ছিলো। মঞ্জুলিকাকে কি বলবো? প্রদীপ্ত বিমর্ষ হয়ে যায়, এক ব্যাপ্ত বিষণ্ণতায় ও এতই মুষড়ে পড়ে যে পাশের লোকটি ওকে কি যেন জিজ্ঞেস করে কিন্তু ও জবাব দেবার বিষয়টি খেয়াল করে না। ওর মনে হয় ঢাকায় পৌঁছার আগে এই বিমর্ষ বোধ কাটিয়ে উঠতে হবে। ট্রেন চলা শুরু করলে শুরু হয় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। এক জাগরিত বোধের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওকে অন্য এক বোধে প্রবেশ করতে হবে। এ যেন এক ধরনের রূপান্তর। সময়টা খুব খারাপ যায় প্রদীপ্তর। নিজেকে সামলাতে ওর কষ্ট হয় এবং চোখ ভিজে গেলে ওর সামনের দৃশ্যমান নিসর্গ সৈয়দপুরের অদৃশ্য নিসর্গকে ম্লান করতে পারে না। ও সৈয়দপুরের ফেলে আসা এবং বর্তমান অদৃশ্য নিসর্গের ভেতর নিজেকে প্রবেশ করতে দেখে, সেই দেখায় এক ভয়াবহ শূন্যতা ওর মুষড়ে-পড়া বোধকে গাঢ় করে তোলে। ও বুঝতে পারে ও সহজেই এখান থেকে বেরুতে পারবে না।

দুপুরবেলা সেমিনার কক্ষে বসে প্রফেসর মুরশেদের ট্রানজিস্টারে জেনারেল-প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার পর আলী আহমদের মনে হয় ওর মুখ ভরে থুতু উঠে আসছে– পাহাড়ী ঢলে নেমে আসা পানির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে, এমন একটি বাজে উপমা ওর মনে আসার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয়। ও থুতু ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়– অন্য শিক্ষকদের

BanglaBook.org

অবাক-হওয়া দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যেতে যেতে ও থুতুর ভয়াবহতার কথা ভাবতেও পারে না। যতই ফেলে ততোই আবার মুখ ভরে ওঠে। ও ভীষণ অস্বস্তিতে অনুভব করে যে মুখ-গহ্বরের ভেতরে তিলমাত্র জায়গা নেই যেখানে থুতুর রেখা পৌঁছে যায়নি। ও ট্যাপ খুলে আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখে পোরে এবং কুলি করে। পানির ছিটকায় ভিজে যায় ওর পাঞ্জাবির বুকের কাছটা। কিছুক্ষণ পর বিরক্তি লাগলে থুত্তুরি করে সেমিনার কক্ষে ফিরে এলে দেখতে পায় দরজায় তালা। কোথাও কেউ নেই। খাঁ-খাঁ করছে করিডোর। দ্রুতপায়ে বারান্দা অতিক্রম করে সামনে এলে দেখতে পায় বেরিয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মচারীরাও। যে যার মতো পৌঁছে যাচ্ছে রাস্তায়। আলী আহমদও দ্রুতপায়ে নেমে আসে রাস্তায়। সূর্যের খানিকটুকু আলো রাস্তার ওপর পড়ে থাকলেও– মধ্য দুপুর হওয়া সত্ত্বেও– আলী আহমদ দেখতে পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাজুড়ে রোদের নানারকম ছক তৈরি হয়েছে, কেননা অসংখ্য মানুষে ভরে থাকা রাস্তায় রোদের সরাসরি প্রবেশ নেই, ফলে সেটা এখন রোদের তৈরি এক ধরনের ভিন্ন নকশা। এই অন্যরকম সড়কের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া মানুষের সমষ্টিকে মিছিল বললে ভুল হবে, বানের পানির কথা মনে করে আবার নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ও ভাবে, আসলেই মানুষ বানের পানির মতো রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। চুয়ান্ন সাল থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী জানে কত ভয়াবহ এ দেশের বন্যা। ওরা হেলিকপ্টারে করে দেখেছিলো দু'কূল প্লাবন করে সর্বগ্রাসী বন্যা শুধু সমতলে যায় না– ফুলে-ফেঁপে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠতে চায়, কেননা হেলিকপ্টারের শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র পানি হয়তো চেয়েছিলো সে শব্দটুকু নিজের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে বন্যা দেখার বিলাস বন্ধ করে দিতে। কিন্তু পারেনি, আলী আহমদ ভাবলো, কখনো কখনো প্রকৃতি মানুষের কাছে পরাজিত হয়। কখনো কখনো প্রকৃতি মানুষের ভেতর দিয়ে নিজের বিকাশ ঘটায়। এখন প্রকৃতির বিকাশ ঘটছে মানুষের মধ্যে দিয়ে; আলী আহমদের মনে পড়ে চুয়ান্নর বন্যায় মানুষের মুখচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলো ও, যে মানুষটি রিলিফ নেবে না বলে গাছতলায় অনড় হয়ে বসেছিলো– সন্ধ্যার অন্ধকার, আকাশে মেঘের কারণে অন্ধকার আরো গাঢ়। জ্যোৎস্নাহীন রাত নেমেছিলো চুয়ান্নর বন্যার থৈ-থৈ পানির ওপর, যে পানি ভাসিয়েছে মানুষের ঘরগেরস্থি, জীবনের সবটুকু না হলেও অনেকখানি, যেহেতু যেটুকু ভাসে তার তো নতুন নির্মাণ আছে। অথচ সেই মুখচ্ছবিতে ভাঙা-গেরস্থির জন্য বিমর্ষের ছায়া ছিলো না; এমন মুখ বেশি থাকে না, তাতে ক্ষতি নেই। এমন মুখ একটি-দুটি থাকলেই চলে। তাতেই সমগ্রের ব্যবস্থা হয়; সমগ্র একটা মাত্রা পায়, সে মাত্রা সমগ্রের জন্য সমুদ্রের ধ্বনি বা বজ্রের আওয়াজ বয়ে আনে, যেখানে মোচড় খায় অভ্যস্ত এবং দীর্ঘবাহী জীবনযাত্রা। এভাবেই নতুন জন্মের আভাস মেলে– সে আভাসের ভেতর থেকে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় নতুন। এই নতুন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বন্যার স্রোত তেমন একটি মুখের দিকে এগুচ্ছে। কলাভবন থেকে রোকেয়া হলের সামনে পর্যন্ত কতটুকুইবা পথ, কিন্তু আলী আহমদ বুঝতে পারে না যে কতক্ষণ সময় লাগলো, কেনই বা এতটুকু পথ পেরুতে ও হিমশিম খাচ্ছে? আসলে কাউকে রেখে, কাউকে ঠেলে সামনে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভিড়ে ও ক্রমাগত কোণঠাসা হতে হতে ফুটপাথে উঠে যায়। দেখতে পায় রোকেয়া হল থেকে শত শত মেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ফুটপাথেও অসংখ্য মানুষ– সেই স্রোতের তোড়ে আলী আহমদ টিএসসি পর্যন্ত চলে আসে। চারদিক থেকে গর্জন উঠছে, মানি না– মানবো না। মানি না– মানবো না। কোথা থেকে আসছে শব্দ? ওর আবার চুয়ান্ন সালের বন্যার কথা মনে পড়ে। ও কালো মাথার ওপর অনবরত ভেঙে পড়া ঢেউ গুনতে চায়– গোনা যায় না, কিছু কিছু জিনিস

BanglaBook.org

কখনো কখনো মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়; সেটা অসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু একটি জিনিস ও দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায়; ওর সাধারণ দুটো চোখ শুধু কাজ করে না, কাজ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়– দেখতে পায় চুয়ান্ন সালের বন্যায় দেখা সেই মুখচ্ছবিটি আর একটি নয়, তা হাজার হাজার; কেমন অনড়, দৃঢ় ভঙ্গিতে একটি পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে– যেমন একটি অমাবস্যা অন্যটিতে প্রবেশ করলে অনন্তকাল ধরে অমাবস্যার জীবন আয়ু পায়। মানুষ এখন তেমন একটি দীর্ঘ আয়ুর দিকে এগুচ্ছে।

জেনারেল-প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন– অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি তারিখ তিনি নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছিলেন– কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর এলাকায় পাখি শিকার করতে যাবার পরিকল্পনা করার পর থেকে তাঁর মগজের ধূসর রঙের স্নায়ুকোষের ভেতর থেকে একটি নীল নকশা উদ্ভাবিত হয়েছে, অথবা একটি নীল নকশা তাঁর মগজের স্নায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে, যে নকশাটি তিনি নিজেও অনুমোদন করেছেন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বেতারযন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সেই নীল নকশাটির বর্ণ আড়াল করে রাখতে পারেনি। বরং সেই কণ্ঠস্বরের মাদকতাময় তরল পদার্থ পূর্ব বাংলার মানুষ বিষের মতো পান করেছে, কিন্তু বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায় না হয়ে তারা উন্মত্ত হয়েছে। ফলে তাদের মগজে সেই নীল নকশা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলে মানুষেরা বুঝে যায় যে এখন কি করতে হবে।

জেনারেল-প্রেসিডেন্ট মদ খেতে ভালোবাসেন, পাখি শিকার ভালোবাসেন– দুটোই নেশা। দুটোই এমন নেশা যে এই নেশায় বুঁদ হয়ে মধ্য-গগনে সূর্য-রেখে হেঁটে গেলেও সামনের যাবতীয় বস্তুনিচয় মনে হয় চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। এখন তিনি সে অবস্থায় আছেন– সূর্যকে আড়াল করে চন্দ্রের ফকফকে আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে প্রচণ্ড ঘোরের ভেতর প্রবেশ করেছেন। তাঁর চারদিকে ঘূর্ণির উন্মত্ত নৃত্য, ফলে তিনি অন্ধ হয়েছেন। তাই বেতার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ভাষণের-বন্দুকে প্রথমে একটি ফাঁকা আওয়াজ করলেন– দেখতে চাইলেন বন্দুকের গুলি ফুটলে পাখিকুল কি পরিমাণ চিৎকার করতে পারে। এটি একটি পরীক্ষা, নীল নকশার প্রথম ধাপ।

কিন্তু কয়টা পাখি শিকার করবেন তিনি? কোটি কোটি পাখি কি শিকার করা যায়? পাখিদেরও তো তীক্ষ্ণ নখ আছে, ধারালো ঠোঁট আছে– হিংস্র পাখিতো প্রমিথিউসের কলজে খুবলে খেতে জানে? এই মুহূর্তে আলী আহমদের চৈতন্যের ভেতরে সে দৃশ্যটি ফুটে উঠতে থাকে– দৃশ্যটি পরিপূর্ণভাবে ওর মগজে চিত্রিত হয়ে গেলে ও অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে, ওহ্ কী ভয়াবহ দৃশ্য। অথচ দৃশ্যটির কোনো বাস্তব সত্য আলী আহমদের সামনে নেই; যেহেতু দৃশ্যটি ওর জ্ঞানের সীমানার মধ্যে আছে, দৃশ্যটিকে নিয়ে ওর ভাবনার সুযোগ হয়েছে– দৃশ্যটি স্বপ্ন এবং বাস্তবের-মধ্যবর্তী স্থান দখল করে আছে এবং যে কোনো বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সময় সেই দৃশ্যটির কথা ওর মনে হয়, সেহেতু সে মনে করতে পারে না যে এমন একটি দৃশ্য ওর দেখা হয়নি। বরং ভাবে দৃশ্যটি ওর দেখা আছে এবং ওর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে পরিপূর্ণ করেছে। তাই দৃশ্যটিকে তুলনা করার জন্য ভেবে নিতে ওর কোনো কষ্ট হয় না। এই মুহূর্তে শত শত মানুষের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্র এবং তার এক বিঘৎ ওপরে নীলিমার আবরণের ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে পাহাড়ের ওপর শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমিথিউস, ওর হৃৎপিণ্ড খুবলে খাবার জন্য জিউসের নির্দেশে হিংস্র ঈগল ছুটে আসছে। পাখিটির প্রসারিত ডানা বিশাল, সে ডানায় চিত্রিত কারুকাজ– ছাই এবং খয়েরি রঙের সমাহার; সাদা বুক। ওর নখর তীক্ষ্ণ, ওর চঞ্চু ধারালো– এসব হিংস্রতা ছুঁয়ে যায় সমুদ্রের বায়ু

BanglaBook.org

কিন্তু শীতল করতে পারে না। পাহাড়ের পাদদেশে আছড়ে পড়ে নীল পানি– বিশাল সমুদ্রের নীলাভ বর্ণের অলৌকিক সৌন্দর্য অবলোকন-প্রেসিডেন্টের এমন পাখিওতো আছে? তিনি পাখি শিকারের জন্য এখন আর সমতলে নেই, পাহাড়ের ওপর উঠেছেন– গুলি ছুঁড়ছেন, কি এসে যায়? ওর মনোজগতের সত্যটিকে ও বাস্তবে ফুটে উঠতে দেখে– প্রচণ্ড তীক্ষ্ণতায় উড়ে আসে ঈগল, দিকবিদিক প্রকম্পিত করে ধেয়ে আসছে শোঁ-শো শব্দ– আলী আহমদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাকায়, ওহ্ তেমন শব্দ চারদিকে।

নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি প্রস্তরখণ্ড পায়ে এবং ঠোঁটে নিয়ে উড়ে এসেছে শহরের ওপর? যেমন উড়ে এসেছিলো পবিত্র কাবাগৃহ রক্ষা করার জন্য লোহিত সাগরের দিক থেকে? কে ছিলো এই আবরাহা, যাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য পাখিদের এমন উড়ে আসা? আলী আহমদের করোটির নীলাভ আকাশ থেকে আবার অলৌকিক জ্যোৎস্না নামতে থাকে– জ্যোৎস্নার কারুকাজে ফুটে ওঠে এক অসাধারণ দৃশ্য, যেন মেঘ নয়, পাহাড় নয়– প্রান্তর জুড়ে বালুর দানা। সে দানা মাড়িয়ে ছুটে আসছে আবরাহার সেনাবাহিনী, সাধারণ মানুষ তার হুকুম অমান্য করেছে– তাই সেইসব মানুষকে শায়েস্তা করতে হবে। কত দুঃসাহস আবরাহার! প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর মক্কায় হজ পালন করতে আসা মানুষ দেখে তার বাসনা হয় আর একটি কাবাগৃহ তৈরি করার। তাই আর একটি গৃহ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে ঐ ঘরের তওয়াফ করতে আদেশ করে। কিন্তু পাষণ্ড চাইলেই কি সাধারণ মানুষ পাষণ্ডের কথা শুনবে? তাই আবরাহা সেনাবাহিনী এবং হাতির দল পাঠিয়েছে পবিত্র কাবাগৃহ ভেঙে ফেলার জন্য। কাবাগৃহের কাছাকাছি এসে হাতির দল বসে পড়ে, আর লোহিত সাগরের ওপার থেকে উড়ে আসা আবাবিল পাখির ঝাঁক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেয় আবরাহা এবং তার সেনাবাহিনীকে। সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, হায় সুসজ্জিত সেনাবাহিনী– আলী আহমদ বাস্তবে নেমে এলে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে পাখি সংক্রান্ত দৃশ্যগুলো চিন্তা করে এবং একসময় দেখতে পায় ও আর রোকেয়া হলের সামনে নেই। ও বাংলা একাডেমীর সামনে দিয়ে, কার্জন হল হয়ে হাইকোর্টের সামনে এসে পড়েছে। ওর চেতনায় আবার একটি না-দেখা দৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে উঠে– নদী কিভাবে সাগরের মোহনায় গিয়ে মিলিত হয়, সে যাওয়া ও দেখেনি, কিন্তু মানুষের বিভিন্ন স্রোত যেভাবে ছুটছে তা দেখা হলে না-দেখা দৃশ্যটি ওর সামনে বাস্তব হয়ে ওঠে। বারবারই মনে হচ্ছে এই মুহূর্তের পূর্ব বাংলায় অলৌকিকের সঙ্গে বাস্তবের তেমন পার্থক্য নেই। চারদিক থেকে যে উন্মাতাল স্রোত আসছে– এ জোয়ারকে কোনো জ্যামিতিক সংজ্ঞায় ফেলা যায় না– একে অন্যভাবে নামাঙ্কিত করতে হবে। ইয়াহিয়ার ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে পরিত্যক্ত হয়েছে স্টেডিয়ামের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা– হাজার হাজার দর্শক রাস্তায়, জিন্নাহ্ এভিন্যুতে বন্যার তোড়ের কলকল ধ্বনি, ছুটে আসছে গুলিস্তান হয়ে মতিঝিলের দিকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনশূন্য হয়েছে অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– ঢাকা শহর ঘিরে বিভিন্ন এলাকা থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে দোকানপাট, সিনেমা হল, কাঁচা বাজার– আরো কত ধরনের অসংখ্যা ছোটবড় প্রতিষ্ঠান– এরা সবাই মিলে ভিন্ন-নামের জোয়ার তৈরি করে এসে মিলিত হয়েছে মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীর সামনে। সেই হোটেলে বঙ্গবন্ধু আছেন– সেখানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি পার্টির সভা চলছে। হাজার হাজার মানুষের একটি কণ্ঠ বিশাল নিনাদে আওয়াজ তুলেছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করো।

তখন তিনি বেরিয়ে আসেন, দেখতে পান বিদ্রোহী জনতা, ঘাড় বেঁকিয়ে একরোখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে; এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা। তিনি তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আগামীকাল ঢাকায়, তার পরদিন সমগ্র পূর্ব

BanglaBook.org

বাংলায় হরতাল। আগামী সাত মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলী আহমদ চৈতন্য এবং বাস্তবের সমন্বয়ে দেখতে পায় এক নতুন ঢাকা শহর। যেদিকে তাকায় সেদিকে মানুষ। পল্টন ময়দান ভরে উঠেছে– তিল ধারণের ঠাঁই নেই, বক্তৃতা করছে ছাত্র নেতারা– শপথের অঙ্গীকারে ঝরে যাচ্ছে বৃক্ষপাতা, রাজপথে হলুদ পত্ররাজির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে সহস্র মানুষের বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি ওঠে– মনে হয় এ জাতির জন্মের সময় কেউ তার মুখে মধু দেয়নি, দিয়েছিলো ভাঙ– এরা নেশাখোর হতে জানে, ওদের বুকের আদিগন্ত প্রান্তর জুড়ে এখন বেজে উঠেছে স্বাধীনতার নেশা, সে নেশায় শব্দ হয়, তা এক আশ্চর্য শঙ্খধ্বনি। আলী আহমদ স্বপ্নের ঘোরে বাড়ি ফেরে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলেও শুনতে পায় মিছিলের গর্জন– ওর মনে হয় স্বপ্ন এবং বাস্তব এভাবে বুঝি এক হতে পারে। শুনতে পায় স্লোগান– ইয়াহিয়ার ঘোষণা ঃ বাঙালিরা মানে না; পাকিস্তানের পতাকা ঃ জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও; জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান ঃ আজিমপুরের গোরস্তান।

সে রাতে বাড়ি ফেরে না প্রদীপ্ত। নিউজ ডেস্কে বসে কলম চলতে চায় না ওর। বিকেলে হোটেল পূর্বানীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো কোনো সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলো যে এ দেশে বসবাসরত বিহারিদের কি হবে। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, ওরা এ মাটির সন্তান। ওদেরকে এখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে।

প্রদীপ্ত সৈয়দপুর দেখতে পায়– ফেলে আসা সৈয়দপুর এক মুহূর্তের জন্যও ওর মগজ থেকে সরে না। ও মঞ্জুলিকাকে কিছু বলতে পারেনি বলেই সৈয়দপুর ওকে অনবরত তাড়া করে ফেরে। মীজানুর রহমানের পরিবারের কি হবে ভাবলেই ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে আসে। ওরা এ মাটির সন্তান হতে পারেনি, এ দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে পারবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ও প্রবল ব্যাকুলতায় মীজানুর রহমানকে চিঠি লেখে, বাবা, আপনি আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসুন।

পরদিন আলী আহমদ কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আবার চৈতন্য এবং বাস্তবের এক অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে। তাঁর মনে হয় এটি যেন স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র সমাবেশ– তার প্রায় সিকি শতাব্দী শিক্ষকতার জীবনে এত বড় সমাবেশ আর দেখা হয়নি– এমন একটি সমাবেশের চিত্র ওর চৈতন্যেও কখনো সবুজ রেখা হয়ে ফুটে ওঠেনি। ও শুনতে পায় ছাত্ররা পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করছে। উত্তোলিত হয়েছে বাংলাদেশের পতাকা– সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত, তার মাঝে হলুদ রঙে ফুটে আছে বাংলাদেশের মানচিত্র। আলী আহমদ ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে– এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝে যায় যে আবরাহার সুসজ্জিত সেনাবাহিনী বুটের খট্‌খট্ শব্দ তুলে ছুটে আসবে। কখন, কতক্ষণ পরে? ও জানে না, শুধু বুটের খট্‌খট্ শব্দ ওর শ্রবণেন্দ্রিয় পীড়িত করে তুললে ও দেখতে পায় লোহিত সাগরের ওপার থেকে ছুটে আসা পাখি। সারা সকাল কলাভবনের সামনে কত মিছিল এসে সমবেত হয়েছে, দুপুর গড়ায়নি, বেলা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথায় গড়াবে বেলা? বাংলাদেশের মানুষের প্রতিটি হৃৎপিণ্ড এখন ঘড়ি, ওরা নিজেরা সময়কে বেঁধে রেখেছে। এই মুহূর্তে ওরা যদি জেনারেল-প্রেসিডেন্টের শিকারের পাখি হয়ে থাকে তবে সে পাখি ময়না, দোয়েল বা বউ-কথা-কও নয়– গতকাল থেকেই বাংলাদেশের পাখিগুলো বাজ, ঈগল এবং আবাবিল।

পরদিন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় আলী আহমদ। আজ

BanglaBook.org

থেকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দেশব্যাপী হরতাল পালিত হচ্ছে। কিন্তু বসে নেই মানুষ– জঙ্গী মিছিল সাইক্লোনে ফুলে-ফেঁপে ওঠা সমুদ্রের মতো শহরের রাস্তা প্লাবিত করছে– একটি ঢেউ শেষ হতে না হতে আর একটি গড়িয়ে আসে। বসে নেই সামরিক সরকার। শহরে কারফিউ জারি করেছে– কিন্তু শহরের মানুষ তা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে আলী আহমদের মনে হয় এ যেন ম্যাজিক– রাতারাতি মানুষ ভুলে গেছে যে এ দেশে একটি সামরিক সরকার আছে– তাকে উৎখাত করে এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে শুরু করেছে। বন্ধ হয়ে গেছে অফিস-আদালত, ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়া, ঢলে পড়েছে নগরী। আলী আহমদ হাঁটতে হাঁটতে মেডিকেল কলেজের সামনে আসে– তখনো তার মাথার মধ্যে ক্রিয়াশীল ম্যাজিক; যদি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ জনগণের সামনে ম্যাজিক, তাহলে এই সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়া বাস্তব। তাহলে কি এই উনিশ'শ একাত্তরের মার্চ-মাসে বাংলাদেশ জুড়ে সত্য হয়ে উঠেছে ম্যাজিক রিয়ালিজম? আলী আহমদ মনে করার চেষ্টা করে– ফিরে যায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, এ দেশে কখনো কি কোনো মার্চ মাসে যাদু-বাস্তবতার খেলা এমন করে জমে উঠেছিলো? না, ও মনে করতে পারে না। এমনকি এই নগরী পত্তনের সময়ও মানুষ যাদু এবং বাস্তবের মিশেলে জীবনের নির্মাণকে এমন অলৌকিক আলোয় দেখেনি। আলী আহমদের জীবনেও এই দেখা ফুটে উঠতে থাকে একটি মুখচ্ছবির পশ্চাতে শত মুখচ্ছবির আলোতে। ওর শরীর কম্পিত হয়– ওর লোমকূপগুলো সোজা হয়ে উঠলে ও শুনতে পায় মেডিক্যাল কলেজের ভেতর থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে। শহীদের লাশ সামনে নিয়ে কাঁদছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কারফিউ অমান্য করার কারণে, রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার কারণে গুলি চালিয়েছে সেনাবাহিনী। আলী আহমদ দ্রুতপায়ে মর্গের সামনে এসে দাঁড়ায়, ওখানে কয়েকটি লাশ নিয়ে একটি ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে– এর আগেও মর্গে লাশ এসেছে, ওখানে লাশের সারি– কিশোর পুত্রের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখে কাঁদছে বৃদ্ধ পিতা। পুত্রের লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় একজন মা, তাকে ধরে রেখেছে কয়েকজন। শোকার্ত মানুষকে বাধা দেয়া কি সহজ কথা? পাগলিনী মা বিলাপ করছে। কতজন প্রিয়মুখ খুঁজছে লাশের সারিতে। কেউ জানে না, কিভাবে কে কখন চলে আসবে মর্গে কিংবা মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে। আবুজর গিফারি কলেজের ছাত্র ফারুক ইকবাল ইমার্জেন্সিতে, ও শহীদ হয়েছে। ওর মৃতদেহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছে ছেলেরা– নতুন শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে উঠছে ওরা। তখন আলী আহমদের দু'কান ভরে বেজে ওঠে সেই বজ্রগম্ভীর অথচ অলৌকিক কণ্ঠস্বর ঃ বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য– গুলি খাওয়ার জন্য নয়। তাই গরিব বাঙালির পয়সায় কেনা বুলেটের দ্বারা কাপুরুষের মতো গণহত্যার পরিবর্তে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিন, বাংলার শাসনভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দিন।

ও দাঁড়িয়ে থাকলে তখনো কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে, যেন পল্টন ময়দান লোহিত সাগরের ওপার– উড়ে আসছে আবাবিল, হাজার হাজার প্রস্তরখণ্ড কণ্ঠভরা। কিন্তু কে শুনবে ওই কণ্ঠের হুঙ্কার। জেনারেল-প্রেসিডেন্টের পাখা গজিয়েছে, সেই নতুন পাখায় ভর করে তিনি আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মার্চের দশ তারিখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন আহ্বান করেন। তখন ঢাকা শহরের এখানে-ওখানে পাকিস্তানের পতাকা পুড়ছে। বঙ্গবন্ধু এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এ আমন্ত্রণ বন্দুকের নলের মাথায় নিষ্ঠুর তামাশা। জনগণ তখন শহীদদের লাশ নিয়ে রাজপথে মিছিল করছে। সেদিন বাড়ি ফিরলে পুষ্পিতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, সোনাই কৈ?

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, নিশ্চয় মিছিলে গেছে। ঠিকই নিজে নিজে ফিরবে।

BanglaBook.org

যদি হারিয়ে যায়?

ওকে আমি শিখিয়ে রেখেছি কখনো পথ ভুলে গেলে একটা রিকশা নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে চলে আসতে। রিকশাওয়ালারা ইউনিভার্সিটি চেনে পুষ্পিতা।

তোমরা সবাই সবকিছু চেনো। শুধু আমি চিনি না।

পুষ্পিতা রাগ করে চলে যায়। সোনাই এখন ওর দুশ্চিন্তার কারণ, ও চাইলেও সোনাইর জন্য দুশ্চিন্তা এড়াতে পারবে না। আলী আহমদ দেখতে পায় পুষ্পিতা বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একবারও কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো না, চা খাবে কি না। ও পুষ্পিতাকে ডাকে না।

ছয় মার্চ জেনারেল-প্রেসিডেন্ট দুপুরবেলা এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পঁচিশ মার্চ পুনরায় ঢাকায় আহ্বান করেন। নিজের ঘরে বসেই রেডিও শুনছিলো আলী আহমদ। পুষ্পিতা, মঞ্জুলিকা, প্রতীক, সোনাই সবাই ছিলো। ভাষণের পর হো-হো করে হাসে প্রতীক। বলে, বাবা, আবার ঘোষণা এবং আবার একটা নাটক হবে।

ভর-দুপুরের ভাষণ, কে জানে কেমন নাটক হবে!

সোনাই উৎসুক হয়ে বলে, ভর-দুপুরে ভাষণ দিলে কি হয়?

প্রতীক ওর মাথায় চাটি দিয়ে বলে, জানিস না, ভূতে ধরে।

হি-হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ও। ভূতের কথায় ভীষণ মজা পেয়েছে। ও হাসতে হাসতে বলে, ভর-দুপুরের ভূতেরা ভীষণ শয়তান হয়।

তুই ভূত দেখেছিস?

ও ঢোক গিলে মঞ্জুলিকার প্রশ্নের জবাব দেয়, দেখেছি মামী, উল্টো ছায়াও দেখেছি। একদিন মা আমাকে ডেকে বললো, দেখ সোনাই নারকেল গাছের মাথায় সাদা ওটা কি? আমি তো তাকাতেই পারিনি। ও মাগো বলে, মায়ের আঁচলের নিচে ঢুকে যাই। মা বলেছিলো, ওটাই ভূত।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলে ও দৌড়ে পালায়। আলী আহমদের মনে হয় কয়েকদিন পর বেশ নির্মল আনন্দ পাওয়া গেলো। তখনো রাজপথে মিছিল চলছে। স্লোগান হচ্ছে : রক্ত চাও রক্ত নেবে, তবু স্বাধিকার দিতেই হবে। সে সময় ঢাকা জেলের চৌদ্দ ফুট উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাচ্ছে কয়েদীরা, ওরা জেলের প্রধান গেটটাও ভেঙে ফেলেছে– ওরা শত শত। পুলিশ গুলি ছুঁড়লে সাতজন পড়ে যায়, আহত হয় অনেকে। কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করতে পারছে না, ভিড়-ঠেলাঠেলি, পেছনে তাকানোর সুযোগ নেই। এদের সঙ্গে ছুটছে নসিব হাফিজুদ্দিনও। নাজিমুদ্দিন রোড পেরিয়ে কার্জন হলের সামনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে পড়লে পেয়ে যায় মিছিল। তখন মুক্তির আনন্দের সঙ্গে ওর মুখ ফুটে অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। পাশের লোক জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে চাই।

লোকটি হেসে সামনে এগিয়ে যায়। মিছিল এগোয়, নসিব হাফিজুদ্দিনও। কতদিন পর মিছিলে অংশ নিচ্ছে ও– কিন্তু এ মিছিলের স্লোগান, সামরিক শাসন নিপাত যাক নয়, এ মিছিল স্বাধীনতার। নসিবের মনে হয় ওর মাথায় একটি উপন্যাসের পটভূমি জেগে উঠেছে– যে উপন্যাসের নাম রাখা যায় 'যুদ্ধ'। ও কোথায় যাচ্ছে ও জানে না– এই মুহূর্তে যাওয়াই সত্য। নসিব দু'হাত উপরে তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়, ও ভুলে যায় যে ওর পরনে কয়েদীর পোশাক। ওকে এ পোশাক বদলাতে হবে।

BanglaBook.org

আজ সাত মার্চ।

সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদের মনে হয় আজ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া নেই, ক্লাস নেই– তবু তারিখগুলোতে একটুও ভুল হয় না। অন্য সময় লম্বা ছুটি হলে তারিখ-দিন গোলমাল হয়ে যায়। আলী আহমদ বিছানায় উঠে বসে। হাই ওঠে না, যেন কোনো আলস্য নেই, আড়িমুড়িও ভাঙে না। আর মুখ-গহ্বর চমৎকার, তেতো বিস্বাদে ভরে ওঠে না। আলী আহমদ গুনগুনিয়ে বলে, এ আমার অন্য সময়।

সোনাই খবরকাগজ দিয়ে যায়। খুঁটিয়ে কাগজ পড়ার সময় টের পায় রান্নাঘর থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে। মুখ ধুয়ে টেবিলে যাবার জন্য পুষ্পিতা তাগাদা দিয়ে গেছে। বলেছে, পরোটা আর মাংসের ভুণা খাওয়াবে। আলী আহমদ দ্রুতপায়ে বাথরুমে ঢোকে। দরজাটা বন্ধ করার সময় মাথাটা টলে উঠলে ও কিছুক্ষণের জন্য দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। ওর মনে পড়ে আজ বিকেলে টিক্কা খান আসবে। জেনারেল-প্রেসিডেন্ট তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন, পয়লা মার্চ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে। টিক্কা খান বেলুচদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য যে গণহত্যা চালিয়েছিলো তার জন্য সে বেলুচিস্তানের কসাই নামে আখ্যায়িত হয়েছিলো। এখন তাকে কেন পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হলো? সেদিনের বক্তৃতায় জেনারেল-প্রেসিডেন্ট কঠোর ভাষায় বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছে তাতে কোনো সরকারই নীরব থাকতে পারে না। আরো বলেছেন, পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন। রূঢ় ও কর্কশ ভাষায় দেয়া সে ভাষণ ছিলো বাঙালিদের প্রতি ক্রোধ ও আক্রোশের প্রকাশ। আলী আহমদ নিজেকে ঠেস দেয়া অবস্থা থেকে টেনে তুলতে পারে না। প্রেসিডেন্ট একদিকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন, অন্যদিকে একজন কসাইকে গভর্নর করে নিয়ে এসেছেন– দুটোতে মিলছে না? ভীষণ গরমিল। ওর মাথার ভেতরে আবার সেই সাদা রেখা জেগে উঠতে থাকে– যেন রেখাগুলোর মধ্যে মানুষের হাড়ের ঝনঝন শব্দ, হাজার হাজার টুকরো টুকরো হাড়, বহন করার সাধ্য কারো নেই। ও দরজার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাইরে থেকে প্রতীক ডাকে, বাবা সেই কখন বাথরুমে ঢুকেছো বেরুচ্ছো না কেন? নাস্তা খাবে না?

আলী আহমদ ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আসছি।

ও ট্যাপ খুলে মাথাটা ট্যাপের নিচে দেয়– ঝরঝর শব্দে পানি পড়ে ভেসে যায় মেঝে। আলী আহমদের মনে হয় ও বুঝি ট্যাপটা আর বন্ধ করতে পারবে না!

মঞ্জুলিকার শরীর খারাপ, মাঝে মাঝে ফলস পেইন হয়। ডাক্তার কাজের মধ্যে থাকতে বলেছে। কিন্তু ও বুঝে যায় যে মন না চললে শরীরটা চালানোও কষ্ট। এত কিছুর মধ্যেও বাবা-মা ভাইবোনের জন্য উৎকণ্ঠার শেষ নেই, অথচ ওর তো মিছিলে যাবার কথা ছিলো, সেটা হলো না। সোনাখালি যাবার কথা ছিলো, তাও হচ্ছে না। প্রদীপ্ত ঢাকা থেকে নড়বে না। ঠিকমতো বাড়িই আসে না। প্রদীপ্তর চিঠির জবাবে ওর বাবা লিখেছে এখন ঢাকা আসা সম্ভব না। দু'দিন ধরে মঞ্জুলিকা ঠিকমতো কিছু খেতেও পারে না। পুষ্পিতা বকাবকি করে। সাধ্যমতো চেষ্টা করে ওকে খাওয়ানোর, যেটা খেতে চায় সেটারই আয়োজন করে– কিন্তু ঘুরেফিরে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় ও, মন ভালো না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। ও চুপচাপ শুয়ে থাকে।

বারোটার পর থেকে সোনাই বাইরে যাবার জন্য রেডি। ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাবে। বারবার আলী আহমদের কাছে আসে, নানা কখন বের হবেন?

মঞ্জুলিকা আর পুষ্পিতা মিলে ওকে শুদ্ধ ভাষা শিখিয়ে ছেড়েছে। আলী আহমদের

BanglaBook.org

মতে ওর অনেকখানি নষ্ট করা হয়েছে। আলী আহমদ খুশি যে ওর খানিকটুকু আঞ্চলিক টান রয়ে গেছে। অবশ্য সোনাই ভাষা শিখতে পেরে নিজে খুশি। কারণ, ওকে আর কলোনির ছেলেরা গাঁইয়া বলে খেপায় না। ও প্রতীককে বলেছে, যেখানে যেভাবে থাকা দরকার সেভাবেই থাকতে হবে। ওর পরিবর্তন আলী আহমদকে অবাক করে না, বরং ওইটুকু ছেলের মধ্যে সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট তত্ত্ব কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে ঢুকে যায় সেটাই ভাবায়। প্রকৃতি কি এভাবে মানুষকে তৈরি করে? তার জায়গা চিনে নিতে শেখায়? আলী আহমদ যখন সোনাইর হাত ধরে রেসকোর্সের মাঠে প্রবেশ করে তখন স্লোগানের বিশাল ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সোনাইও চিৎকার করে বলছে; বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো– বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আলী আহমদ বুঝতে পারে এ কদিন একা একা মিছিলে গিয়ে ও অনেককিছু শিখেছে– ওর মনে হয় এই লক্ষ লক্ষ মানুষ সোনাইয়ের পূর্বপুরুষ, এদের সবার বুকের ভেতর সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট তত্ত্ব। এই রোদের আগুনঝরা মার্চ মাসের এক আশ্চর্য ম্যাজিক রিয়ালিজমের সময়ের মধ্যে ডারউইনের তত্ত্বের কেমন অদ্ভুত অনুপ্রবেশ। আলী আহমদ তখন দু'কান ভরে শুনতে পায় : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ওর শরীর জুড়ে আলোড়ন– ও তখন সেই স্বপ্নের চৈতন্যের ভেতর ফিরে যায়; দেখতে পায় ওর পূর্ব-পুরুষ এস, ওয়াজেদ আলির ভবিষ্যৎবাণী কেমন করে সফল হয়েছে এই রেসকোর্সের মাঠে– কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে; তাঁর নির্দেশের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই ভবিষ্যৎবাণী আলী আহমদকে আলোড়িত করে, 'বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাঁকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন।' তখন সেই বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে : 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, যার যা আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।' চারদিক থেকে আবার স্লোগান ভেসে আসে। আলী আহমদের মনে হয় স্লোগানগুলি কেমন জানি বদলে যাচ্ছে, যেন লক্ষ কণ্ঠ এক হয়ে বলছে, হয় ধ্বংস হবো, না হয় টিকে থাকার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবো। মাঝখানে আর কোনো পথ নেই। সভা শেষ। তিনি নেমে যাচ্ছেন মঞ্চ থেকে– কবিতার ভাষায় তিনি বলে গেলেন স্বাধীনতার কথা, বাঙালির সামনে আর গৌরবময় জীবনের সন্ধান নেই, সন্ধান মিলেছে, তিনি দরজা খুলে দিয়েছেন– বাঙালিকে এখন সেই গৌরব অর্জনের জন্য এগুতে হবে।

বাড়ি ফিরলে প্রতীক বললো, বাবা অনেকেই ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধু আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন।

ঘোষণা কি হয়নি?

সরাসরি তো বললেন না।

এখন পর্যন্ত অন্য একটি রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে থেকে এ বলাটাই যথেষ্ট জিতু। তিনি এক অসাধারণ বক্তৃতার মধ্যে এক অপূর্ব অভিব্যক্তির ভেতর স্বাধীনতার ঘোষণাকে মূর্ত করে দিয়েছেন। এর পরের সিদ্ধান্ত জনগণ নেবে। তিনি বারবারই বলেছেন সিদ্ধান্ত জনগণের।

পরদিন সকালে ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। বাঙালি বেতারকর্মীরা দাবি করেছিলো যে এই ভাষণ রেসকোর্স ময়দান থেকে সরাসরি প্রচার করতে হবে এবং অন্যান্য স্টেশন তা রিলে করবে, কিন্তু তাদের সে দাবি মানা না হলে বেতারকর্মীদের চাপের মুখে ঢাকা বেতার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তাই পরদিন সকালে প্রচার করা হয়। পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকা রেসকোর্সের মাঠে যেতে পারেনি,

BanglaBook.org

ওরা আগ্রহ নিয়ে শোনে। মঞ্জুলিকা আলী আহমদকে বলে, আমার ভীষণ ভয় করছে বাবা।

আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, ভয় কি মা?

আমরা সবাই বাঁচবো তো বাবা?

সবাই কি আর বাঁচবো!

আলী আহমদের কপাল কুঁচকে যায়। ও মঞ্জুলিকাকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে পারে না। মঞ্জুলিকা মুখ ফেরায়। ভাষণ শুনে পুষ্পিতা কেঁদে ফেলে। বলে, অনেকদিন পর সেই মাঝির কথা শুনলাম, যে মাঝি নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলো। কী যে দক্ষ মাঝি। আমাদের কেমন অনায়াসে পার করে দিলো। তোমার মনে আছে গো?

আছে। আলী আহমদ মাথা নাড়ে। পুষ্পিতার কথায় আলী আহমদ নিকট অতীতের সঙ্গে ভীষণ একাত্ম বোধ করে। মনে হয় এইতো সেদিন দেশ ভাগ হলো, মহানন্দা পেরিয়ে ওরা ঢুকলো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে। কী আশ্চর্য, পুষ্পিতা কী ভীষণভাবে একজন দক্ষ মাঝির কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণে। আসলেই এ এক ম্যাজিক রিয়ালিজমের সময়।

পরদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাড়া নবনিযুক্ত গভর্নর টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করেন। মাত্র দু'দিন আগে টিক্কা খান বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণ রণসম্ভার পেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালিদেরকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবেন। মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে তার কোনো শপথ গ্রহণ হতে পারলো না। আলী আহমদ আবার স্বপ্ন-চৈতন্যের কাছে জিজ্ঞাসা খোঁজে। পাকিস্তান সরকার বনাম বঙ্গবন্ধু সরকারের এই প্যারালাল কতদিন চলবে? কি এর পরিণতি? যদি যুদ্ধ পরিণতি হয় তাহলে কিভাবে শুরু হবে যুদ্ধ?

কি হবে, এমন দুশ্চিন্তায় কেঁদে ফেলে মঞ্জুলিকা। সময় আর বেশি নেই, মাত্র ক'টা দিন। প্রদীপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো ভরসা পায় না ও। বলে, বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবো তো? যদি ব্যথা না উঠে? যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয়? যদি ডাক্তার পাওয়া না যায়? আমার ভীষণ মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

আহ্ মঞ্জুলি এসব কেন ভাবছো? ডাক্তার তো বলেছে বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। কোনো প্রবলেম নেই।

এখন নেই। প্রবলেম তো হতেও পারে? বাচ্চার পজিশন উল্টে যেতে পারে, ফুল ওর মাথার সামনে এসে আটকে গেলে ও তো বেরুতেই পারবে না। বেরুনোর প্যাসেজ ব্লক হয়ে থাকলে তো অপারেশন ছাড়া ওকে বাঁচানো যাবে না, বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মঞ্জুলিকা।

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে, ভেবো না একটা ব্যবস্থা হবেই।

ও প্রদীপ্তর বাঁধন আলগা করে ছিটকে ওঠে, কি ব্যবস্থা হবে আমরা কেউ জানি না। যেমন জানি না এই সময়কে, কোন দিকে এগুচ্ছে তা কি কেউ বলতে পারছে?

তুমি শান্ত থাকো মঞ্জুলিকা। আমাদের শিশুটির ভালোর জন্য শান্ত থাকো।

তখন পুষ্পিতা দরজার ওপাশ থেকে ডাকে, দীপু কি হয়েছে? বৌমার কি খারাপ লাগছে?

মঞ্জুলিকা নিজেই এগিয়ে আসে। বলে, সৈয়দপুরে সবাই কেমন আছে ভেবে খুব খারাপ লাগছে। বিহারিদের এখন আমার বেশি ভয় লাগছে মা। রোজই তো কাগজে বাঙালি-বিহারির মারামারির খবর দেখছি।

দীপু একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিস কাল। তুমি ভেবো না মা।

ওরা ভালো আছে মা। কালও একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি। আমি তো চার-পাঁচদিন

BanglaBook.org

পরপর টেলিগ্রাম দিচ্ছি। ও একটু বেশি ভাবছে।

ভাবনারই কথা। তোর বাবা-মা দূরে থাকলে তুইও ভাবতি।

মঞ্জুলিকার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্পিতার মন ভরে যায়। এমন একটা সময় ওর জীবনেও ছিলো– গভীর উৎকণ্ঠার, আশঙ্কার এবং অনিশ্চিতের। ওদের দরজা থেকে ফিরে আসার সময় কালো খালার কথা মনে হয় পুষ্পিতার, যে গর্ভবতী পুষ্পিতার সামনে একমাত্র ভরসা ছিলো, যে না হলে ও হয়তো মরেও যেতে পারতো, মরে যেত শিশু প্রতীক। কেমন করে যে সময় কেটে গেলো। আর কয়দিন পরই মঞ্জুলিকার প্রসবের তারিখ। পুষ্পিতা নিজের ঘরে এসে কতগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা করে, যদি মঞ্জুলিকাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব না হয়? যদি ঘরেই কোনো ব্যবস্থা করতে হয়? তখন তো ওকে কালো খালা হতে হবে, বাঁচাতে হবে মা এবং শিশুকে। তালিকাটা আলী আহমদের হাতে দিয়ে বলে, জিনিসগুলো আজকেই নিয়ে আসবে।

আজকেই কেন?

বলা তো যায় না যে কখন দরকার হবে।

আলী আহমদ পুষ্পিতাকে দেখে। অবিকল কালো খালার কণ্ঠস্বরে কথা বলছে। আশ্চর্য, এইতো সেদিন কালো খালা ওকে হুকুম দিয়েছিলো, একটা গর্ত করো আহমদ, গর্ভফুলটা পুঁতে ফেলতে হবে।

পুষ্পিতা ভুরু কুঁচকে বলে, হাঁ করে তাকিয়ে আছো যে?

জিতুর জন্মের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে আমি রাজশাহীর এক অচেনা জায়গায় অন্ধকার রাতে তোমার গর্ভফুল পুঁতে রেখেছিলাম।

তো হয়েছে কি? পুষ্পিতা না বুঝে প্রশ্ন করে। কারণ আলী আহমদ কথাগুলো পুষ্পিতাকে বলছে না, বলছে নিজেকে। জিজ্ঞাসাটা নিজের কাছে। উত্তরও ও নিজেই দেবে।

তখন জঙ্গী মিছিলের প্রচণ্ড স্লোগান ভেসে আসছে। বারান্দা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে সোনাই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। দু'জনেই ওকে দেখে, কিন্তু কেউই ওকে বাধা দেয় না। আলী আহমদ পুষ্পিতার হাত ধরে। শুনতে পায় স্লোগান, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আলী আহমদ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে, হয়তো আমাদের দীপুর সন্তানও একটি স্বাধীন দেশে জন্ম নেবে! হয়তো ওকে বুকে নিয়ে আমাদের পালাতে হবে।

পুষ্পিতা উত্তেজিত হয়ে বলে, মঞ্জুলিকার গর্ভফুল কি একটি স্বাধীন দেশের মাটিতে পুঁততে পারবো আমরা?

আলী আহমদ পুষ্পিতার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, জানি না। শুধু জানি শিশুটিকে বাঁচাতে হবে। কংসের কারাগার থেকে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে যেমন করে বেরিয়েছিলেন বাসুদেব। আমাদের একটি শিশুও যেন হত্যা করতে না পারে ইয়াহিয়ার সৈনিকরা!

পুষ্পিতা আলী আহমদের আশঙ্কার পক্ষে কোনো কথা বলে না। কিন্তু ওর মনে হয় এও কী সম্ভব!

ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিদেশিরা, ওদের নেয়ার জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিবৃতি দিলেন, 'কোনো অশান্ত এলাকা থেকে নিজ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই জাতিসংঘের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আজ আমরা গণহত্যার হুমকির মুখোমুখি। এ হুমকি এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার– তথা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ লঙ্ঘনের হুমকি।' পত্রিকার খবরটি পড়ে মঞ্জুলিকা আলী আহমদের কাছে এসে বলে, বাবা এই গণহত্যা থেকে কি শিশুরা বাদ পড়বে?

আলী আহমদ ওর দিকে তাকাতে পারে না। মাথা নিচু করে রাখে। মঞ্জুলিকা প্রথম

BanglaBook.org

মা হবে, ওকে বলা যায় না যে, গণহত্যা শিশুদের রেহাই দেয় না। একসময় মঞ্জুলিকা চলে যায়। বুঝতে পারে, বাবার কাছে এর জবাব নেই।

দু'দিন পর টিক্কা খান ১১৫ নং সামরিক আদেশ জারি করেন। আদেশে বলা হয়, যে সকল কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত থেকে বেতন পেয়ে থাকে তারা পনেরো মার্চের মধ্যে কাজে যোগদান না করলে চাকরি যাবে। যোগদান না করলে পলাতক বলে গণ্য হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু কর্মচারীরা সামরিক আইন অমান্য করে এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন।' রাস্তায় দাঁড়ালে আলী আহমদের মনে হয় এখন এ শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম নেই। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই মিছিল– মানুষের দিক ভুল হয় না, কিন্তু এখন দিকগুলো একটা দিক হয়ে গেছে। শহীদদের স্মরণে শহরের ভবনগুলোতে কালো পতাকা উড়ছে এবং ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বাসভবন একটি অঘোষিত সরকারি দপ্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। সেদিন বিকেলে সোনাই বললো, নানা আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাবো? আলী আহমদ বললো, তুইও দিক একটাই করে ফেলেছিস? কেমন করে যে এত কিছু বুঝে গেলি।

পরদিন দেশের শাসন কাজ চালানোর জন্য বঙ্গবন্ধু পঁয়ত্রিশটি বিধি জারি করেন। সেদিন দুপুর আড়াইটায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা সফরে আসেন। প্রদীপ্ত বলে, বাবা দুই সরকার প্রধান একই শহরে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলি অনুসারে বাংলাদেশ চলছে, এখানে ইয়াহিয়ার অবস্থান কোথায়?

আলী আহমদ প্রদীপ্তর কথার উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু বোঝে যে ও একটি সঙ্গত প্রশ্ন করেছে। কদিন ধরে থমথম করছে শহর। একদিকে জেনারেল প্রেসিডেন্ট একজন অঘোষিত সরকার প্রধানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাদা পোশাক পরিহিত সৈন্য ও অস্ত্র আসছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে পিলখানায় ২২-বেলুচ রেজিমেন্টকে পাঠানো হয়েছে। গুজব রটেছে যে ই.পি.আর. বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হবে। দুদিন পর সামরিক কর্তৃপক্ষ জয়দেবপুরে অবস্থানরত এক ব্যাটেলিয়ন বাঙালি সৈন্যকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেয়। বাঙালি সৈন্যরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। ঢাকা থেকে একদল পাঞ্জাবি সৈন্য এ নির্দেশ কার্যকর করার জন্য জয়দেবপুর যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের গ্রামের মানুষ বাঙালি বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে লড়ার জন্য রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তায় ব্যারিকেড দেয় ওরা। শুরু হয় সংঘর্ষ। সেনাবাহিনী গুলি চালালে, পাল্টা গুলি ছোঁড়া হয়। নিহত হয় বিশ জনের মতো। এলাকায় কারফিউ জারি করে সামরিক প্রশাসক। আলী আহমদের মনে হয় অবস্থা আর অসহযোগ আন্দোলনে সীমাবদ্ধ নেই। যুদ্ধের প্রাথমিক লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জনগণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে কি করতে হবে। সারা সকাল মিছিল করে দুপুরে খেয়ে চুপচাপ শুয়েছিলো ও। ইদানীং ঘুম কমে গেছে। ওর মনে হয় রাতে একটানা তিন ঘণ্টা ঘুমুতে পারে না, দিনের বেলা তো ঘুম আসেই না। একসময় পুষ্পিতা কপালে হাত রাখে, ঘুমিয়েছো?

না।

মঞ্জুলিকার শরীর খরাপ, এর ওপর ও বাবা-মার জন্য খুব কান্নাকাটি করছে। কি করা যায়?

দীপু তো যোগাযোগ রাখছে।

শুধু যোগাযোগ রেখে কি হবে? দীপুকে যেতে বলবে?

BanglaBook.org

এখন ও ঢাকার বাইরে যেতে পারবে না।

কেন?

আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের হাতে অস্ত্র উঠে গেছে।

পুষ্পিতা চুপ করে থাকে। এই আগুনের মুখে ছেলেটাকে কি ঠেলে দেয়া যায়? ও আর কথা না বলে উঠে যায়। আলী আহমদ আর শুয়ে থাকতে পারে না। অনেকদিন পর ও রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে দাঁড়ায়। বলে, তুমি এখন পদ্মাপারে এলে মানুষগুলোকে আর চিনতে পারবে না। তোমার শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুরও পাল্টে গেছে। এখনকার মাটি এবং মানুষ তোমার জন্য একটি নতুন আবাসভূমি তৈরি করতে চায়।

ঘটনা দ্রুত পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধু আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া তাঁর ঘোষিত পঁচিশ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তেইশ মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানায়। বঙ্গবন্ধু এ দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। এদিন তিনি তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলে তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্তির ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে। আলী আহমদ একটা রিকশা নিয়ে শহরে ঘুরতে থাকে, যেন মুক্তির উৎসব পালিত হচ্ছে চারদিকে। ঘরে-ঘরে উড়ছে কালো পতাকা এবং বাংলাদেশের পতাকা। উড়ছে অফিসে, আদালতে, হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে, এমনকি বিদেশী দূতাবাসের ভবনগুলোর শীর্ষেও। আলী আহমদ খবর পায়, ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যরা ল্যান্স নায়েক বাশারের নেতৃত্বে পিলখানার প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এই পতাকায় উর্দুতে লেখা ছিলো : 'পশ্চিমারা আভি বাংলা ছোড়কে ভাগ যাও, নেহি তো এধারই তোম লোগকো কবর বানায়েগা।' পাকসেনারা এই পতাকা ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়।

আলী আহমদের মনে হয় পতাকা তো ক্যান্টনমেন্টেই যাবে– ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া তো কোথাও আর পাকিস্তানের চিহ্ন নেই। অথচ আজ পাকিস্তান দিবস। এই শহরে এখনো আছে পাকিস্তানের জেনারেল-প্রেসিডেন্ট, আছে বিরোধী দলের সদস্য ভুট্টোসহ অনেকে, আছে বেশ কয়েকজন জেনারেল।

ইপিআর-দের খবরটি শুনে রিকশা ছেড়ে দেয় আলী আহমদ। ওর মনে হয় আজিমপুর থেকে এটুকু এখন ও হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। জনগণের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত এবং সশস্ত্র যারা তারা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছে। আর কি? ঘরে ফিরে ও পুষ্পিতাকে বলে, ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া কোথাও আর পাকিস্তানের চিহ্ন নেই। এখন অপেক্ষা করতে হবে ক্যান্টনমেন্ট কি করে তা দেখার জন্য।

পুষ্পিতা শুকনো মুখে বলে, আর অপেক্ষা কীসের? শুরুই তো হয়ে গেলো।

আলী আহমদ পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকেই বলে, হ্যাঁ শুরুই হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

৯

মঞ্জুলিকার ব্যথা উঠেছে। ওর ভীষণ ভয় করছে। বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে গেলে মনে হয় হাঁটু কাঁপছে। অথচ ডাক্তার বলেছে অল্প অল্প ব্যথা হলে হাঁটতে– হাঁটলে নাকি ইজি ডেলিভারি হয়। তবু ও হাঁটার চেষ্টা করছে– একবার মাথাটা কেমন টলে উঠেছিলো। ও সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডরোব ধরে সামলে নেয়। তারপর খাটের ওপর বসে পড়ে। বোঝে না মাথা ঝিমঝিম করে কেন– বোঝে না এত ভয় লাগছে কেন– বোঝে না–। বোঝার কি আছে, মঞ্জুলিকা নিজের উপর রেগে ওঠে। পড়ে গেলে কি হতো? পেটের মধ্যে বাচ্চাটা কি মরে যেত? থৈ থৈ রক্তে ভেসে যেত ঘর এবং মা হওয়ার আনন্দ নষ্ট হয়ে–। না, ভাবতে পারে না মঞ্জুলিকা। ও পড়ে যায়নি তবু ওর মা হবার আনন্দ উবে গিয়ে মৃত্যুর কালো রেখা বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেবলই ওর চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

এখন রাত কত? ও ঘড়ি দেখে, নয়টা। সাড়ে আটটায় ভাত খেয়েছে। খিদে পায়নি, তবু একটু আগে পুষ্পিতা ওকে এক গ্লাস দুধ খাইয়ে দিয়েছে। বলেছে, ঘুমিয়ে পড়ো মা। তোমার আর রাত জাগতে হবে না। দীপু ফিরলে ওকে আমিই ভাত বেড়ে দেবো। তবু ঘুম আসে না। এখন এই মুহূর্তে মা'র কথা মনে হচ্ছে। পুষ্পিতাকে ব্যথার কথা বলা হয়নি। লজ্জা লাগছিলো। শাশুড়ি কত আদর-যত্ন করে তবু কেন মা'র কথা মনে হয়? ব্যথার কথা বলতে পারছে না দেখে?

কিন্তু এখন কি করবে? ওর ঘাম হচ্ছে, পা কাঁপছে– ব্যথা থেকে থেকে আসছে আর যাচ্ছে। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ও। প্রদীপ্ত এখনো ফিরছে না কেন? রাস্তায় গাড়ি চলাচল কমে এসেছে– মিছিলের স্লোগানও তেমন শোনা যাচ্ছে না। অনেক দূরে 'জয় বাংলা' ধ্বনি বাতাসে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ও অস্থির পায়ে আলী আহমদের ঘরে আসে। আলী আহমদ পড়ার টেবিলে বসেছিলো। ভীষণ অস্থির– পড়তে পারছে না, লিখতে পারছে না– তবু এই টেবিলটা তার মানসিক আশ্রয়– শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকলে ভয় কেটে যায়। আলী আহমদ এখন উৎকণ্ঠা, ভয় ইত্যাদি তাড়াতে চাইছে। মঞ্জুলিকা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আলী আহমদ ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কি মা? শরীর খারাপ লাগছে?

না, বাবা।

দুধ খেয়েছো?

হ্যাঁ, মা খাইয়ে দিয়েছেন।

তাহলে শুয়ে পড়ো।

ঘুম আসছে না বাবা।

দীপুর জন্য ভাবনা হচ্ছে? এই তো?

মঞ্জুলিকা চুপ করে থাকে। ওর এতক্ষণের অস্থিরতা খানিকটা থিতিয়ে আসে। আলী আহমদের কণ্ঠস্বর ওকে স্বস্তি দিচ্ছে।

ছেলেটা এমনই কাজ পাগল। যেটা নিয়ে পড়বে তো পড়েই গেলো। আর কোনোদিকে খেয়াল রাখে না। তুমি ঘুমিয়ে যাও মা।

মঞ্জুলিকা মাথা নেড়ে বলে, বাবা জিতুও ফেরেনি।

ভেবো না, ফিরবে। শহরের এত উত্তেজনা নিয়ে কি ওরা ঘরে বসে থাকতে পারে। আর ঘরে থাকবেই বা কেন? থাকা উচিত নয়।

পরের বাক্যটি আলী আহমদ অন্যমনস্কভাবে বলে। মঞ্জুলিকা আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে আসে। পুষ্পিতার ঘরে উঁকি দেয়। লাইট নেভানো, হয়তো ঘুমোয়নি, এমনি শুয়ে

BanglaBook.org

আছে। প্রদীপ্তর ওপর রাগ বাড়তে থাকে মঞ্জুলিকার। এখন রাগ করলে শরীর খারাপ করবে, এই ভেবে ও ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পানি খায়। জগে ওর জন্য ফোটানো পানি তৈরি থাকে। পানি যতক্ষণ গলা বেয়ে নেমে যায়, ততোক্ষণ ওর ভারি আনন্দ হয়। মনে হয় পানির শীতল স্পর্শ ওর ভেতরের অন্য কারু কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ও ভেবে দেখলো আসলে ওর উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ একটি অনাগত মানুষের জন্য। ও কি মানুষ? মঞ্জুলিকা মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকেই বলে, আমার কাছে ও মানুষই, শিশু নয়।

ব্যথাটা এখন নেই। ও কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। ব্যথা না ওঠাই ভালো। শহরের যা অবস্থা– প্রদীপ্ত বাড়িতে নেই– ও কিভাবে ক্লিনিকে যাবে? ডাক্তার ওদুদ বলে রেখেছেন, ব্যথা উঠলেই তাঁর ক্লিনিকে চলে যেতে। আট-দশদিন আগেই ডেলিভারি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। পুষ্পিতা বলে, আমারও মনে হয় তারিখের আগেই তোমার বাচ্চা হয়ে যাবে।

ও ধীর পায়ে আলী আহমদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজা সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথের ছবি। ও সন্তানের মঙ্গলের কথা ভাবলেই রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলে, শিশুটি যেন এমন হয়, এমনই। এমন সুন্দর, শান্ত, সৌম্য। এমন প্রতিভাবান।

একদিন প্রদীপ্তকে একথা বলতেই প্রদীপ্ত চমকে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, তুমি তো দারুণ মেয়ে মঞ্জুলি। আমাদের সন্তানের জন্য একটি গভীর বিশাল জায়গা ঠিক করেছো। তোমার এই সুন্দর ভাবনার জন্য আমি তোমাকে ঈর্ষা করছি।

সেদিন প্রদীপ্ত গাঢ় চুমুতে ভরিয়ে রেখেছিলো ওকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে প্রদীপ্ত কোথায়? শিশুটি আসবে বলে জানান দিচ্ছে। ওর ব্যথা উঠেছে। হঠাৎ করে এক ঝলক ব্যথা উঠলে ওর মাথা টলে ওঠে। ও মুখে অস্ফুট শব্দ করে। সেই শব্দে আলী আহমদ চমকে পেছন ফিরে তাকায়। তাড়াতাড়ি ওর কাছে উঠে এসে বলে, মা কি হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

রবীন্দ্রনাথ বাবা।

রবীন্দ্রনাথ? কি হয়েছে?

আলী আহমদ বিস্মিত হয়। মঞ্জুলিকা লজ্জা পেয়ে বলে, না, দেখছিলাম ছবিটা।

ও, তাই বলো। বুঝতে পারছি তোমার খুব একা একা লাগছে। তুমি না হয় টেলিভিশন দেখো। সময় কেটে যাবে।

আলী আহমদ কথা শেষ করার আগেই পুষ্পিতা ওঠে। বাতি জ্বালায়। ঘুম-জড়ানো চোখে বলে, কি হয়েছে? ছেলেরা ফিরেছে?

ফিরেনি মা।

কয়টা বাজে?

আলী আহমদ ডাইনিং টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, দশটা। আমার খিদে পেয়েছে। এসো খেয়ে নিই।

আমি আসছি, বলে পুষ্পিতা বাথরুমে ঢোকে। মঞ্জুলিকা টেবিলে খাবার দেবার জন্য তারাবানুকে ডাকে, ও পেছনের বারান্দায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। দু'দিন ধরে ওর গায়ে জ্বর। মঞ্জুলিকা অল্প অল্প ব্যথা নিয়ে টেবিলে প্লেট, গ্লাস দিতে থাকে। ডাক্তার বলেছে সবসময় কাজের মধ্যে থাকতে। বেশি শুয়ে-বসে থাকলে নাকি বাচ্চার মাথা বড় হয়ে যায়, ডেলিভারিতে কষ্ট হয়। তারাবানু ভাত-তরকারি গরম করে টেবিলে নিয়ে আসে। আলী আহমদ খেতে শুরু করে। পুষ্পিতা তখনো বাথরুমে। ও টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ওর মনে হলো পা বেয়ে একটা পানির ধারা নামছে– ভিজে যাচ্ছে উরু, হাঁটু এবং পায়ের পাতা। ও ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ও ঘামতে শুরু করে। পুষ্পিতা বেরিয়ে এসে টেবিলে বসতে

BanglaBook.org

বসতে ওকে বলে, তুমি দাঁড়িয়ে কেন বৌমা? বসো, এক টুকরো মাংস খাও।

না, মা, খিদে নেই।

শরীর খারাপ? মুখটা শুকনো লাগছে কেন?

মঞ্জুলিকা চুপ। ওর হাঁটু কাঁপছে। পানি এখন বেশ জোরেই আসছে। মেঝেতেও পড়েছে হয়তো। পায়ের স্যান্ডেল ভিজে গেছে। ও কি করবে বুঝতে পারছে না।

পুষ্পিতা দু'গ্রাস ভাত মুখে পুরে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। বলে, তোমার কি ভয় করছে বৌমা?

ও মাথা নাড়ে।

তুমি ঘরে যাও, দীপু যতক্ষণ ফিরবে না, ততোক্ষণ আমি তোমার কাছেই থাকবো।

পুষ্পিতার মমতা মাখানো কথায় মঞ্জুলিকার আশঙ্কা উড়ে যায়। ও ধীরে পায়ে ঘরে আসে, বাথরুমে ঢোকে– ঐ পানির ধারার অস্বস্তি তাড়াতে চায়। কিন্তু বুঝতে পারে পানিতে মেঝে ভরে যাচ্ছে, অথচ ওর কোনো ব্যথা নেই। ওর কান্না পাচ্ছে, ব্যাকুলতা বাড়ছে। ওয়ার্ডরোবের ওপর ওদের বিয়ের ছবি বড় করে বাঁধানো। প্রদীপ্ত হাসছে, আর মাথায় ঘোমটা দেয়া ওর মুখটা নিচু। ও জোরে জোরেই বলতে থাকে, তুমি না বলেছিলে, তোমাকে উৎকণ্ঠায় রেখে আমি কিছুতেই দূরে থাকতে পারবো না মঞ্জুলি। আমার বাচ্চার মুখ সবার আগে আমি দেখবো। এখন কোথায় তুমি? আমাকে উৎকণ্ঠায় রেখে কেন তুমি দূরে আছো? যদি আজ রাতে তোমার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তবে সবার আগে কে দেখবে তোমার বাচ্চার মুখ?

ভয়ে, উৎকণ্ঠায় শব্দ করে কেঁদে ফেলে মঞ্জুলিকা। টেবিলে ভাতের থালা ফেলে ছুটে আসে পুষ্পিতা, কি হয়েছে বৌমা?

ও পুষ্পিতাকে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। তারপর একটা আশ্রয় খুঁজে নেবার জন্য আঙুল দিয়ে পানি দেখায়। ততোক্ষণে মেঝেতে বেশ খানিকটা পানি জমে গেছে। চমকে ওঠে পুষ্পিতা, সর্বনাশ, পানি ভেঙে গেছে দেখছি, ব্যথা আছে?

মঞ্জুলিকা মাথা নাড়ে, না মা।

পুষ্পিতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ঘাবড়িয়ো না মা। আল্লাহ্‌কে ডাকো।

তখন দরজায় কড়া নড়ে।

দেখি দীপু এলো নাকি?

পুষ্পিতা দরজা খুলতে যায়। আলী আহমদ জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বৌমার? পুষ্পিতা জবাব দেয় না। দরজা খুলতেই প্রতীক ঢোকে। সন্ত্রস্ত। ধম্ করে খাবার টেবিলে বসে পড়ে ও।

শহরের অবস্থা খুব খারাপ বাবা। আমরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছি। শোনা যাচ্ছে রাতে মিলিটারি নামবে। লোকজন উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফিরছে। তুমি কিছু শুনেছো বাবা?

শুনেছি। বিকেলে যখন ইয়াহিয়া খান চলে গেলো তখন থেকেই গুজবটা ছড়িয়েছে। তাছাড়া ওরা এতদিন মিলিটারি আর অস্ত্রশস্ত্র যে এনেছে এটাতো আমাদের জানা।

বাবা কি হবে?

যুদ্ধ। আমাদের লড়তে হবে।

কি বলছো বাবা!

আমরা যতটুকু এগিয়েছি তার থেকে আর পিছু ফিরে আসতে পারবো না।

আমাদের তো অস্ত্র নেই?

হয়তো গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে।

BanglaBook.org

খুব ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিকার কথা বলে আলী আহমদ, যেন তার কোনো উত্তেজনা নেই। পাশে দাঁড়ানো পুষ্পিতা রেগে উঠে বলে, কি তোমরা যুদ্ধের কথা বলছো? আমার দীপু কৈ?

প্রতীক চুপ করে থাকে।

কথা বলছিস না যে?

আমি জানি না মা। রাস্তার যা অবস্থা দেখেছি মনে হয় ভাইয়া ফিরতে পারবে না। যদি প্রেসক্লাবে থাকে তাহলে তো ওখানেই থেকে যাবে।

তখন বোমা ফাটার শব্দের মতো গম্ভীর কণ্ঠে পুষ্পিতা বলে, বৌমাকে যে হাসপাতালে নিতে হবে?

কি বললে? চমকে ওঠে আলী আহমদ।

পানি ভেঙে গেছে।

অসম্ভব, এখন কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে বেরুনো যাবে না। প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে।

তাহলে? আলী আহমদ পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকায়। পুষ্পিতা প্রতীকের মুখের দিকে তাকায়। প্রতীক বাবা-মার ভয়ার্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ভয় পাচ্ছো কেন মা? মনে নেই আমার জন্মের কথা? তখন তো তোমাদের খুব সাহস ছিলো?

পুষ্পিতা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। এবার চেয়ারে বসে পড়ে। প্রতীকের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না। ও এখন পরিপূর্ণ যুবক। সারাদিন ঘোরাঘুরি করার জন্য চেহারা রুক্ষ, খানিকটা ক্লান্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে পাতলা ছিপছিপে প্রতীককে খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছে– ওর চোখ কথা বলতে চায়। পুষ্পিতার মনে হয় প্রতীক কি কথা বলবে তা ও জানে। অদ্ভুত তো, স্বপ্নের মতো কি সেই দিনগুলো পেরিয়ে গেলো? ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি জেগে ওঠে। বুঝতে পারে আলী আহমদ এবং প্রতীক ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

পুষ্পিতা ট্রাঙ্ক খুলে পুরনো শাড়ি বের করে। বাথরুম থেকে ডেটলের শিশি নেয়, রান্নাঘরে এসে তারাবানুকে চুলোয় গরম পানি বসিয়ে রাখতে বলে। আলী আহমদ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বলে, ডাক্তার ওদুদকে একটা ফোন করে দেখি?

তুমি ধরো, আমি কথা বলবো। আমার দু একটা বিষয় জানা দরকার।

আলী আহমদ ফোন উঠিয়ে দেখে নষ্ট। পুষ্পিতা বলে, কি হলো?

ডেড। আলী আহমদ অসহায়। প্রতীক খাওয়ার টেবিলে, মুখের গ্রাসটা কোঁত করে গিলে বলে, বুঝেছি, বোধহয় সব টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে।

পুষ্পিতা প্রতীকের কথা শুনতে পায় না। ও মঞ্জুলিকার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মঞ্জুলিকার হাতের তালু। মুখে কথা নেই। শুধু নিশ্বাসে ওর বুক ওঠানামা করছে। ওর কি ঘুম পাচ্ছে?

মা, পানি খাবে?

পুষ্পিতা ওকে পানি খেতে দেয়।

আমার অবশ লাগছে। মনে হচ্ছে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমার কি ঘুম পাচ্ছে মা?

এসব এখন ভাবতে নেই রে বোকা মেয়ে। এখন সজাগ থাকতে হবে। মনে সাহস রাখতে হবে। এমন সময় মেয়েদের জীবনে এক মহৎ সময়– এই সময়টাকে গভীর আবেগ দিয়ে বুঝতে হবে। মা হওয়া যে বড় কঠিন।

পুষ্পিতার কথাগুলো শুনতে শুনতে মঞ্জুলিকার মনে হয় পুষ্পিতার মুখটা ফুল হয়ে গেছে। কোথায়, কতকাল আগে পুষ্পিতার সঙ্গে যেন ওর একটা নাড়ির টান জন্মেছিলো,

BanglaBook.org

প্রদীপ্তর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে টানটা এক হয়ে গেছে। এই টানটা ও গভীরভাবে লালন করতে চায়। তখন একটা বড় ধরনের দমকা ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে ও এবং সে ধাক্কা সামলে নেবার জন্য ও পুষ্পিতার হাত চেপে ধরে। ওর চোখে পানি এসে যায়। দরজার বাইরে আলী আহমদ আর প্রতীক পায়চারি করে। ওদের দু'একটা কথা শোনা যায়। এ ক'দিনে প্রতীক যে স্লোগানটি বেশি দিয়েছে সেটি হলো 'ভুট্টোর বুকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' প্রদীপ্ত বলতো, না এর চেয়ে ভালো স্লোগান, 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।' কিন্তু মঞ্জুলিকা প্রতীকের পক্ষেই যেত। বলতো, এটি হলো রক্ত গরম করা স্লোগান। একটা প্রবল ব্যথার পর এখন ওর ভেতরটা আবার চুপসে গেছে। ওর মনে হয় বেশ মজার খেলা– ওঠানামার খেলা। রাজনীতির খেলার মতো কি? কখনো আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং একটা নতুন প্রত্যাশার জন্ম দেয়। স্বাধীনতা মানে কি জন্ম? মা কেন বললো, মা হওয়া বড় কঠিন, কেন বলে একটি সন্তানের জন্য মাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে হয়? আবার বুঝি জোরে ব্যথা আসছে, না অল্পের ওপর দিয়ে চলে গেলো। এদিকে সমানে পানি ভাঙছে। পুষ্পিতা চিন্তিত হয়। তখন ব্যথার একটি বড় ধাক্কায় মঞ্জুলিকা আঁ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। ওর মনে হলো কোথাও একটা বিকট শব্দ হলো এবং প্রদীপ্ত ওকে খুঁজছে, বলছে, মঞ্জুলি তোমার পেটে কান রেখে শিশুটির নড়াচড়ার শব্দ আমাকে শুনতে দাও। কিন্তু প্রদীপ্ত নয়, প্রতীকের গমগমে ভরাট গলা ও শুনতে পায়।

প্রতীক আলী আহমদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর কিছুটা জোরের সঙ্গে বলে– বাবা কথা বলছো না যে? তুমি কি ভাবছো বাবা? এতকিছুর পরিণতি খুব সুখের নয়, এই তো?

পুষ্পিতা বেরিয়ে এসে বলে, এখন মনে হচ্ছে আজ রাতেই একটা কিছু হবে। আলী আহমদ অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে, দীপুটা বাড়িতে নেই। ওর সন্তান আসছে–

পুষ্পিতা জোরের সঙ্গে বলে, ভাবনার কিছু নেই। সব ঠিকঠাকই হবে। আলী আহমদ দ্রুত কাছে গিয়ে পুষ্পিতাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করে বুঝলে যে আজ রাতেই একটা কিছু হবে?

পুষ্পিতার মুখ উদ্ভাসিত হয়। বলে, জরায়ুর মুখ খুলে গেছে।

পুষ্পিতা ঘরে ঢুকে যায়। আলী আহমদ খানিকটা নিশ্চিত হয়ে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসে। প্রতীক উৎকণ্ঠায় বাবার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু সে মুখে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ও বুঝতে পারে যে মঞ্জুলিকার কোনো খারাপ খবর নেই– ওরা একটি শুভ সংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারে।

আলী আহমদ ওর দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, ঐ জানালাগুলো বন্ধ করে দে জিতু। গরম লাগছে। থাক না খোলা। কী সুন্দর বাতাস আসছে।

আলী আহমদ ধমক দেয় ওকে, তোকে বলছি বন্ধ করতে তুই বন্ধ করবি জিতু।

প্রতীক জানালা বন্ধ করে আসে।

রাত এগারোটায় যখন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে চিন্তান্বিত তখন তার সবুজ রঙের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। তিনি বলেন, Khadim, it is tonight. টিক্কা খানের ফোন পেয়ে মেজর জেনারেল খাদিম উত্তেজিত হননি। বরং এমন একটি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সার্চলাইটের ব্লু প্রিন্ট তৈরি। তিনি আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ

BanglaBook.org

দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয়েছে রাত একটা। একই সঙ্গে একযোগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নির্দেশিত সময়ে বিগ্রেডিয়ার আরবারের বাহিনী অপারেশন শুরু করে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে শহর জুড়ে। কেঁপে ওঠে ওদের চারতলা ভবন।

তখন এক আর্ত-চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয় মঞ্জুলিকার ছেলে। পুষ্পিতা মঞ্জুলিকাকে বলে, তোমার ছেলে হয়েছে বৌমা। মঞ্জুলিকা মৃদু হেসে ক্লান্তিতে চোখ বোজে। ও আর কোনোকিছু জানতে চায় না– ওর এখন ঘুমের ভীষণ প্রয়োজন।

কিন্তু গোলাগুলির শব্দে ক্লান্তি উবে যায় মঞ্জুলিকার। ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেলে ধমক লাগায় পুষ্পিতা, চুপ করে শুয়ে থাকো বৌমা। ফুলটা তো এখনো বেরিয়ে আসেনি। নাড়ি ভেতরে ঢুকে গেলে সর্বনাশ হবে।

ও কিছু না বুঝে শুয়ে পড়ে। ওর ভীষণ কান্না পায়, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। পাছে শাশুড়ির কাছে আবার ধমক খায় এই ভয়ে ও শব্দ করে না। নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে দাবিয়ে রাখা যায় নিজেকে? ও আর পারে না। শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট ওকে অনবরত মোচড়াতে থাকে– মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে দিচ্ছে ওর আবেগের অনুভূতিগুলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মঞ্জুলিকা। পুষ্পিতা ক্ষীণ কণ্ঠে শাসন করে, আহ্ বৌমা এমন করলে তোমার ক্ষতি হবে।

আপনার ছেলের কি হবে মা? যা শব্দ পাচ্ছি, ওরা যে সব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

পুষ্পিতা জবাব দিতে পারে না। মঞ্জুলিকাকে কাঁদতেও বারণ করে না। ওর নিজেরও তো কান্না পাচ্ছে; কিন্তু এখন অতোকিছু ভাবার সময় কোথায়? রাতি চলে গেছে। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলী আহমদ মোম জ্বালিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে পুষ্পিতার হাতে দিয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোয় ও পাতলা নরম কাপড় দিয়ে শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছে দেয়। ও প্রথমে চিঁচি শব্দ করছিলো। তারপর তারস্বরে চেঁচাতে থাকে। মঞ্জুলিকা চমকে উঠে বলে, মা ওকে থামান।

কেমন করে থামাবো?

পুষ্পিতা শিশুটিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু শিশুটি কিছুতেই থামে না।

বাইরে দরজার কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে আলী আহমদ আর প্রতীক। একটু আগে বুটের লাথি পড়েছে দরজার ওপর। সৈনিকরা দরজা খুলতে বলেছে। ওরা খোলেনি। দু'জনে খাবার টেবিলটা ধরে দরজার সামনে দিয়েছে, ধাক্কা দিলেই চট্ করে খুলবে না। একটুপর শব্দ থেমে যায়। মঞ্জুলিকার গর্ভফুল বেরিয়ে গেলে পুষ্পিতা ওটাকে কাপড়ে পেঁচিয়ে খাটের নিচে রাখে। তারাবানু মেঝে পরিষ্কার করছে। মঞ্জুলিকার কান্না থেমেছে, ও এখন খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছে। পুষ্পিতা শিশুটিকে মায়ের পাশে শুইয়ে দেয়, ওর কান্না থামেনি– ও এখন হাত-পা ছুঁড়ছে। পুষ্পিতা মঞ্জুলিকার গায়ে পাতলা কাঁথা দিতে না দিতেই শুনতে পায় আর্তনাদ। মুখোমুখি ফ্ল্যাটে থাকেন অঙ্কের অধ্যাপক। একটুপর গুলির শব্দ। প্রতীক বাবাকে জড়িয়ে ধরে। পুষ্পিতা দরজা সামান্য ফাঁক করতেই রক্তের গন্ধ এসে লাগে দু'জনের নাকে।

তোমরা ভেতরে এসো।

দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকে। প্রতীক ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা ওরা কি ড. জামানকে গুলি করলো?

আলী আহমদ নিস্তেজ কণ্ঠে বলে, জানি না।

মুখ দেখা যায় না। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় গুলিটা বুঝি তার বুকেই লেগেছে। পুষ্পিতা

BanglaBook.org

মেঝেতে চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। দু'জনে পা গুটিয়ে বসে থাকে। পুষ্পিতা খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে শিশুটির মুখে ভেজা ন্যাকড়া দিলে ও চুষতে থাকে। ওর কান্না থেমেছে।

বাইরে গোলাগুলির শব্দ ক্রমাগত বাড়তে থাকে– সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ– আর্তনাদ গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। এতকিছুর মধ্যে কয়েকজন মানুষ একজন নবজাতককে ঘিরে বসে থাকে– নবজাতক ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ওকে নিয়ে আর কারো উৎকণ্ঠা নেই– শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর মুখটি ওদের জন্য প্রবল শান্তি– কিন্তু স্বস্তি নয়। ওর বাবার অনুপস্থিতি ওদের বুকে শোকের মতো গাঢ় হয়ে আছে।

প্রতীক বলে, মা চলো আমরা ওর একটা নাম রাখি।

নাম? কি নাম?

আমি একটি নাম ঠিক করেছি বাবা। বলতে বলতে প্রতীক খাটের পাশে গিয়ে বসে। মঞ্জুলিকা নাক মুছে শান্ত হয়েছে। প্রতীক ওর হাত ধরে বলে, কাঁদছো কেনো ভাবী? কাঁদার কি হলো? আজ তো তোমার আনন্দের দিন। তোমার ছেলের নাম ঠিক করেছি। ওর নাম অজেয়।

অজেয়?

হ্যাঁ, অজেয়। অজেয় আলী আহমদ। ওকে আমরা জয়ী বলে ডাকবো।

অজেয়? ভালো নাম রেখেছিস। আলী আহমদ মাথা নাড়ে।

ও এই সময়ের ছেলে, দারুণ সময়ের ছেলে– আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের ছেলে।

প্রতীক বাবার কাছে এসে দাঁড়ালে আলী আহমদ ফিসফিসিয়ে বলে, তুই কাদের কথা বলছিস আমি জানি জিতু। আমরা সবাই অজেয়দের পেছনে দাঁড়াবো।

হ্যাঁ বাবা তাই। দেখো এই সময়ে ঘরে ঘরে অজেয়রা জন্মাবে। চলো বাবা আমরা ঘরের আগলটা ভাঙি। আমাদের জন্য ঘর নয়।

দু'জনে দরজা ফাঁক করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। গোলা এসে পড়ে বিল্ডিংয়ের দেয়ালের গায়ে– ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে জানালার কাঁচগুলি এবং আগুনের ভেতর থেকে ভেসে আসে মানুষের কোলাহল– আর্তনাদ। আলী আহমদ প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে শোবার ঘরে এসে দাঁড়ায়– পায়চারি করে। এখন আর মঞ্জুলিকার জন্য উৎকণ্ঠা নেই, কিন্তু মধ্যরাতের এই সূচনা, শুধুই একটি ঘটনা বলে মনে হয় না– মনে হয় একটা কিছুর শুরু– একটা বড় কিছু। প্রতীক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ঘুরে বলে, বাবা তুমি শুয়ে পড়ো।

না থাক, ঘুম তো আসবে না।

আলী আহমদ পড়ার ঘরে আসে। রবীন্দ্রনাথের ছবির নিচে দাঁড়ায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে বাইরের ঝলসে ওঠা আলো আলোকিত করে ঘর। সেই ক্ষীণ আলো আলী আহমদের অনুভব থেকে হারিয়ে যায়। জেগে ওঠে অমর জ্যোতি। ওর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ছবি এই জ্যোতির আধার। ওর বুকের ভেতর প্রশান্তির জলপ্রপাত নামে, যেন ঐ ছবির ভেতর থেকে হাজার অজেয় কল্‌কল্ করে গড়িয়ে নামছে– সামনে শস্যবতী সমতল ভূমি। ও অন্ধকার হাতড়ে পড়ার টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে।

সারাদিনের উত্তেজনায় প্রদীপ্তর ঘরে ফেরার কথা মনে ছিলো না। অনেক রাত পর্যন্ত পত্রিকা অফিসে কাজ করেছে। মঞ্জুলিকার শরীর খারাপ– ঘরে ফিরতে হবে, এমন কথা মনে পড়ার পর প্রদীপ্তর আর বাড়ি ফেরার সময় ছিলো না। থমথমে হয়ে গেছে শহর। তোপখানা রোডের কাছে এলে সেকেন্ড গেটের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ওর গা ছমছম করে

BanglaBook.org

ওঠে। এমন টগবগে উত্তরানো শহরটা রাতারাতি লোকগুলোকে কোথায় গায়েব করে ফেললো? ও রিকশা খুঁজতে থাকে। সামনের দিকে এগোয়। বুঝতে পারে রিকশা খুঁজে লাভ নেই। কয়েকজন ছেলে আর্মির চলাচল বন্ধ করার জন্য ব্যারিকেড তৈরি করছে– ওদের হাতে-পায়ে দারুণ ক্ষিপ্রতা। প্রদীপ্ত ওদের সঙ্গে হাত লাগায়। এত কাজ ফেলে বাড়ি ফিরবে কেমন করে? একটি ছেলে জিজ্ঞেস করে, ভাই আপনি কোথায় থাকেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়াটারে।

কিভাবে ফিরবেন? রিকশা তো নেই? চলুন আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দেই।

দু'জনে হাঁটতে থাকে। পুরনো হাইকোর্টে ঢুকবার মুখে গাছ আর ড্রাম ফেলে ব্যারিকেড করা হয়েছে। দু'জনে সরু ফাঁক দিয়ে পার হয়ে আসে। কার্জন হলের গেটের কাছে বিশাল ব্যারিকেড। দু'জনে থমকে দাঁড়ায়। দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো। বললো, শোনা যাচ্ছে রাতে আর্মি নামবে। হয়তো এতক্ষণে নেমেও গেছে। আপনারা শিগ্রি ঘরে যান।

সঙ্গের ছেলেটি বলে, নাজিমুদ্দিন রোডে আমার বাড়ি। আমি চললাম। আমার মনে হয় আপনার পায়ে হেঁটে না যাওয়া ভালো। আপনি বরং পত্রিকা অফিসে ফিরে যান।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো একই কথা বলে যে যার পথে চলে যায়। সেই নিস্তব্ধ ভৌতিক শহর প্রদীপ্তকে গ্রাস করে। ও যে পথে এসেছিলো সে পথেই দৌড়ুতে শুরু করে। প্রেসক্লাবে এসে ঢোকে। তখনো ক্লাব ম্যানেজার কুদ্দুস আর দারোয়ান খয়ের ছিলো। ওরা বললো, আপনি এখানেই থেকে যান স্যার।

এছাড়া আর উপায় কি? যেতে তো পারবো না।

প্রদীপ্ত সোফার ওপর বসে পড়ে। ওর মনে হয় ওর কোনোকিছু মনে পড়ছে না– মাথা কাজ করছে না। ও প্রাণপণে কোনো একটি স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে– পারছে না। স্মৃতির বদলে করোটির মধ্যে খেলা করে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ আলো। আঁকাবাঁকা রেখায় ফুটে ওঠা একটি দেশ। দেশ? তিন তারিখে পল্টন ময়দানের সভায় একটি ইস্তেহার পাঠ করে বলা হয়েছিলো, 'চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত একাত্তর বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাত কোটি মানুষের জন্য আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ।' কেমন সে দেশ? সে দেশের ধমনীর মতো বয়ে যায় নদী– ছুঁয়ে যায় লোকালয়– ফসলের মাঠ, বনানী, পাহাড়, সাগর– এতকিছুর মধ্যে মানুষ, মানুষ, মানুষ। এই পঁচিশ দিনের দেখা হাজার হাজার মানুষের কালো কালো মাথা ওর চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকারের তারাজ্বলা আকাশ হয়ে ওঠে। প্রদীপ্ত খয়েরের মুখের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ আগে ও প্রেসক্লাবের বাইরের গেটে তালা দিয়ে এসেছে। এখন চলে যাবে। ক্লাবের প্রাঙ্গণে ওর ঘর আছে। খয়ের বলে, স্যার আমি আর এখানে থাকতে পারবো না। আমি ঘরে যাই।

ঘর? প্রদীপ্তর নিজের ঘরের কথা মনে হয়। বাবা, মা, স্ত্রী, ভাই এবং– এবং একটি অনাগত সন্তান। যে কোনো মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হতে পারে। ও খয়েরকে বলে, তুমি বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে যাও। তাহলে ওরা হয়তো বুঝতে পারবে না যে ঘরে কেউ আছে।

আমার তাই মনে হয় স্যার। বাইরের গেটে, সিঁড়িতে অন্য সব ঘরে আমি তালা দিয়ে যাচ্ছি।

কাজ শেষ করে খয়ের চলে যেতে না যেতেই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। প্রদীপ্ত বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। ফ্যানও ছাড়েনি। প্রচণ্ড গরমে চুপচাপ সোফায় বসে আছে। আত্মস্থ হতে খানিকটা সময় লাগে ওর। তারপর জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। তোপখানা রোডের ওপর এলাহীকাণ্ড– প্লাটুন দৌড়ে যাচ্ছে। ওর মনে হয় চারদিক থেকে গোলার

BanglaBook.org

আওয়াজ আসছে। ফস্ করে জ্বলে ওঠে আলো– দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক। কমিশনার অফিস ও ইউসিস ভবনের তেমাথায় জ্বলে ওঠা আলোটায় ও দেখতে পায় সৈন্য বোঝাই অনেকগুলো ট্রাক পুরানা পল্টনের দিকে চলে যাচ্ছে। রাত ন'টার পর থেকেই এই রাস্তায় সামরিক বাহিনীর চলাচল বন্ধ করার জন্য ইট-ড্রাম-কাঠের গুঁড়ি-গাছের ডাল দিয়ে ব্যারিকেড দিয়েছে ছেলেরা। সেনাবাহিনীকে কনভয় থামিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের গলিতে লুকিয়ে থাকা ছেলেরা চটপট ইট, কাঠের টুকরো, টিন, এমনকি ছোট ছোট পান-বিড়ির দোকান ফেলে আবার ব্যারিকেড তৈরি করেছে। কী ক্ষিপ্র, কী দুরন্ত ওদের গতি। প্রেসক্লাবের পাশের গলিতে ছিলো এদের আস্তানা। সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলে। শেষবার ওরা ব্যারিকেডের ওপর স্প্রে করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখন আর কোনো বাধা নেই। ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নির্বিবাদে চলে যায়। প্রদীপ্ত ফিরে এসে সোফায় বসে। এসব দেখে ওর হৃদয় ভয়শূন্য হয়ে যায়। ভয়শূন্য হয়ে গেছে মুক্তিকামী মানুষের দল। এই পঁচিশ দিন ধরে এইসব মানুষেরা রাজপথ মাতিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যার সময়ও প্রেসক্লাবের ডান দিকে সেক্রেটারিয়েটের শেষ দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কাঁচা গলিটার মুখে ট্রাক এবং কয়েকটা রিকশা রেখে ব্যারিকেড দিয়েছে যুবকরা, এরা বেশির ভাগই দোকানদার, রিকশাচালক। প্রদীপ্ত উঠে পায়চারি করে। থমকে দাঁড়ায়। এরা কি এখনো অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে? ও জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। কিছু দেখা যায় না। বোঝা যায় যে ওরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। ডান দিকের গলিটা লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়ছে, দু' একটা ছিটকে এসে লাগছে প্রেসক্লাবের দেয়ালে। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, হৃদয় ভয়শূন্য হয়ে যাওয়ার পর ও অনুভব করে যে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। পেটের নাড়ি মোচড়াচ্ছে। পিপাসা পেয়েছে। একটা সিগারেট ভীষণ জরুরি এবং মঞ্জুলিকাকেও চাই। বুকের কাছে রেখে গভীর, গাঢ় চুমুতে ভরিয়ে দেওয়া মঞ্জুলিকা।

প্রদীপ্ত ভেবে দেখলো ওদের বিয়ের দু'বছর পেরিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কখনো কোনো কথা রাখা হয়নি, এমন ঘটনা ঘটেনি। মঞ্জুলিকার সঙ্গে মান-অভিমান হয়েছে, কিন্তু কথার বরখেলাপ নয়। এই মুহূর্তে ওর বুক ধড়ফড় করে ওঠে– আজ রাতে যদি মঞ্জুলিকা মা হয়ে যায় তাহলে কি ওর সঙ্গে কথা রাখা হবে না? ও যে বলে রেখেছিলো সন্তানের মুখ সবার আগে দেখবে? অন্ধকার ঘরে একা একা ওর ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। ও দুটো সোফা জোড়া লাগিয়ে শুয়ে থাকার চিন্তা করে ঘরের মাঝ বরাবর সোফাগুলো টেনে আনে। বাথরুমে গিয়ে ট্যাপের মুখে মুখ লাগিয়ে প্রাণভরে পানি খায়। শার্ট খুলে সোফার ওপর রেখে একটা পা উঠিয়েছে মাত্র তখুনি রাস্তা থেকে ট্যাঙ্কের শব্দ ভেসে আসে। ও ছুটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু আগেও প্রেসক্লাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে, সেটা তেমন ভয়াবহ ছিলো না। ও দেখতে পায় ট্যাঙ্কটি কমিশনার অফিসের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে ইউসিস ভবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। ট্যাঙ্কের নল প্রেসক্লাব ভবনের দিকে ঘোরানো। প্রদীপ্ত অস্থির হয়ে ওঠে। ঐ নল থেকে গোলা এসে উড়িয়ে দেবে কি এই ভবন? ঘরের দরজায় তালা, বেরিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ও বন্ধ দরজার গায়ে মুষ্ঠাঘাত করে, ভেঙে ফেলতে চায়। মৃত্যু কি? কেমন? কালো না সাদা? প্রাণ বেরিয়ে যাবার সময় খুব কি কষ্ট হয়? ওর কি কাঁদতে ইচ্ছে করছে? চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে? বাবা, বাবা, বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে? মা'কে কি অনেককাল দেখা হয়নি? মঞ্জুলিকা কি ওর জীবনের কোথাও নেই? ওহ্, বলে প্রদীপ্ত মাথা দরজার গায়ে ঠুকে দেয়। ভীষণ অবসন্ন বোধ করে। কয়েকজন সৈন্যকে ট্যাঙ্কের কাছে ছুটোছুটি করতে দেখেছে। ওরা

BanglaBook.org

আজ রাতে এখানে একটা কিছু ঘটাবে। এই ভবনে একটা কিছু ঘটবে।

ও ছুটে বাথরুমে যায়। বাথরুমের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করে। দরজা খুলতেই দেখতে পায় দেয়ালের ওপর কতগুলো ফেস্টুন দাঁড় করানো। সবগুলোর গায়ে কার্টুন আঁকা, কোনোটায় স্লোগান লেখা। পঁচিশ দিন যেন এই ফেস্টুনগুলোর মধ্যে বিমূর্ত হয়ে আছে। কত বিচিত্র ধরনের ইয়াহিয়ার কার্টুন– একজন মানুষকে নিয়ে যত ভাবে ব্যঙ্গ করা যায় তা করা হয়েছে। পেছনের সিঁড়িতে রেলিং নেই। দু'পা নেমে এটা টের পেয়ে ও আর নামে না। এই অন্ধকারে পা ফস্‌কে পড়ে যেতে পারে। ও আবার ঘরে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করে। কি মনে করে ও ফেস্টুনগুলো টেনে বাথরুমে ঢোকায়। ট্যাপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। ঐ সামান্য শব্দ বিশাল হয়ে বুকে বাধছে। ওর এখন প্রচণ্ড ইচ্ছে সোফার মধ্যে মুখ বুঁজে শুয়ে থাকা।

অন্ধকার হাতড়ে সোফার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে একটা গোলা এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। ইসপ্লিন্টার শরীরে আঘাত করলে ও ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ে যায়। পর পর তিনটে গোলা এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। ও দেয়ালের কোণে পড়ে আছে। বুঝতে পারছে না শরীরের কোথায় আঘাত লেগেছে। মাথা ওঠানো তো দূরের কথা– মাথা নড়াতেই পারছে না। ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়াল উড়ে গেছে। ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা– বাইরে থেকে সবকিছু দেখা যায়। পর পর তিনবার গোলা নিক্ষেপের পর স্তব্ধ হয়ে আছে ট্যাঙ্ক। ও বুঝতে পারে ওর গায়ের ওপর বাথরুমের দরজাটা কাত হয়ে পড়েছে এবং তার উপর কতগুলো ইট। ওর চোখের সামনে ট্যাঙ্কটা সবুজ থেকে হলুদ হয়– হলুদ থেকে কালো। ট্যাঙ্কটা একবার তিমি মাছ হয়, একবার কোলা ব্যাঙ। তারপর ওর আর কিছু মনে থাকে না। জ্ঞান হারাবার সময় ওর পৃথিবী একটা ট্যাঙ্ক হয়ে আর সবকিছু একদম মুছে দেয়। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে ও জানে না। জ্ঞান ফিরলে টের পায় সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। ইটের গুঁড়োয় লাল হয়ে গেছে শরীর। বাম পা ভারী হয়ে আছে, টেনে ওঠাতে কষ্ট হচ্ছে। রক্তও পড়ছে অনবরত। ও তাজা রক্তের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, যে পরিমাণ গোলাগুলি বষর্ণ হয়েছে তাতে কত অসংখ্য মানুষের রক্ত ঝরেছে এই শহরের বুকে? ও ডান হাতের তর্জনি দিয়ে মেঝেতে পড়া রক্তের ওপর আঁকিবুকি কাটে। তারপর উঠে বসে আড়িমুড়ি ভাঙে, শরীরটা মুচড়িয়ে দেখে কোথাও কোনো হাড় ভেঙেছে কি না। না, তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। পা ছাড়া তেমন আঘাত কোথাও লাগেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ওর ঝিম ভাব কেটে যায়। পরক্ষণে মনে হয় শেল বর্ষণ করেই কি ক্ষান্ত থাকবে জল্লাদরা? ভোর হলে হয়তো স্টেন দিয়ে ব্রাস করার জন্য ছুটে আসবে। খুঁজে দেখবে কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কি না। ভাবতেই ও আঘাতের কথা ভুলে যায়, শরীরের ভেতর নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়, গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কষ্ট হয় খানিকটা, তবু বাম পা টেনে টেনে বাথরুমে ঢুকে যায়। পেছনের দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে।

আলো ফুটেছে। ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা শার্টটা গায়ে দেয় ও। একবার ভাবে শার্টটা ফেলে দিয়ে গেঞ্জি পরে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের মতো মনে হবে। দেখতে পাচ্ছে প্যান্টটা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে– ইটের গুঁড়ো তখনো শরীর থেকে সব মুছে যায়নি। ওকে কি কিম্ভূতকিমাকার লাগছে? মনে হচ্ছে কি ও কোনো গেরিলা যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে? ও দ্রুত দু'হাত দিয়ে মাথার চুল, শরীরের অংশ থেকে ইটের গুঁড়ো মুছতে থাকে। আশেপাশে গোলাগুলি তখনো চলছে। নওয়াবপুরের ওদিকে কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, ঘন কালো, যেন মাটিশুদ্ধ পুড়িয়ে নিয়ে উঠছে। ওর শরীরে ক্রোধ বেড়ে উঠলে ও নিজের আঘাতের কথা ভুলে যায়। দেখতে পায় ক্লাবের উল্টো

BanglaBook.org

দিকের কোয়াটার থেকে খয়ের আসছে।

ও দৌড়ে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার কি হয়েছে? বেশি লেগেছে? চলেন ডাইনিং রুমে গিয়ে বসবেন। ডেটল আছে। আমি কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে দেবো?

রান্নাঘর থেকে একটা ন্যাকড়া এনে ডেটল দিয়ে ক্ষত মুছিয়ে দেবার পর স্বস্তি পায় প্রদীপ্ত। ততোক্ষণে খিদেটা আবার চড়চড়িয়ে বাড়ছে। খয়ের বলে, স্যার রাতে তো কিছু খাননি। ঘরে মুড়ি আছে আমি নিয়ে আসছি।

ও খয়েরকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমার জন্য একটা পুরনো লুঙি নিয়ে এসো। ছেঁড়া প্যান্ট দেখলে ওরা পথে আটকাবে। অন্যরকম সন্দেহ করবে।

খয়ের ঘাড় নাড়িয়ে চলে যায়। প্রদীপ্ত ঘড়ি দেখে। ও আর ফিরে আসছে না, পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। প্রদীপ্তর অস্থির লাগে। উৎকণ্ঠায় ওর বুক চেপে আসে। ও ডাইনিং রুমে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায় ক্লাবের পশ্চিম দিকে সৈন্যরা ঢুকেছে। প্রদীপ্ত বুঝে যায় যে খয়ের আর আসতে পারবে না– ও এখন ওদের হাতে জিম্মি। ওরা ওকে রাখতেও পারে, নাও পারে। এখানে এক মুহূর্ত থাকা নিরাপদ নয়, বেরুতে হবে। রাস্তায় কি হবে সেটা আর ভাবার সময় নেই। ডেটলের শিশিটা প্যান্টের পকেটে পুরে নিয়ে ও পা টেনে টেনে পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরের পাশে যায়। এখান থেকে পুকুরের পাশে সেক্রেটারিয়েটের দেয়াল ঘেঁষে যে গলিটা গেছে ওখানে পৌঁছতে পারলেই ও বড় রাস্তায় উঠবে। পুকুরের পাড়ে দশ-বারোটি ছোট ছোট ঘর আছে। বেশ কয়েকজন দোকানদার, রিকশাওয়ালা ওখানে থাকে। ও ওদের ওখানে পৌঁছতেই কয়েকজন ওকে ঘরে নিয়ে যায়।

সারারাত ক্লাবে ছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

দেখি, কেমন লেগেছে?

তেমন না। হাঁটতে পারবো।

কেমন করে যাবেন? রাস্তাতো একদম ফাঁকা।

আমাকে একটা লুঙি দেবেন?

একজনে একটা পুরনো লুঙি নিয়ে আসে। ও শার্ট খুলে ওদেরকে দিয়ে বলে, এটা আপনারা রেখে দিন।

লুঙিটা পরে ও বেশ আরাম পায়। শারীরিক এবং মানসিক স্বস্তি দুটোই।

এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন?

কেউ একজন একটা ছোট পাউরুটি দেয়। বলে, দোকানে ছিলো, খান।

প্রদীপ্ত লুফে নেয়। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, বাঁচালেন। এইটুকু খেলেই আমি অনেক পথ হাঁটতে পারবো। ভাবছি হেঁটে বাড়ি চলে যাবো।

ওরা যদি ধরে?

ধরলে আর কি করবো? বলবো দিনমজুর।

তাতে কি মাফ পাবেন?

প্রদীপ্ত চমকে লোকটির মুখের দিকে তাকায়। ও যত সহজভাবে কথা বলছে ব্যাপারটা যে অতো সহজ নয় এই সাধারণ লোকগুলো তা বুঝে গেছে। ও ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হয়। একজন বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলে, প্রেসক্লাবের ভেতর সৈন্যরা ঢুকে গেছে। এখানে থাকা কি নিরাপদ? যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে?

বুড়ো ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, এখন আর যাবো কোথায়? রাতভর তো এখানেই থাকলাম। ব্যাটাদের সহজে যেতে দেইনি।

BanglaBook.org

রাতে তো লুকিয়ে করেছেন? দিনের আলোয় কি করবেন?

দেখি কি করি।

উপস্থিত সবার একমত। কেউ এখান থেকে পালাবে না। প্রদীপ্তর বুকের ভেতর গুড়গুড় করে। বুঝে যায় যে মানুষ তৈরি– ওরা প্রতিরোধের জন্য তৈরি। ওরা কেউই পালাতে চায় না। তাহলে কি চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত একাত্তর বর্গমাইলে বিস্তৃত স্বাধীন-সার্বভৌম স্বদেশের পথ বেশি দূরে নয়? প্রদীপ্ত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।

কি হলো? খান?

যেভাবে দাঁড়িয়েছিলো সেভাবে আবার বসে পড়ে। পাউরুটিতে কামড় বসায়। তারপর ঢকঢকিয়ে দু'গ্লাস পানি খায়।

আপনার বাড়ি কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

মনে হলো ওদিকে খুব হয়েছে।

আগুনের শিখা উঠতে দেখেছি।

প্রদীপ্ত আনমনা হয়ে যায়। ওরা কি ভালো আছে? কি অবস্থা মঞ্জুলিকার? ও কি বাবা হতে পারবে?

আপনার বাড়িতে কে আছে?

বাবা, মা, স্ত্রী, ভাই।

ছেলেমেয়ে? বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

ছেলেমেয়ে? প্রদীপ্ত বুড়োর মুখের দিকে তাকায়– বুড়োর মুখটা একজন অজেয় মানুষের চিত্র। এইসব মানুষেরা নিরস্ত্র– লড়বে একটা আধুনিক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই লড়াকু মানুষের ভিড় এখন ওর চারপাশে।

আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

আমার স্ত্রী গর্ভবতী। জানি না কাল রাতে সে কোনো সন্তান প্রসব করেছে কি না।

সবার দৃষ্টি একযোগে প্রদীপ্তর মুখের ওপর পড়ে। ও উঠে দাঁড়ায়, আমাকে যেতে হবে।

বুড়ো বলে, আপনার চলে যাওয়াই উচিত। মিলিটারি আসতে পারে।

প্রদীপ্ত দরজা পেরিয়ে বাইরে নামে। একজন যুবক ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলে, ঘরে গিয়ে যদি দেখেন যে, আপনার ছেলে হয়েছে?

তাহলে ওর নাম রাখবো অজেয়।

যুবকটি অবাক হয়, অজেয়?

হ্যাঁ, অজেয়। যাকে জয় করা যায় না। আমার যদি মেয়ে হয় ওর নামও রাখবো অজেয়।

আপনার সঙ্গে কি আর কখনো দেখা হবে?

প্রদীপ্ত হেসে বলে, কে জানে, হতেও পারে।

ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা ভারী লাগছে, হাঁটতে কষ্টও হচ্ছে। ওর মনে হয় জুতো জোড়া খুলে রেখে যাওয়া উচিত। লুঙির সঙ্গে এই জুতো মানাচ্ছে না। ও পুকুরের ধারে বসে জুতো খোলে। তখন ও দেখতে পায় যুবকটি দৌড়ে ওর দিকে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, রাস্তায় যাবেন না। রেডিওতে ঘোষণা দিচ্ছে, কারফিউ দেয়া হয়েছে।

কারফিউ? আমার বাড়ি ফেরা হবে না?

BanglaBook.org

চলুন, আমাদের ঘরে থাকবেন। তাছাড়া আপনার পায়ে ক্ষত। এভাবে কতদূরই বা আপনি হেঁটে যাবেন?

প্রদীপ্ত ওর সঙ্গে ফিরে আসে। এইদিকটা এখনো নিরাপদ। মিলিটারি এদিকে আসেনি। ও পকেট থেকে ডেটল বের করলে ছেলেটি ন্যাকড়া ভিজিয়ে ক্ষতের জায়গা বেঁধে দেয়। বলে, এই চৌকিতে শুয়ে থাকুন। ঘুমালে শান্তি পাবেন। মিলিটারি এদিকে এলে আপনাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখবো।

ওর কণ্ঠস্বরে প্রদীপ্ত অভিভূত হয়। মনে হয় এই ছেলেটির সঙ্গে ল্যান্স নায়েক বাশারের খুব মিল আছে। বাশার কি বেঁচে আছে? চব্বিশ মার্চ ইপিআর-দের নিরস্ত্র করা হয়। এখন কি করছে ওরা?

প্রদীপ্তর চোখ ছলছল করছে। ও যুবকটির চৌকিতে শুয়ে থেকে স্বস্তি পায় না। যুবকটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পাহারা দিচ্ছে। প্রদীপ্ত উঠে বসে। পাশের টিপয়ের ওপরে রাখা ছোট রেডিওটি বাজছে। কিছুক্ষণ পরপর সামরিক আইন বিধি জারি করা হচ্ছে। ও রেডিওটা হাতে নিয়ে অন্য স্টেশন ধরার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে আকাশবাণী ধরা যায়– ওরা বলছে, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।

প্রদীপ্ত পায়ের ক্ষতের কথা ভুলে যায়। চেঁচিয়ে বলে, বিদ্রোহ?

যুবকটি ছুটে আসে। কি হয়েছে?

বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই বাশাররা মিলিটারির সঙ্গে লড়ছে।

বাশার কে?

বাশার আমার বন্ধু। ইপিআর-এ আছে।

আমারও নাম বাশার।

তুমিও আমার বন্ধু।

BanglaBook.org

রাতে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় প্রদীপ্ত সবাইকে ডেকে এনে বসায়। ওরা ইংরেজি বোঝে না, বারবার প্রশ্ন করে প্রদীপ্তকে। প্রদীপ্ত ওদের বাংলা করে দেয়, কিন্তু একটি বাক্য ও বাংলা করে না, যখন ইয়াহিয়া খান বলেন, Mujib is a traitor to the nation, this time he will not go unpunished. ও একা একাই ভাবে, কি হবে শাস্তি? মৃত্যুদণ্ড? ওই ভয়ে কাতর হলে তিনি তো ধরাই দিতেন না, পালাতেন। নিজের জীবনের জন্য মায়া থাকলে মানুষ কি জীবনের ঝুঁকি নেয়? রাজনীতির দীর্ঘ পথতো তিনি জীবনকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেই পেরিয়ে এলেন। ওর চারপাশে বসে থাকা লোকগুলোকে মুজিবের শাস্তির কথা বলতে পারলো না। ওরা এ কথা শুনলে মন খারাপ করবে, কাঁদবে।

তখন যুবকটি চেঁচিয়ে বললো, রেডিওতে এই লোকটির গলা শুনলে মনে হয় একটা বন্ধুক যদি পেতাম তাহলে ওর বুক ফুটা করে দিতাম। অস্ত্র কোথায় পাওয়া যায় বলেন তো?

অস্ত্রতো আমারও একটি চাই বাশার।

প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে, ইয়াহিয়া খান চেনে শুধু বঙ্গবন্ধুকে। তাঁকে শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছেন। তিনি তো আমাদের চেনেন না।

ঠিক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর পেছনে আমরা তো হাজার জন আছি। ওই বেটার সাধ্য কি বঙ্গবন্ধুর চুল ধরার।

সবাই বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। প্রদীপ্তর মনে হয়, ওই বুড়োই এখানে সবচেয়ে তরুণ।

সেদিন বিকেলের পর রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে খুব অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে প্রদীপ্তর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রেডিওটা কানের কাছে ধরে উঠে বসে ও, I, Major Zia, on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, declare independence of Bangladesh.

আর কিছু শুনতে পায় না প্রদীপ্ত, অস্পষ্ট হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। ও চিৎকার করে বের হয়, বাশার, বাশার? যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ।

তুমি না জিজ্ঞেস করেছিলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

এখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

কোথায়?

যুদ্ধক্ষেত্রে।

ওকে জড়িয়ে ধরে বাশার। সে রাতে চমৎকার ঘুম হয় ওর। নটার দিকে ঘুম ভাঙলে বাশার বলে, প্রদীপ্ত ভাই বাড়ি যাবেন না?

বাড়ি? মঞ্জুলিকার কথা মনে হয় প্রদীপ্তর। ও জানে প্রবল উৎকণ্ঠায় মঞ্জুলিকা যেমন ম্রিয়মাণ হয়েছে, তেমন অভিমানে ফুলছে। ওর অভিমান খুব– ঝগড়া করতে পারে না, চিৎকার করে না– কেঁদে ভাসায়। অল্প কান্নাতেই মঞ্জুলিকার চোখের পাতা ফুলে ওঠে। ঝগড়া করলে প্রদীপ্তরই কষ্ট হয় বেশি– মঞ্জুলিকার নীরব কান্নার যাতনা ওকে মরমে মারে। তখন ও হাসি-তামাশা করে অভিমান ভাঙায়। বলে, তোমাকে ঠিক বেড়ালের মতো লাগছে। এখন থেকে তুমি আমার মিনি। একবার মিঁউ করো, একবার– একবার– একবার।

দূর থেকে ভেসে আসে গুলির শব্দ। প্রদীপ্ত বাশারের মুখের দিকে তাকায়, বলে, যাই। অনেকেই বাইরে জড়ো হয়ে আছে। ওরা কি করবে এখনো সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। প্রদীপ্ত বুড়োকে বলে, যাই। ও দু'বার যাই বলার পরও কেউ কোনো কথা বলেনি। মাথা নাড়েনি। যেন বিদায় জানানোর কিছু নেই, এ যাত্রার বিদায় হয় না। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝে যায় যে, ওদের কিছু বলার নেই। ওরা আজ আর কিছু বলবে না। ও হাঁটতে থাকে। কার্জন হলের গেটটা খোলাই ছিলো। ও বাগান পেরিয়ে রাস্তায় আসে। মেডিক্যালের দিকে যাবার রাস্তা থেকে একটি ট্রাক এসে প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে ওর কাছাকাছি থামে। আর একটু হলে হয়তো চাপাই দিয়ে যেত। ও ধাতস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় মিলিটারির গাড়ি– কয়েকজন ডোম নিয়ে যাচ্ছে। বুলু দাস ওকে হাত ইশারায় ডাকে। কাছে যেতেই চেঁচিয়ে বলে, উঠে আয়।

ও দেখতে পায় একজন সিপাই ওর দিকে বন্দুক তাক করে আছে। কালো চক্‌চকে নলটার দিকে এক পলক তাকিয়ে ও দ্রুত ট্রাকে উঠে। ওর অন্যকিছু ভাবার অবস্থা এখন নয়। মুহূর্তে ওর মনে হয় সেই কৈশোরে বুলু দাস অহির প্রিয় মানুষ ছিলো। অহির সূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয়। পথেঘাটে অনেক দেখা হয়েছে। এখন বুলু দাসের বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়েছে। ওকে ট্রাকে ওঠালো কেন? বুলু দাস কি ওর প্রাণ বাঁচালো? বুলু দাসকেই বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এই জল্লাদরা? ও ট্রাকে উঠে বুলু দাসের গা ঘেঁষে বসে পড়ে। ওর হাতটা চেপে ধরে বুলু নিচু স্বরে বলে, আমি চাইনি যে তোর লাশটাও রাস্তা থেকে আমাকে তুলতে হোক। ওরা তো মানুষ মারছে না, ওরা পাখি শিকার করছে। তোর দিকেও নলটা তাক্ করেছিলো।

তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

লাশ কুড়াতে। লাশ কুড়িয়ে শহর পরিষ্কার করতে।

প্রদীপ্ত বুলু দাসের ঘোলা চোখের দিকে তাকায়– পিচুটিভরা চোখে দীপ্তি নেই, আগুনও

BanglaBook.org

নেই- তবু বুলু দাসের শরীরে ক্রোধ আছে, কণ্ঠে ক্রোধ প্রকাশ পায় এবং একই সঙ্গে বেদনাও। ওর সঙ্গে আরও পাঁচজন ডোম আছে। ওরা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, মুখে কথা নেই। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময় বুলু দাসের ডিউটি ছিলো মর্গে। শহীদের লাশ দেখে সে সময় থেকেই বুলু দাস ঘৃণা করতে শিখেছে- অন্যরকম মানুষ হয়েছে।

একসময় মুখ ফিরিয়ে বলে, আজ ভোররাতে পৌরসভার লোক গিয়ে ডাকাডাকি করে আমাকে ঘুম থেকে জাগায়। দু'দিন তো স্রেফ বসে থেকে কাটিয়েছি। আজ ভোরেই একটু ঘুম এসেছিলো। অফিসে আসতেই পৌরসভার কনসারভেন্সি অফিসার মি. ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে নির্দেশ দেয়। চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান সুর একটা শুয়োরের বাচ্চা। বলেছে, ঠিকমতো শহর পরিষ্কার না করলে আমাদেরকেও গুলি করে হত্যা করবে।

তোমার সঙ্গে থেকে আমি কি করবো বুলুদা? আমি তো লাশ তুলতে পারবো না?

পারতে হবে। নইলে তোকে ওরা মেরে ফেলবে। আমি সিপাইটাকে বলেছি তুই আমার আন্ডারে ডোমের কাজ করিস। পৌরসভা থেকে আসতে আসতে দেখলাম যাকে খুশি তার দিকেই ট্রিগার টিপে দিচ্ছে।

এ পর্যন্ত কোনো লাশ তুলেছো?

হ্যাঁ।

কোথায়?

আমাদেরকে মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগ আউটফলে ফেলতে বলা হয়। সকাল থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকি পোশাক পরা বিকৃত লাশ। সরকারি কর্মচারীও ছিলো অনেক। আমার নাড়িভুঁড়ি উপড়ে আসছিলো প্রদীপ্ত। মনে হচ্ছিলো অস্ত্র পেলে ওদেরকেও মেরে লাশ বানিয়ে ফেলি।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে ওদের শরীর দুলে ওঠে। দু'জনে দু'জনের হাত চেপে ধরে রাখে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি বুলুদা?

জানি না। যেখানে মানুষ পচে-গলে গন্ধ ছড়াচ্ছে সেখানে নিয়ে যাবে আমাদের।

বুলু দাসের কণ্ঠ বড় তিক্ত। নিশ্বাস ফেলে বলে, সাতাশ বছর ধরে ডোমের কাজ করছি। মানুষকে এমন অমানুষ হতে দেখিনি। ভগবান সইবে না রে।

শেষের বাক্যটা বুলু দাস বিড়বিড়িয়ে বলে। তখন গর্জে ওঠে সিপাইটার হাতের রাইফেল। ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো দু'জন। ওদের হাতের কাপড়ের পোটলাটা ছিটকে পড়ে গেলো দূরে। মানুষ দু'জন তড়পাচ্ছে।

দেখলি?

প্রদীপ্ত উঠতে গেলে বুলু দাস ওকে চেপে রাখে। ফিসফিসিয়ে বলে, এখন না পরে।

গাড়ি ততোক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বুলু দাস আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, এতদিনের চাকরির ওপর ঘেন্না হচ্ছে। বাপ মরে যাওয়ার পর মা অনেক ধরাধরি করে পৌরসভার চাকরিটায় আমাকে ঢুকিয়ে দেয়। তখন ভেবেছিলাম বেঁচে গেলাম। দু'মুঠো ভাত খেয়ে তো বেঁচে থাকবো। এখন আমার সাতাশ বছরের অন্ন বমি হয়ে উঠে যেতে চাইছে।

প্রদীপ্ত একজন ভিন্ন মানুষ বুলু দাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। এত কষ্টের মধ্যেও ওর আনন্দ হয়। কেন জানি ওর বুক খুশিতে ভরে ওঠে। ওর ভালো লাগছে- বাবার কথা মনে হচ্ছে- বাবা বলতেন, ওদের ছেড়ে দাও পুষ্পিতা। ওরা মানুষ হোক। মানুষ কখনো এভাবে গভীর অনুভবে শুধু মানুষ নয়, ভিন্ন মানুষ হয়- কেবলই শুধু আকারের, অবয়বের

BanglaBook.org

মানুষ হয়ে থাকে না। মুহূর্তে ওর বাবার জন্য বুক ভার হয়ে যায়– ও জানে ওর বাবা পায়চারি করে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরপর রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর উৎকণ্ঠার সময় এটিই তাঁর প্রিয় অভ্যেস।

জানিস জল্লাদরা ইকবাল হলের লাশগুলো পেট্রোল জ্বালিয়ে পুড়ে ফেলেছে। এরা না ধর্মের কথা বলে? ইসলামের কথা বলে? মুসলমানের লাশ কি কেউ পুড়িয়ে দেয়?

ওদের চোখে তো আমরা মুসলমান নই বুলুদা। আমরা কাফের।

কাফের? তোরা যদি কাফের হোস, তাহলে ওরাও কাফের।

বুলু দাস দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে। তারপর বলে, জগন্নাথ হল থেকে তুলেছি দশজন মানুষের ক্ষতবিক্ষত লাশ। বোঝা যায় যে, বস্তি থেকে ওরা ছুটে এসেছিলো এখানে আশ্রয়ের আশায়। ঢাকা হল থেকে চারশ' ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি।

বুলুদা থাক আর বলতে হবে না। আমি শুনতে পারছি না।

তখন গাড়িটা আচমকা ব্রেক করে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। ওরা দেখতে পায় সামনেই আর একটি লাশ-তোলা ট্রাক। ট্রাকে অনেকগুলো লাশ গাদা করে রাখা। গাড়ির ড্রাইভার আর সুইপার ইন্সপেক্টরকে মারছে পাক-সেনারা। বুলু দাস ফিসফিসিয়ে বলে– ও আমার বন্ধু পঞ্চম। পঞ্চমকে লাথ্থি মেরে সেপাই বলে, 'লাশ খোলা কেউ লে যাতা হায়, শূয়র কা বাচ্চা, বাহেনচোত, শালা হারামি, শালা তেরপল লাগালো।'

প্রদীপ্ত বুলু দাসের মুখের দিকে তাকায়, খোলা লাশে ওদের লজ্জা কীসের বুলুদা? বুলু দাস কথা বলে না। প্রদীপ্ত নিজেই ভাবে, আসলে লজ্জা নয়। ওদের ক্ষতিহানি হবে তাই এত উৎকণ্ঠা। পচা লাশ দূষিত করছে বাতাস, যে বাতাস ওরা বুকভরে টানবে। ট্রাক এসে শাখারি বাজারের মোড়ে থামে। ভেতরে আগুন জ্বলছে। আগুনের খানিকটা দূরে পাহারা দিচ্ছে একদল পাকসেনা। ওরা শাখারি বাজারের দিকে ঢুকতে চাইলে কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বাবুবাজার ফাঁড়ি দিয়ে ঢুকতে বলে। ট্রাক সেই পথে এগিয়ে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বুলু দাস বলে, চল।

বুলুদা আমি পারবো না।

পারতে হবে।

বুলু দাস চোখ লাল করে তাকায়। যেন প্রদীপ্ত ওর অধীনস্ত কর্মচারী। এখন থেকে বুলু দাসের হুকুম শুনতে বাধ্য। মন্দিরের ভেতর ঢুকে পাকসেনাদের আড়ালে গিয়ে বলে, তুই পারবি না আমি জানি। শুধু সঙ্গে থাক। দেখে যা। দু'চোখ মেলে রাখ।

মন্দিরের ভেতর থেকে দু'জন যুবকের লাশ ওঠায় ওরা। তারপর যেতে থাকে ঘরে ঘরে। ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে চারদিকে। প্রদীপ্তর মনে হয় লাশ এবং আগুনের মধ্য দিয়ে এই পদযাত্রা অনন্তের দিকে। ওর সামনে থেকে মুছে যায় শাখারি বাজার, তার ঘর-দোকান– মানুষ– মানুষের সংসার। শুধু জেগে থাকে লাশ– কেউ চিৎ হয়ে আছে, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ অঙ্গার, কেউ গলিত, পথের ওপর থেঁতলে আছে শিশুর মাথা– ছিটকে পড়েছে মগজ– মাথার খুলিতে গেঁথে রাখা হয়েছে পাকিস্তানের পতাকা। প্রদীপ্ত চমকায় না, ব্যাকুল হয় না– কষ্টও নেই ওর মধ্যে– ও নির্বিকার হেঁটে যেতে পারছে– ওদের লাশ তোলা দেখছে– পাকসেনারা যাতে সন্দেহ না করে সেজন্য কখনো বুলু দাসের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে– গন্ধে ওর নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে– বমি আসতে চায়– চাপা স্বরে ওয়াক করে শব্দ করে– বমি চাপতে চাপতে ওর চোখ লাল হয়ে যায়।

বুলু দাস বলে, পকেটে রুমাল নেই? নাক বেঁধে রাখ।

প্রদীপ্ত জামার পকেট থেকে রুমাল বের করে। মঞ্জুলিকা এক কোণায় ছোট্ট ফুল

BanglaBook.org

তুলেছে, তার নিচে লিখেছে পি ও এম– রুমালটা নাকে চেপে ধরলে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। আপন মনে বলে, মঞ্জুলিকা, প্রিয়তমা। এই আগুন ও মৃত্যুর মাঝে দিয়েছো কি জন্ম একটি অজেয় সন্তানের?

দুপুর গড়িয়ে গেছে। শাখারি বাজার থেকে লাশ তুলে ওরা ধলপুর ময়লার ডিপোতে ফেলতে যায়। বাতাসে ডুবে আছে অদৃশ্য ছবি, নিশ্বাস নেয়া যায় না– ফুসফুস পর্যন্ত দূষিত হয়ে ওঠে– বোঝা যায় তখন দৃশ্যমান জগতটা কত গলিত, পচা। যতটুকু পথ ও ঘুরে এলো, শিউলি কুড়ানোর মতো কুড়িয়ে এলো লাশ। খ্রিষ্টান মিশনারি অফিসের সামনে, সদরঘাট, বাস স্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাই স্কুল, জগন্নাথ কলেজ, পগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের সবখানে, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে, আদালত প্রাঙ্গণে– ওর শৈশবের শিউলির মতো সারারাত ঝরে মরেছে মানুষ। ওর মনে হয় যে জায়গা দেখা হয়নি, সে জায়গা আর দেখতে হবে না– ও বুঝে গেছে বাশার নেই, পুড়ে গেছে পিলখানা– পুড়ে গেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন– বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা– বেঁচে আছে কি বাবা? বুকের ভেতর আর্তনাদ ওঠে। ও দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। ও চোখের সামনে দেখতে পায় রেসকোর্সের সেই বিশাল জনসমুদ্র– সাতই মার্চের মানুষের সমুদ্র– যে সমুদ্রের প্রবল ঢেউ হয়ে গর্জে উঠেছিলো একজন মানুষের কণ্ঠস্বর– 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো রক্ত দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' প্রদীপ্তর মনে হয় রক্ত দেওয়া কি যথেষ্ট হয়নি? আর কত রক্ত দিতে হবে? বিড়বিড়িয়ে বলে, ঢাকা এখন একটি লাশের শহর। এ শহরের কাকগুলো একসঙ্গে এত গলিত, বীভৎস, ফুলে ওঠা কিংবা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া লাশ দেখেনি। শহরজুড়ে অসংখ্য মানুষ মুখ থুবড়ে কিংবা চিৎপাত শুয়ে আছে। বুড়িগঙ্গা নদীতেও ভেসে যাচ্ছে মানুষ, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা কিংবা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া। থেঁতলে গেছে শরীর– বেরিয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড– চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে মাথা– ভেঙে গেছে শরীরের জোড়াগুলো– পা ধরে আছড়িয়ে মারা হয়েছে শিশুদের– যুবতী মেয়েদের অবস্থা আরো বীভৎস, বর্ণনার অতীত।

লাশের স্তূপ থেকে চোখ ফেরায় প্রদীপ্ত। ঝকঝকে রোদ্দুরে দিন। নীল আকাশ। কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। শুধু ঢাকা এখন লাশের শহর। তখন ও দেখতে পায় খানিকটা দূরে বসে বমি করছে বুলু দাস। প্রদীপ্ত চোখ ফিরিয়ে রাখে। আর কত দেখতে হবে? বুলু দাস কাছে এসে বলে, আমি আর পারছি না। শরীর খারাপ লাগছে। জ্বরও এসেছে।

তাই তো গা যে পুড়ে যাচ্ছে। চলো তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

চলো বললেই কি আর যাওয়া হবে?

তখুনি নির্দেশ হলো বুড়িগঙ্গা নদী থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগে ফেলতে হবে। পাকসেনারা কুলি দিয়ে সেখানে আগেই গর্ত করে রেখেছে। ওরা যখন নদীর ধারে পৌঁছে দেখতে পায় আর একদল ডোম নদী থেকে লাশ টেনে টেনে পাড়ে জড়ো করেছে। পানিতে ফুলে আছে লাশ– ধরলে পচা মাংসে ঢুকে যায় হাত। খানিকটা দূরে নদীর পাড়ে তাজা রক্তের ধারা। সদরঘাট টার্মিনাল শেডের মধ্যে জমাট রক্ত চাক বেঁধে আছে। আশেপাশের দু' একজন ফিসফিসিয়ে জানালো, পঁচিশের রাতে এই টার্মিনাল ওদের জল্লাদখানা ছিলো। বুলু দাসের শরীর নেতিয়ে এসেছে। ভেজা লাশ টানার ফলে জ্বর আরো বেড়েছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, পা টলছে। প্রদীপ্তর ভয় হয়, বুলু দাস কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে?

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত বুঝতে পারে যে, মানুষ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে– দলে দলে লোক নদী পার হয়ে যাবার জন্য পাড়ে ভিড় করেছে– নৌকা খোঁজাখুজি করছে।

BanglaBook.org

মাঝিরাও পারাপারে ব্যস্ত।

ধাম করে পিঠের ওপর রাইফেলের বাড়ি পড়লে ও ফিরে তাকায়। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সেপাইটা বলে, কাম কিঁউ নেই করতা?

ও ছিটকে ওঠে। টনটন করে মেরুদণ্ড। মুহূর্তে কেমন বেকুবের মতো লাশের পা ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে। বুলু দাস ঘটনাটা দেখেছে। ছুটে এসে বলে, রাখ আমি দেখছি।

সেপাইটা ততোক্ষণে অন্যদিকে চলে গেছে। বুলু দাস সরাসরি বলে, নদী পেরিয়ে চলে যা।

কোথায়?

প্রদীপ্ত মার খেয়ে বেকুবই থাকে। বুলু দাস ঝাঁঝিয়ে বলে, বুঝিস না কোথায়? যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে। দেখিসনি যুবক ছেলেদের লাশ কত টেনেছি।

প্রদীপ্ত নৌকায় বসে থাকা সন্ত্রস্ত মানুষের পলায়ন দেখে। ওর মাথার মধ্যে ঘূর্ণি ওঠে। ওকে তো যেতেই হবে। এটাই তো সময়। শিউলির মতো ঝরে-যাওয়া মানুষের গন্ধ বুকে নিয়ে ওর তো ঘরে ফেরা উচিত নয়।

বুলু দাস ওকে ধাক্কা দেয়, ভাবছিস কী! বাড়ির কথা ভাবতে হবে না। তোর বাড়িতে আমি খবর পৌঁছে দেবো।

কি বলবে বাবাকে?

বলবো, বাবু আপনার ছেলে যুদ্ধ করতে গেছে।

আহ্, বুলুদা! তুমি দারুণ মানুষ।

ও বুলু দাসের শরীরের আড়ালে সেপাইদের অলক্ষ্যে একদল লোকের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে ওঠে। আপাতত জিঞ্জিরায় পৌঁছতে পারলে হয়, তারপর পথ খুঁজে নেবে। তখন পড়ন্ত বিকেল– সূর্যের লাল আলোয় ঘোলা জল বিবর্ণ দেখায়। নৌকা মাঝ নদীতে পৌঁছলে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে কেঁপে ওঠে এলাকা। নৌকা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে দু'চারজন মানুষ। প্রদীপ্ত নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে– কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে গুলি– অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে আছে ও। এমন শান্ত-নিস্তব্ধ পরিবেশে গুলি চালানোর মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি, তবু ওরা গুলি চালিয়েছে। যারা নদীতে পড়ে গেছে– ভেসে যাচ্ছে যাদের লাশ, তাদের প্রিয়জনের কান্না ওর কানে ঢোকে না। ও সবার মুখের দিকে তাকায়– প্রত্যেকে ভীত। ওদের ফ্যাকাসে চেহারা থেকে জীবনের ছায়া ঝরে গেছে– ওরা এখন বেঁচে থেকেও মৃত। ক্রোধ নয়, প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা নয়– এক দার্শনিক মগ্নতায় প্রদীপ্ত নিজেকে তৈরি করে। মাঝি দ্রুত নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে– ভেসে যাওয়া লাশগুলো আর দেখা যাচ্ছে না, হয়তো তলিয়ে গেছে– আবার ভেসে উঠবে অন্য কোথাও গিয়ে। স্বামীহারা একজন নারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তার সঙ্গে আছে দুটি ছেলেমেয়ে। যুবক ছেলেটি জোরে কাঁদতে পারছে না– ঘন ঘন চোখ মুছছে– মাকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। মা যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়! অন্যপাশে একজন বৃদ্ধ, তার বৌ গুলি খেয়ে এইমাত্র পড়ে গেলো নদীতে, সঙ্গে যুবতী মেয়ে আছে। ও বাবার হাত জড়িয়ে ধরে রেখেছে। আর একজন মানুষ পড়েছে– তার জন্য কেউ মাতম করছে না– ও হয়তো প্রদীপ্তর মতো একা ছিলো– হয়তো ঘরে ওর মঞ্জুলিকার মতো বৌ আছে, যার গর্ভে সন্তান।

এক সময় যুবক ছেলেটি মাকে সোজা করিয়ে বসিয়ে দিয়ে প্রদীপ্তর দিকে তাকায়। বলে, আমি কায়সার। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনি সাংবাদিক প্রদীপ্ত আহমেদ।

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

আপনি কোথায় যাবেন?

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। এই ছেলেটিকে ও কি বলে দেবে ওর গন্তব্যের কথা? নাকি অপেক্ষা করবে? যুবকটির কথায় নৌকায় এই মুহূর্তে আর কান্না নেই। সবাই উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকে ওর গন্তব্য জানতে চায়। এই শব্দহীন স্তব্ধতায় প্রদীপ্ত নিজের মেরুদণ্ডে রাইফেলের আঘাত অনুভব করে, পায়ের ক্ষত এখনো শুকোয়নি।

কায়সার বলতে থাকে, আমার নানার বাড়ি কলাতিয়া গ্রাম। মাকে ওখানে রেখে আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

প্রদীপ্ত সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। নৌকায় যাত্রীরা শোক ভুলে গেছে। দু'জনের মুখের ওপর থেকে ওদের দৃষ্টি সরে না।

একজন প্রশ্ন করে, কোথায় যাবেন?

প্রদীপ্ত কঠিন গলায় বলে, যুদ্ধ করতে।

নৌকায় যাত্রীরা নড়েচড়ে বসে। পানিতে ছপছপিয়ে ওঠে মাঝির দাঁড়। যে প্রশ্ন করেছিলো সে বলে, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাবো। যে বৃদ্ধ একটু আগে বৌ হারিয়েছে সে বলে, আমার দরজা তোমাদের জন্য খোলা। তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন আমার সাধ্যমতো দেবো।

কায়সারের মা প্রদীপ্তকে টেনে নিয়ে কপালে চুমু দেয়। বলে, আমরা সবাই তোমাদের পেছনেই থাকবো। আমি জানবো, আমার ছেলে ওর বাবার লাশটা খুঁজতে গেছে।

নৌকা এসে পাড়ে থামে। সবাই নামে। একে অপরকে সাহায্য করে নামতে। শেষ বিকেল। মরা আলো ছড়িয়ে আছে নদী, মাঠ, ক্ষেত, গাছের ওপর। ওরা হাঁটতে থাকে। ওপারে এখনো মিলিটারি আসেনি। এপারে কারো বুকে শঙ্কা নেই, কেউ সন্ত্রস্ত নয়। প্রদীপ্ত যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে তাকায়। নিজেকেই বলে, বাড়ি আর ফেরা হলো না। তোমার ওপর রেখে যাচ্ছি কঠিন দায়িত্ব। জানি শিশুর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় মা– তুমি আমাদের অজেয় সন্তানটিকে আগলে রেখো।

প্রিয়তমা মঞ্জুলিকা আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

১০

দুপুর খেলছে শহরজুড়ে– লাফাচ্ছে রাস্তায়, গাছের মাথায়, দালানের ছাদে– চারদিকে ঝকঝকে রোদ। এসব দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছে প্রতীক। আসলে ও কিছু দেখছে না– দেখতে পাচ্ছে না, সব দৃশ্য ওর মনের ভেতর। ও শহরের রাস্তা, গাছ এবং দালানকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করছে– যে পরিকল্পনা নক্শার মতো ফুটে উঠছে ওর মগজে। প্রতীক বুঝতে পারে ভেতরের দৃশ্যের সঙ্গে বাইরের দৃশ্য মিলছে না। কেননা ভুতুড়ে হয়ে আছে শহরটা। শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারেনি– অঙ্গে প্রচণ্ড ঘা, প্রবল ব্যথা।

প্রতীক বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে নীলক্ষেত আসে। রিকশা নির্বিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ঢুকে যায়। কেউ বাধা দেয়নি। কেউ জিজ্ঞাসাবাদের

জন্য থামায়নি। নিজস্ব বাসস্থানে ফিরে আসার আনন্দে ও উদ্বেল হয়ে উঠলে ওর ভেতরের অনেককিছু নড়েচড়ে যায়। কেমন আছে বাবা, মা? মঞ্জুলিকা এবং অজেয়? বাড়িতে গিয়ে পাবো তো? নাকি ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি? প্রতীক ভাড়া চুকিয়ে দেবার সময় নিজেকে শক্ত করে। আশেপাশে কেউ নেই পরিচিত কিংবা অপরিচিত। ঘাড় উঁচু করে উপর দিকে তাকালে দেখতে পায় অন্যান্য ফ্ল্যাটের জানালাগুলো বন্ধ– একতলাতেও কেউ আছে বলে মনে হয় না। শুধু ওদের চারতলার ফ্ল্যাটের একটি জানালা খোলা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রতীক আবার নিজেকে শক্ত করে। অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ফলে দু'বার হোঁচট খায়– রেলিং ধরে সামলে নেয় নিজেকে। তিন মাস আগেও এই সিঁড়ি দিয়ে হাজারবার ওঠানামা করেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনভ্যস্ত, অপরিচিতি পথ, যেন এখানে ও আগে কখনো আসেনি।

সিঁড়ির মাথায় উঠে ও আবার নিজেকে শক্ত করে। তারপর খুব মৃদুভাবে দরজায় টোকা দেয়। বেশ খানিকক্ষণ কেটে যায়। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ও আবার টোকা দেয়, আবার। এরপর খানিকটা জোরে। তখন ভেতর থেকে ওর বাবার মোটা কণ্ঠ ভেসে আসে, কে?

বাবার কণ্ঠ শুনে ওর বুক হালকা হয়ে যায়। আবার খানিকটা দ্বিধা নিয়ে উচ্চারিত হয়, কে?

বাবা খোলো, আমি জিতু।

জিতু, জিতু এসেছে।

মা'র উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ও দরজার এপারে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়। তখন ওর বাবা দরজার একটা পাল্লা খোলে। ও হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে, কেমন আছো মা?

ভালো। তুই কেমন ছিলি বাবা?

ভালো। ও বাবার দিকে তাকায়। আলী আহমদ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বুঝতে পারে, ছেলের শরীর থেকে মেদ ঝরেছে। ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। বাবার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হলে ও জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি ভালো আছো তো?

আমার শরীর ভালো নেই।

ও চোখ নামিয়ে বলে, একটি পরিবারের দুটি ছেলেই না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেলে তাদের বাবা-মার শরীর তো ভালো থাকবেই না।

ও সহজ কণ্ঠে কথা বলে, সময় এবং সম্পর্কের ফাঁকটুকু উড়িয়ে দিতে চায়– বলতে চায় পরিবারের তরুণ ছেলেরা অনুপস্থিত থাকলে কারো কিছু করার নেই, বিশেষ করে একটি যুদ্ধকালীন সময়ে– যখন সাধারণ মানুষের বুকের ভেতর এক ধরনের ভয় এবং আশঙ্কার সঙ্গে দৃঢ়তার প্রত্যয় জন্মায়।

তুই চা খাবি জিতু?

হ্যাঁ মা। ভাবী কই?

বাথরুমে। হ্যাঁ রে দীপুর কোনো খোঁজ পেয়েছিস?

পেয়েছি।

পেয়েছিস?

দু'জনের কণ্ঠ একই লয়ে নড়ে ওঠে– একই উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কায়।

আমি তো ভয়ে তোকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না?

ভাইয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি মা। লোক মারফত খবর পেয়েছি। তোমার আর বাবার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। একটু পরে দিচ্ছি।

BanglaBook.org

ঠিক আছে তুই বিশ্রাম নে। বলতে বলতে আলী আহমদ পড়ার ঘরে চলে যায়।

প্রতীক মঞ্জুলিকার ঘরে আসে। অজেয় দোলনায় ঘুমুচ্ছে। মঞ্জুলিকা নেই। ও দোলনা ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেটি অবিকল মঞ্জুলিকার আদল পেয়েছে। কত হলো ওর বয়স? দু'মাস আঠারোদিন। মনে মনে হাসে প্রতীক, এইতো পঁচিশের রাতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ভেতর ও কেমন চিৎকার করতে করতে হাজির হলো। কেমন করে বুঝবে ও এ দেশের যুদ্ধের সময়কে? পারবে কি ঠিকঠাকভাবে জানতে?

মঞ্জুলিকা বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে ওকে দেখে হকচকিয়ে যায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, তুমি? তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকে।

ভাবী, তোমার জন্য খবর আছে।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মঞ্জুলিকা।

আহ ভাবী, কেঁদে কী হবে। এই দেখো চিঠি।

প্রতীক জুতো খুলে সুখতলি উঠিয়ে তার ভেতর থেকে ছোট্ট চিঠিটি বের করে।

নাও। দেখো কি লিখেছে।

মঞ্জুলিকা আঁচলে চোখ মুছে হাসে। বারবার পড়েও মন ভরে না। ও চিঠিটা পড়তেই থাকে।

'আমি যেখানে আছি সেখানে পুরাদমে ট্রেনিং চলছে। এটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির। এখানে গেরিলা আর কমান্ডো ট্রেনিং দেয়া হয়। সমতল ভূমি থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে আমাদের অবস্থান। টিনের ছাউনি আর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি ব্যারাকে থাকি। ব্যারাকের সামনে পিটি গ্রাউন্ড। প্রতিদিন পিটি করতে হয়। হাতিয়ার খোলা আর জোড়া দেয়ার কাজ দিয়ে ট্রেনিং শুরু হয়েছে। সামনে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে। একটুও ভেবো না যে লঙ্গরখানায় খেতে বসে বাড়িতে মায়ের রান্নার কথা মনে হয়। এখানে এসে অনেক ধারণা বদলে গেছে। নিষ্ঠুর বাস্তবটাই একমাত্র সত্য। তাই সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। মেজর অনন্ত সিং বলেছেন, আমরা শুধু সাহায্য করবো। তোমাদের যুদ্ধ তোমাদেরই করতে হবে। এটা ভাবলে সামনে থেকে সব অন্ধকার মুছে যায়। যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার দেখতে চাই এবং সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করি। বাচ্চাটির জন্য মন খারাপ নেই, জানি ওর জন্য তুমি আছো।'

কি পড়া যে শেষই হয় না দেখছি? আর তো তোমার দুঃখ নেই ভাবী?

দুঃখ? মঞ্জুলিকার হাসি ফুরিয়ে যায়। ম্লানকণ্ঠে বলে, ও ফিরবে তো জিতু?

প্রতীক বাচ্চার দোলনাটা জোরে দুলিয়ে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে রাস্তা দেখে। মঞ্জুলিকা ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না যে?

যুদ্ধ থেকে কে ফিরবে, কে ফিরবে না এটা আমরা কেউই বলতে পারবো না ভাবী। আমরা শুধু প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষা করতে পারি।

শুধু অপেক্ষা? কতদিন অপেক্ষা?

প্রতীক মাথা নাড়ে, জানি না। তারপর পায়চারি করে এসে দোলনা ধরে অজেয়র মুখের ওপর ঝুঁকে থেকে বলে, না ঠিক বলিনি আমি। অপেক্ষা ততোদিন করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আমরা জয়ী হতে পারি।

যদি আমরা সাফল্য লাভ করতে না পারি?

তাহলে আমরা সবাই মিলে মরবো।

না। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মঞ্জুলিকা। আমার অজেয় মরবে না। ওকে আমি মরতে দেবো না। প্রতীক হেসে বলে, সেজন্যই আমাদের জয়ী হতে হবে। এজন্যই

BanglaBook.org

তোমাকে শক্ত হতে হবে ভাবী।

প্রতীকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলে, আমাকে শক্ত হতে হবে?

বলতে বলতেই ওর দু'চোখে জল ছাপিয়ে ওঠে, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। ও তো জানে যুদ্ধ কত কিছু দাবি করে– ও তো জানে স্বাধীনতা অল্প মূল্যে হয় না– ও তো জানে প্রিয়জনের জন্য অপেক্ষার শেষ থাকে। প্রতীক ওকে কিছু খোলাখুলি না বললেও ও সব বুঝতে পারে।

চিঠিটা বালিশের নিচে রেখে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ে মঞ্জুলিকা। প্রতীক কি বলবে বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ডাইনিং টেবিলে আলী আহমদ একা বসেছিলো। পুষ্পিতা তখনো রান্নাঘরে। প্রতীকের জন্য সুজির হালুয়া আর চা বানানো হয়েছে। প্রতীক টেবিলে বাবার মুখোমুখি বসতে বসতে বলে, তুমি কি কিছু ভাবছো বাবা?

আলী আহমদ ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে, মেয়েটাকে কাঁদিয়ে এলি তো? এমনিতে ওর বাবা-মা-ভাইবোনের চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে থাকে। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কোনো খবর পাচ্ছি না।

আমি কিছু না বললেও ভাবী কাঁদতো। তবু তো আমি ভাইয়ার একটি খবর নিয়ে এসেছি। এতদিন তো বেঁচে আছে কি না এটুকুও তোমরা জানতে না বাবা। আমার মনে হয় ভাবীর বাবা-মা বোধহয় ভারতে চলে গেছে।

আলী আহমদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা হতে পারে। আমাদের সান্ত্বনা যে দীপু বেঁচে আছে। ট্রেনিং নিচ্ছে। যুদ্ধ করবে।

সান্ত্বনা নয় বাবা, বলো গৌরব।

আলী আহমদ এবং পুষ্পিতা চমকিত হয়ে প্রতীকের মুখের দিকে তাকায়– ওর দৃষ্টি দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। ও হালুয়ার বাটির ওপর মুখ নামিয়েছে। চামচে করে মুখে পুরছে, অল্পক্ষণে তিন চার চামচ খেয়ে ফেলে। ও সরাসরি বাবা-মার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। ও জানে যত সহজে ও গৌরবের ভাগিদার হতে চাইলো আসলে তো অতো সহজে হওয়া যায় না। সন্তানকে যুদ্ধে পাঠানো কি ভীষণ কঠিন কাজ। প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া এ পরিবারের মানুষগুলোর আর কিইবা অবশিষ্ট থাকলো? এরা কি পারবে ভীষণ শক্ত হতে? পারবে কি গেরিলা যুদ্ধের যোদ্ধা হতে– সাহসে, সহানুভূতিতে, যত্নে, সহযোগিতায় প্রত্যেক গেরিলার জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে? কে জানে হয়তো আরো বড় কিছু ঘটিয়ে ফেলবে এরা– এমন কোনো অসাধারণ ঘটনা, যে ঘটনার জন্য গৌরবের ভাগিদার হবে এই পরিবারের সবচেয়ে ছোট শিশুটি, এখন থেকে আরো পঞ্চাশ বছর পরে কিংবা তারও বেশি সময় ধরে?

কি রে এমন মুখ নিচু করে খাচ্ছিস কেন? গলায় বেধে যাবে তো?

মা, পানি দাও।

পুষ্পিতা ওর দিকে পানির গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলে, তোর কি হয়েছে বল তো?

আলী আহমদ সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, তোকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?

প্রতীক জোর করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, সময়টা অন্যরকম তো তাই এমন মনে হচ্ছে তোমাদের। তাছাড়া বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে দু'মাস খোঁজ না থাকলে বাবা-মার মনে নানারকম আশঙ্কা থাকে বাবা। একটা কঠিন সময়কে আমরা তো এভাবেই দেখছি।

তুই বেশ দার্শনিক হয়েছিস জিতু। আলী আহমদ নিজের অস্বস্তি তাড়াবার চেষ্টা করে।

যাই বৌমাকে ডেকে আনি। পুষ্পিতা উঠে চলে যায়।

BanglaBook.org

অকস্মাৎ এক ভীষণ ভয় আঁকড়ে ধরে প্রতীককে– ও একা একা বাবার মুখোমুখি হতে চায় না। বাবা অন্য এক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে– বাবা ওকে বুঝতে চাইছে, কিন্তু ও চায় না যে বাবা ওকে বুঝুক এবং যুদ্ধের এই কঠিন সময় বাবার জন্য আরো কঠিন হয়ে উঠুক। তখন সেই গভীর কষ্ট ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে ওঠে। বলে, তুই আমাকে কিছু লুকোচ্ছিস জিতু?

ও ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, মিথ্যে বলা এই মুহূর্তে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ও জবাব দেবার আগেই পুষ্পিতা মঞ্জুলিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। চেয়ারে বসিয়ে দেয়। হালুয়া তুলে দেয় পিরিচে।

আমি খাবো না মা।

এটুকু খাও।

খেতে ইচ্ছে করছে না।

আলী আহমদও একই কথা বলে, না খেলে চলবে কেন? ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে না?

কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়েছে মঞ্জুলিকা। প্রতীকের মনে হয় মঞ্জুলিকাকে গ্রেনেডের পিন খোলা শেখালে কেমন হয়? আচমকা ঠাস করে উড়িয়ে দেবে শত্রুর মাথা।

তখন ও খানিকটা চেঁচিয়ে বলে, ভাবী এই পরিবারের আমরা সবাই একটা বড় গৌরবের ভাগিদার। তুমি এমন করে কাঁদছো কেন? খবরদার কাঁদবে না। ওর ধমকে বিব্রত হয় মঞ্জুলিকা। হকচকিয়ে যায় আলী আহমদ এবং পুষ্পিতা।

প্রতীক একই ভঙ্গিতে বলে, সেই পঁচিশের রাত থেকে শুরু করে কত মানুষ তো জান-মাল কতকিছু হারিয়েছে। আমাদের তো কিছুই হয়নি। আমরা কেন এমন ভয়ে-আশঙ্কায় চুপসে গেছি?

অজেয় কেঁদে উঠলে মঞ্জুলিকা উঠে চলে যায়। কেউ কোনো কথা বলছে না। ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। পুষ্পিতা লাইট জ্বালে। আলী আহমদের মনে হয় ঘরে প্রতীকের কণ্ঠ ছাড়া আর কিছু নেই, যে কণ্ঠ জোরালো, তেজী এবং যে কণ্ঠ উড়িয়ে দিতে চাইছে সব আশঙ্কা ও ভয়– বলছে সামনে তাকিয়ে দেখো, যেতে হবে দীর্ঘ পথ, যা আগুনের, বুলেটের, রক্তের এবং মৃত্যুর– পথে কোনো গাছ নেই, যে গাছের ছায়ায় দু'দণ্ড জিরোনো যাবে– কোনো ঝর্ণা নেই, যে ঝর্ণার শীতল জল তৃষ্ণা মেটাবে– কোনো কুটির নেই যেখানে আশ্রয় জুটবে। এই পথে যেতে হবে আমাদের, তোমরা প্রস্তুত তো।

আলী আহমদ বিড়বিড়িয়ে বলে, হ্যাঁ প্রস্তুত। আমরা সবাই প্রস্তুত। আমাদের পায়ে রক্ত ঝরুক ক্ষতি নেই– আমাদের শরীর ক্লান্ত হোক ক্ষতি নেই– আমাদের বুক শুকিয়ে থাকুক, ক্ষতি নেই। আমরা এই পথেই যাবো।

প্রতীক জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কিছু ভাবছো বাবা?

দীপু কোন ফ্রন্টে যুদ্ধ করবে?

জানি না।

পুষ্পিতা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, তুই কোথায় ছিলি সেটা জানিস তো?

প্রতীক হাসে। বলে, মা আমার সঙ্গে ফান করছে বাবা?

আলী আহমদও গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তুই কোথা থেকে ফিরলি তা আমিও জানতে চাই। দেশে ছিলি না ভারতে গিয়েছিলি?

ভারতে গিয়েছিলাম। আমি মেলাঘরে ছিলাম।

পুষ্পিতার কৌতূহলী কণ্ঠ বেজে ওঠে, ওখানে কি করেছিস বাবা?

BanglaBook.org

ট্রেনিং নিয়েছি।

ট্রেনিং? বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় দু'জনের কণ্ঠ, খানিকটা আর্তনাদও ধ্বনিত হয়। কি ট্রেনিং নিয়েছিস?

মা ওর মাথায় হাত বোলায়। ও চুপ করে থাকে। গলার কাছে কান্নার মতো একটা দলা জমে থাকে। কান্না তো বস্তু নয়, তবু কেন স্তব্ধ হয়ে গেছে কণ্ঠ, কেন স্বর আটকে রেখেছে? ও মাথা নিচু করে। আলী আহমদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তুই বোধহয় আমাদের বিশ্বাস করতে পারছিস না জিতু?

আকস্মিক এই আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে ও আমতা আমতা করে বলে, তা ঠিক নয় বাবা।

তাহলে? দু'জনে উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও টেবিলের ওপর তর্জনীর আঁকিবুকি কেটে বলে, আমি গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য ট্রেনিং নিয়েছি। আমাদের ছয়জনের একটি দল পাঠানো হয়েছে ঢাকায়।

পুষ্পিতা ওর কব্জী চেপে ধরে। প্রতীক মায়ের হাতের ওপর হাত রেখে বলে, ভয় পেয়ো না মা। পুষ্পিতা কাঁদো কাঁদো মুখে আলী আহমদের দিকে তাকায়, ওগো ওকে নিষেধ করো। আলী আহমদ চুপ করে থাকে।

তুমি ওকে কিছু বলবে না?

ওকে ছেড়ে দাও পুষ্পিতা।

ছেড়ে দেবো? না, কখ্খোনো না।

প্রতীকের কণ্ঠ হিসহিস করে ওঠে, মা'র দিকে ঝুঁকে বলে, এ কঠিন সময়ে আমাদের মতো ছেলেদের ছেড়েই দিতে হয় মা। তোমাকে শক্ত হতে হবে। আমার কথা যেন অন্য কেউ না জানে।

আলী আহমদ হাত বাড়িয়ে পুষ্পিতার হাতটা টেনে নেয়। নিজের হাতে ধরে রাখে। প্রতীক উঠে নিজের ঘরে চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে পুষ্পিতা ভাঙা কণ্ঠে বলে, ও এত কঠিন হলো কি করে?

আলী আহমদ বলে, ও যেটাকে কঠিন সময় বলছে, আমার মনে হয় এটাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

পুষ্পিতা চোখ বড় করে, শ্রেষ্ঠ সময়? যদি আমরা বেঁচে না থাকি?

তাতে কি হয়েছে কেউ না কেউ তো থাকবে।

পুষ্পিতা আর কথা বলে না। ও যাবার জন্য ওঠে দাঁড়ায়। আলী আহমদ বলে, ফ্রিজে কি আছে দেখো তো? জিতুর জন্য তো ভালোমন্দ কিছু রান্না করতে হয়।

যাই দেখি। ওটাই আমার যুদ্ধক্ষেত্র। পুষ্পিতা এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যে আলী আহমদ না হেসে পারে না। অনেকক্ষণ পর ওর বুকের ভেতর থেকে কিছু একটা নেমে যায়। ও লঘু মনে পড়ার ঘরে ঢোকে।

অনেক রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রতীক। এখান থেকে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িটা দেখা যায়। রাস্তাটা পশ্চিমে এবং পুবে টানা, প্রতীকের প্রিয় রাস্তা। কতদিন গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে ও চুপচাপ এ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে– দেখতে চেয়েছে চন্দ্রালোকে জনশূন্য রাস্তায় মানুষের ছায়া কেমন দেখায়। ও ভারি মজা পেতো। এখন এই রাস্তাটাকে ভয় পায় ও। দিনে মিলিটারি কনভয় চলে যায় কিংবা অস্ত্র হাতে লরি ভর্তি সেনা ঘুরে বেড়ায়– পঁচিশের রাতে এ রাস্তায় ট্যাঙ্ক এসেছিলো। তারও আগে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছিলো ভারী যানবাহনের চলাচল। উনসত্তরের গণআন্দোলনের

BanglaBook.org

সময় এ রাস্তায় মিছিল উত্তাল হয়ে উঠতো– মিছিল ফুরোত না। ক্যান্টনমেন্টে মিছিল পৌঁছলে লেজটা থাকত এখানে– মানুষের সংখ্যার কোনো হিসেব ছিলো না সে সময়। এখন এই রাস্তা মৃতপ্রায়। এই গভীর রাতে আরো নৃশংস এবং ভয়াবহ মনে হচ্ছে। ও ইচ্ছা করলেই চন্দ্রালোকে এই রাস্তায় নিজের ছায়া দেখতে যেতে পারে না। এখন ওকে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে– নইলে ও ঐ রাস্তার কোনো গাছের আড়ালে গ্রেনেড হাতে লুকিয়ে থাকতে পারে মিলিটারির কোনো গাড়ি উড়িয়ে দেয়ার জন্য। রাস্তাটা ওর সামনে এখন এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। মাঝে মাঝে ওর বন্ধু রুমী ওকে বলতো, তোর যে কেন এমন শখ বুঝি না। চাঁদের আলোয় ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা ভারি মজা। আসলে তুই একটা পাগল। তারপর হা-হা করে হেসে বলতো, না পাগল না, তুই হয়তো কবি হবি। ও কখনো রুমীকে বলতে পারেনি যে, চন্দ্রালোকে নিজের ছায়া দেখা যার অভ্যেস, সে এ শহরটাকে ভালোবাসে। কারণ রাস্তায় ছায়া দেখা মানে শহরের রাস্তাকে আয়না ভেবে নিজের মুখ আবিষ্কার করে চমকে ওঠা। এ মুখ হয়তো অন্য কারো মুখ হতে পারে, মৃত অথবা জীবিত সে মানুষ। নিজেকে বুঝতে চাইলে কখনো অন্যের ভেতর অনুপ্রবেশ দরকার– নিজের সবটুকু বিছিয়ে ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার– যা নেই তা সংগ্রহ করে ভরিয়ে ফেলা কী যে জরুরি, তা ও উপলব্ধি করে ভীষণভাবে।

রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় জিপ। মিলিটারি জিপ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। মনে হয় ওর সামনের পুরো রাস্তাটা মেলাঘরের ট্রেনিং ক্যাম্প। রাস্তাজুড়ে বিছিয়ে আছে খালেদ মোশাররফের ছায়া– ভীষণ জীবন্ত, প্রাণবন্ত– কঠোর এবং সাহসী। ও অনুভব করে নিজের ভেতর অন্যের অস্তিত্ব, যার ভেতর রয়েছে কঠোর এবং সাহসী হওয়ার উপাদান। এই মুহূর্তে যার ছায়া ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে সে ওর আপন। এভাবেই ভরে যায় ফাঁক।

রাজপথে আলো ফেলে চলে যায় আর একটি গাড়ি। আজ ভীষণ নিশ্চুপ নীলক্ষেত ফাঁড়ি। কেন, ও তা বুঝতে পারে না। ওপাশের বাবুপুরা বস্তিতে সাড়াশব্দ নেই– পঁচিশের রাতে ওটা পুড়িয়ে দেবার পর আবার দু'চারটা ঘর উঠছে। মানুষ যাবে কোথায়? ধ্বংসের মধ্যেও মানুষ আবার আশ্রয় খোঁজে। আসলে ও শব্দ চাচ্ছে– কোনো ঘণ্টাধ্বনি কিংবা মানুষের কণ্ঠস্বর। তা না হলেও কোনো আর্তনাদ, চিৎকার, গোঙানি কিংবা একই সমান্তরালে প্রতিশোধের শপথ নিয়ে উন্মুক্ত জিহ্বার উচ্চারণ। কিন্তু শব্দ তো ওর বুকের ভেতর– শব্দ ওকে অতীতে নিয়ে যায়। স্মৃতি রোমন্থন করায়; শব্দ ওকে ভবিষ্যতে নিয়ে যায়– নীল নকশার আঁকাবাঁকা পথে ঘোরার; শব্দ ওকে বর্তমানে ধরে রাখে– বাস্তবের খোয়া ওঠা পথটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, সে পথে ওকে যেতেই হবে।

ও শুনতে পায় খালেদ মোশাররফের কণ্ঠ। বলছেন, 'এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এর জন্য দরকার রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলা বাহিনী। ঢাকায় ফিরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। যারা আসতে চায়, মুক্তিযুদ্ধ করতে চায়, তাদের এখানে পাঠাতে থাকো।'

সত্যি কি এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে? কতকালের যুদ্ধ হবে? পেরিয়ে যাবে কি এক প্রজন্মের আয়ুষ্কাল? রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলা বাহিনী? যুদ্ধ দু'জায়গায়, সীমান্তে এবং শহরের ভেতরে। আতঙ্কিত করে রাখতে হবে দখলদার বাহিনীকে, বোঝাতে হবে তোমাদের অন্যায় দখলের মাশুল দিতে হবে জীবন দিয়ে।

ট্রেনিং ক্যাম্প সরগরম হয়ে উঠেছে তরুণ ছেলেদের আনাগোনায়। সবাই ট্রেনিং নিতে চায়, সবাই যুদ্ধ করতে চায়। ওদের সেক্টরের কমান্ডার পাগলের মতো খুঁজছেন

BanglaBook.org

ছেলেদের। বলছেন, 'ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য আমার প্রচুর ছেলে দরকার। যত পারো সরাসরি ছেলে রিক্রুট করে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই যুদ্ধ আমাদের জাতীয় যুদ্ধ। দল-মত নির্বিশেষে যারাই দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসবে, তাদের সবাইকে আমি সমানভাবে গ্রহণ করবো।'

নিজের ভেতর চাঞ্চল্য অনুভব করে প্রতীক। কাল সকালে ওকে চলে যেতে হবে এ বাসা ছেড়ে। ও জানে না আর কখনো এখানে জীবিত ফিরে আসতে পারবে কি না– জানে না বাবা-মার লাশ ফিরে এসে পাবে কি না– জানে না আর্মি ওকে খুঁজতে এসে ওর বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে কি না। প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চিতের– প্রতিটি মুহূর্ত আশঙ্কার। মঞ্জুলিকা এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখে, ঘুমুবে না?

তুমি ঘুমোওনি ভাবী?

আমার ঘুম আসছে না। চলো, ঘরে চলো।

দু'জনে ঘরে ফিরে ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি বসে। মঞ্জুলিকা বলে, তোমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

চা খাওয়াবে ভাবী?

বুঝেছি কিছুই বলবে না। ঠিক আছে চা-ই খাও। কিন্তু কাল যাবার আগে বলে যাবে তো? নাকি ফাঁকি দিয়ে পালাবে?

কেন, পালাবো কেন?

আমি জানি তুমি থাকতে আসোনি। থাকতে এলে রাত জেগে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না।

মঞ্জুলিকা চুলোয় কেতলি চাপায়। প্রতীকও রান্না ঘরে ঢোকে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। মঞ্জুলিকাকে চায়ের পাতা এগিয়ে দেয়।

দু'মাসে তুমি অনেক বদলে গেছো জিতু।

স্বাভাবিক। দু'মাস আমাদের জন্য কোনো স্বাভাবিক সময় ছিলো না। পুরো পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য আমাদের খাটতে হচ্ছে।

তুমি তো একবারও বন্যার কথা জানতে চাইলে না?

শব্দ করে হাসে প্রতীক। জবাব দেয় না। দু'জনে চা নিয়ে আবার টেবিলে আসে।

কি কথা বলছো না যে?

প্রতীক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঢাকা শহরে ঢোকার পর ওর কথা ভীষণ মনে হচ্ছিলো। সোজা ওদের বাসায় গিয়েছি কাল। পাশের বাসার খোকন বললো ওরা গ্রামে চলে গেছে। কবে ফিরবে ওরা কেউ জানে না। তারপর খানিকটা বিষণ্ন স্বরে খোকন বললো, মতিউর চাচা বলেছে এখানে নাও ফিরতে পারে। ওরা হয়তো ইন্ডিয়া চলে যাবে।

তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, লাগছে। সারাক্ষণই মন খচ্‌খচ্‌ করে। ভাইয়ার যেমন খোঁজ পেয়েছি, বন্যার তেমন কোনো খবর পেলে আর খারাপ লাগতো না। আমি মনের আনন্দে কাজ করতে পারতাম।

প্রতীক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এক চুমুকে অনেকখানি চা খায়। মঞ্জুলিকা কাপের গায়ে টুংটাং শব্দ করে বলে, তোমার ভাইয়া লিখেছে সে এখন মন খারাপের বাইরে। তুমি কি এখন বন্যাকে খুঁজবে?

বন্যাকে খুঁজবো? পাগল নাকি? সে সময় কোথায়?

তোমার এখন কি কাজ জিতু?

এই শহরটাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা।

BanglaBook.org

মানে?

আর একদিন বলবো। শুধু জেনে রাখো কখনো বোমা ফাটার শব্দে যদি চমকে ওঠো তাহলে বুঝবে হয়তো আমি কোথাও আছি। তুমি ঘুমুতে যাও ভাবী।

ঘুম কি আসবে?

আসবে, আসবে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়বে তুমি টেরই পাবে না।

প্রতীক হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। চায়ে শেষ চুমুক দেয়।

তুমি অনেক বদলে গেছো জিতু।

এটা যে যুদ্ধের সময় ভাবী। যুদ্ধ মানুষকে ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারবো না যে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে।

মঞ্জুলিকা যেতে যেতে বলে, ছেলেটা না থাকলে আমার যে কি হতো!

জীবন এমনই ভাবী। একটা কিছু বিকল্প হয়েই যায়।

মঞ্জুলিকা থমকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে প্রতীককে দেখে। জিজ্ঞেস করে, এখন থেকে তো তুমি ঢাকায়ই থাকবে?

হ্যাঁ, ঢাকাতেই তো থাকবো, আর কোথায় যাবো?

হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে যায় প্রতীক। মঞ্জুলিকা ওর কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না। ভয় ওকে জাপটে রাখে। ভয় থেকে ও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। এই আশঙ্কার অস্বস্তি নিয়ে মঞ্জুলিকার এখনকার দিনরাত।

নিজের ঘরে এসে প্রতীকও বিছানায় যেতে পারে না। পায়চারি করে। কতকাল ধরে এই পরিচিত ঘরটায় ও ঘুমোচ্ছে– কখনো ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। গুলেই ঘুম এসেছে। ওরা দু'ভাই যখন এক বিছানায় ঘুমোতো তখন মাঝে মাঝে প্রদীপ্ত রেগে গিয়ে ওকে ধাক্কা দিতো। বলতো, ওকে যদি খাট থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই, তবু ওর ঘুম ভাঙবে না। ওকে যদি ছেলেধরা চুরি করে নিয়ে যায়, তবুও কিছুই জানতে পারবে না।

আজ ওর জীবনে এক ব্যতিক্রমী রাত– ঘুম আসছে না। বন্যা এই শহরে নেই– এটা এমন প্রবল সত্য হয়ে উঠেছে যে ও এই বিষণ্ণতা কাটাতে পারছে না। মেলাঘরে ট্রেনিং নেবার সময় ওর মধ্যে এই ধরনের বিষণ্ণতা ছিলো না– সে অন্য জগৎ, প্রতিজ্ঞা এবং শপথের জগৎ– যুদ্ধে বিজয়ী হবার আকাঙ্ক্ষার জগৎ। পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে ও, যোদ্ধা ছেলেদের বিষণ্ণতা শোভা পায় না, ওর এমন নির্ঘুম রাত কাটানো উচিত নয়। শুয়ে পড়া উচিত। কাল ওর অনেক কাজ। কাজের কথা ভাবতেই ও কিছুটা আশ্বস্ত হয়। মেলাঘরে ওদের ট্রেনিং দিতেন ক্যাপ্টেন হায়দার। দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসতেন। জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন, কী প্রচণ্ড উদ্দীপনা থাকত তাঁর কথায়। বুকের তলদেশ পর্যন্ত কেঁপে উঠতো। এখন এই একলা ঘরে দাঁড়িয়ে সেই জ্বালাময়ী কথাগুলো নিজের ভেতর অনুভব করে প্রতীক। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লে ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে– ঘুম ওর খুব দরকার।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় আলী আহমদের। ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে ওলোটপালোট করে, কিন্তু পড়া হয় না। প্রতীকের ফিরে আসা এবং প্রদীপ্তর খবর– দুটোই তাকে বিমূঢ় করে রেখেছে। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছে এবং কিছু করার নেই ভেবেও এক ধরনের অসহায় বোধ তাকে ক্লান্ত করে রাখে। আলী আহমদ নিজের ভেতর জোর খুঁজে পায় না। প্রতীকের ঘুম ভেঙে গেলে ও বাবার কাছে এসে বসে। আলী আহমদ ওকে দেখে হেসে বলে, খুব গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিস মনে হয়।

হ্যাঁ, বাবা, দারুণ লাগছে। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বাঁচা গেলো। আমি ভাবলাম মাথায় এতকিছু নিয়ে তোর বোধহয় ঘুমই হবে না।

বাবা ঢাকার খবর বলো?

মতিউর ফ্যামিলি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে।

বাবা শহরের খবর কি?

পাক বাহিনী কতটা এগোলো জানতে চাইছিস?

প্রতীক চুপ করে থাকে। দু'হাতে মাথার চুল সোজা করে। আলী আহমদ গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বলে, দশদিন ধরে বিশ্বব্যাংক মিশন ঢাকায় অবস্থান করছে। জাতিসংঘের হাই কমিশনার ফর রিফিউজিজ প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানও ঢাকায়। কারণ ইয়াহিয়া সরকার বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘকে বোঝাতে পারছে না যে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা কেবল কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ মাত্র। এদেরকে দমন করার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। এই সরকার ওদেরকে আরো বোঝাতে পারছে না যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজে প্রাদেশিক সরকারকে সহযোগিতা দিচ্ছে।

এটুকু বলে আলী আহমদ থামে। প্রতীক উদগ্রীব হয়ে শুনছিলো। আলী আহমদ থামতেই বলে, বাবা আমাকে সবটুকু বুঝিয়ে বলো। আমার পুরো পরিস্থিতি জানা দরকার।

আসলে কি জানিস আমাদের রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজগুলো গলা উঁচিয়ে চিৎকার করার পরও পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিতে পারছে না। মে-জুন মাসের কিস্তি তিন কোটি ডলার শোধ দেয়া এখন সম্ভব নয় বলে পাকিস্তান কনসর্টিয়ামের কাছে ছয় মাস সময় চেয়ে আবেদন করেছিলো। এসব বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য বিশ্বব্যাংকের এইড-টু পাকিস্তান কনসর্টিয়ামের চেয়ারম্যান পিটার কারগিল একদল সহকর্মীসহ এখন ঢাকায়।

আলী আহমদ থেমে থেমে ঘটনাগুলো বলে যায়, যেন সবকিছু তার নখদর্পণে– আর এসব নিয়েই তার এখনকার দিনযাপন। প্রতীককে সব বুঝিয়ে দিলে ও জেনে যাবে কোন পথে এগুতে হবে, কি ওদের করণীয়। এখনই তো সময় একটা কিছু করার; শ্রেষ্ঠ সময়ের সাহসী সন্তান হওয়ার।

বাবা, আর কারা আসছে ঢাকায়?

আলী আহমদ আপন মনেই বলতে থাকে, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যে সাহায্য দেয়া হবে তা জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। পাকিস্তান সরকার তাতে রাজি নয়। সরকার বিবৃতি দিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যেসব প্রকৃত পাকিস্তানি, বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতকারীদের ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মুখে পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়ে সীমান্তের অপর পারে চলে গেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করবে। এ কারণে গত সপ্তাহে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অভ্যর্থনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব বিষয় দেখার জন্য এসেছেন প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান। এঁরা সবাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছেন।

এটুকু বলেই আলী আহমদ সরাসরি প্রতীকের দিকে তাকায়, তুই নিশ্চয় জানিস যে ওরা এখানে আছে?

জানি। অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় এটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য আমরা একটি দল শহরে ঢুকেছি।

আলী আহমদ আবার চোখ বোঁজে। আর কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু জিজ্ঞেস করে, আমার কি করতে হবে?

BanglaBook.org

তৈরি থেকো। ঘরে খাবার, ফার্স্ট এইড বক্স, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি সবসময় রাখবে। ছেলেদের যত্ন করবে, কিন্তু কখনোই কারো কাছে আমার কথা জানতে চেয়ো না কিংবা কোনো অপারেশনের কথাও। তোমার কাছে ওরা আসবে। তোমাকে আমাদের ভীষণ দরকার বাবা।

আলী আহমদ প্রতীকের মাথায় হাত রাখে। প্রতীক অভিভূত হয়– ও বুঝতে পারে ওর ভেতর সাহস এবং শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে– ও বাবার হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে বলে, আমার মাথার ওপর তোমার হাতের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার ল্যান্সনায়েক বাশারের কথা মনে হচ্ছে বাবা।

আলী আহমদ সোজা হয়ে বসে।

পঁচিশের রাতে হত্যা করা হয় বাশারকে। বাবা তুমি কি আমার কথা শুনছো? প্রতীক আলী আহমদের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

যে ঘটনা আমি জানি, তুই কেন আমাকে তা আবার শোনালি জিতু?

আমার মনে হলো এসব কথা বলতে হবে বারবার। নিজের জন্য এবং অন্যের জন্যও।

নিজের জন্য কেন?

যেন ভুল না করি, যেন পিছিয়ে না পড়ি।

আলী আহমদ মৃদু হাসে।

হাসলে যে বাবা?

মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে।

প্রতীক নিঃশব্দে উঠে যায়। বাথরুমে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে ভাবে, বাবার সঙ্গে কি একটু বেশি কথা বলা হলো? বাবা ওকে ছেলেমানুষ ভেবে কি হাসলেন? বাবাকে তো বোঝানোর কিছু নেই। বাবা অনেক বেশি জানেন, বিশ্লেষণ করতে পারেন। বাবাকে– নাহ্ ওর লজ্জাই লাগছে। আসলে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলে বোধহয় মুরুব্বী, মুরুব্বী ভাব জন্মায়– অন্যকে উপদেশ দিতে ইচ্ছে করে, নিজের অজান্তে বাবাকে এটাই দেখিয়ে ফেলেছে ও। এবং সেজন্যই বাবা হেসেছেন। ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মুখে পানি দেয়। ঘরে ঢুকে দ্রুত তৈরি হয়ে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলাচল শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার গেটের সামনে দাঁড়ায় ও, এক মুহূর্ত চিন্তা করে। কব্জী উল্টিয়ে ঘড়ি দেখে। দশটায় ওদের জড়ো হতে হবে। প্রথমে ও রুমীর ওখানে যাবে, ওখানে বাদল আর স্বপন আসবে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ওদের ছয়জনের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া সরকার বিদেশী সাংবাদিক ও সাহায্যদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্মানে হোটেল ইন্টারকনে ডিনারের আয়োজন করেছে। এ সময়টিকে ওরা উপযুক্ত সময় মনে করেছে।

রুমীর এ্যালিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে ওরা ছ'জন দুপুরের খাবার শেষ করেছে। ঘরের চারদিকের পর্দা টেনে ঘরটা অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। জুন মাসের ভ্যাপসা গরম, তারওপর সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। ফ্যানের বাতাস খুব একটা কাজে আসছে না। প্রতীক ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর থুতনি মেঝেতে ঠেকানো।

রুমী ওকে খোঁচা দেয়, কি ভাবছিস প্রতীক?

ভাবছি যুদ্ধ এবং মানুষের সম্পর্ক।

BanglaBook.org

ও বাবা, ফিলোসফি, কবিতা নয়।

ওর কবিতা তো চন্দ্রালোকে মানুষের ছায়ায়। স্বপন ফোড়ন কাটে।

দেখ, তোরা আমাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করবি না। আমার মনে হয় যুদ্ধের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এক করতে না পারলে কিন্তু আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না।

যুদ্ধ নয়, গেরিলা যুদ্ধ। মায়া মাথা তুলে বলে, মনে রাখিস সেক্টর কমান্ডার কি বলেছেন? তিনি বলেছিলেন শহরে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। শত্রুকে শুধু জানিয়ে দাও যে, তোমরা আছো। কাউবয় এ্যাডভেঞ্চার গেরিলা যুদ্ধ নয়। গেরিলা যুদ্ধ বীরত্ব দেখাবার জন্যও নয়।

মায়া থামলে প্রতীক যোগ করে, গেরিলারা মিশে থাকবে সাধারণ মানুষের ছায়ায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই গর্জে উঠবে ওদের অস্ত্র, রচিত হবে একটি সাফল্যের ইতিহাস।

ব্রেভো। রুমী হাততালি দেয়। প্রতীকটা আসলেই একটা জিনিয়াস।

বাদল গম্ভীর কণ্ঠে বলে, হৈ-চৈ নয়। যথেষ্ট হয়েছে। সেক্টর কমান্ডারের কথাগুলো আমাদের প্রত্যেকের প্রতিমুহূর্তে মনে রাখতে হবে। আমরা যেন কোথাও কোনো বাড়াবাড়ি না করি। আমাদের শত্রু চারপাশে, পায়ের নিচে, মাথার ওপরে। এটা সম্মুখ যুদ্ধ নয় যে লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যাবো। মনে রাখতে হবে আমার এতদিনকার পরিচিত মানুষটিও আমার শত্রু হয়ে যেতে পারে।

রুমী মাথা নাড়ে, ঠিক। সব বাঙালি এ যুদ্ধের সমর্থক নয়। এদের অনেককেই আমরা চিনেও চিনি না। মুখোশ আঁটা শত্রু বুঝে ওঠা মুশকিল।

এখন আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেরিয়ে পড়া উচিত।

অকস্মাৎ ঘরে প্রচণ্ড নীরবতা নেমে আসে, যেন প্রস্তুতির কালই এমন– মগ্ন হয়ে যেতে হয় নিজের ভেতর, মুছে ফেলতে হয় চারপাশের কোলাহল। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে এ্যাসট্রেতে গুঁজে দেয় রুমী। প্রতীক উঠে বসেছে। কেডসের ফিতা বাঁধছে। স্বপন বাথরুমে ঢোকে। বাদল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরে গেছে গাল। এক মুহূর্ত ভাবে, শেভ করা কি দরকার ছিলো? এখন সময় কোথায়? কিন্তু এমন চেহারা না রাখাই ভালো, সেটা নিয়ে লোকে মন্তব্য করবে, হয়তো বলবে, ছেলেটিকে দেখলেই বোঝা যায়–। না, থাক এত কিছু ভেবে লাভ নেই। ও চুল আঁচড়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়।

এর দশ মিনিট পরে বের হয় প্রতীক। গলির মাথায় দাঁড়ায়। রিকশা ডাকে। ঠিক করে রিকশা নিয়ে শাহবাগ পর্যন্ত গিয়ে তারপর স্কুটার নেবে। ওদের সবাইকে পাঁচটার মধ্যে গুলশান পার্কের কাছে জড়ো হতে হবে। ওখান থেকে একটি গাড়ি সংগ্রহ করবে। একে দুয়ে হাজির হয় সবাই। যেন কেউ কাউকে চেনে না। রাস্তার এপাশে ওপাশে ইতস্তত অবস্থান এক একজনের। বাদল সতর্ক ও তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখছে– ওর নেতৃত্বে একটি গাড়ি হাইজ্যাক হবে। প্রতীক পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ঝালমুড়িওয়ালার সঙ্গে গল্প করছে। মুড়ি খাচ্ছে। পার্কে তেমন লোকজন নেই। এবং তখনই একজন ড্রাইভার পার্কের পাশে গাড়িটি রেখে সামনে এগিয়ে পেশাব করতে দাঁড়ায়। বাদল দৌড়ে আসে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে। রুমী আর প্রতীক ড্রাইভারকে জাপটে ধরে। ওর পেশাব করা শেষ হয়নি। ও আঁতকে ওঠে, কেয়া কর রাহা?

ওরা ওর মুখ চেপে ধরে, চাবি নিকালো শালা।

ওকে দিতে হয় না। গাড়ির চাবি ওর হাতেই ছিলো, রুমী থাবা দিয়ে নিয়ে দৌড় দেয়। বাদল গাড়ি স্টার্ট দেয়। তখনো ড্রাইভারের সঙ্গে জাপটাজাপটি করছে প্রতীক। গাড়ি স্টার্ট হতেই ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গাড়িতে ওঠে।

BanglaBook.org

নিরিবিলি রাস্তা। দু'চারটে গাড়ি যা চলছিলো তারা খেয়াল করেনি। ড্রাইভারের চেঁচামেচি শুনে লোক জড়ো হবার আগেই ওরা মহাখালির রাস্তায় উঠে যায়। পেছন দিকে খেয়াল করে দেখলো কোনো গাড়ি ওদের ফলো করছে না। সবার বুকের ভেতর স্বস্তির নিশ্বাস। সিদ্ধেশ্বরী পৌঁছতে ওদের সাতটা বাজে।

গলিতে অন্ধকার। ডাস্টবিন থেকে পচা গন্ধ আসছে। পাশেই শুয়ে আছে একটি নেড়ি কুকুর। প্রতীকের মনে হয় আকাশে জ্যোৎস্না আছে কি নেই তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এক অদৃশ্য ছায়া লেপ্টে যাচ্ছে মাটিতে– ওরা হাঁটলে এ শহরের বুকে ছায়া জন্মায়– ছায়া ফসিল হয়ে যায়। ওরা শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে এগোয় যেন। গলির শেষ মাথায় যে বাড়িটা, ওদের ওখানে যেতে হবে। ওখান থেকে আটটি গ্রেনেড সংগ্রহ করতে হবে। বাদল গাড়িতে বসে আছে– ও আর রুমী যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতি পায়ে, বুকের ভেতর সাহস এবং আশার মাখামাখি– একটাই লক্ষ্য, সাফল্য অর্জন এবং ধরা পড়া চলবে না।

গ্রেনেড সংগ্রহ করে ওরা ইন্টারকনের সামনে আসে। বড় বড় গাছের আড়ালে গাড়ি রাখে। ঝটপট নেমে যায় তিনজনে। দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কার পার্কে বিশ্বব্যাংকের একটি গাড়ি রাখা আছে। একটি গ্রেনেড ছোঁড়া হয় গাড়ির ওপর, অন্যটি মূল গেটের এক পাশে, আর একটি অপর পাশে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যায় গ্রেনেড। চিৎকার, ছুটোছুটির ফাঁকে ওরা পালিয়ে আসে। রমনা থানার গলি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে মগবাজারের দিকে চলে আসে। সামনেই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাসা। সে বাসায় মিটিং হচ্ছে। ওরা সে বাসায় তিনটি গ্রেনেড ছুঁড়ে সাঁই করে বেরিয়ে যায়।

পরিকল্পনামাফিক গাড়ি ছুটছে। লক্ষ্য দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকার অফিস। এবার মতিঝিল। গেটের সামনে পাহারা দিচ্ছে পাঞ্জাবি দারোয়ান ও মিলিশিয়া জওয়ান। কিন্তু গ্রেনেড ছোঁড়ার সময় জামার আস্তিন আটকে যায় গাড়ির দরজার লকে। ঠিক জায়গায় পড়ে না সেটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মন খারাপ হয়ে যায় প্রতীকের। কিন্তু দাঁড়াবার উপায় নেই। গাড়ি ছুটছে। এদিক-ওদিক ঘুরে ওরা পুরানা পল্টনের ভেতর ঢুকে পড়ে। একটি কানা গলিতে গাড়িটা রেখে যে যার পথে যাবার জন্য হাঁটতে থাকে।

আবার একটি গলিতে ওদের ছয়জনের ছোট দল হেঁটে আসছে– ওদের ছায়া বিছিয়ে থাকে মাটিতে। শহরে গ্রেনেড ফুটেছে– পঁচিশের রাতের পর এই প্রথম– শত্রুর নাকের ডগায় ঘুরে বেড়ায় দুঃসাহসী যুবকেরা। স্বাধীনতাকামী মানুষেরা আশ্চর্য হয়– খুঁজে ফেরে কোথায় সেই সোনার ছেলেরা? কেমন করে ওদের মাঝেই লুকিয়ে আছে ছায়া হয়ে? ছোট দল গলির মাথায় আসে। যে যার পথে চলে যায়। এই যাওয়াটা শেষ হয় না– শেষ হবে না– ছায়াগুলো আটকে থাকবে মাটির বুকে।

প্রতীক একটা রিকশা নেয়। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে, লোক চলাচল নেই বললেই চলে। যে দু'চারটি গাড়ি রাস্তায় ছিলো সেগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। প্রতীকের মনে হয় আজ রাতে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে মায়েদের বুক– আজ রাতে ঘুমহীন থাকবে বাবাদের চোখ। বোন আঁকড়ে ধরবে বড় ভাইকে। বলবে, যেখানেই যাও আমাকে বলে যেও। যেন বুঝতে পারি বোমা ফেলেছো তুমি, যেন বুঝতে পারি জীবন দিয়েছো তুমি। আর প্রেমিকা গভীর চোখ তুলে শাসন করবে প্রেমিককে। বলবে, যা কিছু করো আমাকে সাথে নিয়ে করবে, আমি যেন তোমার সাহস এবং বীরত্বের ভাগিদার হতে পারি। আমি তোমাকে নিয়ে শুধু গর্ব করতে চাই না। চাই গৌরবের অংশ। আহ্ বন্যা! ভীষণভাবে বন্যার কথা মনে হয়। দু'জনে একসঙ্গে ঊনসত্তরের মিছিলে যেত। প্রতীক চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে এলোমেলো করে দেয় পুরো মাথা। যেদিন ঢাকা শহরে আগুন দিয়েছিলো মানুষ– পুড়ছিলো শহরের বিভিন্ন

BanglaBook.org

জায়গা, প্রতীকের মনে হয়েছিলো নদীর মতো গড়াচ্ছিলো আগুন, সেদিন আর্ট কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ও দেখেছিলো বন্যার ভালোবাসার দৃষ্টি, সেদিনই প্রথম।

এর আগে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে ও বন্যাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

ও বলেছিলো, একটুও না।

প্রতীক বলেছিলো, এখন যদি মিছিলে গুলি হয়?

হবে।

ভয় করবে না?

না।

সেদিন বন্যার কণ্ঠে না শুনে চমকে উঠেছিলো ও। ঐ সময়টা কি এমনই হয়ে উঠেছিলো যে, মানুষের কাছে বাঁচা-মরা সহজ হয়ে গিয়েছিলো? তারও পরে বন্যার চোখে ভালোবাসার ঝিলিক দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো ও। দেখেছিলো বন্যার দু'চোখের কালো মণিজুড়ে এক আগুনের মহাসাগর, সে মহাসাগরের তল থেকে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠে আসছে ঢাকা শহর, পটভূমিতে সবুজ-শ্যামল পূর্ববাংলা।

পূর্ববাংলার কথা মনে হতেই ওর বাবার কথা মনে হয়। বাবা ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ। আজ শহরে গ্রেনেড ছোঁড়ার গৌরবের জন্য বাবা উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে– বাবা হয়তো মুহূর্তের জন্য রিফিউজি হওয়ার গ্লানি মুছে ফেলবে। মনে মনে বলবে, স্বাধীন স্বদেশ আমার, আমি তোমারই মানুষ, কোথাও থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসিনি– আমি তোমাকে অর্জন করেছি, তুমি আমার অস্তিত্ব। প্রতীক বিড়বিড়িয়ে বলে, বাবা আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার স্বাধীন দেশের জন্য লড়াই করবো– তোমার আর কোনো অস্তিত্বের সংকট থাকবে না। বাবা, আমি মুছে দেবো তোমার আইডেনটিটির ক্রাইসিস।

ও দু'হাত বুকের ওপর জড়ো করে শরীরে চাপ দেয়, বুঝতে চায় নিজের ওজন। অন্য সময় হলে ও হয়তো মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলতো। কিন্তু না, এখন ও হাত উপরে ওঠাবে না– ও শরীরের সব অঙ্গগুলো জড়ো করে নিজের বুকের ওপর রাখবে। এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে ওর মা'র কথা মনে হয়, কত সহজ, সরল জীবন কাটালো ওর মা। জীবনের কাছে তার অনেক পাওনা ছিলো, কিন্তু চায়নি। এখনকার মেয়েরা বলবে, এই না চাওয়াই নারীত্বের অবমাননা– অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া। মা আসলে এসব কিছুই বোঝেনি কিংবা কে জানে হয়তো বুঝেছে, কিন্তু প্রকাশ করেনি। প্রকাশ করলে জীবনের জটিলতা বাড়বে বলে মানিয়ে নিয়েছে। নাকি তার মনেও রিফিউজি হওয়ার আতঙ্ক এবং গ্লানি ছিলো। প্রতীকের কষ্ট হয় মা'র জন্য। এ এমন এক ধরনের বেদনা যা প্রকাশ করা যায় না। ও কি মা'কে বলতে পারবে, মা আজ আমি শহরে গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছি। হয়তো পারবে, নিশ্চয় পারবে। মা অনেক ঘটনা পার হয়ে এসেছে, মা সহিষ্ণু হয়ে গেছে। আজকের কথা শুনে অবাক হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে কপালে চুমু দিয়ে বলবে, ভালো করেছিস।

ও খুশিতে মা'কে জড়িয়ে ধরবে। ওর চিৎকার শুনে অজেয়কে কোলে নিয়ে ছুটে আসবে মঞ্জুলিকা। ও মঞ্জুলিকার কাছ থেকে কেড়ে নেবে ছেলেটাকে, কোলে নিয়ে সারা ঘর ছুটে বেড়াবে। বলবে, আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। এতকিছু ভাবনার মাঝে রিকশা পেরিয়ে যায় কার্জন হল, বাংলা একাডেমী। রোকেয়া হলের সামনে এলে একদম ভুতুড়ে মনে হয় এলাকা। কোথাও কেউ নেই। রাস্তার বাতিও জ্বলছে না। হয়তো কোনো কারণে পাওয়ার ফেল করেছে। ও ভাবে ভালোই হয়েছে। অন্ধকারই চমৎকার সময়– অন্ধকার

BanglaBook.org

হাতড়ে হাতড়ে ওরা চলে যেতে পারবে লক্ষ্যের দিকে, এ অন্ধকার ওর নিজের– ওর চেনা। ওই পাঞ্জাবি সেনাদের মতো প্রতিমুহূর্তে অপরিচিত মাটিতে পা ফেলার যন্ত্রণা তো ওদের নেই। কেন ওরা ওদের বিরুদ্ধে লড়ে জিতবে না?

রিকশা বড় রাস্তা ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার গেটে ঢোকে। তখন হুস্‌হুস্‌ শব্দে ছুটে আসে ট্রেন। ওটা নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে, তেজগাঁ যাবে। ও রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে। ট্রেনের চলে যাওয়া দেখে, ওর প্রিয় দৃশ্য। কামরার মৃদু আলোতে মানুষগুলোকে ছায়ার মতো দেখায়। ওর মনে হয় সবাই কেমন বিষণ্ন হয়ে বসে আছে– ওদের দুঃখের বুঝি শেষ নেই। পরক্ষণে ও চমকে ওঠে। কেন ও সবাইকে ওর পক্ষের লোক ভাবছে? সব মানুষের তো দুঃখ থাকার কথা নয়। এদের মধ্যে বিহারি আছে, যারা এ দেশের স্বাধীনতা চায় না– বাঙালির একটি অংশ আছে, তারাও স্বাধীনতা চায় না। তাহলে বিষণ্নতা কেন সর্বত্র থাকবে? নিশ্চয় ওদের অনেকের চেহারা চক্‌চকে উজ্জ্বল ছিলো। প্রতীক ঠিকমতো ওদের দেখতে পায়নি। আসলে এসব ওর মনের দেখা, ও এমন করেই ভাবছে, ভাবতে ভালো লাগছে। ট্রেনের শব্দ এখন নেই, তবু ও তন্ময় হয়ে আছে।

রিকশাওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, সাব যামু না? টেরেন তো গেছে গিয়া?

ট্রেন দেখতে তোমার ভালোলাগে না ভাই?

হ, লাগে তো। কিন্তু অহন তো টেরেন দেহার সময় নাই। বাড়িত যাওন লাগবো। শহরে আজ বোমা ফুটছে না?

তাই নাকি? কারা ফোটালো?

মুক্তিবাইনি।

মুক্তিবাহিনী? তুমি কি করে জানলে?

দেহেন না শহরে মানুষ নাই। মনে হয় আরো বোমা ফুটবো। মানুষেরা পলাইতেছে।

তোমারও ভয় করছে?

না, আমার ভয় নাই। ভয় পামু কেন? তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, আপনেরে একডা কতা কই সাব?

হ্যাঁ, বলো।

আপনে কাউরে কইবেন না তো?

তুমি না করলে বলবো কেন? প্রাণে বেঁচে থাকতে কাউকে বলবো না।

জানেন ঐ পাঞ্জাবি কুত্তাগুলারে রাস্তায় দেখলে আমার রক্ত চিড়বির করে। বোমা পাইলে আমিও ফুডাইতাম সাব।

তোমার নাম কি?

কাদের আলি।

কোথায় থাকো?

কাঁটাবন বস্তিতে। যেহান দিয়া রেসের ঘোড়ার আস্তাবল আমি হেইহানে থাকি। কাদের আলি কইলে মানষে আমার গর দেখাইয়া দিবো।

যে রিকশাওয়ালা যাবার জন্য বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো, সে এখন বুক উজাড় করে কথা বলতে পেরে নিজের ভেতর থিতিয়ে গেছে, যেন ও প্রতীকের সঙ্গে সারারাত কথা বলে কাটিয়ে দিতে পারবে। প্রতীক আশ্চর্য হয় না, বুঝে যায় যে মানুষ এভাবে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে গেছে– সাধারণ মানুষ তৈরি না হলে মুক্তিযুদ্ধ কখনোই সফল হয় না।

BanglaBook.org

এ শহরে এখন মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে– একদল স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে। পক্ষে-বিপক্ষের দড়ি-টানাটানিতে জিতবে ওরাই যাদের পায়ের নিচে মাটি আছে, যারা এ মাটিতে দখলদার নয়।

সাব, আপনি যদি মুকতিবাইনীর খবর পান, তো আমারে কইয়েন। আমি বাড়িঘর ছাইড়া চইলা যামু।

বাড়িতে কে আছে তোমার?

বাপ-মা-ভাই-বোন।

প্রতীক ওকে তাড়া দিতে দিতে বলে, তুমি খুব ভালো লোক কাদের আলী।

আপনে আর যাইবেন না?

না, তুমি যাও।

আমার কথা মনে থাকবে তো সাব?

থাকবে, থাকবে।

কাদের আলী ধীরেসুস্থে টাকাটা কোমরে গুঁজে রাখে। তারপর রিকশায় ওঠে। প্যাডেলে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা খুলে যায়– ও প্রাণভরে গান গাইছে। প্রতীক বাড়ির দিকে পা বাড়াতে পারে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ও দেখতে পায় নিউমার্কেটের মোড়ে কাদের বাঁক নিলো। ও জানলো না যে কী গভীর সত্য ও প্রতীকের জন্য রেখে গেলো! সেক্টর কমান্ডার বলেছিলেন, ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর প্রচুর ছেলে দরকার। তাঁর কত ছেলে দরকার? তিনি তো জানেন না যে কত ছেলে দেয়া যাবে। লক্ষ? কোটি? কত চাই? প্রতীক বিজয়ের আনন্দে হাঁটতে থাকে। দূর থেকে দেখতে পায় যে ওদের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে আলো জ্বলছে– ড্রইংরুমের বাতিগুলো নেভানো। রাস্তার পাশেই কারা যেন একগাদা ময়লা ফেলেছে– মাছের নাড়িভুঁড়ির পচা গন্ধ আসছে। নেড়ি কুকুরটা সে ময়লা ঘাঁটছে। প্রতীক পাশ কাটিয়ে আসার সময় কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ওর পিছু পিছু আসতে শুরু করে। প্রতীক পেছন ফিরে দাঁড়ায়। বলে, কি হয়েছে বাপ তোর? পিছু নিয়েছিস কেন?

কুকুরটি ঘনঘন লেজ নেড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে ওর চোখ জ্বলজ্বল করে। আয় আমার সঙ্গে। তোকে আমি ট্রেনিং দেবো। পারবি না শত্রু চিনতে?

কুকুরটির লেজ নাড়া বেড়ে যায়। ওটা ওর পিছু পিছু বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। সিঁড়িতে পা রাখতেই প্রতীকের গা ছমছম করে ওঠে। অন্ধকারের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ও থমকে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, কে?

আলী আহমদ এক পা এগিয়ে এসে ওকে ডাকে, জিতু?

বাবা?

আলী আহমদ দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নেয়। আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করছি জিতু।

ওহ্, বাবা, বাবা। আবেগে ওর চোখে পানি এসে যায়। তুমি এমন অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলে যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

এখন অন্ধকারই তো আমাদের আলো জিতু। যারা দখলদার তাদের সামনে আলোও অন্ধকার। ওদের কাছে দিনরাত সমান।

ঠিক বলেছো। বাবা দেখো এই কুকুরটা আমার পিছু নিয়েছে। এটাকে উপরে নিয়ে যাই? ভাত খেতে দেবো!

হ্যাঁ, চল নিয়ে যাই।

BanglaBook.org

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। প্রতীক তু করে ডাকলে ওটাও পিছু নেয়।

তোরা সবাই ভালো আছিস তো?

হ্যাঁ, বাবা। মা কিছু জানে?

না।

আমি কি কিছু বলবো?

হ্যাঁ, বলবি। বেশ দৃঢ় শোনায় আলী আহমদের কণ্ঠ। কুকুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ওদের পাশ কাটিয়ে আগেই উঠে যায়।

বাবা, কুকুরটাকে আমি পুষতে চাই। আমি বাসায় না থাকলে তুমি ওকে খেতে দিও। রোজ খেতে দিলে ও আর কোথাও যাবে না। আমাদের দরজার সামনে ঘুমুবে। ভালোই হবে, না বাবা?

একজন পাহারাদার হবে, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

দু'জনে হেসে ওঠে। দরজার কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে যায়। উৎকণ্ঠিত পুষ্পিতা ওদের অপেক্ষাতেই ছিলো। আলী আহমদ আগেভাগেই বলে, জানতাম তুমি আমাদের গলার স্বর শোনার জন্য এই দরজার পাশেই বসে থাকবে?

পুষ্পিতা আলী আহমদের কথার জবাব না দিয়ে প্রতীকের দিকে তাকায়, কোথায় ছিলি তুই সারাদিন? আমি ভেবেই মরি।

প্রতীক মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি ভাবো আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মরতে পারবে না।

না, মরবে না? এমন করে ঘোরাঘুরি করলে কেউ না ভেবে পারে? আর এত ভাবলে মরণ তো দু'পা এগিয়ে আসবেই।

দেখছিস তোর মা কথায় কেমন পোক্ত হয়েছে?

ছাড় দেখি জিতু! আজ যে শহরে বোমা ফুটেছে তা কি তুই জানিস?

কেন জানবো না? শহরের সবাই জানে।

পুষ্পিতা গলা নামিয়ে বলে, আমার ভয় তো সেজন্য আরো বেশি।

প্রতীক প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, মা আমি একটি কুকুর এনেছি। একটু ভাত দাও না। ওটাকে পুষবো।

নেড়ি কুকুর পুষে কি হবে?

নেড়িই তো আমাদের কুকুর। বিদেশীগুলোতে আমাদের নয় মা।

হয়েছে, আমাকে আর বোঝাতে হবে না। হাতমুখ ধুয়ে নে। আমি খাবার দিচ্ছি।

প্রতীক বাথরুমে ঢোকে। চোখেমুখে পানি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর খারাপ লাগতে শুরু করে। বাবা তো বলেছিলো, মাকে সব কথা বলতে, কেন ও বলতে পারলো না? ও কি ভেবেছে মা ভয় পাবে। ওকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে? সে বাঁধন খোলা কঠিন হবে? ও মাথা ঝাঁকিয়ে পানি ছিটাতে থাকে। আসলে ভুল, মায়েরা অবুঝ নয়, বলতে বলতে ও বাথরুম থেকে বেরোয়। রান্নাঘরে ঢোকে। পুষ্পিতা অবাক হয়ে তাকায়, কি রে কি হয়েছে?

তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

জানি কি বলবি? পুষ্পিতা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

জানো?

পুষ্পিতা মাথা ঝাঁকায়।

তাহলে তুমিই বলো?

BanglaBook.org

আমি জানি তুই বলবি, শহরে যারা বোমা ফুটিয়েছে আমি ওদের দলেই ছিলাম।

মা? বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রতীক। পেছন থেকে মঞ্জুলিকা ফোড়ন কাটে, ভেবেছো তুমি একাই বাহাদুর, না?

লজ্জা দিও না ভাবী। পিচ্চিটা কই?

ঘুমুচ্ছে।

লুচি ভেজেছে পুষ্পিতা। সঙ্গে আলুর চপ আর বুটের হালুয়া। এত খাবার দেখে খুশি হয়ে যায় প্রতীক। আলী আহমদও টেবিলে এসে বসে। পঁচিশের রাতের পর থেকে এ বাড়ির খাওয়া-দাওয়া একরকম বন্ধই হয়ে গেছে। সবাই টেবিলে এলে আলী আহমদ মৃদু হেসে বলে, তুমি কি জানতে তোমার ছেলে যুদ্ধ জয় করে ফিরবে?

পুষ্পিতা হাসে, মায়েরা অনেক কিছু টের পায়।

প্রতীকের খুশির সীমা নেই। গপগপিয়ে দু'তিনটে লুচি খাবার পর ও দমে যায়। মন খারাপ লাগে। ভাবে, আজ যদি খবর আসতো যে শত্রুর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর বুক? তাহলে কি অবস্থা হতো এ পরিবারের? ঐ বাবার, যে অভিনন্দন জানানোর জন্য সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো? মায়ের, যে বিজয়-উৎসব পালন করছে? ঐ ভ্রাতৃবধূর, যে এক সহজ-স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ওকে আপন করে রেখেছে? ওহ্ না, এক গ্রাস মুখে পুরতে গিয়ে বিষম খায় প্রতীক।

মঞ্জুলিকা পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়। পুষ্পিতা মাথায় হাত রেখে বলে, কি ভাবছিলি? সে জন্য বিষম খেলি। একটু পানি খেয়ে নে।

পানি খেয়ে, কিছুক্ষণ কেশে নিয়ে প্রতীক অদ্ভুত থমথমে গলায় বলে, এই শহরে আজ থেকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলো মা। সবাই ওর মুখের দিকে তাকায়। আলী আহমদ মাথা নাড়ে, এ যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।

প্রতীক একই থমথমে কণ্ঠে বলে, সব দিনই কিন্তু বিজয়ের দিন হবে না মা।

মঞ্জুলিকা ধমক দিয়ে বলে, আহ জিতু, এসব কথা তো আমরা সবাই জানি।

কিন্তু মাকে আমি একটি বিশেষ কথা বলতে চাই।

বল? পুষ্পিতা ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রতীক হাসিমুখ নিয়েই বলে, যদি খবর পাও কোনো অপারেশন করতে গিয়ে আমি শহীদ হয়ে গেছি সেদিনও তুমি কিন্তু বিরিয়ানি রাঁধবে মা। আমার কুকুরটাকে খেতে দিও। ফকিরদের দিও। আর একটি কথা, এই কুকুরটি যেন অন্য কোথাও চলে না যায়, ওটাকে তুমি পুষবে।

বল, বল আর কিছু কি তোর বলার আছে? চিৎকার করে কেঁদে ওঠে পুষ্পিতা। মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় বিজয়ের আনন্দ।

কী যে ছেলেমানুষী করছো? চলো, ঘরে চলো। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে টেনে নিয়ে শোবার ঘরে যায়, সে ঘর থেকে ফোঁপানির শব্দ আসে। মঞ্জুলিকা চোখ গরম করে তাকায়, দিলে তো সব নষ্ট করে? বাস্তব সত্য মানা কঠিন জিতু।

আমি কি ভুল করেছি? আমি তো ভেবেছি মানসিক দিক থেকে তৈরি রাখা ভালো।

তুমি প্রচণ্ড ভুল করেছো। কাউকে এভাবে তৈরি করা যায় না। সময়ই তাকে তৈরি করে দেবে।

মঞ্জুলিকা রেগেমেগে উঠে যায়। টেবিলে পড়ে থাকে খাবার। সে খাবার সামনে রেখে স্তব্ধ হয়ে থাকে প্রতীক। ও ভেবেছিলো, মা হয়তো শক্ত থাকবে। কিন্তু না, ও বুঝতে পারেনি। মা মুখে মুখে যতই নিজেকে শক্ত রাখুক, ভেতরটা তার তেমনই আছে, যেমন

BanglaBook.org

থাকলে মায়েদের চেনা সহজ। শুধু ছেলেকে সাহস দিয়ে, নিজের জন্য রেখে দেয় কান্না। অনুতাপে ভরে যায় ওর মন। নিঃশব্দে উঠে মা'র বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ফিসফিসিয়ে বলে, তুমি এমন করে কাঁদলে আমার সব শক্তি ফুরিয়ে যাবে মা। তুমি ছাড়া কে আমায় সাহস যোগাবে? দাও, তোমার চোখ আমি মুছিয়ে দেই। এ চোখে আর পানি দেখতে চাই না।

পুষ্পিতা ওর কপালে চুমু দিয়ে বলে, পাগল ছেলে।

তারপর দু'জনে মিলে রান্নাঘরে যায়। প্রতীক মাকে আলু কেটে দেয়, পেঁয়াজ কেটে দেয়। সালাদ বানায়। বিরিয়ানি রান্না হয়, সঙ্গে টুকটাক গল্প– কিভাবে গ্রেনেড ছোঁড়া হলো সেই গল্প। প্রতীক পরে ভাবে এই গল্প তো বাবাকে করা দরকার ছিলো, অথচ কেমন করে যেন মাকেই বলা হয়ে গেলো। আসলে মা-ই এমন যাকে সব কথা বলা যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে অনেক রাত জেগে গল্প করে সবাই। বেশির ভাগই যুদ্ধের গল্প। আলী আহমদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা বলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলে। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসে যায়। আলী আহমদের কণ্ঠ ওঠানামা করে, তখন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু শয্যায়। তার দু'বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। হিটলারের নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করেছে পোল্যান্ড। ওরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে এগুচ্ছে। নাৎসীদের ঠেকানোর জন্য সোভিয়েত বাহিনী প্রাণপণে লড়ছে। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন যুদ্ধের খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। সকালে উঠেই তাঁর খবরের কাগজ চাই। না পেলে রাগারাগি করতেন। যেদিন দেখতেন নাৎসীবাহিনী এগুচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে সেদিন আর কাগজ পড়তে পারতেন না। ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সারাদিন তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে থাকত। যেদিন দেখতেন সোভিয়েত বাহিনী নাৎসীবাহিনীকে পিছু হাটিয়ে দিয়েছে সেদিন তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সবাইকে ডেকে বলতেন, পারবে, ওরাই পারবে। সোভিয়েত কখনো পরাভব মানবে না। নাৎসী বাহিনী নয়শ দিন অবরোধ করে রেখেছিলো লেনিনগ্রাদ শহর। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে কিন্তু পিছু হটেনি। যেদিন সবচেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছিলো তার সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। আলো ছিলো না, পানি ছিলো না, খাবার ছিলো না, তবুও কী অদম্য ছিলো মানুষের মনোবল। মাতৃভূমির জন্য মানুষের ভালোবাসা এমনই প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতের বিজয় দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কিন্তু বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের এত টান ছিলো কেন? তিনি তো কম্যুনিজমে বিশ্বাস করতেন না?

এটা কম্যুনিজমে বিশ্বাসের ব্যাপার নয় জিতু। তিনি দেখেছিলেন সোভিয়েতবাসী একটি ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে। এবং তিনি চেয়েছিলেন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে মানবতার জয়।

বাইরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ডেকে ওঠে। খাবার পেয়ে ওটা আর নিচে যায়নি। কুকুরের ডাক শুনে একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। আলী আহমদ মঞ্জুলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ভয় লাগছে মা?

মঞ্জুলিকা ভয়ার্ত স্বরে বলে, কেউ আসেনি তো?

প্রতীক কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখেই বলে, আর যাই হোক ঐ শয়তানগুলো আসেনি। ওগুলো এলে বুটের শব্দে বিল্ডিং কাঁপিয়ে দেবে। আলী আহমদ হাই তুলে বলে, সৈনিকের দম্ভ তো বুটে আর বাঁটে। ওরা যেমন বুটের ব্যবহার করে তেমন রাইফেলের বাঁটের।

খুলে দেখবো বাবা? পুষ্পিতা ওর হাত চেপে ধরে, কখ্খনো না।

BanglaBook.org

কেউ তো আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসতে পারে মা?

কেউ এলে দরজায় ধাক্কা দিতো। আলী আহমদ নিশ্চিত হয়ে বলে।

কুকুরটা হয়তো বাতাসের শব্দ পেয়েছে কিংবা কোনো ছায়া দেখেছে।

তাই হবে। বলতে বলতে উঠে যায় পুষ্পিতা। পেছন পেছন আলী আহমদও। ওরা চলে গেলে মঞ্জুলিকা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ওঠার নাম করবে না ভাবী?

এক রকম তাই।

তুমি না উঠলে আমি কি করে ঘুমুতে যাবো?

যেও না, শোনো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

বাব্বা, এই রাত দুপুরে জরুরি কথা?

আচ্ছা জিতু, তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি যে উনসত্তর সালের কোন তারিখে আমরা বিয়ে করেছিলাম?

নিশ্চয় নয়। উনসত্তর সালের চব্বিশ মার্চ, যেদিন ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করলো।

আমি আর দীপু কোর্টে বিয়ে করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম–

তোমরা কি চেয়েছিলে আর না চেয়েছিলে তা আমার জানার একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমি বরাবরই দেখেছি ভাইয়াটা একটা পাগল। নইলে নিজের ছেলেটাকে পর্যন্ত দেখার সময় হলো না, যুদ্ধে চলে গেলো।

আহ্ জিতু, তুমি ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না। আমার কথা শোনো। আমার আর দীপুর বরাবরের ইচ্ছে ছিলো দেশের কোনো সংকট বা আন্দোলনের সময়গুলোকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে গেঁথে নেয়া। উনসত্তরের আন্দোলনকে যদি আমরা ধারণ করতে পারি, তবে এখন এর অন্যথা হবে কেন? দীপু একা একা যুদ্ধ করবে? আমি কি কিছু করবো না?

তোমার ছেলে?

ওকে মা দেখবে। আমি দীপুর ওখানে যেতে চাই। আমিও ট্রেনিং নিতে চাই।

মঞ্জুলিকার দৃঢ় কণ্ঠ প্রতীককে চমকিত করে না। ও বুঝতে পারে এখনকার সময়টাই এমন। যুদ্ধ ধসিয়ে দিয়েছে প্রচলিত ধারণা। মঞ্জুলিকা আর যাই হোক পুষ্পিতা হবে না। ও যুদ্ধ করবে, রোজগার করবে এবং সংসারও করবে।

কী হলো? কী ভাবছো? মঞ্জুলিকার অসহিষ্ণু কণ্ঠ।

কি করা যায় ভাবছি।

ভাবাভাবির কিছু নেই জিতু। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমার সহযোগিতা চাই।

তুমি তো জানো ভাবী, রাস্তাঘাটে আমার ভয় একটা, তোমার ভয় দুটো।

জানি। আমাকে পেলে ওরা আগে ধর্ষণ করবে, পরে মারবে। আর তোমাকে মেরেই ফেলবে। দেখো এসব বিষয়ে আমার পরিষ্কার ধারণা আছে। যুদ্ধের সময়ে কিংবা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে মেয়েদের চড়া মূল্য দিতে হয়। আমি এটাও মনে করি এসব সময়ে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করা এবং একটি যুবককে হত্যা করার মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। দুটোই সমান।

প্রতীক এবার চমকিত হয়। মঞ্জুলিকা এত কিছু ভেবে রেখেছে ও তার কিছুই বুঝতে পারেনি। কার আগুন যে কোথায় জ্বলছে তা সহজে বোঝাই যায় না, মানুষ তৈরি হয়ে গেছে।

জিতু তুমি কিছু বলছো না যে?

BanglaBook.org

বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে ভাবী। ক'দিন আগে আমাকে এখানে গেরিলা অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি ইচ্ছে করলে এখনই আবার ফিরে যেতে পারি না।

মঞ্জুলিকা চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে চাইলেই ছুটে যাওয়া হবে না। ওকে সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। সীমান্ত পেরুনোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কীভাবে? মঞ্জুলিকা ভাবতে ভাবতে উঠে যায়। অজেয় জেগে গেছে, কাঁদছে। অজেয় শান্ত হলেও মঞ্জুলিকার ঘুম আসে না। কপালের ওপর ডান হাত এবং পেটের ওপর বাম হাত রেখে শুয়ে থাকে, টেনশনের সময় ও এভাবেই শোয়। কুকুরটা আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। মঞ্জুলিকা কান পেতে শোনে। কেউ কি এলো? বুটের শব্দ নয়, ও কোনো মৃদু পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় থাকে কিংবা দরজায় মৃদু করাঘাত? না কোথাও কোনো শব্দ নেই। কুকুরটা বার দুই ডেকে থেমে গেছে। এটাতো ঠিক দখলদাররা আসবে সদম্ভে, সিঁড়ি কাঁপিয়ে, চিৎকার করে এবং অস্ত্র হাতে। গেরিলারা আসবে মৃদু পায়ে, নিঃশব্দে, অস্ত্র হাতে। মানুষের ভেতর থেকে মানুষেরই ছায়া হয়ে। ওরা আসতে পারে আহত হয়ে। ওদের পা ভাঙা থাকবে, ওদের হাত উড়ে যাবে, ওদের পিঠে গুলি থাকবে। ভাবতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে মঞ্জুলিকা : আমি দূরে যাবার কথা কেন ভাবছি, আমি তো এদের জন্যই অপেক্ষা করতে পারি। আমার চারপাশই তো একটি যুদ্ধক্ষেত্র। না, আমি সীমান্তের ওপারে যাবো না। ওই যুদ্ধক্ষেত্র দীপুর জন্য থাক। আমি এই শহরেই থাকবো। আমি ঘরে বসেই লড়বো। দীপুর বড় অর্জনের সঙ্গে আমার এই ছোট অর্জন যুক্ত হবে। তবেই তো শেষ হবে মুক্তিযুদ্ধ। লড়াই তো শুধু অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া নয়– লড়াই নেপথ্যে কাজ করা, ওদের আশ্রয় দেয়া, মমতায় সুস্থ করে তোলা, যেন ওরা আবার ফিরে যেতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি ওদের নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়ে বলবো– খাও, গায়ে শক্তি হোক। ফিরে যাও যুদ্ধক্ষেত্রে। বিজয়ের আগে যেন তোমাদের চোখের আলো নিভে না যায়।

আবার শুয়ে পড়লে প্রবল স্বস্তিতে চোখে ঘুম নামে। এবার ও কাত হয়ে শুয়েছে। দীপু থাকলে ওর হাত দীপুর গলা জড়িয়ে ধরতো। ও শুধু ডান হাত ছেলের ওপর রাখে। দীপুর জন্য বুক মুচড়ে ওঠে। ঘুমুবার আগে ও প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের মতো করে বলে, আমি কোটি কোটি আহত ছেলেকে বলতে চাই, তোমাদের চোখের আলো নিভে যাওয়ার আগে তোমরা ফিরে যাও যুদ্ধক্ষেত্রে। চোখের আলো নিভে যাওয়ার আগে তোমরা দেখে যাও বিজয়ের আনন্দ।

ভোরবেলা প্রতীকের যখন ঘুম ভাঙে তখন অন্যরা কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। ও বারান্দায় দাঁড়ায়– ফুরফুরে স্নিগ্ধ বাতাসে প্রফুল্ল হয়ে যায় মন। এ বাতাস গায়ে মাখলে মনেই হয় না যে জুন মাসের দুপুর এক ভ্যাপসা গরমে ভরে উঠবে। ও মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে আসে। চা বানায়। কৌটো খুলে বিস্কুট নেয়। চা খেয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে আসে। কুকুরটা দরজার কাছে ছিলো। ওকে নামতে দেখে পিছু নেয়। সিঁড়ির নিচে এসে কুকুরটাকে বিস্কুট দেয় ও। বিস্কুট খেয়ে কুকুরটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও বলে, আমি যাচ্ছি। তুই চারতলায় গিয়ে থাকবি। বাবা, মা, ভাবী আর অজেয়কে পাহারা দিবি। দেখবি কেউ যেন ওদের ছুঁতে না পারে। কেউ ওদের ছুঁতে এলে তুই আমাকে খবর দিতে পারবি না? চিনতে পারবি না আমার গায়ের গন্ধ?

কুকুরটা ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে। প্রতীকের মনে হয়, ওর কি দোষ? ও তো আশ্রয় এবং খাবার পেয়েছে। কে না চায় আশ্রয় এবং খাবার? একটু সুখ? একটু স্বস্তি? এবং একই সঙ্গে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ– বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। এসব ভাবতে ভাবতে প্রতীক গেটের দিকে এগুতে থাকে। মনে হয় যার

BanglaBook.org

স্বাধীন দেশ নেই তার মানবজনম বৃথা– যার স্বাধীন দেশ নেই তার চোখের আলো নিভে যায়– যে চোখ দিয়ে সে দেখে সেটা ধার করা, অন্যের। এ বেঁচে থাকা অর্থহীন।

গেটের কাছ থেকে ও একটা রিকশা নেয়। কলাবাগানে স্বপনের বাসায় বসে পরবর্তী অপারেশনের পরিকল্পনা করবে। ওরা ঠিক করেছে একটার পর একটা অপারেশন চলবে, যেন শুধু সৈনিকরা নয়, পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররাও ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। অফিসে, বাড়িতে, রাস্তা-ঘাটে, ক্লাবে পার্টিতে সন্ত্রস্ত থাকবে ওরা– মদের গ্লাস ঠোঁটে ওঠার আগে যেন পিলে চমকে উঠে ছলকে যায় মদ।

নিজে নিজেই হেসে ওঠে প্রতীক। তারপর সন্ত্রস্ত হয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে। সেক্টর কমান্ডার বলেন, কাউবয় এ্যাডভেঞ্চার গেরিলা যুদ্ধ নয়।

প্রতীক মাথা ঝাঁকিয়ে শিউরে ওঠে, মানুষের ভেতরে থেকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার ভয়। এ্যাডভেঞ্চার করতে গেলে এ ভয়ের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ও নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে, সতর্কতা এ যুদ্ধের প্রাথমিক শর্ত। একজন গেরিলা সতর্ক না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে একশ জন সাধারণ মানুষ, যারা ওদেরই প্রয়োজনে লাগবে বলে প্রস্তুত থাকে। এবং যারা না হলে গেরিলা অপারেশন সম্ভব নয়– যারা নাহলে জনযুদ্ধ সম্ভব নয়।

আবার একটি অন্ধকার করে রাখা ঘরের মধ্যে ওরা গুটিসুটি হয়ে বসে। ঢাকা শহরের বড় একটি ম্যাপের ওপর উপুড় হয়ে আছে ওরা ছয় যুবক। নির্ধারণ করছে আক্রমণের স্থান। প্রথমে গ্যানিজ ও ভোগ আক্রমণ। এ দোকান দুটো অবাঙালিদের, এখানে সারাদিন লোক সরগরম থাকে– ওদের সন্ত্রস্ত করতে হবে। গ্যানিজের পাহারায় থাকে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ। এরপর ধরতে হবে উলান পাওয়ার স্টেশন। অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে হবে এলাকা। একদিন চালাতে হবে সিটি টেরোরাইজিং অপারেশন। আতঙ্কিত হয়ে উঠবে শহরবাসী।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে সবাই মেঝেতে, খাটে ইতস্তত হয়ে থাকে। রেডিওর নব ঘোরায় মায়া। ও বিদেশী কোনো স্টেশন ধরে খবর শোনার চেষ্টা করছে। রুমী একসময় নিজে নিজেই বলে, দেশের চারদিকের বর্ডার ঘিরে যুদ্ধ চলছে, বর্ডারের ঠিক ওপাশেই ভারতের মাটিতে আমাদের সেক্টরগুলোর হেডকোয়ার্টার। রেগুলার বাংলাদেশ আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী।

সবার বুকের ভিতর কথাগুলো ধ্বনিত হয়, আমরা আছি গেরিলা বাহিনী। কিন্তু কেউ মুখে তা প্রকাশ করে না। ওরা জানে এই মুহূর্তে ওদের কোনো আলাদা স্বপ্ন নেই এবং সেজন্য আলাদা কোনো ভাবনা নেই। ওরা এখন গ্যানিজ এবং ভোগ আক্রমণের কথা ভাবছে। কাল তিনজন যাবে রেকি করতে। দেখতে হবে অপারেশনের আশপাশের জায়গার অবস্থা। আজ ওদের কিছু করার নেই। কেউ এঘর থেকে বেরুবে না। সন্ধ্যার পর যে যার বাসায় চলে যাবে।

পরদিন নব্বই সিসি হোন্ডায় চেপে ওরা জিন্নাহ্ এভিনিউতে আসে। সঙ্গে ছিলো একটি স্টেনগান, কয়েকটি গ্রেনেড-৩৬ ও ফসফরাস বোমা। একটি টয়োটা গাড়িতে করে এদেরকে কভার দিয়েছিলো অন্যরা। গতবারের মতো এবারও ওরা হোন্ডাটা সংগ্রহ করে একজন অবাঙালির কাছ থেকে। এক হোন্ডায় তিনজন। হোন্ডা চালাচ্ছে মানু, ওর পেছনে মায়া, শেষে গাজী। গাজীর কাছে স্টেনগান। গ্যানিজের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় ওরা দেখলো প্রতিদিনকার মতো চারজন পুলিশ দোকানটি পাহারা দিচ্ছে। ভেতরে বারো তেরোজন খদ্দের কেনাকাটায় ব্যস্ত। ওরা রেকি করার জন্য চারপাশে ঘুরে আসে। কালো রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে

BanglaBook.org

নিয়েছে মায়া ও গাজী। দোকানের সামনে এসে থামতেই গাজী এক লাফে নেমে দৌড়ে মেইন গেটের কাছে চলে যায়। দৌড়ানো অবস্থাতেই ও স্টেনগানে ম্যাগাজিন ভরে নেয়। ওর পেছনে মায়া চিৎকার করে বলে, হ্যান্ডস আপ। পুলিশরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাজী ব্রাশ ফায়ার করে, লুটিয়ে পড়ে চারজন পুলিশ। দোকানের ভেতরের খদ্দেররা কোণাঘুপচিতে লুকোনোর চেষ্টা করছে– দোকানদাররাও প্রথমে হতভম্ব হয়ে আড়ালে চলে যায়। মায়া দোকানের ভেতর গ্রেনেড–৩৬ ছুঁড়ে মারে এবং পরে একটি ফসফরাস বোমাও ছোঁড়ে। মানুষজন পালাচ্ছে, দোকানপাট ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলোর গতি বেড়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে শূন্য হয়ে যায় রাস্তা। যাবার সময় পথচারীরা দেখতে পায় হোন্ডার উপর বসে আছে একজন এবং কভার দেয়া গাড়িটি স্টেনের নল বের করে রেখে আড়াআড়িভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাজ শেষে ওরা দু'জন ঝটপট হোন্ডার কাছে এসে দাঁড়ায়। হোন্ডায় উঠে বসার আগেই মায়া একটি পিন-আউট করা ফসফরাস গ্রেনেড গাজীর হাতে তুলে দেয়। দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে হোন্ডা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসে আছে ওরা। একটু বেশি ঝাঁকুনি লাগলে 'পিন-আউট' করা ফসফরাস বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এতকিছু ভাবার সময় তখন নয়– বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করার সুযোগ নেই, ওরা জানে ওরা ওদের স্বপ্নপিণ্ড হাতে নিয়ে ছুটছে। ওরা যাচ্ছে পুরানা পল্টনের দিকে। ওরা এই বোমাটি ফেলবে 'ভোগ' দোকানে।

ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় দোকানের কর্মচারীরা দোকান বন্ধ করার চেষ্টা করছে। শাটার মাত্র এক হাত খোলা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে সেই দরজা লক্ষ্য করে চলন্ত হোন্ডা থেকে ফসফরাস বোমা ছুঁড়ে মারে গাজী। মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। পথচারিদের হৈ-চৈ, চিৎকারের মাঝে দুরন্তবেগে ছুটে যায় হোন্ডা, যেন অদৃশ্য এক আলোয় মিলিয়ে গেলো এক সজীব বস্তু। কেউ কিছু বুঝেই উঠতে পারলো না।

সেদিন অপারেশন শেষে বাড়ি ফিরলো না প্রতীক। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নামলো তখন এক মুহূর্ত ভাবলো, কোথায় যাবে? ওদের বলা হয়েছে ঠিকানা যেন একটা না থাকে, অনেক হয়। কাদের আলীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর ওর মনে হয়েছে ঠিকানার অভাব নেই। ও কি কাদের আলীর কাছে যাবে? না, বস্তিতে অনেক লোক। ওখানে নয়। মুশতাক? না। খোকন? না। আলতাফ মাহমুদ? হ্যাঁ, ওখানে যেতে পারে। ও রিকশা নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে আসে। এখানে বাসা। ক'দিন আগে সামাদের সঙ্গে এসেছিলো। গুলি ও বিস্ফোরক ভর্তি একটি ট্রাঙ্ক আলতাফের কাছে রেখে গেছে। ওটা তার বাড়ির উঠোনে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

দরজা খুলে ওকে দেখে আলতাফ মৃদু হাসে, আয়।

আপনি কেমন আছেন আলতাফ ভাই?

ভালো। তারপর চুপিচুপি বলে, কোথা থেকে এলি? কিছু উড়িয়েছিস?

হ্যাঁ। দু'একদিনের মধ্যে আমরা সিটি টেরোরাইজিং অপারেশন করবো।

কোন কোন পথে যাবি প্ল্যান হয়েছে?

হ্যাঁ।

বোস, চা নিয়ে আসছি।

রাতে এখানে থাকতে হবে আলতাফ ভাই!

সে আমি আগেই বুঝেছি। থাকবি, অসুবিধা নেই।

আলতাফ পর্দার ওপারে চলে গেলে প্রতীক সোফায় ঘাড় এলিয়ে দিয়ে চোখ বোঁজে। ক্লান্তি নেই। ভেতরের উত্তেজনা এখনো থিতিয়ে আসেনি। ও চোখ বুঁজে উত্তেজনার রেশটুকু অনুভব করে। মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। মনে হয়, আহ্ কী আনন্দ

BanglaBook.org

আকাশে-বাতাসে। ও গুণগুণ করে। পঁচিশের রাতের পর ও আর গান গায়নি, হারমোনিয়াম ধরেনি। আলতাফের ঘরের কোণে হারমোনিয়াম দেখে বন্যার কথা মনে হয়। দু'জনে ছায়ানটে গান শিখতো, সে সময় বন্যাকে দেখলে ওর চারদিক আলোকিত হয়ে যেত, ভালো লাগার কী অসম্ভব মাদকতা ছিলো। বন্যা এখন কোথায় ও জানে না। আর কোনোদিন বন্যার সঙ্গে দেখা হবে কি না সেটাও নিশ্চিত নয়। প্রতীকের মনে হয় ওর ভেতরে উত্তেজনার রেশ ফুরিয়ে গেছে, ও আর কোনোকিছুতেই স্থিত হতে পারছে না, বন্যার অনুভব ওর ভেতরে ঢুকে গেছে। ওর ইচ্ছে করছে, বন্যাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে যেতে, ইচ্ছে করছে ওর কানে কানে বলতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো, যেখানেই থাকো, যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, আমি তো তোমারই বন্যা– আমি তোমাকে একটি নতুন দেশের পতাকা দেবো। ভাবতেই প্রতীক সোজা হয়ে বসে। পতাকা? উড়বে কি প্রতিটি বাড়ির মাথার ওপর? কী অসাধারণ দৃশ্য হবে সেটি– কবে আসবে সেদিন। কবে? প্রতীক ঘরে পায়চারি করে। চা নিয়ে ঢুকে আলতাফ বলে, কি রে এমন অস্থির কেন?

একটি দৃশ্যের স্বপ্ন দেখছি।

দৃশ্যের স্বপ্ন?

হ্যাঁ। দেখছি প্রতিটি বাড়ির মাথায় উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা।

দু'জনে চুপচাপ চা খায়। প্রতীক জানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আলতাফের। ওরা বলে পাঠিয়েছে তিনি যেন উদ্দীপনামূলক গান রেকর্ড করে পাঠান। এই নিয়ে ব্যস্ত তিনি। ও একসময় জিজ্ঞেস করে, আপনার কাজ কতদূর?

প্রায় গুছিয়ে এনেছি। স্পুলগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দেখা যাক কি হয়।

আর কতদিন লাগবে?

ধর মাসখানেক। ভাবছি আমিও চলে যাবো ভারতে।

মন্দ নয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আপনাকে খুব দরকার হবে। ভালোই হবে, রাতের বেলা ট্রানজিস্টারে কান লাগিয়ে শুনবো আপনার গান। ভাবতেই থ্রিল ফিল করছি।

আলতাফ ওর কথার জবাব না দিয়ে কানখাড়া করে। প্রতীক চোখ ইশারায় জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

আলতাফ ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ থাকতে বলে। প্রতীকের মনে হয় দরজার বাইরে মৃদু পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। একজন নয়, দু'তিনজনের পায়ের শব্দ। প্রতীক সন্ত্রস্ত হয়। আলতাফের পাশে এসে বসে।

কি মনে হচ্ছে আলতাফ ভাই?

বুঝতে পারছি না।

তখন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়। প্রথমে বাতিটা বন্ধ করে প্রতীক। তারপর দরজা খুলতে যায়। আলতাফ বাধা দেয়, তুই ওপাশে দাঁড়া, আমি দেখছি।

আলতাফ চাপা গলায় বলে, কে?

আমি জুয়েল, খুলুন।

সামান্য ফাঁক হয় দরজা। জুয়েলের ঘাড়ে আহত কাজল। রক্তে ভিজে গেছে জামা। পেছনে মতিন আর হামিদ। জুয়েল ফিসফিসিয়ে বলে, রেকি করতে গিয়ে কাজলের বুকে গুলি লেগেছে। ওকে কোথায় রাখবো? ওর চিকিৎসা দরকার।

প্রতীক বাতি জ্বালায়। মেঝেতে কাজলকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। ওর জ্ঞান নেই। আলতাফ পালস দেখে। জুয়েল অস্থির, কি করবো এখন?

BanglaBook.org

সবার চেহারা শুকনো, পাঁশুটে হয়ে গেছে। আলতাফ কোনো জবাব দেয়নি। চিন্তিত মুখে ভাবছে, কি করবে? কোথায় ওকে রাখা যেতে পারে? দ্রুত বহু মুখ ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে– কোন জায়গা নিরাপদ? সবাই উদগ্রীব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে একটি সিদ্ধান্তের জন্য।

মুহূর্তে প্রতীক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায়। মঞ্জুলিকার কথা ভাবে– ও যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলো– যুদ্ধ তো শুধু অস্ত্র হাতে লড়াই নয়, যুদ্ধের অনেক ক্ষেত্র আছে। ও আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আলতাফ ভাই কাজলকে আমি নিয়ে যাবো।

তুই? কোথায় নিবি?

আমার বাসায়।

তোর আজকে অন্য জায়গায় থাকার কথা?

উপায় কি? কাজলের জন্য তো আমাদের একটা কিছু করতে হবে।

আলতাফ জুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলে, তোরা একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর। জুয়েল দ্রুত বেরিয়ে যায়। সামাদকে ফোন করলেই হবে।

প্রতীক ডেটল আর তুলা এনে কাজলের ক্ষত মুছিয়ে দেয়। অল্পক্ষণে গাড়ি আসে। ওদের আবাসিক এলাকার গেটে ঢোকার আগে প্রতীক গাড়ি থেকে নেমে দেখতে যায় কোথাও কেউ আছে কি না। ও গেটের ভেতর ঢুকে গেলে গাড়িটা নিউমার্কেটের দিকে চলে যায়। ঘুরেফিরে আবার আসবে।

প্রতীক সিঁড়ি পর্যন্ত না যেতেই কুকুরটা ঘেউ করে কাছে আসে। ও মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলে, ডাকিস না।

ও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। কুকুরটাও পিছু নেয়। দরজা খুলে দেয় আলী আহমদ। উৎকণ্ঠিত প্রতীককে দেখে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

বাবা, একজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে রাখতে হবে।

কোথায়?

রাস্তায় গাড়িতে।

নিয়ে আয়।

তুমি নিচে এসে দাঁড়াও। দেখো কেউ আসে কি না।

ততোক্ষণে পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনে নেমে গেলে ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'জনে তটস্থ, ঘটনার কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার শহরের অনিশ্চিত জীবনযাপন বুঝি এভাবেই চলবে। মুহূর্তে এসব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে মঞ্জুলিকা বলে, যাই জিতুর ঘরটা রেডি করে রাখি। একজন আহত মুক্তিযোদ্ধার জন্য একটি পরিষ্কার বিছানা দরকার মা। আপনি অজেয়কে দেখবেন। আমি একে সামলাবো।

পুষ্পিতা অবাক হয়ে মঞ্জুলিকার দিকে তাকায়। ওর দ্রুতপায়ে চলে যাওয়া দেখে। ক্ষিপ্র হাতে বিছানা ঠিক করতে দেখে এবং ওর ভেতরের চাঞ্চল্য নিজের মধ্যেও অনুভব করলে পুষ্পিতার কাছে এই শহরটা আর অনিশ্চয়তার শহর থাকে না। ও বুঝে যায় যে, এখন থেকে এই শহরে মুক্তিযোদ্ধারা আহত হয়ে এবং তাদেরকে সারিয়ে তুলতে হবে। ফেরত পাঠাতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। এটাই এখন এই শহরের জীবনযাপনের নিশ্চিত, নির্ধারিত লক্ষ্য। ও ধীরপায়ে অজেয়র বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। এখন থেকে এর দায়িত্ব ওকে নিতে হবে। ওর মা অন্য দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ করতে গেলো। এই বাসাটি এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। মঞ্জুলিকা সোনাইকে এটা-ওটা করতে বলছে। ও ছুটে ছুটে কাজ করছে।

BanglaBook.org

কাজলকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে প্রতীক মঞ্জুলিকাকে বলে, তোমার জন্য যুদ্ধ এনেছি। ওকে বাঁচাতে হবে। এ পরীক্ষায় পাস করলে তোমাকে নিয়ে যাবো সীমান্তের ওপারে, নিয়ে যাবো আসল যুদ্ধক্ষেত্রে।

মঞ্জুলিকা এসব কথায় কান না দিয়ে বলে, একজন ডাক্তার ডাকো।

আমরা যাচ্ছি ভাবী। আমাদের এক শুভাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার, ওকে পেলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবো, যদি না আসি তবে বুঝবেন কোনো কারণে আসতে পারিনি। আপনি বুঝেসুঝে ব্যবস্থা নেবেন, ওর নাম কাজল।

জুয়েলের কথা শুনে মঞ্জুলিকা বুঝে যায় যে, এ এক কঠিন দায়িত্ব। বুঝেসুঝে ব্যবস্থা নেয়া সহজ কথা নয়। তবু জুয়েলকে জোর দিয়ে বলে, কাজলকে সারিয়ে তুলতে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

জুয়েল এসে মঞ্জুলিকার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আপনার সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। ভাবী, ওর তো যুদ্ধ করার বয়স হয়নি, মাত্র সতেরো বছর বয়স; এ বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিলো। কিন্তু ও যুদ্ধ করবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। ওকে ভীষণ যত্ন দিয়ে, সার্বক্ষণিক সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে। আমাদের অবহেলার কারণে কেউ যেন মরে না যায় ভাবী।

কাজল অস্পষ্ট শব্দ করলে মঞ্জুলিকা ছুটে কাছে যায়। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ওরা কয়জন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে আলী আহমদ কাজলের ঘরে আসে। তখন মঞ্জুলিকা তোয়ালে ভিজিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিলো।

আলী আহমদকে দেখে ও বলে, বাবা এখন কি করবো?

জ্ঞান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ও একটু-আধটু শব্দ করছে। মনে হচ্ছে জ্ঞান এসে যাবে।

দরকার হলে আমাকে ডেকো। আমি জেগেই থাকবো।

বাবা, বাতি কি বন্ধ করে রাখবো?

না, জ্বলুক। পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দিচ্ছি।

বাবা, জ্ঞান ফিরলে ওকে একটা পেইনকিলার দিয়ে দেবো?

দিও।

মঞ্জুলিকা কাজলের হাত-পা মুছিয়ে দেয়। রক্তমাখা জামাটা খুলে প্রতীকের একটা জামা পরিয়ে দেয়। একটুপর আলী আহমদ আবার আসে। বলে, তোমাকে আমার ইজিচেয়ারটা এনে দেই মা? তুমি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো।

না, বাবা, না। যেন প্রস্তাবটি শুনে আঁতকে ওঠে মঞ্জুলিকা। বলে, আমি জেগে থাকবো। ওর মাথার কাছে বসে থাকবো বাবা, যদি জ্ঞান ফিরে আসে।

আলী আহমদ মাথা নেড়ে চলে যায়। মঞ্জুলিকা চেয়ার টেনে কাজলের মাথার কাছে বসে ওকে দেখে; ওর নাক, চোখ, ভুরু, কপাল–ডান ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ আছে। ও খুঁজে পেতে চায় এই কিশোর ছেলেটির অনমনীয় দৃঢ়তা, কেমন করে সে দেশের স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো, কেমন করে সে পরিবারের সব পিছুটান উপড়ে দিয়ে পালিয়ে এলো? কোথায় আটকে আছে ওর স্বপ্ন? ওর বুক ওঠানামা করছে– নিশ্বাস পড়ছে– শুধু চোখ বোজা বলে ওর চোখের আলো দেখা যায় না। ঐ চোখ ছাড়া আর সবখানে ও সাহস দেখতে পায়। ও বিড়বিড় করে বলে, তুমি চোখ খোলো কাজল, তোমার চোখের দৃঢ়তা দেখবো– যে দৃঢ়তাকে আমি জ্যোতি বলি– দেশপ্রেম বলি, সাহস বলি।

আস্তে আস্তে কাজলের জ্ঞান ফিরছে। ও হাত-পা ছুঁড়ছে। অস্ফুট শব্দ করছে।

BanglaBook.org

মঞ্জুলিকা ওর হাত ধরে। কপালে হাত রেখে ডাকে, কাজল, কাজল?

কাজল তাকায়, মা। মা আমি কোথায়?

তুই তো বাড়িতে।

আমার কি হয়েছে?

তুই একটু ঘুমো বাবা। আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।

কাজল মঞ্জুলিকার হাতটা আঁকড়ে ধরে চোখ বোজে। পরক্ষণে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে, পানি। ও চামচে করে পানি দেয়, দু'ঢোক পানি খাওয়ার পর হেঁচকি উঠতে থাকে কাজলের। মঞ্জুলিকা দেখতে পায় ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে, যেন এই দৃষ্টি দিয়ে ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মঞ্জুলিকার বুক কেঁপে ওঠে, আমি তোমাকে মরতে দেবো না, কাজল। আমি চাই তোমার চোখের আলো নিভে যাওয়ার আগে তুমি বিজয় দেখবে।

আমি নড়তে পারছি না। তুমি আমার কষ্ট ভালো করে দাও।

কাজল ঘোলাটে চোখে মঞ্জুলিকার দিকে তাকায়। ওর হাত চেপে ধরে। মঞ্জুলিকা ছুটে আলী আহমদের কাছে যায়, বাবা, কাজল বলছে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

ওর জ্ঞান ফিরছে তাহলে? আলী আহমদ দ্রুতপায়ে প্রতীকের ঘরে আসে।

কাজল, বাবা?

উঃ শব্দ করে ও ঘোলাটে চোখে তাকায়। মঞ্জুলিকা দেখতে পায় ওর চোখে এক ফোঁটাও আলো নেই, ওর চোখ নিভু নিভু। কাজল আবার চোখ বোজে।

বাবা ওকে একটা পেইনকিলার দেবো?

না, ও খেতে পারবে না। ওর সেই অবস্থা নয়। ওরা তো ডাক্তার নিয়ে এলো না। হয়তো কোথাও আটকে গেছে। হয়তো ডাক্তার পায়নি। এখন আমরা কি করবো?

আমরা অপেক্ষা করবো বাবা।

অপেক্ষা তো অসহায় লোকেরা করে। আমরা কি অসহায়? কেমন আর্তনাদের মতো ছড়িয়ে যায় আলী আহমদের কণ্ঠ।

মঞ্জুলিকার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা ওর চোখের সামনে মরে যাচ্ছে। এবং এই মৃত্যু ওকে দেখতে হবে।

কেঁদেকেটে চোখ মুছে ও আবার খাটের পাশে এসে বসে। কাজলের হাত মুঠি করে ধরে রাখে। ওর মুখের ওপর মুখ নামিয়ে বলে, আমি তোমাকে মরতে দেবো না। আমি তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবো। কাজল তুমি চোখ খোলো। তাকিয়ে দেখো।

কাজল তাকায় না।

ভোররাতে মারা যায় কাজল।

মঞ্জুলিকা কাঁদতে পারে না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। আলী আহমদ ওর মাথায় হাত রেখে বলে, সবাইকে বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনতা আনা যায় না মা।

আমরা কি বাঁচবো বাবা?

হয়তো বাঁচবো, হয়তো বাঁচবো না। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। আলী আহমদ নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মঞ্জুলিকা মাথার কাছে বসেই থাকে। ও উঠতে পারে না। পুষ্পিতা জানতেই পারে না যে তার ঘরে একজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

প্রতীক এবং জুয়েল যখন ডাক্তার নিয়ে আসে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। দরজা খুলে দেয় আলী আহমদ। তার বিপর্যস্ত চেহারা দেখে চমকে ওঠে প্রতীক। জিজ্ঞেস করে, বাবা, কি হয়েছে?

কাজল নেই।

BanglaBook.org

নেই? তিনজনের স্খলিত কণ্ঠে উচ্চারণ।

জুয়েল কাজলের ঘরে যায়। মঞ্জুলিকা ওকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। জুয়েল মুহূর্তে ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

কাঁদবেন না ভাবী। এটা কাঁদার সময় নয়।

মঞ্জুলিকা চোখ মুছতে মুছতে বলে, শোকের কি কোনো সময়-অসময় আছে?

আছে। আপনার কান্না শুনে কেউ যদি জানতে পারে যে, এ বাড়িতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে তাহলে সেটা গেরিলা যুদ্ধের ক্ষতি। ক্ষতিটা ব্যক্তির নয়, সবার।

জুয়েল চাদর দিয়ে কাজলের মুখ ঢেকে দেয়। এ কাজটি মঞ্জুলিকা করতে পারেনি। আলী আহমদ করতে চায়নি। জুয়েলের কাছে সবই সহজ। পুষ্পিতা ঘরে ঢুকে বলে, ওকে কিছু খেতে বল তো বাবা। সকাল থেকে ও কিছু খায়নি।

আপনিও তো কিছু খাননি মা। বাবাও খায়নি।

পুষ্পিতা চোখ মুছে বলে, মৃতের বাড়িতে কেউ তো রান্না করে না।

জুয়েল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, এখন এসব ভাবার সময় নয় চাচী। চলুন আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই চা-মুড়ি খান।

জুয়েল মঞ্জুলিকার হাত ধরে টানে, উঠুন ভাবী। যুদ্ধের সময় শত শত মৃত্যু দেখতে হয়। একজনের মৃত্যুতে এমন ভেঙে পড়লে যুদ্ধ করবে কে?

জুয়েলের এই চাঁছাছোলা কথা মঞ্জুলিকার ভালোলাগে। ও অল্প কথায় পুরো পরিস্থিতি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এটা যে অন্যরকম সময় তা ভুললে চলবে কেন? সময়ের দাবি আগে। এক ফাঁকে প্রতীককে বলে, আমি কথা রাখতে পারিনি জিতু। ওর চোখের আলো তো নিভে গেলো।

মৃত্যুকে ঠেকানোর কথা কেউ রাখতে পারে না ভাবী।

তুমি আমাকে আবার সুযোগ দিও। আমি আবার লড়াই করবো। আহত মুক্তিযোদ্ধার জন্য বসে থাকবো।

ড্রইংরুমে বিষণ্নমুখে বসে আছে ওরা। কাজলকে কিভাবে দাফন করা হবে তা ভাবছে সবাই। আজিমপুর গোরস্তানে যাওয়া যাবে না। নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। কোথায় যাবে? কোন এক অজ্ঞাত স্থানে?

আলী আহমদ ওদের বলে, তোমরা শহর থেকে দূরে একটা জায়গা ঠিক করো, যেটা মুক্তিযোদ্ধাদের গোরস্তান হবে।

প্রতীক বিস্মিত হয়ে বলে, মুক্তিযোদ্ধাদের গোরস্তান? তুমি কি ভেবেছো বাবা যে আমরা মরতেই থাকবো?

না, তা ভাবিনি। সবাই যদি বেঁচেও থাকে তবু মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গোরস্তান থাকা দরকার। স্বাধীন দেশের মানুষ মনে করবে মুক্তিযোদ্ধাদের তোমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করেছিলে এবং এখন থেকে অনেক বছর পরে জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা যখন মারা যাবেন তাঁদের সবার কবর এক জায়গায় হবে।

ড. কবীর মাথা নাড়েন, আপনার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে। একটা জায়গায় কথা তোমরা ভাবো যেখানে আমরা কাজলকে কবর দেবো। তার আগে দু'তিনজন গোরখোদক যোগাড় করতে হবে।

কিন্তু আলাপ-আলোচনা করে দেখা গেলো একটি পরিপূর্ণ গোরস্তানের চিন্তা করা এখন সম্ভব নয়। সরকারি জমি ছাড়া গোরস্তান হবে না। শেষ পর্যন্ত ঢাকা-আরিচা সড়কের এক জায়গায় রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে মাটি দেয়া হয় কাজলকে।

BanglaBook.org

পরদিন সিটি টেরোরাইজিং অপারেশন করার জন্য প্রস্তুতি নেয় ওরা। ওদের ইচ্ছে ছোট-বড় নানাধরনের অ্যাকশন করে শহরবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বুঝবে যে গেরিলারা শহর জুড়ে তৎপর। বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলোও বুঝতে পারবে যে গেরিলাস ক্যান মুভ এ্যাট ঢাকা সিটি এ্যাট দেয়ার উইল। ওদের সঙ্গে ছিলো এমকে–১৪ ও এমকে-১৬ মাইন। সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টি হচ্ছিলো। ওদের দলে ছিলো পাঁচজন। নিজের টয়োটা করোলা ড্রাইভ করছিলো সামাদ। মোহাম্মদপুর থেকে ওদের যাত্রা শুরু। আইয়ুব গেটের কাছাকাছি এলে ওরা দেখতে পায় মিরপুরের দিক থেকে একটি আর্মি কনভয় আসছে। পেট্রোল নেবার ছল করে ওরা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামায়। কনভয় আসার আগেই উলফত দ্রুত রাস্তায় ক'টি মাইন পেতে দিয়ে আসে। কনভয়ের প্রথম দুটি গাড়ি বিনা বাধায় পেরিয়ে যায়। তৃতীয় গাড়ির চাকা মাইনের আঘাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বার্স্ট করে।

লোকজনের হৈ-চৈ ছুটোছুটির মাঝে ওরা নির্বিবাদে পালিয়ে আসে। ওরা এসে পৌঁছুয় হাইকোর্ট– ময়মনসিংহ রোড ক্রসিং-এর ট্রাফিক রাউন্ড এবাউটের কাছে। দেখতে পায় হাইকোর্টের দিক থেকে আসছে দোতলা বাস। বাসের যাত্রীরা সব বিহারি। উচ্চ স্বরে হাসাহাসি-গালগল্প করছে। বাস স্ট্যান্ডে গাড়িটি দাঁড়াতেই উলফত ও বাপী চাকার নিচে পেতে দেয় মাইন। কিছুক্ষণ পর বাসটি চলতে শুরু করলে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায় বাসের টায়ার। সঙ্গে সঙ্গে বাসটি কাত হয়ে পড়ে যায়। ওরা ততোক্ষণে কার্জন হল এলাকা ছাড়িয়ে আসে। গাড়ি ছুটছে নিউ মার্কেটের দিকে। সেখান থেকে ওরা মিরপুর রোড ধরে এগোয়। গ্রীন রোডের মোড়ে আসতেই দেখতে পায় মোড়ের পেট্রোল পাম্পে কয়েকটি মিলিটারি জিপ পেট্রোল নিচ্ছে। ওরা নিজেদের গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির রাস্তায় হামিদ এমকে-১৬ মাইন বসিয়ে দেয়। ওদের গাড়ি একটু এগোতেই শুনতে পায় বিস্ফোরণের শব্দ। গাড়িটি শূন্যে লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ভেতরের দুই/তিনজন পাকিস্তানি সেনা।

সেদিন ওরা এ পর্যন্তই ক্ষান্ত দেয়। এমন সফল অপারেশনে ওদের খুশির সীমা নেই। আনন্দে-উত্তেজনায় ওরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। তারপর সামাদের ড্রইংরুমে ঘুমিয়ে গেলে ওদের মনে হয় সামনে অন্তহীন সাগর, ওদের সাঁতরে কূলে উঠতে হবে। সে রাতেই ওরা পরিকল্পনা করে আগামীকাল কিছু করতে হবে। পাকিস্তান আর্মি এ দেশে যে গণহত্যার সূচনা করেছিলো আগামীকাল তার তিনমাস পুরো হবে। এ তারিখে এমন কিছু করতে হবে যাতে ওদের ভালো করে একটা শিক্ষা দেয়া যায়। ওরা জানে ধানমণ্ডির বিশ নম্বর রাস্তায় একটি বাড়িতে চীনা দূতাবাসের উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা থাকে। বাংলাদেশে এত বড় গণহত্যার পরও চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। ঐ বাড়ির সামনে পাহারা দেয় বেশকিছু পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশ। আঠারো নম্বর রোডের একটি বাড়িতে একজন ব্রিগেডিয়ার থাকে। সেখানেও পাহারা দেয় কয়েকজন মিলিটারি পুলিশ। ওরা দুটো বাড়িকেই টার্গেট করে।

পরদিন ধানমণ্ডির চার নম্বর রোড থেকে একটি মাজদা গাড়ি হাইজ্যাক করে বদি ও আলম। সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ মিনিটে ধানমণ্ডি আটাশ নম্বর রোডে অবস্থিত ওদের গোপন আস্তানা থেকে বের হয় ওরা। গাড়ি চালায় আলম। ওরা চীনা ডিপ্লোম্যাটের বাসার সামনে গিয়ে দেখে মিলিটারি পুলিশ নেই। ওখান থেকে ওরা আঠারো নম্বর রোডে আসে। ব্রিগেডিয়ারের বাড়ির সামনে পুলিশরা আড্ডা দিচ্ছে। গাড়িটার গতি কমিয়ে বাড়িটার সামনে দিয়ে চালানোর সময় আলম নিচু গলায় কমান্ড দেয় 'ফায়ার'। মুহূর্তে গাড়ির

BanglaBook.org

জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি ছুটে যায়। দুই স্টেনগান থেকে দুটো লেভেল ঠিক করা হয়। বদির স্টেনগান তাক করা হয় ওদের পেটের লেভেলে এবং কাজীর স্টেনগান তাক করা হয় ওদের বুকের লেভেলে। সব ক'জন পুলিশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। এরপর ওরা ধানমণ্ডির বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে সাত নম্বর রোডের ভেতর দিয়ে এসে মীরপুর রোডে ওঠে। দেখতে পায় ট্রাক এবং জিপ দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে এবং রাস্তার ওপর এল. এম. জি নিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে দু'জন পুলিশ। ওদের দেখে মুহূর্তে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বদি আর রুমী বলে ওঠে 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে আলমও। মুহূর্তে গুলি ছুটে যায় এবং ঝাঁঝরা হয়ে যায় ওরা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের গাড়ি ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোডে ঢোকে। একটুপর রুমী খেয়াল করে যে, একটি মিলিটারি জীপ ওদের পিছু ধাওয়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে রুমী স্টেনগানের বাঁট দিয়ে পেছনের কাঁচ ভেঙে ফেলে। গুলি করে বদি এবং স্বপন। ওরা দেখতে পায় জিপটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড়ের ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়।

ওদের গাড়ি এ রাস্তা ও রাস্তা করে ছুটে যায়। একসময় ওরা বুঝতে পারে পেছনে আর কেউ আসছে না। ওরা নিশ্চিন্তে যার যার ঠিকানায় চলে যায়। শুধু প্রতীকের বাড়ি ফেরা হয় না। ওকে রুমী ওর বাড়িতে নিয়ে যায়। কাজলের মৃত্যুর পর প্রতীক আর বাড়ি ফেরেনি। ওর মনে হয় ও কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না। আলী আহমদ কেমন নির্জীব হয়ে গেছে, মঞ্জুলিকা অপেক্ষা করতে শিখেছে, পুষ্পিতার জন্য অজেয় এক নতুন কাজ– কিন্তু কোথাও কোনো আনন্দ নেই। ওরা শোকার্ত, বিধ্বস্ত অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য উন্মুখ। রাতে ঘুমোনোর আগে রুমী বলে, গেরিলাদের পরবর্তী পরিকল্পনা পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেয়া। উলান আর গুলবাগ পাওয়ার স্টেশন একই দিনে উড়িয়ে দেয়া হবে।

আমি উলান অপারেশনে যাবো। প্রতীক পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে। অল্পক্ষণে ওর ঘুম এসে যায়। রুমী বাতি বন্ধ করে দেয়।

পরদিন সকাল দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকর্মী সিঁড়ির নিচে পথ আটকায় আলী আহমদের। কুশল জিজ্ঞেস করে চোখ কুঁচকে বলে, ঢাকা শহরে গেরিলা তৎপরতা বেশ বেড়ে গেছে, খেয়াল করেছেন?

হ্যাঁ, রোজই তো একটা না একটা কিছু ঘটছে।

আপনার কি মনে হয়? সবই তো ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাজ, তাই না?

আমি কি করে বলবো।

ওরা ছাড়া আর কে এমন করবে? ওরাই তো পাকিস্তান ভাঙার পাঁয়তারা করছে। আপনার তা মনে হয় না।

আলী আহমদ দ্বিধা নিয়ে বলে, এসব রাজনীতি আমি বুঝি না। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলে, বোঝেন, বোঝেন, অনেক কিছু বোঝেন। আপনি একটা ঘোলা জলের মাছ।

আলী আহমদ কথা না বলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। ভদ্রলোক পেছন থেকে ডাকে, শুনুন আহমদ সাহেব?

কিছু বলবেন?

দু'তিনদিন আগে আপনার কোনো আত্মীয় কি মারা গেছে?

আলী আহমদ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে এবং স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, হ্যাঁ।

আপনার কে হয়?

আত্মীয়ের ছেলে। গ্রাম থেকে চিকিৎসার জন্য এসেছিলো।

কোন গ্রাম?

BanglaBook.org

রাজশাহীর নাচোলে ওদের বাড়ি।

ও আচ্ছা। তো জানাজার জন্য আমাদের খবর দিলেন না যে?

ইচ্ছে করেই ডাকিনি। শুধু শুধু আপনাদের বিরক্ত করা।

ছি, ছি, কী যে বলেন, বিরক্ত হবো কেন? মুসলমানের লাশের জানাজা পড়া তো প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

আলী আহমদ চুপ করে থাকে।

তা, কোথায় কবর দিয়েছেন। আজিমপুরে?

হ্যাঁ।

পুরনো না নতুন গোরস্তানে?

টাকা থাকলে আমি ওর জন্য নতুন গোরস্তানে কবরের জায়গা কিনতাম, কিন্তু আমার তো অতো টাকা নেই।

আলী আহমদের চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ভদ্রলোক কি বুঝলেন কে জানে, গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুধু দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তাই বুঝি পুরনোটায় মাটি দিতে হলো? যাবো একদিন আপনার সঙ্গে কবর জেয়ারত করতে।

আলী আহমদ আর কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। ওর মেজাজ খারাপ হতে গিয়েও হয় না– আশঙ্কা জাপটে ধরে ওকে। ওই লোক এত খবর জানলো কি করে? এর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? ও কি কোনো সন্দেহ করছে? আলী আহমদ চিন্তিত হয়ে যায়।

দু'দিন পর কয়েকজন পাক-সেনা আসে ওর বাড়িতে। ধমাধম বুটের লাথি পড়ে দরজায়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠলে দুটো লাথি খেয়ে কুঁইকুঁই করে। তারপর নিচে গিয়ে ভীষণ জোরে চেঁচাতে থাকে। আলী আহমদ বুঝতে পারে সমূহ বিপদ। পুষ্পিতা মঞ্জুলিকাকে অজেয়সহ ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখে। সোনাই আছে ওর সঙ্গে।

আলী আহমদ বুঝতে পারে ওরা শুধু দরজায় লাথি দিচ্ছে না একই সঙ্গে গালাগালও করছে। ও দরজা খুলে দেয়। সৈনিক ক'জন রাইফেল উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে চেঁচাতে থাকে, মুকুত কিধার?

আলী আহমদ ও পুষ্পিতা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পিতা থরথর করে কাঁপছে। এই বুঝি পড়ে যায়, এমন অবস্থা। আলী আহমদ ওকে ধরে ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ওরা দেখতে পায় বেয়নেটের মাথায় উড়ে যাচ্ছে তুলা– ওরা ছিঁড়ছে তোষক, বালিশ, সোফার গদি। লাথি দিয়ে উল্টে ফেলে দিচ্ছে হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন, চেয়ার-টেবিল। দু'জন নীরব দর্শক। পুষ্পিতা শক্ত করে ধরে রেখেছে আলী আহমদের হাত। সোনাই পুষ্পিতার কোলে মুখ গুঁজে রেখেছে। অল্পক্ষণে ওরা ঘুরে ফিরে এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়– বুকের ওপর চেপে ধরে বেয়নেট।

মুকুত কিধার?

আলী আহমদ ঢোক গিলে। ও আজরাইল দেখেনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে আজরাইল কি, দেখতে কেমন– কি তার আকার। বুঝতে পারছে আজরাইল কিভাবে মানুষের প্রাণটুকু হাতের মধ্যে খামচে ধরে।

আবার সেই প্রবল গর্জনে হুঙ্কার ওঠে, মুকুত কিধার?

আলী আহমদ পরিষ্কার বাংলায় বলে, এখানে কোনো মুকুত নাই।

হয়তো ওরা ওর মাথা নাড়া দেখে একটা কিছু বুঝে নেয়। চেঁচিয়ে বলে, শালা

BanglaBook.org

বাহেনচোত। শুয়োরকা বাচ্চা, মুকুত নেহি তো তোম চলো।

একজন রাইফেলের নল দিয়ে ওর পিঠে গুঁতো দেয়। ও দু'পা সামনে এগিয়ে যায়। পুষ্পিতা ওর হাত ছাড়ে না। ওরা আবার একটা গুঁতো দিলে আলী আহমদ হাঁটতে শুরু করে। সিঁড়ির গোড়ায় এসে ও আস্তে করে বলে, আমার হাত ছাড়ো পুষ্পিতা।

না, না।

আহ্, পুষ্পিতা, এমন করলে ওরা তোমাকে মারবে। আমি চাই না ওরা তোমাকে মারুক।

এই ভাগ, ভাগ হিঁয়াসে।

না, না। ও কেন যাবে? কোথায় নিয়ে যাবে ওকে?

নিকাল যাও। একজন ওর চুলের মুঠি ধরে জোরে ধাক্কা দিলে পুষ্পিতা ছিটকে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে পারে না। মাথা টলে যায়– প্রচণ্ড ব্যথা শরীরের ভেতর প্রবাহিত হয়। ও দেয়াল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, পারে না, শুধু মাথা উঠালে দেখতে পায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে আলী আহমদকে আঘাত করলে ওর নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে জামা ভিজে যায়। দুপদাপ করে নেমে যাচ্ছে ওরা। বাড়ি জুড়ে জেগে থাকে কতগুলো পায়ের শব্দ। পুষ্পিতা খুব সচেতনভাবে সজাগ থাকার চেষ্টা করে। ও ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। চেষ্টা করে, শব্দ মিলিয়ে গেছে। অল্পক্ষণে গাড়ি স্টার্ট দেয় ওরা। প্রবল গর্জনে বেরিয়ে যায় মিলিটারি জিপ। পুষ্পিতা দেয়ালের সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে রাখে– শুধু অনুভব করে উনত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম ও আলী আহমদ থেকে আলাদা হলো। ওর মাথা ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু না কোনোকিছু বেশিক্ষণ ফাঁকা থাকে না। অজেয়র কান্না ভেসে আসে– অজেয়র কান্নায় পূর্ণ হয়ে যায় ওর শূন্য কোটি। ওর মনে পড়ে মঞ্জুলিকা ও অজেয়কে ও ভাঁড়ার ঘরে আটকে রেখেছে। সে ঘরের চাবি ওর আঁচলে বাঁধা। ও পা সোজা করে, ফুলে ওঠা কপাল এবং মাথায় হাত বুলোয়– ও চোখ কচলে নেয়। কুকুরটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গতকাল আলী আহমদ ওটাকে গোসল করিয়েছে– ওর জন্য মাংস কিনে এনেছে। জিতু নেই বলে নিজ হাতে ওটাকে খাবার দিতো। পুষ্পিতা মাথা ঝাঁকিয়ে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ায়। মঞ্জুলিকা অজেয়র কান্না থামাতে পারে না। পুরো বাড়িতে সে কান্নার এক মহাপ্লাবন বয়ে যায়। পুষ্পিতা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। কুকুরটা বসে থাকে দরজার সামনে।

এমপি হোস্টেলের ছয় ফুট বাই আট ফুট আকারের ছোট একটি ঘরের মেঝেতে অনেকের সঙ্গে দেয়াল ঘেঁষে উবু হয়ে বসে আছে আলী আহমদ। নিজের হাত বারবার ঠোঁটের ওপর উঠে যায়। বুঝতে পারে যে ঠোঁটটা ফুলে গেছে– ভারী হয়ে আছে, ব্যথাও করছে। একসময় ও দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে শরীর ছেড়ে দেয়। চোখের পাতা ফেলতে কষ্ট হয়, ওটাও ফুলে আছে। খুব ইচ্ছে করছে চোখ বুজে থাকতে, কিন্তু পারছে না– বারবারই চোখ খুলে যায়। সামান্য একটু শব্দ, একটু গোঙানিতে চমকে তাকায়। এই বুঝি কেউ এলো, নতুন কেউ– এরা সবাই তো সেসব মানুষ, যারা গেরিলাদের আশ্রয় কিংবা সরাসরি গেরিলা। একে একে তো সব কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, জিজ্ঞেস করা যায়ও না– প্রত্যেক প্রত্যেককে অনুভব করতে পারে কেবল। ঘরজুড়ে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

একসময় হাট করে দরজা খুলে যায়। যে মানুষটিকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় দু'জন সেপাই তাকে দেখে চমকে ওঠে আলী আহমদ। আলতাফ মাহমুদ! ওদের

BanglaBook.org

ধাক্কায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয়। ছেলেদের মধ্যে অনেকে জায়গা ছেড়ে দেয়, আলতাফ ভাই এখানে বসুন।

আলতাফ আলী আহমদের দিকে তাকিয়ে হাসে, আপনিও। আলী আহমদ দেখতে পায় বুকের কাছে ওর গেঞ্জি রক্তে ভিজা। নাক মুখে রক্ত লেগে আছে– তখনো তাজা, শুকিয়ে কালচে হয়ে ওঠেনি। চোখ-ঠোঁট সব ফুলে গেছে। তবু কেমন ঋজু এবং সাহসী দেখাচ্ছে– মানুষটি একটুও ভেঙে পড়েনি। আলী আহমদের দু'কান ভরে বেজে ওঠে একুশের গান– আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো– সে গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ বায়ান্নোকে যেমন নিজের মধ্যে ধরে রেখেছিলো তেমনি একাত্তরকেও। তাঁর শরীরের এক ফোঁটা রক্তও যদি মাটিতে পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে নিজের রক্ত দিয়ে তিনি ভিজিয়েছেন একাত্তরের মাটি, তাঁর প্রিয় স্বদেশ।

কি ভাবছেন প্রফেসর? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে আলতাফ মাহমুদ।

আপনার কথা– বাহান্নোর গানের সুরের কথা– ঐ গানটি শুনলে আমার ভেতরে তোলপাড় করে ওঠে। আলী আহমদের হাত চেপে ধরে আলতাফ বলে, এখন ব্যক্তির কথা নাইবা ভাবলেন। সবার কথা ভাবুন। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভাবুন। স্বাধীনতার কথা ভাবুন।

আলী আহমদ লজ্জা পায়। ঠিক কথাই বলেছে মানুষটি। তখন আলতাফ মাহমুদ ছেলেদের দিকে ঘুরে বলে, তোমরা সবাই ওদেরকে একটি কথাই বলবে যে তোমরা কেউ কিছুই জানো না। যা কিছু করেছি, সব আমি করেছি। যা কিছু স্বীকার করার, আমি করবো। তোমরা কিন্তু কেউ কাউকে চেনোও না।

দরজা খুলে যায়। দু'জন সেনা ঢুকে একটি ছেলেকে বের করে নেয়। ও হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আলতাফ দাঁড়াতে গেলে একজন ওর হাত চেপে ধরে। বলে, ও আমাদের ছেলে নয়। হয়তো নির্দোষ। গোলমালে ধরা পড়েছে। আপনি কতজনের সাফাই গাইবেন মাহমুদ ভাই?

আলতাফ মাহমুদ নিশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের কিছু ভুলের জন্য শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে ওরা। গ্রেফতারও করেছে অনেক। আমারই উঠোন থেকে আমারই হাতে মাটি খুঁড়িয়ে অস্ত্রের বাক্সটি নিয়ে গেছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরেছে আমাকে। এতে দুঃখ নেই। দুঃখ অস্ত্রের বাক্সটির জন্য।

কেউ কোনো কথা বলে না। প্রত্যেকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু কোথায় তাকিয়ে আছে কিংবা কি দেখছে তা কেউই জানে না। আসলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখ দেখছে, নইলে দেখতে পায় সাদা দেয়াল এবং একটি বন্ধ দরজা। আসলে প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে নিজস্ব স্মৃতি, আলোকিত কিংবা অন্ধকারে ভরা স্মৃতি– এখন শুধুই তাকিয়ে থাকা– এক অনির্দিষ্ট শূন্যতা সামনে রেখে। বাইরে সন্ধ্যা উতরে গেছে– রাত নেমেছে।

তখন গেরিলারা উলানে ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওরা সঙ্গে নিয়েছে বিশ পাউন্ড পিকে ও পনেরো ফুট প্রাইমা কর্ড, প্রায় তিন মিনিট মেয়াদী সেফটি ফিউজওয়্যারে এবং ডেটোনেটর। দশ পাউন্ড করে পিকের দু'টি চার্জ প্রাইমা কর্ড দিয়ে সংযোজিত করে ট্রান্সফরমারের দু'পাশে ফিট করা হবে বলে ঠিক করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় অপারেশনের অগ্রগামী দল হিসেবে থাকবে গাজী ও নীলু– সঙ্গে স্টেনগান। প্রথম মতিন ট্রান্সফরমারের গায়ে চার্জ বসাবে। গেটে পাহারায় থাকবে জিন্নাহ। সঙ্গে থাকবে একটি রিভলবার। দ্বিতীয় মতিন টেলিফোনের লাইন কেটে দেবে। গ্রেনেড-৩৬ নিয়ে তৈরি থাকবে প্রতীক।

অপারেশনের সময় ঠিক হয়েছে রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নয়টা। উলান

BanglaBook.org

পাওয়ার স্টেশনটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নির্ধারিত স্থানে চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে ওরা গাড়ি থেকে নামে। গাড়িটি ওদের জন্য অপেক্ষা করবে। অপারেশনের পর ঐ গাড়িতে উঠেই পালাবে ওরা। ওরা কয়জন নিঃশব্দে এবং আচমকা পাওয়ার স্টেশনের পুলিশ ও দারোয়ানের সামনে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডস-আপ বলে চিৎকার করে ওঠে। ওরা তৈরি ছিলো না, খানিকটা শিথিল মুডে আড্ডা দিচ্ছিলো। পুলিশ দু'জন নিজেদের রাইফেল হাতে উঠিয়ে নেবারও সুযোগ পায় না। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের পাহরায় থাকে দু'জন, বাকিরা ভেতরে ঢুকে যায়।

দশ পাউন্ড পিকে দিয়ে যে দুটি চার্জ বানানো হয়েছিলো সেগুলো প্রাইমা কর্ড দিয়ে দ্রুত বেঁধে ফেলা হয় ট্রান্সফরমারের গায়ে। কর্ডের দৈর্ঘ্যের ঠিক মাঝখানে বসানো হয় ডেটোনেটর-২৭। এক মিনিটের ফিউজওয়্যার দেয়া হয়। প্রথমবার চার্জ লাগানোর পর ওরা বুঝতে পারে যেভাবে লাগানো হয়েছে তাতে ট্রান্সফরমার ধ্বংস করা যাবে কিন্তু 'বেস-বার' উড়ানো যাবে না। ওরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার নতুন পজিশনে চার্জ লাগায়। আটটা চুয়াল্লিশ মিনিটে ইগনাইট করা হয়– আটটা সাতচল্লিশ মিনিটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে সমগ্র এলাকা। ধ্বংস হয়ে যায় ৩০/৪০/৫০ এমভিএ ট্রান্সফরমারটি। অন্ধকারে ডুবে যায় পুরো এলাকা।

ফেরার পথে ওরা দেখতে পায় রামপুরা টেলিভিশনের পুলিশরা রাস্তার ওপর পজিশন নিয়েছে। ঐ পথে আর ফেরা হয় না। সবাই মিলে বাড্ডার বিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিল সাঁতরে ওরা নিরাপদ আশ্রয়ে যাবে। ভরা বর্ষার বিল– প্রবল স্রোত। সাঁতরাতে কষ্ট হচ্ছে প্রতীকের। ও ক্লান্ত হয়ে গেলে চিৎ সাঁতারে শরীরের ভার ছেড়ে দেখতে পায় তারাভরা আকাশ। ভাদ্রের শুরু হলেও আকাশে তেমন মেঘ নেই, চাঁদ আছে। চাঁদের ছায়া ভাসে জলের বুকে। অন্যরা কে কোথায় গেছে ও জানে না। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না– ও ভেসে যাচ্ছে, কোথাও আশ্রয়ের জন্য উঠতে হবে ওকে।

তখনো রাত দশটা বাজেনি। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকে মঞ্জুলিকা। কানের কাছে ট্রানজিস্টার। মৃদু ভল্যুমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' শুনছে। নিরিবিলি হয়ে গেছে শহর। গেরিলাদের দুর্ধর্ষ অপারেশনগুলো এখন শহরের আলোচনার বিষয়। প্রতিদিন বিকেল হতেই জনশূন্য হয়ে যায় শহরের রাস্তা। সাধারণ মানুষ যে শুধু ভীতি থেকেই ঘরে ফিরে তা নয়, তারা অনেকে অপেক্ষা করে বোমার শব্দ শোনার জন্য।

অপেক্ষা? ও নিজেও তো অপেক্ষা করছে। আজও কিছুক্ষণ আগে কাছাকাছি কোথাও বোমা ফেটেছে– দূর থেকে ভেসে এসেছে বিস্ফোরণের শব্দ। এমন শব্দ শুনলে ওর অপেক্ষার তীব্রতা বেড়ে যায়, ভাবে হয়তো কেউ না কেউ আসবে। কাজলের কথা ভেবে শক্ত হয়ে যায় মঞ্জুলিকা। আরো কোনো কাজল আসবে, তাকে ও সারিয়ে তুলবে। ফেরত পাঠাবে গ্রেনেড হাতে নিয়ে। ওরা এই শহরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। পঁচিশের পর ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিলো মানুষ– ভেবেছিলো এই বুঝি শেষ– কিন্তু শেষেরও তো শুরু আছে– সে শুরুর বিকেল আছে– পরিণতি আছে। ও চোখ বুজে নিজের সঙ্গে কথা বলে, যেন ও নিজে একজন গেরিলা, অপারেশন শেষে অস্ত্র হাতে দৌড়ে যাচ্ছে কোনো আশ্রয়ের খোঁজে। ও মানুষদের বলে, তোমরা থাকো শহর জুড়ে– আমরা তোমাদেরই ছায়ায় মিশে থাকবো– তোমরা যেও না অন্য কোথাও। তোমাদেরকে খুব দরকার আমাদের। ইজিচেয়ারে হেলান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কান্না পায়। আলী আহমদ এখনো ফিরে আসেনি। নিজের কান্না ঠেকানোর জন্য ও ওয়ার্ডরোবের ভেতর কাপড়ের ভাঁজে রাখা প্রদীপ্তর চিঠি দুটো বের করে নিয়ে আসে। ক'দিন আগে ও একটি ছেলেকে দিয়ে আর

BanglaBook.org

একটি চিঠি পাঠিয়েছে। ও এখন প্রদীপ্তর চিঠিরও অপেক্ষায় থাকে। একটি চিঠি মানে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ইজিচেয়ারে শুয়ে দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে ও।

'ভাবতে পারো ইদানীং প্রায়ই নিজের দেশের ভেতর ঢুকছি। বিভিন্ন অপারেশনে যেতে হয়। আগামীকাল একটি ব্রিজ ওড়াতে যেতে হবে। অপারেশনের অস্ত্রসম্ভারের মধ্যে আছে চল্লিশ পাউন্ড বিস্ফোরক। কারটস একশ ফুট, দশটি ডেটোনেটর, ষোলটি ফিউজ ও সেফটি ম্যাচ, তিনটি স্টেনগান, চারটে রাইফেল ও আটটা গ্রেনেড। ভাববে চিঠির ভাষা কেমন বদলে গেছে আমার। এখনকার জীবন যুদ্ধে যাওয়া, যুদ্ধের পরিকল্পনা করা, সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান দেখা। মেজর অনন্ত সিংহের অধীনে যুদ্ধ করছি। যে ক্যাম্পে আছি তার তদারক করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। তারা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রেশন দেয়, মাস গেলে পঞ্চাশ রুপী পাই ভাতা। এছাড়া আমাদের ভালোমন্দের খোঁজ তো সারাক্ষণই রাখে ওরা। মেজর সিং চমৎকার মানুষ। বলেন, দেশকে মুক্ত করতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। অথচ কে না জানে যুদ্ধ ধ্বংস ছাড়া কিছুই দেয় না। তারপরও যুদ্ধ করতে হয়। কারণ রাজনীতি। অনলি ফর পলিটিকস টু-ডে উই আর এ্যাট ওয়ার। আমি জানি তোমরা একদিন নিজের দেশে ফিরে যাবে। জয় বাংলা। তাঁর কণ্ঠে জয় বাংলা শুনতে আমরা খুব মজা পাই। এটা এখন আর স্লোগান নয়। এটা আমাদের রণধ্বনি এবং সম্ভাষণের ভাষাও। আগামীকাল ব্রিজ ভাঙার অপারেশন রাত একটায়। মুক্তিযোদ্ধাদের পনেরো জনের একটি দল। আজকের কমান্ডার আমি নিজে। ট্রেনিংয়ের সময় আমরা শিখেছি কেমন করে এক্সপ্লেসিভ দিয়ে ব্রিজ ওড়াতে হয়। অপারেশনটা রিস্কি। পাকবাহিনী নিয়মিত পেট্রোল.....।'

চিঠিটা শেষ করেনি প্রদীপ্ত। হয়তো যাকে দিয়েছে তার খুব তাড়া ছিলো। মঞ্জুলিকা চিঠি দু'টো বুকের ওপর রেখে দেয়। ওর গভীর বিশ্বাস পরের চিঠিতে প্রদীপ্ত সাফল্যের বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখবে। ও লিখেছে চিঠির ভাষা বদলে গেছে, মঞ্জুলিকা মৃদু হাসলো। বিয়ের আগে দু'জনে কত অজস্র চিঠি লিখেছে আর ছিঁড়েছে। ওই ভাষায় এখন লিখলে সে চিঠি মঞ্জুলিকা পড়তে পারতো না। এটাই আসল চিঠি। এমন চিঠিই তো ও চায়, শুধুই যুদ্ধের খবর। এটাই প্রেম। মঞ্জুলিকার চোখে আবার জল আসে। ও মোছে না, সে জল গড়াতে দেয়।

প্রতীক সাঁতরে কূলে উঠেছে। বাড্ডার কোনো একটি বাড়ির পেছন দিকে। মলের উৎকট গন্ধ আসছে, কাছাকাছি কোথাও হয়তো কাঁচা পায়খানা আছে। ঝোপঝাড় বলে অন্ধকার আরো ঘন। নাকে হাত চাপা দিয়ে ও পেরিয়ে যায় সে জায়গা। টিনের বাড়ি, বারান্দায় মোম জ্বলছে। দু'তিনজন নারী-পুরুষ বসে আছে। পায়ের নিচে পাতার শব্দে বারান্দা থেকে সতর্ক কণ্ঠ ভেসে আসে, কে?

প্রতীক দ্বিধা করে, হঠাৎ সাড়া দেয় না।

আবার উচ্চ কণ্ঠ ভেসে আসে, কে? ভালো চাওতো কথা বলো।

উঠোনে নেমে আসে একজন। কাছাকাছি আসতেই প্রতীক নিচু স্বরে বলে, চেঁচামেচি করবেন না। আমি আশ্রয়ের জন্য এসেছি।

এদিক দিয়ে কিভাবে এলেন? এদিকে তো কোনো পথ নেই?

বিল সাঁতরে এসেছি।

তাহলে আপনি কি উলান–

হ্যাঁ। আপনি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

মানুষটি সতর্কতার সঙ্গে বলে, ভয় নেই। আসুন।

প্রতীক বারান্দায় উঠে আসে। ওরা ছয়জনের একটি পরিবার। রাতের খাবার খেয়ে

BanglaBook.org

বারান্দায় বসে গল্প করছিলো। ওকে দেখে মানুষটির স্ত্রী রান্না ঘরে ছুটে যায়। বড় মেয়েটি বাবার লুঙি গামছা নিয়ে আসে। ছোট মেয়েটির হাতে সাবান। ছেলেটি দু'বালতি পরিষ্কার পানির জন্য টিউবওয়েল চাপতে থাকে। যেন একজন মানুষের আগমনে বাড়িতে উৎসবের সাড়া জেগেছে। ওরা সবাই একটা কিছু করার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

দরজা বন্ধ করে খেতে দেয়া হয় ওকে। ওর চারপাশে গোল হয়ে বসে ওরা। গোসল করার পর ঝরঝরে লাগছে শরীর এবং এই পরিবারের আতিথেয়তা প্রতীকের মনোবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। ও গপাগপ ভাত খায়। বুঝতে পারে কী ভীষণ খিদে পেয়েছে। থালার ভাত কমে আসতেই আরেক চামচ ভাত তুলে দেয় মহিলা। প্রতীক তার চোখের দিকে তাকালে মহিলা হেসে বলে, ভালো করে না খেলে যুদ্ধ করার শক্তি আসবে কোথা থেকে। আমার দরজা তোমার জন্য খোলা বাবা, তুমি যখন খুশি আসবে।

মানুষটি সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। ছেলেমেয়েরাও এক সঙ্গে সেই কথা বলে।

খাওয়া-দাওয়া হলে মানুষটি বলে, আমার মেয়ে তোমার জন্য বিছানা পেতে রেখেছে বাবা। তুমি শুয়ে পড়ো।

যুবক ছেলেটি আগ্রহ ভরে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। আমাকে নেবেন?

এখন না। দরকার হলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো।

মানুষটি আবার বলে, তুমি ঘুমোও বাবা। আমরা বারান্দায় বসে থাকবো সারারাত, যেন একজন পাকিস্তানি সৈনিক বা একজন রাজাকার তোমাকে ছুঁতে না পারে।

বড় মেয়েটি মোম উঁচিয়ে বলে, আসুন আপনার বিছানা দেখিয়ে দেই। রাতে হয়তো গরম লাগবে। তারপর মৃদু হেসে বলে, পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দিয়েছেন ফ্যানতো চলবে না।

ছেলেটি বলে, আপনার যতক্ষণ ঘুম না আসে আমি আপনাকে বাতাস করতে পারি।

না, না, তার দরকার নেই। আমি শুলেই ঘুমিয়ে পড়বো।

আমার কোনো কষ্ট হবে না। কিন্তু, আপনি কত কষ্ট করে এতবড় বিল সাঁতরে এলেন।

আমার কোনো কষ্ট হয়নি। চলুন, কোথায় ঘুমুবো।

প্রতীক তড়িঘড়ি কথা বলে। ও ওদের সামনে থেকে পালাতে চায়।

BanglaBook.org

আলী আহমদের মনে হয় রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ঝিমুনির মতো এসেছিলো ওর। ঐ হালকা তন্দ্রার মাঝে স্বপ্ন দেখছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে গেছে। ক্লাসরুমে ঢুকে দেখে ঘর ফাঁকা। একজন ছাত্রও নেই। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ডেস্কের ওপর এক টুকরো সাদা কাগজ। কোথা থেকে এত কাগজ এলো। ও ভীষণ কৌতূহল নিয়ে কাগজগুলো তুলতে যায়। এক টুকরো কাগজ তুলে দেখতে পায় লেখা আছে 'স্যার, আমরা যুদ্ধ করতে গেলাম। ফিরে এসে ক্লাস করবো।'

আনন্দে-উত্তেজনায় আলী আহমদ দিশেহারা হয়ে যায়। সব কাগজগুলো কুড়িয়ে নেয়। তারপর হাতের মুঠি ভরে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, যাও, উড়ে যাও। প্রত্যেক ঘরে-ঘরে খবর পৌঁছে দাও যে, ছেলেরা যুদ্ধে গেছে। এখন আর ওরা ক্লাসে বসে পড়া শিখবে না। আমি ওদের জন্য এই ক্লাস ঘরে অপেক্ষা করবো। ওরা ফিরে আসবে।

তখন কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ওকে ঘিরে ধরে। চিৎকার করে বলে, শালা বাহেনচোত, তুমহারা স্টুডেন্ট কিধার গিয়া।

ও বুকটান করে গর্বের সঙ্গে বলে, সবাই যুদ্ধে গেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। দেখে নিও তোমরা ওদের সঙ্গে পারবে না।

শালা, গাদ্দার। মালাউন কা বাচ্চা।

ওরা আলী আহমদের বুকের ওপর রাইফেলের নল চেপে ধরে। তখন খট করে দরজা খুলে গেলে সে শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায় আলী আহমদের। ও সোজা হয়ে বসে। তিনজন সৈনিক ঢুকে আলতাফ মাহমুদসহ কয়েকজন যুবককে উঠিয়ে নেয়। আলী আহমদের মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। ওর আর কোনো ঝিমুনি নেই। বুঝতে পারে আসলে ও কোনো স্বপ্ন দেখেনি। ও যে কোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরি করে। রাত কত ও জানে না। ভেবেছিলো রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে এটা বুঝি এক গভীর রাত– এ রাত শেষ হতে সময় লাগে।

আবার আসে ওরা। সরাসরি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টানে ওকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওর তলপেট ভারী হয়ে গেছে– যেকোনো সময় পেশাব হয়ে যেতে পারে। সেই সকালের পর ওর পেশাব করার সুযোগ হয়নি। এখন আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ও সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই পেশাবকে ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে, হয়তো ওদের মুখের ওপর পারবে না, কিন্তু চেয়ার-ঘর-বারান্দা নষ্ট করতে পারবে।

বারান্দার শেষ মাথায় যে ঘরে ওকে এনে ঢোকানো হয় সেটি দেখে ও বুঝে যায় যে এটি একটি নির্যাতন সেল– চোখ ধাঁধানো বাতির নিচে নিয়ে ওকে বসায় ওরা। তারপর প্রশ্ন শুরু করে।

তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছো?

ছেলেমেয়েদের যুদ্ধে যাবার জন্য উস্কে দিচ্ছো?

তুমি কতজন মুক্তিযোদ্ধা চেনো?

কতজনকে আশ্রয় দিয়েছো?

বলো অস্ত্র কোথায় রেখেছো?

BanglaBook.org

আলী আহমদ বোবা। কোনো প্রশ্নের জবাব ও দেয় না। কোনোদিনও কথা বলতে শিখেছে কি না ও নিজেই জানে না। চোখের ওপর তীব্র ঝাঁঝালো আলোয় ও মুখটা এপাশ থেকে ওপাশে ঘোরায়।

একজন তীব্র ভাষায় বলে, ইয়ে সেরাসার শয়তান হ্যায়। উস্কো মুহছে কই বাত নেই নিকেলগি। আর একজন সুঁই এনে ওর আঙুলের মাথায় ফোটাতে থাকে। ও মুখ বন্ধ করে সহ্য করে। শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বের হয়। কোনো আর্ত চিৎকার নয়। আর মাথার ভেতর তীব্র ঝলক। একটা প্রতিবাদ করতে হবে, অন্তত একটা কিছু। ডান হাতের আঙুলে সুঁই ফোটানো হয়েছে, বাম হাতটা বাকি। লোকটি আর একটি সুঁই আনতে পাশে গেলে ও সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের জিপ খুলে ফেলে। লোকটি সুঁই আনতে আনতে বলে, উস্কো সহিতরা বাইট করনা চাহিয়ে।

তখন সাঁই করে ছুটে আসে পেশাব– লম্বা একটা সাদা রেখা গিয়ে লোকটির চোখে-মুখে আঘাত করে। এবং একই সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে লোকটার গায়ে। ও এক লাফে পাশে সরে যায়। ভিজে যেতে থাকে মেঝে। লোকটি আচমকা হকচকিয়ে গিয়ে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, এ্যাই উস্কো চাবুক লাগাও।

লকলকে চাবুক ওর পিঠে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে আলী আহমদ। ওর আর কিছু মনে থাকে না।

জ্ঞান ফিরে এলেও আলী আহমদের চোখের পাতা খুলতে কষ্ট হয়। হাত নড়াতে পারছে না, অসহ্য ব্যথা। পিঠের নিচে ঘাস যেন সুঁইয়ের মতো ফুঁড়ছে। ওর মাথা পরিষ্কার– চিন্তা করতে পারছে এবং বুঝে নিয়েছে যে নির্যাতনের পর ওকে এ জায়গায় ফেলে দিয়ে গেছে ওরা, হয়তো ভেবেছে মরে গিয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে জায়গাটা কুর্মিটোলা। রাস্তায় লোক চলাচল নেই। কেবল ভোর হয়েছে, আলো ফুটছে– দূরের গাছের মাথায় হালকা মেঘের আড়ালে সূর্য। ও বড় করে শ্বাস নেয়। অনুভব করে নির্যাতনের মাত্রা মাংসের উপর দিয়ে গেছে, হাড় ভাঙেনি। ও কষ্ট করে উঠে বসে। অনেকক্ষণ বসে থাকে।

প্রথম যে গ্রামবাসী আলী আহমদকে দেখতে পায় ওর নাম হারেছ। বয়স তেত্রিশ। পরনে লুঙি, গায়ে গেঞ্জি। ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে বেরিয়েছে। মাটি কাটার কাজে যাবে। ওর সামনে উবু হয়ে বসে।

আপনেরে এমুন পিডাইলো কেডা? পিঠটা তো ফালা ফালা কইরা ফালাইছে। ওরা কি মানুষ না পিশাচ?

আলী আহমদ লোকটির মুখের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে লোকটি। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, বুঝছি, কারা মারছে। প্রবল প্রশান্তিতে ভরে ওঠে আলী আহমদের বুক। লোকে বুঝুক, লোকে বুঝতে শিখুক। কেউ কাউকে কিছু বলবে না, সবাই নিজে নিজেই বুঝবে।

দ্বিতীয় যে গ্রামবাসী আসে তার নাম মাখন। গরু নিয়ে বেরিয়েছে। মাঠে যাচ্ছে। বয়স তিরিশ। পরনে লুঙি আর গেঞ্জি, রঙটা চটে গেছে, একসময় হয়তো নীল ছিলো। আলী আহমদকে দেখে আর নড়তে পারে না। দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ওর গরুটা মাঠে নেমে গেছে। ওটাকে বাঁধতে হবে, সে খেয়াল ওর নেই। ও হারেছকে বলে, হারেছ বাই কামডা দেখছেন? হারেছ মাথা নাড়ে। মাখন নিজের হাত কচলায়।

তৃতীয় যে গ্রামবাসী আসে ওর নাম কুদ্দুস। ও যুবক, শহরে যাবে বলে বেরিয়েছে। পরনে কালো রঙের প্যান্ট আর সাদা শার্ট। আলী আহমদকে দেখে পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, স্যার আপনি? আপনাকে এমন করে মেরেছে? হারেছ জিজ্ঞেস করে, তোর মাস্টার নাকি কুদ্দুস?

হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়।

আহা রে, নামি মানুষডার এই অবস্থা।

চারপাশে ভিড় জমে যায়। ওরা ওকে কিভাবে কোথায় নিয়ে যাবে সেসব আলোচনা করছে। ডাক্তার কাকে ডাকবে, কি ওষুধ খাওয়াতে হবে এসব কথা বলাবলি করছে। ওদের ছুটাছুটির ভেতর রোদ উঠেছে। আলী আহমদ অনুভব করে ওর গায়ে জ্বর, নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতা নেই। ওরা ওকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য একটি খাটিয়া এনেছে। ও মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষ দেখতে ওর আনন্দ হয়। এইসব মানুষের ভেতর ও শত মুক্তিযোদ্ধার ছায়া দেখতে পায়। ওর মঞ্জুলিকার কথা মনে হয়। একজন আহত মুক্তিযোদ্ধার চোখের আলো যেন নিভে না যায় সেজন্য মঞ্জুলিকা অপেক্ষা করছে। ওকে তো মঞ্জুলিকার কাছে পৌঁছতে হবে।

আলী আহমদকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে পুষ্পিতা একদম নির্বাক হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে কথা বলে না– সোনাই ডাকলে সাড়া দেয় না, মঞ্জুলিকার দিকে তাকায় না, ডাকলে মুখ নিচু করে রাখে। ও ডাক্তার এনেছিলো, ডাক্তার বলেছে গভীর শকে এমন হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। অজেয় হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, ওকে সামলানো মুশকিল।

BanglaBook.org

দু'দিন খাট থেকে পড়ে গেছে। সোনাই টুকটাক বাজার করে। রান্নাখাওয়া কোনোরকম। মঞ্জুলিকার মনে হয় জীবনটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আটদিনের মাথায় কুদ্দুস এসে মঞ্জুলিকাকে আলী আহমদের চিঠি দেয়। চিঠিটা পড়ে ও চিৎকার করে ওঠে, মা বাবার চিঠি এসেছে। বাবা বেঁচে আছে।

ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় পুষ্পিতা, জ্ঞান হারায়। কুদ্দুস ডাক্তার নিয়ে আসে। জ্ঞান ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে, ভুল বকছে। বিচলিত হয় না মঞ্জুলিকা, নিজেকে বলে সামনে অনেক দায়িত্ব, এর মধ্যে জিতু না ফিরলে সবকিছু ওকে একাই সামলাতে হবে।

বিকেলে কুদ্দুস বিদায় নেয়। ও কুদ্দুসের দু'হাত ধরে বলে, আমি ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে বাবাকে দেখতে যাবো, কিন্তু হলো না।

স্যার, আপনাদের যেতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, সুস্থ হলে তিনি আপনাদের নিতে আসবেন। সবাইকে নিয়ে আমাদের গ্রামে থাকবেন। আমি অবশ্য ভরসা পাই না। ওদিকে রাজাকারের উৎপাত বেড়েছে। আপনি স্যারকে বলবেন, নদীর ওপারে চলে যেতে। দরকার হলে আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো। কলাতিয়ায় আমার মামার বাড়ি আছে।

কুদ্দুস চলে গেলে মঞ্জুলিকার মনে হয় পুরো বাড়ির শূন্য হাহাকার ওর বুকের ভেতর ফুলে-ফেঁপে উঠছে। পুষ্পিতার জন্য খানিকটুকু সাগু রান্নার সময় ওর হাত কাঁপে। সোনাই অজেয়কে নিয়ে খেলছে– ওদের খলখল হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সে মুহূর্তে মাগরেবের আযান হয়।

সাতদিন জ্বরে ভুগে সুস্থ হয় পুষ্পিতা। আলী আহমদের চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে ও একটু-আধটু কথা বলছে। অজেয় কাঁদলে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, ওকে কোলে নিতে চায়। সোনাইকে চিঠির কথা বলে। চিঠিটা সারাক্ষণ তার বালিশের নিচে থাকে। ইদানীং মঞ্জুলিকা আলী আহমদের ইজিচেয়ারে গিয়ে বসে; ওর ধারণা এখানে বসলে ওর কিছু জ্ঞান অর্জন হবে, যে জ্ঞান একজন মানুষ আর একজন মানুষের কাছ থেকে নিজের অজান্তে পায়। ভোরবেলা পত্রিকা নিয়ে এ চেয়ারে বসে ও, যেন আলী আহমদের চিন্তা, জ্ঞান, বিবেচনার ভাগ নিতে পারে। পত্রিকা পড়লে ভালোলাগে না। এসব খবর কি পড়া যায়? ডাক্তার এম. এ. মালিকের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ কিংবা পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর দায়িত্বভার গ্রহণ কিংবা ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, কি এসে যায় ওর? ও বরং কাগজে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে দুষ্কৃতকারীদের খবর ছাপা হয়েছে কি না, কেউ ধরা পড়লো কি না। গত মাসে খবর বেরিয়েছিলো যে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে– ও বুঝে গেছে খবরটা কাদের নিয়ে। ঐ ঘটনার পর প্রতীক আর বাড়ি ফেরেনি। মঞ্জুলিকা এসব খবর পুষ্পিতাকে বলে না। ও সেই খবরটা পুষ্পিতাকে পড়ে শোনায়। যেখানে বলা হয়েছে, রশীদ মিনহাজ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি বিমানকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। কয়েকদিন কাগজে-রেডিওতে ফলাও করে মিনহাজের বীরত্ব-গাঁথা প্রচারিত হতে থাকে, আর যে বাঙালি পাইলট বিমানটি হাইজ্যাক করতে চেয়েছিলো তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করা হয়। দেশের মানুষ বোঝে বিষয়টি কি। পুষ্পিতার কাছে এই ঘটনা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলো মঞ্জুলিকা। প্রদীপ্তর কথা মনে হয়। অনেকদিন কোনো খবর পাঠায়নি। হয়তো ওর সময় নেই এবং খবর পাঠানোর সুযোগও নেই, এই সান্ত্বনা নিয়ে দিন

BanglaBook.org

শুনছে। ভালোলাগে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর শক্তি ও তৎপরতা বৃদ্ধির কথা স্বীকার করেন এবং একই সঙ্গে এর উপযুক্ত জবাব দেবার অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেন, তখন মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর উপস্থিতি নিজের বুকের ভেতর অনুভব করে। এপ্রিল মাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। প্রদীপ্ত কি ছিলো সে অনুষ্ঠানে? দেখেছে কি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান? ও কি এত বড় গৌরবের অংশীদার হতে পারবে? বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে। তিনি অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি– দেশবাসীর সামনে নেই, কিন্তু তাঁর নামে চলছে যুদ্ধ। এদিকে ইয়াহিয়া খান বলেছেন, দেশদ্রোহিতার অপরাধে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার হবে– এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করেই তো তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন, এ নিয়ে নতুন করে ভাবার কিছু নেই বলে নিজেকে শাসন করলেও বুক মুচড়ে ওঠে। মঞ্জুলিকা চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেয়। ওর মনে হয় এ চেয়ারটায় বসলেই একটা সামগ্রিক চিত্র ওর মাথার ভেতর পাকিয়ে উঠতে থাকে। ইদানীং আলী আহমদের চেয়ে প্রদীপ্ত ওকে আচ্ছন্ন করে বেশি– চোখের সামনে কেবলই যুদ্ধক্ষেত্র ভেসে ওঠে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যুদ্ধের সাফল্যের খবর প্রচার করা হয়, যেন বিজয়ের চরম মুহূর্তের বেশি দেরি নেই।

কয়েকদিন ধরে ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট পুঁটলি বানায়। পুষ্পিতা জিজ্ঞেস করে, কি হবে এগুলো দিয়ে?

বাবা ফিরে এলে আমাদের আর এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকা উচিত হবে না মা।

পুষ্পিতা মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছো, ওরা আবার আসতে পারে। বলতে বলতে বুকের কাছে উঠে যায় হাত, যেন প্রবল ভয় থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য নিজেকেই জাপটে ধরা।

কুদ্দুস আরো দু'দিন এসেছে। আলী আহমদের খবর দিয়ে গেছে, ওদের খবর নিয়ে গেছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দু'জন ডাক্তারকে বাসা থেকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ও জানায়। মঞ্জুলিকা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, লাশ পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ, নটরডেম কলেজের দক্ষিণে সার্কুলার রোডে যে ব্রিজটা আছে তার নিচে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

কারা মারলো?

লোক মুখে শুনতে পাই রাজাকাররা।

রাজাকার? মঞ্জুলিকার মুখ শুকিয়ে যায়। মনে পড়ে গভর্নর টিক্কা খান এক অধ্যাদেশ বলে '৫৮ সালের আনসার এ্যাক্ট বাতিল ঘোষণা এবং রাজাকার এ্যাক্ট '৭১ আদেশ জারি করেছিলেন। তাহলে এখন ঘরের শত্রুরাই চিহ্নিত করছে বাঙালিদের? ও কুদ্দুসকে ভয়ার্ত চোখে জিজ্ঞেস করে, বাবা যে তোমাদের ওখানে আছে রাজাকাররা জানে না?

জানে। কিন্তু আর্মি ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার কারণে তাঁকে নিয়ে এখন তেমন কিছু ভাবছে না। তাছাড়া স্যার তো বিছানা থেকেই উঠতে পারেননি এতদিন। এখন একটু-আধটু হাঁটতে পারছেন।

আর কতদিন লাগবে ভালো হতে?

পুরো ভালো হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। আমরা ঠিক করছি আগামী সপ্তাহে স্যারকে নিয়ে আসবো।

রাজাকাররা কি পিছু ছাড়বে?

মনে হয় না।

মঞ্জুলিকা বিবর্ণ মুখে কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও চলে গেলেও উঠতে পারে

BanglaBook.org

না। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা বিচ্ছুগুলো কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঢাকা শহর– মুক্তিবাহিনী সীমান্ত থেকে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে, আর রাজাকাররা হাত-পা বেঁধে লাশ ফেলতে শুরু করেছে– আলী আহমদের ইজিচেয়ারে শরীরটাকে ছেড়ে দিলে মঞ্জুলিকার মনে হয় চেয়ারটা বেত নয়, ওই বেতের ভেতর বিদ্যুৎ আছে– বিদ্যুতের স্পর্শ ওকে তাড়িত করছে।

ক'দিন পর একদিন দুপুরবেলা আলী আহমদ ফিরে আসে, কুদ্দুসের কাঁধে ভর দিয়ে, কোনোরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কড়া-নাড়ার শব্দে প্রথমে দৌড়ে যায় সোনাই, কিন্তু দরজা খোলে না। পেছনে পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ হয়। মঞ্জুলিকা মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে, কে?

বৌমা, আমি।

সোনাই লাফিয়ে ওঠে, নানা, নানা।

মঞ্জুলিকা দরজা খোলে। আলী আহমদ ওদের দেখে মৃদু হেসে বলে, তোমরা কেমন আছো?

বলতে বলতে ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। হতবাক হয়ে থাকে পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকা। এ কোন আলী আহমদ? চেনা যায় না, হাড্ডিসার, বৃদ্ধ, যেন এক বন্দিশালা থেকে নির্যাতনের পর বেরিয়ে এসেছে।

তোমরা কিছু বলছো না কেন? আমি তো ফিরে এসেছি।

দু'জনের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। ঠোঁট কাঁপে। আলী আহমদ কুদ্দুসকে ছেড়ে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুষ্পিতার ঘাড়ে হাত রাখে, আহ্, কতদিন পর নিজের ঘরে ফেরা! পুষ্পিতা বিছানায় নিয়ে যায় আলী আহমদকে। বিছানায় বসেই ও অজেয়কে নেয়ার জন্য হাত বাড়ায়, কিন্তু অজেয় কিছুতেই দাদুর কোলে যায় না, আলী আহমদ নিতে গেলে কেঁদে ফেলে। আলী আহমদ ম্লান হেসে বলে, ও আমাকে চিনতে পারছে না।

রাতে খাবার পর ডাইনিং টেবিলে বসেই মঞ্জুলিকা বলে, বাবা আমাদের আর এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকা উচিত নয়। কাল সকালেই আমরা চলে যেতে চাই। আমি কুদ্দুসকে আসতে বলেছি। কোথায় যাবে ভেবেছো?

নদীর ওপারে।

জিতু এসেছিলো?

না।

আলী আহমদ চুপ করে থাকে। মঞ্জুলিকা অস্থির কণ্ঠে বলে, বাবা কিছু বলছেন না যে?

আমারও মনে হয় চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু আর দুটোদিন পরে।

কেন?

টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শরীরেও বল পাচ্ছি না।

পুষ্পিতা বলে, এ নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। কুদ্দুস তো থাকবেই।

আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে কতক্ষণ লাগবে, আমি না হয় সকালে গিয়েই টাকা নিয়ে আসবো।

আলী আহমদ ক্লান্তি অনুভব করে। আজই একটা নতুন জায়গা থেকে ফিরে, আর একটি নতুন জায়গায় যেতে তার মন চায় না। শরীর ঠিক হয়নি। হাঁটতে ভালো লাগে না। পুষ্পিতা ওর মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, দুটোদিন না হয় আমরা অপেক্ষা করে যাই বৌমা।

মঞ্জুলিকা মন খারাপ করে, বুকের মধ্যে প্রবল আশঙ্কা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। আলী আহমদকে এক গ্লাস দুধ দিয়ে ঘুমুতে যায়। রাতে ঘুমুতে পারে না আলী আহমদ– নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর এই প্রথম ওর নতুন করে ভয় করতে শুরু

BanglaBook.org

করে। অথচ যতদিন গ্রামে ছিলো ততোদিন ওর কোনো ভয় ছিলো না, ভেবে রেখেছিলো ওটাই জীবনের শেষপ্রান্ত, যা হয় হবে। কিন্তু এখন পুষ্পিতা, মঞ্জুলিকা, সোনাই, অজেয়– সবাই ওর সামনে; আবার জীবনের শুরু।

দু'দিন পর ভারতীয় বিমান উড়ে আসে ঢাকার আকাশে। আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবাই মিলে বিমান আক্রমণ দেখে। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে যুদ্ধের খবরাখবর শোনে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড মিত্রবাহিনী নামে গঠিত হয়েছে। রেডিওর সামনে গোল হয়ে বসে থাকে ওরা। আলী আহমদ মঞ্জুলিকার মাথায় হাত দিয়ে বলে, আর কোথাও যেতে হবে না মা।

মঞ্জুলিকা নিজের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। ওর নিজেরও মনে হয়, হয়তো না গিয়ে ভালোই হয়েছে। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে প্রদীপ্ত যদি ঢাকায় আসে তাহলে তো ওর সঙ্গে দেখা হবে না। ও কোথায় খুঁজতে বেরুবে ওদের।

সেদিন ভারতের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পরদিন যশোর বিমান বন্দরের পতন হয়। মিত্রবাহিনী যশোরে প্রবেশ করে। স্বাধীন বাংলা বেতারের এ খবর শুনে আলী আহমদের বুকের ভার নেমে যায়। সেদিন রাতে ওর চমৎকার ঘুম হয়।

ক'দিন পর রেডিওতে নতুন ঘোষণা হতে থাকে। ভারতের চিফ অফ স্টাফ জেনারেল মানেক শ পূর্ব রণাঙ্গণে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরপর এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। আকাশে উড়ে আসছে ভারতীয় বিমান। আলী আহমদ পুষ্পিতাকে বলে, আমরা এখন শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। জয় আমাদের দোরগোড়ায়। পুষ্পিতা কেঁদে ফেলে বলে, আমার দীপু আর জিতু কোথায়?

নিশ্চয় কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে।

জিতু কি ঢাকায় নেই?

মনে হয় না। থাকলে একবার না একবার আসায় আসতো।

মঞ্জুলিকা ছুটে আসে, বাবা ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় কি যুদ্ধ হবে?

কি জানি। আলী আহমদ কিছু ভাবতে পারে না।

স্বাধীন বাংলা বেতার বলছে, বিভিন্ন সেক্টরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী যশোরে এসে গেছেন। ঢাকার কি হবে বাবা?

আকাশযুদ্ধ হবে না এটা আমরা বুঝে গেছি। দেখছো না ভারতীয় বিমান এককভাবে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু এখানকার কোনো প্রতিরোধ নেই। এভাবেই ওরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে।

মঞ্জুলিকার ভয় কাটে না। বলে, পাকিস্তান আর্মি যদি ঢাকা অবরোধ করে রাখে? কতদিন রাখতে পারবে?

বেশিদিন অবরোধ করে রাখার রসদ নেই ওদের। কোনোদিক থেকে সাপ্লাই আসারও পথ বন্ধ। মঞ্জুলিকা আবার নিজের ঘরে ফিরে যায়। আলী আহমদ বিবর্ণ দৃষ্টিতে পুষ্পিতার মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ ওর হাত ধরে বলে, এ যুদ্ধে তুমি আর আমি যদি মরে যাই, আমি চাই তোমার আর আমার কবর যেন একটাই হয়। আমরা এক কবরে শেষ ঘুমটা ঘুমোবো পুষ্পি।

পুষ্পিতার মুখে কথা জোগায় না, এমন আকস্মিক কথায় ও বিমূঢ় হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় বিমান দেখে সোনাই চিৎকার করে বলছে, জয় বাংলা।

মঞ্জুলিকা দৌড়ে গিয়ে ওকে ঘরে টেনে আনে, এমন চেঁচাচ্ছিস কেন? কেউ শুনতে পেলে আমাদের কচুকাটা করে ছাড়বে।

এখানে তো পাকিস্তান আর্মি নাই।

তুই তো জানিস না সোনাই রাজাকারও বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে।

কাকে মেরেছে?

দু'জন ডাক্তারকে।

আমাদের বাড়িতে তো ডাক্তার নাই। এখানে আসবে না। বলতে বলতে সোনাই আলী আহমদের ঘরে যায়। কোনো কথা না বলে মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকে। মঞ্জুলিকা সোনাইর মতো নির্ভার হতে পারে না– এ বাড়ির দু'টো ছেলে যুদ্ধ করছে, এটাই সবচেয়ে বড় ভয়। ওরা তো শুধুই ডাক্তার খোঁজে না, ওরা খোঁজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক।

পরদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা হয়ে গেলে মঞ্জুলিকা আলী আহমদকে বলে, বাবা, আমার মনে হয় ঢাকা শহর অবরোধ করে ওরা বাঙালিদের মারবে। বেঁচে থাকবে শুধু তারা যারা ওদের পক্ষের লোক।

আলী আহমদ মাথা নেড়ে বলে, এমন হতেও পারে মা।

তাহলে কালই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

হ্যাঁ, যাবো। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

পুষ্পিতা বলে, বৌমা তো তৈরি হয়েই আছে। আমাদের বেরুলেই হয়।

মঞ্জুলিকা খুশি হয়ে উঠে যায়। সোনাই ওর পিছু পিছু আসে, আমরা কোথায় যাবো মামী?

যেদিকে দু'চোখ যায়।

কী মজা! কী মজা! কাল খাবো তিল ভাজা।

হুঁ, তুমি তো আমাদের পথের রাজা।

সোনাই নাচের ভঙ্গিতে একটা ঘূর্ণি দিয়ে দৌড়ে চলে যায়।

পরদিন আবাসিক এলাকার গেটের মুখে আটকে গেলো ওরা। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, কেউ রাস্তায় বেরুবেন না। শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

মঞ্জুলিকা চেঁচিয়ে ওঠে, কারফিউ? বাবা কারফিউ? কেন?

আলী আহমদ অবসন্ন বোধ করে। বলে, ঘরে চলো বৌমা।

আবার ঘরের তালা খোলা হয়। একগুচ্ছ চাবির ঝনঝন শব্দ বাজে বাড়িজুড়ে। কুকুরটা অনেকদিন আগে কোথায় যেন চলে গেছে। মঞ্জুলিকা বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। দুপুর পর্যন্ত আর ওঠে না। পুষ্পিতা চালে-ডালে খিচুড়ি রান্না করে– আলু ভর্তা বানায়, ডিম ভাজে। আলী আহমদের জন্য খাঁটি ঘি কেনা হয়েছিলো, সেটা বের করে। মঞ্জুলিকার প্রিয় আচার নামায়। ভিনেগারের মধ্যে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচের কুচি ভিজিয়ে রাখে। ওর মনে হয় ঘরে ফিরে আসতে পেরে ও স্বস্তিই পাচ্ছে।

দুপুরে সবাই মিলে খেতে বসার মুহূর্তে ওরা আসে, পাঁচজন– হাতে রাইফেল, কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা, বের করে রাখা চোখজোড়া হিংস্র। দরজা খুলে দেয় মঞ্জুলিকা। ওকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকেই আলী আহমদের ডান বাহু মুচড়ে ধরে বলে, চলেন প্রফেসর সাহেব।

কোথায়?

BanglaBook.org

গেলেই দেখতে পাবেন।

তোমরা কে? তোমরা তো পাকিস্তান আর্মির কেউ নও?

আমরা পাকিস্তানের রক্ষক। চিনতে পারেন না আমরা কে?

রাজাকার না আল-বদর?

বেশি কথা বলবি না কুত্তারবাচ্চা। শালা কাফের, বাঙালিগিরি ছুটিয়ে দেবো। স্বাধীনতার মজা দেখাচ্ছি।

হেঁচকা টান দিলে আলী আহমদ পায়ে ব্যথা পায়। ওরা ধাক্কা দিয়ে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যায়। পুষ্পিতা কিংবা মঞ্জুলিকার দিকে তাকাতে পারে না আলী আহমদ। মঞ্জুলিকা বলে, একটু দাঁড়ান, বাবাকে একটা শার্ট দেই।

লাগবে না।

বাবাকে চশমাটা পরতেন দিন, নইলে ঠিকমতো দেখতে পাবে না।

দেখার দরকার হবে না।

ওরা কালো কাপড় দিয়ে আলী আহমদের চোখ বেঁধে দেয়। পুষ্পিতা পিছু পিছু যেতে চাইলে ওর বুকের কাছে রাইফেল ধরে, আর এক পা এগুলে গুলি করে দেবো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। মঞ্জুলিকা অজেয়কে বুকের সঙ্গে চেপে রাখে। নিচে গাড়ি স্টার্ট দেয়ার শব্দ হলে সোনাই নানা, নানা বলে চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। অজেয়কে পুষ্পিতার কোলে দিয়ে মঞ্জুলিকাও দৌড়ে নামে, দেখে মিলিটারির জিপে চলে যাচ্ছে আলী আহমদ– গাড়িতে আরো দু'তিনজন চোখ বাঁধা লোক বসে আছে। মঞ্জুলিকার পা কাঁপে থরথর করে। ও দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নেয়। ওর চোখের সামনে মহানন্দার বিশাল ঢেউ গড়িয়ে আসতে থাকে– ও দেখতে পায় ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে নৌকা, সেই নৌকা মুছে দিচ্ছে একটি দেশের সীমান্ত, মুছে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষ– ফেলে আসা ঘরগেরস্থি। কত অসংখ্যবার এ দেশে আসার গল্প করেছে পুষ্পিতা– ভারত থেকে তাড়া খেয়ে এসে উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা নিয়ে কাটিয়েছে এতগুলো বছর, এখন অপরাধ বাঙালি হওয়ার– বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার। কেন চোখ বেঁধে নিয়ে গেলো? মেরে ফেলবে? কোনো ব্রিজের নিচে পাওয়া যাবে তার লাশ? কেঁপে ওঠে মঞ্জুলিকা। প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ বারের মতো চোখ বুঁজে যাবার আগে, অস্বাভাবিকভাবে বুঁজিয়ে দেয়া হলো দৃষ্টি, দেখতে দেবে না প্রিয় স্বদেশ। মঞ্জুলিকা সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে। অজেয়কে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে নেমে আসে পুষ্পিতা। বলে, কেঁদো না বৌমা, কাঁদলেই অমঙ্গল হবে। নিশ্চয় তোমার শ্বশুর আগের মতো ফিরে আসবে। আমরা তো কোনো দোষ করিনি।

মঞ্জুলিকা শাশুড়ির সরলতার ভেতর আশ্রয় নিতে চায়, পারে না– ভাবে, বাঙালি হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাটাই যে সবচেয়ে বড় দোষ, আপনি কি তা বুঝতে পারছেন না মা? ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় পুষ্পিতার সব আবরণ খসে গেছে, কাঠামো ছাড়া কিছু নেই, এই পুষ্পিতার কণ্ঠ অন্য কারো। সোনাই ওর হাত ধরে টানে, ঘরে চলেন মামী। অজেয় ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ও পুষ্পিতার হাত ধরলে সবাই মিলে ঘরে ফিরে আসে।

একদিন পর শহর কেঁপে ওঠে জয় বাংলা স্লোগানে– মিত্র বাহিনী শহরে ঢুকেছে, রাস্তায় মানুষের ঢল। স্লোগানের শব্দ শোনার পরও বিষয়টি আঁচ করতে সময় লেগেছে মঞ্জুলিকার। দৌড়ে বারান্দায় যায়, তারপর চেঁচিয়ে বলে, মা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে।

স্বাধীন? তাহলে তো ফিরে আসবে সবাই? তোমার বাবা, দীপু, জিতু। ওহ্, কী আনন্দ!

BanglaBook.org

আনন্দ শব্দটা মঞ্জুলিকাকে স্পর্শ করে না। ও দ্রুত কণ্ঠে বলে, আপনি অজেয়কে দেখবেন মা। আমি যাচ্ছি।

কোথায় যাবে?

কোথায় নয়? মিছিলে, রাস্তায়, সবখানে। সবার আগে বাবাকে খুঁজতে হবে।

দ্রুত শাড়ি পাল্টে নেমে যায় মঞ্জুলিকা। সোনাই ওর পিছু নেয়। রাস্তায় নেমে ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোথায় যাবে? কোনদিকে আগে? চারদিক থেকে মানুষ আসছে- চারদিকে মানুষ চলে যাচ্ছে। ও খানিকটা পথ প্রবল উত্তেজনায় হেঁটে চলে এসে আর্ট কলেজের সামনে দাঁড়ায়। মানুষের মুখে মুখে খবর হয়ে গেছে- বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করবেন জেনারেল নিয়াজী। চারদিকে গোলাগুলির শব্দ- মুক্তিবাহিনীর রাইফেল থেকে শূন্যে ছুটে যায় গুলি, সেই সঙ্গে গর্জে উঠছে জয় বাংলা ধ্বনি। উল্লাসে ফেটে পড়েছে শহর। ও চারদিকে তাকালে ওর চোখ জলে ভরে ওঠে- এসব মানুষের ভিড়ে কোথায় খুঁজবে আলী আহমদকে, প্রদীপ্তকে, প্রতীককে? এই নয়টা মাস এত মানুষ কোথায় ছিলো? মৃতপ্রায় হয়েছিলো শহর। আজ যেন শহরের মাটি ফুঁড়ে সব একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। আশ্চর্য ও কেন উল্লাসে মেতে উঠতে পারছে না? কেন বারবার চোখ ভিজে যায়। নিজেকে শাসন করে, কি হলো তোমার? তোমার দু'চোখ কি বুড়িগঙ্গা হয়ে গেলো? সোনাই ওর হাত ধরে টানে। ওর কচি দু'চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের বিষণ্ন। বলে, কাঁদেন কেন মামী?

মঞ্জুলিকা জবাব না দিয়ে চোখ মোছে। তারপর সোনাইর হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে বলে, চল আমরা প্রেসক্লাবে যাবো।

ওখানে কে আছে?

দেখি তোর দীপু মামা যদি থাকে।

দু'জনে ঢাকা ক্লাবের সামনে এসে রমনা পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। উল্টো দিকে রেসকোর্সের সেই জায়গাটি যেখানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন। আজ এখানে আত্মসমর্পণ করবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মঞ্জুলিকার বুকটা তবু শূন্য হয়ে থাকে। এত আনন্দের মাঝে মার মুখ ভেসে ওঠে, শোভন, দীপালিকা, বাবা কেমন আছে? কোথায় আছে? নয় মাসের কোনো খবর নেই ওর কাছে, যেন একটি কালো সময় ওর আয়ুতে যোগ হয়েছে- এখন তো ওর গর্ভে কেউ নেই, এখন তো ইচ্ছে করলে ও ছুটে যেতে পারে সৈয়দপুর। কিন্তু? ঢাকা শহরে যারা ওর চারপাশে ছিলো তাদের কেউ নেই- এই নেই হয়ে থাকা অনুভব নিয়ে ও প্রেসক্লাবে আসে। দরজার সামনে দেখা হয় মহাদেবের সঙ্গে। মহাদেব চেঁচিয়ে বলে, জয় বাংলা মঞ্জুলিকা।

জয় বাংলা মহাদেবদা।

কি হলো তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? প্রদীপ্তর খবর পাওনি?

বাবাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে মহাদেবদা। কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে।

আশ্চর্য! কয়েকজন সাংবাদিককেও নিয়ে গেছে।

কোথায় খুঁজবো বাবাকে?

আমি যাচ্ছি। তুমি বাড়ি যাও।

বলতে বলতে মহাদেব বেরিয়ে যায়। আরো দু'চারজন সাংবাদিক ওকে ঘিরে ধরে, আপনি বসুন ভাবী।

মঞ্জুলিকা ভীষণ অসহায় বোধ করে। এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ছুটে আসে তিতুমীর।

আপা খান, স্বাধীনতার মিষ্টি।

BanglaBook.org

পাশ থেকে ইফতেখার বলে, তিতুমীর আজ ভীষণ খুশি। সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।

মঞ্জুলিকা খেতে পারে না, ওর গলার কাছে কান্নার দলা আটকে আছে। ও যেন স্বপ্নের ভেতর শুনতে পায় ইফতেখারের কণ্ঠ, ভাবী আমি তো ভেবেছি প্রদীপ্ত ঢাকায় চলে এসেছে। আপনাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে ও এসে পৌঁছুয়নি। আপনি বোধহয় জানেন না যে সকালে পাকিস্তানি চৌদ্দ ডিভিশন মেজর জেনারেল জামশেদ মীরপুর ব্রিজের কাছে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে মিত্রবাহিনী ও এগারো নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে।

মঞ্জুলিকা বুঝতে পারে ইফতেখারের কণ্ঠ ও শুনতে পাচ্ছে না। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে বলে, ইফতেখার ভাই আপনি তো জানেন না যে আমার দু'জন বাবা। দু'জনের কারোরই কোনো খোঁজ নেই।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও। ওর সঙ্গে সোনাইও কেঁদে ওঠে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ, যেন নিশ্বাস পতনও নেই কোথাও– শুধু স্বজন-হারানোর ব্যথা বয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দের স্রোতের পাশাপাশি। কোনটি বড়? দুঃখ না আনন্দ? তিতুমীর বুঝতে পারে না কোনটি বড়। ইফতেখার বিষণ্ন গলায় বলে, ভাবী আমরা সবাই খুঁজবো আপনার বাবাকে। আপনি কাঁদবেন না।

মঞ্জুলিকা নিজেও সোজা হয়ে বসেছে। তিতুমীর আবার ওকে মিষ্টি সাধলে ও মিষ্টি খায়। সবাই এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিলো। আবার উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের গল্প শুরু করে।

বিকেলবেলা রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে মঞ্জুলিকা দেখে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছে নিয়াজী। স্বাক্ষর শেষে বেল্ট খুলে রিভলভার তুলে দেয় অরোরার হাতে। আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে একশজন পাকিস্তানি অফিসার এবং একশজন জওয়ান তাদের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখে। অভ্যুদয় ঘটে-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মানুষের উল্লাসধ্বনির মধ্যে কাঁপুনি থাকে, সেটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে এক ধরনের ঝঙ্কার বলে মনে হয় মঞ্জুলিকার কাছে। একসময় ও বুঝতে পারে যে ও নিজেও চিৎকার করছে, ফেলে আসা পঁচিশ বছরের ভেতর যেটুকু অংশ আনন্দের ছিলো তা ওর ভেতর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ও দেখতে পাচ্ছে চারদিকে উড়ছে পতাকা। প্রিয়জন খুঁজতে হবে একথা ও মুহূর্তের মধ্যে ভুলতে পারছে। মনে হচ্ছে ওর সামনে রেসকোর্স নামের কোনো ময়দান নেই, ওটা এই মুহূর্তে উল্লাসের বুড়িগঙ্গা নদী, এ জীবন পেরিয়ে যাবে এ নদী। ও চারদিকের মানুষের মুখের দিকে তাকায়– সবগুলো মুখের ওপর শীতের বিকেল লুটোচ্ছে, একটুপর অন্ধকার নামবে, তার আগে শেষ রোদের সোনালি আভা বিশাল একটা বিষুবরেখার মতো দু'ভাগ করে দিচ্ছে মঞ্জুলিকার বুক। অনুষ্ঠান শেষ, যে যার মতো যেদিকে খুশি সেদিকে যাচ্ছে। ও একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি ফেরে। বুঝতে পারে স্বাধীনতার সবটুকু আনন্দ ওর জন্য নয়, আরো অনেকটা পথ যেতে হবে।

দরজায় কড়া নাড়ার আগেই ওর মনে হয় প্রদীপ্তর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। ও থমকে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে, হ্যাঁ প্রদীপ্তই। ওহ্, বলে, ও দু'হাতে সোনাইর চুল এলোমেলো করে দেয়। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে প্রবল আনন্দ ওকে অবশ করে রাখে, তখন জোরে জোরে কড়া নাড়ে সোনাই– শব্দ মঞ্জুলিকার শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, শব্দ মঞ্জুলিকার এতক্ষণের চেতনা-প্রবাহে বাঁক তৈরি করলে ও দেখতে পায় দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ্ত।

মঞ্জুলিকার বিস্ফারিত দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় প্রদীপ্তকে। প্রদীপ্তর বাম চোখ এবং বাম হাত নেই। প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে বলে, ঘরে এসো।

মঞ্জুলিকা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

BanglaBook.org

কেঁদো না মঞ্জুলি। চোখ আর হাত নেই তো কি হয়েছে? আমাদের স্বাধীনতা আছে।

মঞ্জুলিকা কথা বলতে পারে না। ও বুঝতে পারে না যে এ কেমন শোক, এমন শোকের অভিজ্ঞতা ওর নেই। ও ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। অজেয়কে কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্পিতা। প্রদীপ্ত নিজেকে বলে, এত খুশির দিনে মঞ্জুলিকাকে কাঁদতে হলো!

১১

পরদিন দু'ভাই মিলে চষে বেড়ালো ঢাকা শহর, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না আলী আহমদকে। ক্যান্টনমেন্টে নেই, ইসলামী ছাত্র সংঘের অফিসে তালামারা– দু'দিন আগেও যে আলবদর বাহিনী কারফিউ ভেঙে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে, তাদের কোনো হদিস নেই। তবে ওরা দু'জনই জানতে পারলো যে শুধু ওদের বাবাকে নয়, এমন অসংখ্য জনকে ধরে নিয়ে গেছে আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। প্রদীপ্তর শিক্ষক এবং সহকর্মী অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দু'ভাই চুপচাপ বসে থাকে। মঞ্জুলিকা চা দিলে সে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পুষ্পিতা বিছানা নিয়েছে। কথাবার্তা একদম বন্ধ। জোর করলে সামান্য কিছু খায়।

পরদিন মহাদেবই প্রথম ছুটে এলো ওদের বাড়িতে। বললো, রায়েরবাজারের কাটাসূরে বধ্যভূমি পাওয়া গেছে। চলো, দেখে আসি।

রিকশায় যেতে যেতে প্রদীপ্ত বলে, আপনার কি মনে হয় বাবাকে ওখানে পাওয়া যাবে?

মহাদেব শুনেও শুনতে পায় না। সোজা তাকিয়ে থাকে– দেখতে পায় রাস্তার দু'পাশ দিয়ে মানুষ ছুটছে কাটাসূরের দিকে। কোথাও বধ্যভূমি বা গণকবরের খোঁজ পাওয়া গেলে ধাবমান মানুষের পায়ের গতি বেড়ে যায়। যারা প্রিয়জন হারিয়েছে শুধু তারা নয়, যারা হারায়নি তারাও পাগলের মতো ঘুরছে। দেখতে চায় স্বাধীনতা কতটা মূল্য দিয়ে পেতে হলো! প্রদীপ্ত নিজের অজান্তেই ডান হাতটা বাম ঘাড়ের ওপর রাখে, যেখান থেকে হাতটা উড়ে গেছে। মঞ্জুলিকা একবারও জিজ্ঞেস করেনি কেমন করে এমন হলো, কোন যুদ্ধক্ষেত্রে ও ছিলো, কোথায় চিকিৎসা হয়েছে, কতদিন লেগেছে সুস্থ হতে, কিছুই না। ও কি এই দিনগুলোকে সঞ্চয়ের হিসেবে আটকে রাখলো? এমন দিন কি আসবে যখন যুদ্ধের গল্প শুনে দিন কাটবে? আসলে মঞ্জুলিকার কান্না ফুরোয়নি। ও সৈয়দপুরের খবরের জন্য ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আলী আহমদ নিজেই ফিরে আসবে, এমন একটা ধারণা থেকে পুষ্পিতা ছিটকে যাচ্ছে– সব মিলিয়ে সবকিছু শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভাবতে পারছে না প্রদীপ্ত। গতকাল বিকেলে বন্যার খোঁজে গিয়েছিলো প্রতীক। ওরা ফিরে আসেনি। ওদের বাসা অন্যের দখলে। নয় মাসে ঐ বাড়িটিকে পুরোপুরি বদলে ফেলেছে বাড়ির মালিক। ওদের জিনিসপত্রও বেহাত হয়ে গেছে। কাল সারারাত ঘুমোয়নি প্রতীক। খুব ভোরে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। প্রদীপ্তর নিজেকে খুব একলা মনে হয়। প্রত্যেকের নিজস্ব দুঃখ আছে– প্রত্যেকে এক হয়েও দুঃখের ভাগিদার হচ্ছে। ডিসেম্বরের এই মধ্যদিনে প্রদীপ্ত বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

কাটাসূর বধ্যভূমিতে এসে ও স্তব্ধ হয়ে যায়। কত লোক ধরে এনে মেরেছে ওরা? বধ্যভূমিতে অসংখ্য লাশের মাঝে পড়ে থাকা হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়া লাশটির পাশে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। মনে হয় এ লাশ আর কারো নয়, এ লাশ আলী আহমদের। দেশের স্বাধীনতার জন্য বাবা তাঁর হৃৎপিণ্ডটাই দিয়েছেন। এর চেয়ে গৌরবের অঙ্গ মানব শরীরের আর কি হতে পারে? ওর চোখের সামনে যুদ্ধক্ষেত্র ভেসে ওঠে। শত্রুর গোলা এসে আঘাত করলো ওকে– মুহূর্তে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলে ওর আর কিছু মনে নেই। যুদ্ধ-সাথীরা বলেছিলো, জ্ঞান ফিরলে ও নাকি বাবাকে দেখতে চেয়েছিলো। প্রদীপ্তর মনে হয় ওর দু'পায়ে হাজার হাজার বিষ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। ও নড়তে পারছে না। শুধু জলাভূমি থেকে বয়ে আসা বাতাস চোখেমুখে লাগলে মনে হয় বাবা কাছেধারে কোথাও আছে– বাতাসে বাবার নিশ্বাসের শব্দ মিশে গেছে।

ওকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতীক এগিয়ে আসে। বলে, বাবা এখানে নেই ভাইয়া; কিংবা আছে, গলে পচে গেছে বলে আমি তাকে চিনতে পারছি না।

বাবা এখানেই আছে জিতু।

মানে? প্রতীক ভুরু কুঁচকে তাকায়, অসহিষ্ণু এবং রাগী চেহারা। দু'দিনের ঘোরাঘুরিতে ও আরো রুক্ষ এবং মেজাজী হয়ে উঠেছে। চোখ লাল হয়ে থাকে– প্রদীপ্ত দেখেছে রাতে ওর ঘরে সিগারেটের টুকরোর স্তূপ হয়ে যায়। বুঝতে পারে ও রাতে ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না। এই মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্তর বুক ভয়ে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তবুও জোর দিয়ে বলে, যারা যুদ্ধে হৃৎপিণ্ড দেয় তাদেরকে আমি বাবাই ভাবতে পারি।

ন্যাকামি করো না। যুদ্ধে চোখ দিয়েছো, হাত দিয়েছো তাও তোমার পুতপুতামি গেলো না। এবার যুদ্ধের ছেলে হবার চেষ্টা করো।

প্রতীক ওর মুখের ওপর আঙুল নেড়ে চলে যায়। প্রদীপ্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এমন আবেগ প্রকাশ কি ন্যাকামি? যুদ্ধের ছেলে হওয়া মানে কি? অসহিষ্ণু এবং রাগী হয়ে ওঠা? না, ও রাগতে পারে না। ছোট ভাইয়ের জন্য ওর মমতা হয়। চারদিকে মানুষের ভিড়, মহাদেব অন্যদিকে চলে গেছে। ও দেখতে পায় মানুষের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে এবং সে ধুলোর হাল্কা সাদা আভা বধ্যভূমির চারপাশ ঘিরে জমাট বাঁধছে।

পেছন থেকে নসিব হাফিজুদ্দিন ওর ঘাড়ে হাত রাখে। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে ওঠে, নসিব ভাই? নসিব ওকে জড়িয়ে ধরলে ওর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

এখনো সময় আছে খুঁজে দেখার।

আছে কি?

নসিব এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে, মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় জেল-ভেঙে বেরিয়ে আসা কয়েদীর দলে আমিও ছিলাম। এপ্রিল মাসে ভারতে চলে যাই। ট্রেনিং নিয়েছি, যুদ্ধ করেছি। আমি বাঁচতে চাই প্রদীপ্ত। এবং লিখতে চাই।

এজন্যই আপনি ভাবতে পারছেন যে খুঁজে দেখার সময় আছে। কিন্তু এত লাশ দেখে আমি বুঝে গেছি যে খুঁজে দেখার আর সময় নেই।

বাড়ি যাবে না প্রদীপ্ত?

না। আমি এখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবো। দেখবো কিভাবে অন্ধকার নামে।

দু'জনের দৃষ্টি কাটাসূরের জলাভূমি এবং ইটখোলার ওপর দিয়ে ঘুরে আসে– এখানে কত মানুষ নিহত হয়েছে ওরা জানে না, জানার উপায়ও নেই।

প্রদীপ্ত জলাভূমির কাছাকাছি নেমে যায়। নসিব এগোয় না, পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

প্রদীপ্ত ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি কোনো নতুন লেখা লিখতে শুরু করেছেন নসিব ভাই?

না।

এবারও কি আমি আপনার প্রথম পাঠক হবো? কি লিখবেন?

বড় ক্যানভাসে যুদ্ধ এবং ভালোবাসার গল্প।

প্রদীপ্ত হাত নেড়ে নসিবকে বিদায় জানায়। একটুপর প্রতীক এসে ওর সামনে দাঁড়ায়, বাড়ি চলো। মুহূর্তে জ্বলে ওঠে প্রদীপ্ত। ওর হাত এবং চোখ নেই দেখে কি প্রতীক ওকে করুণা করছে? কঠিন গলায় বলে, তুই যা, আমি পরে যাবো।

কেন? এখানে তুমি কি করবে? অন্যের চেহারায় নিজের বাবাকে দেখবে?

জিতু!

বাড়ি চলো ভাইয়া। এইসব ভাবাবেগের সময় এখন না।

ও প্রদীপ্তর ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে টান দেয়। প্রদীপ্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমাকে ছেড়ে দে জিতু।

ছাড়বো না, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি একা বাড়ি ফিরলে মা এবং ভাবীর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ইচ্ছে আমার হবে না। আমি চাই না ওরা তোমার খবর আমাকে জিজ্ঞেস করুক।

পেছন থেকে মহাদেব বলে, বাড়ি যাও প্রদীপ্ত। ওর হাতটা ছেড়ে দাও প্রতীক। যুদ্ধ-করা ছেলেরা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরতে চায় না। তোমরা দুজনেই হারিয়ে যাওয়া বাবাকে খুঁজতে এসেছো। তবে ও কেন তোমার হাত ধরে বাড়ি ফিরবে?

আপনি যেভাবে বলছেন তা আমি বুঝি, আবার এটাও বুঝি যে ছোট ভাইয়ের ভালোবাসার হাত ধরে বাড়ি ফেরায় অগৌরব নেই।

কথাটা বলেই প্রতীক হনহনিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। প্রদীপ্ত পিছু নেয়। মহাদেব বলে, দুঃখ পেয়ো না।

প্রদীপ্তর মনে হয় এই বধ্যভূমিতে দুঃখ নেই, বধ্যভূমিতে শোকও নেই। স্বাধীনতার জন্য মানুষ এটুকুর উপরে উঠতে পারে।

পরদিন দুপুরে ঝোড়ো কাকের মতো বাড়িতে ফেরে প্রতীক। দরজা থেকে চিৎকার করে ডাকে, মা। তারপর দুপদাপ করে পুষ্পিতার ঘরে এসে ঢোকে। মাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানা থেকে নামায়। ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, তুমি এভাবে রাতদিন শুয়ে থাকলে আমার অসহ্য লাগে। আমি চাই না তুমি এমন অথর্ব হয়ে যাও।

পুষ্পিতা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

তুমি কাঁদছো কেন? বাবাকে আমরা খুঁজে পাইনি, পাবো না এমন কথা তো এখনো স্পষ্ট হয়নি মা। চলো, অজেয়র সঙ্গে খেলবে।

প্রতীক পুষ্পিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে মঞ্জুলিকার ঘরে। অজেয়কে নিয়ে সোনাই খেলছে, মঞ্জুলিকা কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

এই আর একজন, প্রতীক কাঁথা টান দিয়ে সরায়, ওঠো ভাবী।

মঞ্জুলিকা অবাক হয়ে চোখ কুঁচকে তাকায়। প্রতীক চেঁচিয়ে বলে, ওভাবে তাকিয়ো না। আমি দেখতে পাচ্ছি অজেয়র ভীষণ অযত্ন হচ্ছে। ওঠো, উঠে হাঁটতে শেখো।

কথা বলে ও দুপদাপ চলে যায়। তখন প্রদীপ্ত বাড়িতে ঢুকছে। ও প্রদীপ্তর হাত ধরে বলে, এসো আমার ঘরে।

কি হয়েছে জিতু? বাবার কোনো খবর পেয়েছিস?

BanglaBook.org

তুমি কি এখনো বাবার খবরের আশায় আছো ভাইয়া? আমি নেই।

জিতু!

হাত ছাড়ো। আমার হাত ধরলে বিরক্ত লাগে। শোনো, সকালে সংবাদ অফিসে গিয়েছিলাম মতিউর চাচার খোঁজে। তাঁর কলিগ সাইদুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, মতিউর চাচা আঠাশ তারিখে চাচী, বন্যা ও পার্থকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সদরঘাটে সাইদুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা এক নৌকাতেই ছিলেন। মাঝ নদীতে মিলিটারির ব্রাশ ফায়ারে মারা গেছে মতিউর চাচার পরিবার। সাইদুর সাহেবের পরিবারেরও কেউ নেই। তিনি একা বেঁচে আছেন। আকস্মিকভাবে কণ্ঠস্বর বদলে প্রতীক বলে, তোমার প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন শহীদ সাবের। তাঁর কি হয়েছে জানো? তিনি পুড়ে কাক হয়ে গেছেন। যেদিন সংবাদ অফিসে আগুন দিলো পাকিস্তান আর্মি সেদিন তিনি সংবাদ অফিসে ঘুমুচ্ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য মানুষ পুড়ে কাক হয়ে যায় ভাইয়া।

প্রদীপ্ত কঠিন গলায় বলে, ন্যাকামি করিস না।

হা-হা করে হেসে ওঠে প্রতীক। ঠিকই বলেছো, হাসতে হাসতে ও ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ে। এতক্ষণ ও পায়চারি করতে করতে কথা বলছিলো। দু'হাতে মুখ ঢাকতে ঢাকতে বলে, আমার ভালোবাসাও পুড়ে কাক হয়ে গেলো। ওহ্ বন্যা– বন্যা–। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে প্রতীক। তখন ওর ঘরের ভেজানো দরজা ধড়াম করে খুলে ফেলে মঞ্জুলিকা। বলে, আমি কালই সৈয়দপুর যাবো।

প্রদীপ্ত বুঝতে পারে না যে ও কাকে সামলাবে, প্রতীককে না মঞ্জুলিকাকে? পুরো সৈয়দপুর ওর চোখের সামনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া শহীদ সাবের হয়ে ওঠে। ও কিছু বলার আগেই দু'হাতে চোখ মুছে ক্ষিপ্র গতিতে উঠে দাঁড়ায় প্রতীক। বলে, তোমার সৈয়দপুর যেতে হবে না। সৈয়দপুর আমি যাবো।

না, আমি যাবো।

পাগলামি করবে না ভাবী। এখনো রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো না। আমি আগে অবস্থা দেখে আসি তারপর তোমরা দু'জনে যাবে।

তুই কি ভেবেছিস আমি অথর্ব হয়ে গেছি? চেঁচিয়ে ওঠে প্রদীপ্ত।

একটি কথাও বলবে না। তোমার যে ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি আর হতে দিতে চাই না ভাইয়া। তুমি আরো কিছুদিন রেস্টে থাকো। আমার তো কিছু হয়নি, সব দায়িত্ব আমি পালন করবো।

তোর কিছু হয়নি জিতু?

সেজন্যই আমাকে ব্যস্ত থাকতে দাও। আমি যাই বাসের টিকিট নিয়ে আসি। মাকে বলো আমার ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে।

মঞ্জুলিকা আর দাঁড়ায় না। ওর মনে হয় এ পরিবারের প্রত্যেকে ভীষণ একা হয়ে গেছে। কেউই নিজেকে সামলাতে পারছে না।

সৈয়দপুরে নেমে রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে যাবার সময় রিকশাওয়ালা বলে, আপনে কোথায় যাইবেন সাব?

স্টেশন মাস্টারের বাসায়।

বাসাতো খালি। কেউ নাই। নতুন ইস্টশন মাস্টার দখলে আছিল, স্বাধীনতার পর

BanglaBook.org

পলাইছে। আহারে সোনার মানুষ ছিলো মাস্টার সাব, এক্কেবারে ভদ্দরলোক, তারে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে কুচিকুচি কইরা কাটছে বিহারিরা, এক্কেবারে পরিবার শুদ্ধ।

কি বললে?

রিকশাওয়ালার গেঞ্জি খামচে ধরে প্রতীক। ও কোনোরকমে টাল সামলে ব্রেক কষে রিকশা থামায়। ও অবাক হয়ে বলে, কি অইছে সাব?

প্রতীক বুড়ো রিকশাওয়ালার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যা বলছো তা কি সত্যি? সত্যি না হলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো। এখনো অস্ত্র জমা দেইনি।

এই কথা শঅরের সব মানুষ জানে। আমি মিছা কথা কমু ক্যান?

বেটা বুড়া ভাম, তোর হাড়গোড় আমি গুঁড়িয়ে ফেলবো।

আপনে আমার লগে রাগ করেন ক্যান?

প্রতীক বুঝতে পারে ওর মাথার ভেতর কিসব চড়চড় করে শব্দ করছে, যেন কোনোকিছু– বিশাল কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে, ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রিকশাওয়ালা নয়, আর কেউ, অন্য কেউ ওকে একটা বধ্যভূমিতে লটকে রেখে দিয়েছে।

আপনে আর কারে কি জিগাইবেন চলেন লইয়া যাই। স্টেশনের সামনে গির্জা আছে, ফাদাররে জিগাইবেন?

চলো।

যেতে যেতে গল্প করে রিকশাওয়ালা, এই শঅরে বহুত মানুষ মারছে বিহারিরা। সেই সময় শঅরের বাঙালিরা গেরামের দিকে পলাইয়া গেছিলো। যারা যায় নাই তাগোরে মিলিটারিরা ক্যাম্প কইরা রাখছিলো। আমিও ক্যাম্পে আছিলাম। কি কমু সাব সেই দুঃখের কথা।

প্রতীক চেঁচিয়ে বলে, চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। কথা বলবি তো লাথি দিয়ে ফেলে দেবো।

রিকশাওয়ালা আর কথা বলে না। স্টেশন মাস্টারের কোয়াটারের সামনে রিকশা থামায়। পরিত্যক্ত বাড়ি, দরজা-জানালা খোলা, বোঝাই যায় যে ভেতরে কেউ নেই। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রতীকের গা ছমছম করে। এই বাড়িটা প্রদীপ্ত নিজের হাতে সাজিয়েছিলো, এমন গল্প ও অনেকবার করেছে। হাবিবের কথা বলেছে, চায়ের দোকানদার, সহকারী স্টেশন মাস্টার, আরো কার কার কথা ও বলে দিয়েছিলো, কিন্তু এসব মানুষকে ও কোথায় খুঁজে পাবে? ও বাড়িটার উঠোনে এসে দাঁড়ায়, ভেতরে ঢুকতে পারে না। রিকশাওয়ালাকে বলেছিলো ওর সঙ্গে আসতে, ও আসেনি। বলেছে, আমি ঢুকতে পারুম না। আমার ডর করে। উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রতীক বুঝতে পারে এ এক কঠিন বধ্যভূমি। ও পিছু ফিরে এক দৌড়ে বেরিয়ে আসে। রিকশার হ্যান্ডেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে ওর গা ছমছম করেনি, ও নির্বিকার মৃতদেহ দেখেছে। কিন্তু এ শূন্য বাড়িটি অগণিত লাশে ভরে থাকা সেই বধ্যভূমির চেয়েও ভয়াবহ। প্রতীক অনুভব করে জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা ওকে গির্জায় নিয়ে আসে। ফাদারের কাছে ও সব ঘটনা শোনে। ফাদার ধীরে ধীরে অমায়িক কণ্ঠে ক্রুরতা এবং হিংস্রতার বর্ণনা করেন। বলেন, যুদ্ধের শুরুতে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি ঘেরাও করে যখন ওদের মারা হয় তখন আমি এই গির্জায় ছিলাম। দু'কান ভরে শুনেছি ওদের জিঘাংসার উল্লাস। ওরা বাড়ি ছেড়ে গেলে আমি দেখে এসেছি খণ্ডিত মাংস, বিচ্ছিন্ন ধড়, জমাট রক্ত। যুদ্ধ শেষে দেখেছি রাস্তায় বিহারিদের লাশ। এটাই নিয়ম প্রতীক। এভাবেই মানুষ প্রতিশোধ নেয়। এর মধ্যে ভালো লোক যে ছিলো না তা নয়। কোনো কোনো বিহারিকে দেখেছি বেশ কয়েকটি

BanglaBook.org

বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপদে পার করে দিয়েছে। এমন বাঙালিও ছিলো যারা বিহারিদের সাহায্য করেছে। শোভনকে আমি খুব ভালোবাসতাম। ও রোজ আমার কাছে আসতো। অনেক গল্প হতো।

প্রতীক বোঝে ওর জ্বর বাড়ছে, শুধু ফাদারের অমায়িক কণ্ঠস্বর ওকে শক্তিটুকু ধরে রাখতে সাহায্য করে। একসময় ফাদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, প্রভু আমাদের আলো দিন, অন্ধকার যেন কেটে যায়।

প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে প্রতীক ঢাকা ফিরে আসে। দু'দিন ওর কিভাবে কেটেছে ও জানে না। দরজা বন্ধ করে প্রদীপ্তকে সব ঘটনা বলেছে, ঠিকমতো বলেছে কি না ও জানে না। প্রদীপ্ত কিভাবে মঞ্জুলিকাকে সামলিয়েছে ও জানে না। মঞ্জুলিকা এখন কি করছে ও জানে না। ও শুধু দেখতে পায় ওর মাথার কাছে পাথরের মূর্তির মতো পুষ্পিতা বসে থাকে। মাঝে মাঝে শীতল একটা হাত এসে ওর কপালে-বুকে থমকে যায়। যেদিন মা ওকে ভাত দিলো সেদিন ওর ঘরে এলো মঞ্জুলিকা। সৈয়দপুর থেকে ফেরার কতদিন পরে তা ওর হিসেব নেই। কেবল ভাতের গ্রাস মুখে তুলেছে, দেখলো মঞ্জুলিকা ওর দিকে তাকিয়ে আছে এবং আশ্চর্য রকমের বুড়িয়ে গেছে। চেহারার বলিরেখাগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মনে হয় ও যেন এক মধ্যবয়সী নারী। ভাত খাবার সময় ওর পাতে এটা-ওটা তুলে দিলো। তারপর কোনো একসময় ওর চোখে চোখ রেখে বললো, তুমি না খুব সাহসী মুক্তিযোদ্ধা? তবে ঘরে ঢুকে দেখে এলে না কেন কোথাও ওদের কোনো চিহ্ন ছিলো কি না? শোভনের ঘরে কোনো মাটির ফ্লাওয়ার ভাস; ড্রইংরুমের দেয়ালে একটি সূচের কাজের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য, দীপালিকার ঘরে একগাদা ডিটেকটিভ বই কিংবা বাবা-মায়ের বিয়ের সময় তোলা বাঁধানো ছবিটা? কেন পারলে না?

কার ঘরে ঢুকবো? ওটা তো একটা দখলদারের ঘর ছিলো। যারা দখল করে ওরা চিহ্ন রাখে না। ওদের প্রয়োজনে লাগলে তা রাখে বাকি সব চলে যায় আস্তাকুঁড়ে।

ওহ্, না। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মঞ্জুলিকা। খবরটা পাওয়ার পর এই প্রথম ও চিৎকার করে কাঁদছে। দরজায় এসে দাঁড়ায় পুষ্পিতা, প্রদীপ্ত এবং অজেয়কে কোলে নিয়ে সোনাই। একটুপর ওরা দেখে মঞ্জুলিকার চিৎকার কমে যাচ্ছে– ও লুটিয়ে পড়েছে। এঁটো হাতে প্রতীক ওকে ধরলে ও প্রতীকের হাতের ওপর জ্ঞান হারায়। ছুটে যায় প্রদীপ্ত, কিন্তু মঞ্জুলিকাকে কোলে তুলে নেয়ার সামর্থ্য ওর নেই। ও নিজের ডান হাতে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, জিতু তোর ভাবীকে ওর বিছানায় দিয়ে আয়।

দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু। জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু লন্ডন-দিল্লী হয়ে ঢাকা এলেন। তেজগাঁ বিমানবন্দর লোকে-লোকারণ্য। মানুষের ভিড় ঠেলে এগুনো যায় না। প্রাণপ্রিয় নেতাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য মানুষ সমবেত হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানের দূরত্ব মাত্র চার মাইল। এই পথটুকু ট্রাকে অতিক্রম করতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় লাগলো। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্তর মনে হলো, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো বঙ্গবন্ধুর জন্য মানুষের ভালোবাসা, আবেগ কত গভীর এবং ব্যাপক। পারবেন কি তিনি মানুষের এই আবেগকে মূল্যায়ন করতে? বিষয়টি ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন হিম মনে হয় শরীরের ভেতরটা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ– বধ্যভূমির লাশের ঘ্রাণ এখনো বাতাসে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র, রাজাকার-আলবদররাও অস্ত্র হাতে ঘুরছে, লুটপাট করছে

BanglaBook.org

ষোড়শ বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, সর্বোপরি ভারতীয় সেনারা এখনো শহরে অবস্থান করছে। কত দায়িত্ব, কত কঠিন কাজ, সেইসঙ্গে জনগণকে পরিতৃপ্ত করা। খুব কি সহজ হবে তাঁর পক্ষে? যে আবেগ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে এ দেশের জনগণ, সে আবেগ কি থাকবে বিধ্বস্ত দেশের পুণর্গঠনে? ব্যক্তিস্বার্থের জোয়ার ভাসিয়ে দেবে না তো মানুষের উদ্দীপনাকে? প্রদীপ্তর মনে হয় ওর ভেতরের হিম জমাট বাধছে, ওটা গলে বেরিয়ে যাচ্ছে না– ও কিছুতেই নিজের অস্বস্তি কাটাতে পারে না। বিকেলে পত্রিকার জন্য রিপোর্ট লেখার সময় লিখলো : বিমানবন্দর হইতে রেসকোর্স ময়দান– দেশের সবগুলো নদী এক হইয়া যদি আরো একটি বঙ্গোপসাগর তৈরি করিতে পারিতো তাহা হইলেও মানুষের ভালোবাসার পরিমাপ করা যাইতো না। এ দেশের মানুষের প্রাণঢালা সংবর্ধনা কতগুলো বঙ্গোপসাগর একত্র করিলে যে গভীরতা ও বিস্তৃতি পাইতো তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ চার মাইল রাস্তা জুড়িয়া মানুষের কালো মাথা প্রবাল ফুলের মতো ফুটিয়াছিলো, শীতের সূর্যের রশ্মি সে ফুলের শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছিলো। এ দৃশ্য অবিস্মরণীয়, এ দৃশ্য স্মরণাতীত এবং ঐতিহাসিক। এ দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

রাতে ভাত খাওয়ার সময় প্রতীক বললো, ভাইয়া তুমি কি অস্ত্র জমা দেবে?

প্রদীপ্ত ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ। এসব জিনিস কাছে না রাখাই ভালো।

প্রতীক গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আমি দেবো না।

কেন?

বাবাকে জীবিত অথবা মৃত এখনো খুঁজে পাইনি।

টেবিলজুড়ে বসে থাকা সবার মাথা প্লেটের ওপর নেমে যায়। পুষ্পিতা উঠতে গেলে প্রতীক বাম হাতে মা'র হাত চেপে ধরে বলে, উঠতে পারবে না। খেতে হবে। কথাটা ইচ্ছে করেই এ সময় বলেছি যাতে তোমরা ভাত ছেড়ে না উঠে যাও। কঠিন সময়কে কঠিন ভাবেই নিতে হবে।

হাতটা ছাড়। ব্যথা পাচ্ছি।

ভাত মুখে দাও। তারপর ছাড়বো।

ভাত খেতে পারে না পুষ্পিতা। সবাই দেখতে পায় বারবার চোখ মোছার পরও ওদের কারোই জল মোছে না। ভাতের ওপর চোখের জল পড়তে থাকে।

অনেক রাতে বাবার পড়ার ঘরে আসে প্রদীপ্ত। বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় চারদিকে ঝোড়ো বাতাসের শব্দ– বাতি নিভে যেতে চায়। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত বলে, বাবা থাকলে ভীষণ খুশি হতেন রবিঠাকুর, তোমার গান এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে। এর চেয়ে বড় সম্মান আমরা আর তোমাকে কিভাবে দিতে পারতাম?

ঘরের জিনিসগুলো অবিকল সেভাবেই আছে। শুধু ধুলোর আস্তর পড়েছে। ওর মনে হয় ও যে ঝোড়ো বাতাসের শব্দ পাচ্ছে তার সঙ্গে চারদিক থেকে ধুলো উড়ে আসছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন লাগছে, কেন এমন অস্থিরতা? ও এক হাতে মুখ ঢেকে বাবার পড়ার চেয়ারে বসে পড়ে। এ ঘরে তালা দিয়ে রাখে প্রতীক। চাবি মঞ্জুলিকার কাছে থাকে। মঞ্জুলিকা জানে এ ঘরে প্রতীকের স্টেনগানটি লুকোনো আছে, বইয়ের র‍্যাকের পেছনে। টেবিলের ওপর ডান কনুই রাখলে ওর শরীরের জমাট হিম ওকে তাড়িত করে, এ অস্ত্র দিয়ে কি করবে প্রতীক? অস্ত্র জমা দেয়ার সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। এখন যার কাছে অস্ত্র পাওয়া যাবে সে অস্ত্র অবৈধ বলে গণ্য হবে, গ্রেপ্তার করা হবে অস্ত্রধারীকে।

মঞ্জুলিকা এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

মঞ্জুলিকা ঘুমোওনি তুমি?

BanglaBook.org

তোমাকে উঠতে দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। বালিশের নিচ থেকে চাবিটা নিলে। কেন এসেছো এ ঘরে?

আমার খুব ভয় করছিলো তাই।

তুমি কি ভাবো বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

না।

তাহলে কীসের ভয় তোমার?

জিতু যে অস্ত্রটা রেখে দিয়েছে সেজন্য।

ও ঠিকই করেছে। তুমিই বরং হেরে যাচ্ছো।

মঞ্জুলিকা, সর্বনাশের কথা বলো না। আমাদের আর কার সঙ্গে লড়াই?

শত্রুর শেষ নেই। চলো ঘুমুবে।

তুমি যাও। আমি পরে আসছি।

না, এখুনি যেতে হবে।

তুমি ইদানীং ভীষণ জেদী হয়ে উঠেছো মঞ্জুলি।

চলো, ওঠো। আমি ঘরে তালা দেবো।

তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছো?

মঞ্জুলিকা চুপ করে থাকে। প্রদীপ্ত চেঁচিয়ে বলে, তুমি কি ভেবেছো আমি জিতুর স্টেনগানটা নিয়ে জমা দিয়ে দেবো?

দিতেও তো পারো। মঞ্জুলিকা নির্বিকার বলে দেয়। অদ্ভুত বিষণ্ন দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার দিকে তাকায়। ও রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং চাবির গোছা দিয়ে ঝুম ঝুম শব্দ করে। তখন প্রদীপ্ত বলে, তুমি আমাকে আটকে রেখে চাবি নিয়ে চলে যাও।

ন্যাকামি করো না। জিতুকে ডাকলে তোমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় ফেলে দেবে।

মঞ্জুলি!

তুমি আহত হলে আমার কিছু করার নেই। ওঠো।

মঞ্জুলিকা ওর বাহু ধরে টানে। প্রদীপ্ত উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস টানে। এই প্রথম ও অনুভব করে দাম্পত্য জীবনের কোথাও ফাঁক হয়ে গেছে। আগে ওর মন খারাপ হলেও মঞ্জুলিকার অনেক কিছু যেত আসতো। এখন ও অবলীলায় যে কোনো কথা বলতে পারছে, প্রদীপ্ত কতটুকু আহত হবে তা তোয়াক্কা না করেই। তাহলে কি যুদ্ধে আহত পঙ্গু স্বামীকে সহ্য করতে পারছে না? নাকি যুদ্ধ থেকে পাওয়া সামগ্রিক পরিস্থিতি ওকে ভিন্ন মানুষ করেছে? ও অস্ত্রকে অবলম্বন করতে চাইছে, প্রতিশোধ নিতে চায়? কার ওপর? মঞ্জুলিকা কার ওপর? আলী আহমদের পড়ার ঘরে তালা লাগিয়ে ও আবার প্রদীপ্তর কাছে আসে। বলে, দীপ আমি সরি। তোমাকে আঘাত করলে তা যে আমাকেও লাগে সেটা আমি ভুলে যেতে বসেছি। আমি আমার চারপাশের কোনোকিছুই সুস্থভাবে দেখতে পারছি না।

নাকি আমার পঙ্গু হয়ে যাওয়াটাই তোমার মর্মবেদনার কারণ? হিংস্র কণ্ঠে প্রদীপ্ত ওকে আঘাত করে।

ছিটকে ওঠে মঞ্জুলিকা, ছিঃ দীপ ছিঃ। কি করে এত ছোট হয়ে গেলো তোমার মন। তোমার জন্য আমার অহংকার সবচেয়ে বেশি।

বাজে কথা। তুমি একবারও জানতে চাওনি কি করে আমি চোখ হারালাম, পা হারালাম। কেমন করে হাসপাতালে একা একা জীবন-মরণ লড়াই করলাম।

BanglaBook.org

থামো দীপ, থামো। একজন যোদ্ধা মানুষ হয়েও তুমি আমাকে বুঝলে না। তোমার সবকিছু শুনবো আমি আমার সুখের সময়ে। এই কষ্ট এবং বেদনার মধ্যে নয়। তোমার যুদ্ধ আমাদের দু'জনেরই সঞ্চয়।

প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে বুকে টেনে নেয়। অনুভব করে মঞ্জুলিকার শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। ও আর আগের মতো নেই। প্রদীপ্তর বুকের সঙ্গে মিশে থেকে মঞ্জুলিকার মনে হয় দীপ আর আগের মতো নেই– ওর পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে আছে। ওর নিশ্বাসে ক্লান্তি। দু'জনে দু'জনকে প্রবল মমতায় আঁকড়ে ধরে। জীবনের একটা নতুন শুরু হলো।

খুব ভোরবেলা পুষ্পিতা ওকে বলে, বৌমা তোমার বাবার ঘরের চাবিটা দাও তো?

কেন মা?

আমি ঐ ঘরে একটুক্ষণ বসবো। কাল রাতে তোমার বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি।

মায়ের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে যায় প্রদীপ্তর। ও বালিশের নিচ থেকে চাবি নিয়ে উঠে আসে। বলে, চলো মা আমরা সবাই মিলে ঐ ঘরে বসবো।

কেন, তোরা কেন? তোদের দরকার নেই। পুষ্পিতা স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে। প্রদীপ্ত মায়ের বিরক্তি বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে। প্রতীকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকে, জিতু ওঠ, আমরা মায়ের সঙ্গে বাবার ঘরে বসবো।

প্রতীক ঘুম জড়ানো চোখে উঠে আসে। মঞ্জুলিকা দরজার তালা খোলে। ভ্যাপসা গন্ধ, ধুলোয় দম আটকে আসে। প্রদীপ্ত জানালা খুলে দেয়। আলোয় ভরে যায় ঘর। পুষ্পিতা মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে। সবাই ওর চারপাশে। প্রদীপ্ত বলে, কি স্বপ্ন দেখেছো মা? পুষ্পিতা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, তোরা আর কতদিন আমাকে মিথ্যে কথা বলবি?

প্রতীক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমরা তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলিনি মা।

তোরা কি তোদের বাবাকে খুঁজে পাবি? বৌমার বাবা-মা-ভাইবোনের মতো তোর বাবাকেও কি ওরা কুচিকুচি করে কাটেনি? আমি যে দেখলাম তোদের বাবা রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

চিৎকার করে ওঠে প্রতীক, আমি তোমাকে নিষেধ করেছি না যে তুমি এসব ভাববে না।

পুষ্পিতা ঠাস করে ওর গালে চড় মারে। বলে, আমি চাই না কেউ আমাকে আমার বাবার মতো শাসন করুক। আমি আজই সব বধ্যভূমিগুলো ঘুরে বেড়াবো। আমি ঠিকই আমার স্বামীর হাড় চিনতে পারবো। আমার কোনো ভুল হবে না। মাথার খুলি, দাঁত, পাঁজর–। পুষ্পিতা উঠতে গেলে পড়ে যেতে থাকে। মঞ্জুলিকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বলে, আমরা এভাবে কতদিন বেঁচে থাকবো? বুকের ভেতর কষ্ট জমতে জমতে পাথর হয়ে যাচ্ছে।

প্রতীক জ্ঞানহারা পুষ্পিতাকে কোলে তুলে বলে, না বাঁচতে পারলে মরো। মরতে পারো না।

ওরা দু'জনে পুষ্পিতাকে শোবার ঘরে নিয়ে যায়। আলী আহমদের পড়ার ঘরে একা দাঁড়িয়ে থাকে প্রদীপ্ত। ও জানালায় দাঁড়ালে দেখতে পায় রাস্তা। ছুটছে মানুষ, নতুন স্বাধীন দেশের মানুষ। ওর বুক মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ ভুলতে– স্বাধীন দেশের পরিপূর্ণ মানুষ হতে, কিন্তু পারলেন কৈ? তাঁর কোনো কবর হয়নি, কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি লাশ– কোনো চিহ্ন নেই। তাহলে বাবা কি উদ্বাস্তুই রয়ে গেলেন? নাকি একজন শহীদ হয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মতো একজন পরিপূর্ণ মানুষের মৃত্যুবরণ করেছেন? গৌরবের মৃত্যু? প্রদীপ্তর মন খুশিতে ভরে ওঠে। ভাবে, এটাই সত্যি। বাবা তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি ঘুচিয়েছেন।

বিকেলে অফিসে যাবার সময় দেখতে পায় বারান্দায় আলী আহমদের ইজিচেয়ারে

BanglaBook.org

শুয়ে আছে পুষ্পিতা। মঞ্জুলিকা চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। প্রদীপ্ত চেয়ারের হাতের ওপর বসে মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে বলে, বাবার জন্য আমাদের আর দুঃখ নেই মা। তোমার বাবার হাড় খুঁজতে হবে না। বাবা একজন শহীদের মৃত্যু বরণ করে তোমাকেও উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তুমি এখন একজন পরিপূর্ণ মানুষ মা।

পুষ্পিতা প্রদীপ্তর ডান হাত নিজের বুকের ওপর রেখে বলে, তোর বাবাকে ছাড়া আমি তো বাঁচতে চাই না দীপু।

মঞ্জুলিকা তাড়াতাড়ি বলে, তুমি না বলেছিলে অফিসে কি জরুরি কাজ আছে?

হ্যাঁ, যাই।

আসার সময় অজেয়র জন্য দুধ নিয়ে এসো।

প্রদীপ্ত মাথা নেড়ে চলে যায়। পুষ্পিতা বলে, ওকে তাড়ালে কেন বৌমা? কতক্ষণ আমাকে আগলে রাখবে? যদি না আমি নিজের থেকে নিজে মুক্ত হই।

মা আমি একটা টিউশনি নিয়েছি। আমাকে একটুপর বেরুতে হবে।

টিউশনি? কখন ঠিক করলে?

আজকেই স্কুলে বসে। একজন ছাত্রীর মা খুব ধরেছে।

স্কুল থেকে ফিরে আবার টিউশনি? শরীরে সইবে? দীপু যা পায় তাতে আমাদের হবে না বৌমা?

আমি কাজের মধ্যে থাকতে চাই মা। আপনিও কাজের মধ্যে থাকুন। অজেয় এখন থেকে আপনার। আপনি অসুস্থ হতে পারবেন না। আমি ওকে একদমই ধরতে দেবো না কিন্তু। পুষ্পিতা ম্লান হাসে। মঞ্জুলিকা তৈরি হয়ে বেরিয়ে যায়।

BanglaBook.org

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে গেছে। ওরা কেন যাচ্ছে না, এমন একটি ভাবনায় প্রদীপ্ত খুব উদ্বিগ্ন ছিলো– কি হবে, এমন চিন্তা ওকে তাড়িত করতো, কিন্তু প্রতীক ও মঞ্জুলিকার সঙ্গে এসব ভাবনা ভাগ করার উপায় নেই। ওদের ব্যক্তিগত শোক ওরা এখন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দেশে ফেরার পর থেকে প্রদীপ্ত বরাবরই ভেবেছে ব্যাপারগুলো আরো উদারভাবে দেখতে হবে। স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি, এটা সবাই বোঝে, কিন্তু ব্যক্তিগত শোকের কাছে তা আবার ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। এখন যদি ভারতীয় বাহিনী না যায় তাহলে কি হবে? আবার যুদ্ধ? প্রতীক এমন একটা আশঙ্কাই করে। কিন্তু যখনই ভারতের সাধারণ মানুষের ত্যাগের কথা মনে হয় প্রদীপ্তর বুক ভরে ওঠে, কী দারুণ সখ্য– মানুষের সঙ্গে মানুষের সহমর্মিতার সেতু রচিত হয়েছিলো। এ ঋণ ভুলবার নয়, পরিশোধও করা যাবে না। হাসপাতালের দিনগুলোতে ডাক্তার, নার্সরা কত সহৃদয় ব্যবহার করেছে। গল্প করে নিঃসঙ্গ সময়কে ভরিয়ে দিতো অন্যরা– এমনকি পাশের বেডের রোগীটির ব্যবহারও ভুলবার নয়। গতকাল থেকে প্রদীপ্তর বুকের ভার নেমে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় গেলে তখনই এক যুক্ত বিবৃতিতে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় সোনাবাহিনী চলে যাবার ক'দিন পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এলেন শুভেচ্ছা সফরে। রেসকোর্স ময়দানে তাঁর জন্য নির্মিত হলো মঞ্চ। নৌকার আকারে তৈরি করা মঞ্চের নাম হলো 'ইন্দিরা মঞ্চ'।

সুদৃশ্য সেই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলিকা বললো, মঞ্চটাকে ছবিতে দেখা পঙ্খিরাজের নাওয়ের মতো লাগছে।

প্রতীক খুক করে হাসলো। প্রদীপ্ত চুপ করে রইলো। ওরা তিনজনে এক জায়গায়

বসেছে। বক্তৃতা শুনবে। একটুপর বঙ্গবন্ধু তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বন্ধুরাষ্ট্র ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাধীনতা যুদ্ধে সবরকম সাহায্য দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় এ কৃতজ্ঞতার প্রতিধ্বনি করে বললেন, রক্তের এ রাখীবন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে। কেঁপে ওঠে প্রদীপ্তর বুক, সম্ভব হবে কি? এ অল্প সময়ের মধ্যেই এ দেশের মানুষ ধাক্কা খেয়েছে, ছোট ছোট ফুসফুড়ির মধ্য দিয়ে ঘা তৈরি হয়েছে। এ দেশের সম্পদ লুট করেছে সেনাবাহিনী, অবাধ চোরাচালান শুরু হয়েছে, জমে উঠেছে কালোবাজারী ব্যবসা। কে জানে এ ক্ষত কিভাবে মুছবে? তারপরও বক্তৃতা শেষে ও প্রতীককে বলে, বঙ্গবন্ধু একটা বড় সাফল্য অর্জন করলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে গেছে।

প্রতীক মাথা নেড়ে সায় দিলো, হ্যাঁ, বুক থেকে পাথর সরে গেলো যেন।

মঞ্জুলিকা হাসলো, না গেলে তোমরা কি আর একটি যুদ্ধ করে টিকতে পারতে? চারদিকে তো ভারতের সীমানা।

প্রতীকের ভঙ্গিটা আক্রমণের, ভয় দেখিও না। সীমানা রয়েছে তো কি হয়েছে? না পারলেও লড়াই তো করে যেতাম।

প্রদীপ্ত ওর হাত ধরে বলে, আমিও করতাম।

মঞ্জুলিকা বলে, এ যুদ্ধ থেকে তোমরা আমাকেও বাদ রাখতে পারতে না। এখন আমার গর্ভে সন্তান নেই।

প্রদীপ্ত হেসে বলে, সবাই যুদ্ধ করলে সন্তানদের দেখবে কে?

মঞ্জুলিকা জোর দিয়ে বলে, দাদীরা, নানীরা। যারা যুদ্ধ করতে পারবে না।

তোমার যুক্তি মানলাম। দু'জনে সায় দেয়। তিনজনে বাদাম খেতে খেতে হেঁটে বাড়ি ফেরে। অনেকদিন পর মঞ্জুলিকার মনে হয়, আজ ওর ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সব কষ্টের বাইরে স্বাধীনতার আনন্দ পাচ্ছে।

রাতে খাবার টেবিলে প্রদীপ্ত প্রতীককে বলে, এখনও কি তোর অস্ত্র রাখার দরকার আছে জিতু?

এটা নিয়ে তোমার এত ভাবনা কেন ভাইয়া?

ধরা পড়লে তোর জেল হবে।

দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি, এরপর যদি জেল খাটতে হয় তো খাটবো।

অভিমানের কথা বলিস না। আইন-শৃঙ্খলার একটা ব্যাপার আছে তো। জিতু আমি চাই না এ দেশে অস্ত্রের রাজনীতি গড়ে উঠুক।

ঠেকাবে কি করে? পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া চাইনিজ অস্ত্র রাজাকারদের হাতে আছে। বঙ্গবন্ধুর অস্ত্র জমা দেয়ার আবেদন সত্ত্বেও কয়টা অস্ত্র জমা পড়েছে দেখোনি? এখনো অনেক অস্ত্র বাইরে। অস্ত্রের রাজনীতির খেলাই জমবে ভাইয়া। দেশের যে পুলিশ বাহিনী আছে ওদের হাতেও এমন আধুনিক অস্ত্র নেই।

তাহলে তো স্বাধীন দেশের মাটিতে নিজেরাই নিজেদের শত্রু হবো।

হতেই হবে। তুমি নিজেও জানো যে বঙ্গবন্ধুর নিজের দলের অনেকেই অস্ত্র জমা দেয়নি। ছাত্রলীগের কর্মী হেলাল আমাকে বলেছে প্রতিপক্ষের হাতে এত অস্ত্র রেখে ওরা নিরস্ত্র হতে চায় না।

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকে। ওর ভেতরে কষ্ট বাড়ে, নিজের একটি হাত এবং চোখ হারানোর চেয়ে মনে হয় এ কষ্ট বেশি। স্বাধীনতা কি প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের শিকার হয়ে যাবে? বঙ্গবন্ধু যদি না পারেন, তাহলে কে আর পারবে স্বাধীনতা ঠেকাতে? মৃত্যুর হাত থেকে তিনি তো তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বদেশে ফিরে এসেছেন– তাঁর জনগণকে তিনিই সবচেয়ে

BanglaBook.org

বেশি চেনেন। তিনি যুদ্ধ করেননি, কিন্তু তাঁর নামে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। তিনি তাঁর এই প্রতীকী সত্তা দিয়ে পারবেন না দেশের সার্বভৌম ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে? নাকি সেই প্রতীকী সত্তা থেকে জীবন্ত মানুষ হওয়ার ফলে ছিঁড়ে যাচ্ছে আবরণ, বেরিয়ে আসছে কাঠামো? আমি যুদ্ধ করেছি, দেশ গড়ার সময় তো চাই, এখনই নিরাশার কথা ভাবছি কেন আমি? নিজেকে শাসন করে প্রদীপ্ত। চুপচাপ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে। মঞ্জুলিকার মনে হয়, ওকে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না, কিংবা ও আমাদেরকে।

রাতে নীলক্ষেত ফাঁড়ির ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যায় প্রদীপ্তর। মঞ্জুলিকা নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে। অপর পাশে অজেয়, বালিশে মাথা নেই– হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ও উঠে বারান্দায় আসে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ও কিছু চায়নি, যে পত্রিকায় কাজ করতো, সেখানে আবার যোগদান করেছে। যে বেতন পায় কোনোরকমে সংসার চলে। কিন্তু প্রতীক মানতে পারছে না– যুদ্ধের মূল্যবোধ ওকে বদলে দিয়েছে। ওর দাবি অনেক। প্রতীকের মতো এমন অজস্র ছেলে আছে। স্বাধীন দেশ এদেরকে কেমন করে শান্ত করবে? জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এরা শহরে-গ্রামে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। সীমান্তে চোরাচালানী রোধে নিয়োজিত হয়েছে। অবৈধ গুদামজাত এবং কালোবাজারী বন্ধ করার চেষ্টা করছে। প্রদীপ্ত ভাবলো, ওদের সমস্যা আরো গভীর, শ্রেণীশত্রু খতমের নামে যে রাজনীতি চলছে তারও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। কত সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে বিপন্ন হবে এই রাজনীতির কাছে– দু'পক্ষই মারবে এদের। যারা ক্ষমতায় আছে তারা সুযোগটা বেশি নেবে। রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ্ত ভীষণ অসহায় বোধ করে।

একটুপর মঞ্জুলিকা উঠে আসে। বলে, ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম তুমি বিছানায় নেই, বাথরুমেও নেই। আমার ভীষণ ভয় হলো তখন।

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে, আমাকে নিয়ে তোমার ভয় নেই মঞ্জুলি।

এত হারিয়েছি যে ভয় তো সেজন্য।

আমার ভয় জিতুর জন্য।

রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাবে?

যদি যায়?

মঞ্জুলিকা হেসে ওর বুকে মাথা রাখে। বলে, মিছেই তোমার ভয়। যুদ্ধকরা ছেলেরা দেশের ভালোমন্দ বিচার করতে চাইবে। এতে দোষ কোথায়? দেশ তো কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নয়?

আমি এসব জানি মঞ্জুলিকা। শুধু এটুকু বুঝি যে নতুন করে কাউকে হারাতে চাই না। অস্ত্রের রাজনীতি যদি জিতুর বুক ফুটো করে দেয়?

তাহলেও জিতু ভালোর জন্যই লড়বে।

তুমিও বলছো তা? ভালোমন্দ বোধ ভীষণ আপেক্ষিক। রাজনীতির ভালোমন্দ বুঝতে সময় লাগে। বোঝার শেষে দেখা যায় যে জল অনেক গড়িয়ে গেছে। মঞ্জুলি আমাদের অনেক হয়েছে।

এসব কি বলছো? স্বাধীনতা যারা এনেছে তারা স্বাধীনতা রক্ষাও করবে। তুমি ভুলে যাচ্ছো যে আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু শুধু একা নন। তাঁকে দিয়ে তাঁর পার্টিকে বিচার করা যায় না।

প্রদীপ্ত নিশ্বাস ফেলে বলে, তা সত্যি।

চলো ঘুমুবে।

BanglaBook.org

মাসখানেক পর বিমল প্রেসক্লাবে প্রদীপ্তকে খুঁজতে আসে। ও তখন নসিবের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলো। বিমলকে প্রথমে চিনতে পারেনি। শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, বোঝা যায় মাথা ন্যাড়া করেছিলো, খোঁচা খোঁচা চুল গজিয়েছে, গালের ওপর বড় একটা কাটা দাগ। দূর থেকে ওকে একবার দেখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। বিমলও ইতস্তত করে, আমি ঠিক দেখছি যে ওটাই দীপু ভাই? তারপর কাছে এসে বলে, দীপু ভাই আমি বিমল।

বিমল? আঁতকে ওঠে ও। তাই তো দূরে তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিলো যে চেনা চেনা লাগছে। ব'সো।

আপনাকেও আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। যুদ্ধ একটা বড় মূল্য নিয়েছে আপনার কাছ থেকে, বলেই হা-হা করে হাসলো ও।

তোমার কি হয়েছে বিমল?

আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছি। রক্ষীবাহিনী আমাকে খুঁজছে।

তিতুমীরকে ডেকে ওর জন্য চা-সিঙ্গাড়া আনায় প্রদীপ্ত। নসিবকে বলে, বিমল আমার সোনাখালির বন্ধু নসিব ভাই। আমরা দু'জনেই এখন ওর কাছ থেকে সোনাখালির কথা শুনবো।

ওকে দেখেই বুঝতে পারছি যে সোনাখালি এমন কাটাছেঁড়া, বিক্ষত হয়েছে। তোমার গল্পের সোনাখালি নেই।

আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে রক্ষীবাহিনী। ধান-চাল যা ছিলো লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

কি করেছিলে?

আমি কিছু করিনি। শিশিরদের পার্টির সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। শিশিররা থানা আক্রমণ করেছিলো। এখন অবৈধ অস্ত্রের খোঁজে এবং সর্বহারা পার্টির কর্মীদের খোঁজে সোনাখালি চষে বেড়াচ্ছে রক্ষীবাহিনী। শিশিরের বন্ধু বলে আমার ওপরও আক্রমণ হয়েছে। আমি অবশ্য আগেই বাড়ি থেকে সরে পড়েছিলাম। ওরা ওখানে ক্যাম্প করেছে।

প্রদীপ্ত এবং নসিব বিমলের বর্ণনা শোনে। বর্ণনার সময় ওর চোখে পানি এসে যায়। নসিব ঠাট্টা করে বলে, সর্বহারা পার্টির কেউ না হয়ে তুমি সর্বহারা হয়ে গেলে বিমল।

না, সব হারাইনি। এখনো কণ্ঠ আছে এবং গান আছে।

ব্রেভো, এই তো চাই। নসিব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

প্রদীপ্ত বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, শিশির কেমন আছে?

ও নিহত হয়েছে।

রক্ষীবাহিনীর হাতে?

না, দলীয় কোন্দলে। নিজেদের লোকেরাই খুন করেছে ওকে। দীপু ভাই আমি কি কিছুদিন আপনার কাছে থাকতে পারবো?

নিশ্চয় পারবে। চলো, বাড়ি চলো।

জিজ্ঞেস করলেন না আমার গালের এই দাগ কিভাবে হলো? শিশিরের কাণ্ড। একদিন রাগ করে ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছে। বেশ অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম।

বুঝেছি, তোমার অনেক কথা জমা হয়েছে। নসিব ভাই তোমাকে নিয়ে গল্প লিখবে। চলো যাই।

আমি একদিন বিমলকে আমার বাসায় নিয়ে যাবো। যাবে তো বিমল?

বোধহয় না। দীপু ভাই ছাড়া এ শহরের কাউকে আমি এখনো আপন ভাবিনি।

আমি তোমার শত্রু নই।

BanglaBook.org

বিমল এ কথার জবাব দেয় না। নসিব থেকে বিদায় নিয়ে প্রদীপ্তর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। ওকে পেয়ে প্রতীক বললো, তুমি আমার ঘরে থাকবে বিমলদা। আমি মার সঙ্গে ঘুমুবো।

না, না, তা কি হয়? আমি ড্রইংরুমে থাকবো।

সেই ছোটবেলার পর মা'র সঙ্গে ঘুমোইনি। তুমি আসাতে আমার সেই সুযোগটা হলো। কেন আমাকে বঞ্চিত করবে? প্রতীক হাসতে হাসতে নিজের কাপড়চোপড় নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মঞ্জুলিকা বলে, যতদিন খুশি থাকবেন। আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

আমার তো হবে ভাবী। বিমল অন্যদিকে তাকিয়ে বলে।

যদি ধরা পড়েন?

পড়লে আর কি করবো। যা হবার হবে। এসব ভেবে লাভ নেই। চা খাবো ভাবী। তার আগে স্নান করবো।

মঞ্জুলিকা ওকে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। বাথরুমে যেতে যেতে ও বলে, এখন বুঝতে পারছি, মানুষের যুদ্ধ ফুরোয় না।

রাতে বিমল ঘুমুতে গেলে প্রদীপ্তর মনে হয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন খারাপই হচ্ছে। চারদিকে অস্ত্রের রাজনীতি। বঙ্গবন্ধু-সরকার পরিস্থিতি ঠিকমতো সামাল দিতে পারছে না। আসলে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত ছিলো, প্রতীক এমন কথাই বলে। প্রদীপ্তর মনে হয়, ঠিকই বলে। জাতীয় সরকার হলে পরিস্থিতি হয়তো আরো সহনীয় হতো। অবশ্য কেউ তো অস্বীকার করবে না যে সত্তরের নির্বাচনে এ দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট দিয়েছিলো। তারা প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলো। পাকিস্তানের কারাগারে থাকা সত্ত্বেও গোটা জাতি বঙ্গবন্ধুর নামে যুদ্ধ করেছিলো। কিন্তু যারা যুদ্ধ করেছে তারা সবাই তো আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতো না। স্বাধীন দেশ পুণর্গঠনে তারা কেন সুযোগ পাবে না? একটুপর প্রতীক এলো। ওর ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভাইয়া?

শুনি তোর সিদ্ধান্ত কি।

আমি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেবো। ওদের কর্মসূচি আমার ভালো লাগছে।

ছিটকে ওঠে প্রদীপ্ত, কি বললি?

আমি চাই বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠন করতে। যুদ্ধ সবাই করেছি। তোমার কষ্ট আমি বুঝি ভাইয়া। আমি দেখেছি তুমি কেমন বিষণ্ন থাকো। আমাদের উচিত একটা কিছু করা।

এখনই নয় জিতু। আমি জানি বাবা থাকলে বলতেন, যারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো তারা কি পারবে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে?

এটা তো সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। যারা নেতৃত্ব নিলো তারা কতটা সফল হবে এটা তাদের কাজই প্রমাণ করবে। আমি বিশ্বাস করি সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতীয় সমস্যাগুলো দূর হবে।

এটা তো দীর্ঘ তর্কের বিষয়। তবে আমি মনে করি সমাজতান্ত্রিক দল যদি শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করে সেটা আমাদের জন্য ভয়াবহ হবে। আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে জিতু।

কী যে সব উদ্ভট ভাবনা তোমার। প্রতীক ওর আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়। বিপ্লবের জন্য ঝুঁকি নিতেই হয়। সেটা আমরা নেবো।

BanglaBook.org

প্রতীক ওকে উপেক্ষা করে চলে যায়। ওর মনে হয় প্রতীক বুঝি এ সময়ের ছেলে, পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে ও এ নতুন সময়কে মানতে পারছে না। এমনকি মঞ্জুলিকাও এ সময়ের মেয়ে– পুরো পরিবার হারিয়ে ও তীক্ষ্ণ এবং ধারালো হয়ে উঠেছে, কোনো যুক্তি মানতে চায় না, যুক্তির বিপরীতে নিজস্ব যুক্তি দেখায়। আর ও নিজে পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাহলে ওর দলে কে থাকলো? মা? পুষ্পিতা নিরীহ, বোবা জীবে রূপান্তরিত হয়েছে– শুধুই বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকছে, তাকে দলে রাখা না রাখা সমান– সংখ্যা বাড়ে, গুণ বাড়ে না। তাহলে এই বিরূপ সময়ের বিরুদ্ধে ও কি বঙ্গবন্ধুর মতো একা? বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব নিয়ে একদিকে, অন্যদিকে তাঁর পার্টির সদস্যরা, যারা মনে করছে দেশের স্বাধীনতা তাঁরাই এনেছে, সুতরাং উসুল তোলার এখনই সময়। আর প্রতীকের মতো টগবগে তরুণরা স্রোতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে নিজস্ব একটা কিছু গড়ে তুলবে বলে।

পনেরো দিনের মাথায় কাউকে কিছু না বলে বিমল চলে গেলো। বালিশের নিচে পাওয়া গেলো একটি চিরকুট। দীপু ভাই, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। তবে পালিয়ে বেড়াবো কেন? তাই সোনাখালিতেই ফিরে যাচ্ছি।

মঞ্জুলিকা ক্রুদ্ধস্বরে বললো, মৃত্যুই ওকে টেনে নিয়ে গেলো। রক্ষীবাহিনী ওকে পেলে টুকরো টুকরো করবে।

ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিলো প্রদীপ্ত। এমন একটি কঠিন মন্তব্য করে স্কুলে চলে গেলো মঞ্জুলিকা। পুষ্পিতা অজেয়কে দুধ-রুটি খাওয়াচ্ছে। ওর জন্য এক টিন দুধ জোগাড় করতে কালকে সাড়ে চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলো মঞ্জুলিকা। বাসায় ফিরে কেঁদেছে। সেই সঙ্গে বাবা-মা-ভাইবোনের নাম ধরে অনেকক্ষণ বিলাপ করেছে। থমথম করছিলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া নিখোঁজ আলী আহমদের বাসভবন। এখন অজেয়র দিকে তাকিয়ে আবার বিমলের কথা মনে হয় প্রদীপ্তর, সেই সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর কথা। প্রতিদিন রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের খবর আসছে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। গ্রামে-গঞ্জে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটায়। লোকে মনে করছে সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা হারিয়েছেন। এটা তো সত্যি আওয়ামী লীগ মনে করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেবল আনুষ্ঠানিক কাজ চালানোর জন্য সেনাবাহিনী থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ জানে পাকিস্তান আমলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে দেশের বাজেটের সিংহভাগ অর্থ সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় করা হতো। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে সেনাবাহিনী লালন করা উচিত নয়। প্রদীপ্ত চায়ের কাপটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভাবে, এ এক আগুন নিয়ে খেলা। এত সহজ নয় বিষয়টি। তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের নিয়তি শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন, পুরো পাকিস্তান আমলে বারবারই এটা প্রমাণ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কি পারবেন এ বাহিনীকে বিক্ষুব্ধ রেখে দেশ চালাতে? প্রদীপ্তর কষ্ট বাড়তে থাকে, তিনি কেন কঠোর হচ্ছেন না? কেন দল বড় হয়ে উঠছে তাঁর সামনে? কখনো কখনো ব্যক্তি কেন তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এভাবে চললে তিনি জাতির প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না। প্রদীপ্ত অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু চিন্তা ওকে ছাড়ে না। কয়েকদিন আগে কর্নেল জিয়াউদ্দিন 'হলিডে' পত্রিকায় কী তীব্র ভাষায় বঙ্গবন্ধু সরকারের সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, 'আপনাকের ছাড়াই আমরা যুদ্ধ করেছি, প্রয়োজনে আবার আমরা লড়বো'; শিউরে ওঠে প্রদীপ্ত, এ কীসের আলামত! একটা অস্পষ্ট ছবি ওর সামনে ভেসে ওঠে, মনে হয় সারি সারি ট্যাঙ্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে ঢাকার রাজপথে। যে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে এ লড়াই কার সঙ্গে? সেনাবাহিনীর সঙ্গে বেসামরিক লোকের? ওর মনে হয় ওর পায়ের নিচে মাটি নেই–

BanglaBook.org

বঙ্গপোসাগরের উত্তাল স্রোত ওর পায়ের নিচ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আলী আহমদের কথা ওর মনে হয়। বাবার জন্য হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করলে প্রদীপ্ত রিকশা নিয়ে উঠে পড়ে।

প্রতীকের সঙ্গে আরো অনেক তরুণ এবং মুক্তিযোদ্ধা মুগ্ধ হয়ে কর্নেল তাহেরের কথা শোনে। তিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কাছে জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি বিকল্প রণনীতি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। ছেলেদের তিনি বলছেন, আমি মনে করি স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো হুবহু একটি গণবিচ্ছিন্ন ব্যারাক আর্মি গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। তার বদলে আমাদের প্রয়োজন ছোট আকারের উৎপাদনমুখী গণবাহিনী। এ গণবাহিনী দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকবে এবং এই গরিব জাতির আর্থিক বোঝা হবে না। আমি বিশ্বাস করি দেশপ্রেমিক জনগণই সেই শক্তি যারা সত্যিকার অর্থে দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আমার মতে রাষ্ট্রীয় গণবাহিনীর মূল দায়িত্ব হবে দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলে দেশের সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা। এভাবে সেনাবাহিনী ও জনগণ পরস্পরের কাছাকাছি হবে। অস্ত্রের কারণে তাদের মাঝে যে দূরত্ব সেটা আর থাকবে না। আমি যে রণনীতির পরিকল্পনা করেছি তাতে আমি স্পষ্ট বলেছি, জনগণ ও সেনা সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ শেষে তারা কেন আলাদা হয়ে যাবে? আমি চাই না একটি স্বাধীন দেশে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সশস্ত্রবাহিনী গড়ে উঠুক, যারা পাকিস্তানের মতো বারবার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে। সেনাবাহিনী দেশের উন্নয়নে অংশ নিলে তারা জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারী গণবাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। এভাবে আমরা দেশকে গড়ে তুলতে পারবো।

প্রতীকের মুগ্ধতা কাটে না। ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে দেখে তাহেরের চোখেমুখে এক অভাবনীয় দীপ্তি, নতুন কিছু করার পরিকল্পনায় উত্তেজিত। তাঁর প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠ ওদের তরুণ হৃদয় অভিভূত করে রাখে। ও মনে মনে বলে, এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা। আমাদের প্রয়োজন নতুন কিছু করা। আমাদের প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর শাসন ভেঙে দিয়ে নতুন করে দেশকে ঢেলে সাজানো।

বাড়ি ফিরে প্রদীপ্তকে এসব কথা বলার সময় ও নিজের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। বলে, আমাদের উচিত শেখ মুজিবের বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করে এসব বৈপ্লবিক ধারণাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটানো।

প্রদীপ্ত ঠাণ্ডা গলায় বলে, এটা কোনো ছোট পরিবর্তন নয় জিতু। ছেলেখেলাও নয়। এটা সাগরের তলদেশকে উপরে উঠিয়ে আনার মতো বড় ঘটনা।

আমরা তো বড় ঘটনাই চাই। জনগণও তাই চাচ্ছে। দেখছো না জাসদের সভাগুলোয় কেমন লোক সমাগম হয়। এ সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ভাইয়া। দেখছো না চারদিকে কী অরাজকতা।

তোর পার্টি এই অরাজকতা ব্যাপক করেছে। তোরা নিজেদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের বদলে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা বেশি করছিস। তাঁকে বিরোধিতা করে খাটো করে রাখার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিস। এটা কোনো পার্টির কর্মসূচি হতে পারে না। নিজেরাও জানিস না কতদূর যেতে পারবি।

তোমার ঐ এক প্যাচাল নিয়ে তুমি থাকো। শুধু নিরীহ, ঠাণ্ডা গোবেচারাই হওনি, অন্ধও হয়েছো। প্রতীক ওকে মুখ ঝামটা দিয়ে চলে যায়। প্রদীপ্তর মনে হয় ও বরাবর

BanglaBook.org

গোবেচারাই ছিলো। নতুন কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু প্রতীক বিপ্লবী হয়েছে, ভাইকে মুখ ঝামটা দিতে শিখেছে। এম.এ. পরীক্ষা দেবে না বলে মাকে জানিয়ে দিয়েছে। ও অনেক অর্জন করেছে।

দু'দিন পর পত্রিকা অফিসে বিমলের মৃত্যুর খবর প্রথমে ও-ই পায়, মফস্বলের নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো। হেডিংটা ছিলো এমন : রক্ষীবাহিনীর গুলিতে বিমল কুণ্ডু নামে সোনাখালির জনৈক যুবক নিহত। খবরটা পড়ে ও কাঁদতে পারলো না, কেমন শক্ত হয়ে থাকলো ভেতরটা– এমন কত খবরই তো প্রতিদিন আসে। প্রতিপক্ষের গুলিতে প্রতিপক্ষ নিহত হচ্ছে, তাদের কাউকেই ও চেনে না, আজ বিমলের জন্য কাঁদবে কেন? নিজেকেই বলে, আমি অন্ধ হইনি। আমি শঙ্কিত, এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কে জানে বঙ্গবন্ধু কতদিন নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অপরিসীম। একজন ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল জিয়াউদ্দিন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ভাষায় লিখেছে, সে অপরাধে তাঁর কোর্ট মার্শাল হওয়ার কথা। কিন্তু তেমন কোনো শাস্তি হয়নি। শুধু জিয়াউদ্দিনকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিলো। তিনি ক্ষমতা চাইতে রাজি হননি, পদত্যাগ করেছেন। কর্নেল তাহের কুমিল্লা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর সকল বিভাগকে জনগণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এডুকেশন কোরকে আশেপাশের গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় খুলে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। মেডিকেল কোরকে পাঠাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে টিকা দিতে। সিপাহী ও অফিসারদের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে সামরিক-সংস্কৃতি পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করছেন। শোনা যায় বঙ্গবন্ধু সবকিছুই জানেন। তারপরও বলেন, তাহের তো যুদ্ধে একটা পা দিয়েছে। প্রদীপ্ত ভাবলো, যুদ্ধে তো অসংখ্য মানুষ জীবনও দিয়েছে, নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছে, শিশুরা বেয়নেটের মাথায় বিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এভাবে প্রশ্রয় দিলে সামরিক শৃঙ্খলার কি হবে? সামরিক বাহিনীর অন্য সদস্যরা এসব কি মানবে? নাকি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলবে? ভাবতেই আশঙ্কায় প্রদীপ্তর ভেতরটা হিম হয়ে যায়। পরিস্থিতি ওর চোখের সামনে জটিল হয়ে উঠতে থাকে। পরমুহূর্তে ও ভাবে নাকি বঙ্গবন্ধু নিজে যুদ্ধ করেননি বলে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের তিনি এমন দৃষ্টিতেই দেখছেন? তাহলে হাজারো মুক্তিযোদ্ধা কেন উপেক্ষিত হলো? এতকিছুর ভাবনার মাঝে গুলিবিদ্ধ বিমলের চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করে। বিমল কি দু'চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে? বড় নীল রঙের মাছি কি উড়ে এসে বসেছে ওর মুখের ওপর? প্রদীপ্ত নিজের চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসে থাকে। কে যেন এসে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে প্রদীপ্ত? ও মুখ তুলতে পারে না, ওর চোখ ভিজে যাচ্ছে।

ডিসেম্বর শুরু হতেই নিজের ভেতর প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করে পুষ্পিতা। আলী আহমদকে খুঁজে পাওয়ার এখনো আশা আছে বলে প্রতীক যতই চেঁচামেচি করুক না কেন এ নিয়ে এখন আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না ও। যা বোঝার বুঝে গেছে। ওর একটাই দুঃখ মানুষটির মৃত্যুর তারিখ নেই, যেদিন কাঙালি ভোজ হতে পারে, মিলাদ হতে পারে। মানুষটির কবর নেই, প্রিয়জনের যে কবর জিয়ারত করে স্বস্তি পাওয়া যায়। যেদিন আলী আহমদকে আল-বদররা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো সেদিন খুব সকালে ওঠে পুষ্পিতা। মঞ্জুলিকারও ঘুম ভেঙে গেছে, ও কেবল দরজা খুলেছে দেখে পুষ্পিতা ওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আঁতকে উঠে বলে, মা, আপনি? আমাকে ডাকেননি কেন?

এখনই এসেছি। তোমার বাবার ঘরের চাবিটা দাও বৌমা।

মঞ্জুলিকা চাবি দিয়ে পুষ্পিতার পিছু পিছু আলী আহমদের পড়ার ঘরের সামনে এসে

দাঁড়ায়। পুষ্পিতা ভেতরে ঢোকে। আঁচল দিয়ে আলী আহমদের বাঁধানো ছবিটা মুছে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর সেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মঞ্জুলিকা নিঃশব্দে সরে আসে। ঘুম ভেঙে গেলে কান্নার শব্দ শুনে ধড়মড় করে ওঠে প্রদীপ্ত, কে কাঁদছে? কাছেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিলো মঞ্জুলিকা। বললো, আজ আল-বদররা বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।

ওহ্ বাবা। প্রদীপ্ত বালিশে মুখ গোঁজে। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় প্রতীকের। ও আলী আহমদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্পিতাকে কাঁদতে দেখে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আশেপাশের কোন গাছে কি ফুল আছে তা ওর জানা ছিলো, তবু মাকে সময় দেয়ার জন্যই ও রমনা পার্কে চলে যায়। এক ঝাঁকা ফুল নিয়ে ফিরে আসে। মঞ্জুলিকাকে বলে, মালা গাঁথো ভাবী। ওর ছয়টা মালা গাঁথা হলে সবাই মিলে মাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

ওঠো মা। এসো সবাই মিলে বাবার ছবিকে মালা পরাই।

পুষ্পিতা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। সারাঘর ফুল দিয়ে ভরে দিয়েছে ওরা। ফুলের গন্ধ লোবানের সুবাসের মতো মনে হয় পুষ্পিতার, ছেলেমেয়েদের মুখগুলো যেন অলৌকিক দেবশিশু, ওরা সবাই আলী আহমদকে ভালোবাসে। একে একে ছবিতে মালা পরায় ওরা। সবশেষ মালাটি অজেয়র হাতে দিয়ে ওকে পুষ্পিতার কোলে দেয় মঞ্জুলিকা। পুষ্পিতা ওর হাত ধরে ছবিতে মালা দেয়। এবং সেই সঙ্গে ছোট ঘরটি সমবেত কান্নার শব্দে ভরে ওঠে। একসময় পুষ্পিতা বলে, আজকে এ ঘরে তালা দিয়ো না কেউ, আলো-বাতাস ঢুকুক ঘরটায়। সোনাই আর অজেয় আজকে এখানেই খেলবে।

প্রদীপ্ত বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, জিতু তোর স্টেনগানটা তোর ঘরে নিয়ে যা। এ বয়সেই যেন বাচ্চাদুটো ওটা বের করে না ফেলে।

প্রতীক জবাব দেয় না। র‍্যাকের আড়াল থেকে স্টেনগানটা বের করে নিয়ে যায়।

পুষ্পিতা খিচুড়ি-মাংস রান্না করে দুপুর নাগাদ ফকির খাওয়ায়। কতজন এসেছে ও জানে না। কি দোয়া করেছে ও শোনেনি, সারাদিন আলী আহমদের নানা মাত্রার কণ্ঠ ওকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে, বিকেলবেলা সে কণ্ঠ ওকে একদম আনমনা করে রাখে।

BanglaBook.org

সেদিনই গণপরিষদে গৃহীত বাঙালি জাতির প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষরদান করা হয়। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এ চারটি স্তম্ভের ওপর রচিত সংবিধানের জন্য যুদ্ধ করেছে এ দেশের মানুষ। ষোল ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' উপলক্ষে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে শাসনতন্ত্র চালু করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি আগামী বছরের সাতই মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। দু'দিন পর সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ হয়। বঙ্গবন্ধু হন বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

মাস দেড়েক আগে যেদিন গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পাস হয় এবং চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় সেদিন বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এর চেয়ে আনন্দের দিন আর হয় না। আমি অত্যন্ত সুখী যে দেশবাসীর কাছে দেয়া ওয়াদা আমি পূরণ করতে পেরেছি।' একটি মানচিত্র এবং একটি সংবিধান পাওয়া একটি জাতির জন্য কম বড় কথা নয়। দুটো জিনিস একজন মানুষ দিয়েছেন, নতুন নেতৃত্ব যারা গড়ে তুলতে চায়, তারা এবার অন্যকিছু দিক। সন্ধ্যায় পত্রিকা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রদীপ্তর মনে হয় বঙ্গবন্ধুর আর কিছু না করলেও চলবে, তিনি এ জাতির ইতিহাসে অমর হয়ে গেলেন। এবার তাঁর ছুটি নেয়ার পালা।

টি এস সির কাছে রিকশার চাকা বার্স্ট করলে ও ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হাঁটতে থাকে। এটুকু পথে আর ভয় কি? প্রতীক বলবে, ভয় তো পায়ে পায়ে– এটুক আর সেটুকে নয়। যে কোনো সময় তুমি হাইজ্যাকারের কবলে পড়তে পারো। ইদানীং আমি অস্ত্র ছাড়া বের হই না। ছোট একটা জোগাড় করেছি যেটা সবসময় সঙ্গে থাকে। কিন্তু প্রদীপ্তর মনে হয় ওর কোনো ভয় নেই। ওর কিছু হারাবার নেই। মুহূর্তে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এত জোর দিয়ে ও ভয় নেই বলছে কেন? যদি মানচিত্র হারায়, যদি সংবিধান হারায়! ধুত্ কিসব বাজে ভাবনা, ও জোর করে নিজের ভেতরের স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। আরো কয়েক পা এগুতেই দেখতে পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য তৈরি হচ্ছে সেখানে অহিউল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল অহি দু'পা ফাঁক করে হেলান-দেয়া ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, যেন খুব ক্লান্ত ও। প্রদীপ্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। দ্রুত হেঁটে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, স্বাধীন দেশে এই প্রথম অহিউল্লাহর সঙ্গে দেখা।

অহি ভাই? তুমি এখানে? কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা?

অহিউল্লাহ কথা বলে না। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কি হয়েছে অহিভাই? তুমি তো আমার কথা জানতে চাইলে না?

প্রদীপ্ত।

বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠে অহিউল্লাহর মুখে নিজের নাম শুনে চমকে তাকায় ও, কিছু বলবে?

এসো, আমরা বসি এই অপরাজেয় বাংলার কাছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসে। প্রদীপ্ত আবার আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আগামী বছর দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। আমরা গণতন্ত্রের পথে এগুচ্ছি।

অহিউল্লাহ চুপ করে থাকে। প্রদীপ্ত ম্লান কণ্ঠে বলে, আমাদের অনেক বয়স হয়ে গেলো অহিভাই। সেই বাহান্নোতে তুমি আমার প্রিয় মানুষ ছিলে।

এসব কথা থাক প্রদীপ্ত।

তোমার কি মন খারাপ? দেশের আইন-শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খল অবস্থা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অসহিষ্ণু বিরোধী দল এবং অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতি দেখে তুমি কি হতাশ?

না। অহিউল্লাহর ভেতর থেকে ভুতুড়ে ঘড়ঘড় কণ্ঠ ভেসে আসে।

তাহলে তুমি কি ভাবছো যারা যুদ্ধ করেছে তাদের সবাইকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে দেশটাকে রাতারাতি বদলে ফেলা যেত?

না, না। এসব আমি ভাবি না। এগুলো সমস্যা নয়। সবকিছুই কাটিয়ে ওঠা যাবে।

তাহলে তুমি এমন বিষণ্ন কেন? কেন এতদিন পরে দেখা হওয়ার পরও বলতে পারলে না প্রদীপ্ত কেমন আছো?

আমি জানি তুমি কষ্টে আছো, কিন্তু তোমার আশাবাদ ফুরোয়নি।

তাহলে তোমার কীসের দুঃখ অহি ভাই?

অদ্ভুত সেই ঘড়ঘড় কণ্ঠ বাতাসে মিশে যায়। প্রদীপ্ত ভীষণ ভয় পায়, ওর গা ছমছম করে। ও দেখতে পায় অহির কণ্ঠস্বর টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে নির্মীয়মাণ ভাস্কর্যের পাদদেশে। সেই কণ্ঠ বলে যাচ্ছে এক অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী– একদিন এই শহর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে– এই শহরে তোমার মতো হাজার হাজার মানুষ দেখতে পাবে ওদের হৃৎপিণ্ড থেঁতলে গেছে– তার ওপর অজস্র পোকা, খুবলে খাচ্ছে অনবরত গজিয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ড। তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের শিশুদের সামনে কালো দেয়াল– শিশুদের বেড়ে ওঠা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডগুলোর গায়ে লেপ্টে আছে বদলে যাওয়া সংবিধান। তোমরা তোমাদের অতীত

BanglaBook.org

ফিরে পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করছো। হা-হা করে হেসে ওঠে অহিউল্লাহ, তুমি ভেবেছো আজ তোমার বড় আনন্দের দিন, না প্রদীপ্ত?

প্রদীপ্তর মনে হয় ভাস্কর্যের জন্য ফেলে রাখা ইট-সুরকির নিচে ও চাপা পড়ে যাচ্ছে। ও প্রাণপণ চিৎকার করে অহিকে ডাকতে চাইছে, কিন্তু অহির নাম ওর মুখে আসে না। ও বলে যায়, মধুদা তুমি কোথায়? তুমি কি তোমার চায়ের ক্যান্টিনে বসে ছেলেদের চা খাওয়াচ্ছো? নাকি আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছো? তাহলে তোমার হাতটা আমাকে বাড়িয়ে দাও। আমি একটু ধরি। তোমার হাত ধরলে আমার ভয় কেটে যাবে মধুদা। রাস্তায় সাঁই করে গাড়ি চলে যায়, আকাশে তারার বুদ্বুদ।

সে রাতে বাড়ি ফিরলে ও দেখে পুষ্পিতা একা। ওকে দেখে চমকে ওঠে। জড়িয়ে ধরে বলে, তোর কি হয়েছে দীপু? জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে দেখছি। চল, শুবি চল। বৌমা ওর বান্ধবীর বাসায় গেছে। এখুনি এসে যাবে।

প্রদীপ্ত মায়ের কথায় কান দেয় না। বলে, মাগো আজ অনেকদিন পর অহিউল্লাহকে দেখেছি।

তোর এই এক রোগ। সেই ছোটবেলার বন্ধু। ছেলেটাকে তুই ভুলতে পারিস না।

ও তো ভোলার ছেলে নয়। এই জাতির কার সাধ্যি আছে যে ওকে ভুলবে? তুমি তো জানো যে ও ভাষা আন্দোলনের কিশোর শহীদ।

তোর মাথায় জলপট্টি দেই দীপু?

না মা। আমার খারাপ লাগছে না। আমি তোমার কাছে বসি।

বলতে বলতে ও মায়ের গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে। পুষ্পিতা দেখতে পায় কিছু একটা ধরার জন্য হাত বাড়ালো দীপু, কিন্তু ধরতে পারলো না। জ্বরের ঘোরে নেতিয়ে পড়ে ও। সোফার ওপর ওকে শুইয়ে দেয় পুষ্পিতা। জলপট্টি দেবার ব্যবস্থা করে। ও তখন একটানা ভুল বকে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে প্রদীপ্তর কণ্ঠে বারবার অহিউল্লাহর নাম শুনতে পায় প্রতীক। প্রদীপ্ত বলছে, অহি ভাই আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও, অহি ভাই– অহি ভাই। ও প্রলাপের মধ্যে বাবাকে খুঁজে বেড়ালো, মধুদার ক্যান্টিনে চা খেলো এবং মধুদার জন্য বিলাপ করলো। প্রতীকের ভুরু কুঁচকে যায়। এবং কোঁচকানো ভুরু নিয়ে ও পুষ্পিতাকে বলে, মা আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। ইদানীং ভাইয়ার প্রায়ই জ্বর আসছে। একটা থরো চেকআপ দরকার।

মঞ্জুলিকা বাড়ি ফিরে দেখলো প্রদীপ্ত ঘুমিয়ে গেছে। পুষ্পিতা ওকে বললো, দীপু আজ অহিউল্লাহকে দেখেছে। প্রলাপের মধ্যে অহিউল্লাহর নাম বলছিলো বারবার। অহিউল্লাহ? মঞ্জুলিকা জানে কখনো কখনো অহিউল্লাহ প্রদীপ্তর মধ্যে ঢুকে যায়। ওর ভেতরে তখন বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে এবং বাজ পড়ে পুড়ে ন্যাড়া হয়ে যায় ওর বুকের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটা। আজ আবার কেন এই তালগাছটা পুড়লো? সামনে কি কঠিন সংকট? রাত জেগে বসে রইলো ও প্রদীপ্তর পাশে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর মনে হয় ও নিজেও প্রদীপ্তর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। প্রদীপ্তর ভাবনার সঙ্গে নিজেকে আর মেলাতে পারে না। যোদ্ধা দীপ এখন একা একা লড়ছে, নিজের ভাবনার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির লড়াই। মঞ্জুলিকা মমতায় ওর মাথায় হাত বুলোয়। ভাবে, যে দেশের জন্য তুমি লড়েছিলে সেটা পাওনি বলে তোমার কষ্ট আছে, কিন্তু আক্ষেপ নেই। তুমি অপেক্ষা করছো ভালোর, এমন নৈরাজ্যের মধ্য থেকে যে টুকরো টুকরো ভালোটুকু পাচ্ছো সেগুলো সঞ্চয় করে তাকিয়ে আছো সোনালি দিনের জন্য। আমি অসহিষ্ণু, ধৈর্য রাখতে পারছি না। তাই তোমার ভালোমানুষী ছবি আমাকে বিরূপ করে তোলে। আমি এ সময়ের সন্তান, তুমি ভবিষ্যতের। তাই আমাদের এই ব্যবধান।

BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন নিউমোনিয়ায় ভুগে ভালো হলো প্রদীপ্ত। কোটরগত চোখ, গালভাঙা বিবর্ণ চেহারা। ওই চেহারার দিকে তাকালে চমকে ওঠে প্রতীক, মনে হয় যেন রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে ফিরে আসা আলী আহমদ। চমকে ওঠে পুষ্পিতা, মনে হয় মিলিটারির হাতে নির্যাতিত আলী আহমদ, একদিন ভোরবেলা যেমন করে ফিরে এসেছিলো, তেমন করে যেন ফিরে এসেছে। আড়ালে চোখ মোছে পুষ্পিতা আর মঞ্জুলিকা প্রদীপ্তর দিকে তাকাতে পারে না। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিলো, এখন ও বুড়িয়ে যাওয়া আলী আহমদ হয়ে গেছে– ওর দিকে তাকালে কান্নাই পায়। বিয়ের মাত্র চার বছরের মধ্যে এতকিছু ঘটে গেলো– ও কি ভেবেছিলো এত দ্রুত এসব ঘটবে? ও কিছুতেই ছুঁতে পারবে না সময়ের বুড়ি?

যেদিন বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন– মাফ পেয়ে গেলো দালালরা, সেদিন চিৎকার করে কাঁদলো মঞ্জুলিকা। প্রতীক প্রদীপ্তর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে আগুন ছুটিয়ে বললো, এ দেশের জন্য বাবা দিয়েছেন জীবন, মা দিয়েছেন উনত্রিশ বছরের সংসার, তুমি দিয়েছো চোখ আর হাত, আমি দিয়েছি আমার ভালোবাসা, ভাবী দিয়েছে তার পুরো পরিবার। এরপরও দালালদের বিচার হবে না? ওরা ক্ষমা পাবে?

এটা বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক কৌশল। পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের তো আনতে হবে জিতু!

তবু তুমি ঐ লোকটিকে সাপোর্ট করবে। তুমি একটা নপুংসক হয়ে গেছো।

প্রতীক চেঁচামেচি করে বেরিয়ে যায়। রাতে ঘুমুবার সময় মঞ্জুলিকা বলে, তুমি শেখ মুজিবের কোনো দোষ দেখতে পাও না?

প্রদীপ্ত নির্বিকার কণ্ঠে বলে, পাই।

তাহলে স্বীকার করো না?

চেঁচিয়ে স্বীকার করলেই কি সমাধান হবে? কার কাছে বলবো? কে আছে? বিকল্প একজন মানুষ দেখাও? যে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বশালী, যাঁর প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর অপরিসীম। শুধু বিরোধিতার জন্য যারা সমালোচনা করছে আমি তাদের দলে নই মঞ্জুলি। আমি নিঃস্বার্থভাবে এ দেশকে ভালোবাসি।

তুমি মোজাফফর ন্যাপ আর সিপিবির মতো দালাল হয়েছো।

ওরাই বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে পারছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাটিকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে চাইছে। সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ ওরাই আনবে।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠে মঞ্জুলিকা, তোমাদের জন্য আর একটি দালাল আইন প্রণীত হবে দেখো। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেমন রূঢ় এবং কর্কশ কণ্ঠে বলে গেলো মঞ্জুলিকা। শেষে ও বললো, আমরা এ সময়কে জানতে চাই, এ সময়কে প্রতিরোধ করতে চাই– আর তুমি ভবিষ্যতের জন্য তোমার সময়কে তুলে রাখছো।

মঞ্জুলি তুমি না বলেছিলে তুমি আমাকে বুঝতে চাও? নাকি সেটা নেহাতই আমার অসুখের সময়ের করুণা?

না, করুণা নয়। আমি যা বলেছিলাম তাও মিথ্যে ছিলো না। কিন্তু তুমি এত বেশি আগামী দিনের মানুষ যে তোমাকে আমার বোঝা সম্ভব না।

তাহলে এভাবে কি একসঙ্গে থাকা যায়?

প্রদীপ্তর এই আকস্মিক আক্রমণে চমকে ওঠে মঞ্জুলিকা। বিমূঢ় কণ্ঠে বলে, আমি তো ঘর ভাঙার কথা ভাবিনি।

BanglaBook.org

হো-হো করে হেসে ওঠে প্রদীপ্ত। বলে, ইমোশন আহত হলে মানুষ বোধহয় অনেককিছু হারায়। আমিও ঘর ভাঙার কথা ভাবি না। আমাদের জীবনে অজেয় আছে, ইমোশনের একটা ভিন্ন ক্ষেত্র ও।

মঞ্জুলিকার চোখ জলে ভরে যায়। ওর মনে হয় একটি পুরো পরিবার হারানো মেয়েকে বুঝতে পারে না প্রদীপ্ত। যুদ্ধ ওদের দূরত্ব বাড়িয়েছে।

ক'দিন পর বেশ রাতে ঘরে ফেরে প্রতীক। অন্যরা রাতের খাবার খাচ্ছিলো। ও সোজা টেবিলে এসে চেয়ার টেনে বসে এং চাদরের নিচ থেকে অস্ত্রটা বের করে ঠক্ করে টেবিলের ওপর রাখে। নিজের প্লেটে ভাত নিতে নিতে বলে, একটা ব্যবসা করবো ভাবছি।

কেউ কোনো মন্তব্য করে না। পুষ্পিতা বলে, কোথা থেকে ঘুরে ফিরে এলি হাত মুখ ধুয়ে নে।

দরকার নেই। আমার তোমার মতো শুচিবাই নেই। ও ভাত খেতে শুরু করে। দু'লোকমা খেয়ে এক গ্লাস পানি খায়। কিসব ছাইপাশ রেঁধেছো, আর কিছু নেই?

পুষ্পিতা ঠাণ্ডা গলায় বলে, থাকলে তো টেবিলে দেখতে পেতি। তোকে বাদ দিয়ে নিশ্চয় আমরা খেয়ে ফেলিনি।

তুমি আর আগের মতো নেই মা। কেবল মেজাজ করো।

পুষ্পিতাকে কোনো জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে মঞ্জুলিকা বললো, এম.এ. পরীক্ষা দেবে না জিতু?

পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে পারবো না। পড়াশোনা তো কবেই ছেড়ে দিয়েছি।

প্রদীপ্ত ওর চোখে চোখ রেখে বলে, তোর অস্ত্রটা নিচে রাখ জিতু।

পায়ের কাছে? অসম্ভব। ও সেটা হাতে নিয়ে আবার ঠক্ করে টেবিলের ওপর রাখে। প্রত্যেকে বুঝলো যার হাতে অস্ত্র থাকে তার আচরণ অন্যরকম। কিছুক্ষণ খাওয়ার পর মঞ্জুলিকা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যবসা করবে?

সেটা এক্ষুনি বলছি না। আগে গুছিয়ে নিই, তারপর। চারদিকে হাওয়ায় টাকা উড়ছে ভাবী। আর আমি ধরতে পারবো না? আমি তো দেখতে পাই একটিন দুধের জন্য তোমাকে পাঁচ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

তোর ভাবী কি এ নিয়ে আক্ষেপ করেছে?

করেনি। করে না তোমার ভয়ে। পাছে তুমি আহত হও। নইলে কষ্টটা যে কি হয় তা কি আমি বুঝি না।

তাহলে তুই টাকা দিয়ে সংসারটা ভরিয়ে দিবি?

হ্যাঁ তাই, এভাবে জীবনকে টেনে-ঘঁষটে আমি চলতে পারবো না।

প্রতীকের খাওয়া শেষ। ও অস্ত্র-হাতে উঠে যায়। পুষ্পিতা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাকি দু'জনের মাথা প্লেটের ওপর। একসময় শেষ গ্রাসটা মুখে তুলে মঞ্জুলিকা বলে, যুদ্ধ আমাদের আলাদা করে ফেলেছে।

প্রদীপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভাবলো, এমন সরলীকরণ সিদ্ধান্ত দিয়ে কি সব সমস্যার সমাধান হয়? মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধগুলো তো নানা কারণেই টাল খায়। এর ব্যাখ্যা অজস্র, এর কোনো শেষ নেই।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ভাসানী তাঁর চৌদ্দদফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছেন। এই দাবিসমূহের অন্যতম

BanglaBook.org

ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ। কয়েক মাস আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় তিনি সরকারকে উৎখাত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জাসদও খুব তৎপর। তাদের সরকার-বিরোধী জনসভায় প্রচুর লোক সমাবেশ হয়। শোনা যায় সেনাবাহিনীর সদস্যরাও জাসদের জনসভাগুলোতে বক্তৃতা শুনতে আসে।

প্রতীক সবসময় বলে, আমাদের লক্ষ্য দেশে গণতান্ত্রিক জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলা। আর সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে পরিপূর্ণ করা সম্ভব। এই সংগ্রামে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিকশিত করে তোলা সম্ভব। জাসদ গণঅভ্যুত্থানকে ক্ষমতা দখলের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তোমার মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি মনে করছে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এ সমাজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে এগোচ্ছে। বোগাস? এটা কোনোদিনই হবে না ভাইয়া। আর এ দালালীর পুরস্কার হিসেবে এ পার্টি পাচ্ছে শেখ মুজিবের ঢালাও প্রশংসা। তিনি বলছেন, মোজাফ্ফর ন্যাপ ও সিপিবি ছাড়া দেশে কোনো দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল নেই।

প্রদীপ্ত সেদিন চেঁচিয়ে বলেছিলো, নেই তো। থাকলে নিজেদের হাতে অস্ত্র রেখে সন্ত্রাসের রাজনীতিতে নামতো না। জাসদের ভূমিকা আমার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এটা তোমার ধারণা, কিন্তু আমাদের সভাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওনা মানুষ কি চায়?

তোরা শহরের ভিড় দেখে একথা বলছিস, কিন্তু গ্রামবাংলার কথা ভুলে গেছিস। ভাবিস না তোদের পায়ের নিচে মাটি আছে, ওটা চোরাবালি।

প্রতীক সেদিন রাগ করে চলে গিয়েছিলো। ইদানীং ও ঠিকমতো বাড়িতেও থাকে না। নিজের খুশিমতো আসা-যাওয়া করে।

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। সবাই ধারণা করেছিলো নির্বাচিত সরকার দেশে স্থিতিশীলতা আনতে পারবে। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হলো না, সেটা ক্রমাগত নামতে লাগলো। কোথায়? কেউ কেউ তিক্তকণ্ঠে বলে, রসাতলে। দু'পক্ষই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ছদ্মবেশী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী, প্রকৃত অপরাধীর দল, মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারী বিভিন্ন অস্ত্রধারী বাহিনী এবং সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার একটি অংশ; অন্যদিকে অস্ত্রহাতে সজ্জিত লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং রক্ষীবাহিনী। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে কেউ বিচলিত নয়, কেউ কারো অবস্থান ছাড়তেও রাজি নয়। বছরের শেষের দিকে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল উত্থাপিত হলো এবং একটি নতুন ভাগ সংযোজন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রদীপ্তর মনে হলো ওর ভেতরে হিম জমাট হয়েছে, ও নড়তে পারছে না। সরকার কেন সংবিধান সংশোধন করলেন এটা বোঝা কষ্টকর নয়। বঙ্গবন্ধু তো স্বপ্ন দেখেছিলেন 'সোনার বাংলা'-র, যেখানে মানুষ ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না– নির্মল, সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পাবে– কেউ বিনা বিচারে কারাভোগ করবে না, মৌলিক অধিকার হরণ করা হবে না, কিন্তু তিনিই বাধ্য হলেন এমন একটি সংশোধনীর। বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচানোর তাগিদ কত প্রবল হয়ে উঠেছে। বারবার অহিউল্লাহর ছায়া প্রদীপ্তর সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। মনে হয় যেখানেই যায়, যে পথেই হাঁটে সেখানেই অহিউল্লাহ রাস্তাজুড়ে শুয়ে থাকে।

আরো কয়েকমাস পরে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' প্রণয়ন করা হয়। এতে বলা হয়,

BanglaBook.org

সরকার যদি মনে করে যে কাউকে বন্দী করে রাখলে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে, তাহলে সে ব্যক্তিকে সরকার আটকে রাখতে পারবে। এতকিছুর মধ্য দিয়ে দিনযাপন। প্রদীপ্ত নিজের দিকে তাকিয়ে বিপন্ন বোধ করে। আয়নায় এক হাতহীন, এক চোখহীন যোদ্ধা মানুষটি বেকুবের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় এই আমি কি সেই, যে বিপন্ন অস্তিত্বের পদধ্বনি অনুভব করছি? নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছি। আর কত আইন প্রয়োজন হবে এই দেশকে শান্ত করার জন্য? মুদ্রণ, সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ নামে নতুন আইন প্রণীত হয়েছে কিছু কিছু সংবাদপত্রের সরকার-বিরোধী ভূমিকা সামাল দেয়ার জন্য। বিরোধী দলের মুখপত্রগুলো বিরুদ্ধ স্রোত, গঠনমূল নয়। বঙ্গবন্ধুর ব্যর্থতাকে যদি তারা গঠনমূলক চিন্তায় মূল্যায়ন করতো, তাহলে হয়তো কিছুটা আশা করা যেত। কিন্তু দু'পক্ষই এমন ভয়ানকভাবে মুখোমুখি। প্রদীপ্তর মনে হয় ওর বাকি হাত এবং চোখ এখন নিষ্পেষণের অপেক্ষায় এবং অহিউল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয় তাহলে ওর হৃৎপিণ্ডটি খুবলে খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে অজস্র পোকা।

এর মধ্যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। মফস্বল থেকে অনবরত দুর্ভিক্ষের খবর আসে। পত্রিকা অফিসে যেদিন নাইট ডিউটি থাকে সেদিন রাতের অন্ধকারে ভুখা মানুষের মুখ ভেসে ওঠে ওর সামনে। ওর শৈশবে রাজশাহীতে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো। ওর আবছা মনে পড়ে– ফেনের জন্য মানুষের চিৎকার এত বছর পর ওর কানে পৌঁছলে মনে হয় অভাবের এই ধারাবাহিকতা কি ওদের জীবন থেকে ফুরোবে না? কতকাল এসব দেখতে হবে? গত বছর বন্যা হয়েছে, ভেসে গেছে মানুষের ঘরগেরস্থি। এ বছর দুর্ভিক্ষে মানুষের ঘরগেরস্থিতে শূন্য হাঁড়ি। রাজশাহীতে সে সময়ের দুর্ভিক্ষে দু'আনা সেরের লবণের দাম হয়েছিলো ষোল টাকা। নুনভাতের মানুষের জীবনে নুনও ছিলো না, ভাতও ছিলো না। প্রবল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা রংপুরে যাবার জন্য ও তাগাদা অনুভব করে। ওর সামনে সোনাখালি ভেসে ওঠে, রাজশাহী ভেসে ওঠে– হায়, কোনো ছবি থেকে রংপুর আলাদা নয়। শস্যের মওসুমে রংপুর যদি সোনাখালি হয়, অভাবে দুর্ভিক্ষের রাজশাহী। এমনই আমার স্বদেশ। একজন কেউ কি নেই যে এর ভেতরটা-বাইরটা এক করে ডগমগে স্বাস্থ্যবতী রূপবতী করে তুলবে?

দু'দিন পর প্রেসক্লাবে বসে জাল-পরা বাসন্তীর ছবি দেখলো পত্রিকায়। অন্যরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পত্রিকার ওপর। পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চারদিকে। কে যেন বললো, ঐ এক ছবিতে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত।

অন্যজন বললো, ওই ছবিটি সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত।

আরো অনেক কথা, অনেক গলাবাজির মাঝে প্রদীপ্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে প্রেসক্লাব থেকে। কোথায় যাবে? নসিবের কথা মনে হয়। ওর বাড়িতে গিয়ে দেখে তালা ঝুলছে। ওর বলদা গার্ডেনের কথা মনে হয়। কতকাল পদ্মপুকুরের সিঁড়িতে বসা হয়নি। ও রিকশা নিয়ে বলধা গার্ডেনে আসে। পুকুরের সিঁড়ির দেয়ালে হেলান দিলে ওর মনে হয় ঘুম পাচ্ছে। কতদিন পর ওর আজ ভালো লাগছে।

রাতে বাড়ি ফিরলে দেখতে পায় ড্রইংরুমে তুমুল আলোচনা। বিষয় জাল-পরা বাসন্তীর ছবি। ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে প্রতীক। বলে, দেখো তোমার বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ দেখো। কোথায় নামিয়েছে দেশকে?

টিভি দেখছিলো পুষ্পিতা। মাকে ছবিটা দেখিয়েছে প্রতীক। তখন পুষ্পিতা ছবি দেখে বলেছিলো, আহারে। কিন্তু প্রদীপ্তকে আক্রমণ করতে দেখে ও রেগে ওঠে, তুই ওকে এভাবে কথা বলছিস কেন জিতু?

BanglaBook.org

সত্যি কথা বলেছি মা।

কাকে তুই সত্যি কথা শোনাচ্ছিস? ও কি এসব বোঝে না? তুই কি ভেবেছিস যে ও তোর চেয়ে বোকা?

পুষ্পিতা রাগে চেঁচিয়ে ওঠে। প্রতীক অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্ত মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি রেগো না মা। এই সংসারে তুমি তো মুখ বুঁজেই দিন কাটিয়েছো। এখন আর কীসের জন্য রাগ?

পুষ্পিতা চোখে আঁচল চাপা দেয়। ও মা'র চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বলে, মা আমি কাল রংপুর যাচ্ছি। দুর্ভিক্ষের অবস্থা সরেজমিনে রিপোর্ট করার জন্য অফিস থেকে আমাকে পাঠাচ্ছে।

মঞ্জুলিকা এবং প্রতীক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনের বুক কেঁপে ওঠে। দু'জনেই আলাদা আলাদা করে ভাবে বড় সোফায় বসে থাকা ওই দু'জন মানুষ বুঝি ওদের কেউ না।

১২

আসমাদের গ্রামে এসেছে প্রদীপ্ত। ঘুরে ঘুরে দেখছে। পুরো এলাকাটা ওর দেখার ইচ্ছে। ও কাউকে কিছু বলে না। একা একা ঘোরে। ও শুধু বাস্তব চোখে নয়, মনের চোখে এবং মগজের চোখেও সব দেখতে পায়। আর ক'দিন পরই আশ্বিন ফুরোবে। সামনে মরা কার্তিক। তাই বাবার মুখ শুকনো। মা'র চোখে জল। বারান্দায় বাবা-মাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে আসমা জেনে যায় যে এখন থেকে ওদের টানাপোড়েনের দিন শুরু। এমনই তো হয়। সারাবছর যেমন তেমন। তারপর একদিন হঠাৎ করে দেখতে পাবে রাত না পোহাতেই বাবা-মা চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে। অর্থাৎ ওদের ভালো ঘুম হয়নি। দুশ্চিন্তায়-দুর্ভাবনায় দু'জনের রাত কেটেছে। আঁধার কাটার শুরুতে মোরগের বাক না পড়তেই ওরা দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে। ওদের অভ্যেস। ওরা বলে, কপাল ওদের টানে।

আসমা ওদের বড় মেয়ে। ওর পরে আরো আটজন ছেলেমেয়ে আছে। আসমার বয়স বাইশ। বিয়ে হয়েছিলো আঠারোতে। বাবা যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেনি বলে আবার ফিরে এসেছে বাবা-মার সংসারে। এ নিয়ে মায়ের দুঃখ আছে, বাপের আক্ষেপ। ও এসব গায়ে মাখে না। দুঃখে কাতরাতে হলে ওর হাসি পায়, কান্না নয়। ও জীবনটাকে অন্যভাবে দেখতে চায়। ও গান গায়, কোমর দুলিয়ে নাচে– হা-হা হাসিতে আসর মাতিয়ে তোলে। এমন প্রাণ-মাতানো হাসি এ গাঁয়ে আর কেউ হাসতে পারে না। অন্যরা অবাক হয়ে সে হাসি শোনে– যেন তিস্তা নদী ভাঙছে, দুম করে পড়ে যাচ্ছে পাড় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকলিয়ে উঠছে স্রোত। কেঁপে-ভেঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে যায় হাসি। কোথায়? আসমার মগজের প্রান্তে– যেখানে স্বপ্ন এবং বেদনার এক অদ্ভুত রঙিন মোহনা আছে। ও যখন সুর করে 'বিষাদসিন্ধু' পড়ে তখন সে মোহনা এসে মেশে ওর কণ্ঠে। ওর চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা মানুষগুলো দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে– ওর দাঁত এবং ঠোঁটের ফাঁক থেকে উচ্চারিত শব্দগুলো ওদের বুক স্পর্শ করে। ওরা কেঁদে বুক

BanglaBook.org

ভাসায়। বেশ রাতে হারিকেনের আলো নিভু নিভু হয়। চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে যায়। নারী-পুরুষের ঘুম পায়। থেমে যায় আসমার কণ্ঠ– সে কণ্ঠের বিপরীতে ডেকে ওঠে শেয়াল। সে ডাকে নড়ে ওঠে ছায়াহীন মানুষগুলো। ওরা চলে যায় যে যার ঘরে। থমথমে হয়ে থাকে রাত– থমথমে হয়ে থাকে রমণীর বুক। শুনতে পায় মা ওকে ডাকছে, আসমা ঘুমুবি না? ওর হাসি পায়। কেন আসমা ঘুমুবে না? ওর তো ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তারপর ওর মার স্বগত কণ্ঠ ভেসে আসে, আল্লাহ্ কী যে আছে মেয়েটার কপালে!

কপালে কি থাকবে? কপালে আছে বিষ– জ্বলেপুড়ে মরার বিষ। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে আসমা। সে শব্দে ঝটপটিয়ে উড়ে যায় হুতোম পেঁচা। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে গনু মিয়ার হাত। বোঝে না কেন ঐ হাসি ওকে একটি আত্মহত্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। ও দ্রুত কাঁথার ভেতর ঢোকে। দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসার আগে ওর মনে হয় মেয়েটির বিয়ে ভেঙে গেলেও ও অমন করে হেসেছিলো। ও বোধহয় হাসতে হাসতেই কাঁদে।

এই কাক-ভোরে বারান্দায় বাবা-মা'কে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় আসমা। দু'জনেই ওকে দেখে। কেউ কোনো কথা বলে না। দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিঃশব্দে উঠোনে নেমে যায়। রোজ এ সময় ওর ঘুম ভাঙে– তলপেট ভারি হয়ে ওঠে, ভীষণ পেশাব পায়– বিছানা না ছেড়ে উপায় নেই। বিরক্তি নিয়ে ওকে উঠতেই হয়। কেননা ঐ কাজটির জন্য ওকে পুকুরের পাড় পর্যন্ত যেতে হয়। মরা কলপাতা ঘেরা দু'টো ইট বিছানো জায়গা আছে। আব্রু তেমন হয় না, তবু আব্রুর চেষ্টা। তবে রক্ষা, এদিকে লোক চলাচল নেই, প্রতিদিনই ও দু'পায়ের পাতা ইটের ওপর তুলে দিয়ে ভাবে, কাজটি একদম বিরক্তিকর। কিন্তু আজ সকালে সেই বিরক্তির কথা ওর মনে থাকে না। ও মরা কার্তিক মাথায় নিয়ে পেশাব করতে বসে।

মরা কার্তিক মানে ভীষণ আকাল– নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এসে কামড়ে ধরে। মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পায় অভাব তিস্তার স্রোতের মতো ওদের পেটের পাড় ভাঙছে– কখনো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মা বলে, কার্তিকের আকাল তো সেই জন্মের পর থেকে দেখে আসছি। আল্লারে এর কী শেষ নাই!

বাবা বলে, এজন্যই তো আমাদের গাঁও-গেরামকে লোকে ঘাটতি এলাকা বলে।

আসমা প্রশ্ন করে, বাবা কবে থেকে এর শুরু?

জানি না।

দীর্ঘশ্বাস বুক ফুঁড়ে চলে যায় আকাশে। দীর্ঘশ্বাস বুক ফুঁড়ে চলে যায় পাতালে। আকাশ-পাতাল জুড়ে মানুষের যদি জীবন থাকে, যদি তাদের জীবনে আকাল থাকে তবে দীর্ঘশ্বাস জমতে জমতে এক অদৃশ্য পাহাড় হয়েছে। এখন আসমা সে পাহাড় ছুঁয়ে দেখছে। কিন্তু এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি?

অভাবের কথা মনে করে আসমা সেই ইটের ওপর থেকে যেন উঠতে পারে না। শুনতে পায় চারদিকে নেই নেই শব্দ– কানের তালা ফাটে না, কিন্তু কেমন করে যেন তীরের ফলার মতো বুকে বেঁধে, নিঃশব্দে অথচ প্রচণ্ড তীব্রতায়। ও দেখতে পায় রিলিফের জন্য মানুষের মিছিল। ওর বাবা হেঁটে যাচ্ছে– হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে এবং হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলে পড়ে যায় পথের ধারে। চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে– কেউ ওর বাবার দিকে তাকায় না। সবাই চলে যায়। পিঁপড়ের সারি উঠে আসে বাবার শরীরে। আস্তে আস্তে বাবা একটা মাটির ঢিপি হয়ে যায়। তখন বারান্দা থেকে মা ডাকে, আসমা? শুনতে পায় না। ওর মগজ মাটির ঢিপি হয়ে যাচ্ছে এবং ওর সামনে কারবালার প্রান্তর।

BanglaBook.org

এবার বাবার গলা, আসমা? আসমা? মা, মাগো? ওরা কেন ডাকছে? ওর দেরি হচ্ছে দেখে কি ভাবনায় পড়েছে? ওরা কেন ডাকছে? কি ভাবছে? ভাবছে ওর ভীষণ একটা কিছু ঘটে গেছে? ভীষণ কিছু ঘটলে বিপদ হবে ওর? বিপদ আর কী? ও সব সইতে পারে। ওর তো কোনো দুঃখ নেই।

দুঃখ নেই ভেবে ও উঠে দাঁড়ায়। বদনার পানি দিয়ে পায়ের পাতাজোড়া ধুয়ে ফেলে। বেশ সুন্দর চক্‌চকে দেখাচ্ছে ওর পা– কী সুন্দর ওর গায়ের রঙ। মা মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বলে, কেমন করে ও এমন হলো? হায় আল্লাহ্ কি হবে আমার!

এই অভাবের সংসারে এমন বাড়-বাড়ন্ত শরীর হলে তো ভাবনারই কথা। তখন ওর ভীষণ হাসি পায়। হাসতে গিয়ে মুখ চেপে ধরে। হাসির দমকে ওর শরীর কাঁপে। সেই হাসির জের ধরে কাঁপুনি শরীর নিয়ে ও বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ায়। সোজাসুজি বাবার চোখে চোখ রেখে বলে, বাবা এবার আর খিচুড়ি আনার জন্য তোমাকে গঙ্গাচড়া সদরে যেতে হবে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ওর বাবা দেলোয়ার, কেন? কেন যাবো না?

গেলোবার তুমি মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে গিয়েছিলে। মনে আছে?

আছে।

কেউ তোমার দিকে তাকায়নি। তোমার হুঁশ ছিলো না। সাঁঝের সময় হুঁশ ফিরলে তুমি একা একা–

থাক মা আর বলিস না।

ওর মা অজরা খাতুন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ও ড্যাবড্যাবে চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, ছোটখাটো এই মানুষটি কেমন করে দশটি ছেলেপোলের জনম দিলো?

অজরা খাতুন আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলে, এইবার যেন তোর বাপের শরীরটা ভালো থাকে সেজন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর মা।

দোয়া? দোয়া করলে শরীল ভালো থাকে? নাকি খেতে পেলে ভালো থাকে?

ও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বাবা-মা দু'জনে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয় সে মুখ দু'টো অবিকল গাধার মুখ। এমন গাধা ও জীবনেও দেখেনি। ওর ইচ্ছে করে একটা লোহার শলাকা দিয়ে ঐ চোখগুলো ফুটো করে দিতে। ওরা যেন কোনোদিন আর কিছু দেখতে না পায়। যেন খুঁজে না পায় কোনো শ্যামল-কোমল অঙ্গ। কারণ ওরা কেবল অঙ্গই চালাতে জানে, জানে না তার বর্তমান, জানে না ভবিষ্যৎ। ওরা নির্বোধ নয় তো, নির্বোধ কে?

একসময় দেলোয়ার মিনমিনে গলায় বলে, তবু আমাকে রিলিফের জন্য যেতে হবে। নইলে ছেলপোলগুলা খাবে কি?

আমি যাবো। আমি তোমাদের জন্য খিচুড়ি আনবো।

তুই পারবি না মা। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়।

আমি সারাদিন ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারি, মাটি কাটতে পারি, মাটিভরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হাঁটতে পারি, আর তিন কোশ পথ হেঁটে গঙ্গাচড়া সদরে যেতে পারবো না?

দেলোয়ারের মাথা নিচু হয়ে যায়। ঘাড় ঝুলে থাকে মাটির দিকে। অজরা খাতুন আবার কেঁদে ফেলে বলে, হায় আল্লাহ্ কতগুলো যে খাবার মুখ!

আসমা রেগে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, তখন তোমাদের মন ছিলো না? সেই তখন–।

BanglaBook.org

কখন? বোকার মতো প্রশ্ন করে অজরা খাতুন। দেলোয়ার উঠোনে নেমে হেঁটে চলে যায়। ভোরের চমৎকার বাতাস খেলে যায় উঠোনের ওপর দিয়ে, সে বাতাস দেলোয়ারের ফুসফুসে ঢোকে না। কারণ আসমার মুখ থেকে উচ্চারিত তখন শব্দটি ওর হৃৎপিণ্ডের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ও বুঝতে পারে আর কিছুদূর হেঁটে গেলে ও ধপ্ করে পড়ে যাবে। আর হাজার হাজার মাছি উড়ে আসবে ওর শরীরের ওপর। উঠোনের মাঝখানে ও টাল খায়। তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চলে আসে পুকুর পাড়ে। মরা কলাপাতার আব্রুর ভেতরে ঢুকে দাঁড়ায়। ও প্রাণভরে পেশাব করে।

অজরা খাতুনের কখন প্রশ্নের উত্তর আর দিতে পারে না আসমা। বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বিড়বিড়িয়ে বলে, সেই তখন– সেই তখন– সেই তখন। বলতে বলতে ও রান্নাঘরে যায়। রাতের এঁটো বাসন-কোসন গোছাতে থাকে। শুনতে পায় ভাইবোনগুলো উঠেছে। ওরা মা'কে ঘিরে ধরেছে। প্রত্যেকেরই কত রকমের দাবি আছে মায়ের কাছে। মায়ের জন্য ওর খুব মায়া হয়। মা'র সময় তো এমন বড়ি ছিলো না যে খেলেই ছৈলপোল হওয়া বন্ধ! থাকলে কি আর মা এমন বছর বছর বিয়োয়ে এমন হাড্ডিসার হয়ে যায়? আহারে এখন মরা কার্তিকের ভয়ে মা'র রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। রাত না পোহাতে বারান্দায় এসে বসে থাকে। এতগুলো মুখের চিন্তায় কেমন বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকতে হয়।

আসমা হাত চালিয়ে কাজ শেষ করতে চায়। ওকে মাটি কাটার কাজে যেতে হবে। কাজ না করলে এতগুলো মুখ ভরে না। বাপের কষ্ট হয়। বাপের কষ্ট? হাসি পায় আসমার। নিজে নিজেই কতক্ষণ হেসে নেয়। বেশি হাসলে ওর চোখে পানি আসে। দু'হাতে সে পানি মুছে ও ভাবে কার্তিক মরা কেন? নিজে মরে তো ও অন্যদেরও মারে। তাহলে মানুষ মরা নয় কেন? কেন বলা যাবে না মরা দেলোয়ার? মরা অজরা খাতুন? মরা আসমা? ওহ্ কী মজা! এই আকালের সময় সবার নামের সঙ্গে ও মরা জুড়ে দেবে। প্রথমে ইউসুফকে বলতো মরা ইউসুফ। কারণ ইউসুফ ওকে মরমে মারে। কিন্তু সেকথা ইউসুফকে বলা যায় না। কোনোদিন বুঝি বলা হবে না। আসমার দীর্ঘশ্বাস গোপনে বয়, হাসির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই।

প্রতিদিন ঠিক সময়েই কাজে যায় ও। ইউসুফ কখনো বলতে পারেনি যে, আজ তুই দেরি করেছিস কেন আসমি? দেরি কেন করবে ও? দেরি করা ওর ধাতে সয় না। ও মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকেই বলে, আমি আসমি না, আসমা। আমাকে তুমি আসমি বলো কেন? কিন্তু বলা হয় না। সাহেবের মুখের ওপর কি কথা চলে? দূর থেকে ইউসুফকে দেখতে পায় ও। রাস্তার ঢালে দাঁড়িয়ে আছে। ওর লাল রঙের মোটর সাইকেলটা নিচে, রোদ পড়ে চক্‌চক্ করছে। গমের বিনিময়ে রাস্তা বানাচ্ছে সরকার। ইউসুফ এ কাজের তদারকি করে। লোকে বলে, ইউসুফ ওদের ফাঁকি দিয়ে গম বেচে দেয়। নইলে ওরা আরো গম পেতো। কিন্তু ইউসুফের সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই। সত্যি কি ইউসুফ গম বিক্রি করে? তাহলে তো ও একটা চোর? আসমার বুকের ভেতর কট্ করে ওঠে। ইউসুফকে চোর ভাবতে ওর ভালোলাগে না। ইউসুফ ওর কাছের মানুষ নয়, তবু ইউসুফকে খানিকটা আলাদা করে দেখতে কেন যে ওর ভালোলাগে! বড় বিশ্রী ভাবনা। নিজেকে নষ্ট মেয়েমানুষ মনে হয়। নষ্ট কি? নষ্ট কেমন? স্বপ্ন দেখলেই কি মানুষ নষ্ট হয়? না, আমি নষ্ট নই। মাথা ঝাঁকিয়ে ও নিজেকেই উত্তর দেয়।

পেছন থেকে আছিয়া ওকে ডাকে, কি রে কার সঙ্গে কথা বলছিস একা একা?

আসমা হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলে, কথা না, গান। তারপর কোমর দুলিয়ে একটা পাক খেয়ে বলে, সুন্দরী কমলাহা নাচে।

BanglaBook.org

খিলখিলিয়ে হাসে আছিয়া।

পেছন থেকে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এত হাসি কেন?

ঘুরে দাঁড়ায় আছিয়া, কেন, হাসলে কি হয়?

রতন মিয়া দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, মাইয়াগুলার যত নষ্টামি।

কি বললেন?

আসমা দু'পা এগিয়ে যায়। পিছু হটে রতন মিয়া। সেও একজন দিনমজুর। ওদের সঙ্গেই কাজ করে। পেছন থেকে আরো অনেকে আসছে। মিছিলের মতো হয়ে গেছে। আসমার আক্রমণের মুখে রতন মিয়া ঢোক গিলে বলে, মেয়েমানুষের এত হাসি ভালো না।

কেন, হাসি শুনলে মাথা ঘোরায়? মাথা ঘোরালে শুনবেন না হাসি।

আসমা আঙুল নেড়ে কথা বলে। তারপর একটা গানের কলি গায়, ও আমার রসের নাগর–। হেঁ-হেঁ করে ওঠে আশেপাশের সবাই। রতন মিয়া চুপসে যায়। বিব্রতমুখে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আসমা পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে, শুনেন রতন মিয়া আমরা মাইয়া মানুষও না, পুরুষ মানুষও না, আমরা দিনমজুর, অহন মাটি কাটার দল। সারাদিন কাম করলে গম পাই।

ঠিক কথা, ঠিক কথা।

অন্যরা চেঁচিয়ে ওঠে। আমরা মাটিকাটার দল স্লোগান দিতে দিতে নতুন তৈরি রাস্তার কাছে পৌঁছে যায় ওরা। ইউসুফ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমাদের?

আসমা গানের সুরে বলে, ঘর ভেঙেছে আমাদের।

হা-হা হাসিতে একে অন্যের গায়ে গুঁতো দেয়। ইউসুফ আগুন-চোখে তাকায়, অ্যাই আসমি?

জ্বী সাব।

এত বাড় বেড়েছে কেন? কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবো কিন্তু। যাও, সবাই কাজে যাও।

কাজ শুরু হয়। হেঁইও, হেঁইও, মাটি কাটি হেঁইও– রাস্তা গড়ি হেঁইও, গম ভাজা হেঁইও– গম চুরি হেঁইও– গম চুরি হেঁইও– গম চুরি হেঁইও। বলতে বলতে হি-হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে আসমা। মাথার ওপর মাটির ঝুড়ি– রোদে তেতে উঠেছে মুখ। সকাল থেকে শুরু হয় কাজ– দুপুরে খানিকক্ষণের ছুটি– তারপর আবার কাজ– কাজ করতে করতে বেলা গড়িয়ে যায়। তারপর ঘরে ফিরে 'বিষাদসিন্ধু' পড়ে বুক ভাসিয়ে দেয়া। আসমা কাজের ফাঁকে দেখে ইউসুফ নেই। বুঝতে পারে না যে গম চুরি আজ ওর মাথায় ভর করেছে। ইউসুফ শুনলে হয়তো ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়েই দেবে। কিন্তু গম চুরি? আসলে মরা কার্তিক মাথায় ঢুকেছে বলেই গম চুরির বিষয়টি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে। গম চুরি না হলে তো মরা কার্তিক ওদের এমন করে ভাবিয়ে তুলতো না। আকাল, আকাল– বানের পানির মতো ভেসে আসতো না আকাল।

মাটিকাটার দলের ওপর ফিচার করবে বলে প্রদীপ্ত দাঁড়িয়ে যায়। ও বিস্ময়ে আসমাকে দেখে। মনে হয় এই প্রবল দুর্ভিক্ষের মধ্যেও মেয়েটি কেমন সজীব, প্রাণবন্ত। ওর সাক্ষাৎকার নিতে চায় ও। তাই দাঁড়িয়ে থাকে।

রাস্তার ওপর একঝুড়ি মাটি ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আসমা টের পায় মোটর সাইকেল ছুটিয়ে আসছে ইউসুফ। মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্ শব্দ চারদিক ঠিক কাঁপিয়ে দেয় না, কিন্তু একটি মানুষের কথা বলে দেয়, শুধু একজনই, আর কেউ নয়। ইউসুফ এসে টিফিনের ছুটি দেয়। আসমা বুক ভরে শ্বাস নিয়ে রাস্তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে। খানিকক্ষণ

BanglaBook.org

জিরিয়ে নেয়। অন্য মেয়েরা গিয়ে পাশের ডোবায় নেমেছে। ওরা কলকলিয়ে কথা বলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে ঘাড়-গলার ঘাম মুছতে মুছতে উঠে পড়ে আসমা। দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয়। জল ওর শরীর জড়িয়ে ধরে। ও মনের সুখে ডোবে আর ওঠে– ওঠে আর ডোবে। অন্য মেয়েরা চলে গেলেও উঠতে পারে না ও। কেবলই মনে হয় আর একটু থাকি। একসময় খেয়াল করে জারুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইউসুফ ওকে দেখছে। ওর ভালোই লাগে। ও জলের সঙ্গে খেলে– ইউসুফ ওকে দেখে। ও জলের সঙ্গে মিশে গেলে ইউসুফের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। ও গুনগুনিয়ে গায়– হাসে– হাসতে হাসতে ভাবে জীবনের সুখ ফুরোয় না। নিতে জানতে হয়। কিন্তু ইউসুফের দেখা ফুরোলে ও চলে যায়। ওর কোনো দ্বিতীয় শাড়ি নেই। ও পাড়ে উঠে রোদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টপ্‌টপ্‌ করে পানি পড়ে শরীর বেয়ে। চুল ঝাড়লে ছিটিয়ে যায় জলের ফোঁটা। সবটাই আনন্দ। শরীর রোদে তেতে উঠলে ভিজে কাপড় গায়ে কুটকুট করে, যেন কোনো ছুঁচালো মুখ শরীরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে– কাতুকুতু দিচ্ছে– তিস্তার সুখের টানে ভেসে যাচ্ছে আসমা। মরা কার্তিক ওকে ছুঁতেও পারে না। ওর শরীরের ওপর রোদ-জলের মাখামাখি– বুকের ভেতর ওম-হিমের অনুভূতি– ও ফিরে আসে গাছের নিচে। পোটলা খুলে রুটি-গুড় খায়। দেখতে পায় তখনো ইউসুফের চোখ ওর ওপর। মা'র কণ্ঠ ভেসে আসে, এই অভাবের সংসারে মেয়েটার কেন যে এত বাড়বাড়ন্ত শরীর! খেতে ওর ভালো লাগে, মনে হয় আরো খাই, কিন্তু খাবার এত কম, মন ভরে না। অন্যদের খাওয়া শেষ হয়েছে, যে যার মতো কাজে যাচ্ছে। হেঁইও-হেঁইও-মাটি কাটি হেঁইও– রুটি খাই হেঁইও– গম-রুটি হেঁইও– বেশি বেশি গম চাই হেঁইও– পেটে খিদে হেঁইও– হেঁইও– হেঁইও। আসমা শেষ রুটির টুকরো দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়ায়। আছিয়া ওর জন্য এক গ্লাস পানি রেখে গেছে। ও গ্লাসটি হাতে নিয়েছে মাত্র, তখন ইউসুফ কাছে এসে দাঁড়ায়। আঙুল উঁচিয়ে বলে, এখনো খাওয়া শেষ হলো না?

আসমা কোনো জবাব না দিয়ে ঢকঢকিয়ে পানি খায়। তারপর ঝুড়ি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে ইউসুফ বলে, কথার জবাব দিলি না?

দিয়েছি তো।

দিয়েছিস? মিথ্যুক।

কথা বলে দেইনি। কিন্তু এই যে উঠে দাঁড়ালাম এটাই তো জবাব। বেঁকে ওঠে আসমার শরীর এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

অ। রাগে লাল হয়ে যায় ইউসুফের মুখ। আসমা দাঁড়ায় না। যেতে যেতে ও গান গায়। ওর কণ্ঠ মাটিকাটার দল শুনতে পায়। ওরা ফিরে তাকায়। আসমার পেটে খিদে নেই। ও দ্রুত হাতে কাজ করে।

বেলা পড়লে এক পোটলা গম নিয়ে ঘরে ফেরে ও। মা উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। ঘরে যেটুকু আটা ছিলো তা দিয়ে রাতের জন্য রুটি বানানো হয়েছে। দু'চারদিনের গম জমেছে, সেগুলো ভাঙাতে হবে। ও দেখলো বাবা বাড়িতে নেই। দেলোয়ার ক্ষেতমজুর। বর্গাচাষীরা বলে, দেলোয়ারের হাতে ফসল ভালো ফলে। কিন্তু এখন গাঁয়ে কোনো কাজ নেই। দেলোয়ার তার ফসল-ফলানোর হাত নিয়ে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। যে ফসল ফলাতে পারে তার হাত বুঝি অন্য কাজে লাগতে চায় না। ফসল মানে জীবন– শস্য সবুজ জমিন– দেলোয়ারের চোখ থেকে শস্যের স্বপ্ন ফুরোয় না। তাই বড় কারিগর হয়েও কাজহীন এবং পরিশেষে শস্যহীন। বাবার জন্য এমন একটা বড় ভাবনা আছে আসমার। কিন্তু ফসল-ফলানো দেলোয়ারের সামনে এখন মরা কার্তিক। আসমা আতঙ্কে চোখ

BanglaBook.org

বোজে। চিৎকার করে মাকে ডাকে, মা, মা?

কি হয়েছে?

বাবা কই?

জানি না।

কেন জানো না? জানতে পারো না?

মেয়ের চেঁচামেচিতে অবাক হয় অজরা খাতুন।

আমাকে তো বলে যায়নি। তারপর কাছে গিয়ে বলে, ভাবনা কি মা, দেখিস একটু পরই চলে আসবে।

আসমা বারান্দায় বসে থাকে। ভাইবোনগুলো উঠোনে ছুটোছুটি করছে। রহিমা ওর কাছে এসে বসে। ওর বয়স উনিশ, দেখায় আরো কম। এখনো বিয়ে হয়নি। বাবা বিয়ের চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বলে, ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

মা ভাবে, কেউ না কেউ একদিন ঠিকই আসবে রহিমাকে বিয়ে করতে। এখনো কেউ আসেনি। আসমার মনে হয় ও খুব একা থাকে।

কি রে কিছু বলবি?

ভাবছি, আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করবো।

পারবি না।

কেন পারবো না?

তোর শরীরে সইবে না।

আছিয়া পারলে আমিও পারবো।

আসমা ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়। কেন ও নিষেধ করছে রহিমাকে? ও কি ভেবেছে এই সংসারের দায়িত্ব ওর একার? আর কেউ এ বোঝা বইতে পারবে না?

কিছু বলছো না যে?

ঠিক আছে নিয়ে যাবো। দেখি ওরা কি বলে।

কালই তো?

হ্যাঁ, কালই।

রহিমা খুশি হয়ে একদৌড়ে উঠোনের বাইরে চলে যায়। হয়তো ও বাড়ির বাইরের উঁচু কাঠবাদাম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে, একটা কিছু তো শুরু হলো– খানিকটুকু তো এগুনো গেলো। তারপর আরো কিছুদূর যাওয়া যাবে। কতদূর? ও নিজেও জানে না। জানবে কি করে আসমা। ও তো দু'টো চুরি খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে। ইউসুফ চুরি করছে, ফলে ঠকছে ওরা সবাই, মাটিকাটার দলের লোকেরা। আর ছেলেরা একজোট হয়ে ঠকাচ্ছে মেয়েদের– কাজ সমান হলে কি হবে মজুরি ওদের কম। সমান সমান মজুরি ছেলেরা মানতে পারছে না। বলে, আমরা বেশি নেবো। রতন মিয়া চেঁচামেচি করে সবচেয়ে বেশি। ওর একটাই যুক্তি, মেয়েমানুষ কি পুরুষ মানুষের সমান হয়? পুরুষ মানুষ তো বেশি পাবেই।

আসমা চেঁচিয়ে বলে, আমরা তো সমান কাজ করি।

ইউসুফ ওদের পক্ষেই কথা বলে। ইউসুফ জানে পুরুষগুলোকে হাতে রাখা দরকার। আসমা ইউসুফকে এসব কথা বললে ওর একটাই কথা, বেশি বাড়াবাড়ি করলে বাদ দিয়ে দেবো। ও দু'চোখে রাগ প্রকাশ করে। কিন্তু আর কিছু করতে পারে না। মেনে নিতে হয়। ভাবতে ভাবতে হা-হা করে হেসে ওঠে আসমা। রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে অজরা খাতুন।

BanglaBook.org

কি হয়েছে মা?

কিছু না। এমনি।

বাতাস লাগা খারাপ। জ্বিনে ভর করে।

আবারো হেসে ওঠে আসমা। অজরা খাতুন নরম স্বরে বলে, এমন করে হাসে না মা। আল্লার নাম কর। দোয়াদরুদ পড়।

তোমার আল্লা কি আমার মজুরি আর রতন মিয়াদের মজুরি এক করে দিতে পারবে?

ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলতে নেই।

কেন বলবো না? আল্লা কেন অন্যায় সহ্য করে? কেন ওদের মাথায় বাজ পড়ে না?

ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলে না মা। অজরা খাতুন খুব বিনীত ভঙ্গিতে মেয়ের হাত চেপে ধরে। আসমার রাগ হয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না, বলতে পারে না– কিন্তু মাঝে মাঝে এই মেয়েমানুষটাকে ওর অসহ্য লাগে। নিরীহ, গোবেচারা, ভ্যাদভেতে। কখনো মনে হয় আকারহীন একদলা মাংস– হাড় নেই, মজ্জা নেই, প্রাণ নেই। ও কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে ঘরে যায়। বাতি জ্বালে। একটুপর আঁধার নামবে– ঘন এবং কালো আঁধার।

তখন দেলোয়ার ফিরে আসে। সারাদিন কিছুই রোজগার হয়নি। বাজারে ঘুরেটুরে কিছু শাকসবজি জোগাড় করতে পেরেছে মাত্র। রান্নাঘরের দরজায় বসে ঝোলাটা উপুড় করে ঢেলে দেয়। অজরা খাতুন সবজিগুলো বড় একটা টুকরিতে উঠিয়ে রাখে।

আর কিছু নাই?

না।

আর কয়দিন যে খেতে পারবো আমরা!

দেলোয়ার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কয়দিন?

দিন সাতেকের চাল আছে। তারপর?

তারপরই লঙ্গরখানা।

দেলোয়ার রান্নাঘরের দরজা থেকে উঠে আসে। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু অজরা খাতুনকে খিদের কথা বলতে ওর লজ্জা করে। ও বারান্দায় এসে বসে। ছেলেমেয়েগুলো উঠোনে ছুটোছুটি করছে। ওর দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। ওদের খেয়াল নেই। রাত হলে ভাত চাইবে এবং ঘুমিয়ে পড়বে। ওর রাগ হয় মহিমা এবং হানিফের ওপর। ওরা তো বড়। ওরা তো ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে পারে, বাবা তোমার কি লাগবে? তোমার কি খিদে পেয়েছে বাবা? সারাদিন বুঝি খাওনি?

কিন্তু ওর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। রহিমা ও হানিফ দু'জনেই ছোটদের সঙ্গে জুটে এক অনাবিল শৈশবের আনন্দ উপভোগ করছে। ঐ জগৎ থেকে ওরা বেরিয়ে আসতে চায় না। দেলোয়ার ভাবে, থাক ওরা ওদের মতো। ও চারদিকে তাকিয়ে আসমাকে খোঁজে, কিন্তু কোথাও আসমাকে দেখা যাচ্ছে না। ও কি কাজ থেকে ফেরেনি? নাকি ফিরে ঘুমিয়েছে? আহা বেচারী, সংসারের জন্য খুব খাটনি করে। ও না হলে এ সংসার তো চলতোই না। কে কোথায় যে ভেসে যেত! দেলোয়ার ঘরের খুঁটির সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বোজে। তাহলে কি দেলোয়ারের সংসারের হাল ধরার জন্য আসমাকে প্রয়োজন? ওর নিজের কি সংসার হবে না– প্রচণ্ড এক চিৎকার উঠে আসে ওর নাভিমূল থেকে। না, কিছুতেই দেলোয়ারের সংসারের জন্য আসমা নয়। আসমার নিজের সংসার হবে– ও বৌ হবে, মা হবে– আবার নতুন করে শুরু, আবার।

তখন উঠোনে ছেলেমেয়েদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ওরা পুকুরের দিকে চলে যাচ্ছে–

BanglaBook.org

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে উঠবে। এবং তখন আসমা দরজায় এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দেয়া ওর জনক, যার কোনো একরৈখিক মাথা উঁচু-করা আকার নেই, যে ভাঙাচোরা, মৃতবৎ, দেখতে পায় রান্নাঘরের দরজায় ফেনের গামলা হাতে ওর জননী, থৈতলানো, প্রাণহীন, নিজেকে টেনে রাখার যার কোনো শক্তি নেই, যার শরীরটা অন্যের ঘাড়ের ওপর; দেখতে পায় একদল সহোদর-সহোদরা চলে যাচ্ছে পুকুরের দিকে– যাচ্ছে জলের কাছে– ফিরবে ক্ষুধার্ত হয়ে, ওরা নিরাকার– কবে কখন ওরা পরিপূর্ণ আকার পাবে তা ওরা জানে না– ওদের পুরো ভবিষ্যতের ওপর মরা কার্তিক, যে কার্তিকের শুরু নেই, শেষ নেই– যা বিশাল, এ মাথা ও মাথা দেখা যায় না, সেটাকে ঠেলে সরানো যায় না। এবং সেই বিশাল আকারহীন সময়টিকে সেই মুহূর্তে ও দেখতে পায় ওদের উঠোন জুড়ে বিছিয়ে আছে। চারদিকে মরা কার্তিকের অন্ধকার। ভয়ে, আতঙ্কে ও চিৎকার করে ওঠে, বাবা, বাবা গো?

কি, কি হয়েছে? দেলোয়ার এক লাফে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। কি হয়েছে মা? কথা বলছিস না যে?

আসমা বিড়বিড়িয়ে বলে, কে তুমি? তুমি কি আমার জনক? কেমন জনক তুমি? জন্ম দিতে পারো কিন্তু রক্ষা করতে পারো না? কেন তুমি পারো না আমাকে বাঁচাতে?

কি রে কিছু হয়েছে? কথা বলছিস না যে?

আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয়? কীসের ভয়?

ওর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর মা এবং ভাইবোনেরা। কেউ কেউ ওর হাত ধরেছে। ঝাঁকুনি দিচ্ছে, কি হয়েছে বুবু?

কীসের ভয় বুবু? ভূতের?

হি-হি করে হাসে ছোটরা।

আমরা ভূতকে ভয় পাই না।

ভূত তোমার কাছে এলে আমরা ওটাকে জবাই করবো। তুমি শুধু আমাদের ডাক দিও।

চারদিকে ছোটদের কলকণ্ঠ। তাহলে কি ওর চারদিকে অনেক মানুষ– যারা ওকে সাহস জোগাবে– শক্তি জোগাবে? অজরা খাতুন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, কীসের ভয় মা?

আসমা স্খলিত কণ্ঠে বলে, মরা কার্তিকের।

হায় আল্লাহ্। দেলোয়ারের কণ্ঠ ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

মরা কার্তিক। ছোটরা চেঁচিয়ে ওঠে। ওরা ভয় পেয়েছে। ওরা জানে অভাবের বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হবার ওদের কোনো শক্তি নেই। অভাব ওদের মাথার ওপর বিরাট বোঝা– ওদের বড় হতে দেয় না– শক্তিশালী হতে দেয় না। মরমে মেরে কুঁকড়ে রাখে। ওরা মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে আসমাকে। চেঁচিয়ে বলে, বুবু আমাদের বাঁচাও।

বাঁচাবো? কেমন করে বাঁচাবো? কিভাবে বাঁচাতে হয়? কেউ তো আমাকে শেখায়নি বেঁচে থাকার কৌশল? বাঁচিয়ে রাখার কৌশল? আমি তো কিছু জানি না। মাটি কাটতে জানি। ধান ভানতে জানি। ঘরের কাজ করতে জানি। এভাবেই তো আমার শ্রম বিক্রি করি। আর কি আছে আমার? কিচ্ছু নেই। আসমা দু'হাতে মুখ ঢাকে।

বুবু? ও বুবু? ছোটরা ওর হাত ধরে টানতে চায়। অজরা খাতুন ওদের সরিয়ে দেয়। বলে, চল মা আমরা ভাত খাই। ভাত রান্না হয়েছে।

হ্যাঁ, চলো, চলো ভাত খাই। ছোটরা খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। রান্নাঘরের কুপির আলোয় সবাই মিলে ভাত খেতে বসে। আজ পর্যন্ত পেটপুরে ভাত খাওয়া হলো।

দিন যত গড়ায় মরা কার্তিক ততো চেপে বসে গাঁয়ের ওপর। প্রদীপ্ত শুনতে পায়

BanglaBook.org

হাহাকারের ধ্বনি। কবেই তো নদীগর্ভে ওদের গ্রাম ভেঙে গেছে– জমি গেছে, ভিটে গেছে– শুধু জীবন নিয়ে টিকে আছে ওরা। বিছানা মানে খড়ের ওপর খেজুর পাতার পাটি, চুলো মানে নুন-পান্তা। ওরা এক গাঁয়ের মানুষ এখন ভেড়িবাঁধের ওপর, মাথার ওপর চালা তুলে দিন গুজরান। দিন কি কেটে যায়? ওটা তো টুকরো টুকরো হয়ে মালার মতো জীবনের সুতোয় আটকে আছে। একসময় গলার কাছে এসে থমকে যাবে। ফুলে উঠবে গ্রন্থি। ঠেলে বেরিয়ে আসবে চোখের মণি। তবু ওরা নিজেদের কাণ্ডজ্ঞান কাজে লাগাতে চায়, নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা কাজে লাগাতে চায়। কে দেবে কাজ? কাজ নেই এবং কাজ দেয়ার মানুষও নেই।

ক'দিনের মধ্যে আসমাদের রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি মজুদে গম নেই। গমের নতুন চালান এলে আবার কাজ শুরু হবে। সবার মুখ শুকনো। এখন কি হবে? এখন তো মরা কার্তিকের সুনসান অবস্থা– স্থির দাঁড়িয়ে গেছে এই ঘাটতি অঞ্চলে। ওদের কাজ নেই, তাই মজুরি নেই। মজুরি নেই তো ভাত নেই, ফেনও নেই। ছেলেমেয়েগুলো আর ছুটোছুটি করে না। ওরা কচুর শাক কুড়োতে যায়, কাশের ডগা ছিঁড়তে যায়, কলার থোড় খুঁজতে বের হয়। কখনো জমে থাকা কাদা-পানিতে মাছ খোঁজে। সারাদিন পর হয়তো কয়েকটা গড়ই কিংবা চ্যাং নইলে শিং পায়। খানিকটা আনন্দ নিয়ে ঘরে ফেরে। ওদের খেতে দেয়া হয় দু'বেলা– একবার সকালে, একবার রাতে। সারাদিন ওরা ছাড়া-গরুর মতো চরে বেড়ায়। কোথায় যায়, কি খায় কেউ খোঁজ রাখে না। যেন বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলা হয়, ঘাস খেয়ে ঘরে ফিরে এসো। ছেলেমেয়েরা চরেবরে পোষ্যালে ফিরতে ভুল করে না।

যেদিন রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে গেলো সেদিন ইউসুফের মোটর সাইকেল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আসমা বললো, আমরা এখন কি করবো?

আমি কি জানি।

কি খাবো?

হা-হা করে হেসে ওঠে ইউসুফ। বলে, দেশে ঘাস-লতা-পাতা-পানি কোনোকিছুর কি অভাব আছে?

মুহূর্তে জ্বলে ওঠে আসমা। ইউসুফের জামার কলার চেপে ধরে বলে, আবার হাসলে খুন করে ফেলবো।

ইউসুফ রাগে না। ধীরভাবে আসমার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমি তো খুন হতেই চাই। তোর হাতেই হতে চাই আসমি।

তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাত উঁচিয়ে বলে, এই তোমরা যাও। এখন দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। আবার যখন কাজ শুরু হবে তখন সবাইকে ডাকবো।

এই অভাবের কি হবে?

আমি কি সাক্ষাৎ ভগবান যে সব সমস্যার সমাধান করে দেবো।

ইউসুফ মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেয়। যে যার পথে পা বাড়ায়। আসমা যেতে পারে না। ও ডোবার দিকে নেমে যায়। কিছু শাকপাতা খুঁজে নিয়ে মাকে দেবে, বলবে, এবার তোমার হাঁড়ির আকার ছোট করো, আর তো পারি না।

আছিয়া ওকে ফেরার জন্য ডাকে, ও তাকায় না। শাক তুলতে তুলতে ও গান ধরে, কিন্তু বেশিক্ষণ গান গাইতে পারে না। ভাবে, কাকে বাদ দিয়ে হাঁড়ির আকার ছোট করবে মা? কাকে বানের পানিতে ভাসিয়ে দেবে? কাউকেই না, এ এক অসম্ভব চিন্তা। আসমা গান গাইতে গাইতে মাঠের মধ্যে ঘুরতে থাকে। তখন শুনতে পায় ফিরে আসছে ইউসুফের

BanglaBook.org

মোটর সাইকেল। চারদিকে কেউ নেই। যারা যাবার তারা অনেকদূর চলে গেছে। ও গান গাইতে গাইতে ইউসুফের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ইউসুফ ভুরু নাচিয়ে বলে, তুই না জানতে চেয়েছিলি এখন কি করবি?

হ্যাঁ, চেয়েছিলাম।

তোর অনেক কিছু করার আছে আসমি।

কি?

ইউসুফ সোজাসুজি ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তোর শরীর আছে আসমি।

তো কি হয়েছে? শরীর তো সবারই আছে।

তোর মতো নেই।

আমার মতো? বাড়বাড়ন্ত? হেসে গড়িয়ে পড়ে আসমা।

তুই তোর শরীর বেচতে পারিস আসমি।

বেচতে পারি? কে কিনবে? এই ঘাটতি এলাকায় কেনার লোক তো নেই।

লোক আছে। তুই বেচবি?

আবার হা-হা করে হেসে ওঠে আসমা। হাসির তোড়ে ওর কোঁচড়ে বাঁধা শাকগুলো পথের ওপর ছড়িয়ে যায়। ওদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ও হাসতে হাসতে বলে, আমি শ্রম বেচতে পারি, আমি আমার গতর বেচতে পারি– পুরুষ মানুষের ওপর এখানেই আমার জিত। তুমি তো তোমার শরীর বেচতে পারো না মরা ইউসুফ। তাহলে আমার মজুরি কম দাও কেন? আমি তো তোমাদের চেয়ে বেশি পারি মরা ইউসুফ।

কি বললি? মরা ইউসুফ?

হ্যাঁ, মরা ইউসুফ, মরা ইউসুফ। বেচবো আমার শরীর। কিনবে?

কিনবো।

তবে চলো। কোথায় যাবো? আসমার হাসি ফুরোয় না। এবার হাসির সঙ্গে কোমর দুলোয় ও। চলো, যাবে না?

আগে বল মরা ইউসুফ কেনো বলেছিস?

মরা কার্তিকে কোনো কোনো মানুষ মরা ইউসুফ হয়ে ওঠে। মরা কার্তিকের জন্যই তো শরীরের কেনা-বেচা।

ঠিকই বলেছিস। ভরা বসন্তে তারাই শরীর বিকোয় এটা যাদের ব্যবসা। মরা কার্তিক মানুষকে মানুষ রাখে না রে মরা আসমা। তোর কোনো দোষ নেই।

হয়েছে, প্যাঁচপ্যাঁচ করতে হবে না। শুনতে ভালোলাগে না। চলো কোথায় যাবে?

চল।

ও ইউসুফের মোটর সাইকেলের পেছনে উঠে বসে। বাতাসে আঁচল উড়িয়ে গঙ্গাচড়া সদরে চলে যায় আসমা। ওখানে ইউসুফের ছোট একটা ঘর আছে। কেনাবেচার জায়গা ওটা। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে প্রদীপ্তও দেখলো আসমা কনট্রাকটরের মোটর সাইকেলে উঠে কোথায় যেন চলে গেলো। আসমার মনে কোনো দুঃখ নেই।

দু'দিন পর বাড়ি ফিরলো আসমা।

চাল-ডাল-মাছ-মুরগি এবং একগাদা শাকসবজি এলো ওর সঙ্গে। ওকে দেখে দৌড়ে এলো ছোটরা, ঘিরে ধরলো রহিমা এবং অজরা খাতুন। দেলোয়ার বাড়িতে নেই, কাজের খোঁজে গেছে। একগাদা জিনিস দেখে ছোটরা তো খুশিতে আত্মহারা। গত

BanglaBook.org

দু'বেলা মা ওদের কলার থোড় আর ছোলা সেদ্ধ দিয়েছে। সেই দুঃখে এবং ভাতের খিদেয় ওরা ম্রিয়মাণ। এত জিনিস নিয়ে বুবুর ফিরে আসা ওদের হতবাক করে দেয়।

ছোটরা ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, গাঁয়ের লোকেরা বলে বুবু তুমি মোটর সাইকেলে চড়েছো?

হ্যাঁ।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

কাজ করতে।

কি কাজ?

সে তোরা বুঝবি না। নে চল, জিনিসগুলো ঘরে তোল। আগে তো ভাত রান্না হোক। তারপর আমরা সবাই মিলে গল্প করবো।

কি গল্প? রাজারানীর?

না। ঘুঁটেকুড়োনি রানীর গল্প। ভীষণ মজার। এই গল্প আমি শিখে এসেছি গঙ্গাচড়া সদর থেকে।

কী মজা, কী মজা! ছোটরা হৈ-হৈ করতে করতে রান্নাঘরে জিনিসগুলো নিয়ে যায়। ওরা সুর করে বলে, চাল তোল হেঁইও- ডাল তোল হেঁইও- মুরগি কাটো হেঁইও- মাছ কাঁটো হেঁইও- ভাত খাও হেঁইও- ভাত খাও হেঁইও- ভাত খাও হেঁইও।

ওরা রান্না ঘরে ঢুকলে রহিমা ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। গলা নামিয়ে বলে, গাঁয়ে ঢি ঢি পড়েছে বুবু।

পড়ুক। আমার কিছু এসে যায় না।

আমার ভীষণ লজ্জা করে।

লজ্জা?

হ্যাঁ, কারো সামনে বেরুতে ইচ্ছে হয় না।

সত্যি?

মনে হয় মাটি দু'ফাঁক হোক আমি ভেতরে ঢুকে যাই। মাগো কী লজ্জা!

হা-হা করে হেসে ওঠে আসমা। হাসতে হাসতে বলে, ওরা কি আমাদের বাড়িতে দু'মুঠো চাল দিয়েছে?

না, দেয়নি। দেবেই বা কেন।

তাহলে ওদের সামনে আমার কোনো লজ্জা নেই রহিমা।

কেন?

আমার ছোট ভাইবোনগুলো না খেয়ে আছে এটাই আমার কাছে বেশি লজ্জা।

ধুর, কি যে বলো, নিজের সতীত্বের চেয়ে এসব কি বড় হলো? তোমার গোনাহ হবে না?

রহিমার এমন আক্রমণে ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে না আসমার কণ্ঠ। শান্তভাবেই বলে, সতীত্ব কি? জন্ম দিয়ে খেতে দিতে না পারাই তো সবচেয়ে বড় গোনাহ রহিমা।

বুবু? রহিমা বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রান্নাঘরে জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে ছোটরা ততোক্ষণে উঠোনে নেমে এসেছে। ওরা একজন আর একজনের ঘাড়ে হাত দিয়ে লাইন করেছে। বলছে, ভাত খাবো হেঁইও- মাছ খাবো হেঁইও- পেট ভরবে হেঁইও- হেঁইও- হেঁইও।

আসমা মৃদু স্বরে বলে, শুনতে পাচ্ছিস ওরা কি বলছে?

পাচ্ছি বুবু, পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমার মতো সাহসী হতে পারবো না। আমি একটা

BanglaBook.org

ভীতুর ডিম। আমার মতো সাহসী তোকে হতে হবে না রহিমা। নিজের ব্যবস্থা যদি তুই অন্যভাবে করতে পারিস তবে সে ভাবেই করবি। কিন্তু হেরে গিয়ে নয়। অন্যের ঘাড়ের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নয়।

এটাই তোমার ঘুঁটেকুড়োনি রানীর গল্প?

হ্যাঁ।

ছোটরা যখন জিজ্ঞেস করবে তখন কি বলবে?

বলবো রানীর পেট থেকে এক বানর জন্মেছিলো তাই রাজা রানীকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

তারপর?

রানী নিজের মতো করে নিজের জীবন সাজিয়েছিলো।

বানর ছেলের কি হলো?

বানর ছেলে বানর হয়েই বড় হলো।

রাজপুত্র হবে না?

না, আমি রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখি না। যে যেখানে থাকুক তাকে সেখানে রেখেই বড় করে তোলা অনেক বড় কাজ।

বুবু তুমি কেমন করে এত কিছু জানলে?

এখান থেকে।

আসমা আঙুল দিয়ে নিজের মাথা দেখায়। তারপর গান ধরে, খাজাঞ্চল করিয়া বাজানরে দোতরা, সুন্দরী কমলাহা নাচে।

দুপুরে খাবার পর অজরা খাতুন ওকে ডাকে। কিছুক্ষণ আদর করে গায়ে মাথায় হাত বোলায়। রহিমা ঘুমিয়েছে। দেলোয়ার ফেরেনি। ছোটরা কেউ বাড়ি নেই। আকাশে মেঘ-রোদ; উঠোনে ছায়া নেই। পাখি ডাকে না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের ডাক।

অজরা খাতুন আস্তে আস্তে বলে, তুই যে ওদের কাছে বললি কাজ করেছিস, কি কাজ করেছিস মা?

আমি আমার শরীর বেচেছি।

কি, কি বললি?

মিথ্যে বলিনি। আমার তো কাজ নেই। আর কিছু করতে পারছিলাম না। ভাইবোনগুলো আমার কাছে বাঁচতে চেয়েছে। তাই শরীর বেচেছি।

আসমা? অজরা খাতুন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কেঁদো না মা। কেঁদে কি হবে?

অজরা খাতুন চোখ মুছতে মুছতে বলে, যদি গর্ভ হয়?

গর্ভ হবে না। পিল খেয়েছি।

অজরা খাতুন মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। গুনগুন করে কাঁদতেই থাকে। রেগে যায় আসমা।

মা চুপ করো। তুমি কাঁদলে আমি যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো।

কাঁদি কি সাধে? আর কি তোর বিয়ে হবে?

বিয়ে? তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে আসমা।

একবার তো বিয়ে দিয়েছিলে। তখন কি আমি পুরুষ মানুষ চিনেছিলাম নাকি কেউ আমার সতীত্ব কেড়ে নিয়েছিলো? তবে কেন সে বিয়ে ভাঙলো? কেন ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিলো? কি দোষ করেছিলাম আমি?

BanglaBook.org

অজরা খাতুন হাঁ-করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলার তো কিছু নেই, এতকিছু ভাবার সাধ্যও তার নেই।

চুপ করে আছো কেন মা?

অজরা খাতুন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকে।

আমি জানি এসবের উত্তর আমাদের কারোই জানা নেই। আমি আমার শাশুড়ির পা ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি রাতদিন আপনার সংসারে খাটবো। আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমার বাবার খুব কষ্ট হবে। আমার বাবা গরিব। সহায়-সম্বল কিছু নেই। শাশুড়ি আমার কথা শুনলো না। আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার কি দোষ? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। স্বামী বললো, বিয়ের সময় তোমার বাপে টাকা দিতে পারেনি সেটাই অপরাধ। যাও বাপের বাড়ি ফিরে যাও। বললাম, আমাকে তাড়িয়ে দিতে তোমার কষ্ট হবে না? হা-হা করে হাসলো আমার স্বামী। যেন এমন আজব কথা সে কোনোদিন শোনেনি। স্বামীর পায়ে ধরে বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। শুনে এমন একটা মুখ ঝামটা দিলো যেন ভালোবাসাটা সবচেয়ে খারাপ কাজ! আমি তো চেয়েছিলাম ঘর করে তোমার মতো হতে, কিন্তু ঘর আমাকে পথে নামিয়েছে, এখন পথে থেকেই আমি দেখতে চাই ঘর ফিরে পাই কি না।

কথাগুলো বলতে বলতে উদাসীন হয়ে যায় আসমা। ওর পুরো শরীর বিষাদে ছেয়ে যায়, যেন আসমা অনেককাল আগের ক্ষয়ে যাওয়া মানুষ, কেউ তার ভেতর একটু একটু করে প্রলেপ লাগাচ্ছে। এসব কথাই ও গল্পের মতো বলে যায় প্রদীপ্তকে। মানুষটির সহানুভূতিতে ওর ভেতরের বাধ ভেঙে গেছে। তবু তো একজন কাউকে পাওয়া গেলো যাকে নিজের কথা বললে ভেতরটা সাফ হয়ে যায়। প্রদীপ্ত ওকে বলে, তুমি একটা লড়াকু মেয়ে আসমা। তোমার মতো যদি সবাই হতো। তোমার কাছ থেকে আমি অনেককিছু শিখতে পারছি।

গঙ্গাচড়া গাঁয়ের মেয়ে আসমা প্রদীপ্তর এত বড় কথা শুনে খুশি হতে পারে না। বরং প্রদীপ্তর জন্য ওর মায়া হয়। ভাবে, চোখ আর হাত হারিয়ে মানুষটার সাহস কমে গেছে।

রাতে ঘরে ফিরে দেলোয়ার খুশি হয়ে বলে বাজারে শুনলাম গঙ্গাচড়া সদরে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। কাল থেকে খিচুড়ি পাওয়া যাবে।

অজরা খাতুন কথা বলে না। ছোটরা পেটপুরে খেতে পেয়ে আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েছে। আসমা আর রহিমা জেগে আছে, কিন্তু দু'জনে চুপচাপ। আসমার গল্প বলা শেষ, তাই কারো মুখে আর কথা নেই।

অজরা খাতুন স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, আজ কিছু জোটেনি?

দেলোয়ারের বুকে দীর্ঘশ্বাস, না। কাল খিচুরি আনবো। এক গ্লাস পানি দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি। শরীরটা যেন ভেঙে আসতে চায়।

অজরা খাতুন কোনো কথা না বলে দেলোয়ারের জন্য রাখা ভাতের থালাটা নিয়ে আসে। ওর চক্ষু চড়কগাছ! ভাত?

খান।

কোথায় পেলি?

খান।

বলবি না?

ভাত খান। সারাদিন পেটে তো দানাপানি পড়েনি।

দেলোয়ার ভাতের থালা টেনে নেয়। এক লোকমা মুখে ওঠতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, আসমা ফিরেছে? অজরা খাতুন মাথা নাড়ে। দেলোয়ার ভাতের থালাটা

BanglaBook.org

সামনে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই খা।

অজরা খাতুন শান্ত স্বরে বলে, আমাদের খাওয়া হয়েছে। সবাই পেট ভরে ভাত খেয়েছি।

অজরা খাতুনের কণ্ঠস্বরে দেলোয়ার চমকিত হয়। এ এক নতুন কণ্ঠস্বর। দেলোয়ার সে কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে ভাতের থালা ঠেলে দেয় সামনে। হাত গুটিয়ে রাখে।

আমি খাবো না।

কেন?

বুঝিস না কেন? মেয়ে কিভাবে টাকা আনে আমি বুঝি, সব বুঝি।

সব বোঝেন, না? শুধু বোঝেন না বাপ থাকতে মেয়ে কেন শরীল বেচতে যায়? আমার ছৈলপোলগুলাই তো ভাতের জন্য কান্দে। ছৈলপোল তো আসমা পয়দা করে নাই।

কি বললি?

শরম করে না রাগ করতে?

অজরা খাতুনের মৃদু ধমকে আবার চমকিত হয় দেলোয়ার। কিভাবে এমন রাতারাতি বদলে গেলো অজরা খাতুন? ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলছে? ভাতের থালাটা স্বামীর সামনে আবার ঠেলে দিয়ে একই কণ্ঠে বলে, ভাত খান। দু'দিন তো ভাত খাননি।

দেলোয়ার আর কথা বলে না। মাথা নিচু করে ভাত খেতে শুরু করে। অজরা খাতুন স্থাণুর মতো বসে থাকে।

দেলোয়ারের ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, আর ভাত নাই?

অজরা খাতুন মাথা নাড়ে, না। হিসাব করে রেঁধেছি। একবেলায় সব শেষ করলে কেমনে হবে।

মনে হয় আরো খাই।

দেলোয়ার থালার মধ্যে পানি ঢেলে থালাটা ধুয়ে সে পানিটুকু খায়। অজরা খাতুন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মনে মনে ভাবে, মেয়েটা শরীর বেচেও বাপের খিদা মেটাতে পারেনি।

দেলোয়ার হাত ধুয়ে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছে। শুয়ে পড়েছে অজরা খাতুন, কিন্তু ঘুম আসে না– অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা বুজলে পাতা কেমন ভারী মনে হয়। কোথায় যে কষ্ট ধরতে পারে না। মাথার ভেতরটায় কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। বিড়ি শেষ হলে দেলোয়ার শুতে আসে। অভ্যেস মাফিক ভেতরটায় কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। বিড়ি শেষ হলে দেলোয়ার শুতে আসে। অভ্যেস মাফিক অজরা খাতুনের শরীরের ওপর উঠে যায় তার হাত ও পা। অজরা খাতুন দ্রুত সেই পা ও হাত নামিয়ে দেয়। দেলোয়ার চাপা গর্জন করে, কি হয়েছে?

উত্তর নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উত্তর শোনার জন্য, তারপর আর প্রশ্ন করার সাহস হয় না। ধমকও দিতে পারে না। মানুষটার আজ কী যে হলো– ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে দেলোয়ার এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু করে। এই প্রথম স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড করুণায় অজরা খাতুনের মন বিষিয়ে ওঠে। বুঝতে পারে না কেমন করে এত বছর কাটালো। কৈ আসমার মতো তো ও কোনোদিন এতকিছু ভেবে দেখেনি। মরা কার্তিকের এই ঘোর দুর্দিনে অভাব শুধু বাইরের নয়, অভাব নিজের ভেতরেরও। অজরা খাতুন তেল চিটচিটে বালিশে মুখ গোঁজে। কিন্তু কাঁদতে পারে না, বুক ফেটে যাচ্ছে, তবুও না।

পরদিন খুব ভোরবেলা আসমা ও রহিমা গঙ্গাচড়া সদরে যাবার জন্য রওনা হয়। লঙ্গরখানার খিচুড়ি আনতে হবে। বড়াইবাড়ি থেকে গঙ্গাচড়া প্রায় চার কোশ পথ– সবটাই ছায়ার পথ নয়, মাঠের মধ্য দিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটলে রোদে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে– অনেক

BanglaBook.org

দূরের সবকিছু ধোঁয়াটে দেখায়। রহিমা প্রথম ঘর থেকে বেরিয়েছে। এতদিন ও গাঁয়ের বাইরে কোথাও যায়নি। ওর কৌতূহলের শেষ নেই। বারবারই প্রশ্ন করে। লোক থাকুক না থাকুক কিছুক্ষণ পরপর মাথার ঘোমটা ঠিক করে, দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। একসময় আসমা বলে, ঘোমটাটা ফেলে দে রহিমা।

ফেলে দিবো? কেন?

দেখবি যতদূর চোখ যায় সব কেমন ফরসা। ঘোমটার আড়াল রাখলে ঠিকমতো দেখা যায় না।

লোকে কি বলবে?

রহিমা তুই আর আমিই তো লোক। আমাদের মতো যারা তারাই লোক। আমাদের যারা ভালো বলবে না তাদের আমাদের দরকার নেই।

আমার যে এত সাহস নেই।

সাহস করতে হবে। সাহস না করলে ঐ লোকেরা তোর গলা টিপে মারতে আসবে।

রহিমা মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নেয়। ওর মনে হয় ওর বেশ ফুরফুরে লাগছে। শরীর যেন হালকা একটা পাখি– ইচ্ছে করলেই উড়তে পারে। ও লাফিয়ে লাফিয়ে খানিকটা পথ চলে আসে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, কী সুন্দর বুবু! মনে হয় আমাদের চারদিকে কোনো বেড়া নেই। আমরা একটা খোলা ঘরে দাঁড়িয়ে আছি।

আসমা হা-হা করে হেসে উঠে গান ধরে, ও মন, মন দরিয়া–।

রহিমা মনোযোগ দিয়ে গান শোনে। এতদিন আসমার গান ও বাড়িতে শুনেছে– এখন ও বুঝতে পারে আসমার গান পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সব দিকে ছুটে যাচ্ছে। আসমার গলা কী যে সুন্দর– এই সুন্দর গলাই তো পারে মানুষকে সাহস দিতে। যেতে যেতে ও থমকে দাঁড়িয়ে বলে, আচ্ছা বুবু আমরা যে লঙ্গরখানায় খিচুড়ি আনতে যাচ্ছি এটা কি একটা কাজ?

না।

আসমার গম্ভীর কণ্ঠ থেকে গানের সুর উবে যায়– সে কণ্ঠ চড়চড় করে ফাটতে থাকে। থতমত খেয়ে বলে, তাহলে এটা কি?

ভিক্ষা। আসমার ফাটা কণ্ঠ ভেসে যায় আকাশে-বাতাসে।

ভিক্ষা! আমরা ভিক্ষা করতে যাচ্ছি?

হ্যাঁ।

তাহলে আমরা যাচ্ছি কেন?

আমাদের না গিয়ে উপায় নেই যে। এই ঘাটতি এলাকায় এখন কাজ নেই।

তখন ওরা দেখতে পায় চারদিক থেকে মানুষ আসছে– সারিবদ্ধ মানুষ– বিভিন্ন গাঁয়ের মানুষ– হাতে মাটির মালসা, নয় এলুমিনিয়ামের থালা– সবাই লঙ্গরখানার দিকের যাত্রী। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই।

বুবু দেখো কত মানুষ?

আমরা একটু দাঁড়াই। ওদের সঙ্গেই যাবো।

না, কেন দাঁড়াবো? আমরা যেতে থাকি। ওরা আমাদের পিছু পিছু আসুক।

রহিমা হাঁটতে থাকে। আসমা প্রথমে অবাক হয়, তারপর হেসে ফেলে। শেষে ওকে এগিয়ে যেতে দেখে ওর পিছু ধরে। ভাবে, রহিমা কি খুব দ্রুত চিনে নিতে চাচ্ছে সবকিছু? ওর পায়ের বেড়ি খুলে গেছে, ও আর বন্দী নেই। ও এগুতে থাকে। চারদিক থেকে শত শত মানুষ এগুতে থাকে। কীসের এই মহাযাত্রা? কোথায় যাচ্ছে এইসব মানুষ?

BanglaBook.org

থানা সদরে পৌঁছে মাথা ঘুরে ওঠে আসমার। মেয়েদের স্কুলের পাশের খালি জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। পুরো থানার দশটা ইউনিয়ন থেকে লোক এসেছে। কত লোক হবে? বিশ হাজার? এত লোক একসঙ্গে কোনোদিন দেখেনি আসমা। ও ভিড়ের মধ্যে কুঁকড়ে যেতে থাকে। চারদিকে ঠেলাঠেলি, মারামারি।

রহিমা ভয়ে ওর হাত আঁকড়ে ধরে, বুবুগো ফিরে চলো। লাগবে না খিচুড়ি।

ওর হাত থেকে মাটির মালসা পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। আসমা রেগে গিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়, এখন খিচুড়ি নেবো কিসে? শয়তান মেয়ে।

তোমারটায় নিলেই হবে।

কচু হবে। দু'জনেরটা কি এক মালসায় দেবে?

চলো ফিরে যাই।

ফিরে যেতে এসেছি নাকি? খিচুড়ি না নিতে পারলে ওরা খাবে কি?

রহিমা কেঁদে ফেলে। আমার ভয় করছে। মাগো, এত মানুষ– কাতারে কাতারে মানুষ– জড়ো হয়ে থাকা মানুষের মাথা নদীর মতো– ফুলছে, ফুলছে।

চুপ কর। চল তোকে বাইরে বসিয়ে আসি।

রহিমাকে স্কুলের বারান্দায় বসিয়ে রেখে লাইনে দাঁড়ায় আসমা। একটু একটু করে এগুচ্ছে মানুষ– নড়ছে মানুষের সারি। বড় ড্যাগ থেকে থালা দিয়ে খিচুড়ি উঠিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। গন্ধ এসে লাগে আসমার নাকে। গন্ধে ওর খিদে বেড়ে যায়– সকালের এক মুঠো পান্তা কখন হজম হয়ে গেছে। রহিমারও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। যেটুকু খিচুড়ি পাবে তা যদি দু'জনে এখানে বসে খেয়ে ফেলে তো বাড়িতে নেবে কি? আসমার খারাপ লাগতে শুরু করে। এক মালসা খিচুড়ির জন্য এতটা পথ হেঁটে এসে যদি আবার না খেয়ে ফিরতে হয় তাহলে পারবে কি এতটা পথ হাঁটতে? ভাবতে ভাবতে ও ড্যাগের কাছে পৌঁছে যায়।

একজন লোক ওদের নামের তালিকা নিয়ে বসে আছে। তালিকা দেখে খিচুড়ি দেয়া হচ্ছে। আসমা সামনে দাঁড়াতেই লোকটি শুরু করে প্রশ্ন।

কোথায় থাকো?

বাঁধের ওপর।

গ্রামের নাম কি?

গ্রাম তো তিস্তার গর্ভে তলিয়ে গেছে।

গ্রাম না থাকলে তোমার নাম তো রিলিফের তালিকায় উঠেনি। তোমাকে রিলিফ দেয়া হবে না।

হবে না? চেঁচিয়ে ওঠে আসমা।

যাও সরো, পেছনের জনকে আসতে দাও।

কেন সরবো? আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে? একসময় তো ছিলো। আমার নদী আছে, যে নদী আমার গ্রাম খেয়েছে। আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে, আমার ভেড়ি বাঁধ আছে। বাঁধের ওপর আমরা ঘর তুলেছি।

এই সরো, সরো, অন্যদের আসতে দাও।

আসমা প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, গ্রাম নেই তো কি হয়েছে, আমার নদী আছে, নদীর নাম তিস্তা।

কে একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। ও রুখে দাঁড়িয়ে বলে, আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে, আমার তো দেশ আছে। ও মিয়া ভাই আমার তো দেশ আছে।

যা, যা, ভাগ।

BanglaBook.org

লোকেরা ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। অন্যদের খিচুড়ি দেয়া শুরু হয়েছে। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আসমা। তারপর খালি মালসাটা নিয়ে স্খলিত পায়ে হেঁটে আসে রহিমার কাছে। ওকে ঘিরে রেখেছে ঢাকা থেকে আসা কয়েকজন সাংবাদিক। প্রদীপ্ত এদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আসমাকে শুকনো মুখে বেরিয়ে আসতে দেখে ওর পিছু পিছু আসে। ততোক্ষণে অন্য সাংবাদিকরা রহিমার কাছে জানতে চাচ্ছে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। আসমাকে দেখে রহিমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, আপনাদের যা কিছু জানার বুবুর কাছে জানতে চান। আমার বুবু সব জানে।

সাংবাদিকরা একযোগে আসমার দিকে তাকায়।

আসমার উদভ্রান্ত দৃষ্টি এবং খালি মালসা দেখে রহিমা আঁতকে উঠে বলে, খিচুড়ি পাওনি?

না।

কেন?

আমার যে গ্রাম নাই। নদী আমাদের গ্রাম ভেঙে নিয়েছে, আমাদের কি দোষ?

রহিমা আসমার কথা বিশ্বাস করতে পারে না। ও জানবে কি করে যে সরকারের রাজনীতিতে কত প্যাঁচ। সাহসী আসমার এমন বিমূঢ় হয়ে যাওয়াও ওর পছন্দ হয় না। নিজের বোন সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে ও কত বড় কথা বলেছে। এখন এই ভাঙাচোরা আসমার চেহারা দেখে ওর লজ্জাই করে।

এগিয়ে আসে একজন সাংবাদিক, তোমার মালসা আমাকে দাও, দেখি কে খিচুড়ি দেয়নি।

রিলিফের তালিকায় আমার নাম নেই।

বললেই হলো, এই আয় তো দেখি।

ওরা চার-পাঁচজন সাংবাদিক মালসা নিয়ে চলে যায়। একটুপর মালসা ভর্তি খিচুড়ি নিয়ে আসে। খাও।

কেঁদে ফেলে আসমা।

এই মালসা তোমরা দু'বোন খেয়ে ফেলো। আমরা আবার এনে দেবো। সেটা নিয়ে তোমরা বাড়ি যেও।

কোমল কণ্ঠে কেউ একজন বলে। আসমার কান্না থামে না। ওর বুক ভেঙে গেছে। গ্রাম নেই বলে ওকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ যন্ত্রণা ও ভুলবে কি করে? ওকে কাঁদতে দেখে রহিমাও কাঁদে।

মুহূর্তে ওদের হাতের ক্যামেরা একসঙ্গে ক্লিক করে ওঠে। ওরা ওদের ছবি তোলে– কান্নার ছবি– খরা কবলিত, দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষ ওরা। ওদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হবে। ঘাটতি এলাকার মানুষ হিসেবে ওরা শহরের মানুষের কাছে পরিচিতি পাবে।

সে সময় আসমা কান্না থামিয়ে ফুঁসে উঠে বলে, ছবি তুলছেন কেন?

এই দুর্ভিক্ষের কথা দেশের মানুষকে জানাতে হবে তো।

তাহলে কি হবে?

একজন ব্যঙ্গ করে বলে, বিরোধীদল চেঁচামেচি করার সুযোগ পাবে।

আর একজন ফোড়ন কাটে, বলছিস না কেন যে এইসব ছবি বেচে আমাদেরও দু'পয়সা কামাই হবে।

হা-হা করে হেসে ওঠে অন্যরা।

তখন আসমা বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আমাদের কিছুই হবে না। আমরা যেমন আছি

BanglaBook.org

তেমনই থাকবো।

আর একজন তড়িঘড়ি বলে, এ খিচুড়িটুকু তোমরা দু'বোন খেয়ে ফেলো। আমরা আবার তোমাদের খিচুড়ি এনে দেবো। তাড়াতাড়ি খাও। নইলে আবার ফুরিয়ে যাবে।

দু'জনে এক মালসা থেকে খিচুড়ি উঠিয়ে খেতে থাকে। দু'জনের মাঝখানে মালসা। দু'বোন মুখোমুখি বসেছে। আবার ছবি ওঠায় ওরা। একজন বলে, দারুণ একটা ক্যাপশন দিয়ে ছবিটা ছাপা যাবে।

ওদের কথা শুনে আসমা এবং রহিমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। পেটে প্রচণ্ড খিদে। ওরা দু'জনে অল্পক্ষণে মালসা শেষ করে ফেলে। তারপর সেটা ডোবা থেকে ধুয়ে এনে ওদের হাতে দেয়। একজন খিচুড়ি আনতে যায়। রহিমা নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করে, বুবু এটা কি আমাদের রোজগার?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

এটাও একরকম শরীর বেচা।

ওরা আমাদের খাতির করছে কেন?

বুঝিসনি?

বুঝেছি। হি-হি করে হেসে ওঠে রহিমা। আসমা বুঝতে পারে রহিমা খুব সহজভাবে সহজ করে ফেলেছে পুরো বিষয়টি। ও পারবে নিজের বোঝা নিজেই টানতে।

ছেলেরা কোথা থেকে আরো একটি মালসা জোগাড় করে দু'মালসা খিচুড়ি নিয়ে আসে ওদের জন্য। রহিমার চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ও নিজেই আগ বাড়িয়ে দু'মালসা নিজের হাতে তুলে নেয়। গদগদ ভাষায় বলে, এই খিচুড়ি পেয়ে আমার মা খুব খুশি হবে।

আসমা বলে, ছোট ভাইবোনগুলো কাকের মতো ঘিরে ধরবে এই দুই মালসা।

একজন জিজ্ঞেস করে, তোমাদের অনেক ভাইবোন বুঝি?

হ্যাঁ, অনেক।

সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ফেল, বুঝলি।

হা-হা করে হেসে ওঠে সবাই।

আমরা যাই?

কালকে আবার এসো, কেমন?

দু'জনে ঘাড় নেড়ে পথে নামে। দু'জনেরই বুকের ভেতর নানাকথা গুঞ্জরিত হয়, কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলতে পারে না। আপন মনে হেঁটে যায় দু'বোন। অথচ কত কথা বলার ছিলো দু'জনের। কিন্তু কি বলবে– কোথা থেকে শুরু করবে ভাবতে পারে না। আসমা ভাবে রহিমা কিছু প্রশ্ন করুক, রহিমা ভাবে বুবু ওকে আরো অনেককিছু শিখিয়ে দিক, যেন ও অল্পে বুঝে যায় সবকিছু। জীবন দিয়ে যে অভিজ্ঞতা আসমা লাভ করেছে সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘ সময় ধরে এবং ধৈর্য সহকারে লাভ করার ইচ্ছা রহিমার নেই। ও চায় জীবনকে অল্প অভিজ্ঞতায় বুঝে নিতে এবং জীবনের খানাখন্দগুলো পাশ কাটিয়ে হেঁটে যেতে। ও আসমার মতো গর্তে পড়তে চায় না। একসময় ও দূরের দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, বুবু দেখো কেউ হয়তো রাস্তার ধারে পড়ে মরে আছে।

সত্যি তো, চল দেখি।

দু'বোন দ্রুতপায়ে হেঁটে যখন গাছটির কাছে পৌঁছে তখন ওরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। রহিমা ডুকরে কেঁদে ওঠে, বাবা, বাবা গো?

রাস্তার পাশের বিশাল গাছের নিচে শুয়ে আছে দেলোয়ার, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। রহিমার

BanglaBook.org

কান্নায় চোখ খোলে।

বাবা, বাবা?

আমার কিছু হয়নি মা।

আসমা বলে, তোমার খিদে পেয়েছে বাবা, তুমি কিছু খাও।

কি খাবো? ওরা আমাকে খিচুড়ি দেয়নি। আমার যে গ্রাম নেই।

ওঠো বাবা, এই দেখো আমাদের কাছে খিচুড়ি আছে।

দেলোয়ার চমকে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে মালসা টেনে নেয়। কিন্তু এক লোকমা মুখে পোরার আগে কেমন নির্জীব বোধ করে। গ্রাম না থাকার কষ্টে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছে, যেন শরীরে শক্তি নেই এবং নিজে কোথাকার মানুষ এটা বুঝে উঠতে না পারার কারণে দিশেহারা।

বাবা খাও। দু'জনে একসঙ্গে বলে। ওদের কণ্ঠস্বর দেলোয়ারের শরীরে শক্তি সঞ্চারিত করে। এক লোকমা ভাত মুখে পুরে ও আস্তে আস্তে চিবোয়। তারপর জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, তোরা কি করে খিচুড়ি পেলি?

আমরা রোজগার করেছি বাবা।

রোজগার?

আসমা জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ রোজগার। লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা পাইনি। আমাদেরও তো তোমার মতো গ্রাম নেই।

দেলোয়ার মুখ নিচু করে। কোঁত করে আর এক লোকমা খিচুড়ি গিলে। রহিমা কলকলিয়ে বলে, আমরা শহরের মানুষদের আমাদের ছবি তুলতে দিয়েছি। ওরা আমাদের খিচুড়ি দিয়েছে। এটা রোজগার না বাবা?

ওরা ছবি দিয়ে কি করবে?

জানি না।

দেলোয়ার আর এক লোকমা খায়। রহিমা যেটাকে রোজগার বললো সেটা কি আসলে রোজগার? হবে হয়তো। দেলোয়ার নিজের ভেতর যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করে। খানিকটুকু খেয়ে ও হাত গুটিয়ে নেয়। বলে, ওদের জন্য থাক।

রহিমা কচুপাতা ভাঁজ করে রাস্তার পাশের নিচু জায়গা থেকে পানি নিয়ে আসে। দেলোয়ার হাত ধোয়। আসমা হাসতে হাসতে বলে, এখন তো তুমি হাঁটতে পারবে বাবা?

হ্যাঁ, পারবো।

তিনজনে হাঁটতে থাকে– হাঁটতে থাকে নিজেদের গ্রামহীন ঘরের দিকে। আসমা বুঝতে পারে না যে ওদের কষ্টটা কোথায় বেশি? পেটে না মনে? এতদিন জেনেছিলো ক্ষুধাটা সত্যি, সবচেয়ে বড়– কিন্তু এখন এই গ্রাম না থাকার ধাক্কায় ও বুঝতে পারছে মানুষের আরো কিছু লাগে, আরো কিছু– যে কথাগুলো মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না, শুধু ধাক্কা খেলে সেটা বিশাল হয়ে ওঠে। আসমার কাছে এই বেঁচে থাকার কত হাজার রকম মানে যে বেরুচ্ছে। এত কিছু বুঝে ওঠার সাধ্য কি ওর আছে?

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওরা দেখতে পায় ছোটরা দৌড়ে আসছে ওদের দিকে। ওরা এতক্ষণ ওদের ফেরার অপেক্ষায় ছিলো। ওরা হৈ-চৈ করে কলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, পেয়েছো খিচুড়ি?

পেয়েছি। তোরা রান্নাঘরে গিয়ে সারি করে বোস। আমি সবাইকে ভাগ করে দেবো।

সান্টু বলে, আমরা কলাপাতা ছিঁড়ে রেখেছি। কলাপাতায় খাবো।

কেন? আসমা ওদের কথায় অবাক হয়।

BanglaBook.org

নিপু গড়গড়িয়ে বলে, লঙ্গরখানার খিচুড়ি যে।

তাতে কি?

শিপু বিজ্ঞের ভঙ্গি করে বলে, ওটা ওভাবেই খেতে হয়। তুমি দেবে আমরা লাইন করে নেবো। খুব মজা না বুবু?

মজা? আসমা বিমূঢ় হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়। দেলোয়ার হেসে মাথা নেড়ে বলে, এটা ওদের কাছে খেলা।

রহিমা হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ঠিক বলেছো বাবা। এটা লঙ্গরখানা আর খিচুড়ি-খিচুড়ি খেলা।

বাচ্চু মাথা নাড়ায়, আমরা যেমন চোর-পুলিশ খেলি তেমন।

কী মজা, কী মজা, বলতে বলতে ছোটরা দৌড়ে বাড়ির দিকে যায়। আসমার মাথা ঘুরে ওঠে। রহিমাও ওদের সঙ্গে দৌড়ে গেছে। ও ওদের দিকে তাকাতে পারে না। ও বুঝতে পারে যে ও এখন একটি ছোটখাটো লঙ্গরখানার সরকারি কর্মচারী হবে আর ঐ ছোটরা হবে দুর্ভিক্ষের লোক, অনেক দূরের গাঁ থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে।

আসমার ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাঁদতে। এ কেমন লঙ্গরখানার অনুভব বয়ে যায় জীবনের ওপর দিয়ে– বাবা বলছে খেলা, লঙ্গরখানা কি খেলা হয়? যদি খেলা হয় তবে বড় নিষ্ঠুর খেলা– ইঁদুর-বেড়ালের খেলা। না হলো না, আসলে মৃত্যু মৃত্যু খেলা। ভাবতেই আসমার শরীর হিম হয়ে আসে।

দেলোয়ার ওর মুখের দিকে তাকায়, কি হয়েছে মা?

বাবা দেখো তো আমার হাতটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি না?

হ্যাঁ, একটু তো ঠাণ্ডা হয়েছে। যেটুকু শীত পড়েছে তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। চল, একটু চুলোর ধারে গিয়ে বসবি।

মা তো আজ চুলো জ্বালায়নি বাবা? মা-ও তো লঙ্গরখানার খিচুড়ির জন্য বসে রয়েছে।

চুলো না জ্বলুক, আমি তো তোর জন্য খানিকটুকু আগুন জ্বালাতে পারি মা। ওতেই তোর হাত সেঁকা হয়ে যাবে।

কি দিয়ে জ্বালাবে?

খড়কুটো কুড়িয়ে আনবো।

আসমা হাসতে থাকে, কতক্ষণ আর জ্বলবে?

দেলোয়ার অনুনয়ের স্বরে বলে, যতক্ষণ জ্বলে, যতটুকু সময় জ্বলে?

ঠিক আছে আনো খড়কুটো। ওদের খাওয়া হলে আমরা সবাই মিলে আগুনের ধারে বসবো। আগুন-আগুন খেলা হবে।

দেলোয়ার মেয়ের মুখের দিকে তাকায় না। একটা কাজ পেয়ে চলে যায়। ওকে যে আগুন জ্বালাতে হবে! কিন্তু ও জানতেও পারলো না কি কারণে আসমার শরীর হিম হয়ে ওঠে! কেন আসমা আগুন-আগুন খেলা খেলতে চায়!

দেলোয়ার প্রচুর খড়কুটো জড়ো করেছে– অনেকক্ষণ ধরে সবাই মিলে আগুনের ধারে বসে থাকে। সবাই বলে হিমালয় থেকে শীতের বাতাস উড়ে আসছে– বাতাস তো জানে না সে উড়ে যাওয়ার ফলে কামড়ে ছিঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের মানুষের শরীর। খড়কুটোর আগুন আর কতক্ষণ থাকে। একসময় নিভে গেলে অজরা খাতুন ছোটদের নিয়ে ঘরে যায়। বসে থাকে দেলোয়ার আসমা আর রহিমা।

আসমা হাসতে হাসতে বলে, মরা কার্তিকের কত যে খেলা বাবা। আকাল ডুবতে

BanglaBook.org

না ডুবতে আবার উত্তরের শীতের বাতাস জেঁকে এসেছে।

দেলোয়ার গম্ভীর কণ্ঠে বলে, সবই আল্লার ইচ্ছা মা।

আসমা কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যায়। তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে, আমার সাধ হয় হিমালয়ে যেতে। যেতে পারলে আর ফিরবো না।

কি করবি সেখানে?

বনে বনে ঘুরবো আর ফলমূল খাবো।

হি-হি করে হাসে রহিমা। বলে, আমার এমন সাধ হয় না। যেখানে মানুষ নেই সেখানে আমি থাকতে পারবো না।

দেলোয়ার উঠে পড়ে। বলে, আমার ঘুম পাচ্ছে।

দু'বোন কথা বলে না। আগুনের সামান্য কয়লা ধিকিধিকি জ্বলছে। একটু পর সেটাও ছাই হয়ে যাবে। দেলোয়ার চলে গেলে আসমা বলে, বাবা আমাদের কথা শুনতে ভালোবাসে না।

কেন?

সে তুই বুঝবি না।

তাহলে তুমি বসে বসে বোঝ। আমি ঘুমুতে গেলাম।

রহিমা উঠে চলে যায়। আসমার মনে হয় ওরও ওঠা উচিত, কিন্তু ওঠা হয় না। মনে হয় কতদিন ধরে আর 'বিষাদসিন্ধু' পড়া হচ্ছে না। কেউ আসর জমায় না। আসমা নিজেও পড়তে চায় না, ওর পড়তে ভালো লাগে না। কেন একটি ঘটনা শুনতে চাইবে মানুষ, যখন কারবালার মতো সময় ওদের চারদিকে– যখন এক নীরব যুদ্ধ চলছে ওদের জীবনে? আসমা নিজেকেই বলে, কাল আবার খিচুড়ি আনতে যাবো। কিন্তু কিভাবে জোগাড় করবো? জানি না, আসমা খুব অসহায় বোধ করে।

সকালে সদরে যাবার কথা তুলতেই রহিমা বলে, আমিও যাবো।

আসমা আপত্তি করে, আজ তোকে যেতে হবে না। তুই ভিড় সইতে পারিস না। কাল যাবি। আজ আমি আর বাবা যাই।

ঐ ছেলেগুলো কি আজও থাকবে বুবু?

জানি না।

ওরা না থাকলে তো তুই খিচুড়ি পাবি না।

গিয়ে তো দেখি। বাবা চলো।

দেলোয়ার তৈরিই ছিলো। দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। আবার সেই তিন ক্রোশ পথ পাড়ি দেওয়া– দেলোয়ার ক্লান্তি অনুভব করে, কিন্তু আসমার ক্লান্তি নেই। ওর খিচুড়ি জোগাড় করতেই হবে।

থানা সদরে ভিড়ের মধ্যে আলাদা হয়ে যায় দু'জনে। দেলোয়ার এর-ওর কাছে ভিক্ষা চাইছে। আসমা হন্যে হয়ে কালকের সাংবাদিকদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু না, ওরা কোথাও নেই। স্কুলের দপ্তরি জানালো যে ওরা চলে গেছে। দুর্ভিক্ষের খবর নিয়ে ওরা শহরে ছুটেছে, জানাতে হবে সবাইকে। সেই ভালোমানুষটি কি চলে গেছে? চারদিকে তাকায়, কিন্তু প্রদীপ্তকে দেখতে পায় না। আসমা খানিকটা অবসন্ন বোধ করে। বারান্দায় বসে পড়ে। কিভাবে কি করবে ভেবে পায় না।

দপ্তরি এসে ওর পাশে বসে। ওকে সান্ত্বনার কথা বলে। আসমার কানে কিছুই ঢোকে না। এখন কারো কথা শোনার ধৈর্য ওর নেই। চারদিকে তাকিয়ে বাবাকে খোঁজে, কিন্তু দেখতে পায় না। ইচ্ছে হয় অন্য কোথাও চলে যেতে। ও কোথাও যাবার জন্য উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়ায়। দত্তরি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাও মা?

ও মাথা নাড়ে, জানি না।

চলো আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। তোমার চাচী আছে। তোমার চাচী ভালো জাল বোনে। শহর থেকে একজন লোক এসেছে। আমার বাড়িতে থাকে।

কি করে ও?

এখানে ওখানে ঘোরে আর ছবি ওঠায়। তোমার চাচী তো ভালো জাল বোনে তার অনেক ছবি তুলেছে। ও নাকি ওর ছবি দিয়ে মেলা করবে।

মেলা করবে? ছবির আবার মেলা হয় নাকি?

সেসব কি আর আমি কিছু বুঝি। যাবে তো চলো।

চলেন।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আসে। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে তবে দত্তরির বাড়ি, লতাপাতা- গাছগাছালিতে ভরা- ভারি সুন্দর দেখতে।

দত্তরির বউ বারান্দায় বসে জাল বুনছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। শনের মতো সাদা চুল দত্তরির বৌর- আসমাকে দেখে একগাল হাসে। আসমার মন ভরে যায়, কেমন অমায়িক সরল হাসি, যেন বলতে চায়, আয় মা কাছে এসে বোস।

দত্তরি বৌকে বলে, এর নাম আসমা। ভেড়িবাঁধের ওপর থাকে। খিচুড়ি নিতে এসেছিলো। গ্রাম নেই তো তাই খিচুড়ি পায়নি।

আহারে সোনা, তাই বুঝি মুখটা অমন শুকনো। আমার ঘরে মুড়ি-গুড় আছে চারটে খা মা।

বুড়ি মুড়ি-গুড় আনতে যায়। দত্তরি এক গ্লাস পানি এনে ওকে দেয়। ও চমকিত হয়। গ্লাস নিতে নিতে ভাবে, লোকটি কেমন করে বুঝলো যে ওর ভীষণ পিপাসা পেয়েছে! আহারে, এ যদি সত্যি সত্যি ওর বাবার ভাই হতো!

খাও মা। বুড়ি এক খাঁচা মুড়ি এনে দেয়।

আপনাদের আর কেউ নেই?

দত্তরি নিশ্বাস ফেলে বলে, না ছৈলপোলে হয়নি। এজন্য বুড়ি কেঁদে বুক ভাসায়। আমার দুঃখ নেই। না হয়েছে তো কি হয়েছে?

তাই তো, না হয়েছে তো কি হয়েছে।

আসমা লাফিয়ে ওঠে। মুড়ি খেয়ে ওর বেশ ফূর্তি হয়। ও মুড়িগুলো কোঁচড়ে নিয়ে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে। তারপর ফিরে এসে বলে, চাচী দুঃখ কি, আমি আপনার মেয়ে হবো।

হবি, খুব খুশির কথা। আমারও দুঃখ নেই রে। আমি জাল বুনি, বড়শি ফেলে মাছ ধরি। শাকপাতার বাগান করি, হাঁস-মুরগি-ছাগল আছে- আমার তো ভরা সংসার। আমার দুঃখ কি? বুড়ি হঠাৎ করে আঁচলে চোখ মোছে, তবে একটা মানুষ থাকলে আর কোনো কষ্ট থাকত না।

তখন চাচী, চাচী ডাকতে ডাকতে মাহবুব ঢোকে। সানগ্লাসটা খুলে বলে, আজ মেলা ছবি নিয়েছি। দারুণ এক্সিবিশন হবে।

বুড়ির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, চাচী বুঝি কষ্টের কথা বলছে তোমাকে?

আসমা জবাব দেয় না। তাকিয়ে থাকে।

চাচীর ঐ একটিই কষ্ট। আর কোনো কষ্ট নেই। আমি চাচীকে ঢাকা নিয়ে যাবো। চাচীর আর কোনো কষ্ট থাকবে না। কি বলো বাসন্তী?

আমার নাম আসমা।

BanglaBook.org

তুমি ঠিক বাসন্তীর মতো দেখতে। বাসন্তী নামে একটি মেয়ের ছবি আমি তুলেছিলাম। জালপরা বাসন্তীকে দেখে আমার আইডিয়াটা মাথায় আসে। ওটা একটা দারুণ ছবি ছিলো।

গলগলিয়ে কথা বলে মাহবুব। অন্যরা ওর মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। ও থামলে দপ্তরি বলে, তুমি চা খাবে বাবা?

চা? হ্যাঁ চা খাবো। সবাই খাবে। বাসন্তীও খাবে।

মাহবুব ঘরে যায়। বুড়ি বলে, বুঝলি আসমা ও একটা পাগল ছেলে। একবার এই গাঁয়ে ছবি তুলতে এসে তোর চাচার সঙ্গে এ বাড়িতে এলো। বললো, চাচী আমি তোমার সঙ্গে ক'দিন থাকবো। আমি বললাম, ভালোই তো, থাক। ও তো মহাখুশি। সাত দিনের জায়গায় পনেরো দিন থাকলো। দু'বছর ধরে বছরে একবার আসেই।

দপ্তরি একগাল হেসে বলে, ও এলে মনে হয় বাড়িটায় বুঝি প্রাণ ফিরে এলো। ও আমাদেরকে মাতিয়ে রাখে।

এতকিছু শুনে আসমার মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে। দপ্তরির একটা কাজ আছে, তাই অভাব নেই। কাজ থাকলে মানুষ অনেক সুখে থাকে। বুড়ি চা বানাতে গেছে। দপ্তরি সঙ্গে গেলো। দু'জনের কী যে ভাব! দু'জনকে দেখে ওর আশ মেটে না। এই মরা কার্তিকের দেশে ওরা খানিকটা অন্যরকম– খানিকটা আলাদা করে সংসার সাজিয়েছে। বুড়ি জাল বোনে, তার থেকে ভালো একটা আয় হয়। খেয়েপরে কী সুন্দর আছে ওরা।

মাহবুব এসে ওর পাশে বসে। বলে, কি ভাবছো বাসন্তী?

এদের এই সংসারের কথা।

বাহ্, তুমি দারুণ মেয়ে তো। আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝে গেছি যে এই ছিমছাম সংসার তোমার মন কেড়েছে। তুমি নিজের জন্যও এমন কিছু ভাবছো।

ওমা, আপনি তো বেশ অনেককিছু বুঝতে পারেন।

হা-হা করে হাসে মাহবুব। বলে, আমি ঠিক করেছি তোমার ছবি তুলবো, অনেক ছবি।

কি হবে ছবি দিয়ে?

এক্সিবিশন করবো। ছবি তুলতে তুমি রাজি তো বাসন্তী?

আমার নাম বাসন্তী না, আসমা।

তোমাকে আমার বাসন্তী ডাকতে ভালো লাগছে। তোমার শরীরটা বসন্তকাল। বিশ্বাস করো তোমার দিকে তাকালে মনে হয় আমার দু'কান ভরে কোকিল ডাকছে। বনে বনে কত রঙিন ফুল। মৌমাছি মধু নিচ্ছে। তুমি আমার কাছে এমন বসন্তকাল বাসন্তী।

আমি তো আসমা।

না বাসন্তী, বাসন্তী। তোমার দু'চোখে আশ্চর্য আভা, যেন সরষে ফুলের মায়া। আশ্চর্য– আরো আশ্চর্য– থেমে যায় মাহবুব।

আসমা হাসতে হাসতে বলে, কি?

আমি বলতে পারছি না।

আসমা খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে। হাসি থামলে মাহবুব বলে, চলো ছবি তুলি?

কি করবেন ছবি দিয়ে?

পত্রিকায় ছাপাবো। আমার মাথায় একটা দারুণ প্ল্যান এসেছে।

পত্রিকায় ছাপলে কি হবে? রিলিফ পাবেন?

BanglaBook.org

রিলিফ?

হ্যাঁ, আমার ভীষণ খিচুড়ির দরকার। খিচুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

মাহবুব স্তব্ধ হয়ে যায়। যে কথাগুলো এ এতক্ষণ ধরে বলেছে তার কোনোটাই আসমার হৃদয়ে পৌঁছুয়নি, কিংবা পৌঁছলেও তা ঝেড়ে ফেলেছে অথবা এর কোনোটাই ও বিশ্বাস করে না। আসমা আগ্রহ নিয়ে মাহবুবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন মাহবুব ওকে আশার কথা শোনাবে– বলবে, চলো দু'মালসা খিচুড়ি জোগাড় করে দিচ্ছি।

মাহবুব তখন ধীর শান্তকণ্ঠে বলে, তুমি এই জাল পরে একটি ছবি তুললে তোমাকে আমি পাঁচশ টাকা দেবো বাসন্তী।

পাঁচশ টাকা? বাসন্তীর চোখ কপালে ওঠে। তারপর হেসে বলে, এ আর এমন কঠিন কি কাজ? ময়নার মাকে আমি জাল পরতে দেখেছি। সিধুর মা তো কোমরের চারপাশে কলাপাতা বেড় দিয়ে রাখে। মা বলেছে, আমার জন্মের সময় ভীষণ আকাল হয়েছিলো। ন্যাংটো মেয়েমানুষ রাস্তায় পড়ে মরে ছিলো। আমি তো তবু জাল পরবো। ক্ষতি কী? আমি রাজি। এই মরা কার্তিকের দেশে আমাদের জাল পরতে হয়, ছালা পরতে হয়– আগুনের ধারে বসে শীত তাড়াতে হয়– আমাদের কি দুঃখের শেষ আছে? মা বলতো নানীর খুব কষ্টের জীবন ছিলো, মা বলেছে তারও খুব কষ্টের জীবন, আমি তো দেখতে পাই আমারও খুব কষ্টের জীবন!

হাসতে হাসতে কেমন বেসামাল হয়ে যায় আসমা। মাহবুব দেখে যাকে বসন্তকাল বলে ভেবেছিলো সে আসলে বসন্ত নয়, ও মরা কার্তিক– ওর দু'চোখে হলুদের যে আভা সেটা সরষের নয়, সেটা জণ্ডিসের। তবু এটাকে নিয়েই হবে ওর রাজনীতি।

কৈ জাল দেন, আমি পরি। এটা তো আমার একটা কাজ, বড় রোজগার। আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবেই জালটা পরবো।

মাহবুব ঘর থেকে জাল নিয়ে আসে। এই জালটা ও বুড়ির কাছ থেকে কিনেছে। ওর এক্সিবিশনের সময় এটা ও পেছনে আটকে দিয়ে এর ওপর ছবিগুলো টাঙাবে বলে ঠিক করেছে। একটা নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড হবে।

আসমা শাড়ি ব্লাউজ খুলে চমৎকার করে জালটা শরীরে পেঁচিয়ে আসে, যেন ও এক আদিম নারী, ফল কুড়োতে কুড়োতে বনপথ দিয়ে হেঁটে এসেছে।

বুড়ি চা বানিয়ে এনে মাহবুবের হাতে দিয়েছে। ওরা তিনজনে বিমুগ্ধ তাকিয়ে থাকে আসমার দিকে। কিন্তু আসমার মুখে হাসি নেই– ওকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ও ম্লান কণ্ঠে বলে, কোথায় ছবি তুলবেন? বারান্দায় না উঠোনে?

মাহবুব চা খেতে পারে না। কাপটা বুড়ির হাতে দিয়ে বলে, সবখানে। অনেক ছবি তুলবো।

ছবি তুলে টাকা নিয়ে বাজারে আসে আসমা। কেনাকাটা করে। চারদিকে তাকায়, বাবাকে পেলে ভালো হয়। এত বোঝা কিভাবে টেনে নিয়ে যাবে? এতগুলো মাল একসঙ্গে কেনা ঠিক হয়নি। এই আকালের সময় মানুষ তো লুটও করে নিয়ে যেতে পারে? মানুষ তো জানবে না যে কত কষ্ট হয়েছে এই টাকাটা উপার্জন করতে। টাকা উপার্জন করা ভীষণ কঠিন কাজ। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও সওদাভর্তি বস্তাটা আঁকড়ে ধরে। ওর চারদিকে বাবাকে দেখতে পায় না।

প্রদীপ্ত সুখী আসমাকে দেখলো।

সেই বিকেলে মাহবুব ওকে বললো, মেয়েটা দারুণ না? তুমি তো জানো না প্রদীপ্ত আমি এক বাসন্তীর ছবি তুলেছিলাম, পাট ক্ষেতে ডেকে নিয়ে জাল পরিয়ে। মাত্র পঞ্চাশ

BanglaBook.org

টাকা দিয়েছিলাম। ছবিটা চারদিকে হৈ-চৈ ফেলে দিলো। কী ভীষণ সরল ছিলো মেয়েটা, কথা বলতে পারতো না।

কাজটা কি ভালো করেছিলে মাহবুব?

ভালোমন্দ বুঝি না। সরকারের গালে ওই ছবি এক দারুণ চপেটাঘাত। এখন আর একটা এক্সিবিশন করবো। দেখবে দারুণ হৈ-চৈ হবে। এই মেয়েটা তার হিরোইন।

একটি মেয়ের দারিদ্র্যের সুযোগে কেন তার নারীত্বের এই অবমাননা? একটি স্বাধীন দেশে এই কি তার প্রাপ্য ছিলো?

লে বাব্বা, এ যে দেখছি আর এক মার্টিন লুথার কিং। দারুণ বক্তৃতা করতে পারো তো।

একটাই শব্দ শিখেছো দারুণ, আর কিছু জানো না।

বাড়াবাড়ি ক'রো না। ভালো হবে না কিন্তু। অস্ত্র জমা দেইনি। টেসে যাবে, টেরও পাবে না।

মাহবুব ধীর পায়ে অন্য দিকে চলে যায়। প্রদীপ্ত মেজাজ খারাপ করে চায়ের দোকানে এসে বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাহবুব ওর ব্যাচ মেট ছিলো। নিরীহ গোবেচারা, এখন শাণিত, কেননা অস্ত্রধারী। চা খাবার ইচ্ছে থাকলেও ও বসতে পারে না। ছটফটিয়ে উঠে যায়।

তখন বিকেল গড়িয়েছে। মানুষের ভিড় কম। বস্তাটা মাথায় নিয়ে পথে নামে আসমা। এতক্ষণ দোকানে বসে ওকে দেখছিলো রুস্তম। আসমা পথে নামতে ওর পিছু নেয়। বাজার পেরিয়ে মাঠে নামলে এগিয়ে গিয়ে আসমাকে বলে, আমাকে বস্তাটা দাও। তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

আসমা ওর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না। কোথাও কি দেখেছে? তারপর করুণ মুখে বলে, অনেক কষ্ট হয়েছে এগুলো কিনতে।

রুস্তম হেসে ফেলে। বলে, আমি ডাকাত না। এই বস্তা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে তাই বলছিলাম। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি গজঘণ্টা গাঁয়ের রুস্তম।

গজঘণ্টা? আসমা বিস্ময়ে তাকায়, ওহ্ রুস্তম ভাই। এখন চিনতে পেরেছি। ঐ গাঁয়ে আমি স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিলাম।

আমি জানি। তোমার শ্বশুরবাড়ির ওরা মানুষ না, খচ্চর। দাও, বস্তাটা আমার কাছে দাও।

এতক্ষণে আসমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বস্তাটা রুস্তমের মাথায় উঠিয়ে দেয়। দু'জনে গল্প করতে করতে পথ হাঁটে। বেশির ভাগই গজঘণ্টা গাঁয়ে আসমার শ্বশুরবাড়ির গল্প। অনেকদিন পর আসমা মন খুলে কথা বলতে পারছে– ওদের গালি দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে পারছে। ওর বুকের ভেতর থেকে জমে থাকা কষ্টটা বাতাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আসমা গান গাইতে শুরু করে। গান থেমে গেলে রুস্তম বলে, তোমার গলাটা খুব মিঠা।

আজ আমার বেশ আনন্দ হচ্ছে। আপনার বাড়িতে কে আছে রুস্তম ভাই?

তুমি ঐ গাঁ ছেড়ে চলে আসার পর বিয়ে করেছিলাম। মাস ছয়েক পর বউ আর একজনের সঙ্গে পালিয়েছে।

আর কেউ নেই?

না।

রাঁধে কে?

নিজেই কোনোরকমে দিন চালাই।

BanglaBook.org

হেসে গড়িয়ে পড়ে আসমা।

হাসছো কেন?

ভালো লাগছে তাই।

ওর কথা শুনে খুশি হয় রুস্তম। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দু'দিন ধরে সদরে তোমাকে দেখে কথা বলার জন্য মন চাইছিলো।

ওমা, আমার ভাগ্য! প্রথমে তো ভেবেছিলাম ডাকাত বুঝি। এই আকালের সময় এতগুলো জিনিস সঙ্গে।

আসমা হাসতেই থাকে। রুস্তমও হাসে। তারপর নিচু স্বরে বলে, যদি ডাকাত হই?

মানে? ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। আসমার বুক শুকিয়ে যায়। সত্যি কি লোকটা জিনিসগুলো নিয়ে পালাবে?

রুস্তম খুব আন্তরিক কণ্ঠে বলে, আমার ইচ্ছা আবার বিয়ে করি।

ওমা, ভালোই তো। মেয়ের কি অভাব? তার জন্য ডাকাত হতে হবে কেন?

আসমা আমি তোমাকে–

বুঝেছি। আসমা গম্ভীর হয়ে বলে। ওর ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। এখন কি সময় হয়েছে একজন ভালোমানুষ ওর জীবনে আসার? কেমন হবে সে জীবনের ছবি? অনেকটা পথ কেউ কোনো কথা না বলে হেঁটে আসে, প্রায় বাড়ির কাছাকাছি। আসমার ভেতরে প্রচণ্ড অস্থিরতা– কিভাবে বলবে, কেমন করে বলবে রুস্তমকে?

একসময় রুস্তম দাঁড়িয়ে পড়ে, আমি একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

জানি। আসমা ওর দিকে তাকাতে পারে না। এখন বলবেন?

না, কালকে।

কখন? কোথায়?

তুমিই বলো না কোথায় দেখা হবে?

ঐ মাঠের ধারে, কড়ই গাছের নিচে। কাল বিকেলে।

আসমা সম্মতির মাথা নাড়ে। রুস্তম বস্তা দিয়ে চলে যায়। আসমা দাঁড়িয়ে থাকে– বস্তা ওঠাতে পারে না– দাঁড়িয়ে থাকে– বাড়িতে ঢুকতে পারে না– দাঁড়িয়ে থাকে– খুশি চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু? মেঘ ঘনিয়ে ওঠে ওর চিন্তায়। ওর শরীর বেচার কথা রুস্তমকে বলা উচিত– বিয়ে যদি করতেই হয় সব খোলাসা করে নেয়া ভালো– কোনোকিছু লুকিয়ে নয়, কোনো সত্য আড়াল করে নয়। পারবে তো বলতে? হ্যাঁ পারবো, পারবো। সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সাহস বেড়ে যায় ওর। এক ঝটকায় বস্তাটা মাথায় তুলে নিলে মনে হয় কোনো ওজন নেই এবং বুঝতে পারে পায়ের গতিতে হরিণ এসে মাথা কুটছে। ওর সামনে শালবীথি ছাওয়া লম্বা পথ– শুধু দৌড় দিলেই হয়, কোনোকিছু আটকাবে না।

রহিমা ওর চক্‌চকে মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে– অজরা খাতুন চমকে ওঠে মেয়েকে দেখে এবং সারাদিনের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেলোয়ার ভাবে এ কেমন ঘর আলো করা মেয়ে আজ ওর ঘরে।

রাতে খেয়েদেয়ে শুতে এলে রহিমা জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে বুবু?

কিছু হয়নি।

হয়েছে। বলো কি হয়েছে? লুকাচ্ছো কেন?

বলার মতো এখনো কিছু হয়নি।

কবে বলবে?

পরশু।

BanglaBook.org

ঠিক তো?

ঠিক। ঘুমো এখন।

বুবুর কি হয়েছে এই চিন্তায় ঘুম আসে না রহিমার। আসমা নিশ্চিত নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকদিন পর স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে গেলে ওর ভীষণ আরাম লাগে– ক্লান্তি নেই, জড়তা নেই– স্নায়ুর ওপর চাপ নেই। ভোররাত পর্যন্ত বিছানায় উসখুস করে রহিমা। দু'একবার আসমাকে ঠেলা দিয়ে বুঝতে পারে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন– আগের মতো পাশে ফিরে অস্ফুট স্বরে বলে না, রহিমা কেন বিরক্ত করছিস। ওর বুক হিংসেয় জ্বলে যায়।

পরদিন কড়ুই গাছের নিচে অপেক্ষা করে রুস্তম। দূর থেকে ওকে দেখতে পায় আসমা। আজ আর খিচুড়ির ভাবনা নয়– মরা কার্তিকের সুনসান সময়কে অতিক্রম করার জন্য দীর্ঘপথ হেঁটে যাচ্ছে ও। যত এগিয়ে যায় ততোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রুস্তমের লম্বা-চওড়া শরীর– একজন মানুষের অবয়ব। হাত বাড়ালেই হাত ধরবে মানুষটি– বলবে, চলো যাই গরুগুলো গোয়ালে অপেক্ষা করছে, হাঁস-মুরগিগুলোকে খুদকুঁড়ো দিতে হবে আর আমার মায়ের ঢেঁকিটা একটা পায়ের চাপের জন্য নির্জীব পড়ে আছে। তুমি এলে ঢেঁকিতে পার পড়বে– উনুনে কাঠ দেয়া হবে– পুকুরের মাছগুলো ঘাটের কাছে ছুটে আসবে বাসি ভাত-তরকারির আশায়। আসমার মন ছটফটিয়ে ওঠে, ও কি সত্যি কথা বলবে? যদি এই ছবিটি হারিয়ে যায়? না, ওকে সত্যি কথাই বলতে হবে। ভয় কীসের? ছবি ছিঁড়ে গেলে আগেই ছিঁড়ে যাক।

ওকে দেখে আগ বাড়িয়ে এসে দু'হাত ধরে রুস্তম, তুমি তো আমার প্রস্তাবে রাজি আসমা?

আমার যে একটা কথা আছে।

কথা? বলো।

ঠিকমতো শুনবেন তো?

হ্যাঁ, শুনবো। শোনার জন্যই তো বসে আছি। চলো, ঐদিকে গিয়ে বসি।

যেতে যেতে রুস্তম বলে, কি আর নতুন কথা বলবে? হয়তো তোমার আর কাউকে পছন্দ আছে, তাই তো?

আসমা মাথা ঝাঁকায়, না।

তাহলে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে, একদিন আমার শরীর বিক্রি করেছিলাম। সে টাকায় চাল-ডাল-মাছ-মুরগি-তরিতরকারি কত কি, কত কি–

রুস্তম ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, সেদিন সবাই পেটপুরে খেতে পেয়েছিলো।

হ্যাঁ।

হা-হা করে হেসে ওঠে রুস্তম। তুমি শরীর বিক্রি করেছিলে? তাতে কি। আমিও তো মেয়েদের শরীর চিনেছি। কতবার–।

ওর চক্‌চকে দৃষ্টির ওপর নেমে আসে রুস্তমের গভীরতম দীর্ঘ স্পর্শ– আসমার মনে হয় এমন নিবিড় আনন্দের জন্য ওর দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিলো।

আসমার গল্পের শেষ কথাটা শুনে প্রদীপ্ত বলে, তুমি সুখী হও আসমা। তোমার কথা আমি ভুলবো না। আমি কাল চলে যাবো।

সব দেখেশুনে ঢাকা ফেরার সময় প্রদীপ্তর মনে হলো সাধারণ মানুষের প্রতি সরকার এবং বিরোধী দল কেউই আন্তরিক নয়। ওরা নোংরা রাজনীতিকে ন্যাংটো শরীরে জালের মতো জড়ায়। জালের ফুটোয় অক্ত ঢাকে না। তবু ওটা ওদের পরতেই হয়।

BanglaBook.org

১৩

রংপর থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো প্রদীপ্তর। সারাদিনের রাস্তার ধকলে ভীষণ ক্লান্তি লাগছিলো। ঘরে ঢুকতেই পুষ্পিতা কেঁদেকেটে বললো, তুই যাবার পর থেকেই প্রতীক বাড়ি আসছে না। কোনো খবরও দেয়নি।

মঞ্জুলিকা এক কাপ চা এনে দিলো, শুকনো মুখ, চোখের নিচে কালি। বিষণ্ন দৃষ্টি। প্রদীপ্তকে বললো, দু'দিন ধরে অজেয়র জ্বর। রাতে একটুও ঘুমোয় না। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। একটু আগে ঘুমুলো। মাঝরাতে উঠে বসে থাকবে।

ডাক্তার দেখিয়েছো?

হ্যাঁ। ওষুধ দিয়েছে। জ্বর নামছে না।

ঠিক আছে কাল ওকে ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য নিয়ে যাবো।

চা খেয়ে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলো, জিতু তোমাকে কিছু বলেছে?

না। মঞ্জুলিকা একটু থেমে বললো, ও রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়তে পারে।

ধরা পড়লে ওর দলের কোনো না কোনো কর্মী নিশ্চয় আমাদের খবর দিতো।

পুষ্পিতা এসে দরজায় দাঁড়ায়। বলে, জিতুর কি হতে পারে তুই তো কিছু বললি না দীপু। ও কি আমার ওপর রাগ করেছে?

তোমার ওপর রাগ করবে কেন? নিশ্চয় পলাতক আছে। জাসদ যে ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেছে হয়তো পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। আমি কালকে খোঁজ করবো মা। তুমি কিছু ভেবো না।

মাকে তো রাজনীতির এতকথা বোঝানো যায় না। মাকে যদি বলা হয় জিতু যে পার্টি করে সে পার্টি এখন সরকারের জন্য এক ভয়ানক হুমকি, মা কি বলবে? মা'র কিছু বলার নেই। ও তো জানে মা কোনোদিন রাজনীতি করেনি, কিন্তু সবসময় রাজনীতির হাতে ইঁদুর হয়েছে, পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটিয়েছে। জনগণের কাছে এখন জাসদ বৃহত্তম রাজনৈতিক দল– ওদের পার্টির পত্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে অনবরত বিষোদগার করছে। ওরা ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেছে। সরকারের মতে জাসদ ধ্বংসযজ্ঞে নিয়োজিত রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ বলছে, জাসদ চীন-মার্কিনের দালাল। স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু। জাসদ বলে, যুদ্ধফেরত তরুণদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেনি আওয়ামী লীগ; বিপরীতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং দলতন্ত্র কায়েম করেছে। তাই শ্রেণী সংগ্রাম এবং সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অসম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণতা দান করতে হবে।

ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে জাসদ কর্মীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়। দু'পক্ষই গুলি বিনিময় করে। শেষ পর্যন্ত রক্ষী বাহিনী আসে। নিহত হয় অনেকে, আহত হয় শতাধিক এবং গ্রেফতার করা হয় জাসদের কর্মীদের। হয়তো ওর মধ্যে প্রতীক থাকতে পারে।

পরদিন পার্টি অফিসে গিয়ে ও জানলো প্রতীক হাজতে, আহত হয়েছে, এখন জেলের হাসপাতালে। সুস্থ হওয়ার আগে দেখা হবে না। যত নির্মমই হোক মাকে প্রতীকের কথা বলতে হলো। পুষ্পিতা নির্বাক হয়ে থাকলো দু'দিন। তৃতীয় দিন ভোরবেলা পুষ্পিতাকে বাড়িতে পাওয়া গেলো না। মঞ্জুলিকা উদ্বিগ্ন মুখে বললো, মাকে পাওয়া যাচ্ছ না। এত ভোরবেলা মা কোথায় গেলো?

ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে মশারির স্ট্যান্ডের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে গেলো প্রদীপ্তর। কপালে হাত বুলাতেই বুঝলো যে ফুলে গেছে, তবু দাঁড়াতে পারলো না। হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি

BanglaBook.org

দিয়ে নেমে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। কোনদিকে যাবে? কোনদিকে গেলে পুষ্পিতাকে পাওয়া যাবে? কপালের ফুলে ওঠা ঢিবির মতো জায়গাটা চিনচিন করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়লো কাল রাতে পুষ্পিতা আলী আহমদের ছবি নিয়ে ঘুমিয়েছিলো। ও রিকশা নিয়ে রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে এলো। ইটখোলার ওপর চুপচাপ বসে আছে পুষ্পিতা। চারদিকে ঝকঝকে রোদ– খোলা প্রান্তরে বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে এই বধ্যভূমিকে অলৌকিক করে তুলেছে। সামনের জলাভূমিতে বাতাসের মৃদু ধাক্কায় তরঙ্গ উঠলে মনে হয় কারা যেন কথা বলছে– কাছে এবং দূরে দাঁড়িয়ে। ও পুষ্পিতাকে ধরে বলে, মা তুমি এখানে কিভাবে এলে?

তুই আমার কাছে বোস দীপু। দেখ আলোর মাথায় চিকচিক্ করছে তোর বাবার চুল।

বাবার লাশ আমরা এখানে খুঁজে পাইনি মা।

তোরা টের পাসনি, আমি পেয়েছি। আমি জানি এখানেই আছে। তোর বাবার লাশের জন্য আমার তো একটি জায়গা দরকার দীপু।

মা বাড়ি চলো।

বাড়ি? বাড়ি কোথায় যে যাবো? সব বধ্যভূমি। তোরা তো কখনো আমাকে এখানে আনিসনি। তাই আমি নিজে নিজে দেখতে এসেছি যে বধ্যভূমি কেমন।

মা, তোমার বাড়ি আছে। অজেয় আছে সে বাড়িতে। চলো, ওঠো।

বাড়িতে গিয়ে কি জিতুকে দেখতে পাবো?

আজ পাবে না। ক'দিন পরই পাবে। ও তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারবে না মা। চলো।

আর একটু বসি। তুইও বোস আমার কাছে।

মায়ের পাশে বসলে প্রদীপ্তর মনে হয় খোলা মাঠের রোদ এবং আলো কমে যাচ্ছে– এক বিশাল ছায়া এগিয়ে আসছে। সে ছায়ার দু'টো পা দেখা যায় শুধু। ও শক্ত মুঠোয় পুষ্পিতার হাত চেপে ধরে। পুষ্পিতা ওকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস না করে বলে, ভয় কীসের, আমি তো আছি। ছোট্ট দীপু ভূতের ভয়ে কাতর হলে পুষ্পিতা তো ওকে এভাবেই অভয় দিতো।

আবার নাইট ডিউটি পড়েছে ওর। রাত বাড়লে ওর বুকের ভেতর গুমগুম শব্দ হয়। ও বুঝতে পারে কিছু একটা ভাঙছে, হয়তো নদী– মানুষের ঘরগেরস্থি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নাকি কোনো ভূমিকম্পে কেঁপে যাচ্ছে সমগ্র দেশ? ও চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে শক্ত হাতে চেয়ারের হাতল ধরে রাখে। মঞ্জুলিকা বলে, ডাক্তার দেখাও, স্নায়বিক দুর্বলতা। প্রদীপ্তর মনে হয় ডাক্তার এর কারণ খুঁজে পাবে না। ও কিছু লিখতে পারে না। লিখতে বসলে চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। পত্রিকা টেনে পড়তে থাকে। গতবছর জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে বাংলাদেশকে সাহায্য করার আবেদন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শরতকালীন শস্য ওঠার আগে দেশের খাদ্য ঘাটতির মোকাবেলা করতে হবে। নইলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে বাংলাদেশে। শোনা যায় বাংলাদেশের জন্য পাঠানো গমের জাহাজ মাঝ সমুদ্র থেকে ফেরত নিয়ে গেছে আমেরিকা। হায় সোনালি গম। ওদের উদ্বৃত্ত গম ওরা ফেলে দেয় সমুদ্রে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের বাঁচা-মরায় ওদের কি এসে যায়। যারা নিজেদের ভার নিজেরা বহন করতে পারে না তারা তো অন্যের চোখে এমনই নেড়ি কুকুর। ক্লান্তিতে, অবসাদে ওর অবচেতনে একজন নিঃসঙ্গ মানুষকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও। মনে হয় তাঁর চারপাশের দুয়ারগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি সামনে এগুতে পারছেন না,

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছেন আগুন, যেতে হলে ঐ আগুন মাড়িয়ে যেতে হবে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর কাঁধে তাঁর দল বোঝার মতো আটকে আছে। সবাই মিলে পিছু টেনেই ধরতে চাচ্ছে। দলের বাইরের সমস্যার সঙ্গে দলের ভেতরের সমস্যাও প্রবল হয়ে উঠেছে। চারদিকের এত সমস্যা তাঁকে একা সামলাতে হবে। তিনি এখন কি করবেন? একটি বিশাল পরিবর্তন না হলে এই পরিস্থিতি সামলানো দায়। প্রদীপ্তর মনে হয় ও সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলছেন, স্বাধীনতার জন্য তুমি কত মূল্য দিয়েছো তা আমি জানি। আমি জানি–। তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। তাঁর দু'চোখে জল!

দিন গড়ালো, কিন্তু প্রতীকের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলো না। ওর পিঠে গুলি লেগেছে, অপারেশন হয়েছে। কতদিন জেল হাসপাতালে থাকতে হবে তা নিশ্চিত নয়। মঞ্জুলিকা আর একটি টিউশনি নিয়েছে। এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুষ্পিতার ভরসা সোনাই আর অজেয়। এদেরও দিন কাটছে, এরা বড় হচ্ছে। একদিন মঞ্জুলিকা বললো, আমাদের এ বাড়িটা ছেড়ে দেয়া উচিত। প্রদীপ্ত খানিকটা অবাক হয়ে গেলো, এখনই কেন ছাড়বো? শহীদ পরিবার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো আমাদের থাকতে দিয়েছে। যখন ছাড়তে বলবে ছেড়ে দেবো।

মঞ্জুলিকা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো, জিতু বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী সে কারণেই ছেড়ে দেয়া উচিত।

ও। প্রদীপ্ত শূন্যদৃষ্টিতে মঞ্জুলিকার দিকে তাকায়।

ওর কথা শুনে পুষ্পিতা বললো, যতদিন থাকা যায় আমি এখানেই থাকবো। তোমাদের বাবার স্মৃতি রেখে আমি যেতে চাই না।

মঞ্জুলিকার মনে হলো কারা বুঝি পুষ্পিতার চোখ বেঁধে ফেলেছে, এখনই একটি বুলেট ছুটে আসবে। তবু ওর সহানুভূতি জাগলো না। দুঃখ শব্দটাকে ও বাতিল করে দিয়েছে, ওটা ওকে স্পর্শ করে না। ওর রাগ হলো। কিন্তু পুষ্পিতার এইসব বাজে দুঃখময় প্যানপেনির ওপর ও কিছু বলতে পারলো না। প্রদীপ্তর সঙ্গে যা করা যায়, পুষ্পিতার সঙ্গে তা করা যায় না। এটুকু ভালোমানুষী এখনো অবশিষ্ট আছে। ও উঠে চলে গেলো। ওর মুখ দেখে প্রদীপ্ত এবং পুষ্পিতা দু'জনেই বুঝলো যে ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। পুষ্পিতার মনে হলো, চোখের সামনে কেমন বদলে গেলো মেয়েটি– সারাক্ষণ খিটখিটে মেজাজ নিয়ে তেতে থাকে। প্রদীপ্তর মনে হলো, একজীবন তো বেশি দীর্ঘ নয়। এক জীবনে কি মঞ্জুলিকাকে আবার আগের মতো করে পাওয়া যাবে? নাকি শেষ হয়ে গেলো জীবনের সোনালি সময়? প্রদীপ্ত উঠতে পারে না, পুষ্পিতা শোবার ঘরে গেছে। একটুপর ও শুনতে পায় মঞ্জুলিকার কণ্ঠ– আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে– অজেয়কে বুকে নিয়ে ও সুর করে গাইছে। সবার জীবনেই এমন শৈশব থাকে– এই শৈশবের কথা ভেবে একটুপর মঞ্জুলিকা চোখের জল মুছবে। কত অজস্র দিন প্রদীপ্তকে এমন দৃশ্য দেখতে হয়েছে। ও ভয়ে মঞ্জুলিকার কাছে যেতে পারে না। ও জানে না কাছে গিয়ে কি বলবে মঞ্জুলিকাকে? যুদ্ধ ওকে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। শুধু ওকে নয় বদলে দিয়েছে এতদিনকার চলে আসা ধারণা, মূল্যবোধ। এই দ্রুত ধাবমান সময়কে ধরতে পারলো না রাতের রেলগাড়ি– আলোর দিকে না গিয়ে চলে গেলো অন্ধকারে। এখন রাত এবং দিনের বিশাল পার্থক্য, সময় আর যেতে চায় না। প্রদীপ্ত মনপ্রাণ দিয়ে মঞ্জুলিকার গুণগুণ ধ্বনি শোনে, যেন এক শ্যামল সময় ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ওর ভেতরটা ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ ও এই ধুয়ে রাখার অনুভবকে ধরে রাখতে পারবে?

দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। সরকার বলেছে 'দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ

BanglaBook.org

বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর হুমকি প্রদান করছে। এসব ভাবলে প্রদীপ্তর ডান হাত বাম চোখ এবং বাম ঘাড়ে ওপর উঠে আসে– ও যুদ্ধের অনুভবকে গাঢ় করে রাখতে চায়। যুদ্ধ যেন নিজের শরীরের সঙ্গে মিশে আছে, ওর কাছে যুদ্ধ কোনো আলাদা অস্তিত্ব নয়। কিন্তু যেভাবে বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত সময় গড়ালো এ সময় এক ভিন্ন স্রোতে চলে যাচ্ছে। একে রুখতে হবে। তিনিই পারবেন। মানুষকে বাদ দিয়ে তিনি রাজনীতি করেননি। তিনি মানুষের ঘরের খবর রাখেন, মনের খবর রাখেন। মানুষকে বাদ দিলে তিনি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতেন না। আর এই মানুষের ভেতর থেকে জেগে উঠেছে জাতীয়তাবাদের চেতনা, এই চেতনা অর্জন করেছে স্বাধীনতা। তিনি সাম্প্রদায়িকতা উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন সমাজতন্ত্র। তাঁকে তো কাঁটা বিছানো পথে হাঁটতেই হবে, দেখতে হবে তাঁর দিকে উঁচিয়ে আছে বন্দুকের নল। এবং তিনি সাহসী মানুষ, সেই নলের সীমানায় পৌঁছে যাবেন সাধারণ মানুষের জন্যই। আর কি করবেন তিনি? আর কত? প্রদীপ্ত নিজের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করে। ও উঁচু গলায় মঞ্জুলিকাকে ডাকে। মঞ্জুলিকা চমকে ওঠে, কেমন অন্যরকম লাগছে প্রদীপ্তর কণ্ঠ। ওর শরীর ঝাঁকিয়ে দেয় সে কণ্ঠ। ও রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে, কি হয়েছে?

প্রদীপ্ত ওর হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে বলে, আমি তোমাকে হারাতে চাই না মঞ্জুলিকা।

কি বলছো?

আমি তোমাকে হারিয়েছি মঞ্জুলিকা। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে পেতে চাই।

মঞ্জুলিকা বিষাদ-কণ্ঠে বলে, সময়টা ভীষণ খারাপ। আমার স্বস্তি নেই। ব্যক্তিগত জীবনও নষ্ট হয়েছে।

সময়টা খারাপ নয়, সময় আমরাই তৈরি করবো। সময়টা আমাদের মঞ্জুলিকা।

প্রদীপ্তর কণ্ঠের প্রবল আবেগ ওকে শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। মুহূর্তে অনুভব করে, এই কাছের মানুষটিকে ফেলে ও কেন উল্টোপথে হেঁটে যাচ্ছে? কি লাভ জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে? ও দু'হাতে প্রদীপ্তর মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে, দীপ, আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই।

সেদিন দু'জনে একসঙ্গে বাইরে খেতে গেলো, স্বাধীনতার পর এই প্রথম। প্রদীপ্ত ওর জন্য হালকা নীল রঙের সুতির শাড়ি কিনলো। ফেরার পথে রমনা পার্ক থেকে একগাদা ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরলো দু'জনে। মঞ্জুলিকা ফুল দিয়ে বিছানা সাজালো। সারারাত দু'জন এক গভীর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলো। সকালে মঞ্জুলিকা লাজুক হেসে বললো, রাতে মনে হয়েছিলো আমার নতুন বাসর হলো। বুকের ভেতরের কষ্টগুলো আমি একপাশে সরাতে পেরেছি দীপ। এতদিন তুমি আমাকে কেন এমন করে বোঝোনি? প্রদীপ্ত এক দীর্ঘ চুমুর ভেতর দিয়ে ওর প্রশ্নের উত্তর দিলো। ও মঞ্জুলিকাকে বলতে পারলো না যে আমার ভেতরও কষ্ট ছিলো, তাই আমি তোমাকে বোঝার চেষ্টা করিনি। কাল আমি নিজেকেও বুঝতে পেরেছি, এখন আমারও কোনো কষ্ট নেই।

এক বড় পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পুরনো কাঠামো ভেঙে এগিয়ে যাবার প্রেরণায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করাই ছিলো তাঁর সরকার প্রণীত সংবিধানের মুখ্য বিষয়। তিনি তাঁর প্রথম বিপ্লবের ডাকে অর্জন করেছেন স্বাধীনতা। জাতীয় সংসদে চতুর্থ

BanglaBook.org

সংশোধনী বিল গৃহীত হবার পর দীর্ঘ ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। সাংবাদিকদের গ্যালারিতে প্রদীপ্ত। চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। প্রদীপ্তর কেবলই মঞ্জুলিকার মুখ মনে পড়ে– তিনটি বছর ও নিদারুণ কষ্টের দিন কাটিয়েছে, হয়তো এ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষগুলো স্বস্তি খুঁজে পাবে। বঙ্গবন্ধু বলছেন, বর্তমানে দেশে যে নৈরাজ্য এবং অরাজকতার আস্তাকুঁড় তৈরি হয়েছে তা আর সহ্য করার পর্যায়ে নেই। দেশের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে পারেনি, তাদের কল্যাণ বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রদীপ্তর মনে হলো বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ বুঝি ভেঙে যাচ্ছে, যে বজ্রকণ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলো এ দেশের মানুষকে, সে কণ্ঠ আজ ভারাক্রান্ত, উদাত্ত নয়। তিনি বলছেন, নিদারুণ যন্ত্রণার দাহ তার বুকে। প্রবল এক দুঃখ ভারাক্রান্ত পরিস্থিতিতে তিনি সংবিধানের পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছেন। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা তাঁর সামনে নেই। তিনি আরো বলেন, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, শোষিতের সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি অনুভব করেছেন সংবিধানের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি লিখিত ভাষণ দিচ্ছিলেন না, তবু তাঁর বক্তব্য ছিলো সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। একইসঙ্গে প্রচণ্ডরকমের আবেগতাড়িত, মনে হচ্ছিলো যন্ত্রণায়, বেদনায় ক্ষতবিক্ষত তাঁর ভেতরটা। প্রদীপ্তর মনে হয় তিন বছর প্রশাসনে থেকে তিনি দেখেছেন কী ভয়াবহ আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, কী তিক্ত তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। বক্তৃতার শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ থেকে আবেগ কমে যেতে থাকে, প্রকাশ পেতে থাকে বিরক্তি। যেন নিজের চামড়া নিজেই তুলে ফেলবেন। তিক্ত সমালোচনায় ধুয়ে দিচ্ছেন প্রচলিত ব্যবস্থা, প্রশাসন এবং পারিপার্শ্বিক। প্রদীপ্তর কষ্ট হয়। এত বিরক্তি এত তিক্ততার বোঝা নিয়ে একজন মানুষ কতদূর যেতে পারেন? কী নিঃস্ব, কী অসহায়, কী যন্ত্রণাদগ্ধ দেখাচ্ছিলো তাঁকে। প্রদীপ্তর ভেতরটা হিম হতে থাকে। ও যেন চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে।

অনেকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে প্রেসক্লাবে ফেরার পথে ফার্মগেটের সামনে অহিউল্লাহকে দেখতে পেলো ও। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ঠেলে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলো। আড়ষ্ট হয়ে গেলো প্রদীপ্ত, ওর চোখের পলক পড়ে না, অহি ভাই তুমি?

তুমি কেমন আছো প্রদীপ্ত?

আমি তোমাকে দেখবো আশা করিনি। আমরা তো আমাদের সংকট কাটানোর পথে নেমেছি। দেখবে সমস্যার সমাধান হবে।

হা-হা করে হাসলো অহিউল্লাহ। জিজ্ঞেস করলো, তোমার ছেলে কেমন আছে?

তুমি তো ওকে দেখোনি।

তোমার মা কেমন আছে?

তুমি তো জানো মা'র শরীর ভালো নেই।

তোমার কি খারাপ লাগছে?

কেন?

কয়েকটি পত্রিকা বাদে তো সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হলো। তোমার তো চাকরি নেই।

তাতে কি হয়েছে? আমার ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন যে হলো এর মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে বড় কিছু পাবো।

হা-হা করে হাসলো অহিউল্লাহ, ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো প্রদীপ্তর। মুহূর্তে জোরে গাড়ির হর্ন বাজলে ওর চমক ভাঙে, বুঝতে পারে ও প্রায় রাস্তার মাঝামাঝি চলে এসেছে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। বন্ধুরা ওর আশেপাশে নেই। ওরা অনেক সামনে

BanglaBook.org

এগিয়ে গেছে। ও ফুটপাথে উঠে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, কেন তুমি আমার সামনে এসেছো অহি ভাই? আমি তো তোমাকে দেখতে চাইনি।

বাড়ি ফিরে পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকাকে বলে, আজ আমি অহিউল্লাহকে দেখেছি।

পুষ্পিতা শক্ত কণ্ঠে বলে, ভয় পাস না।

ভয় তো পাওয়ার কথা মা।

মঞ্জুলিকা হাসতে হাসতে বলে, জুজুবুড়ির ভয় পাওয়া তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে দীপ। আসলে কেন জানি বড় ঘটনা ঘটলে তোমার আশঙ্কা বাড়ে। বাবা কিন্তু এমন ছিলেন না। চা খাবে?

না, ভাত খাবো। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আমাদের জন্য একটা ভালো খবর আছে। তুমি জিতুর সঙ্গে দেখা করার জন্য যে দরখাস্ত দিয়েছিলে তার জবাব এসেছে। আগামী বুধবার বিকেল তিনটেয় সাক্ষাতের সময় দিয়েছে।

কতদিন দেখি না জিতুকে। আচ্ছা মা ওকেও কি আমরা মঞ্জুলিকার মতো ফেরত পাবো?

ও তো অস্ত্র আর টাকা চিনেছে দীপু। ও তো শুধু বন্যাকে হারানোর কষ্ট নিয়ে দূরে সরে যায়নি।

প্রদীপ্ত হাঁ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে অভিজ্ঞতা পুষ্পিতাকে জ্ঞান দিয়েছে।

ঘুমুবার আগে মঞ্জুলিকা বলে, তোমার তো চাকরি নেই দীপ।

চাকরি নেই ঠিক নয়, বেতন তো পাবো। কাজ নেই বলো। এ নিয়ে আমি ভাবি না। সাংবাদিক না থাকতে পারলে অন্য কিছু করবো। আমার ভয় অন্যত্র।

কি? মঞ্জুলিকা আগ্রহ নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এত বড় সৃষ্টিশীল কাজ কাদের নিয়ে করবেন? তাঁর চার পাশে যারা আছে তারা যদি তাঁকে বুঝতো তাহলে এত দুর্ভোগ হতো না। জানি না কি হবে। তিনি ভীষণ একা।

BanglaBook.org

প্রতীককে দেখার জন্য বুধবারে সবাই মিলে জেলখানায় বসে রইলো। নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে ওরা। প্রতীক খেতে পছন্দ করে এমন সব খাবার নিয়ে এসেছে পুষ্পিতা। মঞ্জুলিকাকে বললো, বৌমা জেলখানাতেও আসতে হলো আমার।

মঞ্জুলিকা অবাক হয়ে বললো, দুঃখ পাচ্ছেন কেন মা? ও তো অন্যায় করে আসেনি। ও তো রাজনীতির কারণে জেল খাটছে।

পুষ্পিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলো। সময় গড়িয়ে যায়, কিন্তু প্রতীক আসে না। একসময় সেপাই এসে জানালো, তিনি বলেছেন তিনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

হতবাক হয়ে যায় সবাই। মঞ্জুলিকা বলে, আপনি ঠিক বলেছেন তো? দেখা করবে না বলেছে?

হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

প্রদীপ্ত ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললো, ভাই আপনি আর একবার খবর দিন।

লোকটি চলে গেলো। পুষ্পিতা একবার খাবারগুলোর দিকে তাকায়, একবার প্রদীপ্তর দিকে।

বললো, ও এমন নিষ্ঠুর হলো কি করে দীপু?

অল্পক্ষণে লোকটি ফিরে এলো। বললো, না, আসবে না।

তাহলে এই খাবারগুলো ওকে দিয়ে আসুন।

লোকটি খাবার নিয়ে ফিরে এলো। বললো, ভীষণ রেগে গেছে। এসব খাবে না। বলেছে, জেলের খাবারই ভালো।

তাহলে আপনারা খাবেন।

পুষ্পিতা লোকটির হাতে খাবারগুলো তুলে দেয়। মঞ্জুলিকা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা চলুন।

জেলগেট থেকে বেরুবার সময় প্রদীপ্ত দেখলো অহিউল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। অহিকে দেখতে চায় না। কিন্তু দেখতে না চাইলে কি হবে। অহিউল্লাহ ওর পিছু ছাড়লো না। এই শহরের সর্বত্র ও দেখতে পায় অহিউল্লাহকে, ছায়ার মতো লেগে আছে। ও চেঁচিয়ে বলে, অহি ভাই দোহাই লাগে, তুমি আমার পিছে ঘুরবে না। আমার সামনে তো সুদিন। তবু কেন তুমি আমাকে দুর্দিনের ভয় দেখাচ্ছো। কিন্তু অহি তো কথা বলে না, ও কি বোবা হয়ে গেছে? নাকি এটা অহির ছায়া নয়, অন্য কেউ? প্রদীপ্ত ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলে মঞ্জুলিকা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

না তো, শরীর তো বেশ ঝরঝরে আছে। প্রদীপ্ত উজ্জ্বল চোখে তাকাবার চেষ্টা করে। মঞ্জুলিকা দেখতে পায় ওর চোখের নিচে কালি জমেছে। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকাকে অহির কথা বলতে পারে না। বললেই ও হেসে গড়িয়ে পড়বে। ও আলী আহমদের ঘরে এসে বসে। ছবিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা তুমি থাকলে বলে দিতে পারতে কেন আমি অহিউল্লাহকে দেখতে পাই শহরের এখানে-সেখানে।

BanglaBook.org

বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের চারটি মূল লক্ষ্য ঘোষণা করেন : দুর্নীতি উচ্ছেদ; উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় ঐক্য। প্রদীপ্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। দুর্নীতি উচ্ছেদ, সম্ভব কি? কাদের ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটবেন তিনি? তাঁর লোকও তো আছে, মানবে কি তাঁরা? নাকি এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাঁর হাত? উৎপাদন বৃদ্ধি? কারা করবে? যারা পাটের গুদামে আগুন লাগায়? সার কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটায়? বাজার লুট করে? কে আছে তাঁর সঙ্গে? কাদের ভরসায় তিনি এতবড় কাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন? জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ? হ্যাঁ, সম্ভব। সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। ওরাই তো তাঁর ভরসা। জাতীয় ঐক্য? কাদের নিয়ে? যারা নিজ নিজ ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত? দীর্ঘশ্বাস প্রদীপ্তকে পর্যদুস্ত করে রাখে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে কর্মসূচি। প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফরম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় পদ্ধতি হিসেবে শোষিতের গণতন্ত্র প্রবর্তন। তৃতীয়ত, গণমুখী প্রশাসন প্রবর্তন এবং সামাজিক স্থিতি রক্ষা করার লক্ষ্যে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। চতুর্থত, শোষণহীন সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ। পঞ্চমত, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ। কোথায় তিনি হাত দেননি? সবখানে ছুঁয়ে আছে তাঁর হাত। প্রদীপ্তর মনে হয় তিনি মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করছেন, তাঁর মানুষদের তিনি বাঁচাতে চান, যে মানুষের জীবনের হাড়ে গজিয়েছে তাঁর রাজনীতির ভিত। তাই মার্ক্স পড়া সমাজতন্ত্র নয় জীবন-অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষের জীবন-পড়া সমাজতন্ত্র

তিনি দেখতে চান তাঁর সোনার বাংলায়। ছয় মাস তিনি এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য লড়লেন। বিভিন্ন সভায় নিজের মনের কথা বললেন– সবাইকে ডাক দিলেন কর্মযজ্ঞে শরীক হওয়ার জন্য। আর প্রদীপ্ত ঘরে বসে নিজের ভাবনার মধ্যে বারবার দেখলো গুলিবিদ্ধ অহিউল্লাহকে, ওর মনে হলো অহিকে এখন আর ওর ভয় করছে না। অহির কাছ থেকে এক ধরনের শক্তি পাচ্ছে ও। মঞ্জুলিকা একথা শুনে ওকে বললো, তোমার যে কখন কি হয় বুঝি না। ও মঞ্জুলিকার নাক চেপে ধরে, বুঝতে হবে না সোনার মেয়ে।

ক'দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় সরগরম। বটতলায় প্যান্ডেল করা হচ্ছে, চারদিক সাজানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আসবেন, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন সদস্যপদ দেয়া হবে। প্রদীপ্ত কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে– উনসত্তরের গণআন্দোলনের কথা মনে পড়ে, একাত্তরে এই ভবনের ওপর প্রথম স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো হয়েছিলো। অপরাজেয় বাংলা তৈরি হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রেখেছে এই ভাস্কর্য। ও আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আগস্ট মাস। ভ্যাপসা গরম, চিড়বিড় করে গায়ের চামড়া। মা বলে এ গরমে তাল পাকে। প্রদীপ্ত হাসলো, মা যে কতকিছু জানে। দুপুরে বাড়ি ফিরে কাচকি মাছের দোপেঁয়াজা আর শুটকির ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়ে টানা ঘুম দিলো। বিকেলে ঘুম ভাঙলে মনে হলো মঞ্জুলিকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মা কাঁদছে। ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে চারদিকে তাকালো। ওর পাশে অজেয় ঘুমুচ্ছে। ও চিৎকার করে ডাকলো, মঞ্জুলি, মঞ্জুলি। ছুটে এলো মঞ্জুলিকা, কি হয়েছে?

তুমি কোথায় ছিলে?

এইমাত্র স্কুল থেকে ফিরলাম।

ও। প্রদীপ্ত মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়।

স্বপ্ন দেখেছো বুঝি যে আমি মারা গেছি?

না, খুন হয়েছো।

খিলখিলিয়ে হাসলো ও। বললো, আমার কোনো শত্রু নেই যে আমাকে খুন করবে।

এত বিশ্বাস? সবাই কি তোমাকে ভালোবাসে?

তুমি তো বাসো দীপ।

ওর কথা প্রদীপ্তর হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। মঞ্জুলিকা তাগাদা দিলো, হাঁ করে চেয়ে আছো কেন? হাতমুখ ধুয়ে নাও। মা লুচি ভেজেছে, খাবে।

মঞ্জুলিকা চলে গেলে ও ভাবলো, মঞ্জুলি আগের মতো সপ্রতিভ হয়েছে, এবং লাবণ্যময়ী।

সময় পেলেই সন্ধ্যায় প্রদীপ্ত সোনাইকে পড়ায়। আজ ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া গেলো না। মঞ্জুলিকা বললো, ও আজ পড়বে না।

পড়বে না? কেন?

ও শার্ট-প্যান্ট ইস্তিরি করছে। সকালে কাপড়চোপড় ধুয়েছে, জুতা পরিষ্কার করেছে। আমাকে বলেছে আজ যেন তুমি ওকে ছুটি দাও।

তো এত ফুলবাবু সেজে কোথায় যাবে? এমনিতে তো ধাইধাই করে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চেহারাও খুলেছে।

মঞ্জুলিকা হেসে গড়িয়ে পড়ে, হ্যাঁ, ও বেশ হ্যান্ডসাম বয়।

ঘটনাটা কি?

কাল ও বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাবে।

তাই বলো। ও চেঁচামেচি করে সোনাইকে ডাকে।

BanglaBook.org

কি রে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাবি? পুরনো জামা পরে দেখতে যাওয়া চলবে না। চল তোকে নতুন জামা কিনে দেবো। যা রেডি হয়ে আয়।

কী মজা, কী মজা– বলতে বলতে ও দৌড়ে চলে যায়। অজেয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবা সোনাই ভাইয়ার কি হয়েছে? ও এত খুশি কেন?

ওকে একটা লাল জামা কিনে দেবো।

আমাকেও লাল জামা কিনে দিও।

দেবো, দেবো। প্রদীপ্ত ওকে কোলে নিতে চায়। অজেয় দূরে সরে যায়, না তোমার কোল ভালো না। তোমার হাত নেই তুমি জড়িয়ে ধরতে পারো না। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আহ্ অজেয়, মঞ্জুলিকা ওকে টেনে নিয়ে যায়। প্রদীপ্ত কষ্ট পায়নি। ভাবলো, কত বয়স হলো ওর? প্রায় সাড়ে চার বছর। ও তো এটুকু বুঝতে শিখবেই।

জামা কিনে ওরা যখন ফিরে এলো তখন অজেয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সোনাই অজেয়র জামা ওর মাথার কাছে রেখে দেয়। মঞ্জুলিকা ঘুমিয়ে পড়লেও ঘুম আসে না প্রদীপ্তর। দুপুরের গাঢ় ঘুমের রেশ এখনো লেগে আছে। ও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। বই পড়ে, বারান্দায় পায়চারি করে। হঠাৎ ও কান খাড়া করে, ট্যাঙ্ক চলে যাওয়ার শব্দ আসছে না? যুদ্ধ করার সময় যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সবসময় সজাগ থাকত তেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওর ভেতর জেগে উঠেছে। হ্যাঁ, ও স্পষ্ট ট্যাঙ্কের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওর ভেতরটা মোচড়াতে থাকে। এত রাতে ট্যাঙ্ক নেমেছে কেন রাস্তায়? কোনো সামরিক অভ্যুত্থান? আবার সামরিক শাসন কি বাংলাদেশের নিয়তি? শেষ রাতের দিকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পায়। ঘামে ভিজে যায় গেঞ্জি। এক সময় প্রবল অবসাদে ইজিচেয়ারে বসে পড়ে। তখন ওর দু'কান ভরে বাজতে থাকে সেই বজ্র কণ্ঠের একটি বাক্য : 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।' কতদিন একা একা এই বাক্যটি আউড়েছে ও। যুদ্ধের সময় সহযোদ্ধাদের শিখিয়েছিলো বাক্যটি, বলেছিলো গুলি চালানোর সময় মনে সাহস রাখবে এই বলে যে আর দাবায়ে রাখবার পারবা না। সবাই শিখেছিলো লাইনটি, কেউ কেউ নিজে নিজ সুর করে গাইতো, বিশ্রামের সময় সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হতো। সুরের কোনো ঠিক ছিলো না। তবুও মুহূর্তে বদলে যেত পরিবেশ। এই মুহূর্তে ওর মনে হয় তাহলে কি সেই মানুষটিকে সেনাবাহিনীর কেউ ট্যাঙ্কের নিচে দাবিয়ে ফেললো? স্তব্ধ হয়ে গেলো কি বজ্র কণ্ঠ? নাকি তার জন্য আবার জেল? কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রদীপ্ত টের পায় না।

সকালবেলা মঞ্জুলিকার চিৎকারে ঘুম ভাঙে। পুষ্পিতা ও সোনাই ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। প্রদীপ্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পুষ্পিতা চেঁচিয়ে বলে, কি হয়েছে বৌমা?

রেডিও শুনুন। দু'হাতে মুখ ঢেকে মঞ্জুলিকা বিছানার ওপর বসে পড়ে।

তখনো ভেসে আসছে মেজর ডালিমের কণ্ঠ– ঘরজুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে মেজর ডালিমের কণ্ঠ : শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। প্রদীপ্তর মনে হলো ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না– চারদিকে প্রবল ট্যাঙ্কের শব্দ। ও ছুটে বেরুনোর জন্য উঠে দাঁড়ায়। মঞ্জুলিকা ওকে জড়িয়ে ধরে, কোথায় যাচ্ছো?

ছাড়ো।

বাইরে কারফিউ।

রেডিওতে ঘোষণা হচ্ছে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। বলা হচ্ছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। প্রদীপ্ত ঠাণ্ডা গলায় বলে, রেডিওটা বন্ধ করে দাও।

মঞ্জুলিকা বন্ধ করে না। বলে, ওরা কি বলছে শোনো।

সোনাই কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে বলে, বঙ্গবন্ধুকে কারা হত্যা করেছে মামা?

মিলিটারি অফিসাররা।

BanglaBook.org

যাই আমি দেখে আসি কিভাবে পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু।

না, না বাইরে বেরুলে তোকে গুলি করবে।

বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাবার জন্য মামা আমাকে নতুন জামা কিনে দিয়েছে। নানু জামাটা আমি পরেছি। আমি যাবোই। গুলি করলে করুক।

পুষ্পিতা ওর হাত চেপে ধরে, পাগলামি করিস না সোনাই।

ছাড়েন, ছাড়েন কারো সাধ্যি নাই আমাকে ধরে রাখার।

ছুটে বেরিয়ে যায় সোনাই। পুষ্পিতা পিছু ছুটতে গেলে প্রদীপ্ত নিষেধ করে, থাক মা, যেও না। ও ঠিকই বলেছে আমাদের সাধ্যি নেই ওকে ধরে রাখার। শুধু সোনাইর কণ্ঠ বজ্রকণ্ঠ হয়ে গেলে প্রদীপ্ত শুনতে পায় সেই অমোঘ বাণী, আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।

পুষ্পিতা কাঁদতে থাকে, যদি ছেলেটাকে মেরে ফেলে।

মঞ্জুলিকা বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখে, কোথাও সোনাই নেই। জনশূন্য রাস্তা। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, মনে হয় রাস্তাটা শূন্য নয়– কারা যেন ছুটে যাচ্ছে– বিশাল থামের মতো পা। ও চিৎকার করে প্রদীপ্তকে ডাকে।

প্রদীপ্ত আর পুষ্পিতা ছুটে আসে। মঞ্জুলিকা চেঁচিয়ে বলে, দেখতে পাচ্ছো রাস্তায় ওরা কারা?

কি বলছো বৌমা? কেউ তো নেই।

ভালো করে দেখুন মা।

তুই কি কাউকে দেখতে পাচ্ছিস দীপু?

প্রদীপ্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, ঘরে চলো মঞ্জুলি। মঞ্জুলিকাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখায়। বলে, এত মানুষ কোথা থেকে এলো? ওরা বন্দুকের নলের সামনে কিভাবে যাচ্ছে? ওদের কি ভয় নেই?

এই প্রথম তুমি অহিউল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো।

মঞ্জুলিকা ও পুষ্পিতা হাঁ করে প্রদীপ্তর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রদীপ্ত বলে, ট্যাঙ্কের সামনে অহিউল্লাহই যেতে পারে। রাস্তাটা আজ ওর।

দুপুরের পর ফিরে আসে সোনাই। নতুন জামা ছিঁড়ে গেছে। পিঠে কালশিটে পড়েছে। চোখমুখ ফোলা, গালে কাটা দাগ। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেঁতলে গেছে। সবাই বোঝে ও সেপাইদের হাতে মার খেয়েছে। কিন্তু কেউ ওকে কোনো প্রশ্ন করে না। মঞ্জুলিকা ডেটল দিয়ে মুছে দেয় ওর কাটা জায়গাগুলো। প্রদীপ্ত ওকে একটা পেইন কিলার এবং ঘুমের বড়ি খাইয়ে দেবার সময় ওর মনে পড়ে সতেরো বছর বয়সে ও নিজে মিলিটারির হাতে মার খেয়েছিলো। আলী আহমদ থাকলে হয়তো বলতো আবার কি একজন জেনারেল-প্রেসিডেন্ট এলো আমাদের ঘাড়ের ওপর? ও সরাসরি পুষ্পিতার দিকে তাকালে দেখতে পায় পুষ্পিতা শক্তমুখে বসে আছে। ওর চোখে চোখ পড়লে রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসে। দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সোনাই।

বিকেলে অজেয় প্রদীপ্তর কোলে উঠে বলে, তুমি কাঁদছো কেন বাবা? তোমার কি হয়েছে?

প্রদীপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে।

তোমার হাত নেই, চোখ নেই সেজন্য কাঁদছো?

না, বাবা না। প্রদীপ্ত ফুঁপিয়ে ওঠে, বুকটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি তো বলো তোমার হাত যুদ্ধকে দিয়েছো। কেন তোমার হাত যুদ্ধকে দিয়েছো বাবা?

BanglaBook.org

তোমার জন্য সোনা, তোমার জন্য।

ও বাবার কণ্ঠের উত্তাপ অনুভব করে বাবার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়।

প্রদীপ্ত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে পুষ্পিতা ও মঞ্জুলিকাকে ডাকে। বলে, আমি ওর নামটা ঠিক করে রাখতে চাই। আজ থেকে ওর নাম অজেয় মৃত্যুঞ্জয় মুজিব।

বাড়ি ১৬/এ, সড়ক-২
শ্যামলি, ঢাকা-১২০৭
১৮-১০-৯৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG